শিশু-বিশ্বকোষ : দ্বিতীয় খণ্ড

ক থেকে জ

শিশু-বিশ্বকোষ

মাত্র ১৯ মাস বয়সে গুরুতর মস্তিষ্কজ্বরে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলল একটি মেয়ে। কিন্তু তার জানবার, দেখবার ও বলবার আগ্রহ ছিল প্রবল আর সে ছিল অসাধারণ মেধাবী। একান্ত অধ্যবসায়ে সে ১০ বছর বয়সে আবার ফিরে পেল তার বাক্‌শক্তি। এর পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে সে শুধু তার মাতৃভাষা ইংরেজিই শিখল না, ফরাসি, জার্মান ও গ্রিক ভাষাও আয়ত্ত করল। এই শিশুর নাম কী? —পরবর্তী কালে সারা বিশ্ব জেনেছিল, ইনিই হেলেন কেলার।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের এক মেরুদণ্ডী প্রাণী। নাম কোয়ালা। স্ত্রী কোয়ালাদের পেটের চামড়া ভাঁজ হয়ে থলের মতো একটি অঙ্গ সৃষ্টি করে। একে মার্সুপিয়াম বলে। মার্সুপিয়ামের ভেতরে থাকে এদের স্তনগ্রন্থি। এদের বাচ্চা জন্মানোর পর পরই মার্সুপিয়ামের ভেতর চলে যায় এবং অনবরত মায়ের দুধ খেয়ে বড় হতে থাকে।

ক্যান্সার বা কর্কট রোগের চরিত্র বহুমুখী ও জটিল। ত্বক, ফুসফুস, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, বৃক্ক, মূত্রাশয়, মলাশয় থেকে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, মস্তিষ্ক ও রক্তকোষের ক্যান্সারসহ দুই শ'রও অধিক ধরনের ক্যান্সার মানবদেহ আক্রমণ করে থাকে এবং ক্যান্সারে মৃত্যুর সংখ্যা এখনো অনেক রোগের চাইতে বেশি। অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞানের চোখে ক্যান্সার এখনো রহস্যই রয়ে গেছে।

আদিম মানুষেরা কুকুর বা অন্যান্য প্রাণীর নখ ও দাঁত, ভালুকের হিংস্র চোয়াল, ঝিনুক বা শুক্তি, রঙিন পাথর ইত্যাদিতে ছিদ্র করে অলঙ্কার- রূপে ব্যবহার করত। তারা ভাবত এতে মঙ্গল হয়। শত্রুমিত্র সবার ওপর জাদুবলে প্রভাব বিস্তার করা

(বাকি অংশ শেষ প্রচ্ছদের ফ্ল্যাপে)

www.pathagar.com

যায়, স্বাস্থ্য অটুট থাকে। নারী অপেক্ষা পুরুষই তখন বেশি অলঙ্কার ব্যবহার করত। কাজেই ধারণা করা হয় দেহের শোভা বাড়াবার জন্য নয়, জাদুশক্তি বা অন্য কোনো কারণে অলঙ্কারের প্রচলন হয়েছিল।

অনাদিকাল থেকে গোলাপ পৃথিবীর সর্বত্র জনপ্রিয়। বাগানের ছোট্ট গোলাপ থেকে দীর্ঘগুল্ম বা লতানে গোলাপসহ শত শত রকমের গোলাপ রয়েছে। প্রধানত ৭টি প্রজাতি থেকে আধুনিক সঙ্কর গোলাপের উৎপত্তি।

পেট্রোল-ইঞ্জিনচালিত প্লেন উদ্ভাবনের আগে পাখিদের ডানার ও ওড়ার কৌশল অনুসরণ করে ইঞ্জিনবিহীন এক প্লেন নির্মাণ করা হয়েছিল। তার নাম কী ?
—গ্লাইডার

ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সমাজ, সভ্যতা উদ্ভিদজগৎ, প্রাণিজগৎসহ জ্ঞানের সকল শাখার এমনি সব কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়বস্তু নিয়ে শিশু-বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খণ্ড। ভুক্তি বিষয়গুলোকে মানববিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি —প্রধানত এই তিন বিভাগে ভাগ করে নিয়ে জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যরাজি এখানে তুলে আনা হয়েছে। বাংলা বর্ণক্রম অনুসারে বিন্যস্ত শিশু-বিশ্বকোষের এই খণ্ডে ক থেকে জ বর্ণের মোট ৭৩৩টি ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিভাগ অনুসারে ভুক্তি বিষয়ের সংখ্যা এরকম :

বিভাগ	মূলভুক্তি	দ্রষ্টব্যভুক্তি	মোট
মানববিদ্যা	২৭৭	৫০	৩২৭
সমাজবিজ্ঞান	১৪২	৩৮	১৮০
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	২০২	২৪	২২৬
মোট ভুক্তি	৬২১	১১২	৭৩৩

মূল্য : ৳ ২২৫.০০

ISBN : 984-09-0364-0

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

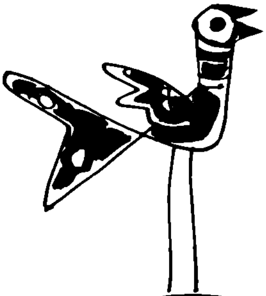

শিশু-বিশ্বকোষ

www.pathagar.com

শিশু-বিশ্বকোষ : ২য় খণ্ড

বাশিশুএ ৩৬৪

প্রকাশক : গোলাম কিবরিয়া, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণ : বাংলাদেশ প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ প্রেস লিঃ, ৪৬/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪০৩, জুলাই ১৯৯৬।

মূল্য : ৳ ২২৫.০০

SHISHU-BISWAKOSH (Children's Encyclopaedia) Vol - 2. Publisher : Golam Kibria, Director, Bangladesh Shishu Academy. Old High Court Compound, Dhaka-1000, Bangladesh. Date of Publication : July 1996.

Price : Tk. 225.00
US $ 12.00

ISBN : 984-09-0364-0

প্রচ্ছদ শিল্পী : হাশেম খান

ছবি এঁকেছেন : গোপেশ মালাকার, সিরাজুল হক, হাশেম খান

আলোকচিত্রের জন্য কৃতজ্ঞতা : নাসির আলী মামুন, পাভেল রহমান, শিহাব উদ্দিন, শান্তনু খান, হাশেম খান।

---

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খণ্ড

শিশু-বিশ্বকোষ

ক থেকে জ

প্রকল্প পরিচালক
গোলাম কিবরিয়া
প্রকল্প সহযোগী
বিপ্রদাশ বড়ুয়া
মো. নাজিমউদ্দিন
ব্যবস্থাপনা সহযোগী
সুজন বড়ুয়া
মুদ্রণ সহায়ক
মোহাম্মদ ইবরাহিম
টিপু কিবরিয়া

সম্পাদনা পরিষদ

আবদুল্লাহ আল-মুতী—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
আহমদ রফিক—সমাজবিজ্ঞান
মনসুর মুসা—মানববিদ্যা
হায়াৎ মামুদ—শৈলী সম্পাদক ও সমন্বয়ক
হাশেম খান ও সিরাজুল হক—শিল্প সম্পাদক

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

www.pathagar.com

শিশু-বিশ্বকোষ ব্যবহারের পদ্ধতি

ক. সকল ভুক্তি (entry) অভিধানগ্রন্থের সাদৃশ্যে বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হয়েছে। সেই অনুক্রম নিম্নরূপ :

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ						
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ						
ট	ঠ	ড	ড়	ঢ	ঢ়	ণ				
ত	ৎ	থ	দ	ধ	ন					
প	ফ	ব	ভ	ম						
য	য়	র	´(রেফ্)	ল						
শ	ষ	স	হ							

খ. ইলেক্, ফলা ও কার এবং হসন্ত সংযুক্তির ক্রমিক উদাহরণ :

অ	অং	অঃ	অঁ	অক	অক্ত	অক্ক ইত্যাদি		
ক	কই	কউ	কও	কং	কঃ	কঁ		
ক ক	ককো	ককি	ককী	ককু	ককূ	ককৃ	ককে	ককৈ
	ককো	ককৌ	কক্					
কক্ক...	কক্ত...	কক্ব...	কক্য...	কক্র...	কক্ল...	কক্ষ		
কখ...	কঠ...	কড...	কড়...	কঢ...	কঢ়...	কণ...	কত...	কৎ...
	কথ...	কদ...	কধ...	কন...	কপ...	কফ...	কব...	কভ...
	কম...	কয...	কয়...	কর...	করৌ...	কর্...	কর্ক...	কর্ক্...
	কর্কট...	কর্হ...						
কল	কশ	কষ	কস	কহ...	কহৌ	ইত্যাদি		

www.pathagar.com

গ. দেশী বা বিদেশী যে কোনো নামের ক্ষেত্রে চলতি রেওয়াজ মানা হয়েছে : নামটি আমরা সচরাচর যেমন বলে থাকি, অর্থাৎ নামের যে অংশটি প্রধানত মনে রাখি ভুক্তিতে সেভাবে দেওয়া হয়েছে। তবে বিদেশী নাম খুঁজবার একটা স্বাভাবিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে—পদবি ধরে খোঁজা। আমরা সে নিয়মও মেনেছি; যেমন—উইলিয়াম শেক্সপীয়র, আলবার্ট আইনস্টাইন, জিগমুণ্ড ফ্রয়েড ইত্যাদি নাম পেতে হলে উইলিয়াম, আলবার্ট, জিগমুণ্ড ইত্যাদি না খুঁজে তাঁদের বংশগত পদবি (Surname বা family name) শেক্সপীয়র, আইনস্টাইন, ফ্রয়েড ইত্যাদি খুঁজে দেখতে হবে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা কাজী নজরুল ইসলামকে পেতে হলে ঠাকুর বা ইসলাম খুঁজলে পাওয়া যাবে না, 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাজী' খুঁজে বের করতে হবে। অন্য দিকে আতাউল গনি ওসমানী কি সঙ্গীতজ্ঞ আলাউদ্দিন খাঁ-কে পেতে হলে ওসমানী (যেহেতু নামের এই অংশটুকুই সবাই জানেন) এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন (যেহেতু এঁদের নামের পূর্বে সর্বদা আমরা 'ওস্তাদ' বলে থাকি) খুঁজতে হবে।

ঘ. ভুক্তির ভিতরে কোথাও দ্র থাকলে বুঝতে হবে যে এর পূর্ববর্তী শব্দটির জন্য পৃথক ভুক্তি যথাস্থানে রয়েছে। যেমন ধরা যাক—'ওদিসি' ভুক্তির রচনাতে হোমার, মহাকাব্য, ভার্জিল, ঈনীদ ও জয়েস শব্দগুলোর পরে দ্র মুদ্রিত হয়েছে; এর অর্থ, এই বিশ্বকোষের নির্দিষ্ট খণ্ডের ভিতরে উপর্যুক্ত পাঁচটি ভুক্তিতে এসব প্রসঙ্গের আলোচনা আছে। কখনো-বা একটি ভুক্তির জন্য অন্য ভুক্তির শিরোনামের পাশে দ্র লিখে তা দেখবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ঙ. ভুক্তির ভিতরে ব্যবহৃত শব্দসঙ্কেত নিম্নরূপ :

আ.	=	আলায়হিস্ সালাম
আনু.	=	আনুমানিক
কিমি	=	কিলোমিটার
কেজি	=	কিলোগ্রাম
খ্রি.	=	খ্রিস্টাব্দ
খ্রি. পূ.	=	খ্রিস্টপূর্বাব্দ
ড.	=	ডক্টর
ডা.	=	ডাক্তার
দ্র	=	দ্রষ্টব্য
ব.	=	বঙ্গাব্দ
মি.	=	মিটার
মিমি	=	মিলিমিটার
মো.	=	মোহাম্মদ
রা.	=	রাদি'য়াল্লাহু আন্হু
শা.	=	শাসনকাল
স.	=	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
সিসি	=	কিউবিক সেন্টিমিটার
সে.	=	সেন্টিগ্রেড / সেলসিয়াস

www.pathagar.com

লেখকদের নাম-সঙ্কেত

অ. ব.	=	অজয় বড়ুয়া
আ. আ.	=	ড. আলী আসগর
আ. আ. মু.	=	ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী
আ. আ. হা.	=	ডা. আফরোজা আখতার হালিদা
আ. ই.	=	আমীরুল ইসলাম
আ. ক.	=	অধ্যাপক আহমদ কবির
আ. কা.	=	আবু কায়সার
আ. ন. ম. আ. র.	=	ডা. আ. ন. ম. আমিনুর রহমান
আ. মা.	=	আহমাদ মাযহার
আ. র.	=	ডা. আহমদ রফিক
আ. হ. খ.	=	আবদুল হক খন্দকার
আ. হা.	=	আবুল হাসানাত
আ. হু.	=	আখতার হুসেন
আজ. ই.	=	আজহার ইসলাম
ক. গো.	=	ড. করুণাময় গোস্বামী
ক. চৌ.	=	অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
কা. আ. আ.	=	কাজী আবদুল আলীম
কা. ম.	=	কাজী মদিনা
খু. জা.	=	অধ্যাপক খুরশীদ জাহান
টি. কি.	=	টিপু কিবরিয়া
ত. চ.	=	তপন চক্রবর্তী
নি. অ.	=	নিরঞ্জন অধিকারী
ফ. মা.	=	ফরহাদ মাহমুদ
ফ. র.	=	ফরিদুর রহমান
ফা. ন.	=	ফারুক নওয়াজ
ব. চৌ.	=	ডা. এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী
বি. ব.	=	বিপ্রদাশ বড়ুয়া
ম. আ.	=	মতলুব আলী
ম. আ. খা.	=	মনসুর আহমদ খান
ম. মু.	=	অধ্যাপক মনসুর মুসা
ম. র.	=	মনজুরুর রহমান
ম. হ.	=	মফিদুল হক
মা. র.	=	ডা. মাসউদুর রহমান
মু. আ.	=	মুহাম্মদ আলী
মু. ই.	=	ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
মু. এ.	=	মুহাম্মদ এলতাসউদ্দিন
মু. মা.	=	মুস্তাফা মাসুদ
মু. হা.	=	মুনির হাসান
মে. খা.	=	মেহ্‌জাবীন খান
মো. ই.	=	মোহাম্মদ ইবরাহিম
মো. হো.	=	মোস্তফা হোসেইন
র. শা.	=	রহীম শাহ্
র. হা.	=	রশীদ হায়দার
রু. হা.	=	ডা. এস. কে. রুহুল হাসিন
শ. আ.	=	শফিউল আলম
শ. আহ.	=	শফি আহমেদ
শ. খা.	=	শরীফ খান
শা. চৌ.	=	শামসুদ্দিন চৌধুরী
শা. ত.	=	ড. শাহজাহান তপন
শা. হ.	=	শামসুল হক
শু. চৌ.	=	ডা. শুভাগত চৌধুরী
স. রা.	=	ড. সত্যব্রত রায়
সা. এ.	=	ডা. সাইফুদ্দীন একরাম
সি. আ.	=	সিরাজউদ্‌দীন আহমেদ
সি. না. হ.	=	ডা. সিকদার নাজমুল হক
সু. ব.	=	সুব্রত বড়ুয়া
সুজ. ব.	=	সুজন বড়ুয়া
সে. এ.	=	সেতারা এলিন
সে. শা.	=	সেলিনা শাহজাহান
সে. হো.	=	সেলিনা হোসেন
সৈ. আ. ই.	=	সৈয়দ আমীরুল ইসলাম
সৌ. মা.	=	সৌম্য মামুদ
হা. খা.	=	অধ্যাপক হাশেম খান
হা. মা.	=	ড. হায়াৎ মামুদ
হা. র.	=	হাসানুর রহমান
হো. আ.	=	হোসনে আরা

www.pathagar.com

শুভেচ্ছা ....

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ক

কংক্রিট (concrete)

সিমেন্ট (দ্র), বালি, খোয়া (ইটের টুকরো), পাথরের টুকরো পানির সঙ্গে মিশিয়ে যে নির্মাণসামগ্রী বা মসলা তৈরি করা হয়, তাকে ঢেলে চাপ দিয়ে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। তাকে বলে কংক্রিট।

সাধারণ কংক্রিটের চাপ ও আঘাত সহ্যের ক্ষমতা কম। তাই মধ্যখানে লোহা (দ্র) বা ইস্পাতের (দ্র) রড রেখে তার চারিদিকে কংক্রিট জমালে তা অত্যন্ত শক্ত এবং চাপ ও ঘাতসহ হয়। এ ধরনের কংক্রিটকে বলে রি-ইনফোর্সড্ (re-inforced) কংক্রিট। কংক্রিটের মধ্যে বাতাসের পরিমাণ যত কম এবং পানি ও সিমেন্টের অনুপাত যত বেশি হয় কংক্রিট তত বেশি শক্ত হয়।

কংক্রিট নির্মাণকাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাকা বাড়ি, দালান-কোঠা, পুল-কালভার্ট নির্মাণে কংক্রিট অপরিহার্য। সম্প্রতি বিভিন্ন ধরনের মূর্তি, ম্যুরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণেও কংক্রিট ব্যবহৃত হচ্ছে।

স. রা.

কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্র

কংস

দুষ্ট প্রকৃতির প্রজাপীড়নকারী ভোজবংশীয় রাজা ছিলেন। তিনি মগধরাজ জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিবাহ করেন। তিনি জরাসন্ধের সহায়তায় বৃদ্ধ পিতা রাজা উগ্রসেনকে বন্দি করে মথুরার রাজা হন। এ সময় কংসের বোন দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিবাহ হয়। বিবাহে উপস্থিত থাকাকালে তিনি দৈববাণী শুনতে পান যে দেবকীর অষ্টম সন্তান তাঁকে বধ করবে। তাই তিনি বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করেন। কারাগারে এঁদের পর পর সাতটি সন্তান হয়, তাদের সকলকে কংস হত্যা করেন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে মধ্যরাতে কৃষ্ণ (দ্র) নামে অষ্টম পুত্রের জন্ম হয়। বংশধারা রক্ষার জন্য বসুদেব তক্ষুণি কৃষ্ণকে গোকুলে গোপরাজ নন্দের ঘরে গোপনে রেখে দেন। সেই রাতেই নন্দের স্ত্রী যশোদার এক কন্যা যোগমায়া জন্মগ্রহণ করে। বসুদেব গোপনে কৃষ্ণকে যশোদার ঘরে রেখে তার সদ্যোজাত কন্যা যোগমায়াকে নিয়ে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করেন। কংস তখন যোগমায়াকে পাথরে নিক্ষেপ করে হত্যা করতে আদেশ দেন, কিন্তু যোগমায়া নিক্ষিপ্ত অবস্থায় আকাশে উঠে বলেন, 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'।

কংস কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করে হত্যা করার অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে যায়। এর পর কংস যজ্ঞ করে কৌশলে কৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন করেন। এই অনুষ্ঠানে কংসের মল্লযোদ্ধারা কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়। এতে কংস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দুই ভাই কৃষ্ণ ও বলরামকে নির্বাসনে পাঠাবার আদেশ দেন। এ ছাড়া তিনি নন্দকে বন্দি এবং উগ্রসেন ও বসুদেবকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এই আদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ কংসকে আক্রমণ করেন এবং সিংহাসন থেকে ছুঁড়ে মেরে হত্যা করেন। কংসের আট ভাই বাধা দিলে বলরাম তাদের হত্যা করেন। পরে কৃষ্ণ মাতাসহ উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসিয়ে মথুরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

বি. ব.

কক, রবার্ট [১৮৪৩—১৯১০]

জার্মান চিকিৎসক রবার্ট কক (Robert Koch) জীবাণুবিদ্যার (দ্র) প্রবর্তকদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। রবার্ট ককের জন্ম ১৮৪৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন জার্মানির গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৬৬ সালে তিনি ডাক্তারি পাশ করেন।

রবার্ট কক জীবাণুর বংশবিস্তার এবং রঞ্জনকরণ (staining)-এর নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি এনথ্রাক্স রোগের জীবাণুর গঠন ও বংশবিস্তার সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ১৮৭৬ সালে এই জীবাণুর নতুন একটি উপপ্রজাতি আবিষ্কার করেন।

১৮৭৮ সালে রবার্ট কক ক্ষতস্থানে সংক্রমণের সঙ্গে রোগজীবাণুর সম্পর্ক আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর অসামান্য কীর্তি হল যক্ষ্মা (দ্র) ও কলেরা (দ্র) রোগের জীবাণু

www.pathagar.com

আবিষ্কার। এর পর তিনি শরীরে যক্ষ্মা রোগের উপস্থিতি নির্ণয়কারী উপাদান 'টিউবারকুলিন' (Tuberculin) আবিষ্কার করেন। যক্ষ্মা রোগের জীবাণু থেকেই তৈরি এই টিউবারকুলিন। তাঁর এই অসামান্য অবদানের কারণে যক্ষ্মাজীবাণু কক্স্ ব্যাসিলাস (Koch's bacillus) নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

কলেরার জীবাণু আবিষ্কারের পাশাপাশি পানীয় জল, খাবার ও কাপড়চোপড়ের মাধ্যমে কলেরা রোগের বিস্তার সম্পর্কেও গবেষণার জন্য তিনি ১৮৯১ সালে বার্লিনে সংক্রামক ব্যাধি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে (দ্র) বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯০৫ সালে নোবেল পুরস্কার (দ্র) পান। ১৯১০ সালের ২৭শে মে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সি. না. হ.

কক্সবাজার

জেলা ও শহর। ইংরেজ কর্মচারী ক্যাপ্টেন কক্স-এর নাম থেকে ১৭৯৮ সালে এর নাম হয় কক্স্স্ বাজার (Cox's Bazar), লোকমুখে হয়েছে কক্সবাজার। সমুদ্রতীরবর্তী মনোরম ও স্বাস্থ্যকর শহর হিসাবে বিখ্যাত। জেলার আয়তন ২,৪৯২ বর্গ কিমি। এ জেলায় ৭টি থানা আছে—উখিয়া, কক্সবাজার, কুতুবদিয়া, চকরিয়া, টেকনাফ, মহেশখালি ও রামু। এটি বাংলাদেশের (দ্র) দক্ষিণতম জেলা। মহেশখালি, সেন্ট মার্টিন (দ্র), কুতুবদিয়া ও সোনাদিয়া দ্বীপ এ জেলার অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব-উপকূল ধরে সরু পর্বতময় ভূখণ্ড এটি। দক্ষিণ প্রান্তে নাফ নদী মায়ানমার (দ্র) ও কক্সবাজারের সীমা নির্ধারণ করে। এর পূর্বে বান্দরবন জেলা, উত্তরে চট্টগ্রাম জেলা এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। বাকখালি ও মাতামুহুরি প্রধান নদী। এ জেলায় কিছু সংরক্ষিত বন আছে। জেলার অধিবাসী মুসলমান, হিন্দু (দ্র) ও বৌদ্ধ (দ্র) ধর্মাবলম্বী। অল্প সংখ্যক মারমা (দ্র), রাখাইন (দ্র), মুরং প্রভৃতি উপজাতি এ জেলায় বাস করে।

কক্সবাজার শহর থেকে বদরমোকাম পর্যন্ত একটানা ১২০ কিমি সমুদ্রসৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম বেলাভূমি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই বেলাভূমি পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

কক্সবাজার সমুদ্রতীরে জেলে

কক্সবাজারের কাছে রামুর বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার বা ক্যাং (অষ্টাদশ শতক)

মৎস্য ও পর্যটনশিল্পের জন্য কক্সবাজার বিখ্যাত। কাঁচা মাছ ও শুঁটকি এখান থেকে দেশের অন্যান্য জায়গায় সরবরাহ করা হয়। সোনাদিয়ার শুঁটকির সুনাম রয়েছে। সমুদ্রের মাছের মধ্যে ইলিশ (দ্র), রূপচাঁদা, লাক্ষা, পোয়া, রীটা, কোরাল, হাঙর (দ্র), শাপলাপাতা, ছুরি, লইট্যা, শঙ্কর ইত্যাদি রয়েছে। কচ্ছপ, কাঁকড়া (দ্র) ইত্যাদিও পাওয়া যায়। এ জেলায় ব্যাপকভাবে চিংড়ির চাষ হয়। উপকূল অঞ্চলে লবণ (দ্র) উৎপন্ন হয়। সেন্ট মার্টিন (দ্র) বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য এই দ্বীপ

www.pathagar.com

কক্সবাজারের সমুদ্র-উপকূল—শিল্পীর স্কেচ

অত্যন্ত আকর্ষণীয়। জাহাজ (দ্র) চলাচলে সুবিধার জন্য কুতুবদিয়ায় বাতিঘর আছে। মহেশখালির পাহাড়ে আদিনাথের মন্দির হিন্দুদের তীর্থস্থান। এখানে বৌদ্ধদেরও তীর্থস্থান রয়েছে। দ্বীপের রাখাইন বৌদ্ধ বিহার (দ্র) দর্শনীয় স্থান। শহরের বৌদ্ধ বিহার বা প্যাগোডা খুবই প্রাচীন। এখানে একটি প্রাচীন কাঠের তৈরি বৌদ্ধ বিহার শতাব্দীর সৌন্দর্য নিয়ে এখানো অম্লান। কক্সবাজার শহরে একটি বিমানবন্দর আছে। প্রবাল, শঙ্খ, ঝিনুক ও ঝিনুকের তৈরি জিনিসের জন্য এই শহর বিখ্যাত। কক্সবাজার জেলায় সামুদ্রিক ঝিনুক থেকে চুন (দ্র) তৈরি হয়। এই চুন জনসাধারণ পানের সঙ্গে খেয়ে থাকেন। মহেশখালি দ্বীপ ভালো জাতের পান উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া চুরুট, কাপড়ের থলে ও তাঁতে তৈরি মোটা লুঙ্গির জন্য কক্সবাজার শহর বিখ্যাত। এই শহরের লোকসংখ্যা ৫৫,০০০ (১৯৯১ সালের হিসাব মতে)। ঘন ঘন সামুদ্রিক ঝড় (দ্র) ও জলোচ্ছ্বাসে এই জেলার জনসাধারণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এতে প্রচুর লোক ও গবাদি পশুর প্রাণহানি হয়।

বি. ব.

কচি ও কাঁচা শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

কচু

কচু আমাদের অতি পরিচিত একটি উদ্ভিদ। বাংলাদেশের (দ্র) প্রায় সব এলাকায় কমবেশি কচু দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তার পাশে, বাড়ির আনাচে-কানাচে, বিভিন্ন পতিত জমিতে অনাদরে-অবহেলায় অনেক সময় কচুর ঝোপ হয়ে থাকতে দেখা যায়। বহু জাতের কচু রয়েছে। কিছু কিছু জাতের কচু রীতিমতো যত্নের সঙ্গে চাষ করতে হয়।

বনে-জঙ্গলে যেসব কচু আপনাআপনি জন্মায় সেগুলোকে সাধারণ বুনো কচু বলে। এর সবগুলো মানুষের খাবার উপযোগী নয়। খাবার উপযোগী জাতগুলোর অন্যতম হচ্ছে মুখীকচু, পানিকচু, পঞ্চমুখীকচু, পাইদনাইল, ওলকচু, দুধকচু, মানকচু ইত্যাদি। সবজি হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও সৌন্দর্যের কারণে কিছু কিছু প্রজাতির কচু টবে ও বাগানে চাষ করা হয়। এদের মধ্যে কতকগুলোর রয়েছে বেশ বাহারী পাতা, আবার কতকগুলোর রয়েছে অত্যন্ত সুন্দর ফুল।

অনুমান করা হয়, কচুর উৎপত্তি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। প্রায় দু' হাজার বছর আগেও কচুর চাষ হত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। স্থলভূমি ও জলভূমি উভয় স্থানেই কচু জন্মাতে পারে। তবে স্থলভাগে জন্মানো কচুর সংখ্যাই বেশি।

কচুর বহু রকম আয়ুর্বেদীয় গুণাগুণ আছে বলে দাবি করা হয়। প্রজাতিভেদে কচুর মূল, শিকড় বা লতি, পাতা ও ডাঁটা সবই মানুষের খাদ্য। কচু শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন

www.pathagar.com

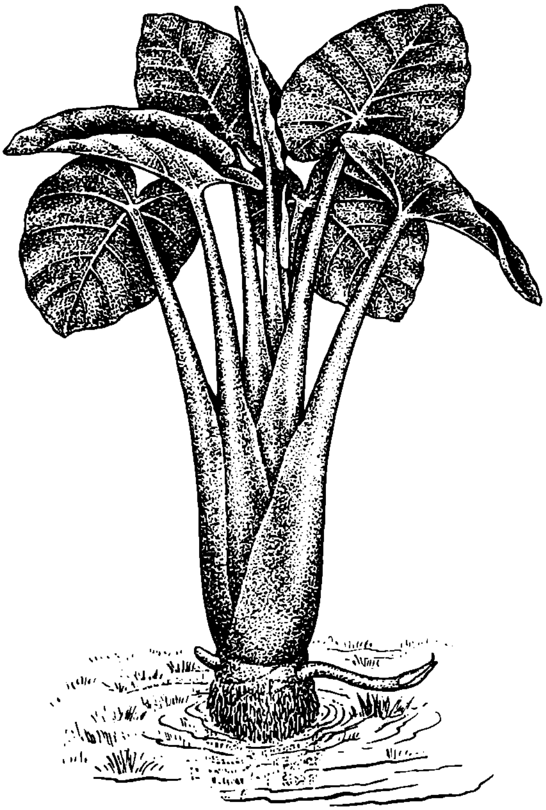

(দ্র) ‘এ’-র উৎস থাকায় রাতকানা রোগ (দ্র) প্রতিরোধে এটি অত্যন্ত উপকারী।

ফ. মা.

কচ্ছপ কাছিম দ্র

কঠিন চীবর চীবর ও কঠিন চীবর দ্র

কথক

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রধান চার ধারার অন্যতম। অপর তিনটি ধারা হচ্ছে ভরতনাট্যম (দ্র), কথাকলি (দ্র) ও মণিপুরী (দ্র)। কথক নামে পরিচিত একটি প্রাচীন নর্তক সম্প্রদায়ের নাম বা তাদের নৃত্য ‘কথক’-এর নাম অনুসারে এই নামটি প্রচলিত হয়েছে। মোগল আমলে দরবারি সঙ্গীত (দ্র) ও নৃত্যের যুগ সূচিত হলে কথক নৃত্য দরবারে স্থান পায়। পূর্বে এই নৃত্যটি সুগঠিত ছিল না। দরবারের সঙ্গে যুক্ত নৃত্যবিদগণ একে সুগঠিত ও শাস্ত্রসম্মত করে তোলার প্রয়াস নেন। তবে এই নৃত্যধারার প্রকৃত বিকাশ ঘটে উনবিংশ শতকে লখ্নৌর নবাব আসফউদ্দৌলা ও ওয়াজিদ আলী শাহ্‌র দরবারকে কেন্দ্র করে। স্বয়ং নৃত্যবিদ ওয়াজিদ আলী (১৮২২-১৮৮৭) এই নৃত্যের প্রকৃষ্ট রূপটি প্রবর্তন করেন। তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর দরবারেরই আশ্রিত এক অসাধারণ নর্তক পরিবার। এই পরিবারে সর্বাগ্রে রয়েছেন প্রকাশজী। তাঁর পরে তাঁর পুত্র ঠাকুরপ্রসাদ ও দুর্গাপ্রসাদ এবং ঠাকুরপ্রসাদের পুত্র বিন্দাদীন, কালকাপ্রসাদ ও ভৈরবপ্রসাদ।

কথক নৃত্যের প্রধান পর্যায় তিনটি : আমদ, পরণ ও গৎ। আমদ পর্যায়ে নৃত্যের সূচনা। নর্তক ঘরে প্রবেশ করেন ও সালামের ভঙ্গিতে দর্শকদের সম্মান জানান। এর পরের অংশ পরণ। এই পর্যায়ে নতর্ক তবলা (দ্র) বা পাখোয়াজ (দ্র) বাদনের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন। বাদক তালবাদ্যের বোলসমূহ উচ্চারণ করেন এবং পায়ের কাজের সাহায্যে নর্তক সেই সব বোলের উত্তর দেন। এই কাজকে বলা হয় ‘তোড়া’। পরবর্তী পর্যায় গৎ। এই পর্যায়ে চলে ভাবাভিনয়। নর্তক এই পর্যায়ে নৃত্যের বিষয়বস্তু বিবৃত করেন। নৃত্যের সঙ্গে গানও গাওয়া হয়। নর্তক বা তাঁর কোনো সহযোগী গান করেন এবং সেই সঙ্গে চলে নাচ। সুরবৈচিত্র্যের সঙ্গে ভাবাভিনয়েও প্রচুর বৈচিত্র্য আসে। কথক নৃত্যে নর্তক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন। নৃত্যশাস্ত্রের কড়াকড়ি নিয়মের বাইরে গিয়েও তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অঙ্গাভিনয়ের কিছু সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। কথক নৃত্যের প্রধান পোশাক হচ্ছে পেশোয়াজ নামক এক প্রকার লম্বা জামা ও চুড়িদার পাজামা।

কথক নৃত্যের তিনটি প্রধান ধারা বা ঘরানা : লখ্নৌ ঘরানা, জয়পুর ঘরানা ও বারাণসী ঘরানা। লখ্নৌ ঘরানাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলিত। কথকের সঙ্গীতাংশে হারমোনিয়াম (দ্র), সারেঙ্গী (দ্র), তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। লখ্নৌ ঘরানায় তালবাদ্যরূপে তবলার প্রচলন আছে। বর্তমান কালের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নৃত্য কথক। লখ্নৌ ঘরানার নর্তক-নর্তকীরাই এই নৃত্যে অগ্রগণ্য রয়েছেন। কথকের আঙ্গিকে প্রচুর নৃত্যনাট্য (দ্র) হয়। নবাব ওয়াজিদ আলী এই ধরনের নৃত্যনাট্য রচনার পথিকৃৎ। উদয়শঙ্কর (দ্র) ও বুলবুল চৌধুরী (দ্র) তাঁদের নৃত্যনাট্যে ব্যাপকভাবে কথকের রীতি প্রয়োগ করেন। এই নাচকে ‘কথক’ বলতেও দেখা যায়।

ক. গো.

www.pathagar.com

কথক নৃত্যের একটি ভঙ্গি ও হাতের কয়েকটি মুদ্রা

কথাকলি নৃত্য

কথাকলি

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য। শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রধান চার ধারার অন্যতম। অন্য তিনটি ধারা হচ্ছে ভরতনাট্যম (দ্র), কথক (দ্র) ও মণিপুরী (দ্র)। দক্ষিণ ভারতের কেরল অঞ্চলে এই নৃত্যের বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। বর্ণাঢ্য পোশাক ও প্রসাধন, প্রবল অঙ্গসঞ্চালন ও তীব্র সঙ্গীত (দ্র) এই নৃত্যের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই নৃত্যে আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির সুন্দর মিলন ঘটেছে। কথাকলি নৃত্যনাট্যবিশেষ। একে নৃত্যের মাধ্যমে অভিনয় বলা চলে।

কেরল অঞ্চলের প্রাচীন নৃত্য কুথু, কুদিয়াট্টম ও শাস্ত্রকলির সঙ্গে কথাকলির সম্পর্ক আছে। তবে ষোড়শ–সপ্তদশ শতকে প্রবর্তিত কৃষ্ণনাট্যম ও রামনাট্যমের মিলনে বর্তমান কথাকলির বিকাশ হয়েছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা কার্তিকথিরুমল (১৭২৪-১৭৯৮) কথাকলির ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। রাজা স্বাথীথিরুমল রামবর্মা (১৮১৩-১৮৪৭) এর পরিণত রূপটি রচনা করেন। তাঁর রাজত্বকালেই কবি ইরিয়াম্মান থাপ্পি (১৭৭৩-১৮৬৩) কথাকলির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নৃত্যনাট্যসমূহ রচনা করেন। কবি নারায়ণ মেনন ১৯৩০ সালে কেরালা কলামণ্ডলম্ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করলে তা এই নৃত্যের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

কথাকলি নৃত্যনাট্যসমূহে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ থাকে। কথোপকথন গদ্যে ও মালয়ালম ভাষায় রচিত হয়। রামায়ণ (দ্র), মহাভারত (দ্র) ও নানা পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে কথাকলির নৃত্যনাট্য রচিত হয়ে থাকে। নর্তকেরা মঞ্চে কথা বলেন না, অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে তাঁরা ভাব প্রকাশ করে থাকেন। মূকাভিনয়ে কথাকলির শিল্পীরা এতই পারদর্শী যে অতি সূক্ষ্ম ভাবকেও তাঁরা অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে প্রকাশ করতে সমর্থ হন। কথাকলি রাতের বেলার অনুষ্ঠান। পনেরো থেকে পঁচিশ জন নর্তক নিয়ে কথাকলির নৃত্যদল গঠন করা

www.pathagar.com

হয়। পুরুষেরাই এখানে স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করেন।

নৃত্যের প্রারম্ভে প্রদীপ জ্বালানো হয়। সে সময় জোরেসোরে বাদ্য বাজে। এই প্রারম্ভ অনুষ্ঠানের নাম আরঙ্গকেলি। এর শেষে দু' জন শিল্পী নৃত্যমঞ্চে একটি পর্দা মেলে ধরেন; এর নাম তেরেশিলা। তেরেশিলার আড়াল থেকে একাধিক নৃত্যশিল্পী দেবতার আশীর্বাদ কামনা করেন। এই পর্যায়ের নাম পূর্বরঙ্গ বা তোডয়াম। এর পর বন্দনাশ্লোক গাওয়া হয়। বন্দনার পর পুরপ্পাড। এখান থেকেই কথাকলি নৃত্যনাট্যের সূচনা। এখানে এসে শঙ্খ (দ্র) বাজিয়ে তেরেশিলা নামিয়ে দেওয়া হয় এবং সারা মঞ্চ জুড়ে নর্তকেরা তাঁদের পদচারণা শুরু করেন। পুরপ্পাড-এর পর মালাপদম। এই অংশে যন্ত্র ও কণ্ঠ-সঙ্গীতের প্রাবল্য থাকে। মালাপদম-এর পর শুরু হয় কথাকলির দীর্ঘস্থায়ী মূল অভিনয়। তার পরই নৃত্যনাট্যের সমাপ্তি।

নৃত্যনাট্যের চরিত্রসমূহকে পাচ্চা, কাত্তি, তাড়ি, কারি ও মিনিক্কু এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। চরিত্রের গুণ অনুযায়ী পোশাক ও অঙ্গসজ্জার ব্যবস্থা থাকে। যেমন পাচ্চা শ্রেণীর চরিত্র সৎ বলে তাদের মুখের রঙ হয় হাল্কা সবুজ। চোখের পাতা ও ভুরুতে ঘন কালো রঙ মাখানো হয়। ঠোঁটের রঙ হয় গাঢ় লাল। এ ছাড়া মুখে থাকে চুট্টি নামে পরিচিত সাদা রেখা। কপালে লাল, কালো, সাদা রঙের কাজ করা হয়। এ ছাড়া সেখানে থাকে হাল্কা গোলাপী তিলক। কপালে চুট্টিনন্দ নামে ফিতাও বাঁধা হয়। তার সঙ্গে মাথার মুকুট আটকে দেওয়া হয়। এমনিভাবে গুণ অনুযায়ী পোশাক ও প্রসাধনের ব্যবস্থা থাকে। কথাকলির পোশাক অত্যন্ত জটিল। এক জন নর্তককে তার পোশাক সঠিক করার জন্য কমপক্ষে আশিটি গিঁট দিতে হয়।

সঙ্গীত কথাকলি নৃত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ। এতে প্রচুর গান থাকে। মঞ্চের পেছনের দিকে অর্ধবৃত্তাকারে বাদক ও গায়কগণ অবস্থান গ্রহণ করেন। ছেণ্ডা, মাদলম, চেঙ্গালা, এলাথালম প্রভৃতি হচ্ছে মুখ্য বাদ্যযন্ত্র। ছেণ্ডা নামক বৃহৎ ঢাক বাদ্যটিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কথাকলি তাণ্ডব-প্রধান নৃত্য। নৃত্যশেষে নৃত্যের নায়ক সকলের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। সত্যের জয় অবশ্যই হবে—এটাই হচ্ছে কথাকলি নৃত্যনাট্যের প্রধান ঘোষণা।

ক. গো.

কথাসরিৎসাগর

সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে রচিত কথা-কাহিনী গ্রন্থ। আনুমানিক ১০৬৩-৮১ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরি কবি সোমদেব কর্তৃক রচিত। তিনি গ্রন্থ রচনার ইতিহাসে লিখেছেন, এর মূল গ্রন্থ হল 'বৃহৎকথা'। তাতে আছে, জলন্ধরের রাজার কন্যা সূর্যমতী বা সূর্যবতী ছিলেন কাশ্মীররাজ অনন্তের মহিষী। মহিষীর চিত্তবিনোদনের জন্য কবি গুণাঢ্য রচনা করেন 'বৃহৎকথা'। বৃহৎকথার সারসঙ্কলন হল 'কথাসরিৎসাগর'।

বৃহৎকথা অনেক আগে লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু কথাসরিৎসাগর এখনো টিকে আছে। এ ছাড়া বৃহৎকথার সারসংক্ষেপ আছে বুধস্বামী রচিত 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ' গ্রন্থে। কাশ্মীরের আর এক শ্রেষ্ঠ কবি ক্ষেমেন্দ্র বৃহৎকথা অবলম্বন করে রচনা করেন 'বৃহৎকথামঞ্জরী'।

সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' ১৮টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' (দ্র) ও 'পঞ্চতন্ত্রের' (দ্র) বহু কাহিনী এই গ্রন্থে আছে। প্রাচীন ভারতের লৌকিক অনেক গল্প-কাহিনী এতে পাওয়া যায়। গ্রন্থের মূল বিষয় হল কৌশাম্বীর রাজা বৎসরাজপুত্র নরবাহন দত্তের চরিত-কথা।

বি. ব.

কদম

কদমকে বর্ষার দূত বলা হয়। বর্ষা ঋতুতে প্রকাণ্ড কদম গাছের ডালে ডালে প্রচুর ফুল ফোটে। ফুলগুলো দেখতে ছোট বলের মতো হয়। এর মিষ্টি গন্ধ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ায়।

এ গাছ বেশ উঁচু হয় এবং এর বহু শাখা-প্রশাখা থাকে। কাণ্ড সরল। বাকলের রঙ ধূসর থেকে প্রায় কালো। পাতা বেশ বড় ও ডিম্বাকৃতির। পাতার রঙ উজ্জ্বল সবুজ। ফুলের রঙ সাদা–হলুদে মেশানো। আমরা যাকে 'একটি কদম ফুল' বলি তা আসলে বহু ফুলের সমষ্টি। মাঝখানে থাকে গোলাকার পুষ্পাধার এবং এর গায়ে ফুলগুলো লেগে থাকে। ফল মাংসল ও টক। কদম ফল বাদুড় ও কাঠবিড়ালির প্রিয় খাদ্য। এরাই কদমের বীজ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে দেয়।

www.pathagar.com

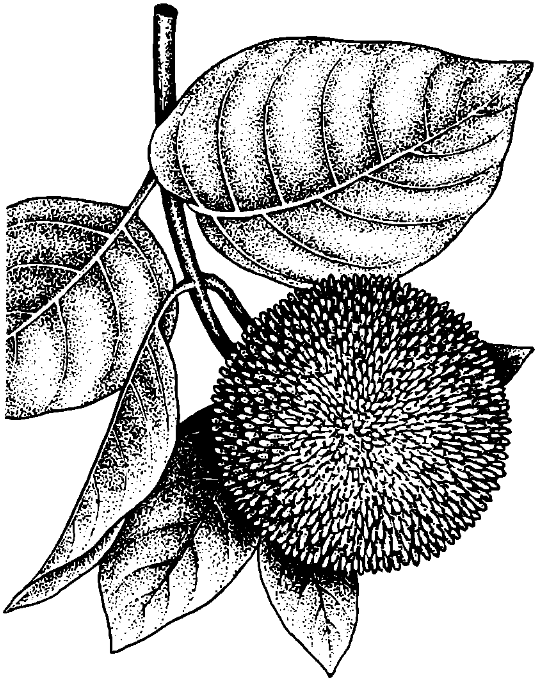

কদম গাছের কাঠ অতি নিম্নমানের। তাই এর কাঠ সাধারণ জ্বালানি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। কদম গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *অ্যান্থোসেফেলাস ইণ্ডিকাস* (*Anthocephalus indicus*)।

ক. মা.

কনজারভেটিভ পার্টি

ব্রিটেনের একটি রাজনৈতিক দল। এটি 'ইউনিয়নিস্ট পার্টি' হিসাবেও পরিচিত। পার্লামেন্টে সর্বদা ডানপন্থার অনুসারী এই দলটিকে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের টোরি (Tory) পার্টির উত্তরসূরি মনে করা হয়।

কনজারভেটিভ বা 'রক্ষণশীল' শব্দটি ব্রিটেনে ১৮২৪ সালে প্রথম ব্যবহার করেন জর্জ ক্যানিং (George Canning : ১৭৭০-১৮২৭)। ১৮৩৪ সালে 'ট্যামওয়ার্থ মেনিফেস্টো' (Tamworth Manifesto) গ্রহণ করার পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই দলটি তার কাঠামোগত রূপ পরিগ্রহ করে। এর মৌলিক নীতি ও লক্ষ্যাদি সূত্রবদ্ধ করেন বেঞ্জামিন ডিজরেইলি (Benjamin Disraeli : ১৮০৪-১৮৮১)। এই সব লক্ষ্যের অন্যতম হচ্ছে বিধিবদ্ধ আইন কঠোরভাবে অনুসরণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষণ ও বিস্তার ঘটানো এবং জনগণের অবস্থার উন্নতি সাধন।

'আইরিশ হোমরুল' প্রশ্নে লিবারেল পার্টিতে ১৮৮৬ সালে ভাঙন দেখা দিলে উইলিয়াম এওয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোনের (William Ewart Gladstone : ১৮০৯-১৮৯৮) বিরোধীরা কনজারভেটিভ দলে যোগ দেয়। এই সময় পর্যন্ত এটি সাধারণভাবে 'কনজারভেটিভ' ও 'ইউনিয়নিস্ট' পার্টি হিসাবেই পরিচিত ছিল।

কনজারভেটিভ পার্টি ১৮৯২ থেকে ১৮৯৫ এবং ১৮৯৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত দু' বার ক্ষমতাসীন হয়। তবে শুল্ককরের ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে মতদ্বৈধতা ও সুস্পষ্ট সামাজিক নীতির অভাবে দলটি সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, ফলে দীর্ঘকাল ক্ষমতার বাইরে থাকে। অ্যাণ্ড্রু বোনার ল-র (Andrew Bonar Law : ১৮৫৮-১৯২৩) নেতৃত্বে ১৯২২ সালে দলটি আবার ক্ষমতায় আসে।

১৯৪৫ সালে কনজারভেটিভ পার্টি নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর থেকে গ্রহণ করেছে কিছুটা মধ্যপন্থী প্রগতিশীল ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের নীতি।

বিভিন্ন সময়ে যাঁরা দলটির নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন স্যার অ্যালেক ডগলাস-হিউম (Alec Douglas-Home), স্যার উইনস্টন চার্চিল (দ্র), কুইন্টিন হগ (Quintin Hogg), এডওয়ার্ড হিথ প্রমুখ।

আ. হ.

কনফুসিয়াস [৫৫১—৪৭৯ খ্রি. পূ.]

প্রাচীন চীনের (দ্র) খ্যাতনামা চিন্তাবিদ। লু-রাষ্ট্রের চৌ শহরে খ্রিস্টপূর্ব ৫৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে বড় হন। ত্রিশ বছর বয়সেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় লু-রাষ্ট্রের রাজার উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।

তিনি মনে করতেন, সমাজ ও শাসনের কারণেই মানুষের ব্যক্তিজীবনে অসীম দুঃখ নেমে আসে। তাই তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। নিষ্ঠুর শাস্তি,

www.pathagar.com

প্রজাদের উপর অন্যায় কর আরোপ এবং অহেতুক যুদ্ধ বন্ধ করার নীতি প্রচারে কনফুসিয়াস সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

কনফুসিয়াস ছিলেন মূলত নীতিবিদ এবং দার্শনিক। প্রাচীন চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নাম এক হয়ে আছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে নীতিজ্ঞান। নীতিবোধ জেগে উঠলেই এক জন ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। তাঁর মতে— মানব সমাজ দু' টি শ্রেণীতে বিভক্ত—ধনী এবং দরিদ্র। ছোটরা বড়দের কথা মেনে চলবে। মানুষকে ভালবাসাই হচ্ছে মানবজীবনের পবিত্র কর্ম।

চীনে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত কনফুসিয়াসের মতবাদ রাজধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পায়। কনফুসিয়াসের মতবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে চীনবাসীদের প্রভাবিত করেছে।

কনফুসিয়াসের ধর্মচিন্তা ছিল মানুষকে নিয়ে। তাঁর মতে—মানুষকে জানাই হচ্ছে জ্ঞান। মানুষ যতদিন এক পরিবারের মতো বাস করতে না পারবে ততদিন সুখী হতে পারবে না।

এই প্রাচীন চীনা দার্শনিক মৃত্যুবরণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৯ সালে। এখনো কনফুসিয়াসের মতবাদ নতুন নতুন ব্যাখ্যার জন্ম দেয়।

আ. ই.

কপিকল (pulley)

কপিকল হল এক বা একাধিক চাকার উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া একটি দড়ি বা বেল্ট, যা শক্তি প্রয়োগের কোনো কাজকে সুবিধাজনক করে তোলে। এটি একটি সরল যন্ত্র, অনেক জটিল যন্ত্রের মধ্যেও যাকে পাওয়া যায়। যন্ত্র মাত্রেরই উদ্দেশ্য হল যান্ত্রিক সুবিধা লাভ অর্থাৎ কম বল প্রয়োগে কোনো কাজ করতে পারা, অথবা কাজ করতে গিয়ে অন্য কোনো ধরনের সুবিধা লাভ।

সরলতম কপিকল হল একটি খাঁজকাটা অনড় চাকার উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া একটি দড়ি। এর এক প্রান্তে থাকে যার উপর কাজ হবে সেই 'ভার' আর অন্য প্রান্তে করা হয় বলপ্রয়োগ। উদাহরণ স্বরূপ, দড়ি টেনে পতাকা উত্তোলনের সময় আমরা এটিই ব্যবহার করি। এতে যান্ত্রিক সুবিধার পরিমাণ ১, যার মানে বলপ্রয়োগ কমে না, ভারের ওজনের সমান বলই প্রয়োগ করতে হয়; তবে টানটিকে সুবিধাজনক স্থানে ও দিকে প্রয়োগ করার সুযোগ ঘটে। যেমন নদীর কিনারা থেকে দূরে বসে নৌকায় মাল ওঠানো-নামানোর জন্য এটি ব্যবহার করা যায়।

কপিকলের চাকাটি এক স্থানে অনড় না থেকে যদি চলনশীল হয়, তা হলে আমরা দ্বিতীয় প্রকারের কপিকল পাই। এতে দড়ির এক প্রান্ত উঁচুতে স্থায়ীভাবে আটকানো থাকে। ভারটি থাকে চাকার সঙ্গে ঝোলানো। দড়ির অন্য প্রান্তে টান প্রয়োগ করলে ভারসহ চাকাটিই উঠে আসে। এতে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন হয় ভারের ওজনের অর্ধেক, যান্ত্রিক সুবিধার পরিমাণ তাই ২। এরকম আরো কপিকলের সমন্বয় করে আমরা যান্ত্রিক সুবিধা আরো বাড়িয়ে নিতে পারি। ফলে সামান্য বলপ্রয়োগেও অনেক বেশি ভার স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।

কপিকলের অন্য রকম ব্যবহার হল দু'টি চাকার মধ্যে চলমান প্রান্তহীন দড়ি বা বেল্টরূপে। এতে একটি চাকাকে ঘোরালে সেই ঘূর্ণন অন্য চাকাতে সঞ্চারিত হয়। চাকা দু'টি সমান আকারের হলে যান্ত্রিক সুবিধা ১ থেকে যায়। কিন্তু একটি চাকা অন্যটির চেয়ে বড়-ছোট করে নিলে হয় কম বল প্রয়োগে কাজ সারা যায়, নয়তো ঘূর্ণনগতি বাড়িয়ে নেওয়া

www.pathagar.com

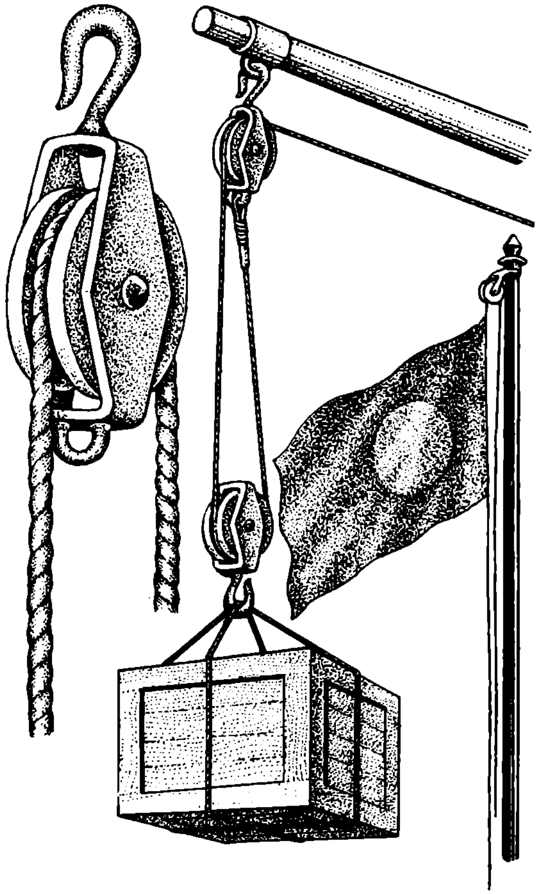

যায়। দড়ি বা বেল্ট লাগাবার সময় মাঝখানে ক্রস করে নিলে এক চাকাকে অন্য চাকার বিপরীত দিকেও ঘোরানো চলে।

মু. ই.

কপিরাইট (copyright)

কপিরাইট বা গ্রন্থস্বত্ব হল সাহিত্যের কিংবা যে কোনো সৃজনশীল শিল্পকর্মের মালিকানা-স্বত্ব। চারুকলা বা এই রকম বিষয়ের মালিকানা-স্বত্বও হতে পারে। এই অধিকারে কোনো সৃজনকর্মের স্রষ্টাই কপিরাইটের মালিক, তিনি তাঁর সম্পত্তি ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারেন। এই অধিকারে তিনি অননুমোদিত ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি তাঁর মালিকানা-স্বত্ব অন্য কাউকে দান বা বিক্রি করেন, তখন কপিরাইট তাঁর আর নিজের থাকে না, যাকে দিয়েছেন তার হয়ে যায়। বার্ন কনভেনশন (Berne Convention) সৃষ্ট হয় ১৮৮৬ সালে। পারস্পরিক কপিরাইটকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বার্ন কনভেনশনের সিদ্ধান্তসমূহ অনেক দেশ মেনে নিয়েছে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) মানে নি। ১৯৫২ সালে ইউনেস্কোর (দ্র) নেতৃত্বে জেনেভায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একটি নতুন কপিরাইট কনভেনশন গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র তা গ্রহণ করে। বাংলাদেশে (দ্র) কপিরাইট চালু আছে, তবে সবাই জানেন না। কোনো গ্রন্থকার অন্য কাউকে তাঁর কপিরাইট দিলে তা দশ বছর পর গ্রন্থকারের নিকট ফিরে আসে। তাঁর মৃত্যু হলে ফিরে আসে তাঁর প্রতিনিধিদের হাতে।

আ. হা.

কপিলদেব রামলাল নিখাঞ্জ [১৯৫৯—   ]

ভারতের (দ্র) বিশিষ্ট ক্রিকেটার। তাঁর জন্ম ৬ই জানুয়ারি ১৯৫৯, চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, ভারত। তিনি ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার; ডানহাতি আক্রমণাত্মক মিড্‌ল্-অর্ডার ব্যাট্‌সম্যান।

টেস্টে তাঁর অভিষেক হয় ১৯৭৮-৭৯ সালে পাকিস্তানের (দ্র) বিরুদ্ধে। ১৯৯৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত কপিলের টেস্ট পরিসংখ্যান—ব্যাটিং: টেস্ট ১২৭, ইনিংস ১৮০, অপরাজিত ১৪ বার, রান ৫১৩১, সর্বোচ্চ রান ১৬৩, সেঞ্চুরি ৮টি, হাফ সেঞ্চুরি ২৬টি, শূন্যতে আউট হন ১৬ বার, ক্যাচ ধরেন ৬৩ বার। বোলিং : ওভার ৪৫৪৩.৪, রান ১২৬১৯, উইকেট ৪২৫, সেরা বোলিং ৮৩ রানে ৯ উইকেট, এক ইনিংসে ৫ উইকেট লাভ ২৩ বার, এক ম্যাচে ১০ উইকেট ২ বার। ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছেন ৪০টি টেস্টে; জয়ী হন মাত্র ৪টিতে। টেস্টে ১০০টি উইকেট লাভকারী সর্বকনিষ্ঠ (২১ বছর ২৫ দিন) খেলোয়াড়।

www.pathagar.com

এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিসংখ্যান—ব্যাটিং : ১৮২ ম্যাচ, রান ৩৪৭৪, অপরাজিত ৩০ বার, সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ১৭৫, সেঞ্চুরি ১টি, হাফ সেঞ্চুরি ১৫টি, ক্যাচ ধরেছেন ৬৫ বার। বোলিং : ১৭৪১ ওভার, রান দিয়েছেন ৫৬০৭, উইকেট ২১৯, সেরা ৪৩ রানে ৫ উইকেট।

রেকর্ড : এক দিনের ম্যাচে ৫ উইকেট লাভকারী প্রথম ভারতীয় ('৮৩-র বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে)। পরপর ৩ বলে ৩ উইকেট নিয়ে হ্যাট্রিক অর্জনকারী দ্বিতীয় ভারতীয় ('৯১-এর এশিয়া কাপ ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে)। শত রান সংগ্রহকারী প্রথম ভারতীয় (অপরাজিত ১৭৫, '৮৩-র বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে)। কপিলের নেতৃত্বে ভারত ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয় করে।

কপিল টেস্টে ডাব্‌ল্‌স্ (১০০০ রান সংগ্রহ ও ১০০ উইকেট লাভ) অর্জন করেছেন ৩ বার। এর মধ্যে ১০০ উইকেট লাভ ও ১০০০ রান করেছেন ২৫ টেস্টে, ২০০ উইকেট লাভ ও ২০০০ রান করেন ৫০ টেস্টে, ৩০০ উইকেট লাভ ও ৩০০০ রান ৮৩ টেস্টে। ৪০০ উইকেট লাভ ৯৬ টেস্টে ও ৪০০০ রান করেন ১১৫ টেস্টে এবং ৫০০০ রান করেন ১২২ টেস্টে।

১৯৯৪ সালের ২রা নভেম্বর তিনি ক্রিকেট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর গ্রহণ করেছেন।

অ. ব.

কফি

কফি চায়ের মতো এক ধরনের পানীয়। কফি গাছের ফলবীজের গুঁড়ো ফুটন্ত পানিতে গুলে এই পানীয় তৈরি করা হয়। অনেকে তার সঙ্গে দুধ-চিনি মিশিয়ে, অনেকে আবার দুধ-চিনি ছাড়াই তা পান করেন। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক কফি পান করেন। কথিত আছে ইথিওপিয়ার রাখালেরা লক্ষ করেন, ছাগল যেদিন কফিগাছের পাতা বা ফল খায় সেদিন সারা রাত জেগে থাকে। এ থেকেই মানুষ কফি পানে আগ্রহী হয়। ইথিওপিয়া থেকেই কফি পানের প্রচলন হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে কফি আরবদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আরব থেকে তুরস্ক (দ্র) হয়ে ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালি ও ইউরোপে (দ্র), ১৬৬০ সালের মধ্যে আমেরিকা (দ্র) এবং ১৭০০ সালের মধ্যে ব্রাজিলে কফির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রত্যন্ত এলাকায় কফি হাউস গড়ে ওঠে এবং তা প্রতিদিন মানুষের গল্পগুজবের আড্ডাখানায় পরিণত হয়।

কফিগাছের বৈজ্ঞানিক নাম *কফিয়া এরাবিকা (Coffea arabica)*। বর্তমানে কৃষিভিত্তিক কফি উৎপাদনের মাধ্যমে অনেক দেশ প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। সুমাত্রা, জাভা, ভারত (দ্র), আরব, আফ্রিকা (দ্র), মেহিকো (Mexico), হাওয়াই, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (দ্র) ও আমেরিকায় কফি চাষ হয়। ব্রাজিল কফি উৎপাদনে শীর্ষস্থানে রয়েছে। কফিগাছ ঝোপ ঝোপ সবুজ উজ্জ্বল পাতায় ঢাকা থাকে। এর উচ্চতা ১০ থেকে ২০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। জামের

www.pathagar.com

মতো ফল হয়, তা প্রথমে সবুজ, পরে হলুদ এবং পাকলে লাল হয়। খোসা ছাড়ালে যে বীজ পাওয়া যায় তাকে উত্তপ্ত করে ঝলসে গুঁড়ো করা হয়। এই গুঁড়োই পানীয় তৈরির মূল উপাদান।

স. রা.

কফিলউদ্দীন চৌধুরী [১৮৯৯—১৯৭২]

রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। জন্ম মজিদপুর দয়াহাট, বিক্রমপুর, ১৮৯৯। কলিকাতা রিপন কলেজ থেকে ১৯২৩ সালে বি.এ. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৫ সালে বি.এল. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৬ সালে মুন্সীগঞ্জ আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু এবং মুসলিম লীগ (দ্র) রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩০ সালে ঢাকা বারে যোগ দেন। ১৯৩২ সালে ঢাকা জেলা বোর্ড এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে জেলা বোর্ডের মুসলিম লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৩৭–৪১ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য। ১৯৩৯ সালে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন এবং কৃষক-প্রজা পার্টিতে (দ্র) যোগদান করেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি মুসলিম লইয়ার ফেডারেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম মুসলিম মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের মার্চে পূর্ববঙ্গ আইন সভার সদস্য নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টে যে দুইজন মহাসচিব যৌথভাবে নিযুক্ত হন তাঁদের মধ্যে কৃষক-শ্রমিক পার্টির পক্ষ থেকে কফিলউদ্দীন চৌধুরী এবং আওয়ামী লীগের

(দ্র) পক্ষ থেকে আতাউর রহমান খান (দ্র)। এই নির্বাচনে তিনি পশ্চিম বিক্রমপুর থেকে আইন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের যোগাযোগ এবং গণপূর্ত, সেচ ও বন (১৯৫৬–৫৭) দপ্তরের মন্ত্রী। ১৯৫৬-৫৮ পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের সদস্য। ১৯৫৮ সালে ৭ই অক্টোবর আইয়ুব খান (দ্র) সামরিক শাসন জারি করলে সরকার কর্তৃক গ্রেফতার। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে ৯৯% ভোটে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ (দ্র) কালে মুজিবনগর (দ্র) গমন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। উদার, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ও বিশ্বাস ছিল গভীর।

কফিলউদ্দীন চৌধুরী বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সিভিল আইনজীবি ছিলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক ও শিল্পপতি হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি ১২ই মে ১৯৭২ তারিখে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ও রাজনীতিবিদ অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী তাঁর পুত্র।

বি. ব.

কবিগান

কবিদের গান এই অর্থে কবিগান কথাটির প্রচলন। এটি বাংলা লোকসঙ্গীতের (দ্র) একটি বিশিষ্ট ধারা। দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এই গান সম্পন্ন হয়। এতে প্রশ্নোত্তর ও জয়-পরাজয় থাকে। প্রতি দলে এক জন থাকেন দলপতি। তিনি কবি বা কবিওয়ালা বা কবিয়াল। তিনি তাঁর

www.pathagar.com

দলের আসর নিয়ন্ত্রণ করেন। বিপক্ষের দলপতির প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তিনিই দায়ী থাকেন। পরাজয় বা জয় হয়ে থাকলে তাঁরই হয়ে থাকে। দেখা যাচ্ছে যে এই গান দুই কবির মধ্যে সংঘটিত এক প্রকার গান। সে থেকেই কবিগান নাম। প্রতি দলে কবিয়ালের সহায়তাকারী কয়েক জন গায়ক থাকেন। এঁদের বলা হয় 'দোহার'। এঁরা কখনো কবিয়ালের সঙ্গে মিলিতভাবে গান করেন, কখনো শুধু ধুয়া অংশটুকু গেয়ে থাকেন।

কবিগানের প্রথমে থাকে বন্দনা বা ভবানীবিষয়। এর পরে সখী–সংবাদ। এই অংশে থাকত গানের মূল প্রশ্নের অবতারণা। এর আরেক নাম 'চাপান'। প্রথম দল চাপান দিলে দ্বিতীয় দল এর উত্তর দেয়। এই উত্তর–অংশের নাম 'উতোর'। কবিগানের প্রধান অঙ্গ চারটি : ভবানীবিষয়, সখী-সংবাদ, বিরহ এবং খেউর। ভবানীবিষয় বা বন্দনা বাদ দিলে বাকি অঙ্গগুলো চাপানে ও উতোরে চলতে থাকে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে প্রবর্তিত এই গানের শুরুর দিকের রূপটি ছিল 'বাঁধুটি'। সে সময় দুই দলের কবিয়াল কোন প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে গান চলবে এবং গানের গতি-প্রকৃতি কেমন হবে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আসরে নামতেন। কিন্তু রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮) এই প্রথার পরিবর্তন করেন এবং প্রশ্নোত্তর না জেনে গান করার রীতি প্রবর্তন করেন। এই গানকে বলা হয় 'উপস্থিতি গান'। তখন থেকেই কবিগান তার প্রকৃত চাতুর্য ও মাধুর্য লাভ করে। গান চলাকালে কবিয়াল নিজে তো গান বাঁধেনই, অন্যেও গান বেঁধে দেন। অন্যে গান বাঁধলে তাঁকে বলা হয় 'বাঁধনদার'। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুকরণে বিশেষ কতগুলো তুক্ বা স্তবক বা পর্যায় অনুযায়ী কবিগান গাওয়ার রীতি প্রবর্তন করেন রঘুনাথ দাস (আনু. ১৭২৫-১৭৯০ খ্রি.)। এর নাম দাঁড়া কবি। দাঁড়া অর্থে রীতি বোঝানো হয়েছে। দাঁড়া কবির পর্যায়গুলো হচ্ছে চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, মেলতা, মহড়া, শওয়ারি, খাদ, ফুকা, মেলতা ও অন্তরা (দ্র)। ঢোল (দ্র) ও কাঁসর কবিগানের আবশ্যিক বাদ্যযন্ত্র। বেহালা (দ্র), হার্মোনিয়াম (দ্র) প্রভৃতিও বাজানো হয়।

গোঁজলা গুঁই আদি কবিয়াল। তাঁর শিষ্য লালু-নন্দলাল, রামজী ও রঘুনাথ দাস কবিগানের ভিত্তি স্থাপন করেন। গোঁজলা গুঁই অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভের ও তাঁর শিষ্যেরা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের মানুষ। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে কবিগানের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে। সে যুগের কবিয়ালদের মধ্যে রাসু, নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, এণ্টনি ফিরিঙ্গি (দ্র), ভোলা ময়রা, ভবানী বেনে, রাম বসু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান কালের কবিয়ালদের মধ্যে চট্টগ্রামের রমেশ শীল (দ্র) ও মুর্শিদাবাদের শেখ গুমানী দেওয়ান-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কবিগানের মুখ্য বিষয় পৌরাণিক। পরবর্তী কালে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়সমূহ কবিগানের অবলম্বন হিসাবে গৃহীত হয়।

ক. গো.

কবিতা কাব্য / কবিতা দ্র

কবীর [? – আনু. ১৪৯৮]

কবীর ছিলেন ভক্ত ও সাধক। ছোটবেলা থেকেই সাধু-সন্তদের প্রতি ছিল তাঁর আকর্ষণ। অবশেষে তিনি সাধকের জীবনই বেছে নেন।

কবীরের পৈতৃক পেশা ছিল তাঁত বোনা। কবীর তাঁতে কাপড় বুনতেন আর ভক্তিমূলক গান গাইতেন। তাঁর বাবা নীরু এবং মা নীমা সুন্দরী মেয়ে দেখে কবীরের বিয়ে দেন। তাঁর একটি ছেলেও হয়। নাম কামাল। কিন্তু কবীর সংসারে আসক্ত হলেন না। ভক্তিমার্গের টানে সংসার ভেসে গেল।

কবীর জাতিভেদ, বর্ণভেদ, এমনকি ধর্মভেদের ঊর্ধ্বে উঠে ভক্তিধর্মের কথা প্রচার করেছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির

www.pathagar.com

জয়গান গেয়েছেন । তিনি ভাবে বিভোর হয়ে ভক্তিমূলক ছোট ছোট কবিতা রচনা করতেন। এ ধরনের কবিতাকে বলা হয় দোঁহা। তিনি গান বাঁধতেন, সুর করে তা গাইতেন। তাঁর দোঁহা আর গানের মধ্য দিয়েই তাঁর ধর্মমত প্রকাশ

পেয়েছে। এভাবে সহজ–সরল কবিতা ও গানের ভাষায় গভীর ধর্মীয় দর্শনকে তিনি প্রকাশ করেছেন। সাধারণ মানুষ তাঁর সহজ–সরল কথা ও গানে আকৃষ্ট হয়েছে। যারা তাঁকে অনুসরণ করেছে তারা 'কবীরপন্থী' নামে পরিচিত।

কবীরের জন্মতারিখ সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে তিনি যে পঞ্চদশ শতকে বর্তমান ছিলেন এবং তখন দিল্লিতে লোদী বংশের শাসন চলছিল, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত। তিনি কাশীধামে ফতেপুর জেলার গঙ্গাতীরস্থ মানিকপুরে এলাহাবাদের (দ্র) অপর তীরে নির্জন স্থানে সাধন-ভজন করতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি কাশী (দ্র) পরিত্যাগ করে গোরখপুর জেলার মগরা গ্রামে গিয়ে গভীর সাধনায় নিমগ্ন হন। এখানে অমী নদীর তীরে নির্মিত কুটিরে আনুমানিক ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

নি. অ.

কবুতর

আমাদের দেশে সচরাচর দু' ধরনের কবুতর বা পায়রা দেখা যায়। একটি নানা বর্ণের গৃহপালিত কবুতর, অপরটি জালালী কবুতর। সকল জালালী কবুতরের দেহের রঙ এক ধরনেরই। পৃথিবীতে প্রায় ২০০ জাতের কবুতর রয়েছে।

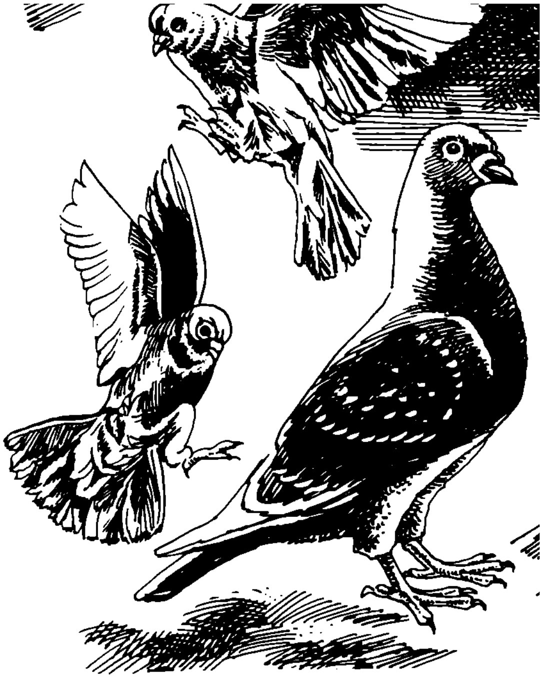

এগুলোর মধ্যে স্ফীতবক্ষ পারাবত বা নোটন পায়রা, পাখনা-পুচ্ছ পায়রা বা শিরাজু পায়রা ও আকাশে ডিগবাজি খাওয়া গেরোবাজ পায়রা সকলের কাছে আকর্ষণীয়।

কবুতর মাঝারি আকারের পাখি। এদের চক্ষু ছোট। চোখ দূর থেকে দেখলে লাল মনে হয়। মোটামুটি চঞ্চল প্রকৃতির এই পাখি দ্রুত উড়তে সক্ষম। উড়ে ১০০ মাইলও পাড়ি দিতে পারে। বীজ, দানাদার শস্য ইত্যাদি কবুতরের প্রধান খাদ্য। এরা পাথরের টুকরোও খায়। দৈনিক গড়ে দেড় থেকে দুই আউন্স খাবার গ্রহণ করে। বছরের যে কোনো সময় ওরা বাচ্চা দিতে পারে, তবে পুরুষ ও স্ত্রী–কবুতরের মিলন ঘটে ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে। এটি প্রলম্বিত হয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলতে পারে। কবুতর প্রথম চালানের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর আগেও দ্বিতীয় চালানের ডিম পাড়তে পারে। ১৭-১৮ দিন ডিমে তা দেয়। বাচ্চা ফোটার পর এক সপ্তাহ ধরে মা-বাবা ওদের পরিচর্যা করে। দ্বিতীয় সপ্তাহে শিশু কবুতর উড়াল দেয়।

কবুতর পোষ মানে। ওরা মনিবের ঘর চিনে ফিরে আসতে পারে। এদেশে অনেকে শখ করে কবুতর পালে এবং কবুতরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিযোগিতায় নামায়। যুদ্ধকালীন সময়ে বা কোনো জরুরি দরকার পড়লে ওদের

www.pathagar.com

মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়। আগের দিনে রাজা-বাদশাহরা প্রতিযোগিতায় নামানোর জন্য হাজার হাজার কবুতর পুষতেন। রাজপুত্র-রাজকন্যারাও গোপন সংবাদ আনা-নেওয়ার জন্য কবুতরকে কাজে লাগাতেন। বাচ্চা কবুতরের মাংস সুস্বাদু। তবে খাওয়ার চেয়ে ওদের দেখে সুখ। ওদের মিষ্টিমধুর আওয়াজ আরো সুখকর।

ত. চ.

কমন মার্কেট ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় দ্র

কমনওয়েলথ (Commonwealth)

অতীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এমন স্বাধীন জাতিসমূহ এবং ব্রিটিশের আশ্রিত জাতিসমূহ নিয়ে গঠিত সংস্থা। ইংরেজিতে একে Commonwealth of Nations বলা হয়। ব্রিটেনই এর নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। লণ্ডনে (দ্র) এর সচিবালয় অবস্থিত।

পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে একত্রে কাজ করার জন্য সদস্য-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়। তারা প্রতিরক্ষা, শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করে থাকে। সদস্য-রাষ্ট্রগুলোর প্রধানমন্ত্রীগণ এক থেকে তিন বছর অন্তর বৈঠকে মিলিত হয়ে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

সদস্য হিসাবে কমনওয়েলথভুক্ত হওয়ার দু'রকম পদ্ধতি আছে : ১. ব্রিটেনের রাজা বা রাণীকে রাষ্ট্রের প্রতীক প্রধান রূপে গ্রহণ করে নিয়ে, যেমন—কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া (দ্র); এবং ২. জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকারের প্রতি ব্রিটেনের রাজা বা রাণীর স্বীকৃতি নিয়ে, যেমন—ভারত, মালয়েশিয়া, ঘানা।

১৯২৬ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত সকল জাতিই স্ব-শাসিত' শীর্ষক সম্মেলনে প্রথম কমনওয়েলথ সম্পর্কিত চিন্তার সূত্রপাত হয়। সম্মেলনে ঘোষণা দেওয়া হয় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন মৈত্রীবদ্ধ রাষ্ট্রপুঞ্জ (Commonwealth of Nations) সমমর্যাদাভুক্ত। ১৯৩১ সালে ব্রিটেনের পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে সম্মেলনের এই ঘোষণা সংবিধানে পরিণত হয়। এর পর থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত কোনো জাতি স্বাধীনতা লাভ করলেই কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণ করে। অবশ্য সদস্যপদ প্রত্যাহারও যোগদানকারী রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন। বিশ্বের ৪৯টি স্বাধীন রাষ্ট্র এখন কমনওয়েলথের পূর্ণ সদস্য। বাংলাদেশও (দ্র) এর অন্তর্ভুক্ত।

সুজ. ব.

কমনওয়েলথ গেম্‌স্

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের (দ্র) এককালীন শাসনাধীন যত উপনিবেশ, অধীনস্থ রাজ্য এবং দেশ ছিল তাদের মধ্যে— অন্য অর্থে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস-এর মধ্যে সৌহার্দ্য, সহযোগিতা, একতা ও পারস্পরিক সমঝোতা বাড়ানোর জন্য ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ গেম্‌সের প্রচলন করা হয়। পরে 'ব্রিটিশ' কথাটি বাদ দিয়ে এই খেলার নামকরণ করা হয় 'কমনওয়েলথ গেম্‌স্'।

কমনওয়েলথভুক্ত সকল দেশই এই গেম্‌সে অংশগ্রহণ করতে পারে। চার বছর অন্তর এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম কমনওয়েলথ গেম্‌সটি কানাডার হ্যামিল্টন ওন্টেরিওতে অনুষ্ঠিত হয় এবং ১১ সদস্য বা জাতি এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৩৪ সালে লণ্ডনে (দ্র), ১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) সিডনিতে, ১৯৫০ সালে নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ডে, ১৯৫৪ সালে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে, ১৯৫৮ সালে ওয়েলসের কার্ডিফে, ১৯৬২ সালে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে, ১৯৬৬ সালে জ্যামাইকার কিংস্টনে, ১৯৭০ সালে স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরায়, ১৯৭৪ সালে নিউজিল্যাণ্ডের ক্রাইস্টচার্চে, ১৯৭৮ সালে কানাডার এডমণ্টনে, ১৯৮২ সালে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে, ১৯৮৬ সালে স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরায়, ১৯৯০ সালে নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ডে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

কা. আ. আ.

কমল দাশগুপ্ত [১৯১২—১৯৭৪]

বিখ্যাত সুরকার, সঙ্গীত (দ্র) পরিচালক, সঙ্গীত প্রশিক্ষক ও গায়ক। কুচবিহারে জন্ম। আদি নিবাস যশোর জেলার কালিয়া গ্রাম। পিতা তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। বড় ভাই বিমল দাশগুপ্তের কাছে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষায় হাতেখড়ি। রামকৃষ্ণ মিত্র, দিলীপকুমার রায় (দ্র), জমিরউদ্দিন খাঁ প্রমুখের কাছে

www.pathagar.com

কমল দাশগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী নজরুল-সঙ্গীতের খ্যাতিমান শিল্পী ফিরোজা বেগম

সঙ্গীতে পরিণত পাঠ গ্রহণ করেন। খুব অল্প বয়সে তিনি কলিকাতায় (দ্র) গ্রামোফোন (দ্র) কোম্পানিতে সুরকার ও ট্রেনার হিসাবে কাজে যোগ দেন। ১৯৩৪ সাল থেকে শুরু হয় তাঁর সঙ্গীতজীবনের স্বর্ণযুগ। তবে গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগ দেন তিনি এর আগে এবং ১৯৩২ সালে তাঁর নিজের গাওয়া গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। তখন থেকে বাংলা ও হিন্দি গানের নানা শাখায় তিনি অসাধারণভাবে কাজ করে চলেন। কমল দাশগুপ্তকে সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার মনে করা হয়। তাঁর সুর করা গানের সংখ্যা চার হাজারের ওপর। এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক গান ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) সঙ্গে কমল দাশগুপ্তের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ এবং তিনি নজরুলের বহু জনপ্রিয় গানের সুর রচয়িতা। চলচ্চিত্র-সঙ্গীত পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর সাফল্য অসামান্য। চল্লিশটিরও বেশি চলচ্চিত্রে (দ্র) তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেন। আধুনিক বাংলা গান বলতে গানের যে-ধারাটিকে বোঝায় তা গড়ে তোলার কেন্দ্রে ছিলেন কমল দাশগুপ্ত। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকায় চলে আসেন ও এখানেই ১৯৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

ক. গো.

কমলা

কমলা একটি লেবু জাতীয় ফল। সারা পৃথিবীতেই কমলার যথেষ্ট কদর রয়েছে। মনে করা হয়, কমলালেবুর আদি জন্মস্থান ভারতীয় উপমহাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় (দ্র)। সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভাস্কো দা গামা (দ্র) এই ফলটি ভারত (দ্র) থেকে ইউরোপে (দ্র) নিয়ে যান।

কমলালেবুকে সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন—টক কমলালেবু, মিষ্টি কমলালেবু এবং ঢিলা-খোসা বা ম্যাণ্ডারিন কমলালেবু। এর মধ্যে মিষ্টি কমলাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। কমলালেবু গোলাকার থেকে ডিমের আকৃতি পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। রঙের পার্থক্যও প্রচুর। যেমন, গোলাপি-কমলা থেকে গাঢ় লাল পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণত যেসব অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে গরম বেশি এবং শীতকালে শীত বেশি অথচ বরফ পড়ে না এরকম অঞ্চলে কমলা ভাল জন্মে।

কমলাগাছের পাতা সবুজ এবং ফুলগুলো দেখতে বেশ সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত। ফুল ফোটা থেকে কমলা পাকা পর্যন্ত কোনো কোনো প্রজাতির আট মাস এবং কোনো কোনো প্রজাতির প্রায় বিশ মাস সময় লাগে। এক একটি কমলার মধ্যে ১০ থেকে ১৫টি পর্যন্ত কোয়া থাকে। কোয়াগুলো রসে পূর্ণ এবং একটি কোয়ায় কয়েকটি বিচি থাকে। তবে কিছু প্রজাতির কোয়া বিচিশূন্যও হয়। কমলা যত পাকবে তত তার মধ্যে চিনি (দ্র) ও রসের পরিমাণ বাড়বে এবং অ্যাসিডের (দ্র) পরিমাণ কমবে। এজন্য অনেক দেশে কমলা আহরণের জন্য পরিপক্বতার একটি সীমা নির্দেশ করা থাকে।

পৃথিবীতে (দ্র) প্রতি বছর প্রায় চার কোটি টন কমলা উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ব্রাজিল রয়েছে শীর্ষস্থানে এবং এর পর পরই যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) ও মেহিকোর (Mexico) অবস্থান। পৃথিবীতে যত কমলা উৎপন্ন হয় তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রস ও জ্যাম-জেলি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাত্র এক-পঞ্চমাংশ কমলা তাজা ফল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কমলালেবু রুটেসী (Rutaceae) পরিবারের সদস্য। মিষ্টি কমলা Citrus sinensis, টক কমলা Citrus aurantium এবং সাধারণ ম্যাণ্ডারিন Citrus reticulata প্রজাতির। এ ছাড়াও ম্যাণ্ডারিনের বেশ কিছু প্রজাতি এবং সঙ্কর প্রজাতি রয়েছে।

ফ. মা.

কমিউনিজ্‌ম্　সাম্যবাদ দ্র

কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো (Communist Manifesto)

কার্ল্ মার্ক্স (দ্র) ও ফ্রিড্‌রিশ্ এঙ্গেল্‌স্ (দ্র)-এর যৌথভাবে লেখা এই ইস্তাহার ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। সমাজ

www.pathagar.com

কীভাবে বিকশিত হয়, কমিউনিজম্ বা সাম্যবাদের (দ্র) প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য ইত্যাদি ব্যাখা করাই বইটির প্রকৃত উদ্দেশ্য। জার্মান ভাষায় রচিত এই পুস্তিকার শিরোনাম ছিল 'মানিফেস্ট্ ডের্ কোমুনিশ্টেন্' (Manifest der Kommunisten)। এটিই 'The Communist Manifesto' নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। বাংলা অনুবাদেও এই ইস্তাহারকে 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' বলে।

কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর মূল বক্তব্য হল : মানবসমাজে সব সময়েই শ্রেণীসংগ্রাম চলছে। ইতিহাস মানেই হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস—সংগ্রাম 'স্বাধীন' মানুষের সঙ্গে 'দাস'দের, 'অভিজাত'বর্গের সঙ্গে অনভিজাত সাধারণ লোকদের, 'জমিদার'দের সঙ্গে 'রায়ত'দের, এক কথায় শোষকের সঙ্গে শোষিতের; কখনো এই লড়াই প্রত্যক্ষ, কখনো-বা পরোক্ষ। আর এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে চলতে চলতেই সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে বিশ্লেষণ করে তাঁরা সিদ্ধান্তে আসেন যে এই দুই শক্তির লড়াইয়ে সংখ্যাগুরু শোষিত দলই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবে এবং যখন জয়ী হবে তখন প্রতিষ্ঠিত হবে বৈষম্যহীন শ্রেণীহীন সমাজ। তাঁরা আরো বলেন যে আধুনিক মানবসমাজে শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও শাসন এত চতুরভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে যে অনেক সময়ে তা বোঝা সম্ভব হয় না। শোষক-শাসক গোষ্ঠীকে তাঁরা সনাক্ত করেছেন 'বুর্জোয়া' সমাজ বলে, যাদের হাতে উৎপাদনের সমস্ত হাতিয়ার জমা রয়েছে। শোষিতদের তাঁরা বলেছেন 'প্রোলেতারিয়েৎ'। তাঁরা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে পুঁজিপতি শ্রেণী বা বুর্জোয়াদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা রয়ে গেছে, ফলে এমন একটা সময় আসতে বাধ্য, যখন তাদের বিরুদ্ধে চাষী-মজুর শ্রেণী বা প্রোলেতারিয়েৎ বিদ্রোহ করবে, লড়াইয়ে নামবে।

কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে যে মতবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল তা হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন লেনিন্ (দ্র)। রাশিয়ার (দ্র) মহাপরাক্রান্ত জার সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রোলেতারিয়েতের বিদ্রোহ পরিচালনা করে তিনি সে দেশে সমাজতন্ত্র (দ্র) ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন ১৯১৭ সালে।

হা. মা.

কমিক (comic)

যা হাসির উদ্রেক করে তাকেই কমিক বলা হয়। সাহিত্যের অঙ্গনে, বিশেষভাবে নাটকে (দ্র) যদি কোনো চরিত্র বা উপাখ্যান দর্শক-পাঠককে হাসায়, তবে সেই চরিত্রকে কমিক চরিত্র ও সেই উপাখ্যানকে কমিক উপাখ্যান বা কমিক এপিসোড বলা হয়। শেক্সপীয়রের (দ্র) 'হেনরি দ্য ফোর্থ' নাটকে ফলস্টাফ এক অনবদ্য কমিক চরিত্র।

কমিক কথাটির আরেকটি ব্যবহার আছে। শিশু (দ্র) ও কিশোরদের জন্য খুব কম বাক্য ও প্রচুর ছবি ব্যবহার করে যেসব ছোট ছোট বই প্রকাশ করা হয়, তাকেও কমিক্স্ বা কমিক বুক্স্ বলা হয়, সেখানে হাস্যকৌতুক থাকুক বা না থাকুক।

ক. চৌ.

কমেডি (comedy)

সাধারণভাবে যে সাহিত্যকর্মে বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচিত ও উপস্থাপিত হয় যার দ্বারা পাঠক উৎফুল্ল হতে পারে তাকে কমেডি বলা হয়। তবে প্রায়শ এর দ্বারা মিলনান্তক বা হাস্য-রসাত্মক নাটককেই (দ্র) বোঝানো হয়। কমেডির সমাপ্তি লগ্নে পাঠক-দর্শক প্রধান চরিত্রদের সুখী ও আনন্দিত দেখে।

কমেডিকে কয়েকটি শাখায় ভাগ করা যায়— (ক) রোম্যান্টিক কমেডি : এখানে আমরা কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হিসাবে পাই পুরুষ-রমণীর প্রেম ও ভালবাসা। প্রেমিক-প্রেমিকা কমেডির প্রথম দিকে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা মধুর আনন্দময় পরিবেশে তাদের মিলন ঘটে। শেক্সপীয়রের (দ্র) 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' রোম্যান্টিক কমেডির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দশন।

(খ) ব্যঙ্গধর্মী কমেডি : এখানে নাট্যকার প্রেম-ভালবাসার স্নিগ্ধ কোমল চিত্র তুলে ধরার পরিবর্তে চরিত্রাবলির নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সমাজের নানা অসঙ্গতি ও দুর্বলতার চিত্র পরিবেশন করেন এবং তিনি এ কাজটি করেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে। এ ধরনের নাটক সাধারণত বাস্তবধর্মী, শহুরে জীবনভিত্তিক ও সমকালীন বিষয়াদি নিয়ে রচিত হয়।

(গ) প্রহসন : এর নির্ভেজাল উদ্দেশ্য দর্শক-পাঠককে হাসানো। এ জাতীয় কমেডিতে সব কিছুই আতিশয্যমণ্ডিত করে উপস্থিত করা হয়। এখানে হাস্যরসের মূল উৎস চরিত্র

www.pathagar.com

নয়, ঘটনা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের (দ্র) 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এবং দীনবন্ধু মিত্রের (দ্র) 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' (১৮৬৬) বাংলা সাহিত্যের (দ্র) উল্লেখযোগ্য প্রহসন (দ্র)।

ক. চৌ.

কম্পন / কম্পাঙ্ক

কোনো বস্তু বা বস্তুকণার অগ্র-পশ্চাৎ গতি বা দোলনকে কম্পন বলে। কম্পন প্রাকৃতিক নিয়মে অথবা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি হতে পারে। স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়মের কম্পনের উদাহরণ ভূমিকম্পন। কৃত্রিম কম্পনের উদাহরণ শব্দ উৎপাদন। আমরা বাতাসে কম্পন সৃষ্টি করে শব্দ উৎপাদন করি, কথা বলি। আমরা যখন কথা বলি, আমাদের স্বরযন্ত্রের কম্পন হয়। মাইক বা লাউড স্পিকারে পর্দাটির কম্পন থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়। প্রকৌশলীরা কম্পন সৃষ্টির জন্য তৈরি করেছেন 'ভাইব্রেটর' (vibrator) নামের যন্ত্র। এর কাজ দোলানো বা ঝাঁকানো।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যেমন— কথা বলা, শব্দ উৎপাদন, ঔষধ তৈরি, রোগীর পরিচর্যা (মাংসপেশির মালিশ), বেতার-তরঙ্গ আদান প্রদান ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম্পন অনভিপ্রেত, তা বিপর্যয়ও সৃষ্টি করতে পারে। যেমন— কলকারখানার শব্দ, যানবাহনের হর্ন, বোমা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট কম্পন ইত্যাদি। বোমা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট কম্পন প্রচণ্ড ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

প্রতি সেকেণ্ডে বস্তু বা বস্তুকণার পূর্ণসংখ্যক কম্পনকে কম্পাঙ্ক বলে। কম্পাঙ্কের একক হার্ট্‌জ্ (hertz)। প্রতি সেকেণ্ডে একটি পূর্ণ কম্পন হলে বলা হয় এক হার্ট্‌জ্। বেতার-তরঙ্গ বোঝাতে এই শব্দই ব্যবহার করে বলা হয় কিলোহার্ট্‌জ্ (kilohertz)।

স. রা.

কম্পাস-১

কম্পাস (compass) ইংরেজি শব্দ। এটি দিক নির্ণয়ের যন্ত্র। একটি দণ্ডচুম্বককে স্বাধীনভাবে ঝুলিয়ে রাখলে সর্বদা উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর এসে স্থির হয়ে থাকে। অর্থাৎ

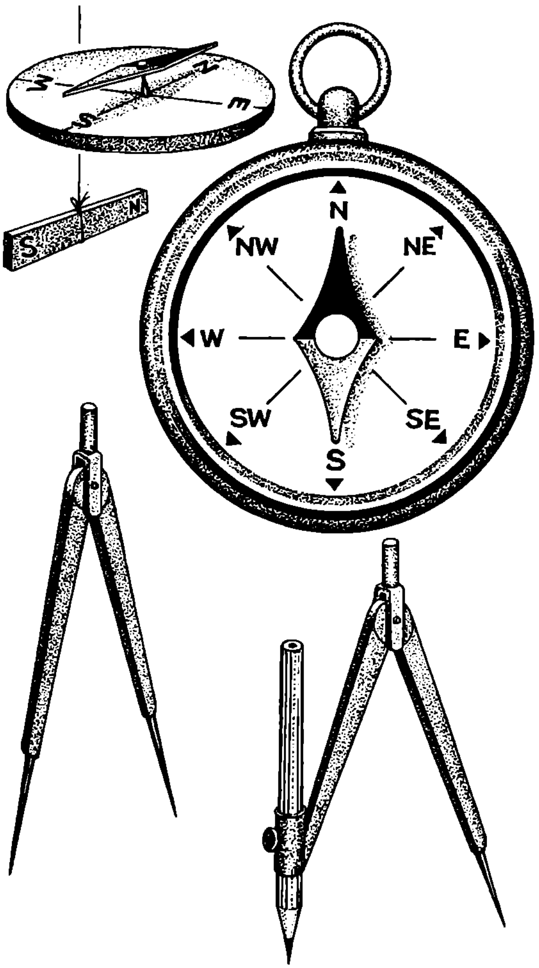

চুম্বকদণ্ডের প্রান্ত দু'টি উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে। এই নীতির উপর ভিত্তি করে কম্পাস বা দিঙ্‌নির্ণয়যন্ত্রের উদ্ভব হয়। একটি সূচ্যগ্র শলাকার উপর সরু অগ্রভাগবিশিষ্ট চুম্বকপাত বসিয়ে কম্পাস তৈরি হয়।

খ্রিস্টপূর্ব চার শ' বছরেরও আগে চীন (দ্র) দেশে এ ধরনের কম্পাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। ১০০০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চীন এবং ভূমধ্যসাগরীয় নাবিকেরা চুম্বক খণ্ডকে সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে কম্পাস তৈরি করত। একে বলা হত 'লিডিং স্টোন'। তখন জাহাজ (দ্র) ছিল কাঠের। এর পরে জাহাজে লোহা ও ইস্পাতের ব্যবহার বেড়ে গেলে

www.pathagar.com

এই সব কম্পাস ব্যবহার অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ চুম্বক (দ্র) লোহা (দ্র) দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ফলে দিক নির্ণয়ে ভুল হয়। এ কারণে নাবিক এবং বিজ্ঞানীরা কম্পাসের উন্নয়নে সচেষ্ট হন। এভাবে উদ্ভব হয় 'নৌ-কম্পাস', 'জাইরোকম্পাস', 'পকেট কম্পাস' ইত্যাদির। নৌ-কম্পাস নৌ-নাবিকেরা ব্যবহার করেন। জাইরোকম্পাস ব্যবহার করেন বৈমানিকেরা। ব্যবহারের সুবিধা এবং ত্রুটিমুক্ত দিঙ্‌নির্দেশনার জন্য ডায়ালযুক্ত বিশেষ ফ্রেমের মধ্যে এসব কম্পাস তৈরি হয়।

স. রা.

কম্পাস-২

জোড়া কম্পাস গণিতচর্চায় ব্যবহৃত অন্যতম যন্ত্র। সুচাল পা বা অগ্রভাগ-বিশিষ্ট দু'টি দণ্ডের অন্য প্রান্ত দু'টিকে স্ক্রু দ্বারা সংযুক্ত করে জোড়া কম্পাস তৈরি করা হয়। সুচাল পা দু'টিকে প্রয়োজনে পরস্পরসংলগ্ন বা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। একটি পায়ের সঙ্গে প্রয়োজনে পেন্সিল যুক্ত করে এর সাহায্যে বৃত্ত, চাপ ও বিভিন্ন জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন করা যায়। পেন্সিল ছাড়া দুই পিনযুক্ত কম্পাসকে বলে বিভাজক (divider), জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কনে এর গুরুত্ব বেশি। গণিত (দ্র) ছাড়াও ভূগোল (দ্র), স্থাপত্যবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যার চর্চায় এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র। মিশরীয় (দ্র) ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় (দ্র) কম্পাস ও রুলারের সাহায্যে অনেক সূত্র উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছিল।

স. রা.

কম্পিউটার (computer)

কম্পিউটার ইংরেজি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল হিসাব বা গণনাকারী যন্ত্র। আসলে আধুনিক কম্পিউটারকে শুধু গণনাকারী বললে ভুল হবে। কম্পিউটার এক দিকে যেমন অত্যন্ত দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে সহজ থেকে জটিল গাণিতিক সমস্যাবলি সমাধান করে, অন্য দিকে তেমনি যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনও করে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

কম্পিউটার ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের চাঁদে (দ্র) পদচারণা, মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়েছে কেবল কম্পিউটারের নির্ভুল ও দ্রুত হিসাব করার ক্ষমতার ফলে। অসংখ্য গণিতবিদ সারা জীবন বসে যে গণনা সম্পন্ন

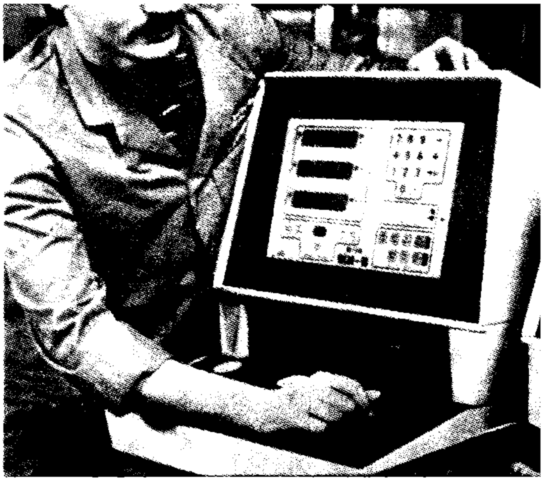

বিভিন্ন কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এত দ্রুত পদ্ধতির উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটছে যা রীতিমত বিস্ময়কর

করতে পারতেন না, কম্পিউটার তা করে দিচ্ছে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

বিভিন্ন কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। কলকারখানা নিয়ন্ত্রণে, ব্যাংক ব্যবসায়, বিমানের কাউন্টারে, মুদ্রণে, খেলাধুলার রেকর্ড রাখতে, এমনকি খেলতে, পড়তে, গবেষণায়ও। নিখুঁত এবং দ্রুত কাজ করতে পারলেও কম্পিউটারের কিন্তু নিজস্ব কোনো মেধা বা বুদ্ধি নেই। একে দিয়ে কাজ করানোর জন্য প্রয়োজন হয় কম্পিউটার প্রোগ্রাম, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ দিতে হয় কম্পিউটারকে। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিউটার কাজ করে।

কম্পিউটার একটি বিস্তৃত পদ্ধতি। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, মাইক্রোপ্রসেসর, ডিস্ক, ডিস্ক ড্রাইভ, প্রিন্টার, মনিটর, কী-বোর্ড ইত্যাদি নিয়ে কম্পিউটার গঠিত। কম্পিউটারের এসব যান্ত্রিক অংশকে বলে হার্ডওয়্যার। সমস্যা সমাধানে ও কম্পিউটারের নিজস্ব স্বাভাবিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী বা প্যাকেজ প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয় তাদের বলে সফ্‌ট্‌ওয়্যার। কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সফ্‌ট্‌ওয়্যার তৈরি করতে পারে। ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কতকগুলো কম্পিউটার প্রোগ্রাম পাওয়া যায়, যেমন ওয়ার্ড, ওয়ার্ডস্টার, ওয়ার্ড পারফেক্ট, লোটাস-১-২-৩, ডিবেস ইত্যাদি।

www.pathagar.com

কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের চারটি অংশ : ইনপুট, আউটপুট, স্মৃতি এবং কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ (Central Processing Unit) সংক্ষেপে CPU । CPU-এর দু'টি অংশ : গাণিতিক/যুক্তি অংশ এবং নিয়ন্ত্রণ অংশ।

কম্পিউটারে CPU-এর মূল যন্ত্র হল মাইক্রোপ্রসেসর, সিলিকন্ (দ্র) চিপসের উপর সমন্বিত বর্তনী বা IC। ইলেক্ট্রনিক (দ্র)যন্ত্রাংশ অত্যন্ত দ্রুত— সেকেণ্ডের লক্ষ লক্ষ ভাগ সময়ে— যে কোনো কাজ বা নির্দেশ পালন করতে পারে। অবশ্য কোন ধরনের সঙ্কেত নিয়ে কাজ করতে হবে তার উপর কম্পিউটারের গতি নির্ভরশীল।

এবার আসা যাক কম্পিউটার আবিষ্কারের কথায়। এর আবিষ্কারের জন্য এককভাবে কাউকে কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যান্ত্রিক গণনাপদ্ধতি বা ক্যালকুলেটর থেকে ধাপে ধাপে আজকের কম্পিউটারের উদ্ভব হয়েছে। আধুনিক কম্পিউটারের সূত্রপাত হয় ১৮৩৩ সালে চার্লস ব্যাবেজের (Charles Babbage : ১৭৯২ – ১৮৭১) এনালিটিকাল ইঞ্জিন থেকে। এর পর ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের ঘটেছে প্রভূত উন্নতি। প্রথম দিকে নির্মিত পেন্সেলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ENIAC নামের কম্পিউটারটির ওজন ছিল ত্রিশ টন, আয়তনও ছিল তেমনি বিশাল। ৪০ ফুট লম্বা, ২০ ফুট চওড়া একটি কক্ষের সকল দেয়াল জুড়ে ছিল এর যন্ত্রপাতি। এখন এই কম্পিউটারই হয়েছে একটি হাতব্যাগের সাইজের।

স. রা.

কয়লা

কার্বন (দ্র) মৌলের অবিশুদ্ধ রূপ কয়লা। অপর্যাপ্ত বাতাসে (দ্র) কাঠ পোড়ালে কয়লা হয়। এর নাম কাঠকয়লা। ভূগর্ভে খনিতে পাওয়া যায় পাথরের মতো শক্ত এক ধরনের শিলাখণ্ড, এর নাম খনিজ কয়লা। এ ছাড়াও আছে প্রাণীজ কয়লা, ভুসা কয়লা, সক্রিয় কয়লা, শর্করা কয়লা প্রভৃতি। প্রাণীদেহের চর্বিমুক্ত হাড়ের বিধ্বংসী পাতনের ফলে উৎপন্ন হয় প্রাণীজ বা অস্থিজ কয়লা। একে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে (দ্র) দ্রবীভূত করে তৈরি হয় আইভরি ব্ল্যাক। রঙ তৈরি এবং চিনির (দ্র) বর্ণ শোধনে এর ব্যবহার হয়। নারকেলমালার অন্তর্ধূম পাতনে (দ্র) যে কয়লা পাওয়া যায় তা সক্রিয় কয়লা, চিনি থেকে পাওয়া যায় শর্করা কয়লা। বিভিন্ন প্রকার কুপী বা প্রদীপশিখা থেকে কালো ঝুল তৈরি হয়, তাকে বলে ভুসা কয়লা।

পাথুরে বা খনিজ কয়লা সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ভিদ (দ্র) থেকে। হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর (দ্র) যেসব বিশাল অরণ্য নৈসর্গিক কারণে ভূগর্ভে চাপা পড়ে যায়, বায়ুর অনুপস্থিতি, পৃথিবীর অভ্যন্তরে চাপ ও ভূস্তরের চাপের ফলে তার জৈব বিধ্বংসী পাতন হয়। মাটির তলে চাপা-পড়া উদ্ভিদের পরিবর্তন ঘটে ধাপে ধাপে, এভাবে সৃষ্টি হয় খনিজ কয়লা। এভাবে কয়লা সৃষ্টিতে হাজার হাজার বছর প্রয়োজন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কয়লায় কার্বনের অনুপাত বাড়তে থাকে এবং কয়লার গুণগত মানও বৃদ্ধি পায়। এজন্য খনিজ কয়লার মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে :

কয়লার নাম	কার্বনের অনুপাত	বিবরণ
পিট কয়লা	৬০%	নিম্নশ্রেণীর কয়লা, দহনে প্রচুর ধোঁয়া সৃষ্টি হয়। জ্বালানিক্ষমতা কম বলে এর ব্যবহার হয় না।
লিগনাইট	৬০-৭৫%	ঐ
বিটুমিনাস	৭৫-৯২%	উচ্চ শ্রেণীর নরম কয়লা। গৃহস্থালির জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দহনে কম ধোঁয়া এবং উত্তম তাপ সৃষ্টি হয়।
অ্যানথ্রাসাইট	৯২-৯৮%	উচ্চ শ্রেণীর কয়লা। দহনে ধোঁয়া হয় না বললেই চলে। সবচেয়ে বেশি তাপ সৃষ্টি করে। ধাতু নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হয়।

খনিজ কয়লার বিধ্বংসী পাতন করে কোল গ্যাস, কোক (দ্র), গ্যাস কার্বন, কেরোসিন (দ্র), আলকাতরা (দ্র), বিটুমিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ (দ্র) আবিষ্কারের আগে কোল গ্যাস দিয়ে শহরে গ্যাসের আলো জ্বালানো হত। ১৭৯২ সালে স্কটল্যাণ্ডে উইলিয়াম মার্ডক (William Murdoch : ১৭৫৪–১৮৩৯) প্রথম কোল গ্যাস দিয়ে তাঁর নিজের বাড়ি আলোকিত করেন।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ কয়লার ব্যবহার জানত (খ্রি.পূ. ২০০০)। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে খনি

www.pathagar.com

(দ্র) থেকে কয়লা তোলা শুরু হয়। ১৩শ শতকে শিল্পক্ষেত্রে কয়লার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। কাঠ-কয়লা জ্বালানি (দ্র) হিসাবে, ধাতু নিষ্কাশনে, বারুদ প্রস্তুতিতে, ফিল্টার তৈরিতে এবং ভুসা কয়লা ছাপার কালি,জুতোর কালি, রঞ্জক প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। সক্রিয় কয়লা দূষিত গ্যাস পরিশোধন করে বলে গ্যাস-মুখোশ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। খনিজ কয়লার প্রধান ব্যবহার জ্বালানি হিসাবে। এ ছাড়া কয়লা থেকে কোল গ্যাস, ঔষধ, রঙ, কীটনাশক (দ্র), স্যাকারিন, রেনজিন, টলুইন, ন্যাপথলিন, আলকাতরা (দ্র) ইত্যাদি তৈরি করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পেট্রোলিয়াম (দ্র) এবং প্রাকৃতিক গ্যাস (দ্র) আবিষ্কৃত হওয়ার পর জ্বালানি হিসাবে কয়লার ব্যবহার কমে যায়। কিন্তু তেল বা গ্যাসের মজুদ যে হারে খরচ হচ্ছে তাতে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে আবার কয়লার ব্যবহার শুরু হবে। কিন্তু কয়লার মজুদও সীমিত। তাই বিজ্ঞানীরা বিকল্প জ্বালানির সন্ধানে তৎপর।

পৃথিবীর অনেক দেশেই কয়লার খনি আছে। চীন (দ্র), জাপান (দ্র), ভারত (দ্র), কোরিয়া, পাকিস্তান (দ্র), তুরস্ক (দ্র), আমেরিকা (দ্র), ইংল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশে উন্নত মানের কয়লা রয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশেও (দ্র) উন্নত মানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে জামালগঞ্জে। এর পরিমাণ ১০০ কোটি মেট্রিক টন। কিন্তু এর অবস্থান ১০০০ মিটার মাটির নিচে। তাই বর্তমান প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে এর উত্তোলন লাভজনক নয়। বড়পুকুরিয়া এবং পীরগঞ্জের প্রাপ্ত কয়লার মান ভাল ; মাত্র ১৬০ মিটার গভীরে প্রায় ৬০-৭০ কোটি মেট্রিক টন কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে এই দুই স্থানে। এই কয়লা উত্তোলনের জন্য সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। এ ছাড়া ফরিদপুর ও খুলনা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ পিট কয়লার সন্ধানও পাওয়া গেছে।

স. রা.

করোনারি রোগ হৃদ্‌রোগ দ্র

কর্কটক্রান্তি

পৃথিবীর (দ্র) উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু থেকে সমান দূরত্বে পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টন করে একটি পূর্ণবৃত্ত কল্পনা করা যায়। একে নিরক্ষরেখা (দ্র) বা নিরক্ষবৃত্ত বা ভূ-বিষুব রেখা বলে। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের অক্ষাংশ বলা হয়। নিরক্ষরেখার অক্ষাংশে ০° ডিগ্রি ধরে উত্তর গোলার্ধের ২৩ $\frac{১}{২}$° উত্তর অক্ষরেখাকে কর্কটক্রান্তি বলে।

সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণকালে পৃথিবী ২১শে জুন তারিখে এমনভাবে অবস্থান করে যে সূর্যরশ্মি ২৩ $\frac{১}{২}$° উত্তর সমাক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পড়ে। এই অক্ষরেখা সূর্যের আপাতগতির সর্ব-উত্তর সীমা বলে এর নাম দেওয়া

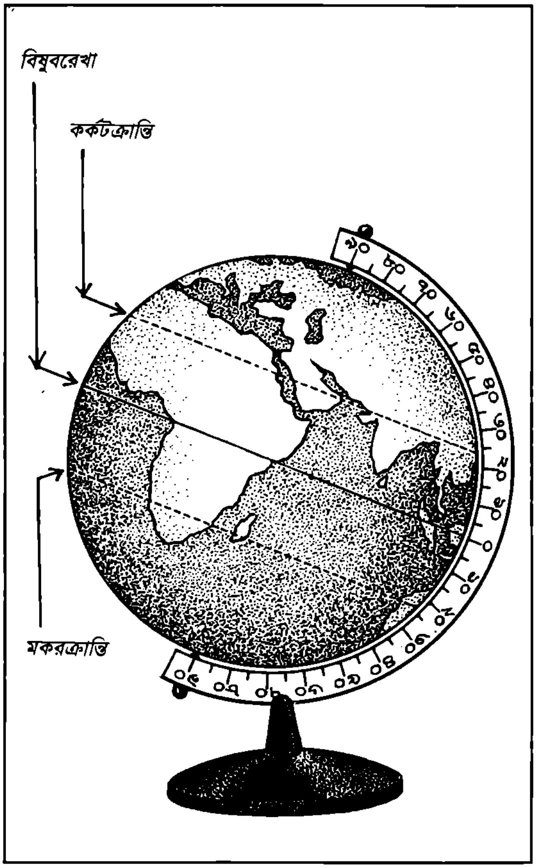

হয়েছে কর্কটক্রান্তি (Summer Solstic : *Sol*=Sun, *stice*=standstill)। উত্তরায়ণে এটি সূর্যের শেষ অবস্থান। এই সময় ছায়াবৃত্ত (৬৬ $\frac{১}{২}$° অক্ষাংশ) নিরক্ষররেখার উত্তর ও দক্ষিণের সমাক্ষরেখাগুলোকে এমনভাবে ভাগ করে যে উত্তর-গোলার্ধে দিন বড় ও রাত্রি ছোট এবং দক্ষিণ-গোলার্ধে দিন ছোট ও রাত্রি বড় হয়। ২১শে জুন তারিখে উত্তর

www.pathagar.com

গোলার্ধে ৬৬ ½° উত্তর অক্ষাংশের উত্তরে সর্বত্রই দিন এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ৬৬½° দক্ষিণ অক্ষাংশের দক্ষিণে সর্বত্রই রাত্রি থাকে।

২১শে জুন তারিখে উত্তর-গোলার্ধে দিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং রাত্রির পরিমাণ সবচেয়ে কম। ঐ দিনটিকে কর্কটসংক্রান্তি বলে।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপবলয় থেকে বায়ু উপরে উঠে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে পৌঁছুলে এ বায়ু শীতল ও ভারি হয়ে নিচে নেমে আসে। এভাবে ২৫° থেকে ৩৫° উত্তর-দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দু'টি উচ্চ চাপবলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই দু'টি চাপবলয়কে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপবলয় বলে। এই উচ্চচাপবলয় থেকে বায়ু উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলে কখনো দুইটি বায়ু মিলিত হওয়ার সুযোগ পায় না, ফলে এখানে কোনো বৃষ্টিও হয় না। পৃথিবীর প্রায় সকল মরুভূমিই (দ্র) কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপবলয়ে অবস্থিত।

মু. এ.

কর্টিসোন (cortisone)

বৃক্কের (দ্র) শীর্ষে অবস্থিত 'অ্যাড্রেনালগ্রন্থি'র (দ্র) বাইরের অংশ বা কর্টেক্স থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক উপাদানের (হরমোন) নাম কর্টিসোন। অন্ত্র থেকে শর্করা পরিশোষণে কর্টিসোন সহায়তা করে। বিভিন্ন প্রকার রোগ (দ্র) সারাতেও কর্টিসোন কাজে আসে। অস্থিসন্ধির প্রদাহ, বিশেষ কারণে মাংসপেশির দুর্বলতা, অ্যালার্জি, এডিসন্স্ রোগ (Addison's disease), হাঁপানিসহ চোখ, ত্বক, পরিপাকনালী এবং বৃক্কের বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে কর্টিসোন কার্যকর।

ফিলিপ হেঞ্চ (Philip Showalter Hench : ১৮৯৬–১৯৬৫) এবং এডওয়ার্ড কেণ্ডাল (Edward Kendall : ১৮৮৬–১৯৭২) নামক দু'জন চিকিৎসক বাতজ্বর সারানোর জন্য এক জন রোগীর ওপর সর্বপ্রথম কর্টিসোন প্রয়োগ করেন। কর্টিসোনের ব্যবহার চিকিৎসাক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেছে। এজন্য ১৯৫০ সালে এঁদেরকে নোবেল পুরস্কার (দ্র) দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানীরা গরুর পিত্তে (দ্র) উপস্থিত এক ধরনের যৌগ থেকে কর্টিসোন তৈরি করতে সক্ষম হন।

সি. না. হ.

কর্ণ/কান

শ্রবণ এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষার অঙ্গ। কর্ণ বা কানের তিনটি অংশ—বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ। বহিঃকর্ণের দু'টি অংশ— অনেকটা চোঙের মতো পিনা এবং কানের বহিঃছিদ্র। পিনা নরম তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি। কানের বহিঃছিদ্র লম্বা নলের মতো। বহিঃকর্ণের শেষে রয়েছে পাতলা চামড়ার কানের পর্দা। গ্রন্থি থেকে তৈলাক্ত পদার্থ কানের পর্দাকে নরম ও আর্দ্র রাখে বলে কান কর্মক্ষম থাকে।

মধ্যকর্ণের ছোট কুঠুরিতে ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপেস নামের পরস্পরসংলগ্ন তিনটি ছোট অস্থি (দ্র) থাকে। মধ্যকর্ণ শ্রুতিনালীর মাধ্যমে ফ্যারিংস (দ্র) বা গলবিলের

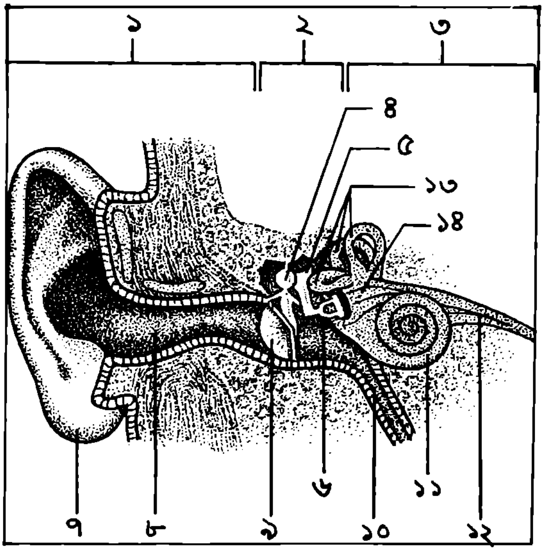

কর্ণ

১. বহিঃকর্ণ ২. মধ্যকর্ণ ৩. অন্তঃকর্ণ ৪. ম্যালিয়াস ৫. ইনকাস ৬. স্টেপেস ৭. পিনা ৮. বহিঃছিদ্র (কর্ণকুহর) ৯. কানের পর্দা ১০. ইউস্টেশিয়ান নালি ১১. কক্লিয়া ১২. শ্রবণস্নায়ু ১৩. অর্ধবৃত্তাকার নালি ১৪. ইউট্রিকিউলাস

www.pathagar.com

সঙ্গে যুক্ত। ফলে কানের পর্দার দুই দিকের বায়ুর চাপ সমান থাকে।

অন্তঃকর্ণ মাথার অস্থির ভিতরে সুরক্ষিত। গোটা অন্তঃকর্ণ আকৃতিতে আঁকাবাঁকা পথের মতো। এজন্য এর নাম 'লেবেরিন্থ'। শব্দশ্রুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এর ভেতরকার অংশের নাম কক্লিয়া (cochlea)। এর তিনটি অংশই তরল পদার্থে পূর্ণ। এই তরল পদার্থে প্রচুর শ্রবণস্নায়ু থাকে, যা মূল শ্রবণস্নায়ু (অডিটরি নার্ভ) নামে মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। এ ছাড়া অন্তঃকর্ণের বহিরাংশে দেহের অবস্থান নির্ধারণ ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য রয়েছে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালী এবং ইউট্রিকিউলাস নামক অঙ্গ।

বহিঃকর্ণ শব্দধ্বনি গ্রহণ করার পর সেই শব্দতরঙ্গ কানের পর্দায় কম্পন সৃষ্টি করে। এই কম্পন মধ্যকর্ণের অস্থি তিনটির মধ্য দিয়ে কক্লিয়া-তে পৌঁছায়। কক্লিয়ার তরল পদার্থ থেকে শ্রুতিস্নায়ুর মাধ্যমে কম্পন মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং তখনই শব্দ শোনা হয়।

কান নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হয়। কানের ভেতরে পানি ও শক্ত ধারালো কোনো জিনিস ঢোকানো উচিত নয়। জন্মগতভাবে যারা বধির তাদের জন্য শোনার বিশেষ যন্ত্র রয়েছে।

আ. আ. হা.

কর্ণফুলি নদী, বাংলাদেশের দ্র

কর্নওয়ালিস, চার্লস্ (১ম মার্কুইস বা লর্ড) [১৭৩৮—১৮০৫] ব্রিটিশ সেনাপতি ও শাসক। কর্ণওয়ালিস (Charles Cornwallis, 1st Marquess) আমেরিকার স্বাধীনতা (দ্র) সংগ্রামের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণকারী ক্যারোলিনা অভিযান পরিচালনা করেন। ইয়র্কটাউন অভিযানে পরাজয় ঘটলে তাঁর অভিযানপর্ব শেষ হয়। পরে তিনি পর্যায়ক্রমে ভারতের (দ্র) গভর্নর জেনারেল (১৭৮৬—৯৩) এবং আয়ারল্যাণ্ডের ভাইসরয় নিযুক্ত হন। ভারতে তাঁর শাসনকালে তিনি বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (দ্র) প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁর আমলে বঙ্গদেশের প্রদেশগুলিতে জেলা ও থানার সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক জেলায় এক জন ইউরোপীয় জজ নিযুক্ত হন, দেওয়ানী আদালত ও উচ্চতম প্রাদেশিক আদালত স্থাপিত হয় এবং জজকে পরামর্শ দানের জন্য কাজী ও পণ্ডিত নিযুক্ত

হয়। তিনি এ দেশে কিছু স্থায়ী সংস্কার প্রবর্তন করেন বটে, কিন্তু দেশীয় ব্যক্তিদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন নি। তিনি তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং মহীশূরের অধিপতি টিপু সুলতানকে (দ্র) পরাজিত ও নিহত করে মহীশূর দখল করেন।

মো. ই.

কর্নিয়া চক্ষু দ্র

কর্পূর (camphor)

উদ্ভিদজাত প্রাকৃতিক গন্ধদ্রব্যের মধ্যে কর্পূর বা ক্যাম্ফার একটি অতি পরিচিত ও প্রয়োজনীয় জৈব উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থ। পূর্ব-এশিয়ার জাপান (দ্র), বোর্নিও, ফরমোজা দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের এক জাতীয় গাছের প্রধানত পাতা থেকেই কর্পূর তৈরি করা হয়। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে এই গাছকে বলা হয় *লরাস ক্যাম্ফোরা*। আবদ্ধ পাত্রে এর পাতা ও ডালপালা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করলে উদ্বায়ী কর্পূর পাতিত হয়ে বেরিয়ে আসে। জলীয়

www.pathagar.com

বাষ্পের সঙ্গে কর্পূর মিশে ঊর্ধ্বপাতিত হয়ে বেরিয়ে ঠাণ্ডা পাত্রের মধ্যে এসে জমে। কর্পূরের কিছু কিছু রোগনাশক, বীজাণুবারক, সুগন্ধদায়ী ও অন্যান্য গুণের জন্য এটি বহুকাল আগে থেকেই নানা কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে এর ব্যবহার বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা সেলুলয়েড (দ্র) তৈরির জন্য কর্পূর একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। সিনেমার ফিল্ম (দ্র), ফটোগ্রাফির নেগেটিভ প্লেট ও কোনো কোনো প্লাস্টিকের (দ্র) উৎপাদনশিল্পে সেলুলয়েডের ব্যবহার বেশ বেড়ে যাওয়ার ফলে কর্পূরের চাহিদাও বাড়তে থাকে। যেসব অঞ্চলে কর্পূরের গাছ জন্মায়, তার বেশির ভাগই ছিল জাপানের অধিকারে আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে এর চাষ বাড়িয়ে জাপান পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে অতি উচ্চমূল্যে কর্পূর সরবরাহ করে খুবই লাভবান হচ্ছিল। এই পরনির্ভরতা দূর করার জন্য পাশ্চাত্যের রসায়ন-বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম কর্পূর উৎপাদনের জন্য গবেষণা শুরু করেন।

কর্পূর বা ক্যাম্ফার একটি হাইড্রোকার্বন (দ্র) জাতীয় জৈব রাসায়নিক যৌগ; দেখতে সাদা, একটা বিশেষ গন্ধযুক্ত উদ্বায়ী ও দাহ্য পদার্থ। এর রাসায়নিক গঠন অতি জটিল হওয়ায় এর আণবিক গঠনবিন্যাস নির্ণয় করতে বিজ্ঞানীদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যা হোক, বহু গবেষণার শেষে উদ্ভিদ জাতের কর্পূরের আণবিক গঠনবিন্যাস নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং ১৯০৩ সালে কৃত্রিম কর্পূর রসায়নাগারে সংশ্লেষিত হয়। অল্পকালের মধ্যেই কৃত্রিম কর্পূরের শিল্পউৎপাদন সফল হয়ে এটি বাজারে বিক্রি হতে শুরু করে। এই সংশ্লেষিত কর্পূর বিভিন্ন গুণ ও ধর্মে পুরোপুরি প্রাকৃতিক কর্পূরের মতো হয়ে শিল্পক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকে।

সংশ্লেষিত কৃত্রিম কর্পূর উৎপাদিত হলেও কিন্তু প্রাকৃতিক কর্পূরের বাজার তেমন কিছু মন্দা হয় নি। জাপানি কর্পূরের চাহিদা আজও যথেষ্ট রয়েছে। কৃত্রিম নীল সংশ্লেষিত হওয়ার পরে উদ্ভিজ্জ নীলের চাষ যেমন বন্ধ হয়ে গেছে, পূর্ব-এশিয়ায় কর্পূর গাছের চাষের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিপর্যয় ঘটে নি। চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্রের ফিল্ম প্রভৃতির জন্য সেলুলয়েড শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং তার ফলে কর্পূরের চাহিদাও বেড়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে কৃত্রিম কর্পূর উৎপাদন করা সম্ভব হয়.নি। তার কারণ হল, কৃত্রিম কর্পূর সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তার্পিন বা টার্পেন্টাইন তেলের দাম যথেষ্ট বেশি, পাওয়াও যায় কম। কাজেই কৃত্রিম কর্পূর চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করা সম্ভব হয় না এবং তা দিয়ে সেলুলয়েডের উৎপাদনশিল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাও চলে না। পাইন জাতীয় গাছ থেকে নিষ্কাশিত তার্পিন তেলের বিকল্প কোনো কাঁচামাল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লেষিত কর্পূর প্রাকৃতিক কর্পূরের স্থান দখল করতে পারবে না। তবে কৃত্রিম কর্পূর সংশ্লেষিত হওয়ায় প্রাকৃতিক কর্পূরের অত্যধিক দাম অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

আ. হ. খ.

কলম্বাস, ক্রিস্টোফার [১৪৫১—১৫০৬]

ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে (Christopher Columbus) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাবিক হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তাঁকে আমেরিকার (দ্র) আবিষ্কারকও বলা হয়, যদিও ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকায় পৌঁছানোর বহু হাজার বছর আগে থেকেই সেখানে জনবসতি ছিল। কলম্বাস আধুনিক ইউরোপের (দ্র) সঙ্গে আমেরিকার একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৫১ সালে ইতালির জেনোয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম কলম্বো (Colombo) পরবর্তী কালে ইংরেজিতে কলম্বাস হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। জেনোয়া সে সময় ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর। তাঁতি পরিবারে জন্ম নিয়েও ক্রিস্টোফারের মনে শৈশব থেকেই সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন কাজ করত। তাই ফাঁক পেলেই কিশোর কলম্বাস বন্দরে নোঙ্গর করা জাহাজে (দ্র) চলে যেত এবং ঘুরে বেড়াত। এভাবে সে নৌবিদ্যার খুঁটিনাটি অনেক কিছুই আয়ত্ত করে।

কলম্বাসের জীবনে প্রথম সমুদ্রযাত্রার সুযোগ আসে তাঁর উনিশ বছর বয়সে। এক জন নাবিক হিসাবে ১৪৭৬ সালে এক দুর্ঘটনায় পড়ার পর একটি পর্তুগিজ জাহাজ তাঁকে উদ্ধার করে লিসবনে নিয়ে যায়। এর পরের কয়েক বছর

www.pathagar.com

কলম্বাস ও তাঁর প্রধান জাহাজ সান্তা মারিয়া। উপরে : তাঁর প্রথম সমুদ্রযাত্রার মানচিত্র

তিনি পর্তুগিজ জাহাজেই কাজ করেন এবং ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। এ সময় তিনি এক জন পর্তুগিজ মহিলাকে বিয়ে করেন।

লিসবনে অবস্থানকালে কলম্বাস লক্ষ করেন, পর্তুগালের নাবিকেরা আফ্রিকার উপকূল হয়ে চীন (দ্র), ভারত (দ্র) ও সংলগ্ন এলাকাসমূহে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু বার বারই ব্যর্থ হচ্ছে। কলম্বাসও এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণা, আফ্রিকার উপকূল বরাবর না গিয়ে সরাসরি পশ্চিমে সমুদ্রযাত্রা করলেই সহজে সেখানে পৌঁছানো যাবে। আর সেখানে পৌঁছাতে পারলে যে কত বড় বাণিজ্যিক সুবিধা পাওয়া যাবে সে ব্যাপারেও তিনি সজাগ ছিলেন।

অবশেষে কলম্বাস ভারতযাত্রার একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেন এবং সফল হলে তিনি কী কী সুযোগ-সুবিধা পাবেন তারও একটি শর্তমালা তৈরি করেন। পর্তুগালের রাজার কাছে তিনি তাঁর পরিকল্পনা ও শর্তাদি পেশ করেন। কিন্তু ১৪৮২ সালে এসব শর্তসাপেক্ষে রাজা তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

এর পর ১৪৮৫ সালে কলম্বাস স্পেনে যান এবং স্পেনের রাজার কাছে তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন। স্পেনের রাজাও এসব শর্তসাপেক্ষে তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু এক জন পরামর্শদাতা রাণী ইসাবেলাকে এই সফরের ফলাফল বোঝালে রাণী সকল শর্তসাপেক্ষে তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৪৯২ সালের ৩রা আগস্ট কলম্বাস তাঁর সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন। সঙ্গে ছিল কাঠের তৈরি ও ইঞ্জিনবিহীন তিনটি সাধারণ জাহাজ এবং ৯০ জন নাবিক। অকূল সমুদ্রে অজানা পথে এটাই ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা। প্রায় তিন সপ্তাহ পর নাবিকেরা সবাই অস্থির

www.pathagar.com

হয়ে উঠল। তাদের ভয় হল আর বুঝি কখনো তীরে ফেরা সম্ভব হবে না। পরিস্থিতি ক্রমে এমন হল যে শেষ পর্যন্ত ১০ই অক্টোবর কলম্বাস তাদের কাছ থেকে মাত্র তিন দিনের সময় নেন। এর মধ্যে পৌঁছানো না গেলে তাঁরা ফিরতি যাত্রা করবেন।

অবশেষে ১২ই অক্টোবর মাঝরাতে বাহামার একটি দ্বীপে তাঁরা জাহাজ থেকে নামলেন। কলম্বাস এর নাম রাখলেন সান সালভাদর। অবশ্য কলম্বাস তখন একে ভারতীয় কোনো দ্বীপ বলেই মনে করেছিলেন।

কয়েক দিন পর আবার যাত্রা করলেন তাঁরা। ২৮শে অক্টোবর কিউবায় পৌঁছে কলম্বাস ভাবলেন, তিনি চীনে পৌঁছে গেছেন। এর পর হাইতির উপকূল দিয়ে যাওয়ার সময় এক জায়গায় তাদের একটি জাহাজ সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেখানকার আদিবাসী-প্রধান তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন এবং জাহাজ মেরামতে সহায়তা করেন। পরিস্থিতি অনুকূল মনে করে কলম্বাস ৪০ জন লোককে সেখানে রেখে যান। তাঁদের তিনি দুর্গ তৈরি ও স্বর্ণ সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে যান। বাকি নাবিকদের নিয়ে ১৪৯৩ সালের ১৫ই মার্চ তিনি স্পেনে ফিরে আসেন। এর পর তিনি আরো তিন বার আমেরিকায় যান। শেষ সমুদ্রযাত্রা করেন ১৫০২ সালে।

ফ. মা.

কলা

কলা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের একটি অবৃক্ষজাতীয় ফল। পৃথিবীর (দ্র) সর্বত্রই এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। পুষ্টি-উপাদানের দিক থেকেও কলা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সারা বছরই কম-বেশি কলার ফলন হয়। শুধু ফল নয়, সবজি হিসাবেও কলার যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। এ ছাড়া কলাগাছ ও গাছের পাতা গবাদি পশুর, বিশেষ করে হাতির অতি প্রিয় খাদ্য। কয়েক জাতের কলাগাছ ও গাছের পাতা বিশেষ ধরনের সুতা, থলে, মাদুর, এমনকি ঘরের বেড়া-ছাউনি তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।

কলার আদি জন্মস্থান এশিয়া (দ্র) মহাদেশে (দ্র)। বর্তমানে এটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সকল দেশেই জন্মে। ব্রাজিল কলা উৎপাদনে শীর্ষস্থানে রয়েছে। এর পরপরই উগাণ্ডা, ভারত (দ্র) ও ফিলিপাইনের অবস্থান। বাংলাদেশেও (দ্র) যথেষ্ট পরিমাণে কলা উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে বৃহত্তর বরিশাল (দ্র) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় প্রচুর কলা উৎপাদিত হয়। এর পরেই রয়েছে বৃহত্তর সিলেট (দ্র), খুলনা, রংপুর, ঢাকা (দ্র) ও ফরিদপুরের অবস্থান।

পৃথিবীতে কলার বহু জাত রয়েছে। তিনটি প্রজাতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো হচ্ছে *Musa sapientum*, *Musa cavendishic* ও *Musa paradisiaca*। বাংলাদেশে উৎপাদিত কলার জাতগুলোকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে– ১. সম্পূর্ণ বীজহীন কলা (যেমন, অমৃতসাগর, সবরী, বসরাই, সিঙ্গাপুরী, অগ্নিস্বর, দুধসর ও মাদ্রাজী); ২. দু-একটি বীজযুক্ত কলা (যেমন, চাঁপা, চিনিচাঁপা, কবরী ও চন্দনী কবরী); ৩. এঁটে কলা (যেমন, চতুর আইটা, গোমা, নিখাইল্যা ও সাংগি আইট্যা)।

উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং উঁচু বেলে-দোআঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটি কলা চাষের জন্য সর্বোত্তম। কলাগাছের গুঁড়ি থেকে যেসব নতুন চারা গজায়, সেগুলো থেকেই নতুন গাছ তৈরি হয়। জাতভেদে এক একটি কলাগাছ ৮ থেকে ৩০ ফুট (২.৪ থেকে ৯ মিটার) পর্যন্ত উঁচু হয়।

কলাগাছের বয়স ১০ মাসের কাছাকাছি হলেই গাছে থোড় বা ফুলের গুচ্ছ বের হয়। থোড়ে অনেকগুলো পাতলা আবরণী পরতে পরতে সাজানো থাকে। আবরণীগুলোর ভেতরে থাকে ফুল। এক একটি আবরণী উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলসহ কচিকলার ছড়া বেরিয়ে আসে। এক একটি ছড়ায় ১০ থেকে ২০টি কলা থাকে। আবার এক একটি কলার কাঁদিতে অনেক ক'টি ছড়া থাকে। কলাগাছে মাত্র এক বারই ফল হয়।

ফ. মা.

কলিকাতা / কলকাতা

ভারতের (দ্র) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী এবং ভারতের বৃহত্তম নগর ও অন্যতম বন্দর। বর্তমানে এই নগর ভারতের

www.pathagar.com

প্রধান শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-কেন্দ্র। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। এটি বঙ্গোপসাগর (দ্র) থেকে ১২৮ কিলোমিটার (৮০ মাইল) উত্তরে হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ১৩–১৫ সেন্টিমিটার (৫–৬ ইঞ্চি)। এর মোটামুটি আয়তন ১০০ বর্গ কিলোমিটার (৪০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি।

ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৯৮ সালে সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা নামক তিনটি গ্রাম ক্রয়ের মধ্য দিয়ে কলিকাতার গোড়াপত্তন করে। হুগলি নদীর মাধ্যমে এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগের সুবিধার কারণে এর দ্রুত বিস্তার ঘটে এবং ক্রমে এটি বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৭০২ সালে এখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ শেষ হয়। ১৭০৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতাকে একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি বলে ঘোষণা করে। ১৭৫৬ সালে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা (দ্র) কলিকাতা অধিকার করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে (দ্র) লর্ড ক্লাইভ (দ্র) নবাবকে পরাজিত করে কলিকাতা পুনরুদ্ধার করেন। ১৭৭৩ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলিকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। ১৯১২ সালে কলিকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে কলিকাতায় শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। কলিকাতার দু'টি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র (বড়বাজার ও ডালহৌসি স্কোয়্যার) হাওড়াপুল দ্বারা হুগলি নদীর অন্য পাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত। সম্প্রতি আরো একটি পুল নির্মিত হয়ে দুই তীরকে যুক্ত করেছে। হুগলি নদীর উভয় তীরে ৭২ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ এক শিল্পাঞ্চল। এই অঞ্চলের শিল্পসামগ্রীর মধ্যে প্রধান হল পাট (দ্র), তুলা (দ্র), বস্ত্র, কাগজ (দ্র), তামাক (দ্র) ও নানাবিধ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। পূর্ব-ভারতীয় উৎপন্নদ্রব্যাদি, যথা চাল, উদ্ভিজ্জ তৈল, পাট, পাতগালা ইত্যাদি কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে যেমন রপ্তানি হয়, তেমনি বিদেশ থেকে শিল্পদ্রব্যসহ বহু পণ্যও আমদানি হয়ে থাকে।

কলিকাতার সঙ্গে সমগ্র ভারতের সংযোগ রক্ষার জন্য স্থাপিত হয়েছে দু'টি রেলপথ। একটি হাওড়া থেকে হুগলির পশ্চিম দিকে ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে এবং অন্যটি শিয়ালদহ থেকে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার সঙ্গে সংযুক্ত। কলিকাতার একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম দমদম। এটি নগরের কেন্দ্রস্থল থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

এখানে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কলিকাতা মাদ্রাসা (১৭৮০) এবং উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দু কলেজ (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র)। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি। কলিকাতার এই বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর ও চিড়িয়াখানা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পরম গৌরবের সামগ্রী। কলিকাতার জাদুঘর প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-সংগ্রহশালা।

কলিকাতা বর্তমানে পৃথিবীর ব্যস্ততম ও জনবহুল শহরগুলোর একটি। প্রতি বর্গকিলোমিটারে এর জনবসতির ঘনত্ব ৩১,০০০ (প্রতি বর্গমাইলে ৭৮০০০) জন। এই শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা বাংলা। তবে বহু ধর্মের বহু ভাষাভাষী লোক এই শহরে বাস করে। শহরের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বী। শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ লোক মুসলমান। এ ছাড়াও খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদি, পার্সি লোকের সংখ্যাও কম নয়।

কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বামপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে বিবেচিত। ১৯৭৭ সালে রাজ্য সরকার নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিই একটানা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাসন করছে।

কলিকাতায় প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়। মৌসুমি বায়ুর (দ্র) প্রভাবে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে এখানে ১৬২৬ মিলিমিটার (৬৪ ইঞ্চি) পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে গড় তাপমাত্রা (জানুয়ারি) ১৯° সেলসিয়াস (৬৭° ফারেনহাইট) এবং গ্রীষ্মকালে গড় তাপমাত্রা (জুলাই) ২৯° সেলসিয়াস (৮৫° ফারেনহাইট) থাকে।

সুজ. ব.

www.pathagar.com

কলিকাতার পুরানো চৌরঙ্গী : ১৭৮৭, শিল্পী ড্যানিয়েলের আঁকা। নিচে : আধুনিক কলিকাতার স্কেচ

বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড

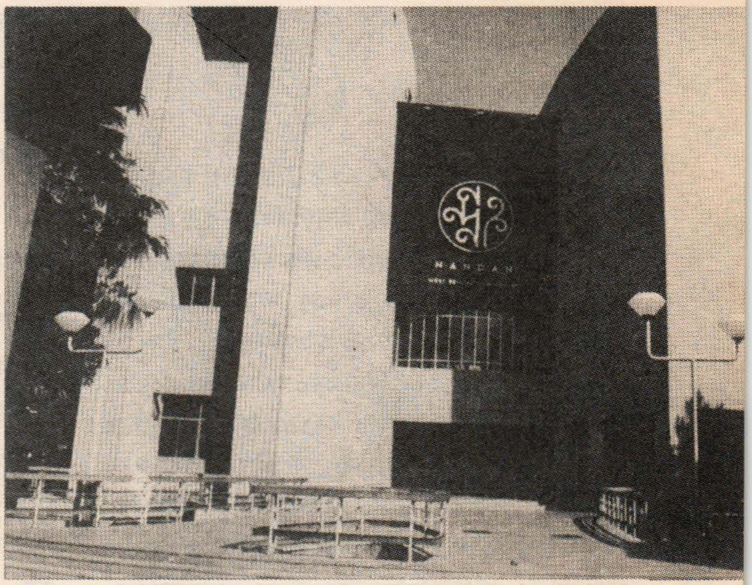

সাংস্কৃতিক সমাবেশের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র 'নন্দন'
যা গঠনসৌকর্যে মনোহারী

www.pathagar.com

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতের (দ্র) পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা নগরে অবস্থিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুরোধে ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনের পর থেকে সমগ্র উত্তর ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীন ছিল। পরে এক সময়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলো এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরে পশ্চিমবঙ্গে আরো বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা আরো সীমিত হয়ে যায়। এখানে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষাবিজ্ঞান, চারুকলা ও সঙ্গীত, আইন, চিকিৎসাবিদ্যা, কারিগরিবিদ্যা, পশুচিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের উন্নত মানের গবেষণাগার এবং কলা বিভাগের আশুতোষ মিউজিয়াম বিখ্যাত। এর অত্যন্ত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে শুধু বইই নয় বিপুলসংখ্যক বাংলা, সংস্কৃত, তিব্বতি, ফার্সি এবং আরবি ভাষার পাণ্ডুলিপিও রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতম ডিগ্রি ছাড়াও কিছু কিছু বিষয়ে ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়। ১লা জুন থেকে শিক্ষাবর্ষ আরম্ভ হয়। বিখ্যাত 'ক্যালকাটা রিভিউ' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই মাসিক প্রকাশনা।

মে. খা.

কলিযুগ

যুগ কালবাচক শব্দ বা হিসাব। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামে চারটি কল্পিত যুগে সমগ্র কালকে বিভক্ত করা হয়েছে। ঋগ্বেদে (দ্র) যুগ বলতে কোথাও এক বছর বা আরো কম সময় বোঝায়। অন্য মতে, ৫ বছর বোঝায়। অথর্ববেদে যুগের কাল-পরিমাণ অন্তত ১০ হাজার বছর।

কলিযুগ বলতে ১২০০ দিব্য বছর অর্থাৎ ১২০০× ৩৬০ = ৪,৩২,০০০ বছর বোঝায়। ৩১০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে কলিযুগ আরম্ভ হয়। বলা হয়েছিল যে এই যুগে অধর্ম সর্বত্র ছেয়ে যাবে, ধর্ম মাত্র এক-চতুর্থাংশ থাকবে। পৌরাণিক মতে, এই যুগের শেষে ভগবান বিষ্ণু (দ্র) কল্কি অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করে অধর্মের বিনাশ করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করবেন। তার পর আবার সত্যযুগের সূচনা হবে।

বি. ব.

কলেজ, প্রেসিডেন্সি হিন্দু কলেজ দ্র

কলেজ, ফোর্ট উইলিয়াম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ দ্র

কলেজ, হিন্দু হিন্দু কলেজ দ্র

কলেরা (cholera)

ভিব্রিও কলেরী *(Vibrio cholerae)* এবং এল্ টোর ভিব্রিও *(El Tor vibrio)* নামক জীবাণু (দ্র) দ্বারা সৃষ্ট পরিপাকনালীর সংক্রমণের ফলে কলেরা রোগ দেখা দেয়। কলেরার জীবাণুযুক্ত খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তারলাভ করে। বাংলায় এ অসুখকে ওলাউঠা বলে।

কলেরা রোগের প্রধান লক্ষণ বারবার পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া (দ্র) এবং এর সঙ্গে বমি। ফলে রোগীর শরীর থেকে দরকারি পানি (দ্র) ও খনিজ লবণ বেরিয়ে যায়। কলেরার ক্ষেত্রে গুরুতর ডায়রিয়ার সব উপসর্গ যথেষ্ট তীব্রতা নিয়ে প্রকাশ পায়। চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থার অভাবে রোগীর মৃত্যু ঘটে থাকে।

কলেরা রোগের চিকিৎসার প্রধান দিক রোগীর শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে পানি ও খনিজ লবণ সরবরাহ করা। এক্ষেত্রে খাওয়ার স্যালাইন কার্যকর নাও হতে পারে। তখন শিরাপথে রোগীকে কলেরা স্যালাইন দেওয়া জরুরি। জীবাণুসংক্রমণ দূর করার জন্য রোগীকে এণ্টিবায়োটিক (দ্র) জাতীয় ঔষধ সেবন করানো উচিত।

সি. না. হ.

কল্পনা দত্ত (যোশি) [১৯১৩—১৯৯৫]

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী ও রাজনীতিক। তিনি ১৯১৩ সালের ২৭শে জুলাই চট্টগ্রামের (দ্র) শ্রীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বিনোদবিহারী দত্ত ও মাতার নাম শোভনবালা দত্ত। পিতা সরকারি কর্মচারি ও পিতামহ খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তাঁদের প্রভাবে কল্পনা দত্ত শৈশবেই সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন।

কল্পনা দত্ত ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতার (দ্র) বেথুন কলেজে ভর্তি

www.pathagar.com

হন। সেখান থেকে আই. এসসি. ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। বেথুন কলেজে পড়ার সময় তিনি ছাত্রীসংঘে যোগদানের মধ্য দিয়ে সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদার (দ্র) তাঁকে চট্টগ্রামের বিপ্লবী গুপ্তসংঘের সদস্য করে নেন।

১৯৩১ সালে কল্পনা দত্তকে কলিকাতা থেকে বিস্ফোরক মালমশলা চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি তা সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হন। তিনি আদালতে ও জেলের মধ্যে ডিনামাইট (দ্র) রেখে দেওয়াল ভেঙে বিপ্লবীদের মুক্ত করার বিখ্যাত ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বাস্তবায়নের আগে পরিকল্পনাটি ফাঁস হয়ে গেলে তাঁর চলাফেরার ওপর পুলিশ বিধিনিষেধ আরোপ করে। তবু তিনি সূর্য সেন (দ্র)-সহ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে বিপ্লবী তৎপরতা অব্যাহত রাখেন।

১৯৩১ সালে সূর্য সেন কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা (দ্র)-কে চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব দেন। নির্দিষ্ট দিনের এক সপ্তাহ আগে পুরুষের পোশাক পরে ঐ এলাকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বের হলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। কিন্তু ক্লাব আক্রমণ পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত থাকার উপযুক্ত কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি সূর্য সেনের সঙ্গে গহিরা গ্রামে আত্মগোপনকালে পুলিশ সেখানে গভীর রাতে হামলা করলে কল্পনা দত্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু সূর্য সেন ধরা পড়েন। তখন কল্পনা দত্ত অন্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সূর্য সেনকে কারামুক্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। ১৯৩৩ সালের ১৩ই মে পুলিশ গহিরা গ্রামে অভিযান চালিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের পর অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে কল্পনা দত্তকে গ্রেফতার করে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দ্বিতীয় সাপ্লিমেণ্টারি মামলায় কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের (দ্র) আদেশ হয়। বিভিন্ন জেলে কারাভোগের পর তিনি ১৯৩৯ সালে মুক্তি পান। এর পর তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আবার আন্দোলন শুরু করেন। এ সময় তিনি চট্টগ্রামে কৃষক ও মহিলাদের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৪৩ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা পি. সি. যোশির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

ভারতের স্বাধীনতার পর কল্পনা দত্ত রাজনীতির চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তী কালে তিনি ভাষাতত্ত্ববিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

তিনি ১৯৯৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

কল্পবিজ্ঞান বিজ্ঞান কল্পকথা দ্র

কল্পস্বর্গ (Utopia)

সাহিত্যের জগতে ইউটোপিয়া (দ্র) বা কল্পস্বর্গ বলতে আমরা এক বিশেষ শ্রেণীর কথাসাহিত্য বুঝি। সেখানে একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সুখী শান্তিপূর্ণ জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়। এই ধরনের সাহিত্যকর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর (দ্র) 'রিপাবলিক'। পরবর্তী সময়ে স্যার টমাস মোর-এর 'ইউটোপিয়া' (১৫১৬), ফ্রান্সিস বেকন (দ্র)-এর 'নিউ অ্যাটলান্টিস' (১৬২৭), এডওয়ার্ড বেলামি-র 'লুকিং ব্যাকওয়ার্ড' (১৮৮৮), উইলিয়াম মরিস-এর 'নিউজ ফ্রমনোহোয়্যার' (১৮৯১) প্রভৃতি গ্রন্থ ইউটোপীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ ধরনের সব রচনাতেই আদর্শ স্থানটিকে কল্পনা করা হয়েছে সুদূর এক দেশে। সেখানে পৌঁছুবার জন্য কতিপয় সাহসী অভিযানকারী অনেক বিপদ ও ঝড়ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কল্পস্বর্গে তারা সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছে যায়। এই শ্রেণীর সাহিত্যকর্মে প্রায়ই নিছক স্বপ্নকল্পনা প্রশ্রয় পেয়েছে, তবে সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির মধ্য দিয়ে

www.pathagar.com

ভবিষ্যতে মানুষ যে নতুন সুখী জীবনে উত্তীর্ণ হবে তার বাস্তবসম্মত রূপরেখাও মাঝে মাঝে আঁকা হয়েছে।

ক. চৌ.

কল্যাণরাষ্ট্র

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর থেকেই 'কল্যাণরাষ্ট্র' (অর্থাৎ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র—The Welfare State) শব্দটির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। কথাটি প্রযোজ্য হয় সেই সব গণতান্ত্রিক সরকার বা রাষ্ট্রের বেলায়, যারা তাদের দেশের গোটা জনসংখ্যার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। এই ব্যবস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে বেকারত্ব, শারীরিক অক্ষমতা ও বৃদ্ধ বয়সের কারণে সৃষ্ট দুর্দশা লাঘব, আয় নির্বিশেষে সকলের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসাসুবিধা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবাব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

আধুনিক শিল্পোন্নত কোনো দেশে কৃষিখামারের অধিকারী পরিবারের সদস্যগণ নিজেদের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজেরা সরাসরি সংগ্রহ বা সেখান থেকে আয়ের ব্যবস্থা করতে পারলেও কারখানা-শ্রমিকদের পক্ষে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে বেকার হয়ে পড়লে তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশার শেষ থাকে না। নিম্ন আয়ের মানুষও অনেক সময় এ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এই সব অবস্থা বিচারে কল্যাণরাষ্ট্রের উপযোগিতা দিন দিনই বাড়ছে। স্ক্যাণ্ডেনেভীয় দেশগুলো— যথা নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক ইত্যাদি— এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিশ্বের বহু দেশই আজ এই ব্যবস্থার অনুসারী এবং এই ব্যবস্থায় পৌঁছাতে আগ্রহী।

আ. হ.

কল্লোল যুগ

'কল্লোল' পত্রিকা থেকে কল্লোল যুগ কথাটির উৎপত্তি। বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে আধুনিকতার পত্তন করেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫)। দীনেশরঞ্জন দাশের (১৮৮৮-১৯৪১) সহযোগিতায় ১৩৩০ সালে গোকুলচন্দ্র 'কল্লোল' পত্রিকা বের করেন। সাত বছর চলে এই পত্রিকাটি। এই পত্রিকাকে ঘিরে যে সময়টিতে সাহিত্যের আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের প্রকাশ ও বিকাশ, তা-ই 'কল্লোল যুগ' নামে পরিচিত।

'কল্লোল' অফিস ছিল ১০/২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতায়। পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু (দ্র), প্রেমেন্দ্র মিত্র (দ্র), নজরুল ইসলাম (দ্র), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্র), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। 'কল্লোল' দপ্তরে আড্ডা জমত খুব। আড্ডার সঙ্গে সাহিত্যচর্চা, রচনা ও প্রকাশ। 'কল্লোল যুগ' কথাটি অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল যুগ' নামে গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু সাহিত্যের সমালোচক বা ইতিহাসের কেউ এরকম কোনো যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বঙ্গসাহিত্যের পথিকৃৎ ইতিহাসলেখক অধ্যাপক সুকুমার সেনের (দ্র) গ্রন্থে 'কল্লোল'-এর উল্লেখ আছে, কিন্তু কল্লোল যুগের বা 'কল্লোল যুগ' বলে কোনো শব্দের উল্লেখ নেই।

আ. হা.

কশেরুকা মেরুদণ্ড দ্র

কসমিক রশ্মি (cosmic rays)

সৌরজগতের (দ্র) বাইরের নভোমণ্ডল থেকে ধনাত্মক আধান (দ্র) যুক্ত এক প্রকার উচ্চশক্তি ও ভেদনক্ষমতা-সম্পন্ন রশ্মি অবিরত পৃথিবীর (দ্র) বায়ুমণ্ডলে (দ্র) প্রবেশ করছে। এদের নাম কসমিক রশ্মি বা নভোরশ্মি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পদার্থবিজ্ঞানীরা লক্ষ করেন যে একটি চার্জযুক্ত বিদ্যুৎবীক্ষণ-যন্ত্র বাতাসে রেখে দিলে ধীরে ধীরে তার চার্জ কমে যায়। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, যন্ত্রটি উত্তমরূপে অন্তরিত করলেও একই ঘটনা ঘটে। বিদ্যুৎবীক্ষণ-যন্ত্র হল বৈদ্যুতিক চার্জের উপস্থিতি ও প্রকৃতি জানার যন্ত্র। চার্জযুক্ত পদার্থের উপস্থিতি জানার জন্য আরো একটি যন্ত্র গাইগার কাউন্টার। এই যন্ত্রটি বাতাসে রেখে দিলে কোনো চার্জ ছাড়াই ক্লিক ক্লিক শব্দ করে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নেন, বাতাসে চার্জ বা আধানযুক্ত কণিকা রয়েছে। কিন্তু কী এই কণিকা ? কোথায় এর উৎস ? পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হল, এই রশ্মি আসছে বহির্জগৎ বা

www.pathagar.com

নভোমণ্ডল থেকে। বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রান্ৎস্ হেস্ (Victor Franz Hess : ১৮৮৩–১৯৬৪) সর্বপ্রথম বলেন যে এই রশ্মি আসে নভোমণ্ডল থেকে। তিনি এর নাম দেন কসমিক রশ্মি। ১৯৩৬ সালে এই আবিষ্কারের জন্য তিনি পদার্থবিজ্ঞানে (দ্র) নোবেল পুরস্কার (দ্র) পান।

কসমিক রশ্মি বা নভোরশ্মি দুই প্রকার : প্রাথমিক বা মুখ্য এবং জাত বা গৌণ। যে নভোরশ্মি সরাসরি নভোমণ্ডল থেকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তা প্রাথমিক নভোরশ্মি। এগুলো প্রধানত ধনাত্মক চার্জযুক্ত হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস অর্থাৎ প্রোটন (দ্র) দ্বারা গঠিত। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এতে থাকে ৯০% প্রোটন, ৯% আলফাকণা (দ্র), বাকি ১% কার্বন (দ্র), নাইট্রোজেন (দ্র), অক্সিজেন (দ্র), লোহা (দ্র) ইত্যাদির নিউক্লিয়াস। উচ্চশক্তির প্রাথমিক নভোরশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেই অন্যান্য কণিকার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায়। ফলে বিভিন্ন ধরনের গৌণ কণিকার সৃষ্টি হয়। এসব কণিকা পজিট্রন, মেসন, হাইপারন ইত্যাদি দ্বারা গঠিত দ্বিতীয় প্রকার নভোরশ্মির সৃষ্টি করে। এই দ্বিতীয় প্রকার নভোরশ্মি হল জাত বা গৌণ নভোরশ্মি।

নভোরশ্মি অতি উচ্চ ভেদনক্ষমতা ও শক্তি-সম্পন্ন কণিকা। সমুদ্রের তলদেশে এবং খনিগর্ভেও এই রশ্মি প্রবেশ করে। তবে নিম্ন উচ্চতায় এর তীব্রতা কমে যায়। পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে এর তীব্রতা বিভিন্ন। নিরক্ষ অঞ্চলে এর তীব্রতা সবচেয়ে কম। এই রশ্মি বায়ুমণ্ডল দ্বারা শোষিত হয়।

স. রা.

কাউন্ট অব মন্টি ক্রিস্টো (The Count of Monte Cristo)

ফরাসি ঔপন্যাসিক আলেক্সান্দ্র্ দ্যুমা (দ্র) রচিত রোম্যান্স কাহিনী। ১৮৪৪ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। 'ল্য কঁৎ দ্য মঁৎ-ক্রিস্তো' (Le Comte de Monte-Cristo) নামের এই রোমাঞ্চকর উপন্যাস ইংরেজি অনুবাদের নামেই আমাদের দেশে পরিচিত। বাংলাতেও একাধিক অনুবাদ আছে, সেখানেও নাম রাখা হয় 'কাউন্ট অব মন্টি ক্রিস্টো'।

এ গল্প এদ্মঁ দঁত্যা নামের এক যুবককে নিয়ে। মের্সেদ্ নামের একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিল বেচারা। একটা জাহাজের (দ্র) ক্যাপ্টেন হওয়া এবং তার পরেই বিবাহ—এ সব যখন ঠিকঠাক হয়ে গেছে তখনই তার কিছু শত্রুর চক্রান্তে মিথ্যা রাজনৈতিক মামলায় তাকে বন্দি করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হল। শাতো দিফ্ নামে এক দুর্গে বন্দি অবস্থাতেই সে সিঁদ কেটে পালায়। ঐ কারাগারে তার এক পাগলাটে কয়েদি বন্ধু তাকে মঁৎ-ক্রিস্তো নামে এক দ্বীপে লুকনো ধন-সম্পদের ঠিকানা দেয়। এদ্মঁ দঁত্যা শেষ পর্যন্ত ঐ দ্বীপে গিয়ে ধনসম্পত্তি পেয়ে বিরাট ধনী হয়, রহস্যময় জীবনযাপন করে এবং তার শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ নেয়।

হা. মা.

কাওয়াবাতা ইয়াসুনারি [১৮৯৯—১৯৭২]

আধুনিক জাপানি সাহিত্যের প্রথম সারির কথাশিল্পী। ১৮৯৯ সালে ওসাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে টোকিওর (দ্র) রয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক হন। অবশ্য তার আগেই শুরু হয় তাঁর সাহিত্যজীবন।

ছোটগল্প (দ্র) সঙ্কলন 'করতলে গল্পসমগ্র' ও আত্মজীবনীমূলক গল্প 'ইজুর নর্তকী' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান। এর পর একে একে প্রকাশিত হয় তাঁর 'তুষারদেশ' ও 'সহস্র সারস' উপন্যাসসহ অন্যান্য রচনাকর্ম। সাহিত্যসমালোচক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতির অধিকারী। শিল্পী ও সাহিত্যিক সন্দীপ ঠাকুর তাঁর একাধিক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় (দ্র) অনুবাদ করেছেন।

১৯৬৮ সালে কাওয়াবাতা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের (দ্র) পর তিনিই দ্বিতীয় এশীয়, যিনি এই গৌরব অর্জনের অধিকারী।

১৯৭২ সালে আত্মহত্যা করে তিনি নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।

আ. হু.

www.pathagar.com

কাঁকড়া (crab)

কাঁকড়া চিংড়ির সমগ্রোত্রীয় অমেরুদণ্ডী (দ্র) প্রাণী। পৃথিবীর (দ্র) সর্বত্র আছে। লোনা ও মিঠা পানি (দ্র)-তে এবং স্থলে বাস করে। কোনো কোনো প্রজাতি কয়েক কিলোমিটার লম্বা গর্ত করতে সক্ষম। বিশ্বে এর প্রজাতিসংখ্যা প্রায় ৪,৫০০ হলেও বাংলাদেশে (দ্র) আছে ১৫টি। বড় প্রজাতিগুলোর মাংস খেতে সুস্বাদু।

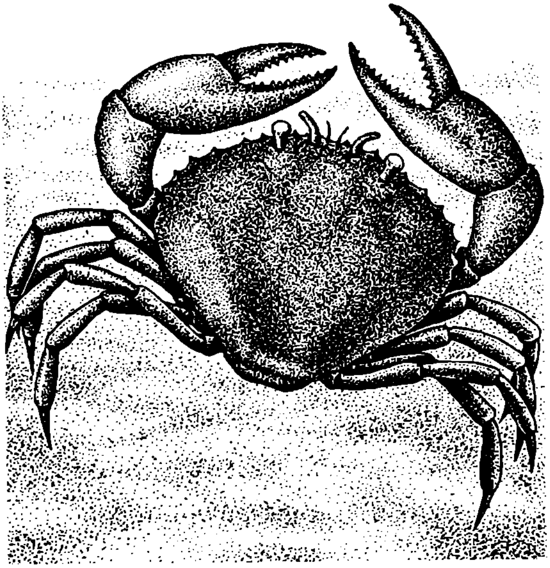

কাঁকড়ার দেহ শক্ত খোলসে আবৃত। এর নখরযুক্ত পাঁচ জোড়া পা আছে। প্রথম জোড়া দাঁড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। এর অগ্রভাগে চিমটা থাকে, যা খাদ্য বা অন্য কিছু ধরতে কাজে লাগে। পুরুষ-ফিডলার কাঁকড়ার বাম বা ডান দাঁড়া পুরো শরীর থেকেও বড়। মটর কাঁকড়া ক্ষুদ্রতম প্রজাতি। স্ত্রী-মটর কাঁকড়া ঝিনুকের খোলসের ভেতরে বাস করে। আলাস্কার রাজ-কাঁকড়ার ওজন ৫.৪ কেজি পর্যন্ত হয়।

প্রজাতিভেদে এদের নখর, পা ও শরীরের গঠন, আকৃতি ও বর্ণে পার্থক্য থাকে। খোলস মসৃণ, অমসৃণ বা কণ্টকময় হতে দেখা যায়। কোনো কোনো প্রজাতি সাঁতারে দক্ষ। কোনো কোনোটি ভাল দৌড়ায়।

কাঁকড়া ছোট ছোট মাছ, সামুদ্রিক ক্রিমি, শামুক, ঝিনুক (দ্র), কীটপতঙ্গ (দ্র), নদী-নালা-সমুদ্রের পচা আবর্জনা খায়। অনেকেই সর্বভুক।

স্ত্রী-কাঁকড়া ডিম পেড়ে তা উদরের পায়ের সঙ্গে আটকে রাখে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে তৎক্ষণাৎ সাঁতরাতে পারে। এটি খোলস বদলে বদলে বেশ কয়েকটি পর্যায় পেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ কাঁকড়ায় পরিণত হয়। রাজ-কাঁকড়া ২০ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

কাঁঠাল

কাঁঠাল বাংলাদেশের (দ্র) জাতীয় ফল। এই ফলের গায়ে কাঁটা আছে। মূলত 'কণ্টকফল' শব্দ থেকেই কাঁঠাল কথাটি এসেছে। কাঁঠালের কোয়া আমাদের প্রিয় খাদ্য। এর বিচিও একটি উপাদেয় সবজি। কাঁঠালের বাকল গরু-মহিষের প্রিয় খাদ্য।

কাঁঠাল গাছের কাঠ বেশ শক্ত, আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কাঁঠাল গাছ বেশ বড় ও ঝাঁকড়া হয় এবং দীর্ঘদিন বাঁচে। কাঁঠাল পাতা বড় বড় এবং প্রায় গোলাকার। পাতা ঘন বলে গাছের ছায়াও বেশ ঘন হয়।

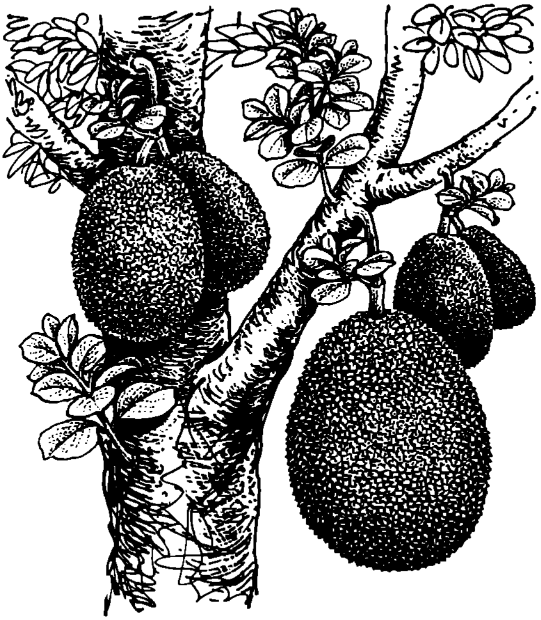

www.pathagar.com

কাঁঠাল গাছে শীতকালে ফুল বা মুচি আসে। মুচি বেশ সুগন্ধ। একটি মুচি আসলে বহু ফুলের সমষ্টি। তেমনি একটি কাঁঠালও বহু ফলের সমষ্টি। গ্রীষ্মকালে কাঁঠাল পাকে। সাধারণত গাছের কাণ্ড ও শাখায় এ ফল ধরে। অনেক সময় গাছের মূলেও ফল ধরতে দেখা যায়।

কাঁঠাল গাছ বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কমবেশি দেখা যায়। তবে বৃহত্তর সিলেট (দ্র), কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, যশোর ও ঢাকা (দ্র) অঞ্চলে এটি একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল।

কাঁঠাল গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *আর্টোকার্পাস ইনটেগ্রা (Artocarpus integra)*। ইংরেজি নাম জ্যাক ট্রি (jack tree)

ফ. মা.

কাঁদানে গ্যাস টিয়ার গ্যাস দ্র

কাক

কাক আমাদের অতি পরিচিত পাখি। এর কা কা শব্দ অনেকের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর। কাক অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পাখি। লোকালয়ের আশেপাশে বসবাস করে। গায়ের রঙ কালো, ঠোঁট লম্বা ও বেশ শক্ত। সাধারণত আলাদাভাবে ঘুরে বেড়ালেও এরা দলবদ্ধ হতে পারে, বিশেষ করে বিপদে পড়লে বা শত্রুর মোকাবেলা করতে হলে এরা বেশ দলবদ্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশে (দ্র) সাধারণত দু' ধরনের কাক দেখা যায়— দাঁড়কাক ও পাতিকাক। দাঁড়কাকের বৈজ্ঞানিক নাম *Corvus macrorhyncos*। এদেরকে লোকালয় ছাড়াও বনে-জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায়। খাবার স্বভাব পাতিকাকের মতোই, তবে অনেক সময় ছোট ছোট জীবিত প্রাণী, মুরগির বাচ্চা, এমনকি কাঁকড়া পর্যন্ত খেতে দেখা যায়। এরা বাসা বানায় গাছের অপেক্ষাকৃত ওপরে বা মগডালে।

পাতিকাকের বৈজ্ঞানিক নাম *Corvus splendensl*। এরা মূলত শহরে বা লোকালয়ে থাকে। এদের গায়ের রঙ কালো হলেও মাথার পিছন থেকে ঘাড় হয়ে বুক পর্যন্ত অংশটি ছাই রঙের। এরা সাধারণত মানুষের ফেলে দেওয়া খাবার, মরা প্রাণী ইত্যাদি খেয়ে থাকে। এজন্য এদেরকে প্রকৃতির ধাঙ্গড়ও বলা হয়। এরা আকারে দাঁড়কাকের চেয়ে কিছুটা ছোট। এরা বট-পাকুড়, রেণ্ডি, কড়ই বা অপেক্ষাকৃত

বড় গাছে বাসা বানায়। একটি বড় গাছে এদের শতাধিক বাসাও থাকতে পারে। অনেক সময় এরা দালানের কার্ণিশে বাসা বানায়। এক মৌসুমে একটি স্ত্রী-কাক ৪-৫টি ডিম দিয়ে থাকে।

ফ. মা.

কাকাতুয়া (cockatoo)

কাকাতুয়া তোতা পরিবারের বৃহত্তর পাখি। প্রত্যেকেরই মাথায় ঝুঁটি থাকে। অস্ট্রেলিয়া (দ্র), ইন্দোনেশিয়া (দ্র) ও আশেপাশের দ্বীপাঞ্চলে এরা বাস করে। প্রজাতির সংখ্যা ১৭।

প্রজাতিভেদে ৩৫-৮০ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। এদের ঠোঁট ছোট, অত্যন্ত শক্তিশালী। ওপরের ঠোঁট নিচের দিকে বাঁকানো, নিচেরটি সোজা। জিহ্বা পুরু। সুপারির শক্ত খোসা ছাড়াতে ও মোটা তার কাটতে এদের ঠোঁটের জুড়ি নেই। গাছের শাখা, খাঁচার তারে পা আটকিয়ে নিচের দিকে ঝুলে থাকে।

www.pathagar.com

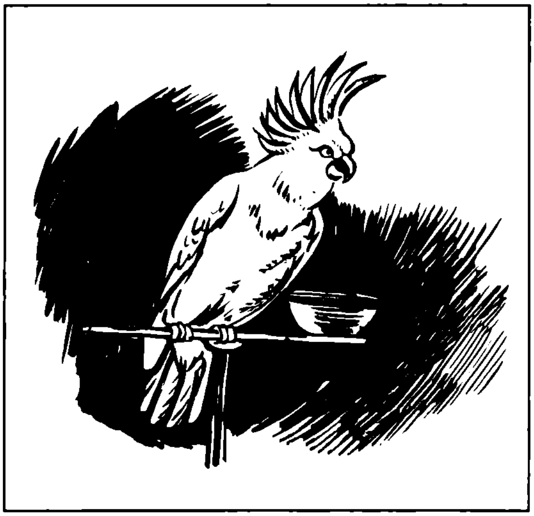

বেশির ভাগ প্রজাতিই সাদা। তবে তাতে লাল, গোলাপি, হলদের ছোঁয়া থাকে। কোনো কোনোটা কালো বা নীল হয়। গোলাপিগুলো সুন্দরতম।

এরা শস্যদানা, সুপারি, ফল ইত্যাদি খায়। ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ করে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে।

এরা গাছে গর্ত করে বা পরিত্যক্ত গর্তে বাস করে। অনেক সময় অন্যদের হটিয়ে গর্তের দখল নেয়। প্রজাতিভেদে স্ত্রী-কাকাতুয়া দু' থেকে পাঁচটি সাদাটে ডিম পাড়ে। তাতে ছাই ও বাদামি ছিট থাকতে পারে। গড়ে ৩০ দিন তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়।

এরা পোষা পাখি হিসাবে জনপ্রিয়। চড়া দামে বিক্রি হয়। কথা নকল করতে তেমন পটু নয়। কোনো কোনোটা পঞ্চাশ বছরও বেঁচে থাকে।

আ. ন. ম. আ. র.

কাগজ

লিপি ও বর্ণমালা আবিষ্কারের পরই কিসের উপর লিখবে এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল মানুষ। গাছের পাতা, বাকল, চামড়া, পাথর, মাটি (দ্র) ইত্যাদির উপর শুরু হল মানুষের প্রথম লেখা। মিশরের নীল নদের তীরে জন্মাত প্যাপিরাস (দ্র) গাছ। এটি নল-খাগড়া জাতীয় গাছ। একে পাতলা ফালি করে পরপর সাজিয়ে পানিতে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিলে জোড়া লেগে পাতলা চাদর বা পাতের মতো হত। লেখার জন্য ব্যবহৃত হত এসব পাত। তারপর গুটিয়ে রাখা হত। প্যাপিরাস গাছ থেকে উৎপন্ন বলে একে বলা হয় পেপার (paper)। পেপারের চৈনিক প্রতিশব্দ 'কায়গদ' ও আরবি প্রতিশব্দ 'কাগজ'।

আজ থেকে প্রায় দু' হাজার বছর আগে চীন (দ্র) দেশে প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয়। পুরাতন ছেঁড়া কাঁথা, কম্বল, কাপড় পচিয়ে চুন (দ্র), আঠা মিশিয়ে হাতে তৈরি এসব কাগজ ছিল নরম এবং তুলোট। প্রায় দু' হাজার বছর ধরে সারা পৃথিবীতে (দ্র) এই পদ্ধতিতেই কাগজ তৈরি হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসি বিজ্ঞানী নিকোলা লুই রবের (Nicolas Louis Robert : ১৭৬১-১৮২৮) কাগজ তৈরির মেশিন আবিষ্কার করেন। এটি ছিল খুব সাধারণ যন্ত্র। ইদানীং এই যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ফলে প্রচুর পরিমাণে এবং বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

কাগজ তৈরির প্রধান উপাদান —১. বাঁশ, নরম কাঠ, ঘাস, আখের ছোবড়া, ছেঁড়া পরিত্যক্ত কাগজ, চট, পাট ইত্যাদি; ২. কস্টিক সোডা (NaOH); এবং ৩. ব্লিচিং দ্রব্য।

যান্ত্রিক উপায়ে মূল উপাদানগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে ডাইজেস্টারে সিদ্ধ করে দলিত-মথিত করে এক ধরনের নরম মণ্ড তৈরি করা হয়; একে বলে পাল্প (pulp)। পাল্পকে ব্লিচিং মিশিয়ে ধৌত করে সাদা করা হয়। পাল্পকে পুনরায় পানিতে মিশিয়ে অর্ধতরল করে বৃহৎ রোলারযুক্ত যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চালিত করলে পাতলা কাগজের শিট তৈরি হয়। এবং তা একটি রীলে জড়ানো হয়। পাল্পকে প্রয়োজনীয় রঙ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বিভিন্ন বর্ণের ও ধরনের কাগজ তৈরি হয়।

আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় কাগজের কল কর্ণফুলি (দ্র) নদীর তীরে চন্দ্রঘোনায় অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে উৎপন্ন বাঁশ থেকে এখানে কাগজ তৈরি হয়। পাবনার পাকশিতে আখের ছোবড়া থেকে কাগজ তৈরি হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চিনিকল থেকে এসব ছোবড়া সংগৃহীত হয়। সুন্দরবনের গেওয়া প্রভৃতি নরম কাঠ থেকে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে কাগজ তৈরি হয়। এই তিনটি কাগজকল ছাড়া বাংলাদেশে (দ্র) সিলেটে (দ্র) একটি পাল্প তৈরির কারখানা আছে।

স. রা.

www.pathagar.com

কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন

১৯৫৭ সালের ৯ই এবং ১০ই ফেব্রুয়ারি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (দ্র) আহ্বান ও নেতৃত্বে টাঙ্গাইলের কাগমারিতে যে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তা কাগমারি সম্মেলন নামে বিশেষ পরিচিতি অর্জন করে। তৎকালীন আওয়ামী লীগ (দ্র) সভাপতি মওলানা ভাসানী দলের কাউন্সিল অধিবেশনকে উপলক্ষ করে এই সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কাউন্সিল অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি (দ্র), প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান (দ্র)-সহ সকল শীর্ষস্থানীয় দলীয় নেতারা যোগ দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক অধিবেশনে জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি ও পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে দলের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য প্রকট হয়ে পড়ে। তবে কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন অভূতপূর্বভাবে বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরে বিশিষ্ট হয়ে আছে।

১৯৫৬ সালের শেষ দিকে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য যে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়, তার আহ্বায়ক ছিলেন লেখক-সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীন (দ্র)। কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন কাজী মোহাম্মদ ইদরিস (দ্র), খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, খায়রুল কবীর, ফকীর শাহাবুদ্দীন আহমদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান ও সদ্‌রী ইস্পাহানী। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক নাম 'পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' হলেও প্রকৃতপক্ষে এই সম্মেলন ছিল বাঙালি সংস্কৃতির বিশিষ্ট জাতীয় রূপ এবং আন্তর্জাতিক ভাবধারার মিলিত রূপের প্রতিফলন।

কাগমারি সম্মেলনে আমেরিকা (দ্র), ব্রিটেন, কানাডা, মিশর থেকে অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডেভিড গার্থ, এফ. এইচ. কসন, ডক্টর চার্লস্ এডাম্‌স্, ডক্টর হাসান হারাশি, হুমায়ুন কবির (দ্র), প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্র), কাজী আবদুল ওদুদ (দ্র) ও সোফিয়া ওয়াদিয়া প্রমুখ। সম্মেলন উপলক্ষে টাঙ্গাইল শহর ও সভাস্থল অপূর্ব সাজে সজ্জিত করা হয়েছিল। বিভিন্ন খ্যাতিমান ব্যক্তির নামে নির্মিত

কাগমারি সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি (ডানে), শেখ মুজিবুর রহমান (বামে) এবং ভাসানীর ঠিক পেছনে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

হয়েছিল পঞ্চাশটিরও বেশি তোরণ। এই সব ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন জামালউদ্দিন আফগানী, তিতুমীর (দ্র), স্যার সৈয়দ আহমদ (দ্র), মওলানা শওকত আলী (দ্র), মওলানা মোহাম্মদ আলী (দ্র), মুহম্মদ আলী জিন্নাহ (দ্র), জর্জ ওয়াশিংটন (দ্র), লেনিন (দ্র), গান্ধী (দ্র), শেক্সপীয়র (দ্র), রবীন্দ্রনাথ (দ্র), চিত্তরঞ্জন দাশ (দ্র), সুভাষচন্দ্র বসু (দ্র), আবুল কালাম আজাদ (দ্র) প্রমুখ।

সম্মেলন উপলক্ষে বাংলার চারু ও কারুশিল্পের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকগায়ক আব্বাসউদ্দিন (দ্র), কবিয়াল রমেশ শীল (দ্র), জারী গানের সম্রাট তসের আলী প্রমুখ শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া চট্টগ্রামের দলের নবজীবনের গান, রংপুরের ভাওয়াইয়া (দ্র), ফরিদপুরের কাঞ্চনযাত্রা ও পদ্মাপারের ঢালার চরের মজিব সরদারের দলগত লাঠিখেলা দর্শকদের বিপুল প্রশংসা অর্জন করে। প্রখ্যাত ভারতীয় নৃত্যশিল্পী ম্যাডাম আজুরিও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

কাগমারি সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায়

www.pathagar.com

নানা ধরনের বিরূপ মন্তব্য করা হয়। বাঙালির জাতীয় অধিকারের বিরোধী মহল থেকেই মূলত এই সব অপপ্রচার চালানো হয়। কিন্তু বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে আয়োজিত অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক সমাবেশ হিসাবে কাগমারি সম্মেলন ইতিহাসে অনন্য হয়ে রয়েছে।

ম. হ.

কাঙ্গাল হরিনাথ [১৮৩৩—১৮৯৬]

জন্ম ১৮৩৩ সালের কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে। আসল নাম হরিনাথ মজুমদার। ছেলেবেলায় কৃষ্ণনাথ মজুমদারের ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হলেও অর্থাভাবে বেশি লেখাপড়া করতে পারেন নি।

কাঙ্গাল হরিনাথ ১৮৫৫ সালে নিজগ্রামে ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা ও অনেক দিন ঐ বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষকতা করেন। এর পর তিনি পেশা হিসাবে বেছে নেন সাংবাদিকতাকে। ১৮৬০ সালের দিকে এক জন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে 'সংবাদ প্রভাকর' নামের পত্রিকাতেই তিনি লিখতেন। ব্রিটিশ নীলকর এবং ঠাকুর-পরিবারের জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেন। ১৮৬০ সালের এপ্রিলে কাঙ্গাল নিজেই একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটির নাম 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'। এতে প্রতিবাদমূলক নানা রকম নিবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশ করে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। উল্লেখ্য, এ সময় রবীন্দ্রনাথের (দ্র) পিতার তত্ত্বাবধানে তাঁদের কুষ্টিয়ার জমিদারি পরিচালিত হত। রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন সেই জমিদারি দেখাশোনার ভার পেলেন, তখন কাঙ্গাল হরিনাথের সঙ্গে কবির সমঝোতা স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং হরিনাথ মজুমদারও জমিদারদের বিরুদ্ধে লেখা বন্ধ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ নীলকরদের বিরুদ্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ ছিলেন আপসহীন।

'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, ছড়া এবং কুসীদজীবী আর নীলকর সাহেবদের শোষণ-নিপীড়নের বিবরণ প্রকাশিত হত। ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা দেশী জমিদারদের হুমকি তাঁকে তাঁর দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখতে পারে নি। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র আত্মপ্রকাশ ঘটে মাসিকপত্র হিসাবে। ১২৭১ সনের আষাঢ় থেকে এটি পাক্ষিক হিসাবে ছাপা হতে থাকে। ১২৭৮ সনের বৈশাখ থেকে পত্রিকাটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। প্রথম দিকে অবশ্য 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' ছাপা হত কলিকাতার (দ্র) গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস থেকে। ১৮৬৪ সালে কুমারখালিতে মথুরানাথ যন্ত্র স্থাপিত হলে পত্রিকাটি সেখানেই মুদ্রিত হতে শুরু করে। এই ছাপাখানাটি কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারকে ১৮৭৩ সালে উপহার দিয়েছিলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র (দ্র) পিতা মথুরানাথ মৈত্রেয়। সেই সেকেলে মুদ্রণযন্ত্রটি কুমারখালিতে আজো অক্ষত অবস্থায় রয়ে গেছে। উল্লেখ্য, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় শৈশবে হরিনাথ মজুমদারের ভার্নাকুলার স্কুলে পড়াশোনা করেন। 'বিষাদ-সিন্ধু' (দ্র)-র রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেনের (দ্র) লেখার হাতেখড়ি 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য়। হিমালয় ভ্রমণকাহিনীখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক জলধর সেনের সাহিত্যচর্চাও শুরু হয় এই পত্রিকাতেই।

১৮ বছর সাংবাদিকতার পর হরিনাথ মজুমদার একটি বাউলের দল গঠন করেন। তিনি গানও লিখতেন। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা আঠারো। এর মধ্যে 'বিজয়-বসন্ত', 'চারুচরিত্র', 'কবিতা কৌমুদী' ও 'কাঙাল ফিকির চাঁদ ফকিরের গীতাবলী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয় 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী'। আজীবন তিনি শিক্ষাবিস্তার ও সব রকম শোষণমুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। ১৮৯৬ সালের ১৬ই এপ্রিল তিনি লোকান্তরিত হন।

আ. কা.

কাচ

কাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণসামগ্রী। এর মধ্য দিয়ে আলো যেতে পারে। তা আবহাওয়া বা রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এসব গুণের জন্য কাচ জানালা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কাচকে বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে পাত্রাদি তৈরি করা যায়। কাচের গায়ে বিভিন্ন ধরনের নকশা এবং ডিজাইন করা যায়। কাচের আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হল লেন্স (দ্র)

www.pathagar.com

তৈরিতে। চশমা (দ্র), দূরবীক্ষণ (দ্র), অণুবীক্ষণ (দ্র), ক্যামেরা (দ্র) ইত্যাদি আলোকযন্ত্র তৈরিতে লেন্স অপরিহার্য।

বিশেষ ধরনের বালি (SiO_2), চুনাপাথর ($CaCO_3$) ও সোডা অ্যাশ (Na_2CO_3) থেকে সাধারণ কাচ তৈরি হয়। একটি বিশেষ ধরনের চুল্লির মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে উপাদানগুলি মিশিয়ে উত্তপ্ত করা হয়। উচ্চতাপে (প্রায় ১৬০০ সে.) উপাদানগুলি গলিয়ে গলিত কাচ তৈরি হয়। গলিত কাচ দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে লম্বা শিট অথবা বোতল, গ্লাস ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এই কাচ সামান্য আঘাতেই ভেঙে যায়। মূল উপাদানের মধ্যে অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে একে অত্যন্ত শক্ত, এমনকি তাপরোধী পর্যন্ত করা যায়। গলিত অবস্থায় কাচের মধ্যে রঙের উপাদান মিশিয়ে কাচকে রঙিন করা হয়। পটাসিয়াম (দ্র) এবং বেরিয়ামযুক্ত কাচকে বলে 'ক্রাউন গ্লাস'। ক্যালসিয়াম সিলিকেট-এর পরিবর্তে লেড সিলিকেট ব্যবহার করে তৈরি হয় 'ফ্লিন্টগ্লাস', বোরন অক্সাইড এবং অতিরিক্ত সিলিকেট দিয়ে 'পাইরেক্স গ্লাস' প্রস্তুত হয়। ক্রাউন গ্লাস বেশ শক্ত এবং তাপ সহ্য করতে পারে। এই কাচ দিয়ে ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত বিকার, বোতল, ফ্লাস্ক তৈরি হয়। ফ্লিন্টগ্লাস উজ্জ্বল এবং এর প্রতিসরাঙ্ক বেশি; আলোকযন্ত্র, লেন্স প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। পাইরেক্স গ্লাস অধিকতর তাপ ও ঘাতসহ। পাইরেক্স থেকেও শক্ত কাচের নাম ভাইকার গ্লাস।

সমতল বা বক্রতল কাচের এক পিঠে অস্বচ্ছ পদার্থের প্রলেপ লাগিয়ে আয়না বা দর্পণ তৈরি হয়। কাচকে মানুষের চুলের মতো সূক্ষ্ম আঁশ বা তন্তুতে পরিণত করা যায়। এসব তন্তু দিয়ে তৈরি পদার্থকে বলে ফাইবার গ্লাস। এই তন্তু দিয়ে কাপড় বোনা যায়, এসব কাপড় অগ্নিনিরোধক হয়। প্লাস্টিকের সঙ্গে ফাইবার গ্লাস মিশিয়ে খুব শক্ত শিট তৈরি হয়। এ দিয়ে গাড়ির বডি, নৌকার খোল, সুটকেস, হাতব্যাগ তৈরি হয়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাচের তন্তু দিয়ে তৈরি হয় 'গ্লাসউল'। গ্লাসউল ক্ষতিকারক তরল বিশোষণ করে এবং তাপনিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দুই শিট কাচের মধ্যে স্বচ্ছ প্লাস্টিকশিট বসিয়ে তাপ ও চাপ প্রয়োগে এক ধরনের কাচ শিট তৈরি হয়। একে বলে স্তরিত কাচ বা 'ল্যামিনেটেড গ্লাস'। এই কাচ বুলেটপ্রুফ হয়।

স. রা.

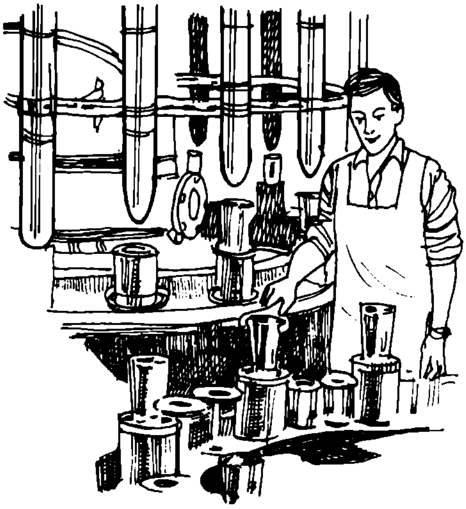

কাচ তৈরির বিভিন্ন পর্যায়

www.pathagar.com

কাছিম (turtle)

কোনটা কাছিম আর কোনটা কচ্ছপ বা কাউট্টা এই নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝি আছে। সাধারণভাবে এদের যেসব প্রজাতি পানি (দ্র)-তে থাকে এবং নরম খোলসবিশিষ্ট সেগুলোকে বলে কাছিম, যেগুলো পানিতে থাকে এবং শক্ত খোলসবিশিষ্ট সেগুলোকে বলে কাউট্টা আর যেগুলোর খোলস শক্ত এবং ডাঙ্গায় থাকে সেগুলোকে বলে কচ্ছপ। এ ছাড়া যেসব প্রজাতি সমুদ্রে বাস করে সেগুলোকে বলে সামুদ্রিক কাছিম। সরীসৃপ (দ্র) শ্রেণীর এই চার ধরনের কাছিমের সবগুলো প্রজাতি মিলে হচ্ছে কিলোনিয়া (Chelonia) বর্গ বা কাছিম বর্গ।

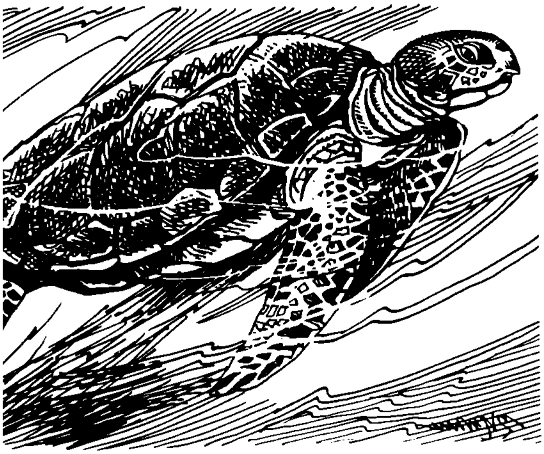

কাছিম বর্গের সকল প্রাণীর দেহ গোলাকার। এদের পিঠের শক্ত খোলস বা বর্ম ওপর দিকে বাঁকানো বা উত্তল। বুক বা নিচের দিকে থাকে অপেক্ষাকৃত নরম আবরণী। অনেকটা চ্যাপ্টা বা থালার মতো এদের সামনে ও পেছনে রয়েছে এক জোড়া করে পা। এই পায়ের সাহায্যে এরা হাঁটতে ও সাঁতার কাটতে পারে। এদের ঘাড় লম্বা। মুখে দাঁত নেই। তবে শক্ত চোয়ালের সাহায্যে যথেষ্ট কঠিন খাবারও ভেঙে খেতে পারে। জীবিত, মৃত বহু কিছুই এরা খেয়ে থাকে। তবে কীটপতঙ্গ (দ্র), ছোট মাছ ও জলজ উদ্ভিদই এদের প্রধান খাদ্য। ভয় পেলে এরা ঘাড়, মাথা, হাত বা লেজ সব খোলসের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে।

বাংলাদেশে (দ্র) কিলোনিয়া বা কাছিম বর্গের ৫টি গোত্রের মোট ২৫ প্রজাতির কাছিম আছে বলে মনে করা হয়। কাছিম জলে বাস করলেও ডিম পাড়ে ডাঙ্গায়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে সহজাত কারণেই বাচ্চারা জলে চলে যায়।

ফ. মা.

কাজ

সাধারণ অর্থে কোনো কিছু করা বা কোনো দায়িত্ব সম্পাদনের প্রচেষ্টাকেই কাজ বলে। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় কাজের সংজ্ঞা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। তা হল বল (দ্র) এবং বলের দিকে বস্তুর সরণ (অতিক্রান্ত দূরত্ব)-এর গুণফল। অর্থাৎ, কাজ = বল × বলের দিকে বস্তুর সরণ। বস্তুর সরণ যদি প্রযুক্ত বলের দিকে না হয়ে θ কোণে বিচ্যুত হয় তা হলে,

কাজ = বল × বলের দিকে সরণের বিশিষ্টাংশ

অর্থাৎ কাজ = বল × সরণ × $\cos\theta$.

প্রায়োগিক অর্থে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো বস্তু উত্তোলন করবে, টেনে বা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে, তখন 'কাজ' হবে। কিন্তু কোনো বস্তু ধরে দাঁড়িয়ে থাকা অথবা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা কোনোটাই কাজ নয়।

মই বেয়ে কোনো লোক উপরে উঠলে কাজ হয়। সম্পাদিত কাজের পরিমাণ হবে লোকটির ওজন এবং যতটুকু উচ্চতা উঠেছে তার গুণফল। এভাবে মই বেয়ে উঠলে কাজ হয় এবং অভিকর্ষজ বলের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জিত হয়। ঐ ব্যক্তি মই থেকে লাফিয়ে পড়লে অর্জিত স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

কাজের একক জুল (দ্র)। এক নিউটন (দ্র) বলের দ্বারা বস্তুর এক মিটার সরণ ঘটলে ঐ বলকে এক জুল বলে। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে কাজের একক ফুট পাউণ্ডাল। ১ ফুট পাউণ্ডাল = ১.৩৫৬ জুল।

স. রা.

কাজী আবদুল ওদুদ [১৮৯৪—১৯৭০]

যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল লেখক ও অভিধান প্রণেতা। তিনি ১৮৯৪ সালের ২৬শে এপ্রিল ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম

www.pathagar.com

সগীরুদ্দিন।

কাজী আবদুল ওদুদ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৩ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাশ করে তিনি কলিকাতায় (দ্র) যান। ১৯১৭ সালে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে বি. এ. এবং ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ করেন।

শিক্ষাজীবন শেষে আবদুল ওদুদ শিক্ষকতাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। এ সময় তিনি আবুল হুসেন, আবদুল কাদির (দ্র), আবুল ফজল (দ্র), কাজী মোতাহার হোসেন (দ্র) প্রমুখ শিক্ষাবিদ–বুদ্ধিজীবীর সংস্পর্শে আসেন। মুক্তবুদ্ধি চর্চার উদ্দেশে তাঁরা ১৯২৬ সালে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। নব্য শিক্ষিত প্রগতিশীল তরুণদের নিয়ে নিয়মিত সাহিত্য সমাবেশ অনুষ্ঠান করা ও পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই সংগঠনের কাজ শুরু হয়। আবদুল ওদুদ ছিলেন এই সংগঠনের প্রাণপুরুষ।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র কর্মকাণ্ড অচিরেই সুধীমহলে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন (দ্র) রূপে পরিচিতি লাভ করে। আবদুল ওদুদ এই আন্দোলনের এক জন প্রধান সংগঠক হয়ে ওঠেন। 'মুসলিম সাহিত-সমাজে'র মুখপত্র 'শিখা'য় তাঁর মুক্ত চিন্তা ও যুক্তিনির্ভর রচনাবলি প্রকাশিত হতে থাকলে তিনি ঢাকার প্রতিক্রিয়াশীল মহলের রোষানলে পড়েন। এই মহলের চাপে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র কার্যক্রম এক সময় বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে আবদুল ওদুদও ঢাকা ছেড়ে কলিকাতা চলে যান।

কাজী আবদুল ওদুদ কলিকাতায় বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগে টেক্সট বুক বোর্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হন। দেশবিভাগের পর তিনি স্থায়ীভাবে কলিকাতায় থেকে যান। ১৯৫১ সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি সার্বক্ষণিক সমাজচিন্তা ও সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

কাজী আবদুল ওদুদ ২৫টিরও বেশিগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— 'নদীবক্ষে' (উপন্যাস : ১৯১৮), 'মীর পরিবার' (গল্প : ১৯১৮), 'কবিগুরু গ্যেটে' (গবেষণাগ্রন্থ: দুই খণ্ড), 'Modernism of Poet Tagore', 'Creative Bengal', 'সমাজ ও সাহিত্য' (১৯৩৪), 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধ' (১৯৩৬), 'শাশ্বত বঙ্গ' (১৯৫১), 'বাংলার জাগরণ' (১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত বক্তৃতাবলি), 'শরৎচন্দ্র ও তারপর' (১৯৫৭ সালে শরৎচন্দ্রের ওপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা)। দুই খণ্ডে 'কোরান' অনুবাদ করেন এবং 'হজরত মোহাম্মদের জীবনী'গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেন। তাঁর সমগ্র রচনাকর্মে অসাম্প্রদায়িক উদার মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি শাস্ত্রবচনের অন্ধ অনুকরণের বিরোধী ছিলেন।

তাঁর জীবনের অন্যতম উজ্জ্বল কীর্তি হল প্রায় ৬৪ হাজার ভুক্তিবিশিষ্ট 'ব্যবহারিক শব্দকোষ'। এই অভিধানের বিশেষত্ব হল, এতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরবি, ফার্সি ও তুর্কি শব্দগুলোর প্রতিবর্ণীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি বাংলার মুসলমান সমাজে এবং পূর্ব- বঙ্গীয় বাঙালি জীবনে প্রচলিত শব্দ ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অভিধানে কাজী আবদুল ওদুদের গভীর প্রজ্ঞা ও অনন্য মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি ১৯৭০ সালের ১৯শে মে মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯—১৯৭৬]

বিদ্রোহী কবি হিসাবে পরিচিত কাজী নজরুল ইসলাম একাধারে সাংবাদিক, গীতিকার, গায়ক ও ঔপন্যাসিক ছিলেন।

১৮৯৯ সালের ২৪শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) তিনি বর্ধমান জেলার আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কাজী আমিনউল্লাহর পুত্র কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয়া পত্নী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান।

কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম ছিল দুখু মিঞা। শৈশবে তিনি পিতৃহারা হয়েছিলেন। দুঃখ, দারিদ্র্য ও অযত্নে মানুষ হলেও তাঁর প্রাণশক্তি ও প্রতিভা ছিল অসাধারণ। সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্যকে অতিক্রম করে তিনি তাঁর প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে পেরেছিলেন। গ্রামের মক্তবে

www.pathagar.com

কিশোর ও তরুণ নজরুল ইসলাম

শৈশবশিক্ষা শুরু হয়। ছোটবেলাতে মসজিদে ইমামতি আর মাজারে খাদেমের কাজও করেছিলেন। এক সময় চরম দারিদ্র্যের কষাঘাতে গ্রাম ছেড়ে লেটোগানের দলে ঢুকে পড়েন। গীতরচনার দীক্ষা তিনি সম্ভবত এই লেটোর দল থেকেই আয়ত্ত করেছিলেন। লেটোর দলে নজরুল খুব জনপ্রিয় ছিলেন। লেটোর দল ছেড়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন নজরুল। স্কুলের নাম ছিল নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউট। লোকে বলত মাথরুন স্কুল। এই স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। প্রতিভাবান ছাত্র নজরুল ইসলাম সহজেই শিক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু আর্থিক অনটনে স্কুলের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

জীবনযাপনের তাগিদে নজরুল রুটির দোকানে চাকুরি নেন। এই সময়ে কাজী রফিজউল্লাহ নামের এক পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর নজরুলকে ময়মনসিংহ জেলার কাজীর সিমলা গ্রামের নিকটবর্তী দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন। কিছুকাল এখানে পড়াশোনা করে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে দেশে (বর্ধমানে) বেড়াতে গিয়ে আর ফিরে এলেন না। এখান থেকে নজরুল রানীগঞ্জ শিয়াড়শোল হাইস্কুলে চলে যান। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষ এই স্কুলেই নজরুলের সঙ্গে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনবন্ধুতে মিলে সাহিত্যচর্চা জমে ওঠে।

নজরুল যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরু হয়ে যায়। নজরুল পড়াশোনা ছেড়ে নতুনের নেশায় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করার জন্য কলিকাতা (দ্র) চলে যান। নজরুল ইসলাম ৪৯ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেণ্টে যোগ দেন। অচিরে নজরুলকে পেশোয়ারের নিকটবর্তী নৌশেরা ট্রেনিং সেণ্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীতে নজরুলের পদোন্নতি হয়। তিনি হাবিলদার পদের দায়িত্ব পান। এই সময়ে তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি লেখা পাঠাতে থাকেন। হাবিলদার কবি নজরুল ইসলাম নামে তাঁর পরিচয় বৃদ্ধি পায়। তিনি সেনানিবাসে বসবাসকালে শুধু সামরিক জ্ঞানই অর্জন করেন নি, বাংলা সাহিত্য (দ্র) ও বিশ্বসাহিত্যের খোঁজ-খবরও রাখতেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) ও ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (দ্র) সব বই তিনি সেখানে পাঠ করেছেন, 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ', 'ভারতী', 'মানসী ও মর্মবাণী' 'সবুজপত্র' ইত্যাদি পত্রিকাও তিনি সংগ্রহ করে পড়াশোনা করতেন। এক পাঞ্জাবি মৌলানার কাছ থেকে ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যও শিখে নিয়েছিলেন। উর্দু-হিন্দিও রপ্ত করেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে নজরুল ইসলাম প্রয়োজনীয় লেখাপড়া খুব কম করেন নি। যুদ্ধশেষে তিনি কলিকাতায় চলে এসে সাহিত্যচর্চায় নিজেকে পুরাপুরিভাবে নিয়োগ করেন। তাঁর সৈনিক জীবনের বিচিত্র পড়াশোনা কবি, সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক নজরুলের কাজে লেগেছিল।

কলিকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' নামের একটি সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান ছিল। সমিতির পক্ষ থেকে 'বঙ্গীয়

www.pathagar.com

মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' (দ্র) প্রকাশ করা হত। এই পত্রিকার অন্যতম সহযোগী সম্পাদক ছিলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ (দ্র)। নজরুল ইসলাম তাঁর সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসের একই কক্ষে থাকতেন। সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে নজরুল ইসলাম সংবাদপত্র সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। তাঁরা উভয়ে মিলে 'নবযুগ' নামক একটি সান্ধ্য দৈনিক প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তিনি তখনকার ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে অনেকগুলো প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধগুলো 'যুগবাণী' নামে সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালে ব্রিটিশ সরকার 'যুগবাণী' বাজেয়াপ্ত করে। ১৯২২ সালের ১১ই আগস্ট কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' নামে অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'ধূমকেতু'তে জ্বালাময়ী ভাষায় দেশের কথা, দেশের স্বাধীনতার কথা, ব্রিটিশের অন্যায় অত্যাচারের কথা, লেখা থাকত। ফলে দেখতে দেখতে পত্রিকাটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই পত্রিকা সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। ক্রমে নজরুল ইসলাম 'লাঙল' 'গণবাণী' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করেন; কিন্তু কোনো পত্রিকাই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, সরকারের রোষে পড়ে হয় বাজেয়াপ্ত হয়েছে, অথবা অর্থনৈতিক কারণে প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে।

নজরুলের নামকরা বহু কবিতা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু', 'প্রলয়োল্লাস', 'রক্তাম্বরধারিণী মা' প্রভৃতি কবিতা সমকালীন পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ব্রিটিশ সরকার এ ধরনের কবিতাকে খুব ভয়ের চোখে দেখত। 'ধূমকেতু'তে তাঁর 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশিত হলে রুষ্ট ব্রিটিশ সরকার কবিকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারারুদ্ধ করে। কারাগারে গিয়েও নজরুল ইসলাম তাঁর দেশপ্রেম বিসর্জন দেন নি। সেখানেই তিনি তাঁর 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' লেখেন। কবিকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে হুগলি জেলে স্থানান্তর করে অসম্মান ও অত্যাচার করা হয়। জেলে বসেই কবি 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' 'এই শিকল-পরা ছল মোদের' ইত্যাদি কবিতা লেখেন। এক পর্যায়ে তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। সারা দেশের লোক কবির জীবনহানির ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে অনশন ধর্মঘট পরিত্যাগ করার জন্য অনুরোধ জানান।

নজরুল ইসলাম সব রকমের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। সরকারের রাজনৈতিক অত্যাচার, বিত্তবান আর পুরোহিততন্ত্রের সামাজিক অত্যাচার, আমলাতন্ত্রের প্রশাসনিক অত্যাচার তিনি কখনো মুখ বুজে সহ্য করেন নি। সম্পাদকীয় লিখে, বই লিখে, কবিতা লিখে, ব্যঙ্গরচনা লিখে, গান লিখে তিনি জনগণের অধিকারের দাবি তুলে ধরেছেন। এমন জনদরদী মানুষ খুব কমই দেখা যায়। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সামাজিক কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নজরুলের জীবনের ব্রত ছিল।

তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন না। জাতের নামে বজ্জাতি তাঁর অসহ্য ছিল। তিনি বিয়ে করেছিলেন কুমিল্লায় আশালতা সেনগুপ্তাকে; বিবাহের পর তার স্ত্রীর নাম হয় প্রমীলা নজরুল।

কবি নজরুল ইসলাম ৩৬টি কবিতা ও সঙ্গীতের বই লিখেছেন। ৩টি অনুবাদ কাব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি ৩টি উপন্যাস–'বাঁধনহারা', 'মৃত্যু ক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা' রচনা করেছেন, নাটকও লিখেছেন তিনটি— 'ঝিলিমিলি', 'আলেয়া' ও 'মধুমালা'। 'যুগবাণী', 'রাজবন্দীর জবানবন্দী,' 'রুদ্রমঙ্গল', 'দুর্দিনের যাত্রী', 'ধূমকেতু' ইত্যাদি তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ। তাঁর

www.pathagar.com

শিশুপুত্র বুলবুলকে কোলে নিয়ে নজরুল
তাঁর বামে : স্ত্রী প্রমীলা নজরুল, ডানে : শাশুড়ি গিরিবালা দেবী

তিনটি ছোটগল্প গ্রন্থ আছে— 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' ও 'শিউলিমালা'। তিনি আড়াই হাজারেরও বেশি গান রচনা করেছেন। তাঁর 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'ফণিমনসা' ইত্যাদি কবিতার বই এখনো জনপ্রিয়।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কবি নজরুল ইসলাম এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে অবশিষ্ট জীবন নির্বাক থাকেন। তিনি সারা জীবন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে ১৯৪৭-এ দেশের স্বাধীনতা তিনি অনুভব করতে পারেন নি। বাংলাদেশ (দ্র) স্বাধীন হওয়ার পর তাঁকে ঢাকা (দ্র) নিয়ে আসা হয়। তিনি ঢাকাতেই ১৯৭২ থেকে অবস্থান করেন। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি দান করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি 'একুশে পদক' লাভ করেন।

১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট সকাল ১০টা ১০ মিনিটের সময় কবি নজরুল ইসলাম ঢাকার পি জি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় কবি।

ম. মু.

কাজী মোতাহার হোসেন [১৮৯৭—১৯৮১]

সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী। তিনি ১৮৯৭ সালের ৩০শে জুলাই নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রামে।

কাজী মোতাহার হোসেন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৭ সালে নিম্ন প্রাইমারি এবং ১৯০৯ সালে উচ্চ প্রাইমারি পাশ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পান। ১৯১৫ সালে কুষ্টিয়া হাই ইংলিশ স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯১৭ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করে আই.এসসি., ১৯১৯ সালে ঢাকা কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে (দ্র) অনার্স পড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) বি.এ. অনার্স ডিগ্রি এবং ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজেই পদার্থবিজ্ঞানে এম. এ. পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রি পান। তিনি ১৯৩৯ সালে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ে ডিপ্লোমা এবং একই সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পরীক্ষণ প্রকল্প' (Design of Experiment) বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

কাজী মোতাহার হোসেন শিক্ষাজীবন শেষ করার আগেই নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ডেমোনেস্ট্রেটর পদে যোগ দেন। পরে তিনি এই বিভাগেরই লেকচারার হন। ১৯৪৮ সালে তাঁর উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যাতত্ত্ব ও তথ্যগণিত বিষয়ে এম. এ./এম. এসসি. কোর্স চালু হয়। কর্মজীবনে তিনি শেষ পর্যন্ত এই বিভাগের অধ্যাপক/অধ্যক্ষ, প্রফেসর (১৯৫৪), বিজ্ঞান অনুষদের ডীন, সুপারনিউমেরারি প্রফেসর বা সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক (১৯৬৪), পরিসংখ্যান

www.pathagar.com

পুত্র-কন্যাদের মাঝখানে কাজী মোতাহার হোসেন : বামে লেখক কাজী আনোয়ার হোসেন, সর্বডানে শিক্ষাবিদ যোবায়দা মির্জা. ডান দিক থেকে ৩য় খ্যাতিমান রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী সনজীদা খাতুন, ৪র্থ কাজী মাহবুব হোসেন

ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রফেসর এমিরিটাস (১৯৬৯) ইত্যাদি পদ লাভ করেন।

পরীক্ষণ প্রকল্পে নিরন্তর গবেষণার ফলে মোতাহার হোসেন একটি পরিসংখ্যান তত্ত্ব প্রবর্তনে সক্ষম হন। তাঁর এই মৌলিক অবদান Hussain's Chain Rule বা 'হোসেনের শৃঙ্খল-নিয়ম' নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে।

কাজী মোতাহার হোসেন মুক্তবুদ্ধি চর্চার লক্ষ্যে ১৯২৬ সালে কাজী আবদুল ওদুদ (দ্র), আবুল হুসেন প্রমুখ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই সংগঠন পরিচালিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের (দ্র) অন্যতম সংগঠক ছিলেন। সংগঠনের মুখপত্র 'শিখা' দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এ সময় তিনি নিজেও সমাজচিন্তামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ—প্রবন্ধ : 'সঞ্চরণ' (১৯৩৭), 'নজরুল কাব্য পরিচিতি' (১৯৫৮), 'সেই পথ লক্ষ্য করে' (১৯৫১), 'গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস' (১৯৭০), 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' (১৯৭৬); অনুবাদ : 'প্লেটোর সিম্পোজিয়াম' (১৯৬৫)। তাঁর সমগ্র রচনাকর্মে প্রগতিশীল চিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে কাজী মোতাহার হোসেন বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা, বিবৃতি ও স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রগতিশীল সাহিত্য সংগঠন 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি বাংলা একাডেমী (দ্র) প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত আয়োজক সমিতির সদস্য এবং ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী (দ্র) আয়োজিত কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে (দ্র) একাধিক অধিবেশনে সভাপতি হন। তিনি ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার কমিটিরও সদস্য ছিলেন।

কাজী মোতাহার হোসন ১৯৬৬ সালে প্রবন্ধসাহিত্যের জন্য 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' এবং ১৯৭৯ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিশেষ অবদানের জন্য 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডি. এসসি. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন এবং ১৯৭৫ সালে জাতীয় অধ্যাপকের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ক্রীড়ামোদী ছিলেন। দাবা খেলায় তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল।

তিনি ১৯৮১ সালের ৯ই অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

www.pathagar.com

কাজী মোহাম্মদ ইদরিস [১৯০৬—১৯৭৫]

বাংলাদেশের (দ্র) বিশিষ্ট সাংবাদিক। রংপুর শহরের মুন্সিপাড়ায় ১৯০৬ সালের ১১ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী মোহাম্মদ সঈদ এবং মাতার নাম কামরুন্নেসা বেগম।

কাজী ইদরিস রংপুর জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯২২), রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে আই. এসসি. (১৯২৪) এবং বি. এ. (১৯২৭) পাশ করেন। কলিকাতা সিটি কলেজে আইন পড়েন, কিন্তু পরীক্ষা দেন নি।

১৯৪০ সালে মীর্জা আজিজা খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি তিন পুত্র ও তিন কন্যা-সন্তানের জনক।

পেশা হিসাবে তিনি সাংবাদিকতাকে বেছে নেন। সেই সুবাদে কলিকাতার (দ্র) বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র) সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সৈনিক'-এ সহকারী সম্পাদকরূপে সাংবাদিক জীবনের শুরু (১৯৩৬), তার পর বিদ্রোহী কবি সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক (১৯৩৭—৩৮), দৈনিক 'আজাদ'-এ সহযোগী সম্পাদক (১৯৪১—১৯৪২), সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' (১৯৪৫) ও সাপ্তাহিক 'ইত্তেহাদ' (১৯৪৬-১৯৪৯)-এ সম্পাদকরূপে দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকার জীবনে দৈনিক 'ইনসাফ'-এ সহকারী সম্পাদক (১৯৫১), দৈনিক 'সংবাদ'-এ সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য (১৯৫১), দৈনিক 'ইত্তেহাদ'-এ প্রধান সম্পাদক (১৯৫৫), অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র সম্পাদক ও প্রকাশক (১৯৫৮), সাপ্তাহিক 'পল্লীবার্তা'র কার্যনির্বাহী সম্পাদক (১৯৫৯), 'পল্লীবার্তা' সাপ্তাহিক 'পূর্বদেশ'-এ রূপান্তরিত হওয়ার পর উক্ত পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক (১৯৬০) এবং সাপ্তাহিক 'যুগবাণী'র (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মুখপাত্র) সম্পাদক (১৯৬৯) ছিলেন।

কাজী মোহাম্মদ ইদরিস শুধু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিকই ছিলেন না, স্বনামধন্য সাহিত্যিকও ছিলেন। 'প্যারাম্বুলেটর' (ছোটগল্প) তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা (দেশ, ১৯৩২)। প্রকাশিত গ্রন্থ 'পীত নদীর বাঁকে' (১৯৫৯), 'নটীর প্রেম' (১৯৬০), 'অন্তঃশীলা' (১৩৭৪ ব.), 'সব মুখ চেনা চেনা', এবং অনুবাদগ্রন্থ 'স্ত্রীগুবার্গের সাতটি নাটক'। 'পীত নদীর বাঁকে' এবং 'নটীর প্রেম' গ্রন্থ দু'টি চীনা গল্পের ভাবানুবাদ।

কলিকাতার মুসলিম সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'র (দ্র) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন।

কাজী মোহাম্মদ ইদরিস ১৯৭৫ সালের ২২শে মার্চ পরলোক গমন করেন।

শা. হ.

কাঠবিড়াল (squirrel)

কাঠবিড়ালের ৩০০ প্রজাতি-উপপ্রজাতি আছে। সাদা লেজ, অ্যান্টিলোপ, 'তের ডোরা' গ্রাউণ্ড, আর্কটিক, সোনালি দাগ, উড়ন্ত ফক্স ও চিপমুঙ্ক *(Chipmunk)* কাঠবিড়াল উল্লেখযোগ্য। কাঠবিড়ালের বৈজ্ঞানিক নাম স্ক্যুরিডি *(Sciuridae)* ।

ফারের মতো লেজ ও গায়ের লোম। বাংলা '৯'-এর মতো লেজ। কালো-উজ্জ্বল চোখ। গোলাকার কান।

প্রজাতিভেদে এরা বাদামি, সোনালি, ডোরাকাটা, সাদা, কালো নানা রঙের হয় । এদের গোঁফ আছে। এরা চঞ্চলগতি। সামনের পা দু'টি হাতের কাজ করে। লাফিয়ে গাছ থেকে গাছে যায়। উড়ন্ত কাঠবিড়াল গ্লাইডারের মতো ৪৫ মিটার পর্যন্ত নামতে পারে। অনেকের লেজ খাটো। অনেকে আবার গাছে চড়তে পারে না।

সবচেয়ে বড় কাঠবিড়াল হচ্ছে মার্মট্ (লেজসহ ৭৬ সেন্টিমিটার, ওজন ৯ কিলোগ্রাম)। এর লেজ হচ্ছে ২৫ সেন্টিমিটার। ছোট হচ্ছে পিগ্মি কাঠবিড়াল। এটি লেজ বাদে ৮ সেন্টিমিটার, লেজ ৫ সেন্টিমিটার, ওজন ১৪ গ্রাম।

এরা কুটো, লতা, ঘাস-পাতা দিয়ে গাছে বা খোঁড়লে গোল বাসা তৈরি করে। ২-৪টি বাচ্চা হয়। অনেকের দুটো আবাসস্থল (শীতে ও গ্রীষ্মে) থাকে।

পাইন জঙ্গলের কাঠবিড়ালকে বলা হয় কাইবাব (Kaibab)। শীতে এরা কয়েকটি মিলে এক বাসায় বসবাসও করে।

www.pathagar.com

লাফ দেবার সময় এদের লেজ ভারসাম্য রক্ষা করে। এরা ২ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

পাখির ডিম, তৃণলতা, কীটপতঙ্গ, ফল-ফলারি, গাছের ছাল ইত্যাদি খায়। উড্ডুক্কু কাঠবিড়াল মূলত নিশাচর। লাল কাঠবিড়াল সবেচেয়ে চঞ্চল ও মুখর। বাদামি, পাঁচডোরা, তিনডোরা, সাধারণ কাঠবিড়ালসহ উড্ডুক্কু কাঠবিড়ালও বাংলাদেশে (দ্র) আছে।

শ. খা.

কাণ্ট্, ইমানুয়েল্ [১৭২৪—১৮০৪]

জার্মান দার্শনিক কাণ্ট্ (Immanuel Kant) ১৮শ শতকের শেষ ও ১৯শ শতকের সূচনালগ্নে জার্মানিতে সনাতন ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা। জার্মানির ক্যোনিগ্স্বের্গ (Konigsberg) শহরে (পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে গিয়ে কালিনিন্‌গ্রাৎ নাম হয়) ১৭২৪ সালে তাঁর জন্ম। স্থানীয় বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা করেন। ১৭৭০ সালে তিনি ক্যোনিগ্স্বের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তিবিজ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রাজনীতি আর সাহিত্যেও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। তাঁর দর্শনের মূলকথা হল বিচারবুদ্ধিকে সীমিত রেখে বিশ্বাসকে দৃঢ় করা।

কাণ্টের দার্শনিক জীবন তিন পর্যায়ে বিভক্ত— প্রাক-বিচারবাদী (১৭৪৭-৭০), বিচারবাদী (১৭৭১-৯০) এবং উত্তর-বিচারবাদী (১৭৯১-১৮০৪)। প্রাক–বিচারবাদী পর্যায়ে কাণ্টের সুস্পষ্ট কোনো দর্শনচিন্তা ছিল না। তিনি ছিলেন দার্শনিক 'লাইব্‌নিৎস্'-এর গুণগ্রাহী আলোচক। এ

সময় তিনি স্যার আইজ্যাক্ নিউটন (দ্র), ইংরেজ দার্শনিক হিউম (দ্র) এবং ফরাসি চিন্তাবিদ রুসোর (দ্র) ভাবধারায় প্রভাবিত হন। দর্শনকে তিনি বিজ্ঞানেরই অংশ মনে করতেন।

১৭৮১ সালে প্রকাশিত কাণ্টের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্রিটিক্ ডের্ রাইনেন্ ভের্নুন্ফ্‌ট্' (শুদ্ধ জ্ঞান-বিচার)-এর মধ্য দিয়ে তাঁর বিচারবাদী ভাবধারার প্রকাশ ঘটে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়াই বুদ্ধি নিজস্ব ক্রিয়ায় অভ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে বলে বুদ্ধিবাদীদের যে ধারণা প্রচলিত ছিল, কাণ্ট্ তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। কাণ্টের মতে, বুদ্ধিসর্বস্ব তত্ত্ববিদ্যা সাধারণ মানুষের সরল ও সত্য বিশ্বাসে আঘাত হানে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষকে জড়বাদী, নিয়তিবাদী বা নিরীশ্বরবাদী করে তোলে। তিনি শুদ্ধ জ্ঞানের স্বরূপ ও ক্রিয়া বিচারের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। শুদ্ধ জ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনি বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের চরম পথ অনুসরণের বিরোধী।

জ্ঞানের সীমা ও প্রকার পর্যালোচনার মধ্যমে কাণ্ট অজ্ঞাবাদের (দ্র) সঙ্কটস্তরে উপনীত হন। কাণ্টের মতে, ইন্দ্রিয়চেতনা এবং ধারণার সমন্বয়ের ফলই হল জ্ঞান। জ্ঞানবহির্ভূত তত্ত্বের স্বরূপ অজ্ঞেয়। প্রাকৃতিক জগৎ জ্ঞানের বিষয় হতে পারে, কিন্তু আত্মা, আত্মার অমরতা, ঈশ্বর কখনো জ্ঞানোদ্ভূত বুদ্ধি (থিওরেটিক্যাল রিজ্ন্)-গ্রাহ্য বিষয় নয়। প্রাকৃতিক জগৎ আসলে মানুষের জ্ঞানেরই সৃষ্টি।

কাণ্টের মতে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের গুরুত্ব বোঝার জন্য শুদ্ধ ধারণা অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কার্যকারণ ইত্যাদির গতি-প্রকৃতি বোঝা দরকার, শুদ্ধ ধারণাগুলো সকল মানুষের কাছেই এক রকম। তাই এই ধারণাগুলোর সাহায্যে অর্জিত জ্ঞান অভিন্ন ও নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে।

নৈতিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কাণ্ট্ ক্যাটাগরিক্যাল ইম্পারেটিভ বা 'শর্তহীন নিয়ামক'-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, কর্তব্য যার প্রতিই হোক না কেন, তা পালন করতে হবে বিনা শর্তে। সৌন্দর্যদর্শন প্রসঙ্গেও তিনি

www.pathagar.com

বিষয়নির্বিশেষ আনন্দ অনুভবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিতে তিনি ছিলেন যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিকামী।

কান্ট ১৮০৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

কাদম্বরী দেবী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্র

কাদিয়ানী আহমদীয়া দ্র

কাদের নওয়াজ, কাজী [১৯০৯—১৯৮৩]

কবি ও শিক্ষক। ১৯০৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামে।

পারিবারিক পরিবেশে তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আরবি (দ্র) ও ফার্সি ভাষার প্রাথমিক পাঠও তিনি পরিবার থেকে লাভ করেন। ১৯১৮ সালে বর্ধমান জেলার মাথরুন উচ্চ ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন এবং এই স্কুল থেকেই তিনি ১৯২৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ে অনার্স নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) অধ্যয়ন করতে থাকেন। অনার্স পাশ করার পর শেষ পর্যন্ত তিনি এম. এ. পরীক্ষা না দিয়ে বি. টি. পাশ করেন।

শিক্ষাজীবন-শেষে কাদের নওয়াজ ১৯৩৩ সালে স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করেন। এর পর প্রেষণে বা ডেপুটেশনে ইংরেজির শিক্ষক হিসাবে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন। ১৩ বছর পর তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে পদোন্নতি লাভ করলে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে এসে ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটে যোগ দেন। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দিনাজপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এক জন আদর্শবান শিক্ষক হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কাদের নওয়াজ অত্যন্ত অল্প বয়সেই সাহিত্যের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর শিক্ষক দ্বিজ বাবুর নিকট প্রেরণা লাভ করেন। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে প্রথম তাঁর কবিতা (দ্র) প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম ছিল 'স্বদেশস্মৃতি' এবং এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বিকাশ' পত্রিকায়। এর পর 'শিশুসাথী', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী', 'শুকতারা', 'পাঠশালা', 'রামধনু', 'শীশমহল', 'মৌচাক', 'প্রবাসী', 'রংমশাল', 'শিশু সওগাত'সহ সে সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। সাহিত্যের সব শাখায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। তবে কবিতাই ছিল তাঁর চর্চার প্রধান ক্ষেত্র।

কাদের নওয়াজ মূলত রবীন্দ্রপ্রভাববলয়ের কবি হলেও বিষয়ে, বিন্যাসে, আঙ্গিকে ও প্রকাশ-নৈপুণ্যে তাঁর কাব্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কবিতায় তিনি আজীবন সত্য-সুন্দর আর সুনীতিকে আবাহন করেছেন। ছান্দসিক কবি হিসাবে তিনি অধিক পরিচিত। সহজ-সরল ভাবমাধুর্যে রচিত তাঁর কাহিনীধর্মী ও নীতিকথামূলক শিশুতোষ রচনার সংখ্যাও অনেক। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গের সাহিত্যচর্চার ধারাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় সুসংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য তাঁর অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হল 'মরাল' (কাব্য : ১৯৩৪), 'দাদুর বৈঠক' (স্মৃতিচারণমূলক গল্পকাহিনী : ১৯৪৭), 'নীলকুমুদী' (কাব্য : ১৯৬০), 'দুটি পাখি দুটি তীরে' (উপন্যাস), 'মণিদ্বীপ' (কাব্য), 'উতলা সন্ধ্যা' (উপন্যাস), 'কালের হাওয়া' (কাব্য), 'মরুচন্দ্রিকা' (কাব্যাকারে রচিত মহানবীর জীবনী) ইত্যাদি।

সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ কাদের নওয়াজ প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, ১৯৬৩ সালে শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) ও মাদারবক্স পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৩ সালের ৩রা জানুয়ারি তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

সুজ. ব.

কানা হরিদত্ত [১৫শ শতক]

সাপের দেবীর নাম মনসা। পৃথিবীতে (দ্র) তার পূজা

www.pathagar.com

প্রচলনের গল্প নিয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে (দ্র) যে-কাহিনী কাব্যে রচিত হয়েছে তাকে বলা হয় মনসামঙ্গল (দ্র) বা মনসার ভাসান বা পদ্মাপুরাণ। মনসার আরেক নাম পদ্মা, সেজনই পদ্মাপুরাণ নাম। মনসামঙ্গলের কাহিনী অনেক কবি রচনা করেছেন। সবচাইতে প্রাচীন কবির নাম কানা হরিদত্ত। এ কবির অস্তিত্ব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু সংশয় আছে। কিন্তু এই নামে যে মনসামঙ্গলের কবি ছিলেন তা বিভিন্ন প্রমাণে বোঝা যায়। কবির এক চোখ নষ্ট ছিল, সে কারণে কানা নাম হতে পারে। অথবা সাপের দেবীর প্রতি ভক্তি দেখিয়ে তিনি নিজের নামের সঙ্গে 'কানা' নাম জুড়ে দিতে পারেন। সাপের দেবী মনসারও এক চোখ নেই।

কানা হরিদত্তের নাম জানা যায় মনসামঙ্গলের বিখ্যাত কবি বিজয় গুপ্তের (দ্র) 'পদ্মাপুরাণে'। বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল রচনা করেন ১৪৮৪-৮৫ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) পুঁথিশালায় বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' আছে। সে পুঁথিতে হরিদত্তের ভণিতায় কবিতার অংশবিশেষ পাওয়া যায়। বাংলা রূপকথার (দ্র) বিখ্যাত লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (দ্র) ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে মনসামঙ্গলের একটি প্রাচীন পুঁথি পেয়েছিলেন। তাতেও হরিদত্তের ভণিতায় কবিতা আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের লেখক দীনেশচন্দ্র সেন (দ্র) তাঁর বইতে এই ভণিতাই ব্যবহার করেছেন। মনসামঙ্গলের আরেক বিখ্যাত কবি নারায়ণ দেবের পুঁথিতেও কানা হরিদত্তের ভণিতা আছে—

পদ্মার চরণে গতি হরিদত্তে কয়।
মনসা পূজিয়ে সঙে ধনপুত্র পায় ॥

তা হলে, মনসামঙ্গলের সব বিখ্যাত কবির রচনাতে কানা হরিদত্তের নাম দেখা যাচ্ছে। বিজয় গুপ্তের আগে কানা হরিদত্তের মনসাগীতি লোকজনে গাইত। হরিদত্ত হয়তো এক জন লোককবি ছিলেন, কিংবা তিনি নিজেই গাইতেন। তাঁর গান কালে কালে লোকের মুখে বিকৃত হয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যায় কিংবা অন্য গায়কের গানের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কানা হরিদত্ত পনেরো শতকের কবি হবেন। তিনি পূর্ববঙ্গের লোক এবং বরিশাল (দ্র) অঞ্চলেই তাঁর জন্ম। বিজয় গুপ্তের জন্মও বরিশালে।

আ. ক.

কানাইলাল দত্ত [১৮৮৮—১৯০৮]

বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের জন্ম ১৮৮৮ সালের ৩১শে আগস্ট, হুগলি জেলার চন্দননগরে। কৈশোরে প্রথমে বোম্বাইয়ের গিরগাঁও এরিয়ান এডুকেশন স্কুলে এবং পরে চন্দননগরে দ্যুপ্লে *(Dupleix)* বিদ্যামন্দিরে (বর্তমানে কানাইলাল বিদ্যামন্দির) লেখাপড়া করেন। হুগলি মহসিন কলেজ থেকে ১৯০৮ সালে তিনি বি.এ. পাশ করেন। এ সময় তিনি রাজদ্রোহের কারণে কারাগারে থাকায় ব্রিটিশ সরকার তাঁর ডিগ্রি কেড়ে নেয়।

কানাইলাল দত্ত বিলেতি দ্রব্য বর্জনসহ ব্রিটিশবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনের এক জন নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন। বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক চারুচন্দ্র রায়ের কাছে তিনি বিপ্লববাদের দীক্ষা নেন। বি.এ. পরীক্ষার পরপরই তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় অস্ত্রআইন লঙ্ঘন ও বোমা তৈরির অভিযোগে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ (দ্র)-সহ অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ১৯০৮ সালের ২রা মে কানাইলাল দত্তও গ্রেপ্তার হন।

বোমা তৈরির মামলায় নরেন গোঁসাই নামে এক ব্যক্তি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। কারাগারে থাকা অবস্থাতেই কানাইলাল দত্ত বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মাধ্যমে অস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং ৩১শে আগস্ট তারিখে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। একই বছরের ১০ই নভেম্বর এই মহান বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

ফ. মা.

কানামাছি

কানামাছি আমাদের গ্রাম-বাংলার ছোট-বড় ও কিশোর-কিশোরীদের কাছে খুবই আনন্দদায়ক একটি গ্রামীণ

www.pathagar.com

খেলা। এই খেলায় কোনো সরঞ্জাম লাগে না। একটা খোলা জায়গায় বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে এই খেলা খেলতে হয়।

খেলোয়াড়েরা একটা বৃত্ত রচনা করে বৃত্তের মাঝখানে এক জন খেলোয়াড়কে চক্ষু বেঁধে তাকে অন্ধ লোক বা কানামাছি সাজাবে। বৃত্তের সবাই একটু ঘুরে অথবা অন্ধ কানামাছির হাত ধরে দু' তিন-বার ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবে। তার পরে কানামাছি খেলোয়াড়টি বৃত্তের দিকে আঙুল দেখিয়ে যে কোনো জীবজন্তুর নাম করবে। যার দিকে আঙুল দেখানো

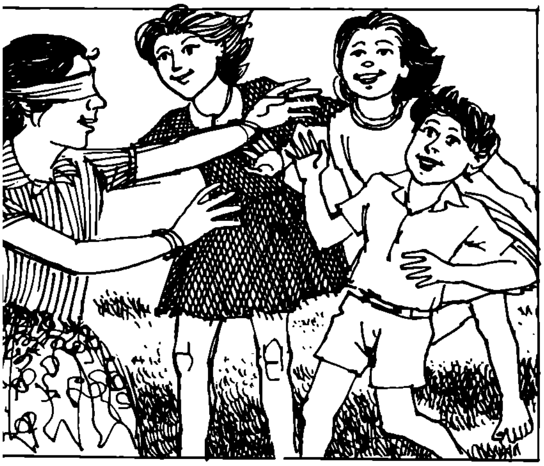

হল সে জন্তুর মতো শব্দ করবে আর কানামাছি গলার স্বর শুনে কে আওয়াজ করল তার নাম অনুমান করে বলে দিতে চেষ্টা করবে। কানামাছিকে তিন বার চেষ্টা করার সুযোগ দেওয়া হবে। সে যদি কৃতকার্য হয় তবে যে খেলোয়াড়ের নাম সে বলেছে তার সঙ্গে কানামাছির জায়গা বদল হবে, আর ব্যর্থ হলে খেলাটি চলতে থাকবে।

আবার অন্যভাবেও কোনো কোনো জায়গায় খেলাটি হয়ে থাকে। বৃত্তের ভিতরে এসে কিছু সংখ্যক খেলোয়াড় কানামাছিকে ছুঁয়ে যেতে চাইবে আর কানামাছি তাদের ধরার চেষ্টা করবে। যাদের সে ধরবে, তাদের নাম বলার চেষ্টা করবে। যদি কানামাছি তাদের নাম বলতে পারে তা হলে তার সঙ্গে কানামাছির জায়গা বদল হবে। অবশ্য অন্ধ কানামাছি যার দিকে আঙুল দেখাল সে বৃত্ত হতে অন্ধের সামনে এসে দাঁড়ালে অন্ধ কানামাছি তাকে ধরে তার নাম বলার চেষ্টা করবে। এমনি করেও বহু জায়গায় কানামাছি খেলা হয়ে থাকে। খেলাটি অত্যন্ত নির্দোষ ও আমোদজনক।

কা. আ. আ.

কান্তজীর মন্দির

কান্তজী বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে রুক্মিণীকান্তকে। রুক্মিণীকান্ত শ্রীকৃষ্ণেরই (দ্র) একটি নাম। দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১৪ মাইল উত্তর দিকে ঢেপা নদীর তীরে কান্তজীর মন্দির অবস্থিত।

এই মন্দিরের নয়টি চূড়া। নয় চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরকে বলা হয় নবরত্ন মন্দির। কান্তজীর মন্দির একটি নবরত্ন মন্দির। মাটি থেকে প্রধান চূড়াটির উচ্চতা ছিল ৭০ ফুট। ১৮৯৭ সালে এক ভূমিকম্পে মন্দিরের চূড়াগুলো ভেঙে যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্দিরের গায়ে রয়েছে টেরাকোটা (দ্র) বা পোড়ামাটির চিত্রফলক। এগুলোতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রামায়ণ (দ্র), মহাভারত (দ্র) ও বিভিন্ন পুরাণ থেকে নেওয়া নানা কাহিনী।

এই মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু করেন দিনাজপুরের এক জমিদার। তাঁর নাম মহারাজা প্রাণনাথ রায়। কিন্তু তিনি নির্মাণ কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি। পরে তাঁর পুত্র (পোষ্যপুত্র) রামনাথ রায় নির্মাণকাজ শেষ করেন। ১৭৫২ সালে মন্দির উৎসর্গ করা হয়। মন্দিরের পুরানো কৃষ্ণমূর্তিটি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের (দ্র) সময় পাকিস্তানের (দ্র) হানাদার বাহিনী নষ্ট করে ফেলে। স্বাধীনতার পরে নতুন একটি কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি বছর এখানে বিরাট মেলা বসে।

নি. অ.

কাপালিক

শৈব (শিব) বা শাক্ত সম্প্রদায় বিশেষ। এরা তান্ত্রিক। এরা আধখান নরমুণ্ড ধারণ করে এবং তাতে করে তাদের পান ও

www.pathagar.com

ভোজন হয়। গলায় থাকে মানুষের অস্থিমালা, কপালে চিতাভস্ম। আগুনে নরমাংস আহুতি দেয়, নরমুণ্ড নিয়ে সুরা পান করে এবং নরবলি দ্বারা মহাভৈরবের পূজা করে। শিবের (দ্র) আর এক নাম মহাভৈরব। কাপালিকেরা ধ্যান ও আসন করে পৃথিবীতে (দ্র) তাদের পুনর্জন্ম না হওয়ার জন্য। এদের ধ্যানের মুদ্রা ছয়টি— কণ্ঠিকা, রুচক, কুণ্ডল, শিখামণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত। এ ছাড়া দুটি উপমুদ্রার নাম কপাল ও খট্টাঙ্গ। এই মুদ্রা দ্বারা দেহ মুদ্রিত করলে পুনর্জন্ম হয় না। এদের বামাচারী বলা হয়। বামাচারী অর্থ শ্রেষ্ঠ আচার-পালনকারী, আবার 'বামাচার' শব্দে মতান্তরে বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রের আচার বোঝায়। এদের শাস্ত্রের নাম ভৈরবাষ্টক, চন্দ্রজ্ঞান, হৃদভেদতন্ত্র, কলাবাদ।

বি. ব.

কাফ্‌কা, ফ্রান্‌ৎস্‌ [১৮৮৩—১৯২৪]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অন্যতম প্রধান লেখক। তিনি তৎকালীন চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রাগের এক স্বচ্ছল ইহুদি পরিবারে ১৮৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতৃভাষা ছিল জার্মান। ১৯০৬ সালে তিনি প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন-শেষে পিতার ইচ্ছানুসারে কিছুকাল তিনি বীমাকর্মচারী হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু ফ্রান্‌ৎস্‌ কাফ্‌কা (Franz Kafka) সাহিত্যপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তখন থেকে পরবর্তী কয়েক বছর ধরে লিখলেও সেসবের অল্পই তিনি প্রকাশ করেন। তাঁর বিখ্যাত বড়গল্প 'মেটামোর্ফোসিস' ছাপা হয় ১৯১৬ সালে। একই বছর তিনি তাঁর 'বিচার' উপন্যাস রচনায় হাত দেন।

ফ্রান্‌ৎস্‌ কাফ্‌কা ব্যক্তিগত জীবনে খুবই অসুখী ছিলেন। ১৯১৭ সালে তাঁর জীবনে ঘটে এক অনভিপ্রেত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা—দীর্ঘ পাঁচ বছরের বাগদত্তা ফ্রয়লাইন এফ. বি-র সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ইতি ঘটে এবং ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। এই অবস্থাতেও তিনি তাঁর দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ বছরটি অতিবাহিত করেন হাসপাতালের শয্যায়। ১৯২৪ সালে সেই অবস্থাতেই ভিয়েনায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

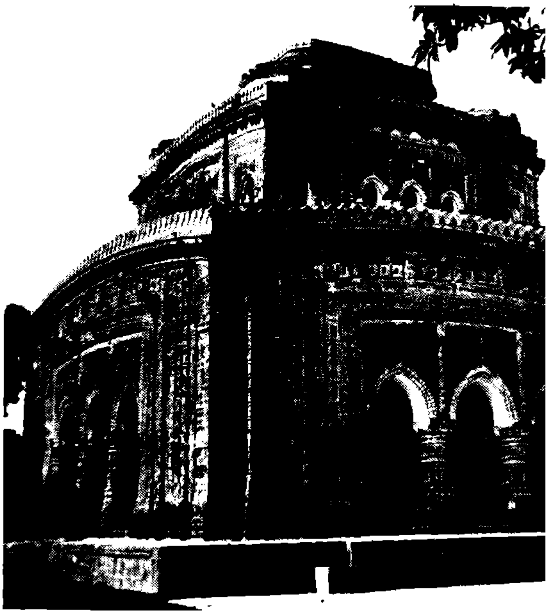

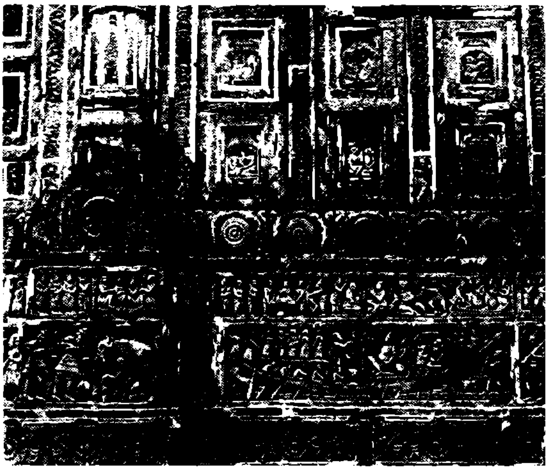

উপরে : কান্তজীর মন্দির
নিচে : কান্তজীর মন্দির-গাত্রে পোড়ামাটির ফলকচিত্র

বেঁচে থাকতে কাফ্‌কার রচনা খুব অল্পই প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তিনটি উপন্যাসের কোনোটিই

www.pathagar.com

তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর একান্ত সুহৃদ ও বন্ধু মাক্স ব্রোড্-এর প্রচেষ্টাতেই কেবল তাঁর সাহিত্যকর্ম পাঠকদের কাছে ক্রমশ পরিচিতি লাভ করে এবং প্রশংসিত হয়। কাফ্কা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার আদেশ পর্যন্ত দিয়ে যান, কিন্তু মাক্স ব্রোড্ সেগুলো সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তাঁর উপন্যাস 'বিচার' (১৯২৫), 'দুর্গ' (১৯২৬) এবং 'দ্য আমেরিকা' ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। কাফ্কার অন্যান্য রচনাকর্মের মতোই তাঁর এই তিনটি উপন্যাসেও আধুনিক মানুষের গভীর হতাশা, নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশিত। তাঁর গ্রন্থের মুখ্য নায়কদের সকলেই অজ্ঞাত এক শক্তির বিরুদ্ধে সতত সংগ্রামশীল। কাফ্কার জীবন-বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মাক্স ব্রোড্ রচিত 'ফ্রান্ৎস্ কাফ্কা : জীবনকথা'; বইটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।

আ. হু.

কাবা

'কাবা' অর্থাৎ কাবাঘর মক্কায় অবস্থিত। এর অন্য নাম 'বায়তুল্লাহ্' বা আল্লাহ্র (দ্র) ঘর। কাবাকে কিবলা (দ্র) করে অর্থাৎ কাবার দিকে মুখ করে মুসলমানগণ নামায (দ্র) আদায় করেন। হজ্বের (দ্র) সময় প্রতি বছর সমগ্র বিশ্বের প্রায় বিশ লক্ষ মুসলমান কাবাঘর প্রদক্ষিণ করেন।

কথিত আছে, হযরত আদম (আ.) (দ্র) উপাসনার জন্য যে গৃহটি নির্মাণ করেন, তা-ই আদি কাবা। কালক্রমে তা বিনষ্ট হলে হযরত ইবরাহিম (আ.) (দ্র) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.) কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণ করেন।

মু. মা.

কাব্য

সাধারণভাবে ভাবসমৃদ্ধ সরস রচনাকে কাব্য বলা হয়। গদ্যে বা পদ্যে রসসমৃদ্ধ রচনাই কাব্য। রচনারীতি ও বিষয়বৈচিত্র্যানুসারে কাব্য বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে পারে। যেমন—মহাকাব্য (দ্র), ঐতিহাসিক কাব্য, খণ্ডকাব্য,

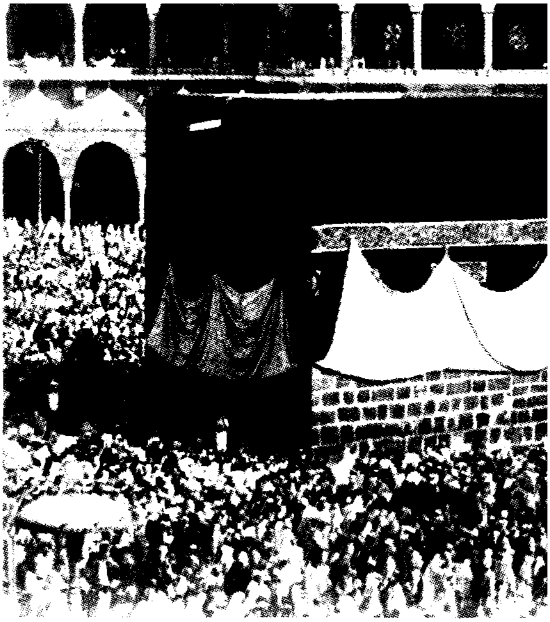

মক্কায় কাবা শরীফ

দূতকাব্য, শতক কাব্য, স্তোত্রকাব্য, গদ্যকাব্য, চম্পূকাব্য, পালাগান, পদাবলী কাব্য, চরিতকাব্য, মঙ্গলকাব্য, প্রণয়কাব্য, আধুনিক কাব্য।

ঐতিহাসিক কাব্য : ইতিহাস যখন হয়ে ওঠে কাব্যের মূল বিষয় তখনই তা ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে পরিচিত হয়। কাশ্মীরের ইতিহাস নিয়ে মহাকবি কলহণ রচনা করলেন 'রাজতরঙ্গিণী'। সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' রচনা করলেন পালবংশীয় রাজা রামপালদেবের রাজত্বকাহিনী এবং অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে।

খণ্ডকাব্য : মহাকাব্যের তুলনায় খণ্ডকাব্যগুলো আকারে যেমন ছোট এগুলোর বিষয়ও তেমনি অনেকাংশে বৈচিত্র্যহীন। কবির ব্যক্তিগত মনোভাব, প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি মূলত এই ধরনের কাব্যের বিষয়।

দূতকাব্য : দূতের মাধ্যমে বার্তা পাঠাবার ছলে যখন খণ্ডকাব্য রচিত হয় তখনই তা পরিণত হয় দূতকাব্যে। কালিদাসের (দ্র) 'মেঘদূত' এই ধারার প্রথম কাব্য এবং পরবর্তী কালে তাঁর অনুসরণে অনেকেই এই ধরনের কাব্য রচনা করেছেন।

শতক কাব্য : এক শ'টি শ্লোক সংগ্রহের মাধ্যমে কবি

www.pathagar.com

যখন তাঁর বক্তব্য পৌঁছে দেন পাঠককে, তখন তাকে বলা হয় শতক কাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ধরনের রচনা দেখা যায়, যেমন ভর্তৃহরির 'শতকত্রয়'।

স্তোত্রকাব্য : উপাস্য দেবতার উদ্দেশে ভক্তের আন্তরিক নিবেদনেরই সঙ্কলন স্তোত্রকাব্য। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব (দ্র), বৌদ্ধ (দ্র), জৈন (দ্র) সম্প্রদায়ের উপাসকগণ তাঁদের নিজ নিজ দেবতার উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করেছেন স্তোত্রের মাধ্যমে। বাল্মীকির (দ্র) 'গঙ্গাস্তোত্র', বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবিভারতীর 'ভক্তিশতক', জীবগোস্বামীর 'স্তবমালা' স্তোত্রকাব্যের নিদর্শন।

গদ্যকাব্য : সংস্কৃত সাহিত্যে বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' এবং সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' গদ্যকাব্যের নিদর্শন।

চম্পূকাব্য : বৈচিত্র্যময় সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য চম্পূকাব্য। গদ্যরচনার মাঝে মাঝে বিষয় বর্ণনার জন্য কবি ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের সাহায্য গ্রহণ করেন। ফলে রচনায় মাধুর্য ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়।

পালাগান এবং মঙ্গলকাব্য : বাংলার গ্রামাঞ্চলে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য নাচ-গানের সাহায্যে কয়েক রাত ধরে বর্ণনা করা হত। দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক এই গানগুলোই 'পালাগান' বা 'পাঞ্চালিকা' বা 'পাঁচালি' নামে পরিচিত ছিল। এই পাঁচালিগুলোরই কাব্যরূপ 'মঙ্গলকাব্য' হিসাবে পরিচিত। যেসব লৌকিক দেবতা এসব পালাগানের প্রধান ছিলেন তাঁরা হলেন মনসা, চণ্ডী (দ্র) ও ধর্মঠাকুর। মনসামঙ্গলের প্রথম কবি বিপ্রদাস পিপ্পলাই। চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, আর ধর্মমঙ্গলের প্রধান কবি রূপরাম চক্রবর্তী।

প্রণয়কাব্য : হিন্দী-আওধী কাব্যের স্বাধীন অনুবাদ নিয়ে সাহিত্যের এই ধারাটি গড়ে উঠেছে। 'বিদ্যাসুন্দর', 'পদ্মাবতী', 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী', 'মধুমালতী', 'লায়লী মজনু' এই ধারার কাব্য।

পদাবলী কাব্য : রাধা–কৃষ্ণের জীবন অবলম্বন করে যে ধারাটি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে সেটি হচ্ছে পদাবলী কাব্য। বৈষ্ণব পদাবলীর (দ্র), প্রধান কবিদের মধ্যে রয়েছেন বিদ্যাপতি (দ্র), চণ্ডীদাস (দ্র), জ্ঞানদাস (দ্র), গোবিন্দদাস (দ্র)।

চরিতসাহিত্য : শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর পারিষদদের জীবন নিয়ে সাহিত্যের একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হয়, যা 'চরিতসাহিত্য' হিসাবে পরিচিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' শ্রীচৈতন্যের একটি উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ। আর তাঁর ছয় জন পারিষদের জীবনী অবলম্বনে রচিত 'উজ্জ্বলনীলমণি' এই ধারার আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

আধুনিক কবিতা : ইংরেজি lyric-এর অনুসরণে উনিশ শতকে বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধুনিক কবিতার সূচনা হয়। ছোট ছোট কবিতায় কবির একান্ত অনুভূতি প্রকাশিত হয়ে সৃষ্টি হল গীতিকবিতা (দ্র)। বাংলা সাহিত্যে এই ধারার প্রথম কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (দ্র)। বিহারীলাল চক্রবর্তীর অনুসরণে এই ধারায় যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল (দ্র), স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (দ্র) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র)। গীতিকবিতা রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সফলতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েও বলা যায়, সমসাময়িক কালে অন্য অনেকেও ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ।

আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। ইতালির কবি পেত্রার্কা (দ্র)-এর অনুসরণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (দ্র) বাংলায় প্রথম সার্থক সনেট রচনা করেন। আর বাংলা সাহিত্যের বীরবল (দ্র) প্রমথ চৌধুরী (দ্র) রচনা করেন শেক্সপীয়রের (দ্র) অনুসরণে সনেট।

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান থেকে পেছনে ফিরে তাকালে বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্নে পাই চর্যাগীতিকা বা চর্যাপদ (দ্র)। এই চর্যাপদ হচ্ছে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচনা— তাঁদের সাধনতত্ত্ব যা কাব্যগুণে গীতিকবিতা হিসাবেও উৎকৃষ্ট।

বাংলা কাব্যের আরেকটি ধারা হচ্ছে অনুবাদ-সাহিত্য। কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'(দ্র), কৃত্তিবাসের (দ্র) 'রামায়ণ' (দ্র) এই ধারার অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

আরবি-ফার্সি ও বাংলার মিশ্রণে কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছিল উনিশ শতকে। 'সোনাভানের পুঁথি', 'জঙ্গনামা', 'হামজানামা' এই ধারার কাব্য। আর সম্পূর্ণ পূর্ববঙ্গের লৌকিক কাহিনীর সংগ্রহ হচ্ছে 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' (দ্র) এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকা' (দ্র)। এই দু'টি সংগ্রহেই কাব্যাকারে লৌকিক জীবনকথা ঠাঁই পেয়েছে।

বিচিত্র রচনা ও বিচিত্রতর বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্যের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে।

মে. খা.

কামধেনু

যে ধেনু বা গাভী ইচ্ছা পূরণ করে তাকে কামধেনু বলে। এই ধেনুর কাছে যা প্রার্থনা করা হয়, তা-ই পাওয়া যায়। ইনি কাশ্যপের পত্নী সুরভির কন্যা এবং সমস্ত গো-জাতির মাতা। বশিষ্টের আশ্রমে কামধেনু সৈন্যসহ বিশ্বামিত্রকে খাদ্য-ভোজ্য-পেয় দান করেছিলেন। গাভীর এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে বিশ্বামিত্র লোভী হয়ে গাভীটিকে চুরি করার চেষ্টা করেন। ঋষি বশিষ্টের অনুরোধে সেই গাভী তৎক্ষণাৎ অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করে বিশ্বামিত্রকে হটিয়ে দেন।

বি. ব.

কামরুল হাসান [১৯২১—১৯৮৮]

কামরুল হাসানকে সবাই শিল্পী হিসাবে সম্বোধন করলেও তিনি নিজে 'পটুয়া' নামে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন।

লোকশিল্পের শিল্পীদের পটুয়া বলা হয়। কামরুল হাসান বাংলার লোকশিল্পের রঙ, রেখা, আদল ও অনেক গুণাগুণ নিজের মধ্যে গ্রহণ করে তাতে নিজের মেধা ও শিল্পচিন্তা মিশেল দিয়ে তাঁর ছবি আঁকার ভাষা তৈরি করেছেন। তাই কামরুল হাসানের আঁকা ছবি দেখলে লোকচিত্রকলার সঙ্গে মিল খুঁজে পেলেও তা সম্পূর্ণ আলাদা ছবি বলেই মনে হয়। আর তা কামরুল হাসানের আঁকার গুণেই সম্ভব হয়েছে।

তাঁর মতো এত বেশি সংখ্যক ছবি এঁকেছেন এমন শিল্পী শুধু বাংলাদেশেই (দ্র) নয়, সারা বিশ্বেও দু'-চার জনের বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশ্য তাঁর ছবির মধ্যে ড্রইংয়ের সংখ্যাই বেশি।

ড্রইংয়ে কামরুল হাসান ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। তাঁর অনায়াসলব্ধ, সাবলীল ও অপ্রতিরোধ্য রেখায় যে কোনো বিষয় হয়ে উঠেছে বাঙ্ময় ও হৃদয়গ্রাহী। তাই ড্রইংয়ের দক্ষতায় কামরুল হাসান বিশ্বের খ্যাতিমান ড্রইং মাস্টারদের অন্যতম।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ (দ্র)-কালীন পোস্টারচিত্রে তিনি তৎকালীন পাক-প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার (দ্র) মুখাবয়বের একটি ড্রইং করেছিলেন— নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার মূর্ত প্রতীক। ছবির সঙ্গে একটি মাত্র কথা ছিল শুধু—'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে।' সেখানে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার, হানাদার পাক-বাহিনীর নৃশংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞের এক নিষ্ঠুর হোতার চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন কয়েকটি তুলির আঁচড়ে। এক জন শিল্পী কামরুল হাসান তাঁর তুলি দিয়ে এভাবেই যুদ্ধ করেছেন। পোস্টারচিত্রটি মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা যুগিয়েছে, উদ্বেলিত করেছে বাঙালিদের— হানাদার বাহিনীকে তছনছ করার সাহস যুগিয়েছে। তাই বলা যায়, একটি ছবিই ছিল লক্ষ মেশিন গানের সমান।

কামরুল হাসানের জন্ম ১৯২১ সালের ২রা ডিসেম্বর কলিকাতার (দ্র) তিলজলা গোরস্থানের বাড়িতে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ হাশেম এবং মাতা আলিয়া খাতুন। পৈতৃক বাড়ি বর্ধমানের কালনা মহকুমার নারেঙ্গা গ্রামে। শৈশবে গ্রামের মানুষ ও আদিবাসী সাঁওতালদের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল।

ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন বাড়ির কাছেই মডেল স্কুলে। এখানে ছবি আঁকা ও মডেল তৈরির নিয়মিত ক্লাস হত। তবে ছবি আঁকায় হাতেখড়ি তাঁর পিতার কাছেই হয়েছিল।

কলিকাতায় মাদ্রাসায় সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে তিনি ১৯৩৮ সালে ভর্তি হন ক্যালকাটা আর্ট স্কুলে।

www.pathagar.com

কামরুল হাসানের কয়েকটি ড্রইং ও ছবি

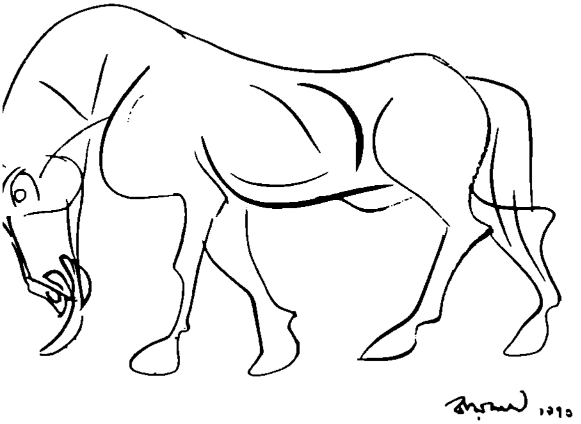

স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্যবহৃত খুনী ইয়াহিয়ার মুখের ছবি দিয়ে আঁকা কামরুল হাসানের ঐতিহাসিক পোস্টার

www.pathagar.com

অভাব–অনটন ও নানাবিধ কারণে পাঁচ বছরের শিক্ষা শেষ করতে লেগে যায় নয় বছর। ১৯৪৭ সালে পাশ করে বের হন। শিক্ষক হিসাবে অনেক নামকরা শিল্পীসহ তরুণ জয়নুল আবেদিনকেও (দ্র) তিনি পেয়েছিলেন, যাঁকে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলতেন—'আমার মাষ্টার মশায়'।

কিশোর বয়সেই কামরুল যোগ দেন ব্রতচারী আন্দোলনে। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে এ আন্দোলনে নিজকে যুক্ত রেখেছিলেন। ব্রতচারী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কামরুল নিজের ভিত তৈরি করেন। কামরুলের মতো এক নিষ্ঠাবান সৈনিক পেয়ে নেতা গুরুসদয় দত্ত প্রীত হন। জারিগান, সারিগান, বাউল সঙ্গীত, ঢাল ও সড়কির লড়াই, লাঠিখেলা (দ্র), রায়বেঁশে নাচ, বাজনার ভিতরে কাঁসি, ঢোল (দ্র), মাদল (দ্র), খমক ইত্যাদির চর্চায় নিজেকে তৈরি করলেন। রায়বেঁশে নাচের বোল ডাক ও হুঙ্কারে, ঢোল ও মাদলে কামরুল ছিলেন এক দক্ষ শিল্পী। আর এভাবেই ব্রতচারী আন্দোলনের প্রভাব তাঁর চিত্রকলাকে লোকজ শিল্প-চেতনায় সমৃদ্ধ করে। একই সময়ে দেশের শিশু-কিশোরদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠন করেন 'মুকুল ফৌজ'। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত 'মুকুল ফৌজের' সর্বাধিনায়ক হিসাবে তিনি সুনাম ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। ব্যায়াম ও শরীরচর্চায়, 'বডি বিল্ডার' প্রতিযোগিতায় সুন্দর দেহ ও স্বাস্থ্যের জন্য 'সি বেঙ্গল' উপাধি ও সনদপত্র লাভ করেছিলেন ১৯৪৫ সালে।

১৯৪৮ সালে ঢাকায় (দ্র) চলে আসেন তিনি। শিল্পী জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে যোগ দেন আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কাজে। পশ্চাৎপদ ও প্রভাবশালী এক শ্রেণীর মানুষের প্রবল বাধা এবং শিল্পীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কামরুল হাসান ও তাঁর সহযোগী শিল্পীরা বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান।

কামরুল হাসান ১৯৬০ সালে যোগ দেন সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থায়। 'ডিজাইন সেন্টার' নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এক দল তরুণ শিল্পী নিয়ে নতুন নতুন নকশা তৈরি করতে থাকেন—বাংলার কুটির শিল্প ও কারুশিল্পের জন্য। আমাদের লোকশিল্পের ধারাকে উজ্জীবিত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তিনি নানারকম পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের ধারা তৈরি করেন। পুতুল, বাস্তুশিল্পের নানারকম নকশা, মাটি (দ্র), বাঁশ (দ্র), বেত, শোলা, কাঠ, খড়, চামড়া, পিতল–কাঁসা ইত্যাদির তৈরি কারুশিল্প, জামদানী ও অন্যান্য তাঁতের শাড়ির জন্য নতুন নতুন নকশা উদ্ভাবন করে তা কারিগর ও শিল্পীদের জন্য ব্যবহারের উপযোগী করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। 'ডিজাইন সেন্টার' এদেশের কারুশিল্পের জন্য নতুন নতুন নকশা তৈরির এক উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৮ সালে ডিজাইন সেন্টার থেকে অবসর গ্রহণ করে নিরলসভাবে প্রতিদিন অসংখ্য ছবি এঁকে গেছেন তিনি।

কামরুল হাসান দেশের অনেক রকম গঠনমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গ্রাফিক ডিজাইন ও বইপুস্তক অলঙ্করণ করে শিল্পকলার এই বিশেষ ক্ষেত্রকে তিনি সমৃদ্ধ করে তোলেন। গ্রাফিক ডিজাইনে আধুনিকতার ছোঁয়া কামরুল হাসানই প্রথম এনে দেন।

সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে। বেশ কিছু চমৎকার ছোটগল্প (দ্র) লিখেছেন। শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে নিবন্ধ লিখেছেন। 'খেরোখাতা' নামে চৌদ্দ খণ্ডের দিনলিপি রেখে গেছেন; সেখানে তাঁর সারা জীবনের নানারকম অভিজ্ঞতা, চিন্তা, শিল্পবোধ, দেশ ও মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে বহুমুখী আলোচনা, ব্যাখ্যা ইত্যাদি আছে। 'খেরোখাতা' গ্রন্থাকারে এখনো বের হয় নি, তবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

খেরোখাতায় কামরুল হাসানের যে হাতের লেখা তা এতই সুন্দর যে সেটাও হস্তলিপির শিল্পকর্ম হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে। খেরোখাতার প্রতিটি পৃষ্ঠা হস্তলিপি, নকশা ও ছবি দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো। তাই খেরোখাতাও তাঁর অন্যান্য শিল্পকর্মের মতো একটি নতুন ও চমকপ্রদ শিল্পসৃষ্টি।

কামরুল হাসান আজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে নেতৃত্বের

www.pathagar.com

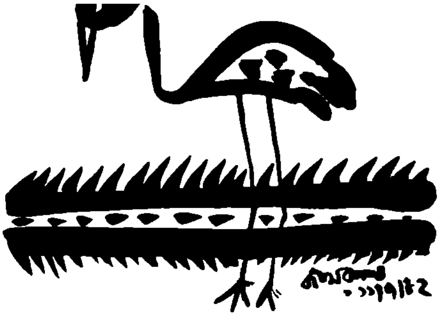

ভূমিকায় কাজ করে গেছেন। জীবনের শেষ দিনেও (১৯৮৮ সালের ২রা ফ্রেব্রুয়ারি) সারা দিন কেটেছে তাঁর স্বৈরাচারবিরোধী দ্বিতীয় কবিতা উৎসবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেছেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এক কবির খাতায় আঁকলেন শেষ ড্রইং এবং লিখলেন 'দেশ আজ এক বিশ্ববেহায়ার খপ্পরে'। তারপর নিজের নামটি লেখার কয়েক মুহূর্ত পরেই হঠাৎ হৃদ্‌রোগে (দ্র) আক্রান্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁর শেষ স্কেচ ও শেষ উক্তিই হয়ে দাঁড়ায় সেই সময়কার স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের এক অমোঘ অস্ত্র।

হা. খা.

কামলা রোগ জণ্ডিস দ্র

কামাখ্যা

হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি তীর্থস্থান। এখানকার দেবীর নাম অনুসারে স্থানটির নামও কামাখ্যা। আসাম প্রদেশের কামরূপ জেলার ঝালুকাবাড়ি থানায় স্থানটি অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদের (দ্র) বাম তীরে নীলাচল পাহাড়ে কামাখ্যা দেবীর মন্দির। হিন্দুরা তাঁদের একান্নটি তীর্থস্থানকে বলে পীঠস্থান। কামাখ্যা এই একান্নটির একটি। পুরাণ মতে, নরকাসুর নামক এক দৈত্যরাজ মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। ১৬৬৫ সালে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ নতুন করে এটি তৈরি করেন।

ঘন অন্ধকারে আবৃত একটি গুহার সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নিচে নেমে পাওয়া যায় কামাখ্যা দেবীর আসন। সামনে জলের ধারা। এই জল নিচে থেকে উঠে এসেছে। এখানে পৌষ ও আষাঢ় মাসে উৎসব হয়। শরৎকালে দুর্গাপূজা, বসন্তে বাসন্তী উৎসব। এখানে আরো কয়েকটি মন্দির আছে। যেমন ভৈরব উমানন্দের মন্দির।

নি. অ.

কামারুজ্জামান, এ. এইচ. এম. [১৯২৬—১৯৭৫]

রাজনীতিক, আইনজীবী ও বাংলাদেশের (দ্র) এককালীন মন্ত্রী। তাঁর পুরো নাম আবু হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান। তিনি ১৯২৬ সালে রাজশাহী (দ্র) শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

কামারুজ্জামান ১৯৪৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে অর্থনীতিশাস্ত্রে অনার্সসহ এম. এ., পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ সালে আইন পাশ করেন।

১৯৪২ সালে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি মুসলিম লীগের (দ্র) রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৬ সাল থেকে আইনজীবী হিসাবে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু হয়। এর অনতিকাল পরে তিনি আওয়ামী লীগে (দ্র) যোগ দেন।

১৯৬৭ সালে তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়ে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে (দ্র) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা গঠিত হলে কামারুজ্জামান তাতে ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রীর পদ লাভ করেন।

স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত কার্যকর মন্ত্রিসভায় তিনি একাধিক বার মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হলে দলীয় নেতৃবৃন্দের অনেকের সঙ্গে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয় এবং ঐ বছরেরই (১৯৭৫) ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকাবস্থায় সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে তিনি নিহত হন।

আ. হু.

www.pathagar.com

কামাল আতাতুর্ক্, মুস্তাফা [১৮৮১—১৯৩৮]

আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা এবং তুরস্ক (দ্র) প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি। দার্দানালেস- আর্মেনীয় যুদ্ধক্ষেত্র ও প্যালেস্টাইনে অসাধারণ রণকৌশলের জন্য তিনি 'পাশা' খেতাব পান। পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) শেষে তুরস্কের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষায় তাঁর ভূমিকাগ্রহণের স্বীকৃতি স্বরূপ কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে 'আতাতুর্ক্' উপাধিতে ভূষিত করে; এর অর্থ 'তুর্ক্দের জনক'। তাঁর আসল নাম ছিল মুস্তাফা কামাল।

১৮৮১ সালে সালোনিকার এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে তিনি সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯০৫ সালে সামরিক শিক্ষাশেষে ডিপ্লোমা নেন।

লিবিয়ার যুদ্ধ (১৯১১-১২), দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ (১৯১৩) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে কুশলতার পরিচয় দেন কামাল পাশা।

তিনি ১৯১৯ সালে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী দল গড়ে তোলেন এবং নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তখন তুরস্কের সুলতান ছিলেন ৬ষ্ঠ মুহম্মদ। কিন্তু তিনি নামেমাত্র সুলতান ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সরকার নিয়ন্ত্রণ করত ইস্তাম্বুলে অবস্থিত মিত্রশক্তি (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের)। কামাল পাশা তুরস্কের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করায় রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত হন।

১৯২২ সালের ১লা নভেম্বর তিনি সুলতানকে সপরিবারে বিতাড়িত করে সুলতানশাহীর বিলোপ ঘটান। ১৯২৩ সালে সুইজারল্যাণ্ডে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার ফলে তুরস্ক পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ফিরে পায়। একই বছর নতুন পার্লামেন্টে সর্বসম্মতিক্রমে তুরস্কের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন কামাল পাশা। ১৯২৭, ১৯৩১ এবং ১৯৩৫ সালে পরপর তিন বার রাষ্ট্রপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন। আমৃত্যু তিনি এই পদেই বহাল ছিলেন।

পনেরো বছরের শাসনামলে (১৯২৩-৩৮) কামাল পাশা দেশের আইনকানুন সংস্কার, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক বিকাশ, তুর্কি ভাষায় আরবি হরফের পরিবর্তে রোমান হরফের প্রচলন, মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করেন। ১৯৩৮ সালের ১০ই নভেম্বর তিনি ইস্তাম্বুলে মৃত্যুবরণ করেন।

আধুনিক তুরস্কের দৃঢ় ভিত্তি তৈরিতে কামাল পাশার ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

টি. কি.

কাম্যু, আল্বের্ [১৯১৩—১৯৬০]

বিখ্যাত অস্তিত্ববাদী ফরাসি সাহিত্যিক কাম্যু (Albert Camus) আলজেরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৩ সালে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করার সময় তিনি বহু ধরনের পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আলজিয়ার্স ফুটবল টিমের গোলরক্ষক হিসাবে তাঁর খেলোয়াড় জীবন। এর পর তিনি প্যারিসে আসেন এবং সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় হিটলারের (দ্র) নাৎসি (দ্র) বাহিনী ফ্রান্স দখল করে নিলে কাম্যু ফরাসি প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং 'কম্ব্যাট' নামের একটি গোপন পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

যুদ্ধের আগে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত নাটক 'কালিগুলা' এবং যুদ্ধ চলাকালে প্রকাশিত তাঁর 'আগন্তুক' উপন্যাস ও 'সিসিফাস পুরাণ' নামের গদ্যগ্রন্থ তাঁকে বিশেষ খ্যাতি এনে দেয়। যুদ্ধশেষে রাজনীতি ত্যাগ করে তিনি পুরোপুরি সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

www.pathagar.com

তাঁর অন্য কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম, ইংরেজি অনুবাদে,— উপন্যাস : 'দ্য স্ট্রেঞ্জার' 'দ্য প্লেগ' , 'দ্য ফল'; 'দ্য রেবেল' (প্রবন্ধ), 'এক্সাইল অ্যাণ্ড কিংডম' (ছোটগল্প) এবং 'ক্রস পারপাসেস' (নাটক)।

১৯৫৭ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

১৯৬০ সালে এক সড়কদুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন।

আ. হু.

কায়কোবাদ [১৮৫৭—১৯৫১]

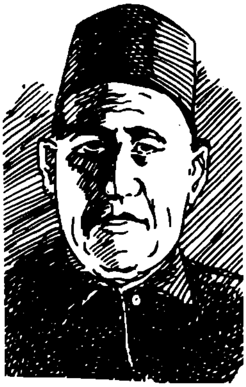

উনিশ শতকের বাংলা মহাকাব্য (দ্র) রচনার ধারায় অন্যতম আদর্শবাদী কবি। 'কায়কোবাদ' তাঁর ছদ্মনাম। শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজকে তার অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর কাব্যসাধনার মূল বৈশিষ্ট্য। তবে তাঁর জীবনদৃষ্টি ছিল অসাম্প্রদায়িক এবং বাংলা কাব্যসাহিত্যের মূল ধারার অনুসারী। কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মুহম্মদ কাজেম আল কোরায়শী। তিনি ১৮৫৭ সালে তৎকালীন বৃহত্তর ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

কায়কোবাদ প্রথমে ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলে ও পরে মাদ্রাসায় এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন করলেও শেষে পরীক্ষা দেন নি। ফলে এখানেই তাঁর শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে। পরে তিনি ডাকবিভাগে চাকরি নেন এবং অনেক দিন পর্যন্ত নিজের জন্মস্থান আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে পোস্টমাস্টার হিসাবে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বিরহ বিলাপ' (১৮৭০), 'কিশোরকালের রচনা ও কুসুম কানন' (১৮৭৩), 'অশ্রুমালা' (১৮৯৫), 'মহাশ্মশান' (১৯০৪), 'শিবমন্দির' (১৯১৭), 'অমিয়ধারা' (১৯২৩), 'শ্মশানভস্ম' (১৯২৪) ও 'মহররম শরীফ' (১৯৩৩) ইত্যাদি।

মহাকাব্যধর্মী কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করার জন্য তিনি 'মহাকবি' আখ্যা লাভ করেন। নিখিল ভারত সাহিত্যসংঘ তাঁকে ১৯২৫ সালে 'কাব্যভূষণ', 'বিদ্যাভূষণ' ও 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৩২ সালে তিনি কলিকাতায় (দ্র) অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের মূল শাখায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

কায়কোবাদ তাঁর 'মহাশ্মশান' কাব্যগ্রন্থের জন্য খ্যাত।

তিনি ১৯৫১ সালের ২১শে জুলাই তারিখে ঢাকায় পরলোকগমন করেন।

আ. হু.

কারাতে (Karate)

কারাতে একটি জাপানি শব্দ। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে কারা (=খালি) + তে (=হাত), অর্থাৎ খালি হাতে আত্মরক্ষা চর্চা। এরই অপর নাম 'কুং-ফু' (দ্র)। শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য পুরানো চীনা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাদের মন্দিরে এর চর্চা করতেন। পরে কারাতের জনক ফোনাকেশি গিচিন জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপে প্রথম আধুনিক কারাতের গোড়াপত্তন করেন, যা বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। কারাতে চর্চার দ্বারা মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে। আর এই জন্যই এই চর্চার অপর নাম 'সুস্থ জীবনযাপনের পন্থা'।

১৯৬৮ সালে জুডো (দ্র) ফেডারেশনের সহায়তায় বাংলাদেশে (দ্র) কারাতের প্রচলন ঘটে। ড্রাগন কারাতে এসোসিয়েশনের অধীনে বর্তমানে কারাতে শিক্ষার জন্য ৪০টিরও বেশি শাখা রয়েছে। এদের মধ্যে নিয়মিত প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। ১৯৮২ সাল থেকে জাতীয় কারাতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই প্রতিযোগিতা ওজনের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ কারাতে দল বিদেশে বেশ কয়েক বার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। মস্কোতে (দ্র) ১৯৭৯ সালে, জাকার্তায় দক্ষিণ এশীয় চ্যাম্পিয়ানশিপে ১৯৮১ সালে, মায়ানমারে (দ্র) ১৯৮৪ সালে, শ্রীলঙ্কাতে (দ্র)

www.pathagar.com

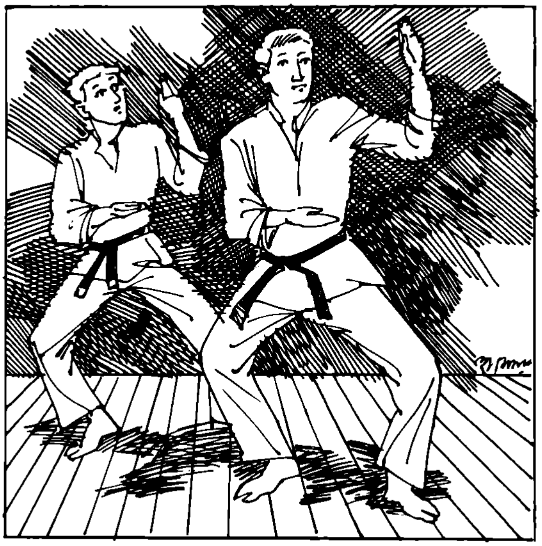

১৯৮৬ সালে, ১৯৮৭ সালে কুয়েতে ও নেপালে (দ্র), ১৯৮৮ সালে সিরিয়ায়, এবং ১৯৯০ সালে বেইজিংয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বহু পদক ও ডিপ্লোমা পেয়ে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছে।

কা. আ. আ.

কারামত আলী জৌনপুরী, মওলানা [আনু. ১৮০০—১৮৭৩]

বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ও ধর্মসংস্কারক। জন্ম আনুমানিক ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে, ভারতের জৌনপুরে। এজন্য তাঁর নামের শেষে জৌনপুরী পদবিটি ব্যবহৃত হয়।

বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিতগণের নিকট তিনি ইসলামের বিভিন্ন শাখায় প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করেন। তিনি বিশিষ্ট ধর্মসংস্কারক ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী মওলানা সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ২০-২২ বছর বয়সে। তবে তিনি গুরুর মতো কোনো সক্রিয় সংগ্রামে বা ইংরেজবিরোধিতায় লিপ্ত হন নি। তিনি মূলত তাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োজিত করেন ইসলাম (দ্র) প্রচার ও মুসলমানদের মধ্যকার নানাবিধ কুসংস্কার, অনাচার ও ধর্মবিরোধী তৎপরতা ও কার্যাবলি দূরীভূত করার কাজে। এ কাজে তিনি বাংলা ও আসামের বহু স্থানে শিষ্য-সাগরিদসহ ভ্রমণ করেন এবং জনগণকে ইসলামের পথে আহ্বান জানান। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকও রচনা করেন।

১৮৭৩ সালের ৩০শে মে তাঁর মৃত্যু হয়। রংপুর শহরে তাঁর মাজার অবস্থিত।

মু. মা.

কার্জন, লর্ড [১৮৫৯—১৯২৫]

কার্জনের (Lord Curzon) জন্ম ১৮৫৯ সালের ১১ই জানুয়ারি, ইংল্যাণ্ডের এক জমিদার বংশে। লেখাপড়া করেন অক্সফোর্ডে। পররাষ্ট্রসচিব হিসাবে চাকুরিজীবন শুরু করেন ১৮৯১ সালে। ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত ঘুরে বেড়ান মধ্য-এশিয়ায়। তিনটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেন এই সময়ে : 'রাশিয়া ইন সেন্ট্রাল এশিয়া' (১৮৮৯)', 'পার্সিয়া এণ্ড দ্য পার্সিয়ান কোশ্চেন' (১৮৯২) এবং 'দ্য প্রবলেম্স্ অব ফার ইস্ট' (১৮৯৪)।

১৮৯৯ সালের ৬ই জানুয়ারি কার্জন ভারতের (দ্র) গভর্নর জেনারেল বা বড়লাট নিযুক্ত হন। তিনি ভারত সরকারের নতুন বাণিজ্য বিভাগ সৃষ্টি করেন, পুলিশ বিভাগের সংস্কার করেন এবং পুরাকীর্তি উদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য প্রত্নতত্ত্ববিভাগ গঠন করেন। শিক্ষার উন্নতির জন্য ১৯০৪ সালে 'দ্য ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংস্কার সাধান করেন।

লর্ড কার্জনের লক্ষ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি। এই উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে নতুন একটি প্রদেশ গঠন করেন। তিনি তিব্বত পর্যন্ত ব্রিটিশ সৈন্য পাঠিয়েছিলেন।

কার্জন ১৯০৫ সালের ৬ই জুলাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ ভাগ করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে আরেকটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এই বিভাগনীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু হলে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ (দ্র) রদ করতে হয়।

কার্জনের আমলেই ভারতের রাজধানী কলিকাতা (দ্র) থেকে দিল্লি (দ্র)-তে স্থানান্তরিত হয়।

www.pathagar.com

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন স্বদেশে ফিরে যান। ১৯০৭ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। ১৯১৫ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। ১৯২৫ সালের ২০শে মার্চ লণ্ডনে (দ্র) তাঁর মৃত্যু হয়।

আ. ই.

কার্টুন (cartoon)

যে চিত্রকর্মের মাধ্যমে কোনো চরিত্র, ঘটনা বা সামাজিক অবস্থাকে ব্যঙ্গ করা হয়, তাকে আমরা কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র বলি। শুধু নিছক হাস্যরস সৃষ্টি নয়, কার্টুন চেষ্টা করে অন্যায়, অসঙ্গতি ও বিভিন্ন দুর্বলতাকে এমনভাবে তুলে ধরতে, যা দর্শককে হাসাবার সঙ্গে ভাবিয়েও তুলবে এবং তার চিত্তে একটা জ্বালা ধরিয়ে দেবে। কার্টুনের দুই প্রধান বিভাগ হল রাজনৈতিক কার্টুন ও সামাজিক কার্টুন।

রাজনীতিবিদদের অসাধুতা, ছলনা, লোভ, মিথ্যাচার এবং সমাজজীবনে বিরাজমান নানা বিচ্যুতি ও বিশৃঙ্খলা (যেমন নারী-নির্যাতন, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, চোরাকারবারি, ছিনতাই, রাহাজানি, সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, যানজট, সড়ক দুর্ঘটনা, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য) প্রভৃতি অজস্র বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে এখন প্রায় প্রতিনিয়ত নানা রকম কার্টুন অঙ্কিত হচ্ছে। ক্যারিকেচারের মতো কার্টুনেও সচেতনভাবে আতিশয্য একটি আঙ্গিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিলেতের ব্যঙ্গধর্মী পত্রিকা 'পাঞ্চ' (Punch) -এর রাজনৈতিক কার্টুনগুলি এক সময় বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন

সার্ক ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের বিফলতা বিষয়ে শিশির ভট্টাচার্যের কার্টুন

www.pathagar.com

রনবীর একটি কার্টুন

শিশির ভট্টাচার্যের কার্টুন

করেছিল। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে (দ্র) রনবী তথা শিল্পী রফিকুন নবী কার্টুনিস্টরূপে খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন।

ক. চৌ.

কার্তিক

কার্তিক এক জন দেবতা। নামটি আসলে কার্তিকেয়। এর অর্থ কৃত্তিকার সন্তান। কার্তিকের জন্মের পর ছয় জন কৃত্তিকা নামের মাতৃকা (অর্থাৎ শক্তির দেবী) কার্তিককে শৈশবে পালন করেন বলে এই দেবতার নাম হয় কার্তিকেয়। সংক্ষেপে বলা হয় কার্তিক।

কার্তিকের জন্ম ও বাবা-মার পরিচয় নিয়ে পুরাণে নানা কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। শিব (দ্র) বা অগ্নি বা রুদ্র তাঁর বাবা। তাঁর মা হিসাবে স্বাহা, গঙ্গা ও পার্বতীর নাম পাওয়া যায়। কার্তিকের চেহারা খুব সুন্দর। তিনি তেজ ও শক্তির জন্য বিখ্যাত। তিনি অনেক বড় যোদ্ধা। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তাঁর বীরত্ব স্বীকার করে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে দেবতাদের সেনাপতি পদে বরণ করে নিয়েছিলেন। তিনি তারকাসুর, বাণাসুরসহ বেশ কয়েক জন অসুর বা দৈত্যকে হত্যা করেছিলেন। একটি মতে তিনি চিরকুমার। অন্য মতে তিনি দেবসেনাকে বিয়ে করেছিলেন। কার্তিকের বাহন ময়ূর।

কার্তিকের ছ'টি মুখ। তাই তাঁর এক নাম ষড়ানন। তাঁর আরো অনেক নাম আছে। যেমন—স্কন্দ, কুমার, জয়ন্ত, বিশাখ, মহাসেন, সুব্রহ্মণ্য, সনৎকুমার, গুহ ইত্যাদি। আবার সূর্যের সঙ্গেও কার্তিক সম্পর্কিত। ভবিষ্যপুরাণে তিনি সূর্যের অনুচর। বৌদ্ধ (দ্র) ও জৈন (দ্র) পুরাণ এবং পালি সাহিত্যেও কার্তিকের উল্লেখ আছে।

কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে ঘটা করে কার্তিক-পূজা করা হয়। 'কার্তিক ষষ্ঠী' বা 'কুমার ষষ্ঠী' নামে লৌকিক ব্রতও পালন করা হয়। দক্ষিণ ভারতে কার্তিকের অনেকগুলো মন্দির রয়েছে।

নি. অ.

কার্বন (carbon)

একটি অধাতব মৌলিক পদার্থ। এর রাসায়নিক প্রতীক C। পারমাণবিক সংখ্যা ৬, ভর (দ্র) ১২.০১১। প্রাচুর্যের দিক থেকে বিশ্বে কার্বনের স্থান ষষ্ঠ। নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে তাপীয় নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় (হাইড্রোজেন দহন প্রক্রিয়ায়) কার্বনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূপৃষ্ঠে মৌলিক ও যৌগিক দু' ভাবেই কার্বন পাওয়া যায়। ওজনের অনুপাতে ভূত্বকের প্রায় ০.২% কার্বন। পৃথিবীতে (দ্র) কার্বনের সবচেয়ে বিশুদ্ধ রূপ হীরক (দ্র) ও গ্রাফাইট (দ্র)। এর অপেক্ষাকৃত অবিশুদ্ধ রূপ খনিজ কয়লা (দ্র), কোক (দ্র), কাঠকয়লা, ভুসাকালি। এ ছাড়া বায়ুমণ্ডলের বাতাসে (দ্র) অক্সিজেন (দ্র) যৌগ হিসাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) রূপে, পানিতে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড, বিভিন্ন কার্বনেট,

www.pathagar.com

যেমন চুনাপাথর (দ্র), মার্বেলপাথর হিসাবে, প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে কার্বোহাইড্রেট (দ্র) রূপে এবং ভূগর্ভে হাইড্রোকার্বন (দ্র) (ইথেন, মিথেন, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস) রূপে কার্বন যৌগিক অবস্থায় থাকে। মানুষের তৈরি বিভিন্ন প্রকার জৈব যৌগ অ্যালকোহল (দ্র), জৈব অ্যাসিড বেনজিন, টলুইন, পলিথিন (দ্র), প্লাস্টিক (দ্র), পলিয়েস্টার (দ্র) ইত্যাদি পলিমারসমূহের প্রধান উপাদান কার্বন।

কার্বনের পরমাণুসমূহ বিভিন্নভাবে সজ্জিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে অণু গঠন করে। তাই প্রকৃতিতে বিভিন্ন রূপে কার্বন পাওয়া যায়। পদার্থের এই ধর্মকে বলে 'বহুরূপতা' এবং মৌলটিকে বলে 'বহুরূপী'। কার্বন একটি বহুরূপী মৌল। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি বহুরূপী মৌল আছে। রূপভেদ অনুযায়ী কার্বনের ধর্মের বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন হীরক সবচেয়ে কঠিন পদার্থ, বিদ্যুৎ-অপরিবাহী, স্বচ্ছ। গ্রাফাইট নরম, বিদ্যুৎ-পরিবাহী, পিচ্ছিল এবং অস্বচ্ছ ধূসর বর্ণের। গ্রাফাইট ভিন্ন কার্বনের গলনাঙ্ক ৩৫৫০° সেলসিয়াস। স্ফুটনাঙ্ক ৪৮২৭° সেলসিয়াস। গ্রাফাইট গলে না, ৩৩৭০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সরাসরি কঠিন থেকে বাষ্পে পরিণত হয়। হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.১ থেকে ৩.৫, গ্রাফাইটের ১.৯ থেকে ২.৩। অন্যান্য কার্বন ১.৮ থেকে ২.১ এর মধ্যে।

স. রা.

কার্বন ডাই-অক্সাইড (carbon dioxide)

বর্ণহীন গ্যাস (দ্র)। রাসায়নিক সংকেত CO_2। এর আণবিক ভর (দ্র) ৪৪। বায়ুর (দ্র) চেয়ে ভারি। বায়ুমণ্ডলের (দ্র) প্রায় ০.০৪% কার্বন ডাই-অক্সাইড। বায়ুমণ্ডলের চেয়ে বারিমণ্ডলে (সমুদ্রের পানিতে) ৫০ গুণ বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে। জোসেফ ব্ল্যাক (Joseph Black : ১৭২৮-১৭৯৯) নামে স্কটল্যাণ্ডের এক জন বিজ্ঞানী ১৭৫৬ সালে এই গ্যাস আবিষ্কার করেন।

সকল প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ নিঃশ্বাসের সঙ্গে CO_2 গ্যাস ত্যাগ করে যা বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয়। এক জন বয়স্ক মানুষের নিঃশ্বাসে ৫% CO_2 নির্গত হয়। যখন কোনো জীব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় অথবা জ্বালানির দহন হয়, তখন কার্বন (দ্র) ও অক্সিজেনের (দ্র) সংযোগে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়।

CO_2 নিজে জ্বলে না, দহনে সাহায্য করে না। এজন্য আগুন নেভানোর কাজে এই গ্যাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি পানি (দ্র)-তে সহজে দ্রবণীয়। উচ্চচাপে পানিতে CO_2 গ্যাস দ্রবীভূত করে সোডাওয়াটার, লেমনেড প্রভৃতি ঠাণ্ডা পানীয় প্রস্তুত করা হয়। কেক, রুটি ও বিস্কুট তৈরিতে ঈস্ট (দ্র) ব্যবহৃত হয়। এ থেকে CO_2 উৎপন্ন হয় এবং রুটি, কেক, বিস্কুটকে ফসফসে করে। এই গ্যাস—৭৮.৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সরাসরি কঠিন আকার ধারণ করে। একে ড্রাই আইস (দ্র) অর্থাৎ শুষ্ক বরফ বলে। ড্রাই আইসকে গরম করলে সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয়। আইসক্রিম (দ্র) বহনকারী গাড়িতে ড্রাই আইস ব্যবহৃত হয়। এটি উত্তম হিমায়ক (দ্র)।

উদ্ভিদ (দ্র) সূর্য (দ্র) থেকে আলো (দ্র), মাটি (দ্র) থেকে পানি এবং বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে আলোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গ্লুকোজ (দ্র) বা শর্করা প্রস্তুত করে। এভাবে গাছের খাদ্য প্রস্তুত হয়। এই খাদ্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী গ্রহণ করে।

বাতাসের (দ্র) CO_2 সূর্যতাপ শোষণ করে। এতে পৃথিবী (দ্র) উত্তপ্ত হয়। CO_2 না থাকলে পৃথিবী শীতল হয়ে যেত। ইদানীং বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বায়ুমণ্ডল বেশি উত্তপ্ত হচ্ছে, পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একে বিজ্ঞানীরা গ্রিনহাউস (দ্র) প্রতিক্রিয়া নামে অভিহিত করেন। পৃথিবীর উত্তাপ এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

স. রা.

কার্বন মনক্সাইড (carbon monoxide)

কার্বন (দ্র) ও অক্সিজেন (দ্র) দ্বারা গঠিত যৌগ। রাসায়নিক সংকেত CO। আণবিক ভর (দ্র) ২৮। বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন এবং তীব্র বিষাক্ত গ্যাস (দ্র)। ফরাসি রসায়নবিদ দ্য লাসন্ (J. F. de Lassone) ১৭৭৬ সালে সর্বপ্রথম এই গ্যাস প্রস্তুত করেন। ১৮০০ সালে ব্রিটিশ রসায়নবিদ উইলিয়াম ক্রুইডশ্যাঙ্ক (William Cruidshank) এর উপাদান শনাক্ত করেন।

ত্রুটিপূর্ণ চুলা, স্টোভ, বার্নার বা যেখানে জ্বালানির (দ্র)

www.pathagar.com

দহনে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাব হয়, সেখানেই কার্বন মনক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস বায়ুদূষণ (দ্র) ঘটায়। সিগারেটের (দ্র) ধোঁয়ায় খুব সামান্য পরিমাণে CO থাকে। এই সামান্য পরিমাণ গ্যাসই হৃদ্‌রোগের (দ্র) কারণ হয়। বিশেষ করে হৃদ্‌রোগীদের জন্য এই গ্যাস অত্যন্ত মারাত্মক। CO গ্যাস রক্তে প্রবেশ করে হিমোগ্লোবিনের (দ্র) কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়, ফলে রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। অক্সিজেনের অভাবে মানুষ দ্রুত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এ থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় CO গ্যাস উৎপন্ন হতে না দেওয়া। আর এর জন্য দরকার পর্যাপ্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জ্বালানির দহন, বদ্ধ ঘরে চুলা জ্বালানো বা বদ্ধ গ্যারেজে গাড়ির ইঞ্জিন চালানো থেকে বিরত থাকা।

কার্বন মনক্সাইড জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোল গ্যাস এবং পানি গ্যাসে CO থাকে। ধাতু নিষ্কাশনে (লোহা [দ্র] ও ইস্পাত [দ্র] প্রস্তুতে) ও বিশুদ্ধীকরণে CO ব্যবহৃত হয়।

স. রা.

কার্বুরেটর (carburettor)

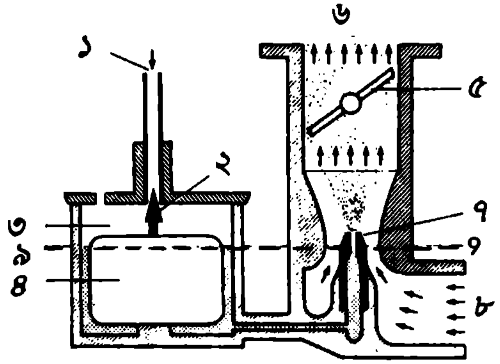

কার্বুরেটর-এর কার্যপদ্ধতি :
১. পেট্রোল প্রবেশপথ ২. ভাসমান কাঁটা ৩. ফ্লোট আধার ৪. ফ্লোট ৫. থ্রট্‌ল্ ভাল্‌ভ্ ৬. মিশ্রণ সিলিণ্ডারে ঢুকছে ৭. জেট ৮. বাতাস প্রবেশপথ ৯. পেট্রোল মাত্রা

এটি পেট্রোল ইঞ্জিনের একটি অংশ, যার কাজ হল পেট্রোল আর বাতাসের (দ্র) একটি দাহ্য মিশ্রণ তৈরি করে দেওয়া। ভাল দহনের জন্য বাতাসের অক্সিজেন (দ্র) জ্বালানির (দ্র) সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে থাকা প্রয়োজন। কার্বুরেটরে ক্ষুদ্র পেট্রোলবিন্দু আর বাতাস একত্রে কুয়াশার মতো একটি দাহ্য মিশ্রণ সৃষ্টি করে। কার্বুরেটরে মূল অংশ মোটামুটি একটি নলের মতো। এর এক প্রান্ত দিয়ে বাতাস প্রবেশ করে। প্রবেশের সময় একটি ফিল্টার বা ছাঁকনির মাধ্যমে বাতাস থেকে ধূলাবালি সরিয়ে ফেলা হয়। নলটির মাঝামাঝি একটা জায়গা হঠাৎ একেবারে সরু হয়ে আবার প্রশস্ত হয়। কার্বুরেটরে সংযুক্ত একটি পেট্রোল-আধার থেকে পেট্রোল ঐ সরু অংশে ঢুকতে পারে। বার্নুলির নীতি (Bernoulli's principle) অনুসারে বাতাস যখন নলের সরু অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তার গতিবেগ বাড়ে এবং চাপ কমে। ফলে পেট্রোল–আধারের অধিকতর চাপের কারণে পেট্রোল কার্বুরেটরের নলের অংশে ঢোকে এবং ক্ষুদ্র বিন্দুতে বিভক্ত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায় অনেকটা সুগন্ধ দ্রব্য স্প্রে করার পদ্ধতিতে।

এই মিশ্রণ নলের অন্য প্রান্ত দিয়ে ইঞ্জিনের বিভিন্ন সিলিণ্ডারে চলে যায় দহনের জন্য। যাওয়ার পথে এটি থ্রট্‌ল্ ভাল্ভ নামক একটি কপাটের মধ্য দিয়ে যায়।

ইঞ্জিনের চালক বাইরে থেকে এটি নিয়ন্ত্রণ করে কম বা বেশি জ্বালানি যেতে দিতে পারেন। ঐ জ্বালানি–মিশ্রণ সিলিণ্ডারে যত বেশি পরিমাণে যাবে, ইঞ্জিনের গতিবেগ তত বাড়বে। সব রকম গতিবেগে ইঞ্জিনকে মসৃণভাবে চলতে দিতে হলে পেট্রোলের ওজনের চেয়ে অন্তত ১৫ গুণ বেশি ওজনের বাতাস এর সঙ্গে মেশা চাই। কার্বুরেটরে সেরকম ব্যবস্থাই থাকে। তবে শুরুতে চালু করার সময় ইঞ্জিন যদি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা থাকে, সে ক্ষেত্রে মিশ্রণের মধ্যে বাতাসের তুলনায় পেট্রোল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে ভাল হয়।

www.pathagar.com

কার্বুরেটর নলে ঢোকার পথেই চোক্ ভাল্ব নামে একটি কপাট নিয়ন্ত্রণ করে বেশি বা কম বাতাস এতে ঢোকানো যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোক্ ভাল্বটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

মু. ই.

কার্বোহাইড্রেট (carbohydrate)

জৈব যৌগের একটি বিশাল শ্রেণী হল কার্বোহাইড্রেট। কেবল কার্বন (দ্র), হাইড্রোজেন (দ্র) এবং অক্সিজেন (দ্র) অণু (নির্দিষ্ট অনুপাতে) রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে কার্বোহাইড্রেট গঠন করে। এদের সাধারণ সঙ্কেত $C_x(H_2O)_y$।

কার্বোহাইড্রেট আমাদের জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্বসনপ্রক্রিয়ায় সমস্ত প্রাণিজগৎ যে শক্তি পায় তার উৎস কার্বোহাইড্রেট। চিনি (দ্র), ভাত, রুটি, ডাল, সবজি, তরকারি আমাদের প্রধান খাদ্য। সুতি-বস্ত্র আমাদের পরিধেয়। কাগজ (দ্র) আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহন। এগুলো সবই কার্বোহাইড্রেট, বা কার্বোহাইড্রেট থেকে উৎপন্ন।

কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—চিনি এবং অ-চিনি। চিনি দুই শ্রেণীর: ১. এককশর্করা জাতীয় (monosaccharides)—গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$); ফ্রুক্টোজ ($C_6H_{12}O_6$)। ২. দ্বিশর্করা জাতীয় (disaccharides)— ইক্ষুচিনি ($C_{12}H_{22}O_{11}$); সুক্রোজ ($C_{12}H_{22}O_{11}$); ল্যাক্টোজ ($C_{12}H_{22}O_{11}$) ইত্যাদি। অ-চিনি বা বহুশর্করা (polysaccharides) কার্বোহাইড্রেট দুই ধরনের : শ্বেতসার $(C_6H_{12}O_6)_n$ ও সেলুলোজ $(C_6H_{10}O_5)_n$। এরা লম্বা শৃঙ্খলাবদ্ধ জটিল যৌগ। বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেটের আণবিক সঙ্কেত সদৃশ হলেও এদের গঠনসঙ্কেতের মধ্যে তারতম্য থাকে।

উদ্ভিদের (দ্র) পাতায় সালোকসংশ্লেষণপ্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। সুক্রোজ সরল চিনি, যা আমরা সাধারণ চিনি হিসাবে খাই এবং আখ বা বীট থেকে উৎপন্ন হয়। ফ্রুক্টোজ ফলের মধ্যে এবং ল্যাক্টোজ দুধের মধ্যে পাওয়া যায়। শ্বেতসার জাতীয় যৌগ হল গম (দ্র), আলু (দ্র), ভুট্টা (দ্র), যব, চাউল ইত্যাদির অণু। সেলুলোজ উদ্ভিদ কোষপ্রাচীরের উপাদান—ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত অণু। এগুলো উদ্ভিদের আঁশযুক্ত কোষকলা (দ্র) তৈরি করে। উদ্ভিদের প্রধান আঙ্গিক উপাদান। তাই উদ্ভিদ শক্ত হয় এবং এ থেকে সুতা, কাগজ ইত্যাদি তৈরি করা যায়। খাদ্যের মধ্যে সেলুলোজ থাকে। কিন্তু এগুলো আমরা হজম করতে পারি না। কোনো কোনো তৃণভোজী প্রাণী (যেমন গরু, ঘোড়া) ও কীটপতঙ্গ (যেমন উইপোকা) সেলুলোজ হজম করতে পারে। এদের পাকস্থলী (দ্র)-তে বিশেষ ধরনের ব্যাক্টেরিয়া (দ্র) বা প্রোটোজোয়া (দ্র) থাকায় এটি সম্ভব হয়।

স. রা.

কার্ল্ মার্ক্স মার্ক্স, কার্ল্ দ্র

কালপুরুষ মণ্ডল

আকাশের (দ্র) কালপুরুষ বা অরায়ন (Orion)-মণ্ডল কতিপয় তারার সমষ্টি। এই তারাগুলো দিয়ে আকাশে মহাবীর কালপুরুষের একটি চিত্র কল্পনা করা হয়েছে : তার এক হাতে রয়েছে গদা, অন্য হাতে সিংহের চামড়া, কোমরবন্ধনীতে তরবারি ঝোলানো, সঙ্গে রয়েছে একটি শিকারি কুকুর। রামায়ণের (দ্র) উত্তরকাণ্ডে কালপুরুষ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই একে আদমসুরত হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের (দ্র) পরপরই রয়েছে কালপুরুষ বা অরায়নমণ্ডলের তারাগুলো। এই মণ্ডলের তারাগুলো দিয়ে সহজেই এক জন মানুষের আকৃতি কল্পনা করা যায়। তাই যুগে যুগে দেশে দেশে এই মণ্ডলটিকে মানুষের আকৃতিতেই কল্পনা করা হয়েছে। কালপুরুষ মণ্ডলটিকে শীতকালের আকাশে, বিশেষ করে অক্টোবর মাস থেকে দেখতে পাওয়া যায়। ডিসেম্বর মাসে সন্ধ্যার ঠিক পরপরই পূর্ব-আকাশে এই মণ্ডলটি উদয় হয়। সারা রাত ধরে ক্রমশ পশ্চিম দিকে তা এগিয়ে যায়। এপ্রিল মাসে সন্ধ্যার দিকে তাকে পশ্চিম

www.pathagar.com

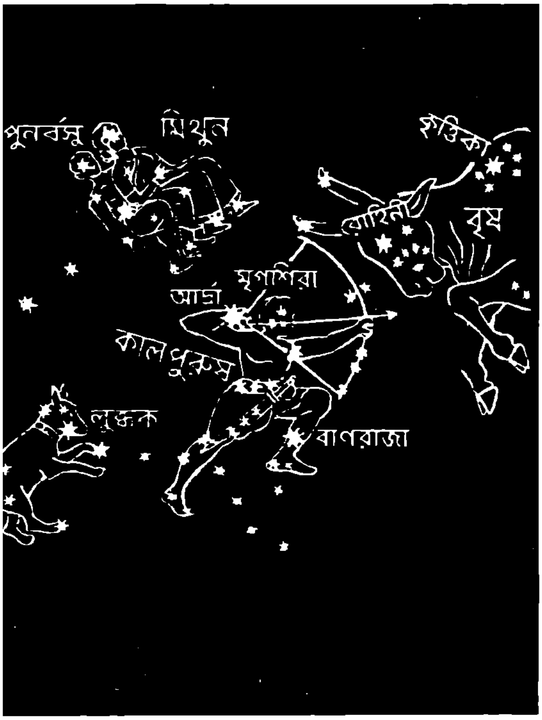

অনেক তারার মাঝে 'কালপুরুষ মণ্ডল'-কে দেখা যাচ্ছে

আকাশে ডুবতে দেখা যায়। এর পর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তাকে আর রাতের আকাশে দেখা যায় না।

আকাশের মাঝামাঝি দিগন্ত থেকে প্রায় ৭০ ডিগ্রি উত্তরে একই রকম উজ্জ্বল তিনটি তারা একই সরল রেখায় অবস্থিত। এই সরল রেখাটি উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্ব-দক্ষিণে আড়াআড়িভাবে বিস্তৃত। আকাশের অন্য কোথাও একই রকম উজ্জ্বল তিনটি তারাকে এরকম একই সরল রেখায় আর দেখা যায় না। এই তিনটি তারাকে চেনা গেলে কালপুরুষ মণ্ডল চেনাও সহজ হয়ে যায়। কালপুরুষ মণ্ডলের ঠিক মধ্যখানে অবস্থিত একই সরলরেখায় পূর্বোক্ত তিনটি তারা। এগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে কালপুরুষের কোমরবন্ধনী। এর কিছুটা উত্তরে বেশ উজ্জ্বল দুটো তারা রয়েছে। এ দুটো তারা দিয়ে তৈরি হয়েছে কালপুরুষের কাঁধ। কাঁধের তারা দু'টির মাঝখান দিয়ে আরো খানিকটা উত্তরে খুব ছোট ছোট কয়েকটি তারা রয়েছে। ত্রিভুজাকৃতির অনুজ্জ্বল বা মিটমিট করা এই তারাগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে কালপুরুষের মাথা। কোমরবন্ধনীর তিনটি তারা থেকে অনেকটা দক্ষিণে দু'টি বেশ উজ্জ্বল তারা রয়েছে। এ দু'টি তারা কালপুরুষের পা নির্দেশ করছে। পশ্চিমের তারাটি খুব উজ্জ্বল। এটি বাম পায়ের গোড়ালিতে অবস্থিত। পূর্বদিকের অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল তারাটি ডান পায়ের ঊরুতে অবস্থিত। কোমরবন্ধনীর তিন তারা এবং ডান পায়ের ঊরুর তারার মাঝখানে খুব অস্পষ্ট আরো তিনটি তারা রয়েছে। এই তারাগুলো দিয়ে কোমরবন্ধনীর সঙ্গে ঝোলানো তরবারি কল্পনা করা হয়েছে। মিশরীয় (দ্র), অ্যাসেরীয় (দ্র), গ্রিক (দ্র) ইত্যাদি প্রায় সকল সভ্যতাতেই এই মণ্ডলটিকে নিয়ে নানা ধরনের উপাখ্যান প্রচলিত ছিল।

ফ. মা.

কালবৈশাখী (nor'-wester)

মার্চ-এপ্রিল মাস বাংলাদেশের (দ্র) উষ্ণতম মাস। এই সময়ে বায়ুর (দ্র) উষ্ণতা বঙ্গোপসাগর (দ্র) থেকে দেশের অভ্যন্তরের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে কোনো এলাকার উষ্ণতা হঠাৎ অত্যন্ত বেশি হয়ে আঞ্চলিক ঘূর্ণিঝড়ের (দ্র) পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ফলে চারপাশের শীতল বায়ু তীব্র বেগে ঐ স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। এই শীতল বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে আসে। ফলে ঐ এলাকায় ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাতও হয়। এটিকে কালবৈশাখী বা কালবোশেখি বলে। বজ্র ও বৃষ্টিপাতসহ এই কালবৈশাখী ঝড় বাংলাদেশের এক-পঞ্চমাংশ বৃষ্টিপাতের জন্য দায়ী। প্রতি বছর কালবৈশাখী বাংলাদেশে জান ও মালের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে, যদিও এই ঝড় তীব্র দাবদাহের পর বর্ষা মৌসুমের আগমনী বার্তা বয়ে আনে। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল এরূপ একটি ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূল এলাকার লক্ষাধিক লোক মারা যায় এবং সম্পদের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়।

মু. হা.

www.pathagar.com

কালবৈশাখী ঝড়

কালমেঘ

কালমেঘ একটি ভেষজ উদ্ভিদ। বাংলাদেশের (দ্র) সকল অঞ্চলেই এই গাছ জন্মে থাকে। বিশেষ করে পতিত জমিতেই এই গাছ বেশি দেখা যায়। এরা অযত্নেই বাড়ে। সাধারণ মানুষের কাছে এর বিশেষ কদর নেই। এর পাতা, কাণ্ড, ফল, ফুল সব কিছুরই স্বাদ তেতো। সে জন্য গরু-ছাগলও এই উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে পছন্দ করে না।

কালমেঘ বর্ষজীবী উদ্ভিদ (দ্র), অর্থাৎ এর আয়ু মাত্র এক বছর। এটি উচ্চতায় আধ মিটারের মতো। এর মূল, কাণ্ড ও শাখা দেখতে চার কোণা আকৃতির। মূল, কাণ্ড, পাতা সবই নরম। পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের। শাখায় পাতারা পরস্পরের বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় থাকে। পাতার গোড়া ও মূল কাণ্ডের মিলনস্থল থেকে সাদা রঙের ছোট ছোট ফুল বের হয়। ফুল পরে ফলে পরিণত হয়। ফলের ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ জন্মায়। ফল ফেটে বীজ ছড়িয়ে পড়ে। পরে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়।

কালমেঘের টাটকা পাতার রস মিছরির সঙ্গে সেবন করলে কৃমির (দ্র) উৎপাত, যকৃতের (দ্র) রোগ ও দূষিত জ্বরে সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদ (দ্র) মতে উদরাময় (দ্র), পেট ফাঁপা, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও রক্তামাশয় রোগেও এই গাছের রস খাওয়ানো হয়। গাছ ও পাতার রস এক চামচ পরিমাণ সকাল-বিকাল দু'বেলা খেতে হয়।

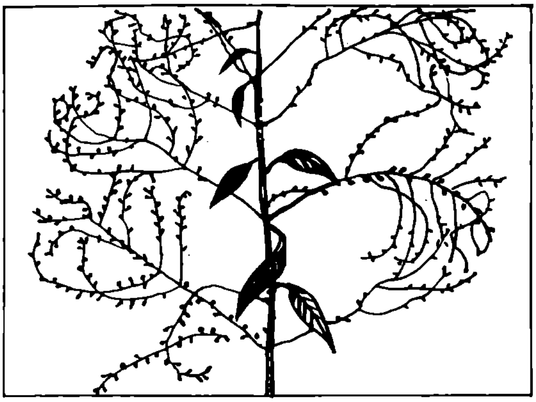

কালমেঘ

এইভাবে সাত দিন খেলে রোগীর রোগমুক্তি ঘটে। এই গাছের নির্যাস বর্তমানে অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি (দ্র) চিকিৎসায়ও ব্যবহার করা হচ্ছে।

ত. চ.

www.pathagar.com

কালাজ্বর (kala-azar)

কালাজ্বর প্রধানত উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকার রোগ (দ্র)। লিশমেনিয়া ডনোভানি *(Leishmania donovani)* নামক পরজীবী এই রোগের কারণ। পরজীবীবাহী ফ্লেবোটোমাস (phlebotomus) জাতের মাছির দংশনে এই রোগ বিস্তারলাভ করে। কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগীর মল, মূত্র এবং নাসিকায় নিঃসরণের মাধ্যমে সুস্থ শরীরে কালাজ্বরের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। কালাজ্বরে আক্রান্ত কুকুর (দ্র), শেয়াল এবং অন্যান্য প্রাণীর কামড়েও মানবদেহে কালাজ্বরের বিস্তার ঘটতে দেখা যায়।

এই রোগের প্রধান লক্ষণ জ্বর; সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান রক্তাল্পতা (দ্র)। তা ছাড়া এই রোগে রোগীর প্লীহা (দ্র) ও যকৃতের (দ্র) আকার বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসা না করানো হলে রক্তাল্পতা, ওজন হ্রাস ও অন্যান্য উপসর্গে রোগীর মৃত্যু ঘটে। কালাজ্বরের চিকিৎসায় সোডিয়াম স্টিবো-গ্লুকোনেট (Sodium stibo-gluconate) জাতীয় ঔষধ ব্যবহৃত হয়। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (দ্র) প্রথম কালাজ্বরের ঔষধ (দ্র) ইউরিয়া স্টিবামিন ইঞ্জেকশন আবিষ্কার করেন।

সি. না. হ.

কালাপানি দ্বীপান্তর দ্র

কালাপাহাড়

কালাপাহাড় সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব রয়েছে। তবু কালাপাহাড় নামটি বহুল পরিচিত। তাঁর সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তা হচ্ছে, বাংলার নবাব সুলেমান কুররানী ও তাঁর পুত্র দাউদ কুররানীর সেনাপতি ছিলেন কালাপাহাড়। তিনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন এবং তিনি দেবমন্দির ধ্বংস করতেন। তাঁর প্রকৃত নাম কী তা সঠিকভাবে জানা যায় না। রাজু হতে পারে, রামচন্দ্রও হতে পারে। জাতিতে পাঠান মুসলমান কিনা তাও অজানা। কেউ কেউ বলেন, তিনি হিন্দু ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ। তিনি ১৫৬৮ সালে পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেন বলে অনেক ঐতিহাসিক জানিয়েছেন। অনেকের মতে, রাজশাহীর (দ্র) নয়ানচাঁদ ভাদুড়ীর পুত্র ছিলেন কালাপাহাড়। গৌড়ের নবাব বরবাক শাহের ফৌজদার ছিলেন কালাপাহাড়। আবার এসব মত সত্য নয় বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

কালাপাহাড় বহুল উচ্চারিত একটি নাম। এই নামে একের অধিক সেনাপতির কথা জানা যায়। এক নামের আড়ালে নানা জনের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত মিলেমিশে গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু এই নামটির একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা তৈরি হয়ে গেছে, সেটি জানা প্রয়োজন। একটি অর্থ—প্রচলিত সংস্কার যে নষ্ট করতে চায়। আরেকটি অর্থ পাওয়া যায়—কালাপাহাড় এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এক জন প্রচণ্ড বিধর্মদ্বেষীতে রূপান্তরিত হন।

কোনো লোকের চরিত্রজ্ঞাপক শব্দ হিসাবে বাংলা ভাষায় 'কালাপাহাড়' শব্দটি এখন ব্যবহৃত হয়। অপরাজেয় বীর বা অত্যন্ত সাহসী অথচ মমতাহীন, প্রচলিত মত বা আচরণের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন ও প্রবলভাবে আত্মবিশ্বাসী, যে কোনো নিয়মের তোয়াক্কা করে না—এমন গুণাগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা 'কালাপাহাড়' বলে থাকি। আর এমন মানুষের ক্রিয়াকলাপকে বলি 'কালাপাহাড়ী' কাণ্ডকারখানা।

আ. হা.

কালিদাস

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অত্যন্ত খ্যাতিমান কবি ও নাট্যকার। বাল্মীকি (দ্র) ও বেদব্যাসের (দ্র) পরেই তাঁর স্থান। কিন্তু তাঁর জীবন ও আবির্ভাবকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এ কালের গভীর গবেষণা এবং তাঁর রচনাবলির সাক্ষ্য অর্থাৎ তাঁর রচনাবলিতে বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও দৃশ্য, খাদ্য, আচার-রীতি থেকে ধারণা করা হয় যে তিনি ছিলেন বাঙালি। তাঁর 'কালিদাস' নামও এই মতের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কারণ অবাঙালি সমাজে এই নাম নেই। তাঁর জন্মস্থান নিয়েও বিতর্ক আছে। অনেকের ধারণা, তাঁর জন্ম মালবে। আবার কারো মতে, তিনি বাংলাদেশের (দ্র) উত্তরাঞ্চলের কোনো জায়গার মানুষ। সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁর জন্ম হয় এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি মারা যান। খ্রিস্টীয় ৬৩৪ শতকের আইহোলি শিলালিপিতে কালিদাসের খ্যাতির উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

কালিদাসকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তিও প্রচলিত আছে। জানা যায়, বাল্যকালে অনাথ হয়ে পড়লে গো-পালকেরাই কালিদাসকে লালনপালন করে। ফলে তাঁর বিদ্যার্জনের সুযোগ ঘটে নি। কিন্তু ঘটনাচক্রে এক বিদূষী রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দুর্বিনীতা রাজকন্যাকে শিক্ষা দেবার জন্য মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা এই বিবাহ স্থির করেন। বিবাহের পর কালিদাসের মূর্খতার কথা জেনে রাজকন্যা মর্মাহত হন। কিন্তু তিনি কালিদাসকে কালিকাদেবীর (শ্রীদুর্গা) আরাধনা করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। দেবী কালিদাসের আরাধনায় প্রসন্ন হন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করেন। এর পর কালিদাস লেখাপড়া শিখে বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য (দ্র), অলঙ্কার, ছন্দ (দ্র), ব্যাকরণ, দর্শনতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মধ্যে অভিনব কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে। পরবর্তী কালে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যসাধনা করেন। কথিত আছে যে, কালিদাস উজ্জয়িনীর সম্রাট বিক্রমাদিত্যের (দ্র) সভার নবরত্নের অন্যতম ছিলেন।

কালিদাসের নামে সংস্কৃত ভাষায় বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। কিন্তু গবেষকদের মতে সব গ্রন্থ এক কালিদাসের লেখা নয়। এই নামে আরো দু' জন কবি ছিলেন বলে তাঁদের ধারণা। মহাকবি কালিদাস বলে যিনি খ্যাত, তাঁর গ্রন্থসংখ্যা প্রায় এক শ'। এগুলোর মধ্যে 'রঘুবংশম্', 'কুমারসম্ভবম্' মহাকাব্য, ছোট কাহিনীকাব্য 'মেঘদূতম্' এবং 'ঋতুসংহার' খণ্ডকাব্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' ও বিক্রমোবর্শী' নামে তিনটি নাটক রচনা করেন। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটক কালিদাসের শ্রেষ্ঠকীর্তি রূপে বিবেচিত হয়। তাঁর 'মেঘদূতম্' কাহিনীকাব্যটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। মেঘের মাধ্যমে বিরহিণী প্রিয়ার কাছে এক নির্বাসিত যক্ষের বার্তাপ্রেরণ 'মেঘদূতম্' কাব্যের বিষয়বস্তু। 'পূর্বমেঘ' ও 'উত্তরমেঘ' এই দুই অংশে কাব্যটি বিভক্ত। কালিদাসের পরবর্তী অনেক কবি মেঘদূতের অনুকরণে বহু কাব্য রচনা করেন। মূল 'মেঘদূতম্' কাব্যটি বাংলা ভাষাতেও (দ্র) অনেকে অনুবাদ করেছেন।

কালিদাসের সমগ্র রচনায় প্রাচীন ভারতের এক অভিজাত ও সংস্কৃতিমান সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি সংস্কৃত ভাষাকে সমৃদ্ধ করে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যে প্রায় ৩০টি বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ ব্যবহার করেছেন। শিল্পরূপময়তা, অর্থের গভীরতা ও কল্পনার ব্যাপকতা তাঁর সকল রচনাকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে। অসাধারণ কবিপ্রতিভার জন্য কালিদাসকে হোমার (দ্র), ভার্জিল (দ্র), দান্তে (দ্র), গোয়েটে (দ্র), শেক্সপীয়র (দ্র) প্রমুখ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

সুজ. ব.

কালী

শক্তিদেবীর দশটি প্রধান রূপ। এই দশটি রূপকে দশমহাবিদ্যাও বলা হয়। এই দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা কালীদেবী। কালী অসামান্য শক্তির অধিকারী। শক্তিউপাসকেরা কালীকে আদ্যাশক্তি বা আদিশক্তি রূপে পূজা করে। কালী দেবীর অনেক রূপ। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন এবং দুর্বলকে সহায়তা করেন, সৃষ্টিকে কলুষমুক্ত করেন। তাঁর শান্ত ও উগ্র রূপের বর্ণনা

www.pathagar.com

বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর বিভিন্ন নামের মধ্যে রূপ ও গুণের পরিচয় মেলে, যেমন—সিদ্ধকালী, ভদ্রকালী, গুহ্যকালী, শ্মশানকালী, ব্রহ্মাকালী, মহাকালী, চামুণ্ডাকালী, দক্ষিণাকালী প্রভৃতি।

তাঁর চারটি হাত। প্রত্যেক হাতে আছে অস্ত্র—খট্বাঙ্গ, খড়্গ, চর্ম ও পাশ। গলায় নরমুণ্ড, দেহ বাঘের চামড়ায় আবৃত। তাঁর দীর্ঘ হাত, রক্ত-চক্ষু, বিস্তৃত মুখ ও স্থূল কর্ণ ভীতিপ্রদ। বাহন কবন্ধ (অর্থাৎ মস্তকবিহীন শব)।

বাংলাদেশের (দ্র) নানা স্থানে অগণিত কালীমন্দির, কালীবাড়ি বা কালীতলা আছে, যেমন—ঢাকায় ঢাকেশ্বরী ও সিদ্ধেশ্বরী এবং যশোরে যশোরেশ্বরী অন্যতম। দেশে ওলাওঠা অর্থাৎ কলেরা (দ্র) মহামারীরূপে দেখা দিলে রক্ষাকালী বা শ্মশানকালীর সর্বজনীন পূজার নিয়ম আছে। কার্তিকী অমাবস্যা, জ্যৈষ্ঠ ও মাঘ মাসের অমাবস্যায় কালীদেবীর বিশেষ পূজার নিয়ম আছে। তবে কার্তিকী অমাবস্যা বা দেওয়ালির (দ্র) পূজার মাহাত্ম্য সবচেয়ে বেশি। এই পূজা বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে হয়ে থাকে। কালীর অনেক নাম আছে, তার মধ্যে শ্যামা নামটি প্রসিদ্ধ। শ্যামাকে অবলম্বন করে রচিত শ্যামাসঙ্গীত বাংলা গানের একটি বিশিষ্ট ধারা। এ ছাড়া কালীগান ও কালীকীর্তনেরও প্রচলন আছে।

বি. ব.

কালীঘাট

কলিকাতা (দ্র) শহরে অবস্থিত বিখ্যাত তীর্থস্থান। এখানে সতীর দেহের দক্ষিণ পায়ের আঙুল পড়ে অন্যতম পীঠস্থান হয়। কালীঘাটে দেবী কালী (দ্র) ও শিবের (দ্র) পূজা হয়। শিব বা ভৈরব এখানে নকুলীশ নামে পরিচিত। বাঙালি-অবাঙালি বহু যাত্রীর সমাগম হয় এখানে। বিশেষ করে ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে দেবীদর্শন বেশি পুণ্যজনক ও অবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচিত।

খুব প্রাচীন গ্রন্থে তীর্থ হিসাবে এর নাম পাওয়া যায় না। এটি ১৭-১৮শ শতাব্দীতে তীর্থস্থান বলে পরিচিত হয়ে এখন বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। কালীঘাটের মন্দিরকে

কালীঘাট : প্রাচীন চিত্র

কেন্দ্র করে ১৮-১৯শ শতাব্দীতে দেশজ রীতির পটশিল্প গড়ে ওঠে এবং তা 'কালীঘাটের পট' নামে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।

বি. ব.

কালীপূজা

কালী অন্যতম শক্তির দেবী। পুরাণে আছে দৈত্য শুম্ভ ও নিশুম্ভের কাছে দেবী দুর্গা এক বার হেরে যান। তখন ক্রোধে তাঁর ভেতর থেকে কৌষিকী নামে এক দেবী বেরিয়ে আসেন। দেবীর রঙ তখন কালো হয়ে যায়। কালো বলে নাম হয় কালী। পরে অবশ্য দেবী নিজের পূর্বরূপ ফিরে পান। সিদ্ধকালী, ভদ্রকালী, দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী প্রভৃতি নানা রূপে কালী কল্পিত ও পূজিত। বিজয়া দশমীর (শারদীয়া দুর্গাপূজার দশমী) পরের অমাবস্যায় 'শ্যামাপূজা' নামে কালীপূজা করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী এবং মাঘ মাসে রটন্তী কালীপূজা করা হয়। কালী ভয়ঙ্করী, কিন্তু তা

www.pathagar.com

দুষ্টের কাছে, ভক্তের কাছে তিনি কল্যাণময়ী, তিনি শান্ত। কালীপূজা রাত্রি বেলায় করা হয়।

নি. অ.

কালীপ্রসন্ন ঘোষ [১৮৪১—১৯১০]

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৮৪১ সালের ২৩শে জুলাই ঢাকা জেলার ভরাকরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শিবনাথ ঘোষ। তিনি শৈশবে ফার্সি, সংস্কৃত ও বাংলা শেখেন। দশ বছর বয়সে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ইংরেজি শিক্ষালাভ করেন। তিনি 'মুগ্ধবোধ' 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত' প্রভৃতি গ্রন্থ এন্ট্রান্স ক্লাসে অধ্যয়নকালেই পড়ে শেষ করেন। পড়াশোনার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ থাকায় তিনি কলিকাতায় (দ্র) গমন করেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি পাঠ করেন এবং প্রকৃতঅর্থে বিদ্বান হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয়, তিনি 'অষ্টাধ্যায়ী' নামের পাণিনির ব্যাকরণও পাঠ করেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে বক্তৃতাদান তাঁর জীবনের একটি অন্যতম ঘটনা। এই বক্তৃতা শুনে কলিকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। যাঁরা প্রশংসা করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) ও রেভারেণ্ড ভ্যাল। এর পর তিনি জীবিকা অর্জনে ব্রতী হন। তিনি ঢাকার (দ্র) ছোট আদালতে পেশকার পদে যোগদান করেন। এখানে তিনি দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যেহেতু মেধাবী, পরিশ্রমী ও কর্মকুশলী ছিলেন, সে জন্য ১৮৭৭ সালের মার্চে ভাওয়াল রাজ্যের প্রধান কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি ১৮৭০ সালে 'শুভসাধিনী' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। পত্রিকাটি পূর্ববঙ্গ-ব্রাহ্ম যুবসমাজের মুখপত্র ছিল। তার পর বাংলা ১৮২১ সনে তিনি 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন তিনি। 'বান্ধব' পত্রিকাটি খ্যাতি অর্জন করেছিল। তিনি কবিতাও (দ্র) লিখতেন। তবে তাঁর গদ্য রচনাসমূহ অধিকতর প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি বিদ্যাসাগরের (দ্র) প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করতেন ও তাঁর রীতি, যা বিদ্যাসাগরী রীতি নামে পরিচিতি অর্জন করেছিল, উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। এ জন্য তাঁকে 'পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর' বলে অভিহিত করা হত। তিনি অনেকগুলো ভাষা শিখেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর রচনায় সংস্কৃত ও ইংরেজির ছাপ আছে—ফার্সির ছাপ নেই। তাঁর গদ্য রচনা 'নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব', (১৮৬৯), 'প্রভাতচিন্তা' (১৮৭৭) 'ভ্রান্তিবিলাস' '(১৮৮১)' 'নিভৃতচিন্তা' ('১৮৯৬); ' নিশীথচিন্তা' (১৮৯৬), 'ভক্তির জয়', 'প্রমোদ-লহরী' (১৮৯৫), 'মা না মহাশক্তি' (১৯০৫), 'জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা' (১৯০৫), 'ছায়াদর্শন' (১৯০৫) ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে 'প্রভাতচিন্তা' ও 'নিশীথচিন্তা' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বহুদিন চালু ছিল।

তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। তাঁকে ইংরেজি ও বাংলায় বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে হত। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (দ্র)-এর বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন (১৩০১) এবং এ সংস্থার সহ-সভাপতিও হয়েছিলেন (১৩০৪-১৩০৭)। তিনি বহু সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এসব ছাড়াও তিনি জেলা বোর্ডের সভ্য ও সদর লোকাল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। কৃতিত্বপূর্ণ ও গৌরবময় জীবনের অধিকারী এই ব্যক্তি ১৯১০ সালে ২৯শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হা.

কাশ কুশ ও কাশ দ্র

কাশী

হিন্দুদের একটি প্রাচীন তীর্থ। বিদ্যাচর্চারও স্থান। ভারতের উত্তর প্রদেশে গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে বরুণা ও অসি নদীর মিলনস্থলে এই তীর্থ। তাই এর অপর নাম বারাণসী। ইংরেজেরা বলত বেনারস। পুরাণে আছে, কাশ নামক এক রাজা খ্রিস্টের জন্মের ১২০০ বছর আগে পত্তন করেন এই নগরী। তাঁর নামানুসারে এর নাম হয় কাশী।

www.pathagar.com

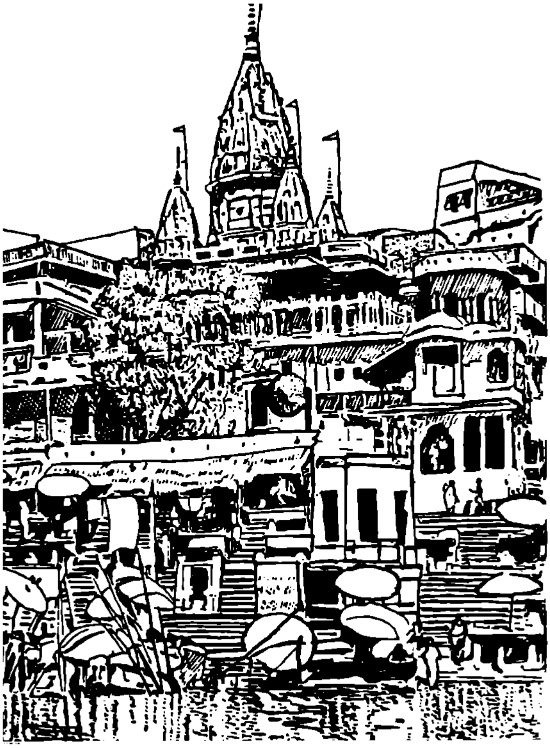

কাশীর দশাশ্বমেধঘাট

কাশীতে অনেক মন্দির রয়েছে। বিশ্বনাথের মন্দির এগুলোর অন্যতম। কাশীতে একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠও রয়েছে। পীঠের দেবীর নাম অন্নপূর্ণা (দ্র)। কাশী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রচর্চারও কেন্দ্র। তুলসী দাস তাঁর 'রামচরিতমানস' এখানকার গঙ্গাতীরে বসে রচনা করেছিলেন। ঐ স্থানের নামকরণ করা হয় তুলসীঘাট। কাশীর 'বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি' বিশ্ববিখ্যাত।

নি. অ.

কাহ্নপাদ

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (দ্র) আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত বাংলা ভাষার (দ্র) আদি রূপ হিসাবে স্বীকৃত হাজার বছরের পুরাতন বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহার বারোটি গীতির রচয়িতা। বৌদ্ধ ধর্ম (দ্র)-সাধনার এসব গান সাধারণত চর্যাপদ/চর্যাগীতি (দ্র) নামে পরিচিত। কাহ্নপাদ ধর্মে বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি কাহ্নপা, কণহপা, কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণাচার্য ও কৃষ্ণবজ্র নামেও পরিচিত।

কাহ্নপাদের জীবনকাল ও জন্মস্থান নিয়ে মতান্তর আছে। ঐতিহাসিক তারানাথের মতে, কাহ্নপাদ ছিলেন বিদ্যানগর বা পার্ণ্ডনগরের অধিবাসী। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, তিনি বিহার বা বাংলাদেশের (দ্র) অধিবাসী ছিলেন। ৮৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৯—৮৪৯) তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর সাধনক্ষেত্র ছিল উত্তরবঙ্গের সোমপুর বিহার (দ্র)। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (দ্র) মতে, পদকর্তা কাহ্নপাদ ছিলেন সপ্তম শতকের মানুষ। আবার কেউ কেউ বলেন, আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর জন্ম।

কাহ্নপাদের রচিত গ্রন্থগুলো হল 'গীতিকা', 'মহাঢুঁঢন', 'বসন্ততিলক', 'অসম্বন্ধ দৃষ্টি', 'বজ্রগীতি', 'দোহাকোষ'। তখনকার দিনে ছন্দ ও লৌকিক উপমা প্রয়োগের সাহায্যে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কবি খুবই কম ছিলেন।

কাহ্নপাদের দু'টি পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা ॥
আসা বহল পাত ফল বাহা ॥

অর্থাৎ মন হল তরু, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তার শাখা, আশা বহুবিধ পত্রের ও ফলের বাহক।

সুজ. ব.

কিউনিফর্ম চিত্রলিপি দ্র

কিং, মার্টিন লুথার [১৯২৯—১৯৬৮]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) দরিদ্র, সুযোগবঞ্চিত ও বর্ণবৈষম্যে নিপীড়িত নিগ্রো সমাজের পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী নেতা মার্টিন লুথার কিং (Martin Luther King, Jr)। ১৯২৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি জর্জিয়ার আটলান্টা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রেভারেণ্ড মাইকেল (পরবর্তী কালে মার্টিন) এবং মাতা আলবার্টা উইলিয়ামস কিং। তাঁর পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ তিন জনই ছিলেন ব্যাপটিস্ট পুরোহিত, মাতা ছিলেন স্কুলশিক্ষিকা।

পিতা-মাতার তিন সন্তানের মধ্যে কিং ছিলেন দ্বিতীয়। তিনি ১৯৪৮ সালে আটলান্টার মোরহাউস কলেজ থেকে

www.pathagar.com

সমাজতত্ত্ব বিষয়ে বি. এ. ডিগ্রি, ১৯৫১ সালে পেন্সিলভেনিয়ার ক্রোজার থিওলোজিক্যাল সেমিনারি থেকে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে ডিগ্রি নিয়ে ১৯৫৫ সালে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে পুরোহিত পদে প্রতিষ্ঠিত ও ১৯৫৪ সালে ২৫ বছর বয়সে অ্যালাবামার মন্টগোমারির ডেক্সটার এভেনিউ ব্যাপটিস্ট চার্চের যাজক নিযুক্ত হন। তখন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদী ঘৃণা ও বৈষম্য ছিল প্রবল।

চার্চের যাজক হওয়ার পর থেকে কিং নিগ্রো সমাজের বৈষম্যমূলক অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন এবং ক্রমে তাদের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। প্রথম জীবনে তিনি ভারতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধীর (দ্র) অহিংস নীতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে গভীরভাবে আলোড়িত হন এবং অহিংস নীতিকেই আন্দোলনের কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৫ সালে বাস সার্ভিসের ক্ষেত্রে নিগ্রোদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে মন্টগোমারিতে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে থাকেন।

নিগ্রোদের অবস্থা দেখার জন্য কিং বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন এবং বক্তৃতাদানের কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে থাকেন। ১৯৫৮ সালে 'স্বাধীনতার দিকে ধাবমান' (Stride Toward Freedom) শিরোনামে একটি বই লেখেন। ১৯৬০ সালে তিনি দক্ষিণাঞ্চলীয় খ্রিস্টান নেতৃ-সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। এর মাধ্যমে তিনি নিগ্রোদের সম-অধিকারের আন্দোলন জোরদার করে তোলেন। নিগ্রোদের ভোটদানের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিভিন্ন শহরে পূর্ণ অসহযোগ, অবস্থান ধর্মঘট ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ অভিযান পরিচালনা করেন। ১৯৬৩ সালের ২৮শে আগস্ট তিনি ওয়াশিংটন যাত্রার (March on Washington) ডাক দেন। এতে তিনি 'আমার স্বপ্ন' (I Have a Dream) শীর্ষক একটি গভীর মানবিক আবেদনময় বক্তৃতা উপস্থাপন করেন।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে আমেরিকার 'টাইম ম্যাগাজিন' কিংকে বছরের সেরা ব্যক্তিত্ব মনোনীত করে। এ বছরই তিনি বিশ্ববিখ্যাত নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৫ বছর। শান্তির জন্য নোবেল

পুরস্কার (দ্র)-প্রাপ্তদের মধ্যে তিনি এখনো সর্বকনিষ্ঠ। পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ (চুয়ান্ন হাজার ডলার) তিনি নিগ্রোদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য দান করেন।

নোবেল পুরস্কার লাভের ৪ বছর পর সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের দাবিতে কিং-এর নেতৃত্বে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের এক ঐতিহাসিক আন্দোলন পরিচালিত হয়। ইতিহাসে এই আন্দোলন 'ফ্রিডম মার্চ' বা স্বাধিকার অভিযান নামে পরিচিত। এর অংশ হিসাবে ধর্মঘট পালনকারী স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের সমর্থন দেবার উদ্দেশ্যে কিং টেনেসি অঙ্গরাষ্ট্রের মেমফিসে যান। সেখানেই ১৯৬৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল তিনি এক হোটেলে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

সুজ. ব.

কিড্‌নি রেচনতন্ত্র দ্র

কিণ্ডারগার্টেন (kindergarten)

শিশুশিক্ষার একটি পদ্ধতিবিশেষ। স্বতঃস্ফূর্ত খেলাধুলা ও সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে সুষ্ঠুভাবে শিশুদের পরিচালনা করাই এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য। আপন প্রবণতা অনুযায়ী বেড়ে ওঠাই শিশুর সহজাত ধর্ম। তাই এই বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় শিশুদের

www.pathagar.com

যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়ে তাদের মানসিক বিকাশ সাধনের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ফ্রিড্‌রিশ্‌ ফ্রোয়েবেল্‌ (Friedrich Froebel : ১৭৮২-১৮৫২) নামে এক জার্মান শিক্ষাবিদ সর্বপ্রথম শিশুদের খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁর মতে, খেলাধুলা শিশুর নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টার প্রাথমিক ধাপ এবং তার ব্যক্তিসত্তা বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রোয়েবেল্‌ ১৮৩৭ সালে জার্মানির ব্লাঙ্কেন্‌বুর্গ্‌-এ পরীক্ষামূলকভাবে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি খেলাধুলার মাধ্যমে ৪ থেকে ৬ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষাদান করতে থাকেন। ১৮৪০ সালে তিনি বিদ্যালয়টির নাম দেন 'কিণ্ডারগার্টেন'। শব্দটি জার্মান, এর অর্থ 'শিশুউদ্যান'। শিশুদের এখানে উদ্যানের বা বাগানের চারাগাছের মতো কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ এই বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমন, যেখানে উদ্যানের গাছের মতোই শিশুরা স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠে।

শিশুরা প্রথমে যাতে কতকগুলো নির্দিষ্ট ধারণা লাভ করতে সমর্থ হয়, তার জন্য ফ্রোয়েবেল্‌ বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী বিভিন্ন আকারের খেলার সামগ্রী বা উপহার উদ্ভাবন করেন। এই উপহারগুলোর সঙ্গে শিশুদের মাটি, বালি, কার্ডবোর্ড প্রভৃতি দেওয়া হত। এর উদ্দেশ্য ছিল দ্রব্যগুলোর আকার পরিবর্তন করে নতুন দ্রব্য তৈরি করার খেলা খেলতে খেলতে শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটানো। শিশুদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলার জন্যও ফ্রোয়েবেল্‌ যৌথ কর্ম এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রবর্তন করেন।

'কিণ্ডারগার্টেন' নামে নবপ্রতিষ্ঠিত শিশুবিদ্যালয়টি ও তার শিক্ষাব্যবস্থা খুব দ্রুত প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার (দ্র) শিক্ষাবিদগণ ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে ওঠেন। ফ্রোয়েবেলের মৃত্যুর পঁচিশ বছরের মধ্যে জার্মানি, যুক্তরাজ্য (দ্র), হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, কানাডা, জাপান (দ্র) ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) প্রধান প্রধান শহরে কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতেও এই ধরনের শিশুবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। এখন শহরের প্রায় প্রতিটি মহল্লায় কিণ্ডারগার্টেন দেখা যায়।

বিংশ শতাব্দীর শিশু-মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতিকে আরো গভীরভাবে কার্যকর করতে সাহায্য করছে। ইতালির মন্তেস্‌সরি (Maria Montessori : ১৮৭০-১৯৫২) প্রমুখ শিক্ষাবিদ আধুনিক কালে ফ্রোয়েবেল্‌পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধন করেছেন।

সুজ. ব.

কিব্‌লা

আভিধানিক অর্থ— দিক। ইসলামী পরিভাষায় অর্থ পবিত্র কাবাঘরের (দ্র) দিক। মুসলমানেরা কাবাঘরের দিকে মুখ করে নামায (দ্র) আদায় করে থাকেন।

জানা যায়, প্রথম হিজরিতে মুসলমানগণ জেরুজালেমে (দ্র) 'বায়তুল মুকাদ্দাস' নামক উপাসনাগৃহের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। তখন এটাই ছিল তাঁদের কিব্‌লা। পরে দ্বিতীয় হিজরিতে তাঁরা কাবাকে কিব্‌লা করে নামায আদায় করা শুরু করেন। এখনো সেই নিয়ম চালু আছে।

মু. মা.

কিয়ামত

আভিধানিক অর্থ মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, মৃত্যুর পর উত্থান। ইসলামী বিশ্বাসমতে, মৃত্যুর পর হাশর (দ্র) বা শেষ বিচারের দিন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক দিন ধ্বংস হয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সমস্ত সৃষ্টি। অতঃপর আল্লাহ্‌ (দ্র) সকল জীবকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং নিজে তাদের কৃতকর্ম অর্থাৎ পৃথিবীতে (দ্র) জীবিত থাকাকালীন পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন। যারা সৎকর্ম করেছে, তারা অনন্ত সুখের আবাস বেহেশ্‌ত্‌ (দ্র) লাভ করবে। আর পাপীরা অনন্ত যন্ত্রণার স্থল দোজখ (দ্র)-বাসী হবে। কিয়ামত-দিবসের উপর বিশ্বাস ঈমানের (দ্র) অপরিহার্য অঙ্গ।

পবিত্র কুরআনের (দ্র) বহু স্থানে 'পুনরুত্থান দিবস' বা কিয়ামত-দিবসের উল্লেখ আছে।

মু. মা.

www.pathagar.com

কিরীটি রায় নীহাররঞ্জন গুপ্ত দ্র
কিলোহার্ট্‌জ্‌ কম্পন / কম্পাঙ্ক দ্র
কিশলয় শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র
কিশোর তারকালোক শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র
কিশোর বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র
কিশোরপত্রিকা শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

কীটনাশক

শস্যক্ষেত্র এবং অন্যত্র অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের (দ্র) বিরুদ্ধে মানুষ বরাবরই সচেষ্ট ছিল। তবে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের (দ্র) বদৌলতে উন্নত ধরনের রাসায়নিক কীটনাশক এসেছে। প্রথম দিকে তামা (দ্র), পারদ (দ্র), সীসা (দ্র), আর্সেনিক ইত্যাদির বিষময় রাসায়নিক লবণই কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হত। উনিশ শতকে প্রাকৃতিক কিছু জৈব যৌগ এবং আধুনিক কালে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত জৈব যৌগই কীটনাশক হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৩৯ সালে ডিডিটির (DDT = *d*ichloro*d*iphenyl*t*richloroethane : ডিক্লোরোডিফেনাইলট্রিক্লোরেথেন) আবিষ্কার ছিল এ দিক থেকে একটি বিরাট পদক্ষেপ। এর অপূর্ব সাফল্য আরো কিছু জৈব যৌগ আবিষ্কারের পথ করে দেয়। এর মধ্যে মেথোক্সিক্লোর, বি এইচ সি, অলড্রিন, ক্লোরডেন, ডিয়েলড্রিন ইত্যাদি অর্গানো-ক্লোরিন জাতীয় কীটনাশক যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েছে। পরে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের প্রতি এদের ক্ষতিকর দিকগুলো উদ্ঘাটিত হলে ডিডিটি এবং অনুরূপ কিছু কীটনাশকের ব্যবহার অনুচিত বলে ঘোষিত হয়। আজকাল অর্গানো-ফসফেট ও কার্বামেট জাতীয় কীটনাশক, যেমন— ফেনিট্রোথিওন, ম্যালাথিয়োন, ডাইমিথোয়েট ইত্যাদি অধিক প্রচলিত রয়েছে।

এসব কীটনাশক আধুনিক কৃষিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে উফশী (দ্র) বা উচ্চ ফলনশীল শস্যের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কীটনাশকের ব্যবহারও বেড়ে গেছে খুবই বেশি। পরিবেশের উপর এর গুরুতর বিরূপ প্রভাব দেখা দিচ্ছে। দেখা গেছে, অনেকগুলো কীটনাশক শুধু অনিষ্টকারী কীটেরই ক্ষতি করছে না, পরিবেশে অনেক দিন টিকে থেকে, খাদ্যশৃঙ্খলের (দ্র) মধ্যে ঢুকে পড়ে এটি অল্পে অল্পে মানুষের

শস্যক্ষেতে কীটনাশক ছড়ানো হচ্ছে

ও অন্য জীবের জীবকোষে জমে উঠছে এবং তাদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেসব কীটপতঙ্গ, পাখি (দ্র), মাছ (দ্র) ইত্যাদি প্রাকৃতিকভাবে অনিষ্টকারী কীট দমন করত, তাদের বিরুদ্ধে কাজ করে রাসায়নিক কীটনাশক নির্দোষ প্রাকৃতিক দমনের পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। অন্য দিকে কীটনাশকের কবল থেকে যেসব অধিক প্রতিরোধী কীট বেঁচে যাচ্ছে, পরবর্তী প্রজন্ম তাদেরই বংশধর হওয়াতে ঐ কীটনাশক তাদেরকে আর কাবু করতে পারছে না, দরকার হচ্ছে আরো বেশি কড়া কীটনাশক। কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীলতা এভাবে বেড়েই চলেছে। তাই এখন রাসায়নিক কীটনাশকের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে কীটদমন, পোকার ফাঁদ ইত্যাদি ব্যবহার, নিম প্রভৃতি নির্দোষ উদ্ভিজ্জ কীটনাশক এবং আধুনিক জৈব প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সমন্বিত কীটদমন ব্যবস্থার উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মু. ই.

কীটপতঙ্গ

কীট অর্থ পোকা, কৃমি। যেমন— জোনাকি (দ্র) পোকা, কৃমিকীট। জোনাকি পোকার পাখা আছে। পাখার সাহায্যে জোনাকি উড়তে পারে। জোনাকি পোকার দেহে পা-ও আছে। কৃমির পা নেই, পাখা নেই। পতঙ্গ মানে পত বা পক্ষ

www.pathagar.com

দ্বারা যে কীট বা পোকা উড়তে পারে। তা হলে কীটপতঙ্গ বলতে বুঝব সেসব পা-যুক্ত কীট বা পোকা যারা পাখায় ভর করে উড়তে পারে। যেমন— প্রজাপতি (দ্র), ফড়িং, জোনাকি, গুটি পোকা, গুবরে পোকা, গাঁধি পোকা, ইত্যাদি। পোকা-মাকড় বলে একটা কথা আছে। মাকড় কীটপতঙ্গের প্রায় সমগোত্রের প্রাণী। কীটপতঙ্গে থাকে তিন জোড়া পা, মাকড়ে চার জোড়া। কীটপতঙ্গ প্রাণিজগতের (দ্র) অমেরুদণ্ডী (দ্র) পর্যায়ের প্রাণী-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কীটপতঙ্গের দেহে মেরুদণ্ড নেই। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক'টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। কীটপতঙ্গ আর্থ্রোপোডা পর্বের অধীন। আর্থ্রো (arthro) অর্থ সন্ধি। পোডা (podos) অর্থ পা। সন্ধিযুক্ত পা যে সকল অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে রয়েছে তারাই আর্থ্রোপোডা বা সন্ধিপদী (joint footed), যেমন—জোনাকি, চিংড়ি, মাকড়সা। সন্ধিপদীদের মধ্যে যাদের দেহ মাথা-বক্ষ-উদরে বিভক্ত এবং বক্ষের পৃষ্ঠভাগে দু'জোড়া পাখা ও অঙ্গে তিন জোড়া পা থাকে এবং যারা পাখায় ভর করে উড়তে পারে, তাদেরকেই ইনসেক্ট বা পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

পৃথিবীতে (দ্র) কীটপতঙ্গের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এ পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ প্রজাতির কীটপতঙ্গের হিসাব পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, অনেক কীটপতঙ্গ এখনো তাঁদের অজানা। কীটপতঙ্গদের দেহের আকার, আকৃতি ও বর্ণ বিচিত্র রকমের। এত ক্ষুদ্র আকৃতির পোকা রয়েছে, যা খালি চোখে দেখা যায় না। কোনো কোনো পোকা আকারে ২০ সেন্টিমিটারও হয়ে থাকে। কীটপতঙ্গের অধিকাংশ স্থলভাগে বাস করে। মিঠা পানিতেও অনেক কীটপতঙ্গ দেখা যায়। সামুদ্রিক কীটপতঙ্গের সংখ্যা খুব কম। কীটপতঙ্গ মানুষের বড় উপকারী বন্ধু। অধিকাংশ উদ্ভিদের (দ্র) ফুলে পরাগসংযোগ ঘটায় কীটপতঙ্গ। পরাগায়ণ না হলে ফসল ফলে না, ফসল না হলে মানুষের আহার জুটবে না। মধু (দ্র), রেশম (দ্র) ইত্যাদিও কীটপতঙ্গের দান। কীটপতঙ্গ মানুষের ক্ষতিও করে। তেলাপোকা (দ্র) গৃহস্থালির অনেক খাবার ও জিনিস নষ্ট করে। আমাদের প্রধান ফসল ধানের ক্ষতি করে মাজরা পোকা। মশা মানুষের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়ায়। অনেক দেশের লোক পোকা, শূককীট ও মূককীট আহার হিসাবে গ্রহণ করে। কীটপতঙ্গ প্রকৃতির এক বড়

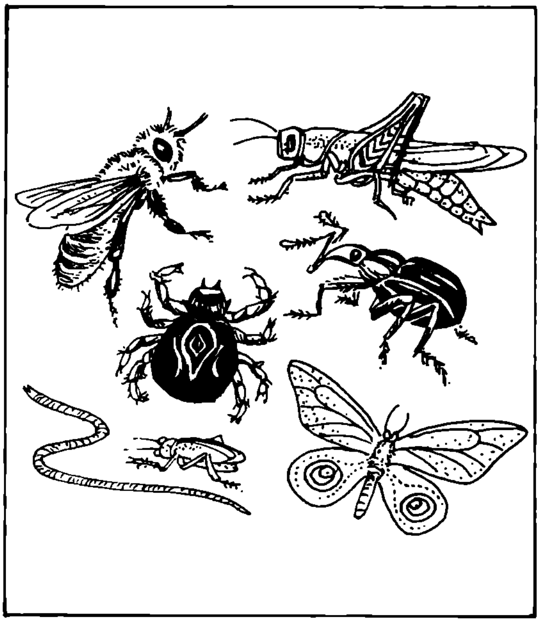

সম্পদ। মানুষের জীবন ও সভ্যতা কীটপতঙ্গের অবদানের উপর বেশ নির্ভরশীল।

ত. চ.

কীট্স্, জন্ [১৭৯৫—১৮২১]

কবি জন্ কীট্সের (John Keats) জন্ম ১৭৯৫ সালে। এক অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। বাবা ছিলেন সরাইখানার অশ্বরক্ষক। আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া তেমন কিছু হয় নি তাঁর। লাতিন ও ইতিহাসশাস্ত্র পাঠ করেছিলেন কিছুটা। ফরাসি ভাষার সামান্য জ্ঞানও ছিল। এক ঔষুধ-প্রস্তুতকারীর কাছে শিক্ষানবিশি আরম্ভ করেছিলেন বালক বয়সে, কিন্তু এটা বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। কীট্স্কে বলা হল সে বরং শল্যচিকিৎসক হবার শিক্ষা নিতে পারে। এ বিষয়ে প্রাথমিক পরীক্ষায় তিনি পাশ করেন, কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর ভেতর সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্যের জন্য এক অদম্য আকর্ষণ। শল্যচিকিৎসার প্রশিক্ষণ তিনি ছেড়ে দিলেন। এর মধ্যে ঘটনাক্রমে তিনি হেজ্লিট্ (William Hazlitt) এবং লে হাণ্টের (Leigh Hunt)ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। এঁদের সূত্র ধরেই

www.pathagar.com

তাঁর সঙ্গে অন্য এক প্রধান কবি পার্সি বিশি শেলির (দ্র.) পরিচয় ঘটে। বন্ধুদের আনুকূল্যেই ১৮১৬ সালে Examiner পত্রিকায় তাঁর সনেট On First Looking Into Chapman's Homer প্রকাশিত হয়। শেলির সহায়তায় ১৮১৭ সালে প্রকাশিত হয় Poems। কবির প্রধান প্রবণতা ও কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এই বইয়ে। কিন্তু বইটি সেকালে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি। পরের বছরটি কবি কীটসের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এই বছর প্রকাশিত হয় তাঁর Endymion; এই কবিতার তীব্র সমালোচনা বেরয় দু'টি সাময়িকীতে। একটিতে বলা হয় কবির উচিত তাঁর তুলো আর ব্যাণ্ডেজের জগতে ফিরে যাওয়া, কবিতার এলাকা তাঁকে মানায় না। এই বছরেই তাঁর ভাই টম যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান এবং অন্য ভাই জর্জ আমেরিকায় (দ্র) চলে যান। কবি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, প্রায়ই জ্বরে ভুগতে থাকেন, যা তাঁকে মৃত্যুর আগে আর রেহাই দেয় নি। জীবনের শেষ দু' বছর কীট্‌সের সাহিত্য-প্রতিভা ঝলসে উঠেছিল। ১৮১৯ সালেই রচিত হয়েছিল তাঁর বিখ্যাত কবিতাসমূহ : The Eve of St. Agnes: La Belle Dame sans Merci; Ode on a Grecian Urn; Ode to a Nightingale; Ode to Autumn; Ode on Melancholy; Ode to Psyche প্রভৃতি। ১৮১৯ সালেই তিনি ফ্যানি ব্রন (Fanny Brawne) নাম্নী এক মহিলার প্রেমে পড়েন। কিন্তু তাঁর শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছে। তিনি বুঝতে পারছেন, মৃত্যু সমাগত। তাই নির্লিপ্ত ভাষায় ফ্যানিকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ১৮২০ সালে তাঁর Lamia and other Poems এবং Isabella প্রকাশিত হয়। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে কবির থুথুতে রক্ত দেখে তিনি তাঁর শেষটা বুঝতে পেরেছিলেন নিজেই। ফ্যানির শুশ্রূষা ছেড়ে চলে গেলেন ইতালিতে। ১৮২১ সালে রোমে তিনি

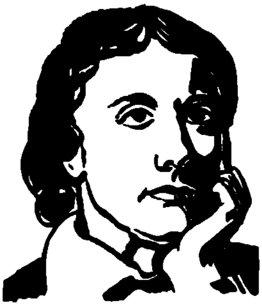

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ. আহ.

কীর্তন

ঈশ্বর, দেব-দেবী, অবতার বা মহাপুরুষের প্রশস্তিমূলক গান উচ্চৈঃস্বরে গাইলে তাকে কীর্তন বলা হয়। কীর্তন দু' প্রকার—নামকীর্তন ও পদকীর্তন। ঈশ্বর, দেব-দেবী, অবতার বা মহাপুরুষের নামবাচক কয়েকটি শব্দ সুর ও তালসহ উচ্চৈঃস্বরে গাইলে তাকে বলা হয় নামকীর্তন। তাঁদের প্রশস্তিতে পদ বা গান রচনা করে গাইলে তাকে বলা হয় পদকীর্তন।

বাংলায় কীর্তন বলতে একটি বৈশিষ্ট্যময় সঙ্গীতপদ্ধতিকে বোঝায়। এই পদ্ধতিতে গাওয়া পদসমষ্টিকে বলা হয় পদাবলী কীর্তন। রাধা-কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য-এর জীবনকাহিনী অবলম্বনে পদাবলী (দ্র) রচিত। একে বৈষ্ণব পদাবলীও (দ্র) বলা হয়। কেননা বৈষ্ণব ধর্মের অঙ্গ হিসাবে এই সব পদ রচিত ও গীত হয়। দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগের কবি জয়দেব পদাবলী কীর্তন ধারার সূচনা করেন। বিদ্যাপতি (দ্র) ও বড়ু চণ্ডীদাসের (দ্র) রচনায় সেই ধারার প্রসার ঘটে। তবে শ্রীচৈতন্য (দ্র) কীর্তনকে ব্যাপকভাবে গেয় বিষয়ে পরিণত করেন। কীর্তন ছিল তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের স্তম্ভ বিশেষ। তাঁকেই কীর্তনের জনক বলা হয়। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে রাজশাহীর (দ্র) নরোত্তম ঠাকুর (১৫৩১-১৫৮৭) পদাবলী কীর্তনের জন্য একটি রীতিসম্মত গাইবার ধারা চালু করেন। তিনি ১৫৮৩ সালে রাজশাহীতে আহূত এক বৈষ্ণব সম্মেলনে তাঁর গীতরীতি উপস্থাপন করলে সকলে তা অনুমোদন করেন। নরোত্তমের কীর্তনরীতির নাম হয় 'গরানহাটি কীর্তন'। এর দৃষ্টান্তে আরো চারটি প্রধান কীর্তনরীতির বিকাশ হয়। এদের নাম মনোহরশাহি, রেনেটি, মন্দারিণী, ঝাড়খণ্ডী। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত পদাবলী কীর্তন রচনার ধারা অব্যাহত থাকে।

সঙ্গীতগুণে ও কাব্যগুণে পদাবলী কীর্তন বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছে। এর ভিতর দিয়ে বাঙালির নিজস্ব সঙ্গীতচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের সকল উল্লেখযোগ্য বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতার কর্মে কীর্তনের প্রভাব পড়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র)

www.pathagar.com

বহু সংখ্যক কীর্তন পদ রচনা করেন। কীর্তনের সঙ্গীতের ঢঙকেও নানাভাবে তাঁর গানে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

ক. গো.

কুইট ইণ্ডিয়া আগস্ট আন্দোলন দ্র

কুইনিন (quinine)

কুইনিন ম্যালেরিয়া (দ্র) পরজীবীর বিরুদ্ধে কার্যকর ঔষধ (দ্র)। সিন্‌কোনা (cinchona) গাছের বাকল থেকে সংগৃহীত এক ধরনের উপক্ষার বা অ্যালকালয়েডের নাম কুইনিন। ১৮২০ সালে পেল্‌তিয়ে (Pierre Joseph Pelletier : ১৭৮৮-১৮৪২) ও বিন্যামে কাভঁতু (Joseph Bienaimé Caventou : ১৭৯৫-১৮৭৭) নামে দু'জন ফরাসি বিজ্ঞানী সিন্‌কোনা গাছের বাকল থেকে প্রথম কুইনিন সংগ্রহ করেন। ১৯৪৪ সালে উডওয়ার্ড (Robert Burns Woodward : ১৯১৭-১৯৭৯) ও ডোয়েরিং নামে দু'জন বিজ্ঞানী গবেষণাগারে রাসায়নিক উপায়ে কুইনিন সংশ্লেষণ করেন।

কুইনিনের স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত। ম্যালেরিয়ার জীবাণু-নাশক হিসাবে ম্যালেরিয়ার ঔষধ তৈরিতে এবং এ রোগ প্রতিরোধে কুইনিন বহুল ব্যবহৃত। এ ছাড়া জ্বর ও বেদনানাশক ক্রিয়াও কুইনিনের রয়েছে। কুইনিন-চিকিৎসার দ্বারা কখনো কখনো ম্যালেরিয়ার স্থায়ী নিরাময় সম্ভব হয় না বলে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে কুইনিনজাত বিভিন্ন সংশ্লেষিত ঔষধ ব্যবহৃত হচ্ছে।

সি. না. হ.

কুও ভাদিস্ (Quo Vadis)

পোল্যাণ্ডের নোবেল পুরস্কার (দ্র)-প্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক হেন্‌রিক্ সিঙ্কেভিচ্ (Henryk Sienkiewicz : ১৮৪৬—১৯১৬) রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'কুও ভাদিস্' শব্দটি লাতিন, এর অর্থ —তুমি কোথায় যাচ্ছ ? নৃশংস ও প্রায়-উন্মাদ সম্রাট নিরোর (দ্র) রাজত্বকালে রোম নগরী ও প্রথম দিকের নব্য খ্রিস্টানদের রাজরোষে নিহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে সিঙ্কেভিচ্ তাঁর কাহিনী নির্মাণ করেছেন।

এই উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক উভয়কেই বিশ্ববাসীর নিকটে আরও বেশি পরিচিত করেছে।

হা. মা.

কুওমিণ্টাং (Kuomintang)

চীনের (দ্র) জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল। ১৮৯১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান্ ইয়াৎ-সেন্ (দ্র)-এর উদ্যোগে। এই দলের লক্ষ্য ছিল সামাজিক সংস্কারসাধন ও একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ১৯১১ সালে প্রথম চীনা বিপ্লব (দ্র) সংঘটনে কুওমিণ্টাং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিপ্লবের মাধ্যমেই চীনের মাটি থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধিত হয়।

দলটির উদ্যোগে দ্বিতীয় বিপ্লব পরিচালিত হয় ১৯১২ সালে প্রতিক্রিয়াশীল সমরনেতা ইউয়ান শি কাইয়ের বিরুদ্ধে। ১৯৩০ সালে দক্ষিণ চীনের ওপর এই দলটি তার প্রাধান্য বিস্তার করে এবং ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানি হামলার বিরুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (দ্র) সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে গড়ে তোলে চীনা জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধ।

কুওমিণ্টাং ১৯২৮ সালের ১০ই অক্টোবর একটি কার্যকর সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৯৩১ সালের মে মাসে গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিক সংবিধান। ১৯৪৮ সাল নাগাদ কমিউনিস্ট পার্টি চীনের মুখ্য পার্টিতে পরিণত হয় এবং সান্ ইয়াৎ-সেন্-এর দুর্নীতিবাজ ও কট্টর কমিউনিস্ট-বিরোধী উত্তরাধিকারী চিয়াং কাই শেক্ (দ্র)-কে মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে চীনকে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এর পর থেকে কুওমিণ্টাং দলের কার্যকলাপ মার্কিন সাহায্যের ওপর নির্ভর করে কেবল ফরমোজা দ্বীপকে কেন্দ্র করে সীমিত হয়ে পড়ে।

আ. হ.

কুং-ফু (kung-fu)

খালি হাতে আত্মরক্ষার সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হল কুং-ফু। পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন দেশে কুং-ফু বিভিন্ন নামে পরিচিত। জন্মস্থান চীন (দ্র) থেকে আশেপাশের বৌদ্ধ

www.pathagar.com

ধর্মাবলম্বী দেশগুলোয় কুং-ফু ছড়িয়ে পড়ে। জাপানে (দ্র) 'জুডো' (দ্র) ও 'কারাতে' (দ্র), চীনে 'উশু', কোরিয়ায় 'তায়েকেণ্ডু' এবং বার্মায় (দ্র) এর নাম 'বানেদো' —সবই আদি কুং-ফুর রকমফের অর্থাৎ পরিবর্ধন, পরিবর্জন, পরিমার্জন ইত্যাদি।

কুং-ফুর উৎপত্তি দুই হাজার বছর পূর্বে। উৎপত্তিস্থল চীন। চীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ, বৌদ্ধদের ধর্ম অহিংসা বলে শত্রুর কবলে পড়লেও শত্রুকে হত্যা না করে নিজেকে বাঁচানোই প্রধান লক্ষ্য হয়। চীনের অধিবাসীরা তাই খালি হাতে আত্মরক্ষা করত। এজন্য আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবিত হতে থাকে।

চীনের পশ্চিমাংশের হান্ (Han) রাজবংশের রাজত্বকালে (খ্রি. পূ. ২২০–খ্রি.পূ. ২৫) হুয়া টু নামের এক ডাক্তার বাঘ, হরিণ, ভালুক, বাঁদর এবং পাখিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে কিছু ব্যায়াম উদ্ভাবন করেন। পরবর্তী সময়ে তাং (Tang) রাজবংশের সময়ে (খ্রি. পূ. ৯০৭-৬১৮) এই ব্যায়ামগুলোকে উন্নতিসাধনের মধ্য দিয়ে কুং-ফুতে পরিণত করা হয়।

সেই সময় রাজকর্মচারী কিংবা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হলে কুং-ফুর কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হত। এভাবেই আবির্ভূত হতে থাকেন দক্ষ 'কুং-ফু মাস্টার'।

বর্তমানে চীনের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা কুং-ফু। চীনে উৎপত্তিলাভ করলেও বর্তমানে কুং-ফু পৃথিবীর অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক খেলা হিসাবেও কুং-ফু স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে একটি চীনা কুং-ফু দলের প্রদর্শনী খেলার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৪৯ সালে চীনে প্রথম কুং-ফুর প্রতিযোগিতামূলক খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

কুং-ফু খেলার মোট ৮টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। এগুলো হল : ১. চাংকুয়ান্, ২. নান্‌কুয়ান্, ৩. আইজিকুয়ান্, ৪. বড় তলোয়ার, ৫. ছোট তলোয়ার, ৬. লাঠি খেলা, ৭. বর্শা খেলা এবং ৮. সান্দা।

এতে বিচারক থাকেন মোট ৬ জন। এক জন থাকেন প্রধান বিচারক। তাঁর নির্দেশে পাঁচ জন বিচারক নম্বর প্রদান

করেন। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন নম্বর বাদ দিয়ে বাকি ৩টি নম্বরের গড় করা হয় এবং সেটাই হল প্রতিযোগীর প্রাপ্ত নম্বর।

বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও (দ্র) কুং-ফু জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সারা দেশে গড়ে উঠেছে কুং-ফু শেখানোর অনেক স্কুল।

টি. কি.

কুক, জেম্‌স্ [১৭২৮—১৭৭৯]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান ইংরেজ অভিযাত্রী ও নাবিক। প্রশান্ত মহাসাগরে (দ্র) তিন পর্ব অভিযান পরিচালনার মধ্য দিয়ে নিউজিল্যাণ্ড, পূর্ব-অস্ট্রেলীয় উপকূলাঞ্চল ও হাওয়াই দ্বীপ আবিষ্কার করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

জেম্‌স্ কুক (James Cook) ১৭২৮ সালের ২৭শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি বেশ কয়েক বার বাল্টিক সাগর ভ্রমণ করেন। ১৭৫৫ সালে তিনি ব্রিটিশ নৌবিভাগে (Royal Navy) যোগ দেন। কর্মজীবনে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে তিনি ১৭৬৭ সালে লেফটেন্যান্ট ও পরে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন।

১৭৬৮ থেকে ১৭৭১ সালে কুক এনডেভার (Endeavour) নামক জাহাজে (দ্র) পৃথিবী (দ্র) প্রদক্ষিণ করেন এবং নিউজিল্যাণ্ড ও পূর্ব-অস্ট্রেলীয় উপকূলাঞ্চল আবিষ্কার

www.pathagar.com

করেন। এ সময় তিনি ৩,২০০ কিমি অস্ট্রেলীয় উপকূল জরিপ করে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউগিনির মধ্যবর্তী জলপথের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

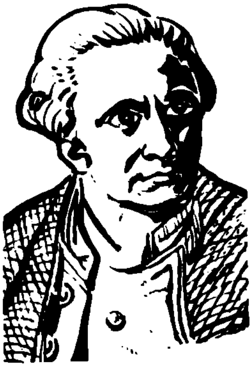

১৭৭২ থেকে ১৭৭৫ সালে তিনি রিজলিউশন (Resolution) ও অ্যাডভেঞ্চার (Adventure) নামক দু'টি জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর ও নিউ হেব্রাইডিস (New Hebrides) ভ্রমণ করে নিউ ক্যালেডোনিয়া (New Caledonia)এবং নর্ফোক (Norfolk) আবিষ্কার করেন। এই অভিযানে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অ্যান্টার্কটিকা (দ্র) মহাদেশের (দ্র) অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিলেন।

১৭৭৬ সালের ১২ই জুলাই কুক 'রিজলিউশন' নামের জাহাজটি নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমে পথ অনুসন্ধানের অভিযান শুরু করেন। ১৭৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি ক্রিসমাস দ্বীপ এবং হাওয়াই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। এ সময় তিনি উত্তর আমেরিকার (দ্র) মধ্য দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে (দ্র) যাওয়ার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের চেষ্টা চালান। কিন্তু তাঁর জাহাজ মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি হাওয়াই দ্বীপে ফিরে আসেন। এখানে স্থানীয় লোকদের এক উপদলীয় দাঙ্গায় ১৭৭৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তিনি নিহত হন।

জেম্স্ কুক তাঁর অভিযানের মাধ্যমে হাজার হাজার মাইল উপকূল জরিপ করেন এবং ছক তৈরি করেন। তাঁর এসব তথ্যাবলি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অনেক রহস্যের অবসান ঘটিয়েছে। পরবর্তী কালে মানচিত্র (দ্র) অঙ্কনেও তাঁর তথ্যাবলি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তিনিই সমুদ্রযাত্রায় প্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। জাহাজে যাত্রীদের স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধের জন্য তিনি কার্যকর স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সুজ. ব.

কুকুর

কুকুর অত্যন্ত প্রভুভক্ত প্রাণী। এই প্রভুভক্তির কারণেই আজ থেকে কমপক্ষে ১২ হাজার বছর আগে কুকুর গুহাবাসী মানুষের পোষ্যপ্রাণীতে পরিণত হয়েছিল। সেদিক থেকে কুকুরই মানুষের প্রথম পোষমানা প্রাণী।

আকার, আকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিভিন্ন প্রজাতির কুকুরের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এদের কোনোটির সারা শরীর লম্বা লম্বা চুল দিয়ে ঢাকা, আবার কোনো কোনোটির গায়ে যেন লোমই নেই। *'চিহুয়াহুয়া'* নামের সবচেয়ে ছোট জাতের কুকুরটি দাঁড়ালে উচ্চতা হয় মাত্র ৫ ইঞ্চি এবং ওজন মাত্র ১.৮ কেজি। অপর দিকে সবেচেয়ে উঁচু আইরিশ উল্ফ্ হাউণ্ডের উচ্চতা হয় ৩৪ ইঞ্চি পর্যন্ত এবং সবচেয়ে ভারি সেন্ট বার্নার্ড-এর ওজন হয় ৯০ কেজি পর্যন্ত।

বলা হয়, গুহাবাসী মানুষ কুকুরকে খাবার দিত এবং বিনিময়ে রাতে ঘুমানোর সময় কুকুর তাদের অন্যান্য জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করত অথবা সতর্ক করে দিত। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কুকুর মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা বা পাহারাদারের কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়াও কুকুরের নানা রকম ব্যবহার রয়েছে। বরফে ঢাকা অঞ্চলসমূহে কুকুরকে দিয়ে 'স্লেজ' (দ্র) নামক এক ধরনের গাড়ি টানানো হয়। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। তাই বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে দিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি থেকে শুরু করে অপরাধীদের খুঁজে বের করা পর্যন্ত নানা রকম অনুসন্ধানের কাজ করানো হয়।

কুকুরের প্রভুভক্তি নিয়ে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। পালনকারী প্রভুর কল্যাণে কুকুর নিজের জীবন দিতেও পিছপা হয় না। কুকুরের এমনি ত্যাগস্বীকারের বহু স্মরণীয় ঘটনা রয়েছে। আর তাই সারা পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ

www.pathagar.com

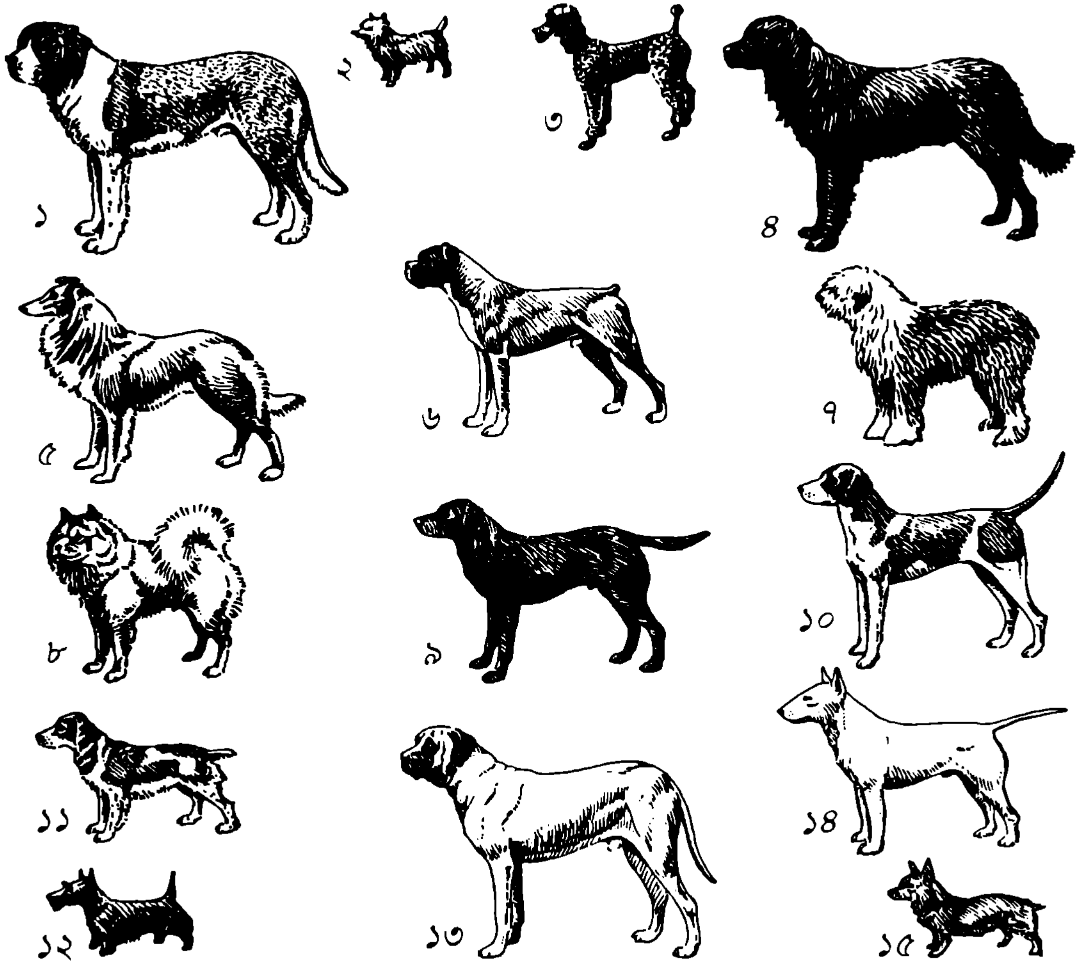

সারা পৃথিবী জুড়ে আছে নানান জাতের কুকুর :
১. সেন্ট বার্নার্ড ২. কায়র্ন. টেরিয়ার ৩. পুড্‌ল্ ৪. নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ৫. কোল্‌লী ৬. বক্সার ৭. শিপ্‌ডগ্ ৮. চৌ চৌ ৯. লেব্রেডর রিট্রাইভার ১০. ফক্সহাউণ্ড ১১. ককার স্প্যানিয়াল ১২. স্কটিশ টেরিয়ার ১৩. মাস্‌টিফ্ ১৪. বুল-টেরিয়ার ১৫. পেম্ব্রোক ১৬. অ্যালসেশিয়ান

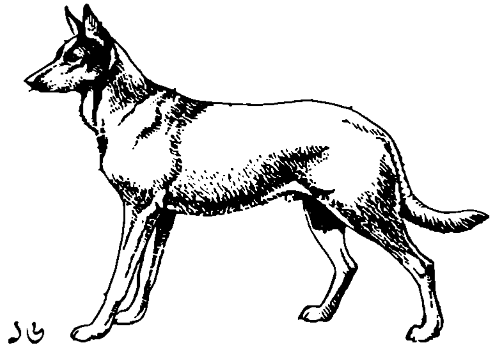

কুকুরের নামে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক শ' সমাধিস্তম্ভ।

একটি মাদী কুকুর এক সঙ্গে ১২টি পর্যন্ত বাচ্চা দিয়ে থাকে। বাচ্চারা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। জন্মের সময় এসব বাচ্চার চোখ ও কান দুটোই বন্ধ থাকে। সাধারণত ১৩ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে চোখ ও কান ফুটে যায়।

ফ. মা.

কুঙ্কুম / কুমকুম জাফরান দ্র

কুটিল লিপি অক্ষর দ্র

www.pathagar.com

কুতুব মিনার

ভারতের (দ্র) রাজধানী নয়াদিল্লির অন্যতম আকর্ষণ কুতুব মিনার। সুউচ্চ ও সুদৃশ্য এই মিনারের প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ক আছে। কারো মতে, এটি নির্মিত হয় ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনার একটি প্রতীক বিজয়স্তম্ভ হিসাবে। আবার অনেকে মনে করেন, খাজা কুতুবউদ্দিন নামে এক সুফি সাধকের স্মৃতিতে এটি নির্মিত হয়েছিল। এই মিনার কেবল ভারতেরই নয়, বরং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিনার।

দিল্লির শাসক কুতুবউদ্দিন আইবক (দ্র) কুতুব মিনারের নির্মাণকাজ শুরু করেন। কিন্তু তাঁর আমলে কেবল এর নিচ তলাটিই নির্মিত হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী ইল্‌তুৎমিস্ আরো কয়েকটি তলা নির্মাণ করেন। ফিরোজ শাহ্ তুঘলক তৈরি করেন এর পঞ্চম ও সর্বশেষ তলাটি। কুতুবউদ্দিন আইবক থেকে ফিরোজ শাহ্ তুঘলক পর্যন্ত এর স্থাপত্য-রীতিতে সময়ের যথাযথ ছাপ অঙ্কিত। তা ছাড়া এর নির্মাণপদ্ধতি ও নির্মাণকর্মে ব্যবহৃত মালমশলাও আলাদা। কুতুব মিনারের উচ্চতা ২৩৮ ফুট। এটি অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত। কুতুব মিনারের কাছেই রয়েছে জাওয়াতুল ইসলাম মসজিদের ধ্বংসাবশেষ।

আ. কা.

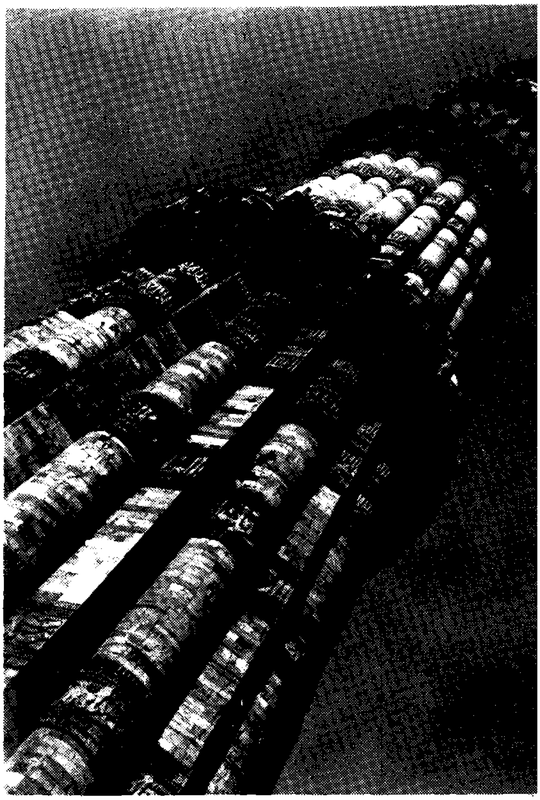

কুতুব মিনার

কুতুবউদ্দিন আইবক [শা. ১২০৬—১২১০]

ভারতীয় উপমহাদেশে তুর্কি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও দিল্লির (দ্র) প্রথম মুসলিম সুলতান। জন্ম মধ্য-এশিয়ার তুর্কি পরিবারে। নিশাপুরের কাজী ফখরুদ্দিন আবদুল আজিজ কুফী তাঁকে জনৈক দাস-ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ক্রয় করেন। কুতুবউদ্দিনকে তিনি তাঁর নিজ সন্তানদের সঙ্গে লেখাপড়া ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন। গজনীর সুলতান শাহাবুদ্দিন মুহম্মদ ঘুরী কাজীর কাছ থেকে কুতুবউদ্দিনকে ক্রয় করেন। নিজ প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার বলে কুতুবউদ্দিন পরবর্তী কালে সুলতান মুহম্মদ ঘুরীর (দ্র) প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হন। তাঁরই সাহায্যে মুহম্মদ ঘুরী ১১৯৩ সালে দিল্লি জয় করেন। সেনাপতিরূপে কুতুবউদ্দিন হানসী, মীরাট, দিল্লি, রণথম্বোর ও কোইল রাজ্য অধিকার করে বারাণসী পর্যন্ত ভূখণ্ড জয় করেন। কুতুবউদ্দিনকে বিজিত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সুলতান মুহম্মদ ঘুরী গজনী ফিরে যান। দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে কুতুবউদ্দিন তাঁর সাম্রাজ্য কালিঞ্জর, গুজরাট, লাহোর এবং বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

কুতুবউদ্দিন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, সুদক্ষ সেনাপতি ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি দয়ালু এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁর শাসনামলেই সুফি খাজা কুতুবউদ্দিনের স্মরণে ভারতবর্ষের উচ্চতম স্তম্ভ 'কুতুব মিনার' (দ্র)-এর নির্মাণকাজ শুরু হয়। কুতুবউদ্দিন শৈশবে ক্রীতদাস ছিলেন বলে অনেকে তাঁর বংশকে 'দাস বংশ' বলে অভিহিত করে থাকে। তাঁর পরবর্তী দু'জন সুলতান ইল্‌তুৎমিস্ এবং বলবনও প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন।

খু. জা.

www.pathagar.com

কুদরাত-এ-খুদা [১৯০০—১৯৭৭]

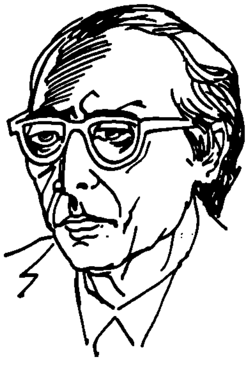

রসায়নবিদ, গ্রন্থকার, শিক্ষাবিদ। ১৯০০ সালের ১লা ডিসেম্বর ভারতে বীরভূমের মাড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খোন্দকার আব্দুল মুকিদ, মাতা ফাসিহা খাতুন। শিক্ষাজীবন শুরু হয় মাড়গ্রাম এম.ই. স্কুলে, পরে কলিকাতা উডবার্ন এম.ই. স্কুল এবং কলিকাতা মাদ্রাসায়। কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে ম্যাট্রিক (১৯১৮), প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এসসি (১৯২৫) এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে ডি.এসসি (১৯২৯) ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (দ্র) নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং ১৯৩১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নবিভাগে শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৯৩৬ সালে এ কলেজে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব নেন। ১৯৪২ সালে ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং ১৯৪৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন।

দেশবিভাগের পর ড. খুদা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন এবং জনশিক্ষা পরিচালকের দায়িত্ব নেন (১৯৪৭–১৯৪৯)। অতঃপর তিনি পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা হন। ১৯৫২-১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগারসমূহের পরিচালক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের (দ্র) চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের (দ্র) স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য যে শিক্ষাকমিশন গঠন করা হয় ড. খুদা তার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণীত হয়।

ড. খুদা স্টেরিও কেমেস্ট্রি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বনৌষধি, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, পাট (দ্র), লবণ (দ্র), কাঠকয়লা, মৃত্তিকা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ। তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ, বিজ্ঞানগ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প', 'বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী', 'বিচিত্র বিজ্ঞান'; 'পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্প সম্ভাবনা' ও 'জৈব রসায়ন' (চার খণ্ড)। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি ১৯৭৬ সালে শিক্ষায় একুশে পদক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৮৪ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার পান।

ড. খুদা ১৯৭৭ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

স. রা.

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

যুগপ্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের (দ্র) উপযোগী সমাজগঠনমূলক একটি সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্য থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই গঠিত 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' প্রণীত সুপারিশমালা। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত-এ-খুদা (দ্র)। তাঁর নামানুসারেই পরবর্তী কালে এই রিপোর্টের নাম হয় 'কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট'।

১৯৭৪ সালের মে মাসে 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' নামে এটি প্রকাশিত হয়। এতে পরিশিষ্ট বাদে ৩৬টি অধ্যায় ছিল এবং এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল মোট ৪৩০।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান (দ্র) ১৯৭২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে কমিশনের মাননীয় সদস্যবৃন্দের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের বাঞ্ছিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ আহ্বান করেন। পাশাপাশি তিনি এই আবেদন জানান যে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট দেশের সীমিত সম্পদের কথা মনে

www.pathagar.com

ছাত্র ও ছাত্রপ্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাবৈঠকে মিলিত হন। পরিশেষে ৪শ' সদস্যবিশিষ্ট ৩০টি অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটির মাধ্যমে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সুধী সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ কমিশনের সুপারিশমালা প্রণয়নে সহায়তা করেন।

যে ৩৬টি অধ্যায়ে এই কমিশনের রিপোর্ট বিভক্ত, সেগুলোর শিরোনাম হচ্ছে : শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন, কর্মঅভিজ্ঞতা, শিক্ষার মাধ্যম,

১৯৭৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে তুলে দিচ্ছেন ড. কুদরাত-এ-খুদা

রেখেই প্রণয়ন করতে হবে এবং তা হতে হবে এমন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগত রূপরেখা, যা বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার সার্থক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনে সহায়তা করবে।

এই কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়নে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভারত (দ্র) সরকারের আমন্ত্রণে এর সভাপতি ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে কমিশনের সদস্যবৃন্দ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সফর করেন। প্রায় এক মাস দীর্ঘ এই সফরকালে তাঁরা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৯৭৩ সালের ৮ই জুন কমিশনের অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশংসা অর্জন করে।

পরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের জন্য একটি প্রশ্নমালা দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নানাবিধ সংস্থা, শিক্ষাব্রতী, শিক্ষাবিদ এবং দেশের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরণ করা হয়। শুধু তাই নয়, কমিশনভুক্ত মাননীয় সদস্যবৃন্দ উক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন জেলা সফর করেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসহ স্কুলের শিক্ষক, সাধারণ

শিক্ষায় বিদেশী ভাষার স্থান, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার, প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ডিপ্লোমা স্তরে প্রকৌশল শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা, ডিগ্রি স্তরে প্রকৌশল শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা, আইন শিক্ষা, ললিতকলা, পরীক্ষা ও মূল্যায়নপদ্ধতি, শিক্ষকদের দায়িত্ব ও মর্যাদা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, নারীশিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের এবং বিশেষ মেধাবীদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, শরীরচর্চা ও সামরিক শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাগৃহ ও শিক্ষার উপকরণ, গ্রন্থাগার, শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা, ছাত্রনির্দেশনা ও পরামর্শ দান, ছাত্রকল্যাণ ও জাতীয় সেবা, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষার জন্য অর্থসংস্থান, এবং পরিশেষ। এই কমিশনের মাননীয় সদস্যবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, এম. ইউ. আহমেদ, মাহমুদ মোকাররম হোসেন, মোহাম্মদ নূরুস সাফা, এম. আবদুস সাত্তার, কবীর চৌধুরী, আবদুল হক, আনিসুজ্জামান, নূরুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম, আ. ম. জহুরুল হক, সিরাজুল হক, বাসন্তী

www.pathagar.com

গুহঠাকুরতা, মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান, মুহম্মদ নুরুল হক, মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ, হেনা দাস, মো. আশরাফউদ্দিন খান।

আ. হু.

কুবের্ত্যাঁ দ্য কুবের্ত্যাঁ দ্র

কুমড়া

কিউকারবিটেসি (Cucurbitacea) পরিবারভুক্ত দ্বি-বীজপত্রী বর্ষজীবী রোহিণী জাতীয় লতানে গাছ। এর একটি প্রজাতি চালকুমড়া (সাদা কুমড়া বা ছাঁচি কুমড়া বা চুনা কুমড়া) এবং অপর একটি মিষ্টি কুমড়া নামে পরিচিত।

চালকুমড়া : এর ইংরেজি নাম অ্যাশ গোর্ড (ash gourd) সংস্কৃত নাম কুষ্মাণ্ড। এর বৈজ্ঞানিক নাম *বেনিনোকাসা সেরিফেরা, কং (Beninocasa cerifera, cong)* এবং *বেনিনোকাসা হিসপিডা, কং (Beninocasa hispida, cong)*। এ গাছ বাংলাদেশে (দ্র) সহজেই উৎপাদন করা যায়। বাঁশের মাচা বা ঘরের চালায় এ গাছের লতাপাতার বৃদ্ধি ভাল হয়। কুমড়া গাছের পাতা সবুজ ও নরম এবং শাক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কচি কুমড়া সবজি হিসাবে বেশ জনপ্রিয়। পাকা কুমড়া দিয়ে মোরব্বা ও হালুয়া তৈরি করা যায়। পাকা কুমড়া অনেক দিন সহজেই ঘরে সংরক্ষণ করা যায়। বাংলাদেশে লম্বা ও খাটো দুই ধরনের কুমড়া উৎপন্ন হয়ে থাকে।

মিষ্টি কুমড়া : এর ইংরেজি নাম সুইট গোর্ড (sweet gourd) এবং সংস্কৃত নাম কুষ্মাণ্ড। এর বৈজ্ঞানিক নাম *কিউকারবিটা ম্যাক্সিমা, ডাচেসনি (Curcurbita macsima, Duchesne)*। বাংলাদেশে এটি প্রিয় সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মিষ্টি কুমড়ার কচি ডগা ও পাতা এবং ফুল রান্না করে খাওয়া যায়। মিষ্টি কুমড়ায় ভিটামিন 'বি' ও 'সি' এবং খনিজ পদার্থ থাকে। এ গাছ গ্রীষ্মকালে ভাল জন্মে। তবে শীতকালেও এর চাষ হতে পারে। দক্ষিণ অমেরিকার (দ্র) গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল এর উৎপত্তিস্থল বলে মনে করা হয়। মিষ্টি কুমড়া লম্বা, ছোট, বড় ও গোলাকার ইত্যাদি আকারের হয়ে থাকে। বীজের সাহায্যে এর বংশবৃদ্ধি ঘটে। ম্যামথ কিং, আর্লি প্রলিফিক, জুকিনি, বাটারনাট প্রভৃতি বিদেশী জাতের

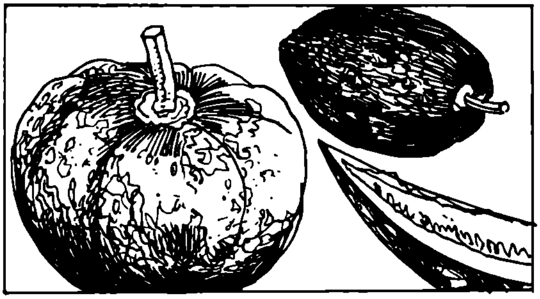

মিষ্টি কুমড়া বাংলাদেশে সহজেই চাষ করা যায়।

মু. আ.

কুমারজীব

মধ্য-এশিয়ার কুচা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনে কাশ্মীরে এসে ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। প্রথমে তিনি হীনযান (দ্র) বা স্থবিরবাদ-এর সর্বাস্তিবাদী ছিলেন, পরে মহাযান (দ্র) মতাবলম্বী হন। তার পর তিনি কুচাতে ফিরে যান। খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে চীন সম্রাটের আক্রমণে কুচা নগরীর পতন হয়। সে সময় কুমারজীব অন্যান্য বন্দির সঙ্গে চীনে (দ্র) প্রেরিত হন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিজের যোগ্যতা-বলে এক জন শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। এর ফলে তিনি বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে চীনের শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে আসীন হন। এ সময় তাঁর প্রায় তিন হাজার ছাত্র ছিল। তিনি পঞ্চাশটি ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। তিনি বিনয়, ব্রহ্মজালসূত্র, বজ্রচ্ছেদিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা (দ্র) প্রভৃতি বিশিষ্ট বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ৪০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি চীন সম্রাটের আদেশে ৮ শত বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহায়তায় সংস্কৃত প্রজ্ঞাপারমিতা ও দশভূমীশ্বর চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সত্যেন সেন (দ্র) তাঁর জীবনের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী অবলম্বন করে 'কুমারজীব' নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন।

বি. ব.

কুমির

ফসিল থেকে জানা গেছে যে ১ কোটি ৯০ লক্ষ বছর আগেও বিশ্বে কুমির ছিল। বর্তমানে এর প্রজাতিসংখ্যা ১২।

www.pathagar.com

কুমিরের বৈজ্ঞানিক নাম ক্রোকোডাইলিডি *(Crocodylidae)*। এর লম্বা দেহ, চ্যাপ্টা মোটা পেট, লম্বা শক্তিশালী লেজ, মজবুত লম্বাটে চোয়াল, চোয়ালের অগ্রভাগে নাক, চোখ মাথার ওপরে। চোখের পিছনে কান, ঝিল্লি। ঝিল্লি কানে পানি ঢুকতে দেয় না। শক্ত পুরু চামড়া, পিঠ-মাথায় শক্ত কাঁটা। চামড়ার আঁশ শক্ত। তীক্ষ্ণ দাঁত। চিবোতে পারে না, গেলে। শিকার শূন্যে ছুঁড়ে মুখে পোরে। জলের তলায় দেখতে পায়। মুখের ভিতরে দু'টি ভাল্‌ব্ আছে। খাবার সময় জলের তলায়ও ভাল্‌ব্ জলকে ঠেকায়। পারে ৫০ কিমি বেগে। সাধারণত চার মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়; ৫.৫ মিটারের রেকর্ড আছে শ্রীলঙ্কায়। এটি সমুদ্রসমতল থেকে ৬০০ মিটার উচ্চতায় উঠতে পারে, পেট পেতে বিশ্রাম নেয়, পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে।

লোনা জলের কুমির মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি খায়। অধিকাংশই মানুষখেকো হয়। মিষ্টি জলের কুমির মানুষ খায় না। হাঁস-মুরগি-মাছ খায়। ডাঙ্গার কুমির তাড়া করে ছোট ছোট বন্যপ্রাণী ধরে, পাথরও গেলে। এরা ডাঙ্গায় ডিম পাড়ে। ঘড়িয়ালের ৫০টি ডিম হতে পারে। অন্যরা দেয় ১

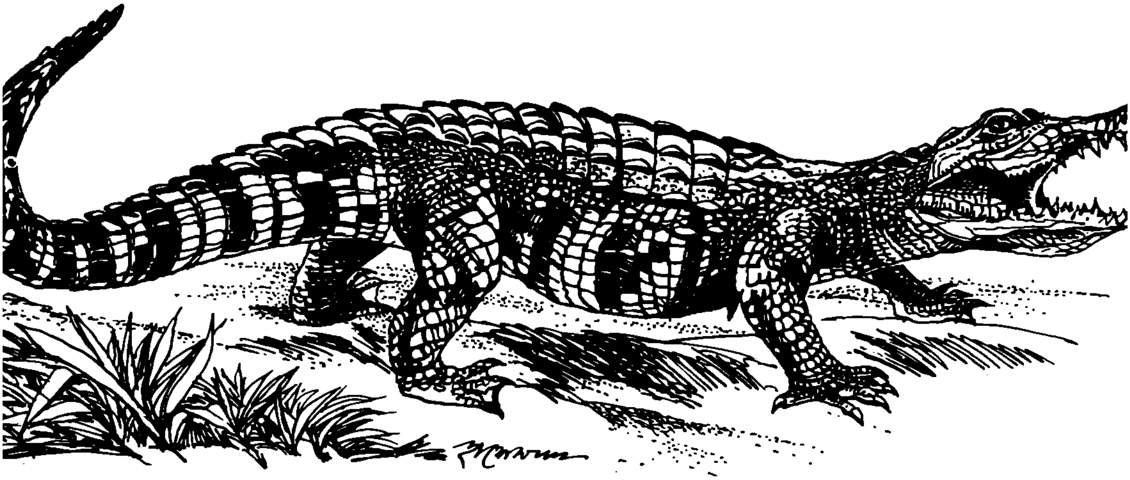

দেহ জলের তলায় রেখে চোখ ওপরে রাখে।

নানা রকম কুমির আছে। আমেরিকার কুমির, আফ্রিকার নাইল (Nile), লোনা জলের কুমির (The Giant Salt Water Crocodile), থাইল্যাণ্ডের সিয়ামিজ (Siamese), মাগার অথবা মার্শ (Mugger or Marsh) ও ঘড়িয়াল (দ্র) হচ্ছে বিখ্যাত। জীবাশ্ম বা ফসিল প্রমাণ করেছে যে ১৫ মিটার কুমিরও ছিল। কুমিরকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়—জলের কুমির ও ডাঙার কুমির। কুমির দক্ষ ডুবুরি। এদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল।

কুমির হ্রদে-নদীতে থাকে। এর লেজ হালের কাজ করে। হাঁটতে পারে ঘণ্টায় ৩ কিলোমিটার বেগে, ছুটতে থেকে ৩টি। ডিমের মাপ ১০ সেন্টিমিটার, বেড় ৫ সেন্টিমিটার। ডিমের উভয় মাথা সমান। ৬০-৭৫ দিনে এর বাচ্চা ফোটে। ডিম থেকে বেরিয়ে বাচ্চারা জলের দিকে ছোটে। কেউ কেউ মায়ের পিঠে চড়ে। অনেকে আবার বাচ্চা মুখে পুরে জলে নামে। লোনা জলের কুমির শ্রীলঙ্কা (দ্র), বার্মা (দ্র), থাইল্যাণ্ড (দ্র), অস্ট্রেলিয়া (দ্র)-সহ ইন্দোনেশিয়ায় (দ্র) পাওয়া যায়। বাংলাদেশে (দ্র) মূলত লোনা জলের কুমিরই আছে। মিষ্টি জলের কুমির চিড়িয়াখানা ও খান জাহান আলী (দ্র) দিঘিতে আছে। ঘড়িয়াল সম্ভবত নেই। কুমির ৫০-৮৫ বছর বাঁচে।

শ. খা.

www.pathagar.com

কুমুদরঞ্জন মল্লিক [১৮৮৩—১৯৭০]

কবি। ১৮৮৩ সালের ১লা মার্চ বর্ধমান জেলার কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করে তিনি 'বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণপদক' লাভ করেন।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক ছিলেন একজন শিক্ষক। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মাথরুণ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক রূপে দায়িত্ব পালন করেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র) তাঁর ছাত্র ছিলেন।

শৈশবেই কুমদরঞ্জনের কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে। অজয় ও কুনুর নদীর মোহনায় অবস্থিত তাঁর গ্রামের জীবন ও প্রকৃতিই তাঁর প্রথম জীবনের কবিতার মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে ওঠে। সে সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চৌদ্দ। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হল: 'উজানী' (১৯১১), 'বনতুলসী' (১৯১১), 'শতদল' (১৯১১), 'একতারা' (১৯১৪), 'বীথি' (১৯১৫), 'বনমল্লিকা' (১৯১৮), 'নূপুর' (১৯২০), 'রজনীগন্ধা' (১৯২১), 'অজয়' (১৯২৭), 'তূণীর' '(১৯২৮), 'স্বর্ণসন্ধ্যা' (১৯৪৮)। বৈষ্ণব ভাবাদর্শ, গ্রামীণ জীবন ও নিসর্গ ইত্যাদির চিত্রময় সহজ সরল প্রকাশই তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি একখানি নাটকও রচনা করেন। নাটকটির নাম দ্বারাবতী (১৯২০)।

কুমুদরঞ্জন বঙ্গদেশের কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্যতীর্থে'র তীর্থপতি ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' (দ্র)-এ ভূষিত করে। তিনি ১৯৭০ সালে ১৪ই ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

কুমেরু অ্যান্টার্কটিকা দ্র

কুম্ভকর্ণ

রামায়ণের (দ্র) অন্যতম চরিত্র রাবণের ভাই। পিতা বিশ্রবা মুনি, মা কৈকষী রাক্ষসী। ব্রহ্মার বরে কুম্ভকর্ণ বছরে ছয় মাস ঘুমিয়ে এবং ছয় মাস জেগে কাটাত। কুম্ভকর্ণের স্ত্রী বজ্রমালা বা বজ্রজ্বালা; কুম্ভ ও নিকুম্ভ দুই পুত্র। লঙ্কাযুদ্ধের সময় কুম্ভকর্ণ ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু যুদ্ধে রাক্ষসপক্ষে বিপর্যয় দেখা দিলে কুম্ভকর্ণকে জাগানো হয়। জেগে উঠে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে যোগদান করে এবং বহু বানরসেনা হত্যা করে অবশেষে নিজেও রামের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে মৃত্যুবরণ করে।

মে. খা.

কুম্ভমেলা গঙ্গা নদী দ্র

কুয়াশা

কুয়াশা হল ভূমির কাছাকাছি সৃষ্টি হওয়া এক প্রকারের মেঘ। শীতের রাতে ভূমি দ্রুত শীতল হয়ে পড়লে এর সংস্পর্শে কাছের বাতাসও (দ্র) শীতল হয়। এ সময় বাতাসের প্রবাহ কম থাকলে ওখানকার বাতাস শীতল অবস্থায় থেকে যায়। এই শীতলতা শিশিরাঙ্কের কাছাকাছি পৌঁছলে বাতাসের জলীয় বাষ্প আর বাতাসে থাকতে পারে না। এটি তখন বাতাসের মধ্যে থাকা ক্ষুদ্র অসংখ্য ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ঘনীভূত হয়ে ছোট ছোট জলবিন্দু গঠন করে। এভাবেই সৃষ্টি হয় কুয়াশা। মাটির (দ্র) ধূলিকণা, কলকারখানা ও গাড়ির ধূম্রকণা ইত্যাদির আধিক্য থাকলে কুয়াশা বেশি হতে পারে।

জোরালো বাতাস থাকলে ভূমির কাছাকাছি ঠাণ্ডা বাতাসের স্তর এলোমেলো হয়ে তার সঙ্গে উপরের গরম বাতাস মিশে যায়। এতে কুয়াশা হতে পারে না। তবে মৃদুমন্দ বাতাস বইলে সেটি বরং উপরের বাতাসকে আরো ঠাণ্ডা করে কুয়াশাকে পুরু করে তোলে। সকালে সূর্যের তেজ বাড়ার পর বায়ুমণ্ডল (দ্র) উত্তপ্ত হয়ে তা নাড়া খায়। তখন গরম বাতাসের সংস্পর্শে এসে কুয়াশার জলবিন্দু বাষ্পীভূত হয়, কুয়াশা কেটে যায়।

www.pathagar.com

তাপ বিকিরণে (দ্র) ভূমি শীতল হয়ে সাধারণ যে কুয়াশার সৃষ্টি হয় সেটি 'বিকিরণ কুয়াশা'। শীতল স্রোত ইত্যাদির কারণে সমুদ্রের পানি ঠাণ্ডা হয়ে সেখানে অন্য একভাবে কুয়াশা জমে। আবার বাদলা দিনে ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্য দিয়ে উষ্ণতর বৃষ্টিপাত হলে 'ভাপ কুয়াশা' নামে আরেক রকমের কুয়াশার সৃষ্টি হয়। এটি অনেকটা ফুটন্ত পানির কেৎলির মুখে দেখা যাওয়া ভাপের মতো বলে একে 'ভাপ কুয়াশা' বলা হয়। ।

কুয়াশা থাকলে দৃষ্টি ব্যাহত হয়ে চলাচলের অসুবিধা হয়। গাড়ি চলাচল, বিমান অবতরণ ইত্যাদির জন্য এটি রীতিমতো বিপজ্জনক হতে পারে। শিল্পাঞ্চলের ময়লাটে কুয়াশা ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর।

মু. ই.

কুরআন শরীফ

কুরআন মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, ঐশীবাণী। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে তা খণ্ড খণ্ড অনুচ্ছেদ বা অংশে মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়। ইসলাম (দ্র) ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এক জন ফিরিশতা (দ্র) বা ঐশীদূত হযরত জিব্রাইল-এর মাধ্যমে এই বাণী সময়ে সময়ে নাজিল (অবতীর্ণ) হয়েছিল।

রসূলুল্লাহ্ (স.) (দ্র)-র নিকট কুরআনের প্রথম বাণী অবতীর্ণ হয় ৬১০ খ্রিস্টাব্দের রমজান মাসে। এ সময় তাঁর বয়স চল্লিশ বছর।

একদা মক্কার অদূরবর্তী হেরা গুহায় (দ্র) আল্লাহ্‌র (দ্র) ধ্যানে মগ্ন থাকা অবস্থায় তিনি প্রথম ঐশীবাণী লাভ করেন। তাঁর নিকট অবতীর্ণ কুরআনের সেই পাঁচটি আয়াত বা বাক্যের বাংলা অর্থ হচ্ছে : "পড় ! তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এমন বস্তু হতে, যা দৃঢ়রূপে সংলগ্ন। পড় ! তোমার প্রভু অতীব মহান, যিনি শিক্ষা দেন কলমের দ্বারা। তিনি মানুষকে তাই শিক্ষা দেন, যা সে জানত না।"

পবিত্র কুরআনে সর্বমোট ১১৪টি সূরা বা অধ্যায় আছে। এর আয়াত বা অনুচ্ছেদসংখ্যা ৬ হাজার ৬ শত ৬৬টি। সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরার (দ্র) নাম সূরা আলাক। কিন্তু সুবিন্যস্ত ও সঙ্কলিত কুরআন শরীফে এর অবস্থান ৯৬ নম্বর ক্রমিকে। কুরআন শরীফের সর্বশেষ সূরা (১১৪ নং) হিসাবে সূরা 'নাস'-এর অবস্থান হলেও প্রকৃতপক্ষে কুরআনের শেষ সুরা কিংবা আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে ইসলামী শরিয়তবিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের মতে, পবিত্র কুরআনের 'সূরা মায়িদা' (৫নং সূরা)-র ৩নং আয়াতটি সর্বশেষ অবতীর্ণ ওহী (দ্র) বা ঐশীবাণী। এই অংশটির বাংলা অনুবাদ এরকম : "তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে মড়া, রক্ত, শূকর-মাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গীকৃত পশু আর গলা টিপে মারা জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যা তোমরা জবেহ্ দ্বারা পবিত্র করেছ তা ব্যতীত আর যা মূর্তিপূজার বেদির উপর বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এই সব পাপকার্য; আজ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের দ্বীনের (ধর্মের) বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় করো। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম। তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

কুরআনের এই অংশটি অবতীর্ণ হয় ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে বিদায় হজ্বের (দ্র) সময়। এ সময় রসূলুল্লাহ্ (স.) আরাফাতের (দ্র) প্রান্তরে বিশাল জনতার সামনে জীবনের সর্বশেষ ভাষণ দিচ্ছিলেন।

www.pathagar.com

মনোযোগ দিয়ে কুরআন শরীফ পড়ছেন

কুরআন শরীফ ইসলামী বিধি-বিধানের মূল উৎস। কুরআনের এতগুলো সূরা এবং আয়াতে মূলত মানুষের সুন্দর, পবিত্র, সুশৃঙ্খল ও মঙ্গলময় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনব্যবস্থার লক্ষ্যে বিস্তারিত দিঙ্‌নির্দেশনা রয়েছে। এখানে আরো আছে সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধের কথা; সমস্ত অন্যায়-অবিচার, পাপ, অশুভ-অকল্যাণ পরিহারের কথা, মানবজাতির মঙ্গলের কথা; ন্যায়, সত্য, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার কথা এবং সর্বোপরি আছে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস, দ্বিধাহীন আনুগত্য এবং তাঁর ইচ্ছার নিকটে আত্মসমর্পণের কথা; পুণ্যবানদের জন্য পরকালে অশেষ শান্তির আবাস বেহেশতের (দ্র) প্রতিশ্রুতি এবং পাপীদের জন্য কঠিন শাস্তির স্থান দোজখে (দ্র) নিক্ষেপের হুঁশিয়ারি।

পবিত্র কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড আকারে বা অংশে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে প্রথম দিকে তা পুস্তকাকারে সংরক্ষিত হয় নি। তখন অবতীর্ণ বাণীসমূহ চামড়া, গাছের বাকল, পাথর, প্রশস্ত হাড়ের পাত প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ করে রাখা হত।

এর পর রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আল্লাহ্‌র নির্দেশে সমগ্র কুরআনের বাণীসমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করেন। এই বিন্যাসধারা বজায় রেখেই বহুসংখ্যক সাহাবী (দ্র) সমগ্র কুরআন মুখস্থ করেন। এই বিন্যাসধারা অনুযায়ী তা বিভিন্নভাবে শিক্ষিত সাহাবীদের দ্বারা লিখে রাখার প্রক্রিয়াও অব্যাহত থাকল। কুরআনের বাণী লিপিবদ্ধকারী হিসাবে সাহাবী উবাই ইব্‌নে কাব এবং জায়েদ ইব্‌নে সাবেতের নাম সমধিক বিখ্যাত। পরবর্তী কালে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (দ্র) সময় পূর্ণাঙ্গভাবে কুরআন সঙ্কলনের কাজ সম্পন্ন হয়।

কুরআন শরীফ আবৃত্তি বা তেলাওতের রেওয়াজ আছে। তবে অর্থ না বুঝে তেলাওতের চেয়ে অর্থ বা মর্মবাণী বুঝে ও হৃদয়ঙ্গম করে কুরআন তেলাওত করা শ্রেয়।

বাংলা ভাষায় (দ্র) সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন অনুবাদ করেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (দ্র)। এই মহৎ কর্মের জন্য তিনি বাঙালি মুসলমানদের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মু. মা.

কুরবানি ঈদুল আয্‌হা দ্র

কুরি, জোলিও জোলিও-কুরি, জঁ ফ্রেদেরিক্ দ্র

কুরি, পিয়ের কুরি, মারি দ্র

কুরি, মারি [১৯৬৭—১৯৩৪]

পোল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণকারী ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী। মারি কুরির (Marie Curie) জন্ম ১৮৬৭ সালে ৭ই নভেম্বর পোল্যাণ্ডের ওয়ার্স শহরে। মৃত্যু ১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই ফ্রান্সের প্যারিসে। পিতা ভ্লাদিচ্‌লভ স্ক্লদোভ্‌স্কি ছিলেন দরিদ্র স্কুলশিক্ষক। স্ক্লদোভ্‌স্কির দুই মেয়ে ব্রোনিয়া আর মানিয়া। মানিয়ার পুরো নাম মারিয়া স্ক্লদোভ্‌স্কা। স্কুলপরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেও আর্থিক অনটনের জন্য ব্রোনিয়া এবং মারিয়ার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। মারিয়া গৃহশিক্ষকতা করে ব্রোনিয়ার পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। ব্রোনিয়া ডাক্তারি পাশ করার পর মারিয়ার উচ্চশিক্ষার সুযোগ আসে। তিনি প্যারিসের সর্বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান (দ্র) ও গণিত

www.pathagar.com

নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৮৯৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম এবং ১৮৯৪ সালে গণিতে দ্বিতীয় হয়ে উত্তীর্ণ হন। এর পর পদার্থবিজ্ঞানে উচ্চতর গবেষণা শুরু করেন। এই সময় তাঁর পরিচয় হয় প্যারিসের তরুণ বিজ্ঞানী পিয়ের কুরির (Pierre Curie) সঙ্গে। ১৮৯৫ সালে মারিয়ার সঙ্গে পিয়ের কুরির বিয়ে হয়। মারিয়ার নাম হয় মারি কুরি।

কঠোর অধ্যাবসায় এবং অক্লান্ত গবেষণা করে কুরি দম্পতি ১৮৯৮ সালে দু'টি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। মারি কুরির জন্মস্থান পোল্যাণ্ডের নামানুসারে তাঁরা প্রথম মৌলটির নাম দেন পলোনিয়াম, অন্যটির তেজস্ক্রিয়তা (radiation) ধর্মের জন্য নাম দেন রেডিয়াম (দ্র)। ১৯০৩ সালে তেজস্ক্রিয়তার উপর গবেষণা ও নতুন মৌল আবিষ্কারের জন্য আঁতোয়ান্ অঁরি বেক্যরেল্ (Antoine Henri Becquerel : ১৮৫২-১৯০৮) এবং কুরি দম্পতিকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার (দ্র) দেওয়া হয়।

১৯০৬ সালে পিয়ের কুরি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। স্বামীর মৃত্যু মারি কুরিকে প্রচণ্ড আঘাত দেয়। তা সত্ত্বেও তিনি দুই মেয়ে ইরিন্ এবং ইভ্‌কে নিয়ে সংসার যাপনের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। স্বামী সর্বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন; তাঁর মৃত্যুর পর মারি সেই পদে যোগদান করেন। তিনিই ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মহিলা অধ্যাপক। তাঁর গবেষণা ও শিক্ষকতা তাঁকে মাদাম কুরি হিসাবে খ্যাতিমান করে।

১৯১০ সালে তেজস্ক্রিয়তার উপর তাঁর মৌলিক গবেষণাপ্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে তিনি বিশুদ্ধ রেডিয়াম নিষ্কাশন করেন। এসব গবেষণার জন্য ১৯১১ সালে মাদাম কুরি রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান। এ ছাড়াও তিনি পান রয়াল সোসাইটির ডেভিড পদক, একাডেমিক পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার।

তিনি প্যারিসের বিখ্যাত রেডিয়াম ইনস্টিটিউট এবং কুরি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় মাদাম কুরি রঞ্জনরশ্মি (দ্র) এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে রোগচিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং এই পদ্ধতিতে সামরিক হাসপাতালে আহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য ভ্রাম্যমাণ দল গঠন করেন। এই দলে তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন মেয়ে ইরিন্ কুরি। ইরিন্ ও তাঁর স্বামী জোলিও উভয়েই পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান (১৯৩৫)। ৬৭ বছর বয়সে লিউকেমিয়ায় (দ্র) আক্রান্ত হয়ে মাদাম কুরির মৃত্যু হয়।

মাদাম মারি কুরি ও স্বামী পিয়ের কুরি নিজেদের গবেষণাগারে

স. রা.

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ

ভারতীয় পুরাণে উল্লিখিত কুরু-পাণ্ডবের মহাযুদ্ধ। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে সংঘটিত এই যুদ্ধ 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ' নামেই পরিচিত।

কুরু বংশীয় রাজা বিচিত্রবীর্য হস্তিনাপুর শাসন করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র রাজা হন। কিন্তু তিনি জন্মান্ধ ছিলেন বলে তাঁর ছোট ভাই পাণ্ডু রাজ্য শাসন করতে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্রের জীবিতকালেই পাণ্ডুর মৃত্যু

www.pathagar.com

ঘটে। তখন কুরুরাজ্যের শাসনভার ধৃতরাষ্ট্রের বড় ছেলে দুর্যোধনের হাতে চলে যায়। তবে রাজ্যাংশের অধিকারী হিসাবে পাণ্ডুর বড় ছেলে যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রপ্রস্থের শাসনভার দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্যোধন এই ব্যবস্থা মেনে নিতে নারাজ। তিনি কৌশলে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের সাধুতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে এবং তাঁর অন্য চার ভাই ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। দুর্যোধন ঘোষণা করেন যে 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'। তাঁর এই উক্তি থেকেই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। আঠারো দিন ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলে। তখনকার ভারতবর্ষের সকল রাজা-মহারাজাই কোনো না কোনোভাবে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডুর পুত্রদের পক্ষকে বলা হত পাণ্ডবপক্ষ আর দুর্যোধনের পক্ষকে কৌরবপক্ষ। যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের জয় হয়। পাণ্ডবপক্ষের প্রধান যোদ্ধারা ছিলেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব তথা পঞ্চপাণ্ডব এবং তাঁদের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কৌরবপক্ষে ছিলেন কর্ণ, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ। এই মহাযুদ্ধে প্রতিদিন অগণিত যোদ্ধার মৃত্যু হয়। যুদ্ধ-শেষে উভয়পক্ষের মাত্র ১০ জন যোদ্ধা জীবিত ছিলেন। পাণ্ডবপক্ষে সাত জন এবং কৌরব পক্ষে তিন জন। দুর্যোধন পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র ভীমের হাতে নিহত হন। তার. পর যুধিষ্ঠিরকে কুরুরাজ্যের রাজপদে অধিষ্ঠিত করা হয়। এই যুদ্ধের কাহিনী নিয়েই বিখ্যাত মহাকাব্য 'মহাভারত' (দ্র) রচিত।

সুজ. ব.

কুর্তোয়া, বের্নার্ আয়োডিন দ্র

কুলঁ, শার্ল্ ওগুস্ত্যাঁ দ্য [১৭৩৬—১৮০৬]

ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী কুলঁ (Charles Augustin de Coulomb)-র জন্ম ১৭৩৬ সালের ১৪ই জুন, মৃত্যু ১৮০৬ সালের ২৩শে আগস্ট। (কুলঁ নামটি বাংলায় ভুল উচ্চারণে কুলম্ব ও কুলম্ হিসাবে চালু আছে।) তিনি প্যারিস থেকে ১৭৬১ সালের স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রকৌশলী হিসাবে ফরাসি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (দ্র)। তিনি ১৭৮১ সালে চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে প্যারিসে ফিরে এসে পদার্থবিজ্ঞান (দ্র) চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এ সময় তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণাপ্রবন্ধ, বিশেষ করে তড়িৎচুম্বকের উপর ৭টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৭৮৫ সালে তিনি দু'টি বিপরীত চার্জের (দ্র) মধ্যে আকর্ষণবলের ব্যস্তানুপাতের সূত্রটি প্রদর্শন করেন। ১৭৮৭ সালে তড়িৎচার্জ এবং চুম্বকমেরু উভয় ক্ষেত্রে সমধর্মী চার্জের মধ্যে বিকর্ষণ ও বিপরীত মেরুর মধ্যে আকর্ষণবলের ব্যস্তানুপাত প্রদর্শন করেন। এভাবে তিনি নিম্নোক্ত দু'টি সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন :

(১) চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল মেরুশক্তির গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

(২) তড়িৎচার্জের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল চার্জ দু'টির গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

সূত্র দু'টি পদার্থবিজ্ঞানে Coulomb's Law বা 'কুলম্ সূত্র' নামে বিখ্যাত। তাঁরই নামানুসারে ইলেকট্রিক চার্জের একক 'কুলম্'। এ ছাড়া তিনি যন্ত্রপাতির ঘর্ষণ, বায়ুকল, ধাতু ও সিল্ক সম্পর্কীয় বিজ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটান।

স. রা.

কুশ ও কাশ

কুশ শরতে ফোটে। কুশের গোত্রভেদ আছে। কুশের পাশে আছে কাশ। এই গোত্রের শর ও দর্ভ ঘাসের মতো দেখতে এবং আখের মতো লম্বা হয়। কুশ, কাশ, শর ও দর্ভ একই গোত্রের এবং দেখতে প্রায় এক রকম। কুশ খুব কম পাওয়া যায়। আমাদের দেশে পাওয়া যায় কাশ। কুশের পাতার গায়ে কোনো খাঁজ বা ধার নেই। কাশের পাতায় ধার আছে। উষ্ণ ও শুকনো অঞ্চলে কুশ পাওয়া যায়। ভারতের (দ্র) গয়া এবং দ্বারভাঙ্গা জেলার কোশী নদীর ধার বরাবর কুশ প্রচুর জন্মে। এ জন্য ঐ নদীর নাম কোশী। কুশের বোটানিক্যাল নাম *Desmostachya bipinnata stapf,* ফ্যামিলি Gramineae।

www.pathagar.com

কাশ জন্মে বাংলাদেশ (দ্র) ও ভারতের প্রায় সব অঞ্চলে। আমাদের দেশে নদীর ধারে, চর এলাকায়, শুকনো রুক্ষ এলাকায় বালিতে কাশের ঝাড় দেখা যায়। আবার শক্ত মাটিতে ছোট ছোট ঘাসের মতোও কাশ জন্মে। শরতে এর ফুল দেখে আমরা চিনতে পারি। কাশের বোটানিক্যাল নাম *Saccharum spontaneum*, ফ্যামিলি Gramineae।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এদেশে কুশ ছিল। পুরাণে কুশের স্থান খুব উঁচুতে। প্রাচীন কালে এক বার ব্রাহ্মণ বড় নাকি কুশ বড় এই নিয়ে বিবাদ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কাউকে বড় বা ছোট না করে কুশকে ব্রাহ্মণের প্রতিভূ হিসাবে স্থান দেওয়া হয়।

বি. ব.

কুশপুত্তলিকা

কুশপুত্তলিকা হচ্ছে কুশদ্বারা নির্মিত কোনো মৃত বা জীবিত মানুষের মূর্তি। প্রাচীনকালে এই উপমহাদেশে কোনো স্থানে কোনো মানুষের অজ্ঞাত মৃত্যু হলে অথবা দীর্ঘ ১২ বছর কোনো মানুষের সন্ধান পাওয়া না গেলে কিংবা কেউ বিষপান বা কেউ ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়ে অথবা অন্য কোনো অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যুবরণ করলে এবং মৃতের দেহ খুঁজে পাওয়া না গেলে মৃত মানুষের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক কুশগুচ্ছ দিয়ে তার প্রতিমূর্তি তৈরি করে তা দাহ করার রীতি প্রচলিত ছিল। আর এভাবে নির্মিত প্রতিমূর্তি হচ্ছে কুশপুত্তলিকা। ইংরেজিতে বলে effigy (এফিজি)।

বর্তমান যুগে কোনো রাজনৈতিক নেতার কাজের প্রতিবাদ জানানোর জন্য খড় কাপড় দিয়ে (কেননা কুশ বঙ্গদেশে পাওয়া যায় না) ঐ রাজনৈতিক নেতার মতো চেহারার কুশপুত্তলিকা বানিয়ে তা দাহ করা হয়। এভাবে কুশপুত্তলিকা তৈরি করার প্রাচীন পদ্ধতির নবায়ন করা হয়েছে।

বি. ব.

কুষাণবংশ

কুষাণবংশ প্রাচীন ইতিহাসে এক স্বনামখ্যাত রাজবংশ হিসাবে চিহ্নিত। এদের আদিবাস ছিল উত্তর-পশ্চিম চীনের (দ্র) কান্‌সু প্রদেশে। তারা ইউ-চি নামক এক যাযাবর সম্প্রদায়ের লোক। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৬৫ অব্দে ইউ-চি জনগোষ্ঠী হুন (দ্র) নামক আরেক যাযাবর সম্প্রদায়ের আক্রমণের শিকার হয় এবং পরাজিত হয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। অবশেষে তারা সির দরিয়ার তীরে উপস্থিত হয়। এখানে শক (দ্র) নামক জাতি বসবাস করত। ভাগ্যবঞ্চিত ইউ-চি সম্প্রদায় শকদের পরাজিত করে ঐ স্থানে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু তাদের এই অবস্থান নিরঙ্কুশ হয় নি। পূর্ব-শত্রু হুন জাতি আবার তাদের ওপর হামলা চালায়। তারা পরাজিত হয়ে তখন দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। এখানেও শক জাতি বসবাস করত। ইউ-চি সম্প্রদায় তাদের পরাজিত করে। ক্রমে তারা আমু দরিয়া পার হয়ে বক্‌ত্রিয়ায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে এবং যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে। কালক্রমে এই ইউ-চি জাতি পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করে। এই পাঁচটি শাখারই একটির নাম কুষাণবংশ, যারা তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা এবং বীরত্ববলে আজো স্মরণীয় হয়ে আছে।

এই বিভক্তির এক শ' বছর পর কুষাণরাজ ১ম কদফিসেস আপন ক্ষমতাবলে অন্য শাখাগুলোকে পরাভূত করে অখণ্ড ইউ-চি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর রাজত্বকাল ৪০–৭৮ খ্রিস্টাব্দ। তিনি কাবুল থেকে তক্ষশীলা পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। এর পর দ্বিতীয় কদফিসেস ক্ষমতায় আসেন (রাজত্বকাল ৭৮–১১০) এবং তাঁর রাজ্যসীমা কাশী (দ্র) থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত প্রসারিত করেন।

কুষাণবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কণিষ্ক (১২০–১৬২)। কাশ্মীর থেকে বিহার পর্যন্ত প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত এবং মধ্য-এশিয়ার গোবি মরুভূমি পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি একটি স্বতন্ত্র সনের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের (দ্র) অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ (দ্র)-সহ কয়েক জন পণ্ডিত তাঁর রাজসভা

www.pathagar.com

অলঙ্কৃত করতেন বলে জানা যায়।

এই বংশের অন্যান্য যাঁরা রাজত্ব করেন, তাঁদের মধ্যে বাশিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের নাম জানা যায়। এর পর ক্রমশ কুষাণ সাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়তে থাকে এবং পারস্যের দুর্ধর্ষ সাসানীয় রাজবংশের আক্রমণের ফলে এই সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

কুষাণ আমলে অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি সাধিত হয় বলে আধুনিক গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মু. মা.

কুষাণ লিপি অক্ষর দ্র

কুষ্ঠ রোগ (leprosy)

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম লেপ্‌রি (Mycobacterium leprae) নামক জীবাণু সংক্রমণে কুষ্ঠ রোগের সৃষ্টি হয়।

কুষ্ঠ রোগের জীবাণু সাধারণত শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে বা ত্বকের ক্ষতমুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। তবে এই রোগের বিস্তারপ্রক্রিয়া এখনো পুরোপুরি জানা যায় নি। শরীরে কুষ্ঠ রোগের জীবাণু প্রবেশের পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে এক বছরেরও বেশি সময় লাগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুষ্ঠ রোগ অন্যের শরীরে সরাসরি সংক্রমিত হয় না। কেবল কুষ্ঠ রোগের বিশেষ অবস্থাতেই তা সংক্রমিত হতে পারে।

কুষ্ঠ রোগে ত্বকে ফ্যাকাসে বা লাল রঙের দাগ (patch) দেখা দেয়। সেখানে অনুভূতি থাকে না বা চুলকানিও সৃষ্টি হয় না। কুষ্ঠ রোগে শরীরের প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়, মাংসপেশিতে দুর্বলতা দেখা দেয় এবং রোগীর ত্বক, হাত, পা ইত্যাদি স্থানের অনুভূতি লোপ পায়।

কুষ্ঠ নিরাময়যোগ্য রোগ। যথাশীঘ্র চিকিৎসা এবং সেবা প্রদান করা হলে কুষ্ঠ রোগজনিত অঙ্গবিকৃতি প্রতিরোধ করা সম্ভব। কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসায় সাধারণত এন্টিবায়োটিক (দ্র) ও সালফোন (sulfones) জাতীয় ঔষধ (দ্র) ব্যবহৃত হয়।

সি. না. হ.

কুসুম্বা মসজিদ

কুসুম্বা মসজিদ পাঠান আমলের স্থাপত্যকর্মের অন্যতম নিদর্শন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে (১৫৫৪—১৫৬০) ১৫৫৮ সালে সোলায়মান নামক এক ব্যক্তি মনোরম স্থাপত্যশৈলীতে সমৃদ্ধ এই সুন্দর মসজিদটি নির্মাণ করেন। এটি রাজশাহী (দ্র) শহর থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরে মান্দা থানার কুসুম্বা গ্রামে এখনো বিদ্যমান।

মসজিদটি রাজমহল থেকে আনা কালো পাথরে তৈরি। তবে এর দেয়ালের বহিরাংশ ইটের তৈরি। দেয়ালগুলো ছয় ফুট পুরু। মসজিদের গম্বুজসংখ্যা ছয়। এগুলোর প্রান্ত গোলাকার। এতে আট-কোণা চারটি মিনার, তিনটি দরজা

কুসুম্বা মসজিদের মেহরাব

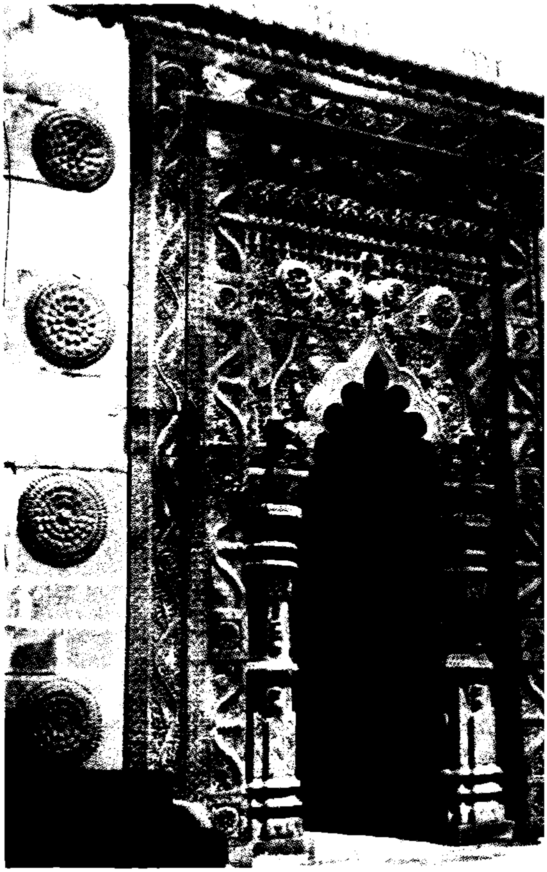

www.pathagar.com

কুসুম্বা মসজিদ

যাবে না। পিঠের উভয় হাড় (স্কন্ধের নিচের অংশ) ম্যাটে বা মাটিতে লাগিয়ে তিন সেকেণ্ড রাখতে পারলেই এতে জয়ী হওয়া যায়। অপরদিকে ফ্রি স্টাইল কুস্তি নামে যে কুস্তিটি প্রচলিত আছে, তাতে কিছু নিষিদ্ধ ধরা ব্যতীত বিধিসম্মত ধরার জন্য পয়েন্ট বা নম্বরের দ্বারা জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। কুস্তি ওজন অনুযায়ী দু'জনের মধ্যে

এবং তিনটি মেহরাব আছে।

মসজিদটির সামনের দেয়াল ও মেহরাবগুলো নানা ধরনের অলঙ্করণে সজ্জিত। এসব অলঙ্করণে বাংলার ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা (দ্র) বা পোড়ামাটির ফলকচিত্রের নিখুঁত ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

মু. মা.

কুস্তি

কুস্তি খেলা এসেছে মিশর থেকে। খ্রিস্টের জন্মের ৩০০০ বছর পূর্বে মিশরের বেনি হাসানের মন্দিরগাত্রে খোদিত চিত্র থেকে আমরা তা জানতে পারি। এ ছাড়া প্রাচীন গ্রিস ও রোমে এই খেলা প্রচলিত ছিল। গ্রিসে অতীত যুগের অলিম্পিক খেলায় এটা একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রতিযোগিতা ছিল। এর পর ধীরে ধীরে সভ্যতার উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে কুস্তি খেলাটি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে।

কুস্তি খেলার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হল গ্রেকোরোমান পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বীরা একে অপরের কোমরের উপরের অংশ ধরে প্রতিযোগিতা করবেন, কোনো ক্রমেই কোমরের নিচের অংশ ধরা

অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বিশ্ব অলিম্পিকে (দ্র) এই দু' ধরনের কুস্তি প্রতিযোগিতা ১০টি ক্লাসে বা শ্রেণীতে তিন মিনিট কুস্তি ও মাঝে এক মিনিট বিরতি দিয়ে তিন দফা বা রাউণ্ড করে হয়ে থাকে। এ ছাড়া এক ধরনের পেশাদার ফ্রি স্টাইল কুস্তিও প্রচলিত রয়েছে। এই কুস্তিতে এক পক্ষ অপর পক্ষকে ব্যথা দিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। কুস্তির শ্রেণীগুলি নিম্নরূপ :

১. লাইট ওয়েট—৪৮ কেজি পর্যন্ত
২. ফ্লাই ওয়েট—৫২ কেজি পর্যন্ত
৩. ব্যান্টাম ওয়েট— ৫৭ কেজি পর্যন্ত
৪. ফেদার ওয়েট—৬২ কেজি পর্যন্ত
৫. লাইট ওয়েট—৬৮ কেজি পর্যন্ত
৬. ওয়েল্টার ওয়েট—৭৪ কেজি পর্যন্ত
৭. মিড্‌ল্ ওয়েট— ৮২ কেজি পর্যন্ত
৮. লাইট হেভি ওয়েট—৯০ কেজি পর্যন্ত
৯. হেভি ওয়েট—১০০ কেজি পর্যন্ত
১০. সুপার হেভি ওয়েট—১০০ কেজির উপর।

১৯১২ সালে আন্তর্জাতিক কুস্তি ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৮৯৬ সালের প্রথম আধুনিক অলিম্পিক থেকে অলিম্পিক

www.pathagar.com

খেলায় কুস্তি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৫৪ সাল থেকে এশিয়ান গেম্‌সে (দ্র) কুস্তি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে কুস্তি খেলা বহুদিন থেকেই চালু আছে। পূর্বে দেশের প্রত্যেক জমিদারের নিজের কুস্তিগীর ও কুস্তির আখড়া থাকত। এখন কুস্তির প্রসার কমে গেছে, তবে প্রতি বছর জাতীয় কুস্তি ও জুনিয়র কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বর্তমানে এই খেলাটি নগরকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ (দ্র) বরাবরই আন্তর্জাতিক কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

কা. আ. আ.

কৃত্তিবাস ওঝা [আনু. ১৭শ শতাব্দী]

কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামকথা-কাব্য বা শ্রীরামপাঞ্চালী রচনা করেন। তিনি বাংলার প্রাচীনতম কবিদের অন্যতম। তিনি যে 'রামায়ণ' রচনা করেন তাকে অনেকেই বাল্মীকির 'রামায়ণ' -এর অনুবাদ বলতে নারাজ। বাল্মীকি যে রামকথা প্রথম লিখে গিয়েছিলেন, তার গল্পাংশ এ দেশে যেভাবে লোকমুখে চলে এসেছে, তা-ই কৃত্তিবাস বর্ণনা করেছেন নিজের ভাষায়। তাঁর মূল রচনা পাওয়া যায় নি। যে পুঁথিতে তাঁর 'রামায়ণ'পাওয়া গেছে তার অধিকাংশের লিপিকার ১৫০–২০০ বছরের বেশি পূর্বের নয়। তখন পর্যন্ত ছাপাখানা চালু হয় নি বলে মূল রচনা লিপিকারের মাধ্যমে কপি করা হত। মূল রচনা থেকে লিপিকারের নকল করা এসব পুঁথির মধ্য দিয়ে কালে কালে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কবির ভণিতা ও লেখা একই পুঁথিতে যোগ হয়ে যেত। সুতরাং কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' অনেকখানি বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়ে এই কালে এসে মুদ্রিত হয়েছে।

কৃত্তিবাসের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে। ১৩২২ সনে সেখানে কৃত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী ওঝা ও মা মালিনী। তাঁর ছয় ভাই ও বৈমাত্রেয় এক বোন ছিল। বারো বছর বয়সে কৃত্তিবাস বরেন্দ্রভূমিতে বিদ্যার্জন করতে যান। বিদ্যালাভ করে তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় যান। সেখান থেকে দেশে ফিরে তিনি 'রামায়ণ' রচনা করেন। তাঁর 'রামায়ণ' প্রথম ছাপা হয় শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে ১৮০২-৩ সালে পাঁচ খণ্ডে। লোকপ্রিয়তার বিচারে কৃত্তিবাস বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে খ্যাত।

বি. ব.

কৃমিরোগ (helminthiasis)

কৃমি বহুকোষী পরজীবী (দ্র) শ্রেণীর অন্তর্গত। কৃমি পুষ্টি শোষণ করে কিংবা বিষাক্ত বস্তু নিঃসরণ করে মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করে। মানবদেহে সচরাচর রোগ সৃষ্টিকারী কৃমির মধ্যে রয়েছে গোলকৃমি, বক্রকৃমি, সুতাকৃমি ও ফিতাকৃমি।

গোলকৃমি বা রাউণ্ডওয়ার্ম (roundworm) দেখতে কেঁচোর মতো। মানুষের অন্ত্রে বাস করে। গোলকৃমির পূর্ণাঙ্গ ডিম দূষিত খাবার, পানি, ফল ইত্যাদির মাধ্যমে পাকস্থলীতে (দ্র) প্রবেশ করে এবং পরিপাকতন্ত্র (দ্র) ও শ্বসনতন্ত্রের (দ্র) বিভিন্ন অংশে বিচরণ-শেষে পুনরায় পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ করে ক্ষুদ্রান্ত্রে পূর্ণাঙ্গ কৃমিতে পরিণত হয়।

বক্রকৃমি বা হুক্‌ওয়ার্ম (hookworm) ধূসর-সাদা বর্ণের ছোট ছোট কৃমি। স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বক্রকৃমির ডিম থেকে নির্গত শূককীট মানুষের পায়ের পাতার চামড়া ভেদ করে দেহে প্রবেশ করে কৃমিরোগ ঘটায়।

সুতাকৃমি বা থ্রেড্‌ওয়ার্ম (threadworm) ছোট ছোট সুতার আকৃতিবিশিষ্ট কৃমি। সুতাকৃমির ডিম মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে

www.pathagar.com

প্রবেশের ফলে এই কৃমিরোগ দেখা দেয়। এই কৃমিরোগে মলদ্বারের চারপাশে ভীষণ চুলকানি হয়।

ফিতাকৃমি বা টেপওয়ার্ম (tapeworm) লম্বা আকৃতির এবং এর দেহ অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত। ফিতাকৃমির শূককীট দ্বারা আক্রান্ত বিভিন্ন পশুর মাংস, মাছ কাঁচা বা অর্ধসেদ্ধ খেলে মানুষ এই কৃমিতে আক্রান্ত হয়। এর প্রতিরোধব্যবস্থা হিসাবে মাছ-মাংস ভালভাবে সিদ্ধ করে খাওয়া যেমন উচিত, তেমনি পশুকেও পরিষ্কার খাবার খেতে দেওয়া উচিত।

কৃমিরোগে দুর্বলতা, বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা, কাশি, চুলকানি, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। কৃমিরোগের প্রতিরোধব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, যেখানে-সেখানে মলত্যাগ না করা, মাছি বা অন্যান্য মাধ্যমে সংক্রমিত খাবার না খাওয়া, খাওয়ার আগে এবং মলত্যাগের পর হাত ভালভাবে পরিষ্কার করে ধোওয়া, খালি পায়ে না হাঁটা ইত্যাদি। ঔষধের সাহায্যে দেহ থেকে কৃমির পূর্ণ অপসারণই কৃমিরোগের যথাযথ চিকিৎসা হিসাবে স্বীকৃত।

আ. আ. হা.

কৃষক-প্রজা পার্টি

অবিভক্ত বাংলায় জমিদার ও মহাজনদের শোষণে জর্জরিত কৃষকদের কল্যাণে গঠিত একটি রাজনৈতিক দল। এর মূল উদ্যোক্তা ও সংগঠক ছিলেন 'শেরে বাংলা' এ.কে. ফজলুল হক (দ্র)। দলটি গঠিত হয় ১৯২৭ (মতান্তরে ১৯২৯) সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি নামে। ১৯৩৬ সালে পরিবর্তিত নাম হয় কৃষক প্রজা পাটি।

১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় বিধানসভার নির্বাচনে এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন এই দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে মন্ত্রিসভা গঠন করে।

কৃষক-প্রজা পার্টির স্লোগান ছিল : 'লাঙ্গল যার, জমি তার, ঘাম যার দাম তার'। দলটির দাবি ও লক্ষ্যের মধ্যে ছিল বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা রহিত করা, জমিতে কৃষক-প্রজার স্থায়ী মালিকানাস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা, সেলামি প্রথা উচ্ছেদ করা, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা ও শোষণমূলক মহাজনী প্রথা রদ করা ইত্যাদি।

পরবর্তী কালে শেরে বাংলা মুসলিম লীগে (দ্র) যোগ দিলে কৃষক-প্রজা পার্টি কার্যত বিলুপ্ত হলেও অবিভক্ত বঙ্গের কৃষকসমাজের কল্যাণ সাধনে এর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

১৯৫৩ সালে শেরে বাংলা দলটিকে পুনরুজ্জীবিত করেন 'কৃষক-শ্রমিক পার্টি' নামে এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এই দলটি ছিল যুক্তফ্রন্টের (দ্র) শরিক দলগুলোর একটি।

আ. হ.

কৃষণ চন্দর [১৯১৫—১৯৭৭]

আধুনিক উর্দু সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথাশিল্পী। তিনি ১৯১৫ সালের ২৩শে নভেম্বর লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গৌরীশঙ্কর রাজ-চিকিৎসক ছিলেন।

কৃষণ চন্দরের শিক্ষাজীবন শুরু হয় কাশ্মীরে। তাঁর জীবনের একটি প্রধান অংশ সেখানেই অতিবাহিত হয়। পরবর্তী কালে তিনি লাহোরে পড়াশোনা করেন। তিনি লাহোর ফারমান ক্রিশ্চান কলেজ থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। পরে তিনি আইনশাস্ত্রেও ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি মেধাবী ছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি স্থায়ীভাবে বোম্বাইতে চলে যান।

শিক্ষাজীবন শেষে কৃষণ চন্দর কিছুকাল আকাশবাণী (দ্র) অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে চাকুরি করেন। এসময় তিনি চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে

www.pathagar.com

জড়িয়ে পড়েন। বহু চিত্রনাট্যও তিনি রচনা করেন। কিন্তু চলচ্চিত্রজগতের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পেরে তিনি গভীরভাবে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। সাহিত্যচর্চার শুরুতেই তিনি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। সারা জীবন তিনি লিখে জীবিকানির্বাহ করেছেন।

কৃষণ চন্দর ছোটগল্প (দ্র), উপন্যাস (দ্র), নাটক (দ্র), শিশুসাহিত্য ও ব্যঙ্গরচনাসহ সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় সমানভাবে বিচরণ করেছেন। সব মাধ্যমেই তিনি ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর চিন্তা ও ভাবের জগৎ ছিল বিশাল ও বিচিত্র। মানুষের কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ভাবপ্রকাশের এমন পথ ও শৈলী গ্রহণ করেন যাতে সহজেই সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। জীবনের বিভিন্ন দিক ও সমস্যার প্রতি তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ভাষার পারিপাট্য, বর্ণনার সাবলীলতা ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে তাঁর প্রতিটি রচনা হয়ে উঠেছে অনবদ্য। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো তীব্র সংবেদনশীল বিষয়ও তাঁর একাধিক রচনায় বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে মহৎ সাহিত্যের অনেক উপাদান। বলা হয়, সমগ্র উর্দু সাহিত্যে তাঁর মতো জীবনবাদী প্রগতিশীল লেখক খুব বেশি নেই।

কৃষণ চন্দরের গ্রন্থসংখ্যা শতাধিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মগুলো হল—উপন্যাস : 'শিকাস্ত' (পরাজয়), 'আনদাতা' (অন্নদাতা), 'তুফান কি কলিয়া', 'বরফ কি ফুল', 'আসমান রওশন হ্যায়', 'সুবাহ হোতি হ্যায়', 'বুবরান ক্লাব', 'দর্দ কি নহর', 'মিট্টি কা সমন', 'গাধে কি সরগুজাশ্‌ত্', 'ফুল কি তানহাই', 'আধারাস্তা', 'গাদ্দার', 'জব খেত জাগে'; গল্প : 'নাজারে', 'জান্নাত ওয়া জাহান্নাম', 'ঘুংঘট মে গোরি জালে', 'পেশওয়ার এক্সপ্রেস', 'সড়ক ওয়াপস্ যাতি হ্যায়', 'কালা সুরুজ'; নাটক : 'দরওয়াজে', 'তিন গুণ্ডে'; কিশোর উপন্যাস : 'উল্টা দরখত্', 'চালাক খরগোশ', 'চিড়িয়া কি আলিফ লায়লা', 'কারজাং', 'সিতারো কি শায়ের'। তাঁর 'শিকাস্ত' এবং 'আনদাতা' নামক উপন্যাস দু'টি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর অনেকগুলো উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। এই উপমহাদেশ ছাড়াও বর্হিবিশ্বে অনূদিত হয়েছে তাঁর অনেক রচনা। কৃষণ চন্দরের অনেকগুলো বই বাংলাতেও অনূদিত হয়েছে।

সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃষণ চন্দর নেহরু পুরস্কার (দ্র) এবং 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৭ সালের ৮ই মার্চ ৬২ বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন।

সুজ. ব.

কৃষি-প্রকৌশল

সম্প্রতি কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তি-কৌশল প্রয়োগ করে অধিক ও উন্নত মানের ফসল ফলানোর যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হচ্ছে, একে কৃষি-প্রকৌশল বলা হয়। মানুষের প্রাচীন কর্মকাণ্ডের মধ্যে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। কৃষি মানবসভ্যতার একটি বড় ভিত্তি। মানুষ ক্রমে ক্রমে কৃষিকাজের নানা কৌশল আয়ত্ত করেছে। এক্ষেত্রে মানুষ যেখানে ঠেকেছে সেখানে তার উদ্ভাবনী মেধা খাটিয়ে সমস্যার সমাধান করেছে। এভাবে মানুষ কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত পানিসেচপদ্ধতি, আবহাওয়া বিজ্ঞান, কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বীজ-সংরক্ষণ ইত্যাদি নানা বিষয় আবিষ্কার করেছে। আগে পৃথিবীতে (দ্র) মানুষের সংখ্যা ছিল কম। ক্রমেই পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। জনসংখ্যা বাড়লেও জমির পরিমাণ বাড়ে নি। কিন্তু বাড়তি লোকের জন্য বাড়তি ফসল ফলানো চাই। তাই বিজ্ঞানীরা আরো উন্নত প্রযুক্তি, কৃত্রিম সার, কীটনাশক (দ্র) ইত্যাদি আবিষ্কারের উদ্যোগ নেন। এভাবে কৃষি-প্রকৌশলবিদ্যার পত্তন হয়।

কৃষি-প্রকৌশলকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়—যান্ত্রিক কৃষি-প্রকৌশল ও জৈবিক কৃষি-প্রকৌশল। যান্ত্রিক কৃষি-প্রকৌশল জমি চাষ, বীজবপন, নিড়ানি, ফসল সংগ্রহ, ফসল বাছাই, মাড়াই ইত্যাদির জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করে থাকে। এই প্রকৌশল ফসল-ক্ষেতে তাপমাত্রা ও আলোকদৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করে এক ঋতুর ফসল অন্য ঋতুতেও ফলানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। জৈবিক কৃষি-প্রকৌশল বিভিন্ন ধরনের উন্নততর জাত উদ্ভাবন, রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবন এবং উচ্চ ফলনশীল বা উফশী ফসলের (দ্র) জাত উদ্ভাবনের কাজ করে। বর্তমানে জিন-প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি, হরমোন প্রয়োগ ধরনের আরো উন্নত কৌশল

www.pathagar.com

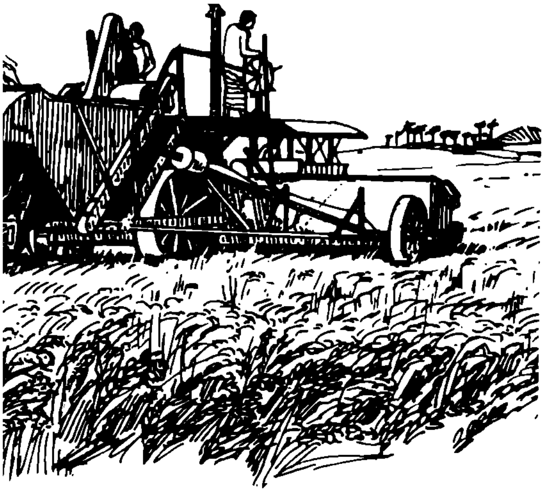

কৃষি প্রকৌশলে আধুনিক পদ্ধতির কৃষিকর্মে যুগান্তকারী অবদান ট্রাক্টর

আবিষ্কৃত হচ্ছে এই শাখায়। ফসলের শত্রু কীটপতঙ্গ (দ্র) দমনে ও জৈবিক নিয়ন্ত্রণেও এই বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। স্বল্প পরিমাণ জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব করেছে কৃষি-প্রকৌশল।

ত. চ.

কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ দ্র

কৃষ্ণচূড়া

কৃষ্ণচূড়া গাছ ও এর ফুল আমাদের অনেকের কাছেই পরিচিত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এর ছড়িয়ে থাকা ডাল-পালা ফুলে ফুলে ভরে যায়। উজ্জ্বল-লাল কিংবা গাঢ়-কমলা রঙ এর ফুল। তখন বহুদূর থেকেও গাছটির সৌন্দর্য চোখে পড়ে।

কৃষ্ণচূড়া মাঝারি আকারের বৃক্ষ। এর শাখা-প্রশাখা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। পাতা যৌগিক ও দ্বি-পক্ষল। পাতার দৈর্ঘ্য ২.৫ থেকে ৪ সেন্টিমিটার। ফুলের ব্যাস ৫ থেকে ৭.৫ সেন্টিমিটার। বৃতির বাইরের দিকটা সুবজ এবং ভেতরের দিকটা লাল। দলে পাপড়ির সংখ্যা ৫টি। ফল বেশ লম্বা

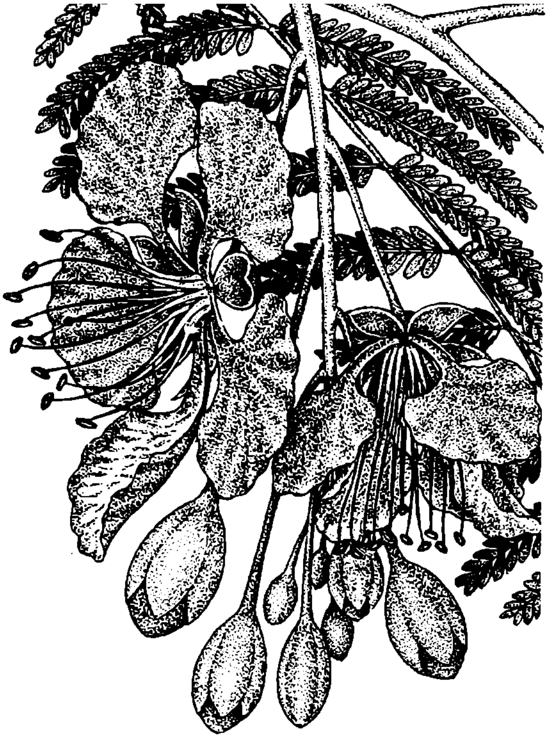

কৃষ্ণচূড়ার ফুল ও পাতা

হয়— ২৫ থেকে ৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। কচি ফলের রঙ সবুজ, পাকা ফল গাঢ় ধূসর। একটি ফলে লম্বাকৃতির অনেকগুলো বীজ থাকে।

কৃষ্ণচূড়া গাছে শীতের শেষ দিকে ফুল ফুটতে শুরু করে। চৈত্র-বৈশাখ মাসেই গাছে ফুল থাকে সবচেয়ে বেশি। তার পর ধীরে ধীরে ফুলের সমারোহ কমতে থাকে। মোটামুটি বর্ষার শেষ পর্যন্ত অনেক গাছেই ফুল ফুটতে দেখা যায়। ফুল গাঢ়-লাল, লাল, কমলা, হলুদ, হালকা হলুদ ইত্যাদি নানা রঙের হয়ে থাকে।

কৃষ্ণচূড়া গাছের কাণ্ড খুব দীর্ঘ হয় না, শাখা-প্রশাখাও খুব একটা উর্ধ্বগামী হয় না। ফলে ছড়িয়ে যাওয়া শাখা-প্রশাখায় গাছটিকে অনেকটা ছাতার মতো মনে হয়। এর কাণ্ড বা শাখা খুব মজবুত নয়। কাঠ মূলত জ্বালানি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

কৃষ্ণচূড়া আমাদের খুব চেনা হলেও এর আদি নিবাস অনেক দূরে। আফ্রিকার মাদাগাস্কার দ্বীপপুঞ্জ থেকে এটি

www.pathagar.com

কৃষ্ণচূড়া গাছের অবয়ব

প্রথমে যায় ইউরোপে (দ্র) এবং মাত্র গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশেরা এটিকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসে। লেগুমিনোসি পরিবারের এই গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম *Delonix regia Raf.* ইংরেজি Flame tree, Peacock tree.

ফ. মা.

কৃষ্ণপ্রস্তর হজরে আসওয়াদ দ্র

কৃষ্ণবিবর (black hole)

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যায় মনে করা হয়, মহাকাশে কোনো কোনো তারার মাধ্যাকর্ষণ এত বেশি যে এর আকর্ষণ কাটিয়ে কোনো কিছুই এর বাইরে আসতে পারে না—এমনকি আলোও নয়। ফলে এসব তারা অদৃশ্য। এদেরকে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণবিবর বলা হয়। কৃষ্ণবিবরের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রচলিত মত হল : কোনো কোনো অতিকায় তারা তার নিজের ভারে নিজেই নিজের ভিতর চুপসে যায়। এরকম সংকোচনের ফলে তার বস্তুঘনত্ব বেড়ে যায় অনেকখানি, ফলে এর পৃষ্ঠদেশে নিজের মাধ্যাকর্ষণও বেড়ে যায় খুব বেশি। এটি তখন একটি কৃষ্ণবিবরে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে আমাদের সূর্যের ব্যাস ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার কিলোমিটার; যদি কখনো চুপসে গিয়ে তা ৬ কিলোমিটারে পরিণত হতে পারে তা হলে সেটি কৃষ্ণবিবর হবার মতো মাধ্যাকর্ষণ-বল অর্জন করবে।

অদৃশ্য হবার কারণে কৃষ্ণবিবরের অস্তিত্ব সরাসরি প্রমাণের কোনো উপায় নেই। তবে পরোক্ষভাবে এর অস্তিত্ব অনুমান করা হয়েছে। যেমন— দৃশ্যমান একটি বিশাল অতিদানব ধরনের তারার চলাচলের আচরণ থেকে বোঝা যায় যে এর একটি নিকটসঙ্গী রয়েছে, যা অত্যন্ত ভারি হতে বাধ্য, অথচ সে সঙ্গী তারাটিকে দেখা যাচ্ছে না। একই সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহবাহিত এক্সরে টেলিস্কোপে (দ্র) একটি এক্সরে সংকেতে বোঝা গেছে যে সেই অদৃশ্য স্থানে মাত্র ৩০০ কিলোমিটার ব্যাসের একটি উৎস রয়েছে। সব দিক থেকে প্রমাণিত হয় যে ওখানে একটি কৃষ্ণবিবরই রয়েছে। কোনো কোনো জ্যোতির্বিদ মনে করেন, আমাদের ছায়াপথের সমস্ত তারকাবস্তুর এক-তৃতীয়াংশই রয়েছে কৃষ্ণবিবররূপে।

আইনস্টাইনের (দ্র) আপেক্ষিকতার তত্ত্ব (দ্র) অনুসারে বস্তুমাত্রই তার মাধ্যাকর্ষণের কারণে নিজের আশপাশের 'স্থানে' একটি বিকৃতির চতুর্থ মাত্রা সৃষ্টি করে। কৃষ্ণবিবরের ক্ষেত্রে এই বিকৃতি চরম রূপ লাভ করে এবং এখানে 'স্থানে'র মধ্যে যেন এক এক 'অতল কূপ' সৃষ্টি হয়। কেউ এই অতল কূপের মধ্যে পড়লে সে কূপের অন্য প্রান্তে স্থান-কালের অন্য এক অংশে উঠে আসবে, যেখানে শুধু স্থান নয়, কালও হবে ভিন্ন—হয়তো-বা সুদূর অতীতে বা ভবিষ্যতে। যদিও আপাতত প্রমাণের কোনো উপায় নেই, তবু কৃষ্ণবিবর এরকম চমকপ্রদ কিছু তাত্ত্বিক চিন্তার উদ্ভব করেছে।

মু. ই.

কেঁচো

সাধারণত মৃত্তিকা-কৃমিকেই (earthworms) কেঁচো বলা হয়। পৃথিবীর (দ্র) প্রায় সর্বত্র, এমনকি ৩০০০ মিটার উঁচু পার্বত্যভূমিতেও কেঁচো দেখা যায়। কেঁচো মাটির মধ্যে থাকে, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে চলে, চলার পথে মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং মাটিতেই মলত্যাগ করে। এভাবে কেঁচো মাটিকে নরম ও উর্বরা করে তোলে। এ কারণে কেঁচোকে 'প্রকৃতির লাঙ্গল' বলেও উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া কেঁচো গৃহপালিত হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসাবে এবং মাছ ধরার জন্যও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

কেঁচো অমেরুদণ্ডী (দ্র) প্রাণী। সাধারণত জৈবপচন যুক্ত (humus) নরম মাটিতে থাকে। কেঁচোর লম্বা শরীরের অগ্রভাগ বা মুখের অংশ বেশ সরু। মাটিতে ছোটখাট কোনো ছিদ্র পেলে সেখানে অগ্রমুখটি (peristomium) ঢুকিয়ে দেয় এবং পেছনের অংশটিকে সংকুচিত করে

www.pathagar.com

সামনের দিকে চাপ দেয়। ফলে ছিদ্র ক্রমশ বড় হয় এবং শরীরটাকে মাটির মধ্যে ঢোকাতে থাকে। এ ছাড়া মাটি খাওয়ার কারণেও কেঁচোর পক্ষে গর্ত খোঁড়া সহজ হয়। কেঁচো মুখ দিয়ে মাটি খায় এবং শরীরের অপর প্রান্ত দিয়ে বের করে দেয়। এই খাওয়া এবং বের করে দেওয়ার মধ্যেই

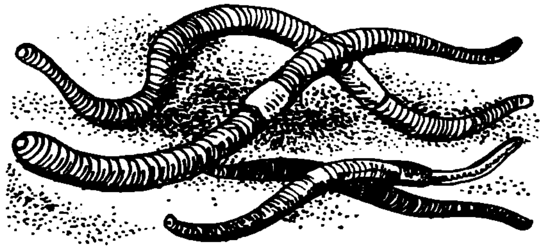

কেঁচোর শরীর মাটি থেকে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করে নেয়।

কেঁচোর আকৃতিতে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। কেঁচোর শরীরের দৈর্ঘ্য মাত্র ১ মিমি থেকে শুরু করে ১ মিটার (৩ ফুট) পর্যন্ত হতে পারে। দেহের রং সাধারণত লালচে-বাদামি। এর কোনো চোখ বা কান নেই। মুখের অংশটি তাপ, আলো ও স্পর্শের প্রতি অত্যন্ত সংবেদী। কেঁচোর কোনো ফুসফুস নেই। ত্বকের সাহায্যেই এরা শ্বাসকার্য চালায়। একই কেঁচোতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জননাঙ্গই থাকে। তবে ডিম পাড়ার জন্য একটি কেঁচোকে অন্য একটি কেঁচোর সঙ্গে মিলিত হতে হয়।

ফ. মা.

কেদারনাথ

হিন্দুদের অন্যতম প্রধান দেবতা শিবের নাম কেদারনাথ। শিবের নামের সঙ্গে জড়িত হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান কেদারনাথ ভারতের (দ্র) উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। ৩৫৮৪ মিটার উঁচুতে হিমালয়ের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ২ x $\frac{১}{২}$ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে একটি উপত্যকা। এ উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী নদী। কেদারনাথ পাহাড়ের পাদদেশে পাথরের তৈরি মন্দির। মন্দিরের ভেতরে প্রতিষ্ঠিত মহিষরূপী কেদারনাথজী। প্রবাদ, এই মন্দির মহাভারতের (দ্র) পাণ্ডবদের তৈরি। দীপান্বিতা থেকে অক্ষয় তৃতীয়া পর্যন্ত মন্দির বন্ধ থাকে। কারণ, এ সময়ে কেদারনাথ পাহাড় থাকে বরফে ঢাকা।

কাছেই রয়েছে প্রখ্যাত ধর্মগুরু শঙ্করাচার্যের (দ্র) সমাধিক্ষেত্র। কথিত আছে শঙ্করাচার্যই এই তীর্থটি উদ্ধার করেন।

নি. অ.

কেনিয়াপিথেকাস (Kenyapithecus)

১৯৬২ সালে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ লুই সেমুর ব্যাজেট লিকি (Louis Seymour Bazett Leakey : ১৯০৩-১৯৭২) আফ্রিকার কেনিয়া অঞ্চলে এপ (দ্র) সদৃশ প্রাণীর চোয়াল এবং কয়েকটি দাঁত উদ্ধার করেন। এগুলো আনুমানিক এক কোটি চল্লিশ লক্ষ বছর আগের বলে তিনি ধারণা করেন। তিনি এই নিদর্শনগুলোর নাম দেন 'কেনিয়াপিথেকাস', পুরো নাম কেনিয়াপিথেকাস আফ্রিকানাস। পরবর্তী কালে এগুলোর আরো নিদর্শন এ অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এরা যে তিন কোণা পাথরের সাহায্যে পশুর খুলি ও হাড় ভেঙে মগজ ও মজ্জা বের করে খেতে অভ্যস্ত ছিল তেমন প্রমাণও লিকি আবিষ্কার করেছেন। কেনিয়াপিথেকাসের সঙ্গে রামাপিথেকাসের (দ্র) দৈহিক মিল দেখে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়েছেন। তাদের কেউ কেউ মনে করেন, রামাপিথেকাস ও কেনিয়াপিথেকাস একই জাতির এশীয় এবং আফ্রিকীয় সংস্করণ।

সৈ. আ. ই.

কেনেডি, জন ফিটজেরাল্ড [১৯১৭—১৯৬৩]

আমেরিকার (দ্র) পঁয়ত্রিশতম প্রেসিডেন্ট। ১৯১৭ সালের ২৯শে মে ম্যাসাচুসেট্স্ প্রদেশের ব্রুক্লিন্ শহরে এক ধনী পরিবারে কেনেডির (John Fitzgerald Kennedy) জন্ম। পিতা জোসেফ পি. কেনেডি ইংল্যাণ্ডে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

জন এফ. কেনেডি লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স নামক প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেন। ১৯৪০ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি নেন।

১৯৪১ সালে তিনি আমেরিকার নৌবিভাগে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতা ও কুশলতার সঙ্গে লেফটেন্যান্টের

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালন করেন।

যুদ্ধের পর কিছুদিন সাংবাদিকতা করেন কেনেডি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত আমেরিকার হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের নির্বাচিত প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালে ম্যাসাচুসেট্‌স্ থেকে সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন প্রথম বারের মতো। ১৯৬০ সালে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী নিক্সনকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

তাঁর শাসনামলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিনীতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের (দ্র) সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। নিগ্রোদের সমান অধিকার আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৬৩ সালের ২২শে নভেম্বর তিনি টেক্সাস প্রদেশের ডালাস শহরে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

টি. কি.

জন এফ. কেনেডি আলাপ করছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন বি. জনসন ও প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারার সঙ্গে

কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলা শিশুসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র

কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর শিশুসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র

কেন্দ্রীয় বাঙ্‌লা উন্নয়ন বোর্ড

বর্তমানে বিলুপ্ত একটি সংস্থা। ১৯৬২ সালের মে মাসে তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রস্তাব অনুসারে এই সংস্থার জন্ম হয়। ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে এর আনুষ্ঠানিক গঠনকাজ শেষ হয়। এর দফতর প্রথমে ছিল ঢাকার শান্তিনগরে। সংস্থাটির লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষা (দ্র) ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন, বিশেষত প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানসহ প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চায় বাংলা ভাষা ব্যাপক ব্যবহারে এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অন্য সব সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা। বাংলা ভাষার পাশাপাশি উর্দু ভাষার প্রচারে সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশও এই সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এর কার্যনির্বাহী কমিটিতে দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও ভাষাবিশেষজ্ঞগণ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কেন্দ্রীয় বাঙ্‌লা উন্নয়ন বোর্ড ছিল একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলেও এটি মন্ত্রণালয়ের কোনো রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে কাজ করত। এই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার মধ্যে ছিল বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশিত বাংলা পরিভাষা-কোষ, বেশ কিছু গবেষণাগ্রন্থ এবং কয়েকটি সাময়িকী।

বাংলাদেশ (দ্র) স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৭ই মে এক সরকারি আদেশবলে কেন্দ্রীয় বাঙ্‌লা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর (দ্র) সঙ্গে একীভূত হয়।

আ. হু.

কেন্দ্রীয় মুকুল ফৌজ শিশুসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র

কেপ্‌লার, ইওহানেস্ [১৫৭১—১৬৩০]

জার্মান জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী। জন্ম ২৭শে ডিসেম্বর, ১৫৭১ সাল। মৃত্যু ১৫ই নভেম্বর, ১৬৩০ সাল। দক্ষিণ জার্মানির এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ইওহানেস্

www.pathagar.com

(Johannes Kepler)। স্কুলজীবনে তাঁর অধ্যবসায় এবং বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে গুটেন্‌বার্গের ডিউক তাঁর উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শন, গণিত ও ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। এই সময় সবাই ধারণা করতেন যে পৃথিবী (দ্র) স্থির এবং সূর্য (দ্র)ও চন্দ্র, গ্রহ (দ্র), নক্ষত্র (দ্র) ও সমস্ত বিশ্ব পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। এ সম্পর্কে ১৫৪৩ সালে জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাসের (দ্র) সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তত্ত্বটি হল—সূর্য স্থির, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তখনকার দিনে এই তত্ত্বটি কেউ মেনে নেন নি। কিন্তু কেপ্‌লারের শিক্ষক মাইকেল ম্যাস্টলিন তত্ত্বটি বিশ্বাস করতেন। কেপ্‌লারকে তিনি তত্ত্বটির প্রতি আকৃষ্ট করেন। কেপ্‌লার গ্রহ-নক্ষত্রের গতি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন।

কেপ্‌লারের ইচ্ছা ছিল ধর্মযাজক হবেন। কিন্তু তিনি অস্ট্রিয়ার গ্রেজে একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি নেন। ২৪ বছর বয়সে তিনি 'Mysterium Cosmographicum' (বিশ্বতত্ত্বের রহস্য) নামে একটি বই লেখেন। এতে তিনি কোপার্নিকাসের তত্ত্বের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানান। বইটি ইউরোপের (দ্র) খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহের (Tycho Brahe : ১৫৪৬-১৬০১) দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি কেপ্‌লারকে তাঁর সঙ্গে গবেষণা করতে আমন্ত্রণ জানান। টাইকো ব্রাহে ছিলেন প্রাগ মানমন্দিরের প্রধান এবং রোমের প্রধান রাজজ্যোতির্বিদ। তাঁর মৃত্যুর পর কেপ্‌লার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন (১৬০১)।

দীর্ঘদিন গ্রহনক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে কেপ্‌লার তিনটি সূত্র উদ্ভাবন করেন, যা কেপ্‌লারের সূত্র হিসাবে খ্যাত। এগুলো হল : ১. সূর্যকে উপকেন্দ্রে রেখে গ্রহগুলি উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে; ২. গ্রহের গতি সূর্য থেকে তার দূরত্বের উপর নির্ভরশীল; গ্রহ এবং সূর্যের সংযোগকারী রেখা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্র অতিক্রম করে; ৩. একটি গ্রহের আবর্তনকালের বর্গকে সূর্য থেকে এর গড় দূরত্বের ঘনফল দ্বারা ভাগ করলে একটি ধ্রুব সংখ্যা পাওয়া যাবে। প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রটি ১৬০৯ সালে এবং তৃতীয় সূত্রটি ১৬১৯ সালে প্রকাশিত হয়।

এ ছাড়া কেপ্‌লার আলোকতত্ত্বের গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আমরা কীভাবে দেখি তিনি তার প্রথম ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, বিচ্ছুরিত রশ্মিকণা আমাদের চোখের তারারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ফোকাস হয়ে রেটিনা (দ্র) বা অক্ষিপটে পড়ে। রেটিনা আলোকসংবেদী, দর্শনের অনুভূতি জাগায়। আলোকরশ্মির ফোকাস রেটিনার সামনে বা পিছনে পড়লে চোখে ঝাপসা দেখা যায়। এই তত্ত্বের জন্য তাঁকে আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

স. রা.

কেবিনেট মিশন (Cabinet Mission)

চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, নৌবাহিনীর বিদ্রোহ এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) আঘাত সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করে তুলেছিল। ভারতে (দ্র) ব্রিটিশ শাসনের উপর এই প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ব্রিটেনে উদারপন্থী লেবার পার্টির সরকার গঠিত হওয়ার ফলে প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট রিচার্ড এটলির (দ্র) উদ্যোগে ভারতীয় স্বশাসন সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬, কমন্স সভায় ভারতে কেবিনেট মিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। তিন সদস্যের এই মিশনে ছিলেন সেক্রেটারি অব স্টেট লর্ড পেথিক লরেন্স, ট্রেডবোর্ডের সভাপতি স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ ও নৌবাহিনীর প্রথম লর্ড এ. ভি. আলেকজাণ্ডার। মন্ত্রী মিশনের সদস্যরা ভারতে আসেন ১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ।

কেবিনেট মিশনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল এবং দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গে আলোচনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্বাধীন দেশীয় সরকার গঠনের জন্য গঠনতন্ত্র তৈরির পদ্ধতি নির্ধারণ ও সে জন্য কমিটি গঠন এবং একটি একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন। কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব (১৬.৫.৪৬) ছিল—নতুন গঠনতান্ত্রিক কাঠামোয় বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন (কেন্দ্রীয় সরকার), যার

www.pathagar.com

হাতে থাকবে বৈদেশিক বিষয়, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ এবং অর্থ। কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের আওতায় তিনটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল (বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে হিন্দু-প্রধান অঞ্চল এবং পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে মুসলমানপ্রধান পশ্চিমাঞ্চল এবং বাংলা ও আসাম নিয়ে অনুরূপ পূর্বাঞ্চল) গঠন। দেশীয় রাজ্যগুলো তাদের ইচ্ছামত যে কোনো অঞ্চলে যোগ দিতে পারবে। গঠনতন্ত্র তৈরির জন্য প্রদেশগুলো থেকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ২৯২ জন এবং দেশীয় রাজ্য থেকে ৯৩ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হবে। মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন নিয়ে বড়লাটের উদ্যোগে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। এই পরিকল্পনাই 'কেবিনেট মিশন প্রস্তাব' নামে পরিচিত।

প্রথমে কংগ্রেস (দ্র) ও মুসলিম লীগ (দ্র) উভয় দলই এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। কিন্তু পরে উভয় পক্ষের নানা ধরনের দাবির টানাপোড়েনে পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে যায় এবং কেবিনেট মিশন দৌত্যকর্মে বিফল হয়ে স্বদেশে ফিরে যায়।

আ. র.

কেমোচিকিৎসা (Chemotherapy)

লুই পাস্তুর (দ্র), রবার্ট কক (দ্র) প্রমুখ বিজ্ঞানীর গবেষণায় সংক্রামক রোগের কারণরূপে জীবাণুর (দ্র) ভূমিকা প্রমাণিত হবার পর সেই সূত্রে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই জীবাণুনাশক ঔষধ (দ্র) আবিষ্কারের দিকে বিজ্ঞানীদের নজর পড়ে।

বিশ শতকে পৌঁছে জার্মান চিকিৎসক পাউল্ এর্লিক্ (Paul Ehrlich : ১৮৫৪-১৯১৫) প্রথম রঞ্জক পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে জীবাণু-নাশক আর্সেনিক যৌগের সন্ধান পান। ১৯০৯ সালে তাঁর আবিষ্কৃত ৬০৬ নম্বর যৌগটি পরে 'স্যালভার্সান' নামে খ্যাতি অর্জন করে।

এর পর ১৯৩৫ সালে আরেক জার্মান বিজ্ঞানী গেরহার্ড ডোমাক্ (Gerhard Domagk : ১৮৯৫-১৯৬৪) 'প্রন্টোসিল রুব্রাম' নামে একটি জীবাণুনাশক রাসায়নিক উপাদান আবিষ্কার করে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এটি বহুল পরিচিত সালফোনেমাইড জাতীয় জীবাণুবিরোধী ঔষধের আদি সংস্করণ। এর পর ব্রিটেন ও ফ্রান্সে এর উন্নত রূপ সংশ্লেষিত হয়ে জীবাণুবিরোধী চিকিৎসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। জীবাণুবিরোধী এই সব রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যে চিকিৎসা পরিচিত হয়ে ওঠে কেমোথেরাপি বা কেমোচিকিৎসা নামে।

ক্রমে এই পথে উন্নততর ও নিরাপদ উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হয়েছে একাধিক রাসায়নিক ঔষধ। এগুলো জীবাণু ও পরজীবীর (দ্র) বিরুদ্ধে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এন্টিবায়োটিকের (দ্র) উপস্থিতি সত্ত্বেও মেট্রোনিডাজোল, ট্রাইমেথোপ্রিম, ড্যাপসোন, আইসোনিয়াজিড নামীয় ঔষধগুলো বিভিন্ন সংক্রামক রোগের (দ্র) বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। এবং এর পরও চলছে পরজীবী সংক্রমণের বিরুদ্ধে নতুন নতুন কেমোচিকিৎসার উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টা।

রু. হা.

কেয়ার পুরস্কার

বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি ত্রাণ ও উন্নয়ন সংস্থা কেয়ার (CARE = Co-operative American Relief Everywhere)।

উন্নয়নশীল বিশ্বে জীবনের মান উন্নয়নে যে সকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মুহম্মদ ইউনুস এই পুরস্কার লাভ করেছেন।

খু. জা.

কেরি, উইলিয়াম [১৭৬১—১৮৩৪]

খ্রিস্টধর্ম (দ্র) প্রচারক এবং বাংলা মুদ্রণশিল্প ও বাংলা গদ্যের বিকাশের ইতিহাসে স্মরণীয় পুরুষ। ১৭৬১ সালের ১৭ই আগস্ট ইংল্যাণ্ডের নর্দাম্পটনশায়ারের এক দরিদ্র পরিবারে কেরির (William Carey) জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি জুতো তৈরি ও মেরামতের কাজ করতেন। তবে শৈশব থেকেই ধর্ম ও জ্ঞানচর্চার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। টমাস জোন্সের

www.pathagar.com

উইলিয়াম কেরি

মদনবাটি নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। স্থানীয় কৃষক-প্রজাদের শিক্ষার সুবিধার্থে এখানে তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৭৯৭ সালে বই ছাপানোর উদ্দেশ্যে দেশী হরফ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলে তাঁর সঙ্গে চার্ল্‌স্ উইল্‌কিন্সের (দ্র) শিষ্য পঞ্চানন কর্মকারের (দ্র) পরিচয় হয়।

এর পর নীলকুঠি বন্ধ হয়ে গেলে কেরি কিছুকাল খিদিরপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে ১৭৯৯ সালের শেষ দিকে জোশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড, গ্রান্ট প্রমুখ মিশনারির সঙ্গে শ্রীরামপুরে যোগ দেন এবং ১৮০০ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় পঞ্চানন কর্মকারও এই মিশনের ছাপাখানায় যোগ দেন। কেরি ও পঞ্চাননের যৌথ প্রচেষ্টায় 'মিশন সমাচার' নামে বই ছাপার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রণকাজের সূচনা

নিকট তিনি গ্রিক ও লাতিন ভাষা শিক্ষা এবং বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

১৭৮৬ সালে উইলিয়াম কেরি মোল্টন্ গ্রামে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৭৯২ সালে তাঁর নেতৃত্বে খ্রিস্টানদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে কেটারিং শহরে একটি সমিতি গঠিত হয়। এ সময় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পন্থা সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় তিনি একটি বই লেখেন। ১৭৯৩ সালে ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে তাঁকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতে (দ্র) পাঠানো হয়। বঙ্গদেশে এসে রামরাম বসুর (দ্র) নিকট তিনি বাংলা ভাষা (দ্র) শেখেন এবং তাঁর সহায়তায় বাংলায় 'বাইবেল' অনুবাদ করেন।

১৭৯৪ সালে কেরি মালদহের

চাকর ভাড়া করণ। ——

তুমি কেটা। তোমার বাটী কোথায়।

সাহেব আমার নাম রমজান। আমার বাটী কলিকাতায়।

কথা বৃত্তান্ত কহিল রাজা তাহা শুনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া সে স্থানে ইষ্টক ও মসালা দিতে না পারিয়া

সমাদর করিয়া দিয়াছেন অপূর্ব্ব স্থান নিরূ
পন করিয়া দিয়া রায়কে এবং রায়ের গৃহিনীকে

উপরে : কেরির 'চাকর ভাড়াকরণ' থেকে
নিচে : 'ইতিহাসমালা' থেকে লেখা

www.pathagar.com

হয়। পরে শ্রীরামপুর থেকে কেরির নেতৃত্বে প্রায় ৪০টি ভাষা ও উপভাষায় খ্রিস্টধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১৮০১ সালের মে মাসে কেরি ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের (দ্র) বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে ভাষা শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি ভারতীয় ভাষাসমূহের, বিশেষ করে বাংলা ভাষার, সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। সুশৃঙ্খলভাবে ভাষা শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে তিনি পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ এবং অভিধান রচনা করেন। তাঁর অধীনস্থ পণ্ডিতদেরও তিনি এই কাজে উৎসাহিত করতে থাকেন।

কেরির রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল 'গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৮০১ সালে ইংরেজি ভাষায় রচিত), ডায়ালোগ্‌স্' (বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিক গ্রন্থ, ১৮০১) 'ইতিহাসমালা' (গল্পসংগ্রহ, ১৮১২), 'বাংলা-ইংরেজি অভিধান' (১৮১৫-২৫), চার খণ্ডে ওল্ড টেস্টামেন্ট বা 'ধর্মপুস্তক' (১৮০২-০৯, হিব্রু থেকে অনূদিত)। এ ছাড়া তিনি মারাঠি ব্যাকরণ ও অভিধান এবং পাঞ্জাবি ব্যাকরণ, তেলিঙ্গা ব্যাকরণ, কানাড়ি ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। তিনি ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, সংস্কৃত ও অসমীয়া ভাষাতেও বাইবেল অনুবাদ করেন। জোশুয়া মার্শম্যানের সঙ্গে মিলে তিনি মূল বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এর অযোধ্যাকাণ্ড পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। 'এ ইউনিভার্সাল ডিক্‌শনারি অব দ্য ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস' নামক সংস্কৃতসহ ১৩টি ভারতীয় ভাষায় এক সমন্বিত শব্দকোষ কেরির অসামান্য পাণ্ডিত্যের স্মারক হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু এই শব্দকোষের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হওয়ায় এর মুদ্রণ সম্পন্ন হতে পারে নি। তাঁর উদ্যোগে ১৮১৮ সালে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। পুস্তক রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশের পাশাপাশি বাংলা হরফের সংস্কার এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় হরফ তৈরির কাজেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

১৮০৬ সালে কেরি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন। ১৮০৭ সালে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অব ডিভিনিটি' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি ১৮২২ সালে বিখ্যাত লিনিয়ান সোসাইটির এবং ১৮২৩ সালে লণ্ডন জিওলজিক্যাল সোসাইটি ও রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটির সদস্য হন। ১৮২৩ সালে ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮২৪ সালে কেরি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের বাংলা অনুবাদক নিযুক্ত হন। ত্রিশ বছর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৮৩১ সালে অবসর নিয়ে তিনি পরবর্তী এক বছর শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৩৪ সালের ৯ই জুন শ্রীরামপুরে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

সুজ. ব.

কেরোসিন (kerosene)

পেট্রোলিয়াম (দ্র) পরিশোধন করে অনেকগুলো উপজাত পদার্থ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম উপাদান কেরোসিন। সস্তা জ্বালানি (দ্র) হিসাবে কেরোসিন বহুল ব্যবহৃত পদার্থ। ১৮৫৪ সালে এক জন কানাডীয় ভূতত্ত্ববিদ আব্রাহাম গেসনার পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের পাতন প্রক্রিয়ার পেটেন্ট করেন এবং কেরোসিন উদ্ভাবন করেন। কেরোসিন শব্দটি গ্রিক শব্দ কোরেস থেকে নেওয়া। কোরেস অর্থ মোম। কেরোসিন আবিষ্কারের আগে কৃত্রিম আলোক-উৎস ছিল মোমবাতি এবং উদ্ভিজ্জ তেলের বাতি। কেরোসিন আবিষ্কারের পর কুপি, হারিকেন, হ্যাজাকবাতি প্রভৃতিতে কৃত্রিম আলোক-উৎস হিসাবে কেরোসিনই জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কারের পর এর ব্যবহার কমলেও যেসব অঞ্চলে বিদ্যুৎসরবরাহ নেই এখনো সেসব অঞ্চলে আলো জ্বালতে এবং উনুনের চুলোয় কেরোসিন ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে কেরোসিনের প্রধান ব্যবহার জেট-ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসাবে। কোনো কোনো যুদ্ধবিমানে কেরোসিন এবং গ্যাসোলিনের মিশ্রণ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ট্রাক্টর, ইলেকট্রিক জেনারেটর, কীটনাশক (দ্র) ও জৈব যৌগের দ্রাবক হিসাবে কেরোসিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

কেরোসিন মূলত হাইড্রোকার্বনের (দ্র) মিশ্রণ। নির্দিষ্ট অনুপাতে কার্বন (দ্র) ও হাইড্রোজেন (দ্র) মিলে হাইড্রোকার্বন যৌগ শ্রেণী গঠন করে। যেসব হাইড্রোকার্বন যৌগের কার্বনসংখ্যা ৯ থেকে ১৬-র মধ্যে, সেগুলির মিশ্রণই কেরোসিন।

কেরোসিনের স্ফুটনাঙ্ক ১৫০° থেকে ৩০০° সে.-এর মধ্যে, আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৮।

স. রা.

কেলার, হেলেন [১৮৮০—১৯৬৮]

চরম দৈহিক পঙ্গুত্বের বাধা জয় করে আপন লক্ষ্যসাধনে একাগ্র, অদম্য জ্ঞানপিপাসু এবং মানবতাবাদী নারী।

জন্ম ১৮৮০ সালের ২৭শে জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) উত্তর আলাবামায়। হেলেন কেলারের (Helen Adams Keller) বয়স যখন ১৯ মাস, তখন তিনি আক্রান্ত হন গুরুতর মস্তিষ্কজ্বরে। ফলে তাঁকে হারাতে হয় দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি। কিছুকালের মধ্যে তিনি বাক্‌শক্তিও হারিয়ে ফেলেন।

১৮৮৭ সালের ৩রা মার্চ থেকে শিক্ষিকা অ্যান ম্যান্সফিল্ড সুলিভানের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৭ বছর বয়সে হেলেনের নতুন

জীবন শুরু হয়। অন্ধ, মূক ও শ্রবণশক্তিহীন হলেও হেলেন ছিলেন অসাধারণ মেধাবী এবং তাঁর জানার আগ্রহ ছিল প্রবল। ছাত্রীর অধ্যবসায় দেখে শিক্ষিকা মিস সুলিভান সিদ্ধান্ত নেন, হেলেনকে তিনি কথা বলতে শেখাবেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক হন মূক ও বধিরদের স্কুলের শিক্ষিকা মিস ফুলার।

অবশেষে কারো সাহায্য ছাড়াই হেলেন প্রথম কথা বলেন ১৮৯০ সালের ২৬শে মার্চ। চার শব্দের সেই বাক্যটি ছিল 'ইট ইজ ভেরি হট'। এর পর সুলিভানের চেষ্টায় এক বছরের মধ্যেই হেলেন তাঁর বাক্‌শক্তি ফিরে পান। পরবর্তী দু' বছরের মধ্যে তিনি আয়ত্ত করেন ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি, জার্মান ও গ্রিক ভাষা।

কিন্তু এখানেই থেমে থাকে নি তাঁর জীবন। ১৯০৪ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যাডক্লিফ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে।

হেলেন কেলারের শিক্ষকতাসূত্রে অ্যান ম্যান্সফিল্ড সুলিভান লাভ করেছেন 'বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকে'র মর্যাদা। প্রায় অর্ধশত বৎসরের অক্লান্ত পরিচর্যায় তিনি হেলেনকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তোলেন। ১৯৩৬ সালে অ্যান সুলিভান মারা যান।

শেষ জীবনে হেলেন কেলার মূক-অন্ধ-বধির ও দৈহিকভাবে পঙ্গু শিশু ও আর্ত মানবতার সেবায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এশিয়া (দ্র), অস্ট্রেলিয়া (দ্র), দক্ষিণ আমেরিকা (দ্র), ইউরোপ (দ্র) ও আফ্রিকার (দ্র) বহুদেশ তিনি ভ্রমণ করেন, অর্থ সংগ্রহ করে গড়ে তোলেন অসংখ্য বিদ্যালয় ও নিরাময়কেন্দ্র। তাঁর নামে সারা বিশ্বে গড়ে উঠেছে সমাজকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

হেলেন কেলার সম্পর্কে মার্ক টোয়েনের (দ্র) মন্তব্য : 'জোয়ান অব আর্কের [দ্র] পর ধরিত্রীর বুকে এমন গুণবতী নারী আর কখনো জন্মগ্রহণ করেন নি।' তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৬৮ সালের ১লা জুন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'স্টোরি অব মাই লাইফ' (১৯০৩) এবং 'টিচার' (১৯৫৫)।

আ. হ.

www.pathagar.com

কেলাস

কঠিন পদার্থের একটি রূপ হল ক্রিস্টাল (crystal) বা কেলাস। কঠিন পদার্থের পরমাণু বা পরমাণুসমষ্টি যখন পরস্পর থেকে সুনির্দিষ্ট দূরত্বে পুনরাবৃত্ত হয়ে সুনির্দিষ্ট প্যাটার্নে অবস্থান নেয়, সে ক্ষেত্রে আমরা পদার্থটির কেলাসিত রূপ পাই। অধিকাংশ কঠিন জড়বস্তু কেলাসিত অবস্থাতেই থাকে। একটি বস্তুর পুরো অবয়বটাই যদি একই নিরবচ্ছিন্ন কেলাস প্যাটার্নের অন্তর্ভুক্ত হয়, তা হলে একে সিঙ্গ্‌ল্‌ ক্রিস্টাল বা এক-কেলাস বলা হয়। তা না হয়ে বস্তুটি যদি অপেক্ষাকৃত ছোট অনেকগুলো কেলাসের এলোমেলো সমাহার হয়, তা হলে একে পলি-ক্রিস্টাল বা বহু-কেলাস বলা হয়। আমাদের চারপাশের অধিকাংশ কঠিন বস্তু এই শেষোক্ত দলে পড়ে। বাষ্প, দ্রবণ (দ্র) বা গলিত অবস্থা থেকে কঠিন রূপ লাভ করার সময় খুব ধীরে এবং অবিচলভাবে তা করা হলে সাধারণত বড় এক-কেলাস সৃষ্টির সুযোগ ঘটে। অন্যথায় ক্ষুদ্রাকার কেলাসের সমন্বয়ে বহু-কেলাস, এমনকি একেবারে বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকা পরমাণু (দ্র) বা পরমাণুসমষ্টিতে গড়া অকেলাসিত রূপ পাওয়া যায়। কাচ (দ্র) এমনি একটি অকেলাসিত বস্তু। বড় এক-কেলাসের ক্ষেত্রে পরমাণু–সজ্জার প্যাটার্নটি বস্তুটির সামগ্রিক অবয়বের মধ্যেও ধরা পড়তে পারে। যেমন— বড় লবণদানার কিউব বা ঘনক আকৃতির কেলাস এর অনুরূপ পরমাণুসজ্জারই প্রতিচ্ছবি। কেলাসের গঠনে বিভিন্ন প্রতিসাম্য দ্বারাই এর শ্রেণীবিভাজন করা হয়। জ্যামিতিকভাবে এরকম ৩২ রকম প্রতিসাম্য সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে বাইরের অবয়ব থেকে প্রতিসাম্য ধরা পড়ে। তবে কেলাসিত রূপের বিস্তারিত গঠন জানতে হলে ক্রিস্টালোগ্রাফি বা কেলাসবিদ্যার আশ্রয় নিতে হয়—বিশেষ করে কেলাসের এক্স-রে ছবিভিত্তিক উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়ার। জড়বস্তু ছাড়াও প্রোটিন, ডি. এন. এ. প্রভৃতি বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল জৈব বস্তুর বিস্তারিত গঠন উদ্‌ঘাটন এভাবেই সম্ভব হয়েছে।

বস্তুত ভৌত গুণাগুণের অনেক কিছু তার কেলাসিত রূপের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হীরা (দ্র) আর গ্রাফাইট (দ্র) একই কার্বন-পরমাণুতে গঠিত

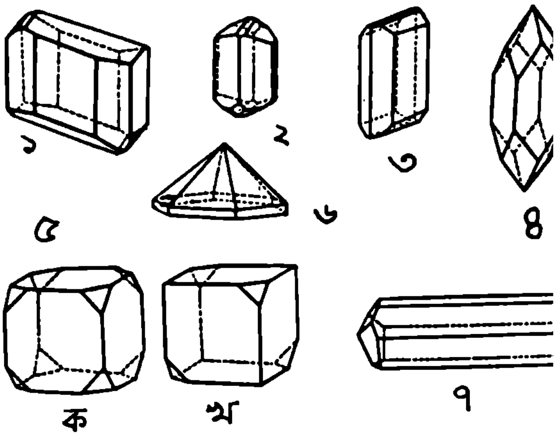

সরল আকৃতির নানা ধরনের কেলাসের নমুনা :
১. ট্রাইক্লিনিক ২. মনোক্লিনিক ৩. অর্থোরম্বিক ৪. টেট্রাগোনাল
৫. কিউবিক (ক. হলোহেড্রাল খ. হেমিহেড্রাল) ৬. ট্রাইগোনাল
α, β, τ = কোণ ক, খ, গ = পার্শ্বতল

হওয়া সত্ত্বেও শুধু কেলাস গঠনের পার্থক্যের কারণে হীরা সকল বস্তুর মধ্যে কঠিনতম, অথচ গ্রাফাইট খুবই নরম। যে সকল বৈদ্যুতিক গুণের কারণে সিলিকনের (দ্র) মতো সেমিকণ্ডাক্টর আধুনিক ইলেকট্রনিক্সে (দ্র) বিরাট ভূমিকা রাখছে, তা অনেকাংশে এর কেলাস গঠনের উপর নির্ভরশীল। এভাবে বস্তুর যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক, তাপীয় কিংবা আলোক-গুণ তার কেলাস গঠনের ওপর নির্ভর করে। আবার কেলাসের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির উপরও এসব গুণ যথেষ্ট নির্ভর করে, যেমন— অনেক বস্তুর রঙ, নমনীয়তা, বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা ইত্যাদি।

মু. ই.

কেশবচন্দ্র সেন [১৮৩৮—১৮৮৪]

ব্রাহ্মধর্মের (দ্র) অন্যতম সংস্কারক এবং সমাজসংস্কারক। জন্ম ১৮৩৮ সালের কলিকাতার (দ্র) কলুটোলায়। সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে কেশবচন্দ্র সেন ধর্মকর্ম ও সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

উনিশ বছর বয়সে ব্রাহ্মসমাজের (দ্র) সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে তিনি ব্রাহ্ম বিদ্যালয় গঠন, স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা ও বিধবাবিবাহ আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হন। তিনি ছিলেন সুবক্তা। সকলের মতবাদ খণ্ডন করে তিনি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-

www.pathagar.com

খ্রিস্টান সকলকে এক ধর্মে মিলিত হবার আহ্বান জানান। ভারত (দ্র) ভ্রমণ করে তিনি ধর্মীয় কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 'ব্রাহ্মসমাজ' ও 'ব্রহ্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে 'ভারত সংস্কার সভা' এবং ১৮৭২ সালে যৌথ উপার্জনে যৌথ জীবন যাপনের চিন্তা মাথায় নিয়ে 'ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি গ্রন্থ রচনা, পত্রিকা প্রকাশ ও বক্তৃতার মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্মের মতবাদ প্রচার করেছেন। তিনি সকল ধর্মগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করান। ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারি কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

আ. ই.

কেসিন (casein)

কেসিন দুধের অন্যতম আমিষ অংশ। সাধারণত দুধে এটি কেসিনোজেন (caseinogen) হিসাবে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। মূলত এই কেসিন নামক আমিষের কারণেই দুধ এত পুষ্টিকর। ক্যালসিয়াম (দ্র) আয়নের (দ্র) উপস্থিতিতে কেসিন এক ধরনের অদ্রবণীয় পদার্থ তৈরি করে। এই পদার্থের নাম ক্যালসিয়াম প্যারাকেসিনেট (Calcium paracaseinate)। অদ্রবণীয় এই পদার্থটি খুব সহজেই তলানি হিসাবে জমা পড়ে। মুখ্যত এই ক্যালসিয়াম প্যারাকেসিনেটের বৈগুণ্যে দুধ থেকে দৈ, পনির (দ্র) বা অন্যান্য জমাটবদ্ধ দ্রব্য তৈরি করা সম্ভব হয়। দুধ পানের সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে (দ্র) জমাট বাঁধার কারণ হল রেনিন (rennin) নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ। পাকস্থলীসংলগ্ন বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে এই রেনিন নিঃসৃত হয়। এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্লাস্টিক কেসিন থেকে উৎপন্ন করা হয়। এর নাম কেসিন-প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিককে বোতাম, সেলাইয়ের সূচ তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। আট হাজার গ্যালন দুধ থেকে এক টন কেসিন পাওয়া যায়।

ত. চ.

কৈবর্ত বিদ্রোহ

আনুমানিক ১০৭০-৭৫ খ্রিস্টাব্দে পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে অনন্ত-সামন্ত-চক্র মিলিত হয়ে যে বিদ্রোহ করেন, তা-ই বঙ্গদেশের ইতিহাসে 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে প্রসিদ্ধ। এই বিদ্রোহের নেতা কৈবর্ত সম্প্রদায়ভুক্ত দিব্য বা দিব্বোক (দ্র) পালরাজ মহীপালকে হত্যা করে পালরাজাদের 'জনকভূ' বরেন্দ্রভূমি সমেত রাজ্যের বৃহত্তর অংশ অধিকার করে নেন।

দিব্বোকের মৃত্যুর পর যথাক্রমে তাঁর ভাই রুদোক ও ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম রাজা হন। প্রভূত বিশৃঙ্খলার ভেতরে ভীমের শাসনামলে রাজ্য জুড়ে কিছুটা শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এলেও দেশবাসী ছিল করভারে জর্জরিত। এদিকে রাষ্ট্রমুকুট মথন (বা মহন) এবং মগধরাজ ভীমযশা প্রমুখ ১৪ জন প্রধান সামন্তরাজের সহায়তায় ভীমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য রামপাল প্রস্তুত হন। রামপালের সৈন্যদল বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করলে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম হাতির পিঠ থেকে পড়ে যান এবং বন্দি হন। তাঁর সৈন্যরাও এই যুদ্ধে পরাজিত হয়। এর পর প্রথমে ভীমের নিকট-আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করা হয়, পরে ভীমকেও হত্যা করা হয়।

তবে এই বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহের নায়ক দিব্বোক সম্পর্কে নানা রকমের বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন— সন্ধ্যাকরনন্দী রচিত 'রামচরিত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এতে অংশগ্রহণকারী সামন্তদের সকলে অথবা অধিকাংশই যে কৈবর্ত অর্থাৎ জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এমন নয়। উল্লিখিত গ্রন্থে এই বিদ্রোহের সংগঠক হিসাবে দিব্য বা দিব্বোকের নামের উল্লেখ নেই। এতে কেবল উল্লেখ করা হয়েছে যে দিব্য ছিলেন এক জন 'দস্যু' এবং অন্যায় কৌশল অবলম্বন করে স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থকারী ব্যক্তি। তিনি পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালকে উৎখাত করার লক্ষ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, সন্ধ্যাকরনন্দী কৈবর্ত বিদ্রোহকে 'উপপ্লব' ও 'অনীক ধর্মবিপ্লব' বলে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট এবং একে গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতা যুদ্ধের শামিল কোনো ঘটনা বলে বর্ণনা করাও

www.pathagar.com

যুক্তিহীন।

বাংলা সাহিত্যে এ বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লিখিত প্রথম উপন্যাস সত্যেন সেনের (দ্র) 'বিদ্রোহী কৈবর্ত'।

আ. হু.

কৈলাস

মহাভারতে কৈলাস পর্বতকে বলা হয়েছে হেমকূট। কৈলাসের পাশেই অবস্থিত মানস সরোবর (দ্র)। দু'টিই পবিত্র তীর্থস্থান। কৈলাস পর্বতমালা কাশ্মীর থেকে ভুটান (দ্র) পর্যন্ত বিস্তৃত। কৈলাস পর্বতমালার মাঝখানে লাছু ও ঝুংছু দু'টি পাহাড় দিয়ে ঘেরা অংশ কৈলাস পর্বত। কৈলাসশিখরের উচ্চতা ৬৭১৪ মিটার। এই শিখর দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতে; এবং লাসা থেকে ১২৮৭ কিলোমিটার দূরে। এর বর্তমান তিব্বতী নাম কিং-রিম-পোচে।

কৈলাস দেবতাদের বাসস্থান, বিশেষ করে শিব ও কুবেরের বাসস্থান বলে বর্ণিত। বৌদ্ধদের বিশ্বাস—বোধিসত্ত্ব (দ্র) বাস করেন কৈলাসে। জৈনরাও কৈলাসকে তাঁদের একটি তীর্থক্ষেত্র বলে মনে করেন। আসলে হিন্দু (দ্র), বৌদ্ধ (দ্র) ও জৈন (দ্র) তিন ধর্মাবলম্বীরই পরম তীর্থ এই কৈলাস ও মানস সরোবর।

নি. অ.

কোঁৎ, ওগুস্ত্ [১৭৯৮—১৮৫৭]

ফরাসি চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানের জনক ও প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টবাদের প্রবক্তা। ফ্রান্সের মঁপেলিয়ে শহরের এক ক্যাথলিক পরিবারে ১৭৯৮ সালে কোঁৎ (Auguste Comte)-এর জন্ম। ১৮১৪ সালে প্যারিসের একোল্ .পলিতেক্‌নিক্-এ তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। কিন্তু প্রগতিপন্থী ছাত্ররাজনীতিতে নেতৃত্ব দানের জন্য অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তিনিও এই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮১৬ সালে বহিষ্কৃত হন।

১৮১৭ সালে ফরাসি দেশের সমাজবাদী নেতা 'স্যাঁ-সিমঁ'র একান্ত সচিব নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় ১৮২৪ সালে পদত্যাগ করেন। এর পর তিনি জনসমক্ষে আধুনিক সমাজভাবনামূলক বক্তৃতাদানের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৮২৬ সালে প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টবাদের ওপর প্রথম বক্তৃতা দেন। তাঁর মতে, যা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন কোনো কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস না করাই প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টবাদ (পজিটিভিজম)। এই সম্পর্কে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'কুর্ দ্য ফিলজফি পজিতিভ্' ('দ্য কোর্স অব পজিটিভ ফিলসফি', ১৮৩০-৪২) ছ' খণ্ডে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সিস্ত্যাম্ দ্য পলিতিক্ পজিতিভ্' ('সিস্টেম অব পজিটিভ পলিটি', ১৮৫১-৫৪) চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

কোঁতের মতে, সামাজিক গতি বা প্রগতি মানুষের জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত। তিনি জ্ঞানের সমগ্র বিকাশের একটি ইতিহাস তৈরির চেষ্টা করেন এবং তিনটি স্তর চিহ্নিত করেন। জ্ঞানের এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়েই মানুষকে তথা সমাজকে অগ্রসর হতে হয়। তিনি বলেন : ধর্মীয় যুগই জ্ঞানের বিকাশের আদি যুগ; এই যুগে রহস্যের ব্যাখ্যায় মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় যুগ দার্শনিক যুগ; এ যুগে চরম সত্তার অস্তিত্বের ভিত্তিতে মানুষ ও সমাজের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা চলেছে। সর্বশেষ যুগটি হল প্রত্যক্ষবাদ বা বিজ্ঞানের যুগ; এ যুগে অতিপ্রাকৃত শক্তি নয়, চরম সত্তা নয়, প্রত্যক্ষ প্রকৃতিকেই মানুষ চরম বলে মনে করেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের মাধ্যমে। বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ প্রকৃতির যথাযথ জ্ঞান মানুষের কাছে পৌছে দেয়। প্রত্যক্ষ প্রকৃতিই চরম সত্তা, একে অতিক্রম করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

সোসিওলজি ('sociologie') অর্থাৎ সমাজবিদ্যা শব্দটি বর্তমানে প্রচলিত অর্থে কোঁৎই প্রথম ব্যবহার করেন। সামাজিক সকল কিছুকে তিনি বিচার করেছেন স্থিতি ও গতির দিক থেকে। তাঁর মতে, সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সাময়িক ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধ স্থিতির দিক থেকেই বিবেচনা করা উচিত, এটি সামাজিক শৃঙ্খলার সহায়ক। সমাজের উন্নতিকে তিনি গতির দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেন।

কোঁতের মতে ধর্মের (দ্র) কেন্দ্রবিন্দু ঈশ্বর নয়, মনুষ্যত্ব। মানবপ্রেমের ওপরই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

www.pathagar.com

স্বভাবে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। সারা জীবনই তাঁকে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে তিনি গবেষণা কাজ চালান। ১৮৫৭ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

সুজ. ব.

কোক (coke)

কার্বন (দ্র) মৌলের বহু রূপের একটি। শক্ত ধূসর পদার্থ। প্রাকৃতিক বা খনিজ কয়লাকে চূর্ণ করে বায়ুশূন্য চুল্লি (দ্র)-তে উত্তপ্ত করলে কোক পাওয়া যায়। বায়ুশূন্য চুল্লিতে উত্তপ্ত করার প্রক্রিয়াকে বলে অন্তর্ধূম পাতন (দ্র)। এভাবে পাতনের ফলে পানি (দ্র), বাষ্প, কোলটার এবং গ্যাসকার্বন উৎপন্ন হয়। আর অনুদ্বায়ী যে কঠিন পদার্থ নিচে পড়ে থাকে তা-ই কোক। কোক অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট বা রন্ধ্রবহুল কার্বনপিণ্ড। এর মধ্যে ৮৭% থেকে ৯০% বিশুদ্ধ কার্বন থাকে।

কোকের প্রকৃতি পাতনপ্রক্রিয়ার তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। উষ্ণতায় পাতন করলে যে কোক পাওয়া যায় তাকে বলে নরম (soft) কোক এবং উচ্চতাপমাত্রায় যে কোক পাওয়া যায় তাকে বলে শক্ত (hard) কোক। পাতনপাত্রের অপেক্ষাকৃত শীতল দেয়ালে যে শক্ত কালো আস্তরণ পড়ে তা গ্যাসকার্বন।

শক্ত কোক ধাতু (দ্র) নিষ্কাশনে বিদারকরূপে ও জ্বালানি (দ্র) হিসাবে এবং নরম কোক গৃহস্থালি জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।

স. রা.

কোকিল

মিষ্টি ডাকের জন্যই কোকিল আমাদের কাছে বেশি পরিচিত। সাধারণত বট-পাকুড় গাছে এদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষ-কোকিলের গায়ের রঙ কালচে-নীলাভ, চোখ লাল। স্ত্রী-কোকিলের গায়ের রঙ বাদামি। তার ওপর ধূসর ও সাদার আঁকিবুকি রয়েছে। ঠোঁট অনেকটা সুবজ।

কোকিল নিজে বাসা বানায় না। অন্যান্য পাখির বাসায়,

বিশেষ করে কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। কাক যাতে বুঝতে না পারে সে জন্য অনেক সময় কোকিল ডিম পেড়ে কাকের ডিম নিচে ফেলে দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চা হলে কাক নিজের বাচ্চা মনে করে কোকিলের বাচ্চার যত্ন নেয়। বাচ্চা যথেষ্ট বড় হলেই কেবল কাক তাদের চিনতে পারে এবং বাসা থেকে তাড়িয়ে দেয়। কোকিলের বাচ্চা ততদিনে উড়তে শিখে গেছে।

কোকিলের প্রধান খাদ্য বট-পাকুড়সহ বিভিন্ন গাছের ফল। তবে অনেক সময় এরা কীটপতঙ্গ (দ্র)-ও খেয়ে থাকে। এরা একা একা, জোড়ায় জোড়ায়, কিংবা দলবদ্ধভাবেও বাস করে। রাতে পুরুষ-কোকিল প্রহরে প্রহরে কিংবা অন্যান্য পাখির সঙ্গে গলা মিলিয়ে মিহি সুরে 'কুহু কুহু' বলে ডাকে। স্ত্রী-কোকিল কোনো কারণে পালাবার সময় 'কিক কিক' শব্দ করে ডাকে, অন্য সময় সাধারণত চুপচাপ থাকে।

কোকিলকে অঞ্চলভেদে কুলি বা কালো কোকিল নামেও ডাকা হয়। এই প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম *Eudynamus scolopacsa*। এ ছাড়াও আরেক ধরনের কোকিল রয়েছে, যেগুলোকে বলা হয় সবুজ কোকিল *(Rhopodytis tristis)*। এক সময় বাংলাদেশে (দ্র) সবুজ কোকিল যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যেত, কিন্তু এখন আর খুব একটা দেখা যায় না।

ফ. মা.

www.pathagar.com

কোকেন (cocaine)

কোকা (ইরিথ্রোজাইলাম কোকা) গাছের কচি পাতা থেকে সংগৃহীত নির্যাস প্রক্রিয়াজাত করে কোকেন পৃথক করা হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার (দ্র) পেরু উপত্যকার ইনকা (দ্র) আদিবাসীদের জানা ছিল যে কোকা পাতা চিবিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে কষ্ট হয় না। এটিকে তারা 'স্বর্গীয় উদ্ভিদ' মনে করত। পেরু ও বলিভিয়াতে কোকা গাছের চাষ সবচাইতে বেশি হয়। কোকা পাতা থেকে প্রথম কোকেন সংগ্রহ করা হয় ১৮৬০ সালে।

কোকেনই প্রথম 'স্থানিক অবেদনিক' (local anaesthetic) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভিয়েনাবাসী বিজ্ঞানী কার্ল কোলার (Carl Koller) ১৮৮৪ সালে প্রথম 'স্থানিক অবেদনের' কাজে কোকেন ব্যবহার করেন। প্রধানত শ্লেষ্ম-ঝিল্লিতে এবং চোখের অস্ত্রোপচারে অবেদনিক হিসাবে কোকেন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু বিরূপ ক্রিয়া ও আসক্তির জন্য এখন কোকেনের বদলে অন্যান্য নতুন ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কোকেন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উচ্চতর কেন্দ্র উদ্দীপ্ত করে যে সুখানুভূতির সৃষ্টি করে তার ফলে কোকেন ব্যবহারকারী ক্রমেই ঔষধটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। হেরোইনের (দ্র) মতো কোকেনের মাদকাসক্তিও (দ্র) এখন বিশ্বে যথেষ্ট ব্যাপক। সে জন্য কোকেন ব্যবহার রোধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। চেষ্টা চলছে কোকেনের উৎপাদন ও সরবরাহ বন্ধ করার।

সি. না. হ.

কোকো (cocoa)

কাকাও(cacao) বা থিওব্রোমা কাকাও (*Theobroma cacao*) গাছের ফসল। কোকো থেকে চকোলেট (দ্র) ও কোকো মাখন উৎপন্ন হয়। নানা রকম ঔষধ (দ্র) আর প্রসাধন দ্রব্য তৈরির কাজেও কোকো ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও আইসক্রিম (দ্র), রুটি, পুডিং, পানীয়সহ বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় খাবারের সুগন্ধ বাড়ানোর জন্য কোকোর প্রয়োজন অপরিহার্য। এই রকম নানাবিধ চাহিদার কারণে কোকো এখন অর্থকরী ফসল হিসাবে পরিগণিত হয়।

কোকো ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। এর গাছ চিরসবুজ। এটি ঘন ডালপালা ছড়িয়ে ৭.৫ মিটার বা ২৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। এর কাণ্ড ও শাখার বাকলে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপি-হলুদ রঙের ফুল ধরে। এ ফুলই ক্রমে ফলে পরিণত হয়। চার বছর বয়স থেকে গাছে ফল ধরতে শুরু করে। ফল পাকতে ছয় মাস সময় লাগে। ফলের রঙ বাদামি। ফল ৩০ সেন্টিমিটার বা ১ ফুট লম্বা এবং ১০ সেন্টিমিটার বা ৪ ইঞ্চির ওপর পুরু হয়। ফলের বাইরের দিকে চামড়ার মতো শক্ত আবরণ থাকে। প্রতিটি ফলে ২০ থেকে ৪০টিরও বেশি বীজ হয়। বীজগুলো প্রথমে কলাপাতার মধ্যে দিয়ে গাঁজানো হয়। পরে প্রয়োজন মতো রোদে শুকিয়ে সিদ্ধ করে খোসা ছাড়ালেই পরিষ্কার একটি শাঁস পাওয়া যায়। এই শাঁসকে বলা হয় কোকোনিব। কোকোনিবের গুঁড়োই কোকো পণ্য তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

কোকোর খাদ্যমূল্য বেশ উঁচুমানের। এতে প্রায় ৪০% কার্বোহাইড্রেট (দ্র), ৩৭% স্নেহ পদার্থ, ১৮% প্রোটিন, ৬% অজৈব লবণ, ২% থিওব্রোমিন নামক উপক্ষার (অ্যালকালয়েড) ও অল্প পরিমাণে জল, জৈব তন্তু এবং ক্যাফিন (দ্র) নামক উপক্ষার থাকে।

কোকো গাছের জন্মভূমি দক্ষিণ আমেরিকা (দ্র) হলেও পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা, নাইজেরিয়া, কঙ্গো প্রভৃতি দেশ সমগ্র বিশ্বের মোট চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ কোকো সরবরাহ করে। এ ছাড়া মেহিকো (Mexico), ব্রাজিল, ইকুয়েডর, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (দ্র), শ্রীলঙ্কা (দ্র), ইন্দোনেশিয়া (দ্র), নিউগিনি প্রভৃতি দেশেও ব্যাপকভাবে কোকোর চাষ হয়।

সুজ. ব.

কোণ (angle)

একটি ঘরে সাধারণত চারটি দেয়াল থাকে। চারটি দেয়াল এমনভাবে তোলা হয় যে দু'টি দেয়ালের দু'টি ধার বা প্রান্ত একত্রে মিলে একটি করে মোট চারটি কোণ তৈরি করে। ফুটবল খেলার মাঠে চারটি কোণ থাকে এবং ফুটবল খেলায় কোণের গুরুত্ব অনেক বেশি। আমরা আমাদের সাধারণ

www.pathagar.com

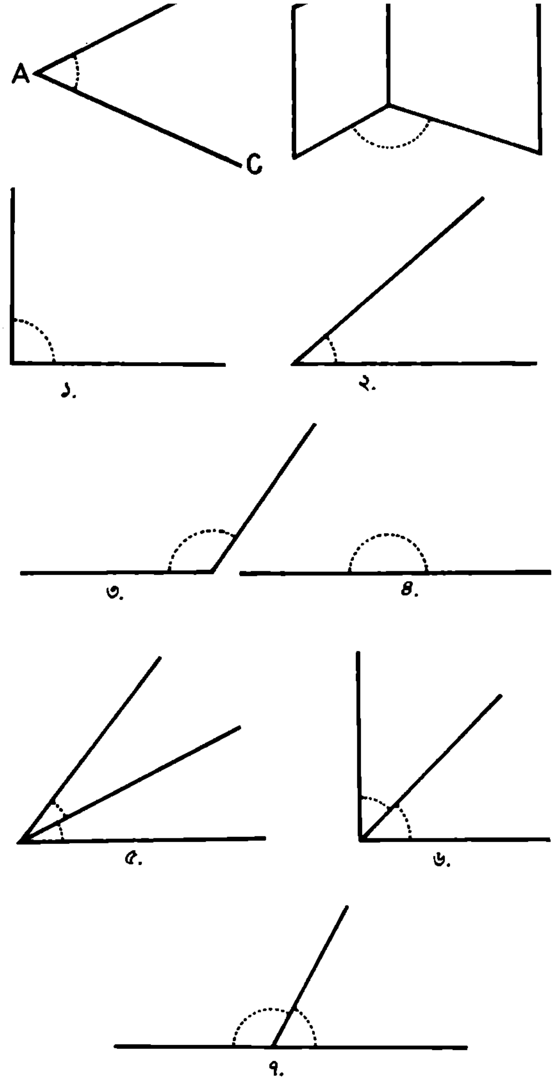

কোণ : ১. সমকোণ ২. সূক্ষ্মকোণ ৩. স্থূলকোণ ৪. সরল কোণ ৫. সন্নিহিত কোণ, পূরক কোণ ৬. সম্পূরক কোণ

কথাবার্তায় প্রয়োজনে কোণ শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। গণিতের জ্যামিতি অংশে কোণ একটি প্রাথমিক আলোচনার বিষয়।

কোণ হল দু'টি রেখা একটি বিন্দুতে মিলিত হলে অথবা দু'টি তলের দু'টি ধার বা প্রান্ত সংযুক্ত করলে তাদের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান। রেখার শুধু দৈর্ঘ্য আছে বলে দু'টি রেখা একটি বিন্দুতে মিলিত হয়, আর তলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুই-ই আছে বলে দু'টি তলের দু'টি প্রান্ত একটি রেখায় মিলিত হয়। অর্থাৎ একটি বিন্দু থেকে দু'টি রেখা আঁকলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা-ই কোণ। যেমন : AB ও AC রেখা দু'টি A বিন্দুতে মিলিত হলে বলা যায় A বিন্দুতে কোণ তৈরি হয়েছে। কোণের চিহ্ন <। চিত্রের কোণটিকে লেখা যায় <BAC বা <CAB। A বিন্দুতে <BAC বা <CAB-এর মান সব সময় এক; AB বা AC বাহুকে অনেক দূর পর্যন্ত একই সরলরেখায় বাড়ালে কোণের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। কোণকে ডিগ্রিতে অথবা রেডিয়ানে (বৃত্তীয় পরিমাপ) পরিমাণ করা হয়। একটি রেখা কোনো একটি প্রারম্ভিক অবস্থানের সাপেক্ষে একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে অবস্থানের পরিরর্তন করলে বিভিন্ন কোণের সৃষ্টি হয় এবং এ থেকে কোণ পরিমাপ করা যায়। নব্বই ডিগ্রি (৯০°) মানের কোণকে সমকোণ, এর চেয়ে ছোট মাপের কোণকে সূক্ষ্মকোণ আর বড় মাপের কোণকে স্থূলকোণ বলে। কোণের মান ১৮০° হলে তাকে সরলকোণ বলে। দু'টি কোণের একটি সাধারণ বাহু থাকলে কোণ দু'টিকে সন্নিহিত কোণ বলে। দু'টি সন্নিহিত কোণের মান ৯০° হলে একটিকে অপরটির পূরক কোণ বলে। দু'টি সন্নিহিত কোণের মান ১৮০° হলে একটিকে অপরটির সম্পূরক কোণ বলে।

হো. আ.

কোণারক সূর্যমন্দির

ভারতের (দ্র) ওড়িশা (উড়িষ্যা) প্রদেশে কোণারক অবস্থিত। কোণারক তার সূর্যমন্দিরের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। কোণারকের প্রাচীন নাম মৈত্রেয়ারণ্য। ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বর থেকে কোণারকের দূরত্ব ৬৪ কিলোমিটার।

১৯০৪ সালে ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁড়ে বের করা হয় এই মন্দির। মন্দিরটির বহুলাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও তা বিশ্বের অন্যতম সেরা শিল্পকর্ম বলে প্রশংসা কুড়িয়ে আসছে। পুরো মন্দিরটাই একটা রথের আকারে গড়ে তোলা হয়েছিল। যেন ঘোড়ায় রথ টেনে নিচ্ছে। দু'পাশে বারোটি করে চব্বিশটি চাকা। তার মানে বারো মাসের চব্বিশটি পক্ষ। প্রতিটি চাকায় আটটি করে স্পোক; এর অর্থ দিনের আটটি প্রহর। ৯ ফুট ব্যাসের চাকাগুলো ধ্বংসের মুখে। তবে একটি চাকা

www.pathagar.com

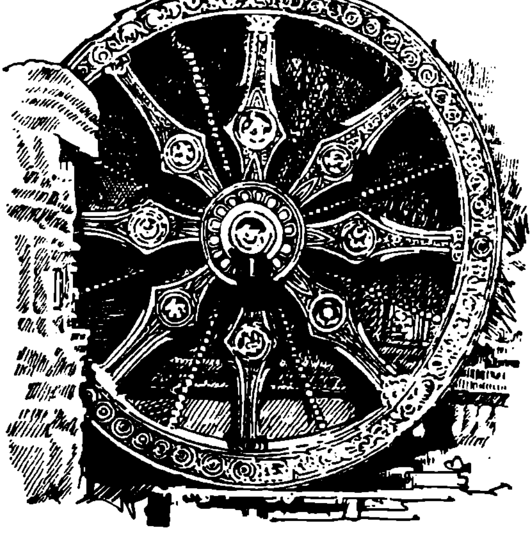

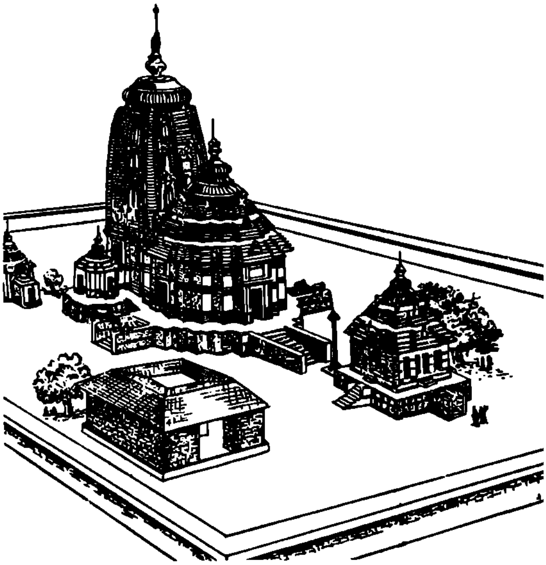

বাঁয়ে : কোণারকের 'চাকা'। ডানে : কোণারক মন্দিরের সম্পূর্ণ অবয়ব (শিল্পীর ড্রইং)

আজও অক্ষত রয়েছে। নানান দেব-দেবী, বাদ্যরত সুন্দরী, নর্তকী ও গায়িকা—এমনি আরো অনেক মূর্তি রয়েছে মন্দিরের গায়ে।

সেকালে সূর্যমন্দিরের সামনে দিয়ে বয়ে যেত বঙ্গোপসাগর (দ্র), কাছেই চন্দ্রভাগা নদী। সূর্য (দ্র) উঠলে তার প্রথম কিরণ পড়ত মন্দিরের সূর্যদেব-মূর্তির মুখে কোণাকুণি হয়ে। তাই তার নাম হয়েছে কোণা+অর্ক=কোণার্ক । অর্ক মানে সূর্য। মানে দাঁড়াল সূর্যের কোণা। 'কোণার্ক' শব্দটিই লোকের মুখে মুখে হয়েছে কোণারক।

পুরাণ মতে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব এই সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন। আইন-ই-আকবরীর প্রণেতা আবুল ফজলের মতে, কেশরীবংশের রাজা নবম শতকের শেষভাগে মন্দিরটি তৈরি করেছেন। অন্য মতে, গঙ্গাবংশের রাজা নরসিংহদেব ১৩ শতকে এই মন্দির নির্মাণ করেছেন।

মন্দিরে সূর্যের মূর্তি নেই। যে কোনো ধর্ম বা বর্ণের পর্যটকের জন্য কোণারকের দ্বার খোলা ।

নি. অ.

কোনান্ ডয়েল্, স্যার আর্থার্ ডয়েল্, স্যার আর্থার্ কোনান্ দ্র

কোপার্নিকাস [১৪৭৩—১৫৪৩]

ইউরোপের (দ্র) রেনেসাঁস যুগের জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicolaus Copernicus) পৃথিবীকে (দ্র) পরিক্রমণশীল গ্রহ (দ্র) হিসাবে দেখিয়ে সূর্য (দ্র)-কেন্দ্রিক সৌর-জগতের (দ্র) আধুনিক ধারণা প্রবর্তন করেন। জ্যোতির্বিদ্যায় (দ্র) এবং মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এটি ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা।

কোপার্নিকাস ১৪৭৩ সালে পোল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে ক্রাকভ (Krakow) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের

www.pathagar.com

পর তিনি পোল্যাণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মযাজকের পদ লাভ করেন এবং আমৃত্যু সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর মধ্যেই তিনি ইতালিতে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়ে ফেরারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন এবং পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা (দ্র) অধ্যয়ন করেন। কিন্তু কোপার্নিকাস অমর হয়ে রয়েছেন তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চা ও এ বিষয়ে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থটির জন্য, যার নাম 'জ্যোতিষ্ক গোলকসমূহের পরিক্রমণ সম্পর্কে'। ১৫৪৩ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি সৌরজগৎ বিষয়ে তাঁর নতুন মতবাদগুলো অকাট্য যুক্তিতে সন্নিবেশিত করেন। তাঁর মৃত্যু ঘটে এ বৎসরেই।

প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্রে স্থিরভাবে স্থাপন করেই জ্যোতির্বিদ্যার ঘটনাবলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। বিশেষ করে গ্রিক পণ্ডিত টলেমি (দ্র) বিস্তারিত জ্যামিতিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই ভূকেন্দ্রিক চিত্রকে নিখুঁত বলে প্রতীয়মান করে রেখেছিলেন হাজার বছর ধরে। কোপার্নিকাসই প্রথম এ চিত্রের দুর্বলতাগুলো ধরিয়ে দেন এবং সত্যিকার গতি ও আপাতগতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি দেখান কীভাবে পৃথিবীর আবর্তন-পরিক্রমণের ভিত্তিতে অন্যান্য জ্যোতিষ্কগুলোর আপাতগতিকে অনেক সহজতর একটি চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁর এই ধারণার উপর ভিত্তি করে পরে গালিলেও (দ্র)-র দূরবীন (দ্র) সহকারে পর্যবেক্ষিত সিদ্ধান্তগুলো, কেপ্‌লারের (দ্র) গ্রহ সম্পর্কীয় নিয়ম এবং নিউটনের (দ্র) মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সমকালে এবং পরবর্তী সময়ে বেশ কিছুদিন এ মতবাদ মোটেই গ্রাহ্য হয় নি। বরং শক্তিশালী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষসহ সব মহল একে উদ্ভট ও ধর্মদ্রোহী মতবাদ হিসাবে নিন্দা করেছে।

মু. ই.

কোয়ান্টাম তত্ত্ব (Quantum Theory)

পরমাণু (দ্র) বা অ্যাটম ও সাব-অ্যাটমিক বা অবপারমাণবিক জগতের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করার আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ১৯০০ সালে কৃষ্ণকায় বস্তুর বিকিরণ (দ্র) ব্যাখ্যা করার সময় জার্মান বিজ্ঞানী মাক্স্ প্লাঙ্ক (Max Planck : ১৮৫৮-১৯৪৭) প্রথম কোয়ান্টাম ধারণা প্রকাশ করেন। কোনো শক্তির বিকিরণ অবিচ্ছিন্নভাবে নির্গত হয় না, বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুচ্ছ (energy packet) হিসাবে নির্গত হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুচ্ছকে বলা হয় কোয়ান্টাম। যেমন— আলোর কোয়ান্টাম হলো ফোটন (দ্র)।

১৯০৫ সালে আলোকতড়িৎক্রিয়া ব্যাখ্যা করার সময় আইনস্টাইন (দ্র) দেখালেন, বিকিরণ শুধু নির্গত হবার সময় কোয়ান্টাম আকারে নির্গত হয় না, বরং স্থানান্তর গমনের সময়ও (propagation) গুচ্ছাকারেই গমন করে। পরবর্তী কালে নীল্‌স্ বোর্ (Niels Bohr : ১৮৮৫-১৯৬২) পরমাণু-মডেল তৈরি করার সময় লক্ষ করলেন, বস্তুকণা মাত্রই স্থির (stable) অবস্থায় যেখানে সেখানে থাকে না, বরং সুনির্দিষ্ট শক্তিস্তর বা কোয়ান্টাম স্তরে থাকে।

এভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অবদানে এই শতকের প্রথম দিকে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে ওঠে। বিশ শতকে লুই দ্য ব্রগ্‌লির (Louis Victor de Broglie : ১৮৯২–) কণাতরঙ্গ দ্বৈতবাদ, শ্রয়েডিংগারের তরঙ্গসমীকরণ (Schrödinger Equation), ডিরাকের সমীকরণ (Dirac Equation), মাক্স বর্নের (Max Born : ১৮৮২–১৯৭০) পরিসংখ্যান, সর্বোপরি হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূচনা করে। হাইজেনবার্গের (Werner Heisenberg : ১৯০২-১৯৭৬) অনিশ্চয়তার নীতি প্রচলিত নিউটনীয় ধ্যানধারণার বিপরীতে সম্ভাবনার জগৎ উন্মোচন করে দেয়। এই অনিশ্চয়তার নীতির জন্য আইনস্টাইনের মতো অনেক বিজ্ঞানী প্রথমে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। বর্তমানে সাব-অ্যাটমিক স্কেলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। কোয়ান্টাম তত্ত্ব শুধু যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়েছে তা নয়, বরং কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগে ইলেক্ট্রনিক্সের (দ্র) বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

প্রকৃতিজগতের চারটি বলের মধ্যে অভিকর্ষ ছাড়া বাকি তিনটিরই কোয়ান্টামতত্ত্ব রয়েছে। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন যাতে অভিকর্ষের একটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব দাঁড় করানো যায়। তা হলে প্রকৃতিজগতের চারটি বলকেই একটি মাত্র সমীকরণ দ্বারা প্রকাশের যে আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞানীদের আছে তার একটি বড় ধাপ পূরণ হবে।

মু. হা.

www.pathagar.com

কোয়ার্জ (quartz)

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ শিলা, যার কয়েকটি রূপ মূল্যবান রত্নপাথর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিল্পক্ষেত্রেও এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। স্বচ্ছ, বর্ণহীন, কেলাসিত রূপেই সাধারণত কোয়ার্জকে পাওয়া যায়। রাসায়নিকভাবে এটি সিলিকন (দ্র) ডাই-অক্সাইড বালি বা মাটির মতোই। কেলাস (দ্র) গঠনই কোয়ার্জকে তার বৈশিষ্ট্য দিয়ে থাকে। কেলাসে সামান্য ত্রুটি হিসাবে যদি স্বল্প অনুপাতে এর সঙ্গে লোহা (দ্র) ও ম্যাঙ্গানিজের পরমাণু (দ্র) মেশানো থাকে, তা হলে তা মূল্যবান রত্নপাথর বেগুনি রঙের এমেথিস্ট-এ পরিণত হয়।

কোয়ার্জ খুব শক্ত একটি বস্তু। এর গলনাঙ্ক অনেক বেশি। উত্তাপে এর আয়তনও বাড়ে খুব কম, দ্রুত ঠাণ্ডা করলে ফেটেও যায় না। এসব কারণে উচ্চ উত্তাপের কাজের জন্য কাচপাত্রের বদলে কোয়ার্জপাত্র ব্যবহার করা হয়। আলোকবিদ্যার মূল্যবান কিছু লেন্স্ (দ্র) ইত্যাদি কোয়ার্জ দিয়ে তৈরি হয়। কোয়ার্জের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর পিয়েজোইলেক্ট্রিক গুণ (piezoelectricity)। এর ফলে পাতলা করে কাটা কোয়ার্জপাতের দু'পাশে যদি চাপ প্রয়োগ করা হয়, তা হলে এর এক পাশে ধনাত্মক ও অন্য পাশে ঋণাত্মক বিদ্যুৎবিভবের সৃষ্টি হয়। আবার টানে রাখলে ঠিক বিপরীতটি ঘটে। ফলে যান্ত্রিকভাবে কোয়ার্জকে কাঁপানো হলে এতে পরিবর্তী বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ সৃষ্টি হয়, যার পর্যাবৃত্তিহার কোয়ার্জের আকার-আকৃতির উপর নির্ভর করে। একইভাবে পরিবর্তী বিদ্যুৎবিভব প্রয়োগ করলে কোয়ার্জ যান্ত্রিক কম্পন লাভ করে থাকে। বৈদ্যুতিক স্পন্দন সৃষ্টিকারী যন্ত্রে ফ্রিকোয়েন্সি বা স্পন্দনহার নিয়ন্ত্রক অংশ হিসাবে তাই কোয়ার্জের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ঘড়ি (দ্র), রেডিও ট্রান্সমিটার, রেডার (দ্র) ইত্যাদি অনেক ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে কোয়ার্জের এই ব্যবহার হয়ে থাকে।

মু. ই.

কোয়ালা (koala)

কোয়ালা এক ধরনের মেরুদণ্ডী (দ্র) প্রাণী। দেখতে অনেকটা বিড়ালের (দ্র) মতো। এরা স্তন্যপায়ী (দ্র) প্রাণী। স্তন্যপায়ী প্রাণিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মার্সুপিয়ালিয়া (Marsupialia) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী কোয়ালা। এরা ক্যাঙ্গারুর (দ্র) সমগোত্রীয়। এদের বৈশিষ্ট্য হল, এ জাতীয় প্রাণীর স্ত্রীদের পেটের চামড়া ভাঁজ হয়ে থলের মতো একটি অঙ্গ সৃষ্টি করে। একে মার্সুপিয়াম (marsupium) বলে। মার্সুপিয়াম থাকার কারণেই এদের মার্সুপিয়ালিয়া বলা হয়। এদের স্তনগ্রন্থি মারসুপিয়ামের ভেতর অবস্থান করে। বাচ্চা জন্মানোর পর পরই মারসুপিয়ামের ভেতর চলে যায় এবং অনবরত মায়ের দুধ খেয়ে বড় হতে থাকে।

কোয়ালার মাথা অনেকটা ত্রিভুজাকৃতি এবং এদের কান বেশ লম্বা এবং দীর্ঘ লোমযুক্ত। এদের পায়ে নখরবিহীন থাবা রয়েছে, যা এদের গাছপালায় চলাফেরা করতে সাহায্য করে। কোয়ালার চোখ দুটো বড় বড়। এরা প্রধানত গাছে থাকে। তবে মাঝে মাঝে এদের মাটিতে নেমে আসতে দেখা যায়। এরা নিশাচরও বটে। রাতে এরা গাছের ডালে ডালে ঘুরে খাবার সংগ্রহ করে। এরা প্রধানত উদ্ভিদভোজী। গাছের পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি এদের প্রিয় খাদ্য। তবে খিদে পেলে কোয়ালা বিস্কুটও খায়। প্রতি প্রজনন-মৌসুমে কোয়ালা একটি করে বাচ্চা দেয়। পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কোয়ালাশিশু মায়ের পেটের থলিতেই বাস করে। মা-কোয়ালা নিজের পেটের থলিতে রেখে সন্তানকে নানা ধরনের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। কোয়ালার বাসস্থান অস্ট্রেলিয়া (দ্র) মহাদেশ (দ্র)।

ত. চ.

www.pathagar.com

কোয়াসার (quasar)

মহাকাশে এমন কিছু গ্যালাক্সি (galaxy) বা তারকাপুঞ্জ আছে, যার মাঝখানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প এলাকা থেকে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ হয়ে চলেছে। এগুলোকে বলা হয় কোয়াসার, যে নামটি কোয়াসি-স্টেলার রেডিও সোর্স (quasi-stellar radio source) কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রধানত আলোক ও রেডিওতরঙ্গ হিসাবে শক্তি কোয়াসার থেকে নির্গত হয়। এসব আমাদের কাছে পৌঁছতে এক শ' কোটি বছর লেগে যায় এমন দূরত্বে থাকা কোয়াসারকেও উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। এগুলো বলতে গেলে মহাবিশ্বের (দ্র) এক কিনারায় অবস্থিত। দূরবর্তী কোনো উৎস থেকে আসা বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য দীর্ঘতর হবার দিকে সরে যেতে থাকলে (লাল সরণ) বোঝা যায় যে উৎসটি ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। কোয়াসারের ক্ষেত্রে এটি এতই প্রকট যে এ থেকে মনে হয় কোয়াসারের দূরে সরে যাবার গতি আলোর গতির কাছাকাছি, যা আশ্চর্যজনক।

কোয়াসার প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) মাউন্ট পালামোরে অবস্থিত বৃহৎ দূরবীক্ষণে (দ্র)। তখন থেকে এ পর্যন্ত হাজার হাজার কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে। কোয়াসারের বিকীর্ণ শক্তির বিস্ময়কর প্রচণ্ডতার কারণ সম্পর্কে নানা অনুমান বিজ্ঞানীরা করে থাকেন। এর মধ্যে একটি অনুমান হল, কোয়াসারের মাঝখানের বস্তুপুঞ্জ বৃহদাকার ব্ল্যাকহোলের বা কৃষ্ণবিবর (দ্র)-এর মধ্যে গিয়ে পড়ার কারণেই এই বিপুল পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ হয়।

মু. ই.

কোয়েল (quail)

কোয়েল (বাংলায় বটের) মুরগি পরিবারের ক্ষুদ্রতম সদস্য। অ্যান্টার্কটিকা (দ্র) মহাদেশ (দ্র) ছাড়া সবখানেই আছে। বিশ্বে কোয়েলের প্রজাতিসংখ্যা ১৩০। বাংলাদেশে (দ্র) অছে দুটো, তাও বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। কোয়েল গোলগাল, ছোটখাটো পাখি। লেজ ছোট, ঘাড় খাটো। প্রজাতিভেদে লম্বায় ১২-৩০ সেমি। স্ত্রী-পুরুষ আলাদা রঙের। পুরুষগুলোই সুন্দর। এরা সাধারণত ধূসর বা বাদামি।

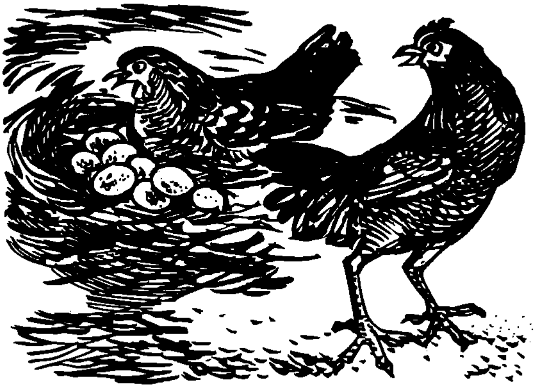

তাতে লালচে-বাদামি, নীল, সাদা, কালো ডোরা। স্ত্রীগুলো সাধারণত বাদামি, তামাটে বা ধূসর। আবাস-এলাকার পরিবেশের সঙ্গে এদের গায়ের রঙ মিলেমিশে যায়। চীনা রঙিন কোয়েল ক্ষুদ্রতম প্রজাতি — মাত্র ১২ সেমি ও ওজনে ৪৫ গ্রাম। পাহাড়ি কোয়েল বৃহত্তম — ২৭-৩০ সেমি ও ওজনে ২৩০ গ্রাম। কোয়েল ঝোপঝাড়পূর্ণ খোলা মাঠে থাকতে ভালবাসে। শস্যদানা, গাছের পাতা, শেকড়, পোকা-মাকড় খায়। মাটিতে বা ঝোপ-ঝাড়ে খড়-কুটো বিছিয়ে বাসা বানায়। সাধারণত বসন্তে আট থেকে বারোটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলো নীল, খয়েরি ও বেগুনি ফোঁটাযুক্ত। মা-বাবা মিলে প্রজাতিভেদে ১৬-২১ দিন তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। একরত্তি বাচ্চাগুলো অত্যন্ত চঞ্চল।

কোয়েলের মাংস ও ডিম অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এদের শিকার করছে। এদের বেশ ক'টি প্রজাতিকে পোষ মানানো গেছে। বর্তমানে জাপানি কোয়েল সারা বিশ্বে খামারভিত্তিতে পোষা হচ্ছে। বাংলাদেশেও (দ্র) এদের খামার আছে। বছরে প্রতিটি স্ত্রী-কোয়েল ১০-১২ গ্রাম ওজনের ২৯০ থেকে ৩০০ ডিম পাড়ে। ওজনে পুরুষগুলো ১৩০-১৪০ গ্রাম, স্ত্রীগুলো ১৪০—১৫০ গ্রাম। সদ্য-ফোটা বাচ্চাগুলো মাত্র সাত গ্রাম হয়। জন্মের পাঁচ সপ্তাহ পরেই এদের মাংস খাওয়ার উপযোগী হয়। মাত্র ৬-৭ সপ্তাহ বয়সে স্ত্রী-কোয়েল ডিম পাড়া শুরু করে। একাধারে বছরখানেক ডিম পাড়ে। ইনকুবেটরের সাহায্যে ডিম ফোটাতে হয়।

আ. ন. ম. আ. র.

www.pathagar.com

কোরাস (chorus)

কয়েক জন মিলে গান গাইলে কোরাস হয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ব্যবহৃত এই কথাটি অনেক দিন ধরে আমাদের সঙ্গীতে (দ্র)-ও ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে মিলিত গায়নকে বলা হয়েছে বৃন্দগান, বৃন্দগীতি, সম্মেলক গান, সম্মেলক গীতি প্রভৃতি। গায়ক ও সহযোগী যন্ত্রবাদকের সংখ্যা অনুযায়ী বৃন্দগানকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা— উত্তমবৃন্দ, মধ্যমবৃন্দ, কনিষ্ঠবৃন্দ ও কোলাহল' বৃন্দ।

পবিত্র নৃত্যগীত অর্থে প্রাচীন গ্রিসে 'খোরস্' কথাটি ব্যবহৃত হত; ধর্মোৎসবে খোরস্ দল নাচগান করত। এই গ্রিক শব্দ থেকেই কোরাস কথাটা এসেছে। পরবর্তী কালে খ্রিস্টীয় প্রার্থনাসঙ্গীতে কোরাস গায়ন প্রচলিত হয়। ক্রমে নানা শ্রেণীর গানে নানা ধরনের কোরাস ব্যবহৃত হতে থাকে। কোরাস দল কখনো শুধু পুরুষ দ্বারা, কখনো শুধু মহিলা দ্বারা, আবার কখনো স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে গঠিত হতে পারে। যে কোরাস দল নারী-পুরুষ মিলিয়ে গঠিত হয়, তাকে বলা হয় মিশ্রকণ্ঠ কোরাস। গির্জায় কোরাস গায়ক দলকে বলা হয় 'কয়ার' (choir)। দু'টি সম্পূর্ণ কোরাস একত্রে প্রযুক্ত হলে তাকে বলা হয় ডাবল কোরাস।

কোরাস প্রাচীন গ্রিক নাটকেরও একটি আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম দিককার গ্রিক নাটকে চরিত্রসংখ্যা ছিল অল্প। কোরাস দলের সঙ্গে নাটকের (দ্র) চরিত্রের কথোপকথনকে সে সময় খুবই গুরুত্ব দেওয়া হত। সোফোক্লেস (দ্র) প্রথম কোরাসকে নাটকের প্লটের কাঠামোয় বিন্যস্ত করেন। সারা ইউরোপের (দ্র) নাটকে এই গ্রিক দৃষ্টান্তটি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ক. গো.

কোর্তোয়িস কুর্তোয়া, বের্নার্ দ্র

কোল্ড ওয়ার স্নায়ুযুদ্ধ দ্র

কোল্লোদি, কার্লো পিনোচ্চিও দ্র

কোল্‌রিজ্, স্যামুয়েল্ টেলর্ [১৭৭২—১৮৩৪]

স্যামুয়েল্ টেলর্ কোল্‌রিজের (Samuel Taylor Coleridge) জন্ম ২৩শে অক্টোবর ১৭৭২ সালে। বাবা ছিলেন ডেভনশায়ারের অটারি সেন্ট মেরির ভিকার। লেখাপড়া প্রথমে বিখ্যাত স্কুল ক্রাইস্ট্'স্ হসপিটালে এবং তারপর কেম্ব্রিজের জিসাস কলেজে। ১৭৯১ থেকে ১৭৯৪—এই তিন

বছর কেম্ব্রিজে থাকার সময় তিনি নিবেদিতপ্রাণ রিপাবলিকান হয়ে ওঠেন এবং এমন একটা দলভুক্ত হন যারা পড়াশোনার চেয়ে আড্ডা ও খানাপিনার জন্য খ্যাতি অর্জন করে। কবি রবার্ট সাউদির (Robert Southey) সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ মিত্রতা গড়ে ওঠে। ১৭৯৪ সালে তিনি 'The Fall of Robespierre' নামে একটি নাটক রচনা করেন এবং সাউদির সহযোগিতায় তা প্রকাশিত হয়। ১৭৯৫ সালে কোল্‌রিজ্ সারা ফ্রিকারকে বিয়ে করেন। ১৭৯৩ সালের দিক থেকেই তিনি 'The Morning Chronicle' কবিতায় লেখা পাঠাতে শুরু করেন এবং ১৭৯৬ সালে নিজেই 'The Watchman' নামে একটি সংবাদপত্র সম্পাদনা করতে থাকেন। ইতোমধ্যে ১৭৯৫ সালে তাঁর সঙ্গে আর এক বিখ্যাত কবি উইলিয়াম ওয়ার্ড্‌স্ওয়ার্থের (দ্র) পরিচয় হয় এবং তা এক গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ওয়ার্ড্‌স্ওয়ার্থের সঙ্গে যৌথভাবে 'Lyrical Ballads' (১৭৯৮) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কোল্‌রিজের বিখ্যাত কবিতা 'The Rime of the Ancient Mariner'। এই ধরনের কবিতা রচনায় কোল্‌রিজের বিশেষ প্রবণতা ও দক্ষতা ছিল।

লৌকিক জগতের বাইরের বিষয়সমূহকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে বর্ণনা করতে তিনি অত্যন্ত পটু ছিলেন। এই ধারার অন্য বিখ্যাত কবিতা হল 'Christabel' এবং 'Kubla Khan'। ১৭৯৮ সালে কোল্‌রিজ্ জার্মানি ভ্রমণে যান। সেখানে বেশ কয়েক মাস কাটিয়ে এসে তিনি বিখ্যাত জার্মান লেখক শিলারের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮০৯ সালে তিনি অন্য

www.pathagar.com

একটি সাময়িকী 'The Friend' এর সম্পাদনা শুরু করেন। এটির আয়ুও দীর্ঘ হয় নি। এই পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি পরে সংগৃহীত আকারে ছাপা হয়। ১৮১৭ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Biographia Literaria' প্রকাশিত হয়। এটি একদিকে যেমন তাঁর সাহিত্যিক আত্মজীবনী, তেমনি সাহিত্য বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন মূল্যবান অভিমত ও রায়ও প্রতিফলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। ১৮১৭ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল 'Zapolya' এবং 'Osoril' নামে তাঁর দু'টি নাটক।

কোল্‌রিজ্ কবি হিসাবে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হলেও সাহিত্য-সমালোচনার জন্যও তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে এক অক্ষয় স্থান দখল করে আছেন। তিনি জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যায় আগ্রহী ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি জার্মান দার্শনিক কাণ্ট (দ্র) ও শেলিং দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ১৮৩৪ সালের এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় কোল্‌রিজ্ অনুভব করেন যে তিনি মারা যাচ্ছেন। মৃত্যুর আগের দিন সন্ধ্যাবেলাতেও তিনি বন্ধু গ্রিনকে শ্রুতিলিখন দিয়েছিলেন।

শ. আহ.

কোষ (cell)

জীবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকর্মের ক্ষুদ্রতম এককের নাম কোষ, যা স্বাধীনভাবে জীবনক্রিয়া পরিচালনায় সক্ষম। দেহ অসংখ্য কোষের সমবায়ে গঠিত। কোষের প্রধান দু'টি অংশ সাইটোপ্লাজম (cytoplasm) ও কেন্দ্রক (নিউক্লিয়াস)। সাইটোপ্লাজমকে ঘিরে প্রাচীরের মতো রয়েছে কোষঝিল্লির বেষ্টনী। সাইটোপ্লাজম এক ধরনের সজীব পিচ্ছিল পদার্থ, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কাজের দায়িত্বসম্পন্ন যন্ত্রপাতি, যেমন রিবোসোম (রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা আর. এন. এ.), এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, গল্‌গি অ্যাপারেটাস, মিটোকণ্ড্রিয়া, লাইসোসোম, সেন্ট্রোসোম ইত্যাদি।

কেন্দ্রক সাধারণত আকারে গোল, ঘনবদ্ধ উপাদান; প্রায়শ কোষের কেন্দ্রস্থলেই এর অবস্থান। এর আকার, আকৃতি ও অবস্থানে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কেন্দ্রকের চারপাশে রয়েছে আবরক ঝিল্লি। কেন্দ্রকের প্রধান উপাদান ডি এন এ (ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড)। কেন্দ্রকের ভেতরে এক বা একাধিক নিউক্লিয়োলাস (কেন্দ্রিক) অবস্থান করে।

উদ্ভিদকোষের আদর্শ নমুনা

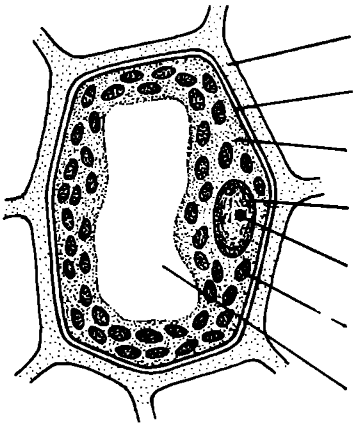

প্রাণিকোষের আদর্শ নমুনা

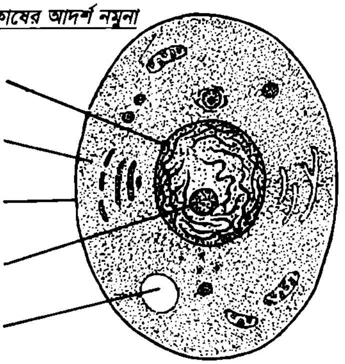

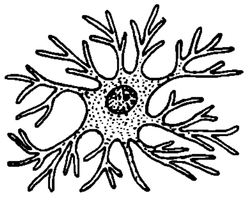

স্নায়ু কোষ

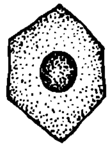

আবরক কোষ

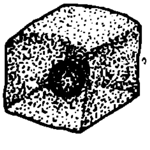

নিঃসারক কোষ

কেন্দ্রকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিশেষ ধরনের আর. এন. এ. সংশ্লেষণ, যা আবার বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন তৈরির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। তা ছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রকে রয়েছে বংশগতির উপাদান ক্রোমোজোম (দ্র), জীন (দ্র), ইত্যাদি। কেন্দ্রকটি সরিয়ে নিলে কোষের মৃত্যু ঘটে। বহুকোষী

www.pathagar.com

জীবের কোষ বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন কাজের হয়ে থাকে। যেমন— কাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্নায়ুকোষ, আবরক কোষ, নিঃসারক কোষ ইত্যাদি।

১৬৬৫ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক (Robert Hooke : ১৬৩৫-১৭০৩) অণুবীক্ষণের (দ্র) সাহায্যে প্রথম দেখান যে উদ্ভিদদেহ প্রকোষ্ঠের মতো অসংখ্য কোষের সমবায়ে গঠিত। কোষ শব্দটির লাতিন অর্থ প্রকোষ্ঠ। এর পর হেনরি দুত্রোশেৎ, ইয়াকোব শ্লাইডেন (Jacob Schleiden : ১৮০৪-১৮৮১), টেওডোর শ্ভান্ (Theodor Schwann : ১৮১০-১৮৮২) রুডোল্‌ফ্ ফির্কোহ্ব (Rudolf Virchow : ১৮২১-১৯০২) প্রমুখ বিজ্ঞানী কোষ সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেন। আর ১৮৩১ সালে রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown : ১৭৭৩-১৮৫৮) দেখান কোষের অভ্যন্তরে কেন্দ্রকের উপস্থিতি। এমনি করে ছোট্ট এই কোষের গবেষণার ধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোষতত্ত্বের মতো বিজ্ঞানের উপশাখা।

রু. হা.

কোষকলা (tissue)

গঠন ও কার্যক্রমের দিক থেকে সব দেহকোষ এক ধরনের নয়। বরং দেখা যায়, এক জাতীয় কোষ সমষ্টিগতভাবে নির্দিষ্ট ধরনের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এ ধরনের সংঘবদ্ধ কোষ বা কোষসমষ্টির নাম কোষকলা বা টিস্যু, সংক্ষেপে কলা। সংঘবদ্ধ কোষগুলোকে ধরে রাখে বিভিন্ন পরিমাণের আন্তঃকৌষিক উপাদান। দুই বা ততোধিক কলার সমন্বয়ে বিশেষ ধরনের কাজ করার জন্য তৈরি হয় অঙ্গ বা দেহযন্ত্র (অর্গ্যান)। এগুলো দেহকর্মের বৃহত্তর একক হিসাবে বিবেচিত, যেমন— যকৃৎ (দ্র), বৃক্ক (দ্র), রক্তবাহ, ত্বক (দ্র), ফুসফুস (দ্র) ইত্যাদি। আবার কয়েকটি অঙ্গ নির্দিষ্ট ধরনের কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে সমন্বিত হয়ে দেহতন্ত্র গঠন করে, যেমন— শ্বসনতন্ত্র (দ্র), পরিপাকতন্ত্র (দ্র) ইত্যাদি।

মানবদেহ কয়েক প্রকার মৌলিক কোষকলার সাহায্যে গঠিত। যেমন— আবরক কলা (এপিথেলিয়াল টিস্যু), সংযোজক কলা (কানেক্টিভ টিস্যু), পেশিকলা (মাস্‌কুলার টিস্যু), স্নায়ুকলা (নার্ভাস টিস্যু)। দেহের প্রয়োজনীয় নানা কাজ এরা করে থাকে। যেমন—দেহকে রক্ষা, শোষণ, নিঃসরণ, নিষ্কাশন, চলন, দেহকাঠামো গঠন, প্রতিরক্ষা, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, প্রতিটি কাজের উপযোগী উদ্দীপনা সৃষ্টি ও তা পরিবহণ ইত্যাদি।

রু. হা.

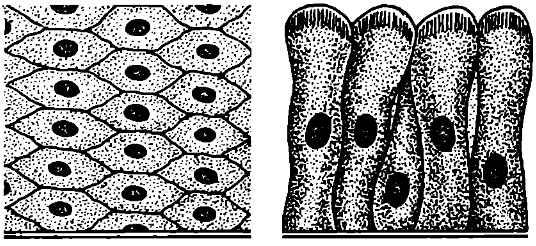

আবরক কলা : আইশাকার ও স্তম্ভাকার

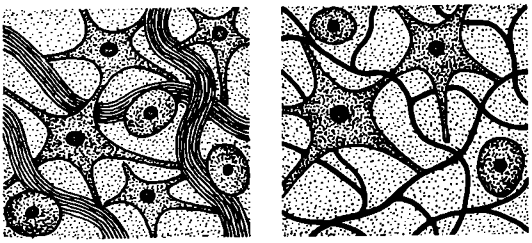

সংযোজক কলা : শ্বেততন্তুময় কলা ও স্তম্ভাকার আবরক কলা

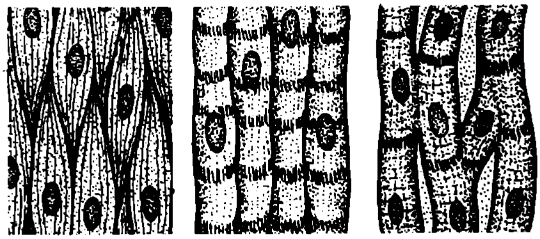

পেশি কলা : মসৃণ রৈখিক ও হৃদ্‌পেশি

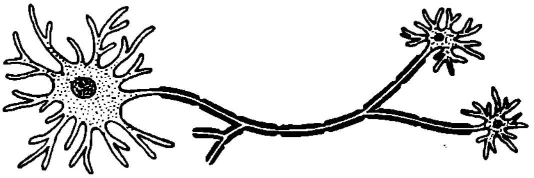

স্নায়ু কলা

www.pathagar.com

কোষ্ঠী

জন্মপত্রিকা। এতে জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে নবজাতকের সারা জীবনের শুভাশুভ লিখিত থাকে। সেই কোষ্ঠী গণনা করতে হলে সর্বপ্রথমে জন্মসময় নির্ণয় করতে হয়। সময় স্থির করতে না পারলে কোষ্ঠী গণনা করা যায় না। ঘড়ি (দ্র) দ্বারা অনেক সময়ে সূক্ষ্মরূপে সময় নির্ণয় হয় না। এ জন্য প্রাচীন কাল থেকে প্রাচীন রীতি ও প্রথা ইত্যাদি নানা উপায়ে জন্মসময় ঠিক করা হয়।

বহুকাল থেকে ভারতবর্ষে কোষ্ঠী লেখার নিয়ম প্রচলিত। লোকের বিশ্বাস যে গ্রহ (দ্র)গণ দেবতা। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো না কোনো একটি গ্রহের অধিকারে অবস্থান করে। এই গ্রহগণ মানুষের শুভাশুভ ফলের কারণ। গ্রহ মন্দ হলে পুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য প্রভৃতি সবই বিনষ্ট হতে পারে। আবার শুভ গ্রহগণ মানুষের সব রকম সুখের কারণ। এমনকি গ্রহগণ মানুষকে পৃথিবীর (দ্র) অধিপতি বা পৃথিবীখ্যাত করে দিতে পারে।

পৃথিবীর বহু জাতির মধ্যেও বহুকাল থেকে জন্মকোষ্ঠীর প্রথার প্রচলন আছে। ইউরোপীয়দের মধ্যেও জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত করা হয়। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী জন্মকোষ্ঠীতে আদৌ বিশ্বাস করেন না।

কোষ্ঠীতে লগ্ন ও গ্রহের অবস্থান অনুযায়ী রাশি নির্ধারিত হয়। রাশি বারোটি—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। এই রাশিগুলোর নিয়ন্ত্রক নয়টি গ্রহ— রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। এসবের সাহায্যে রাশিচক্র তৈরি হয়। বঙ্গদেশের রাশিচক্র ও দক্ষিণ ভারতের রাশিচক্র ভিন্ন রকম।

যিশুখ্রিস্টের (দ্র) জন্মের পরে এদেশে রাশিচক্র ও গ্রহভিত্তিক ফলশাস্ত্রপদ্ধতির প্রচলন হয়। অনেকে মনে করেন যে আলেকজাণ্ডারের (দ্র) পরে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পরিচয়ে যাঁরা পশ্চিম থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তাঁরাই এদেশে গ্রহভিত্তিক ফলশাস্ত্র প্রবর্তন করেন। পারস্য বা কান্দাহার বা সাইথিয়া বা কাশ্মীরের উত্তরের দেশকে শাকদ্বীপ বোঝায়। ভারতবর্ষে বরাহমিহিরের (খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক) গ্রন্থে বর্তমান কোষ্ঠীপদ্ধতির রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত তার দু'-তিন শ' বছর আগে থেকে এদেশে রাশিভিত্তিক ফলিতজ্যোতিষ ও কোষ্ঠীবিচার প্রভৃতির ক্রমপ্রবর্তন ঘটেছে।

বি. ব.

কৌটিল্য চাণক্য দ্র

কৌতুকাভিনয়

মঞ্চে বা চলচ্চিত্রে (দ্র) কোনো চরিত্র বা ঘটনাকে অভিনয়ের মাধ্যমে হাস্যকররূপে পরিবেশন করার প্রক্রিয়াকে কৌতুকাভিনয় বলা হয়। দর্শকচিত্তে হাসি উদ্রেকের জন্য অভিনেতা সচেতনভাবে আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেন। দক্ষ কৌতুকাভিনেতা তাঁর অঙ্গভঙ্গি, উচ্চারণ, এমনকি নীরবতাকেও এ কাজে ব্যবহার করেন। সার্থক কৌতুকাভিনয় একটি কঠিন শিল্পকর্ম। রুচির দৈন্য ও আতিশয্যের প্রকৃতির কারণে কৌতুকাভিনয় অনেক সময় স্থূলতাদোষে আক্রান্ত হয়ে নিচু ভাঁড়ামি হয়ে পড়তে পারে।

চার্লি চ্যাপলিন —'দ্য কিড' ছবিতে

বাংলা রঙ্গমঞ্চে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (১৮৫০–১৯০৮) কৌতুকাভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে চলচ্চিত্রের অঙ্গনে চার্লি

www.pathagar.com

চ্যাপলিন (দ্র) কৌতুকাভিনেতা হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীর মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর কৌতুকাভিনয় ছিল বহুমাত্রিক। তিনি তার মধ্যে সমাজচেতনা, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ এবং কখনো কখনো অত্যন্ত আবেদনময়ভাবে একই সঙ্গে হাসি ও কান্নার আবহ সৃষ্টিতে সক্ষম হতেন।

ক. চৌ.

কৌলীন্য প্রথা

কুলমর্যাদা ও আভিজাত্যকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক প্রথা বঙ্গদেশ ও মিথিলায় প্রচলিত ছিল তা-ই কৌলীন্য প্রথা। এই প্রথাটি মূলত ব্রাহ্মণপ্রধান সামাজিক ব্যবস্থা। বঙ্গদেশে শুধু ব্রাহ্মণ সমাজে নয়, কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কৌলীন্যপ্রথায় একই শ্রেণীর বংশের কয়েকটিকে উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ও প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং এই বংশগুলি 'কুলীন' হিসাবে পরিচিত। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাংলার কায়স্থসমাজে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র বংশ হিসাবে কুলীন অর্থাৎ সামাজিক মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিচিত। কুলীনব্রাহ্মণেরা যে কোনো শ্রেণীর মেয়ে বিয়ে করতে পারতেন, কিন্তু কুলীন মেয়ের বিয়ে অকুলীনের সঙ্গে হলে মেয়ের বাবা সমাজচ্যুত হতেন। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন বিধিনিষেধ থাকায় সমাজে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কুলীন ব্রাহ্মণ যেমন টাকার লোভে বহু বিয়ে করতেন, তেমনি গরিব কুলীন মেয়েদের চিরকুমারী থাকতে হত। বহুপত্নীকের স্ত্রীরা নিজ নিজ পিতৃগৃহেই জীবন কাটাতেন। কৌলীন্য প্রথার উদ্ভাবক ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সেনবংশের রাজা বল্লাল সেনের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আর মিথিলার রাজা হরিসিংহের নামও এর সঙ্গে জড়িত। তবে অনুমান করা হয়, যেহেতু প্রাচীন বাংলা ও মিথিলার মধ্যে যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ, ফলে উভয় প্রদেশে একই সময়ে একই সামাজিক প্রথার উদ্ভব স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল।

মে. খা.

ক্যাঙ্গারু (kangaroo)

বিচিত্র এক স্তন্যপায়ী প্রাণী (দ্র) ক্যাঙ্গারু। পেছনের পা দু'টি বেশ লম্বা আর শক্তিশালী। সেই তুলনায় সামনের পা দু'টি নিতান্তই ছোট, যেন দু'টি হাত। ক্যাঙ্গারু পেছনের পায়ের সাহায্যে বেশ দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে পারে, এমনকি ঘণ্টায় প্রায় ৪০ মাইল বেগে দৌড়াতে পারে।

পৃথিবীতে প্রায় ৪০ প্রজাতির ক্যাঙ্গারু আছে। এর মধ্যে ৫টি প্রজাতি অন্যান্য ক্যাঙ্গারুর তুলনায় বেশ বড়। এগুলোকে সাধারণত বৃহৎ ক্যাঙ্গারু বলে উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে ধূসর ক্যাঙ্গারু ও লাল ক্যাঙ্গারু ১.৮ মিটার বা প্রায় ৬ ফুট উঁচু হয় এবং ওজন হয় ৪৫ কেজি বা ১০০ পাউণ্ডের মতো।

ক্যাঙ্গারুর মাথা অপেক্ষাকৃত ছোট, দেখতে অনেকটা হরিণের মতো। কান দু'টি বড় এবং ওপর দিকে খাড়া। দেহ ছোট ছোট লোমে ঢাকা থাকে। অবশ্য একই প্রজাতির বিভিন্ন ক্যাঙ্গারুর গায়ের রঙ বিভিন্ন রকম হতে পারে। কোনো কোনো প্রজাতির বা বৃহৎ ক্যাঙ্গারুর লেজ প্রায় এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। দৌড়ানোর সময় ক্যাঙ্গারু

www.pathagar.com

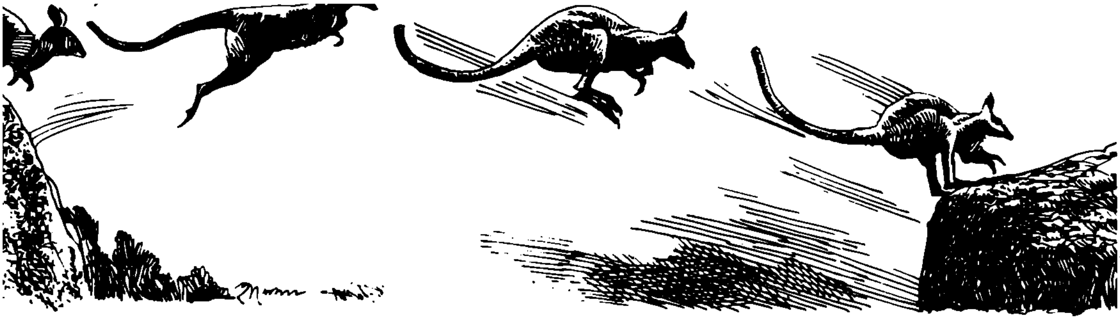

লেজের সাহায্যে তার শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। এরা লাফাতে এত ওস্তাদ যে ৬ ফুট উঁচু দেয়াল পর্যন্ত ডিঙিয়ে চলে যেতে পারে। অধিকাংশ ক্যাঙ্গারুর আবাস অস্ট্রেলিয়া (দ্র) মহাদেশে (দ্র)। নিউগিনি এবং নিকটবর্তী দ্বীপগুলিতেও কিছু কিছু ক্যাঙ্গারুর আবাস রয়েছে। কিছু ক্যাঙ্গারু বনে-জঙ্গলে, কিছু ক্যাঙ্গারু সমতল ভূমিতে, আবার কিছু কিছু ক্যাঙ্গারু মরুভূমি ও সংলগ্ন তৃণভূমিতে বিচরণ করে।

ক্যাঙ্গারু খুবই ছোট অর্থাৎ মাত্র ইঞ্চি খানেক লম্বা বাচ্চা প্রসব করে। ক্যাঙ্গারুর পেটের নিচে বাচ্চা বহনের জন্য একটি থলে থাকে। প্রসবের পর এই ছোট বাচ্চাটিকে ক্যাঙ্গারু থলের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং বাচ্চা যথেষ্ট শক্তসমর্থ না হওয়া পর্যন্ত এই থলেতেই থাকে। সাধারণত ৬ মাস থলেতে থাকার পর বাচ্চা থলের বাইরে আসতে শুরু করে। প্রায় ৮ মাস পর ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা স্থায়ীভাবে থলে ছেড়ে যায়।

ফ. মা.

ক্যান্টারবেরি টেইল্‌স্‌, দ্য

'দ্য ক্যান্টারবেরি টেইল্‌স্‌' (The Canterbury Tales) ইংরেজি সাহিত্যের (দ্র) এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এর রচয়িতা চতুর্দশ শতাব্দীর জেফ্রি চসার (Geoffrey Chaucer : আনু. ১৩৪৫-১৪০০) ছিলেন এক অসাধারণ গুণী মানুষ। সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, অনুবাদক, পণ্ডিত, যোদ্ধা, রাষ্ট্রদূত, দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন সরকারি কর্মচারী জেফ্রি চসার মাতৃভাষা মধ্য-ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি এবং লাতিন ভাষা খুব ভাল জানতেন। কিন্তু তিনি নিজেকে কখনো গ্রন্থজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। বাস্তব জগতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি ভালভাবে অবহিত ছিলেন। বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন তিনি, ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন স্বদেশ ও বিদেশের নানা স্তরের নানা চরিত্রের নানা মানুষের সঙ্গে। এর মধ্যে ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্য, সৈনিক, ধর্মযাজক, পণ্ডিত, বণিক ও নিচু তলার মানুষ। বাস্তব জীবনের এই ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন আমরা দেখি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ক্যান্টারবেরি টেইল্‌স্‌-এ।

এই গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কতকগুলি গল্প পরিবেশন করেছেন। তিনি প্রথমে সুন্দর একটি পটভূমি নির্মাণ করে নিয়েছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের কয়েক জন মানুষ বসন্তকালের এক মনোরম প্রভাতে একটি পান্থশালায় একত্রিত হয়েছেন। তাঁরা তীর্থে যাবেন। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে আছেন উচ্চবংশীয় নাইট, আইনজীবী, নাবিক, চিকিৎসক, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী, অক্সফোর্ডের পণ্ডিত ব্যক্তি, পাদ্রি ও অন্যান্য পেশার আরো কতিপয় ব্যক্তি। দীর্ঘ পথযাত্রাকে যতটা সম্ভব আনন্দদায়ক ও ক্লান্তিহীন করার উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রীরা প্রত্যেকে একটি করে গল্প বলছেন। এই গল্পগুলি নিয়েই গড়ে উঠেছে ক্যান্টারবেরি টেইল্‌স্‌।

গ্রন্থের ভূমিকা অংশে আমরা উনত্রিশ জন তীর্থযাত্রীর উল্লেখ পাই। চসার প্রথমে পরিকল্পনা করেছিলেন যে প্রত্যেক তীর্থযাত্রী দু'টি করে গল্প বলবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা তেইশ জন তীর্থযাত্রীকে একটি করে গল্প বলতে

www.pathagar.com

দেখি। এর মধ্যেও দু'একটি গল্প অসমাপ্ত। তবু ক্যান্টারবেরি টেইল্‌স্‌ অসামান্য শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে। গল্পগুলিতে আমরা এক নিপুণ শিল্পীর দক্ষ তুলির আঁচড় লক্ষ করি। প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত। চসার শুধু চরিত্রগুলির বর্ণনাই দেন নি, তিনি তাদের কথাবার্তা, রুচি, ভালমন্দের প্রতি আকর্ষণ ও জীবনযাত্রার চমৎকার ছবি তুলে ধরেছেন। তীর্থযাত্রীরা পুণ্যভূমি ক্যান্টারবেরি যাবার পথে নিজেরা যে শুধু যার যার গল্প বলে যায় তাই নয়, তারা পরস্পরের গল্পের সমালোচনাও করে। বিভিন্ন স্তরের সমাজজীবনের বিশ্বস্ত চিত্রের পাশাপাশি আমরা ক্যান্টারবেরি টেইল্‌স্‌-এ পাই সূক্ষ্ম হাস্যরস, লক্ষ করি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে লেখকের উদার প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি পাপীর চিত্র এঁকেছেন, ধার্মিকের চিত্র এঁকেছেন, ভণ্ডের চিত্র এঁকেছেন, আরো নানা রকম মানুষের চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু কারো প্রতি তাঁর ক্রোধ বা বিদ্বেষ নেই। সবার সম্পর্কেই যেন তাঁর এক ধরনের প্রশ্রয় ও স্নেহ আছে। গল্পগুলি তাদের বৈচিত্র্যের গুণেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া প্রতিটি তীর্থযাত্রীর গল্পের মধ্য দিয়ে সেই সময়ের ইংল্যাণ্ডের জীবনধারার একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি ক্যান্টারবেরি টেইল্‌স্‌-এ অঙ্কিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, গল্পগুলিতে গল্পবলিয়েরা নানা উপকথা ও পৌরাণিক কাহিনীও জুড়ে দিয়েছেন। চসার এক জন উচ্চমানের শিল্পীর দক্ষতা নিয়ে এই সব কিছু এক সুতোয় গেঁথেছেন, তাদের সুসমন্বিত করেছেন এবং সমগ্র রচনাটিকে রসমণ্ডিত করে তুলেছেন। বিশেষভাবে ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের মানুষদের চরিত্র ও আচার-আচরণের মধ্যে যে অসঙ্গতি ও দুর্বলতা আছে, লেখক তাকে চমৎকারভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। আজকের দিনেও পাঠক সানন্দে তা উপভোগ করে। ক্যান্টারবেরি টেইল্‌স্‌ বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে মর্যাদার আসনে সমাসীন।

ক. চৌ.

ক্যাথলিকবাদ

খ্রিস্টান ধর্মের আদি রূপ। এই মতে পবিত্র আত্মার উৎস কেবল ঈশ্বর নন, ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিস্টও (দ্র)। পরলোকে পাপীদের জন্য শোধনাগারের অস্তিত্বের ধারণও এই ধর্মমতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পোপ হচ্ছেন এই ধর্মের শীর্ষস্থানীয় পুরোহিত বা ধর্মগুরু—যিশুখ্রিস্টের ইহলৌকিক বা পার্থিব প্রতিনিধি। তিনি সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে। তাঁর বাণী বা নির্দেশ এই ধর্মের অনুসারীদের জন্য অলঙ্ঘনীয় জীবনবেদস্বরূপ। ক্যাথলিকবাদে ধর্মযাজকদের জন্য বিবাহ ও পারিবারিক জীবন নিষিদ্ধ। রোমের ভাটিকান সিটি (Vatican City) হচ্ছে পোপের রাজধানী এবং এই ধর্মানুসারীদের প্রধান তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ।

মধ্যযুগের ইউরোপে (দ্র) রোমান ক্যাথলিকেরা কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। পার্থিব সম্পদ ও শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাঁরা গড়ে তোলেন এক প্রবল প্রভাব-বিস্তারকারী বিশাল সাম্রাজ্য। রোমান ক্যাথলিকেরা এখনো সারা বিশ্বে প্রভাব ও সাংগঠনিক শক্তির বিচারে এক বিরাট শক্তি হিসাবে বিদ্যমান।

আ. হু.

ক্যাথোড (cathode)

কোনো তড়িৎ-উপাদানের দু'টি তড়িৎদ্বার বা ইলেক্ট্রোড থাকে। একটি দিয়ে ইলেক্ট্রন (দ্র) বেরিয়ে যায়, অন্যটি দিয়ে প্রবেশ করে। যেটি দিয়ে ইলেক্ট্রন বেরিয়ে আসে (ইলেক্ট্রন-আধিক্যবিশিষ্ট পাত) সেই পাতটিকে ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার বা ক্যাথোড বলে। ধনাত্মক তড়িৎদ্বারটি অ্যানোড (দ্র)।

তড়িৎ বিশ্লেষণ বা তড়িৎপ্রলেপনের (দ্র) সময় ভোল্টামিটারে (দ্র) দু'টি পাত বা দণ্ড ডোবানো থাকে। যে পাতটি ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেটি ক্যাথোড। তড়িৎপ্রলেপন বা ইলেক্ট্রোপ্লেটিং (দ্র) প্রক্রিয়ায় এক ধাতুর ওপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। যার ওপর প্রলেপ দেওয়া হয় তাকে ভিতধাতু বলে। ভিতধাতুটি ক্যাথোডে যুক্ত করা হয়।

থার্মো আয়োনিক ভাল্ব বা ইলেক্ট্রনিক টিউবে (ডায়োড (দ্র), ট্রায়োড (দ্র) ইত্যাদি) একাধিক তড়িৎদ্বার থাকে। এদের একটি থাকে ক্যাথোড। ক্যাথোডটি এমন পদার্থের

www.pathagar.com

দ্বারা তৈরি হয়, যা উত্তপ্ত হলে ইলেক্ট্রন মুক্ত করে। বর্তনীতে এই ভাল্বগুলি এমনভাবে যুক্ত হয় যে ক্যাথোড থেকে ইলেক্ট্রন নির্গত হয় এবং তড়িৎপ্রবাহকে একমুখী করে। রেক্টিফায়ার (দ্র), অ্যামপ্লিফায়ার (দ্র) তৈরিতে এই সব ভাল্ব ব্যবহৃত হয়।

স. রা.

ক্যানোয়িং (canoeing)

ক্যানো হল এক ধরনের ছোট হাল্কা দেশী ডিঙি নৌকার মতো নৌকা। এর দুই দিক চোখা থাকে। এক বা একাধিক বৈঠার দ্বারা (একটি বৈঠার উভয় দিকে উপরে ও নিচের দিকের চ্যাপ্টা অংশ) বাওয়া হয়ে থাকে। ক্যানোর উপরিভাগ খোলা থাকে। এ ধরনের জলযান বেশি ওজনসহ খুব দ্রুতবেগে চালানো যায়। তবে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যেসব ক্যানো ব্যবহৃত হয়, সেগুলি লম্বায় ১২ থেকে ১৫ ফুট ও গভীরতায় ১০ থেকে ১৫ ইঞ্চি এবং মাঝখানের অংশ ছাড়া প্রায় সবটাই হাল্কা মজবুত আচ্ছাদন দ্বারা ঢাকা থাকে। এই ক্যানোগুলির চালকও এক জনই থাকে।

১৯৪৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্যানো ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৩৬ সালে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেম্‌সে

প্রতিযোগিতার জন্য দু' ধরনের ক্যানো

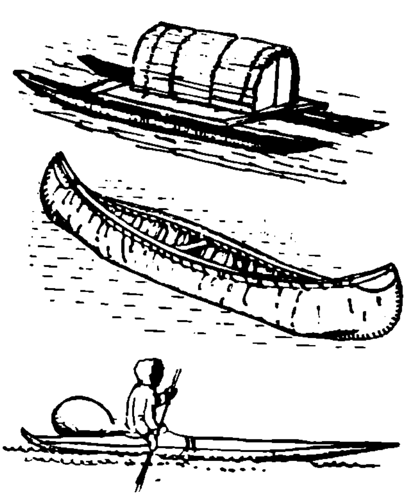

উপরে : শ্রীলঙ্কার জোড়া ক্যানো
মাঝে : গাছের বাকলে তৈরি কানাডার ক্যানো
নিচে : এস্কিমোদের ক্যানো 'কায়াক্'

(দ্র) ক্যানো প্রতিযোগিতা সর্বপ্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়। মহিলাদের ক্যানো প্রতিযোগিতা ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিক্‌স্-এ সংযোজিত হয়। ক্যানোয়িংয়ে বিভিন্ন আকারের ও দূরত্বের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

কা. আ. আ.

ক্যান্সার / কার্সিনোমা (cancer/carcinoma)

ক্যান্সার (চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'কার্সিনোমা') এপিথেলিয়াল কোষ থেকে উদ্ভূত ম্যালিগন্যান্ট (ক্ষতিকর) টিউমার (দ্র)। নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষের অনিয়ন্ত্রিত ও বিশৃঙ্খল সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে ক্যান্সার দেখা দেয়। এই অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধির পেছনে রয়েছে কোষের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার পরিবর্তন এবং আচরণগত চরিত্রবদল। ক্যান্সারকোষ তাই তার নিজস্ব নিয়মে বেড়ে চলে এবং দেহের কোনো কাজে আসে না। ক্যান্সারকোষ কখনো পরিণত পর্যায়ে পৌঁছায় না বলে কোষের বংশবৃদ্ধি অব্যাহত ধারায় চলে এবং ক্যান্সারকোষ সন্নিহিত কোষকলাদের আক্রমণ এবং সেগুলোকে নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে।

এই বৈশিষ্ট্যের ফলে ক্যান্সারকোষ লসিকাপ্রবাহ বা

www.pathagar.com

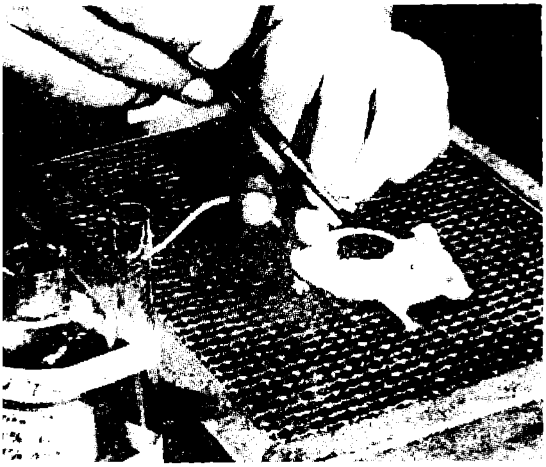

সিগারেটের টার জাতীয় পদার্থ থেকে ইঁদুরের চামড়ায়ও ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি হয়

ঘাতক লিম্ফোসাইটের ক্যান্সার কোষ আক্রমণ
নিচে : ক্যান্সার রোগ বিষয়ে গবেষণা

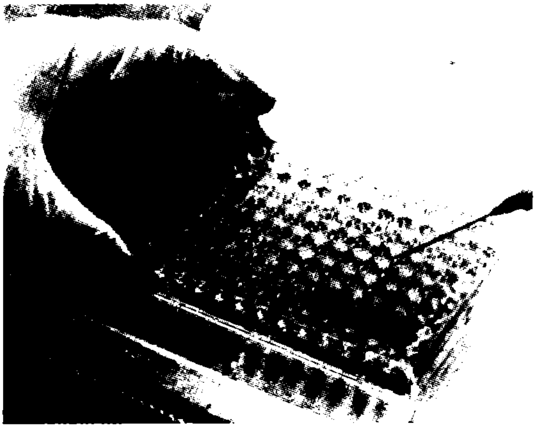

রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং নতুন নতুন স্থানে ক্যান্সারকোষের বসতি স্থাপন করতে পারে। সেই সঙ্গে তা রাখে অনিয়ন্ত্রিত বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা। এই দূরবিস্তারের ('মেটাস্টেসিস') কারণে ক্যান্সার রোগীর মৃত্যু ঘটে থাকে।

ক্যান্সারের কারণ এখনো পুরোপুরি জানা যায় নি। যদিও কিছু কিছু ভৌত কারণ, রাসায়নিক উপাদান, ডি. এন. এ বা আর. এন. এ ভাইরাসের কোনো কোনোটি এবং কখনো-বা যৌন হরমোন স্বাভাবিক কোষের চরিত্র বদল করে ক্যান্সারের সূচনা ঘটাতে পারে, তবু চিকিৎসাবিজ্ঞানের (দ্র) চোখে ক্যান্সার এখনো রহস্যই রয়ে গেছে।

ক্যান্সারের চরিত্র তাই বহুমুখী ও জটিল। অথচ ত্বক (দ্র), ফুসফুস (দ্র), পাকস্থলী (দ্র), অগ্ন্যাশয় (দ্র), বৃক্ক (দ্র), মূত্রাশয়, মলাশয়, থেকে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি (দ্র), মস্তিষ্ক ও রক্তকোষের ক্যান্সার (লিউকেমিয়া [দ্র]) সহ দুই শ'রও অধিক ধরনের ক্যান্সার মানবদেহ আক্রমণ করে থাকে এবং ক্যান্সারে মৃত্যুর সংখ্যা এখনো অনেক রোগের চাইতে বেশি।

সঠিক কারণ জানা না থাকার কারণে ক্যান্সারের চিকিৎসাও ফলপ্রসূ নয়। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আক্রান্ত অঙ্গ অপসারণ, রশ্মিচিকিৎসা এবং কোষনাশক ঔষধ (দ্র) ব্যবহারই বর্তমানে প্রচলিত চিকিৎসা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুরুতে ধরা পড়ে না বলে অস্ত্রোপচারের সাফল্য যথেষ্ট নয়, আবার শেষোক্ত দুই পদ্ধতির চিকিৎসার বিষক্রিয়াও যথেষ্ট। তাই ক্যান্সার চিকিৎসাকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে এখনো অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে।

ক্যান্সারকে বাংলায় বলা হয় কর্কট রোগ।

রু. হা.

ক্যাপাসিটর (capacitor)

সাধারণ অর্থে যে তড়িৎযন্ত্র বিদ্যুৎ বা চার্জ (দ্র) ধারণ করে তাকে ধারক বা ক্যাপাসিটর বলে। কোনো অপরিবাহী মাধ্যম মাঝখানে রেখে দু'পাশে দু'টি পরিবাহী খণ্ডকে বিশেষ উপায়ে সাজিয়ে ক্যাপাসিটর তৈরি করা হয়। তড়িৎশক্তি বা চার্জকে ধরে রাখাই এর কাজ। ক্যাপাসিটর বা ধারকের ধারকত্ব হল চার্জ ধারণ করার ক্ষমতা।

www.pathagar.com

ক্যাপাসিটরের প্রাথমিক অবস্থা হল লিডেন জার (Leyden jar)। এটি আবিষ্কৃত হয় ১৭৪৬ সালে। পরবর্তী সময়ে ক্যাপাসিটরের আকারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন আকার-আকৃতির ক্যাপাসিটরের মূলনীতি একই। দু'টি পরিবাহী পাতকে কোনো অপরিবাহী দিয়ে আলাদা করে পাশাপাশি বসানো হয়। অপরিবাহী হিসাবে বায়ু (দ্র), সিরামিক (দ্র), কাচ, মাইকা (দ্র), প্লাস্টিক (দ্র), কাগজ (দ্র) এবং তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয়। এই অপরিবাহীগুলোর বিশেষ নাম 'ডায়লেট্রিক'। যখন বিদ্যুৎবর্তনীতে কোনো ক্যাপাসিটর যুক্ত করা হয়, এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না, কিন্তু দুই প্লেটে দুই ধরনের চার্জ জমা হয়। ব্যাটারি বা তড়িৎ-উৎস সরিয়ে বর্তনী পূর্ণ করলে বর্তনীতে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাওয়া যায়।

ক্যাপাসিটরের গঠন-আকৃতি এবং ব্যবহৃত ডায়লেট্রিক-এর প্রকৃতির উপর চার্জ ধারণক্ষমতা নির্ভর করে। ধারকত্ব পরিমাপের একক ফ্যারাড (farad)। এর হাজার ভাগের এক ভাগ হল মাইক্রো-ফ্যারাড। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক এবং ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ক্যাপাসিটর। টিউব স্টার্টার এক ধরনের ক্যাপাসিটর। রেডিও (দ্র)–টেলিভিশনের (দ্র) ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র বা প্রচারতরঙ্গ নির্বাচনের জন্য যে নব্ (চাবি) ঘোরানো হয়, তার সঙ্গে যুক্ত থাকে বিশেষ ধরনের ক্যাপাসিটর, এদের বলে 'ভ্যারিয়েব্‌ল্' (পরিবর্তনশীল) ক্যাপাসিটর।

স. রা.

ক্যাপিটাল / ক্যাপিট্যাল ডাস্ কাপিটাল্ দ্র

ক্যাফিন (caffeine)

রাসায়নিক জৈব যৌগ। এর সংকেত হল $C_8H_{10}N_4O_2.H_2O$। ক্যাফিন গন্ধহীন সামান্য তিক্ত স্বাদের কঠিন পদার্থ, কেলাসাকৃতি। চা (দ্র) এবং কফির (দ্র) মধ্যে সামান্য পরিমাণে ক্যাফিন পাওয়া যায়। ক্যাফিন উত্তেজক পদার্থ। সামান্য পরিমাণ ক্যাফিন পানে রক্তের পরিচলন বৃদ্ধি পায়। এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু অধিক পরিমাণে তা

গ্রহণ করলে অনিদ্রা এবং স্নায়ুদুর্বলতা সৃষ্টি করে, মাথাব্যথা হয় এবং হজমে ব্যাঘাত ঘটায়। ক্যাফিন পানি (দ্র) ও অ্যালকোহলে (দ্র) দ্রবণীয়।

১৮২০ সালে প্রথম কফিবীজ থেকে ল্যাবরেটরিতে বিশুদ্ধ ক্যাফিন নিষ্কাশন সম্ভব হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ রোগীর জন্য হৃৎপিণ্ড বা স্নায়ুর উত্তেজনা বৃদ্ধিতে ক্যাফিন ব্যবহৃত হয়। আফিম (দ্র), অ্যালকোহল এবং অন্য ড্রাগের দ্বারা সৃষ্ট বিষক্রিয়া বিনষ্টের জন্য ক্যাফিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অনেক গবেষকই প্রমাণ করেছেন যে ক্যাফিনমুক্ত চা ও কফি স্বাস্থ্যের জন্য অধিক উপযোগী।

স. রা.

ক্যামেরা

ফটো তোলার যন্ত্র। ভেতরে কালো রঙ করা একটি আলোকনিরুদ্ধ বাক্সের এক দিকে একটি ছোট্ট ছিদ্র করে তার বিপরীত দিকে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক প্রলেপযুক্ত একটি পর্দা বসানো হয়। কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পর্দার উপর পড়লে ছবি তৈরি হয়। এই নীতির উপর ভিত্তি করেই ক্যামেরা তৈরি। 'ক্যামেরা' শব্দটি লাতিন শব্দ *camera obscura* থেকে এসেছে, এবং এর অর্থ 'অন্ধকার কক্ষ'।

বাজারে বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা পাওয়া যায়। সব ক্যামেরাই একই নীতিতে কাজ করে। এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে আলোকনিরুদ্ধ বাক্স বা ক্যামেরা বক্স, লেন্স (দ্র), ডায়াফ্রাম, শাটার, ফিল্মস্থল, ভিউফাইণ্ডার, পর্দা এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট রিং ইত্যাদি। ক্যামেরা বক্সের মুখেই থাকে

www.pathagar.com

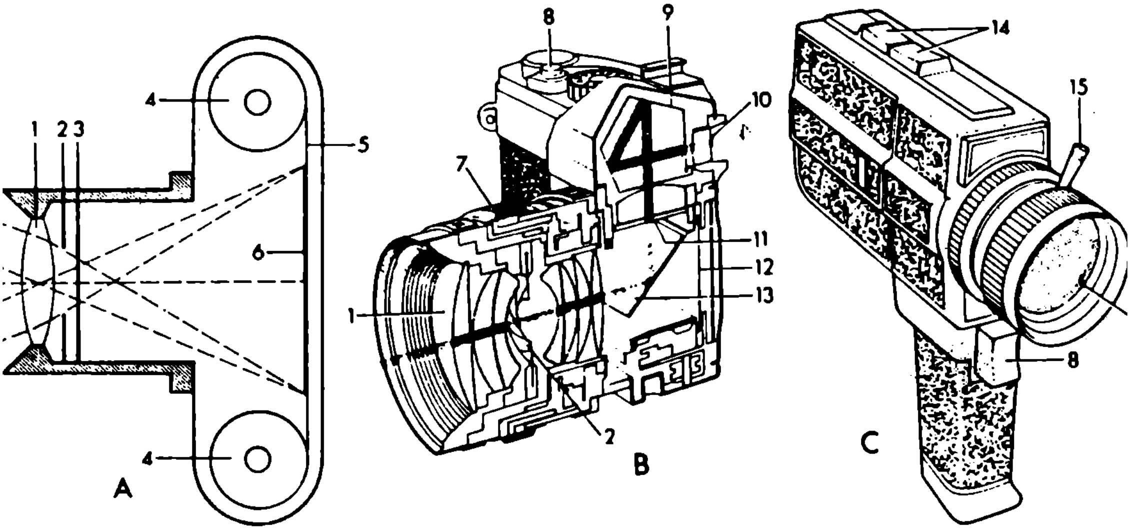

ক. ক্যামেরার নক্‌শা খ. ৩৫ মিমি সিঙ্গল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা (তীরচিহ্ন আলোকের পথ নির্দেশ করছে)
গ. চলচ্চিত্রের জন্য ব্যবহৃত ক্যামেরা :
১. লেন্স ২. আইরিস পর্দা (অ্যাপার্চার) ৩.শাটার ৪. ফিল্ম স্পুল ৫. ফিল্ম ৬. ওল্টানো প্রতিবিম্ব ৭. ফোকাস করার আংটা ৮. শাটার রিলিজ ৯. পেন্টাপ্রিজ্‌ম্‌ ১০. ভিউফাইণ্ডার ১১. ফোকাস করার পর্দা ১২. ফোকাস-তল শাটার ১৩. ত্বরিত-প্রত্যাবর্তন আয়না ১৪. বিদ্যুৎ-চালিত জুম নিয়ন্ত্রণ ১৫. হস্ত-চালিত জুম নিয়ন্ত্রণ

একটি উত্তল লেন্স, কখনো একাধিক লেন্স দিয়ে তৈরি একটি যৌগিক লেন্স। অ্যাডজাস্টমেণ্ট রিং ঘুরিয়ে লেন্স ও পর্দার মধ্যের দূরত্ব বাড়ানো-কমানো যায়। লেন্সের পরেই থাকে ডায়াফ্রামযুক্ত একটি ছোট্ট ছিদ্রপথ। এই ছিদ্রটিকে ছোট বড় করার জন্য থাকে অ্যাডজাস্টমেণ্ট রিং। প্রয়োজন মতো আলো ফিল্মের উপর ফেলার জন্য ডায়াফ্রামের ছিদ্র ছোট-বড় করতে হয়। ডায়াফ্রামের পর শাটারের অবস্থান। একটি সুইচের সাহায্যে শাটারটি খুলে দেওয়া বা বন্ধ করা যায়।

যে বস্তুর ছবি তুলতে হবে, ক্যামেরার লেন্সটিকে সেই দিকে মুখ করে ধরে ভিউফাইণ্ডারের মধ্য দিয়ে লক্ষ করতে হবে। ভিউফাইণ্ডারে যা-কিছু দেখা যায়, যেভাবে দেখা যায়, পর্দায় ঠিক সেভাবেই ছবি ওঠে। তাই ভিউফাইণ্ডারের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে লেন্সটি সামনে পেছনে সরিয়ে পর্দার উপর বস্তুর স্পষ্ট ছবি ফেলতে হয়। অতঃপর শাটারটি খুলে দিলে বস্তু থেকে আলো লেন্সের মধ্য দিয়ে পর্দার উপর পড়ে। পর্দার উপর রাসায়নিক বস্তুর তৈরি ফিল্মটি থাকায় ফিল্মের উপর ছবি তৈরি হয়।

ফিল্মের উপর প্রাপ্ত ছবিটি আলোতে আনা যাবে না। একে অন্ধকার ঘরে বিশেষ রাসায়নিক দ্রবণে (দ্র) ডুবিয়ে স্থায়ী করার পরই শুধু আলোতে আনা যাবে। এ ধরনের ছবিকে বলে ডেভলপ-করা নেগেটিভ। বিশেষ ধরনের কাগজের উপর একই উপায়ে অন্ধকার কক্ষে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ ছবি মুদ্রিত করা হয়। এই ছবিকেই বলে ফটোগ্রাফ।

আজকাল বাজারে বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা পাওয়া যায়। যেমন— ফিক্সড্‌ ফোকাস ক্যামেরা, টুইন-লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা, ভিউ ক্যামেরা, ইন্সট্যাণ্ট বা পোলারয়েড ক্যামেরা, মুভি ক্যামেরা, অটো ক্যামেরা, স্টিরিও ক্যামেরা ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে মহাকাশের ছবি তোলার, যুদ্ধের ছবি তোলার, বৈজ্ঞানিক কাজের, পানির তলায় ব্যবহারযোগ্য বিশেষ বিশেষ ক্যামেরা।

স. রা.

www.pathagar.com

ক্যারল (carol)

এক সময় ক্যারল বলতে বোঝাত গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে এক ধরনের নাচ। পরে গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচলেই তা ক্যারল নামে অভিহিত হত। এখন 'ক্যারল' বলতে সবাই বোঝে ক্রিসমাস (দ্র) তথা খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের বড়দিনের সময় স্নিগ্ধ মধুর আনন্দময় পরিবেশে গাওয়া ধর্মসঙ্গীত। ক্যারলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে উৎসবের আমেজ। গির্জায় (দ্র) ক্যারল পরিবেশনের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। মধ্যযুগে ধর্মযাজকেরা অনেক ক্যারল রচনা করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েক জন উল্লেখযোগ্য ইংরেজ কবি, যেমন— হার্বার্ট, ভঅন (Vaughan), ক্র্যাশঅ (Crashaw) এবং মিল্টন (দ্র) ক্যারল রচনা করেন। মিল্টনের 'নেটিভিটি' এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঐতিহ্যবাহী বহুল পরিচিত ক্যারলগুলির মধ্যে রয়েছে 'সেভেন জয়েস অব মেরি', 'জিসাস বর্ন্ ইন বেথ্‌লেহেম' এবং 'দ্য টুয়েল্‌ভ্ ডেজ অব ক্রিসমাস'।

ক. চৌ.

ক্যারাম (carom)

ক্যারাম একটি ঘরোয়া বিনোদনমুখী খেলা। এই খেলা সব বয়সের পুরুষ ও মহিলারা খেলতে পারেন। যেখানে বিনোদনের জন্য স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা সেখানে ক্যারাম খেললে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ক্যারামের বোর্ডের বেশ কয়েকটি সাইজ হয়ে থাকে। ২৮ ইঞ্চি থেকে ৩৬ ইঞ্চি মাপের বোর্ডে ক্যারাম খেলা হয়ে থাকে। এই বোর্ডে চারটি পকেট থাকে। এই পকেটগুলি গোলাকার এবং ২$\frac{১}{২}$ থেকে তিন ইঞ্চির অধিক বড় হয় না। বোর্ডের ধার থেকে ভিতরের দিকে ৪ ইঞ্চি দূরে সমান্তরাল রেখা থাকে। সেখানে স্ট্রাইকার বসিয়ে ঘুঁটিতে মেরে ঘুঁটি পকেটে ফেলতে হয়। বোর্ডটির মাঝখানে ছয় ইঞ্চি ব্যাসের একটি বৃত্ত থাকে। এই বৃত্তে ৯টি সাদা ও ৯টি কালো এবং একটি লাল ঘুঁটি (মোট ১৯টি ঘুঁটি) থাকে। স্ট্রাইকারটি বৃত্তাকার হয় এবং ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চির বেশি ব্যাসার্ধের নয়। টস্ করে কে কোন দিক নেবে এবং কে প্রথম ঘুঁটিতে স্ট্রাইকার দিয়ে আঘাত করবে তা স্থির করা হয়। নিজের ভাগের ঘুঁটি ফেলতে বা লাল ঘুঁটি ফেলতে ব্যর্থ হলেই বিপক্ষকে মারার সুযোগ দিতে হয়। যে আগে তার নিজের ভাগের সব ঘুঁটি পকেটে ফেলে দিতে পারবে সে তখন বিপক্ষের যে কয়টি ঘুঁটি বোর্ডের উপর থেকে যাবে সেই কয়টি পয়েন্ট জিতবে। আর লাল ঘুঁটির জন্য অতিরিক্ত পাঁচ পয়েন্ট হয়ে থাকে। ঘুঁটি ছাড়া বা ঘুঁটি সমেত স্ট্রাইকার যদি পকেটে পড়ে যায়, তা হলে অপরাধ হয় ও ফাইন হিসাবে ঘুঁটি উঠিয়ে বোর্ডের মাঝখানের বৃত্তে রাখতে হয়। যে আগে ২৯ পয়েন্ট করতে পারে, সে এক গেম খেলা জিতেছে বলে ধরা হয়। সাধারণত তিন বোর্ড খেলা না হলে এক গেম হয় না। এক বোর্ডে ১৪ পয়েন্টের বেশি করা যায় না। আমাদের দেশে বেশির ভাগ ঘরে বিশেষ করে মধ্যবিত্তের সংসারে ক্যারাম বোর্ড খেলা হয়ে থাকে। ঢাকা (দ্র) ও অন্যান্য শহরে সব ক্লাবে এবং বিদ্যায়তনগুলিতে ক্যারাম খেলার ব্যবস্থা আছে। এই নির্মল বিনোদন সবাইকে আনন্দ জোগায়।

কা. আ. আ.

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অবস্থিতি ক্যারিবিয়ান সাগরের (Caribbean Sea) ভিতরে। দু'টি বিশালাকার ভূভাগ—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার (দ্র) মাঝখানে এই সাগর। ক্যারিবিয়ান সাগরের পশ্চিম দিকে রয়েছে মেহিকো (Mexico) ও মধ্য-আমেরিকা; দক্ষিণে আছে পানামা যোজক, কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলা; পূর্ব দিকে দ্বীপময় লেসার অ্যান্টিল (Lesser Antilles); আর উত্তরে রয়ে গেছে দ্বীপময় গ্রেটার অ্যান্টিল (Greater Antilles)।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বলতে ছোটবড় অসংখ্য দ্বীপ বোঝায়। সেসবের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বা সর্বাধিক পরিচিত হল— বার্বাডোস (Barbados), কিউবা (Cuba), গ্রেনাডা (Grenada), ডোমিনিকা (Dominica), হাইতি (Haiti), হিস্পানিওলা (Hispaniola), জামাইকা (Jamaica), পুয়ের্তো রিকো (Puerto Rico), ত্রিনিদাদ ও

www.pathagar.com

তোবাগো (Trinidad and Tobago) এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (West Indies)।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছিলেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস (দ্র)।

হা. মা.

ক্যারোল্, লিউইস্ [১৮৩২—১৮৯৮]

গোটা বিশ্বের শিশুসাহিত্য-অঙ্গনে লিউইস্ ক্যারোল্ (Lewis Carroll) একটি অসাধারণ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর রচিত 'এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' (দ্র) (১৮৬৫) এক অনবদ্য গ্রন্থ। একটি ছোট্ট মেয়ের স্বপ্নের কাহিনী। এলিস নামের একটি মেয়ে তার বোনের পাশে রোদ্দুরে বসে ঢুলতে ঢুলতে একটা খরগোশের গর্তের মধ্য দিয়ে অনেক নিচে পড়ে যায়। এটা স্বপ্ন। তার পর ঘটতে থাকে একের পর এক আজব কাণ্ডকারখানা। রঙ্গরস, বিস্ময় ও ব্যঙ্গকৌতুক-ভরা নানা উদ্ভট ঘটনা লিউইস্ ক্যারোল্ ঐ বইয়ে অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন।

লিউইস্ ক্যারোল্ নামটি ঐ ইংরেজ ভদ্রলোকের ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম চার্লস্ লাট্উইজ্ ডজ্সন্ (Charles Lutwidge Dodgson)। তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষক। জ্যামিতির উপর তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। চিরকুমার চার্লস্ ডজ্সন্ তথা লিউইস্ ক্যারোল্ ছিলেন এক জন খুব নিয়মনিষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনকারী মানুষ। অথচ তিনিই রচনা করলেন 'এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'-এর মতো অদ্ভুত, অবাস্তব, স্বপ্নকল্পনাসমৃদ্ধ মজাদার এক কাহিনী। বিশ্বের বহু ভাষায় এ গ্রন্থ অনূদিত হয়ে অগণিত শিশু-কিশোরকে আনন্দ দিয়েছে। এখনো দিচ্ছে। শুধু শিশু-কিশোরদের নয়, বড়দেরও। বাংলা ভাষায় (দ্র) রূপান্তরিত এর একটি সংস্করণের নাম 'আজব দেশে অমলা'। সুকুমার রায়ের বিখ্যাত শিশুতোষ গ্রন্থ 'হযবরল' পড়বার সময় অনেকেরই 'এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'-এর কথা মনে পড়ে।

লিউইস্ ক্যারোল্ এলিসকে নিয়ে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার নাম 'থ্রু দ্য লুকিং গ্লাস' (১৮৭১)। এটিও অত্যন্ত সরস রচনা। ছোটদের জন্য তিনি আরো দু'টি কৌতুকরসদীপ্ত গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, কবিতায় 'দ্য হান্টিং অব দ্য স্নার্ক' (১৮৭৬) এবং গদ্যে 'সিলভি অ্যাণ্ড ব্রুনো' (১৮৮৯)।

এক জন গণিতবিদ ও জ্যামিতিবিশারদ হয়েও ক্যারোল্ কীভাবে তাঁর মনের মধ্যে একটি শিশুকে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং কীভাবে বিশ্বের শিশুদের জন্য অসাধারণ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়।

ক. চৌ.

ক্যালকুলেটর

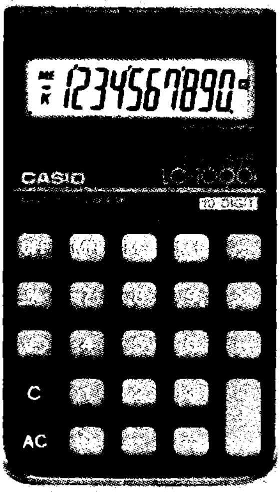

ক্যালকুলেটর ইংরেজি শব্দ। এর অর্থ গণকযন্ত্র। দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি গাণিতিক হিসাব সমাধানের যন্ত্রই 'ক্যালকুলেটর'।

প্রাচীন কাল থেকেই গণনার কাজে মানুষ যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করে আসছে। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে চীন (দ্র)-সহ এশিয়ার (দ্র) বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হত অ্যাবাকাস (দ্র)। এখনো জাপান (দ্র) এবং চীনে অ্যাবাকাসের প্রচলন রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জটিল গণনা ও গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে উন্নততর ক্যালকুলেটর। এসব ক্যালকুলেটরকে প্রধান দু'ভাগে ভাগ করা যায় : ১. যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর, ২. ইলেক্ট্রনিক ক্যালকুলেটর। যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর তৈরি হয় গিয়ার, লিভার, দণ্ড ও পুলি দিয়ে।

www.pathagar.com

এসব ক্যালকুলেটরের নির্মাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জন বিজ্ঞানী হলেন ফরাসি বিজ্ঞানী ব্লেইজ পাস্কাল্ (Blaise Pascal : ১৬২৩-১৬৬২), জার্মান গণিতবিদ লাইব্‌নিৎস্ (Gottfried Leibniz : ১৬৪৬-১৭১৬)এবং ইংরেজ চার্ল্‌স্ ব্যাবেজ (Charles Babbage : ১৭৯২-১৮৭১)। পাস্কাল্ ১৬৪২ সালে, লাইব্‌নিৎস্ ১৬৭১ সালে এবং ব্যাবেজ ১৮১২ সালে প্রথম এবং ১৮৩৩ সালে দ্বিতীয় ক্যালকুলেটরযন্ত্র তৈরি করেন। ব্যাবেজের যন্ত্র থেকেই কালক্রমে কম্পিউটারের (দ্র) উদ্ভব হয়েছে। ১৮৭২ সালে ফ্রাঙ্ক স্টিফেন বলডুইন বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযুক্ত ক্যালকুলেটর তৈরি করেন। ১৮৮৭ সালে ডর ফেল্ট 'কমটোমিটার' নামে ক্যালকুলেটরের প্রথম পেটেন্ট নেন।

বিদ্যুৎশক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হলে ক্যালকুলেটরে গিয়ার চাকা (দ্র), লিভার ইত্যাদির পরিবর্তে তড়িৎ-যান্ত্রিক (electro-mechanical) পদ্ধতি চালু হয়। ১৯৪০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) জর্জ স্টিবিজ 'কমপ্লেক্স-ক্যালকুলেটর' নামের প্রথম ম্যাগনেটিক রিলে পদ্ধতির যন্ত্র তৈরি করেন।

বিংশ শতাব্দীতে ইলেক্ট্রনিক্সের (দ্র) সূত্রপাত হয়। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে অত্যন্ত উন্নত মানের রকমারি ক্যালকুলেটর তৈরি সম্ভব হয়েছে। ক্যালকুলেটর বলতে আমরা ইলেক্ট্রনিক ক্যালকুলেটর বুঝি। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন নির্দেশসম্পন্ন ক্যালকুলেটর পাওয়া যায়। সাধারণ হিসাবের জন্য, পকেটে বহনযোগ্য, ডেস্কে ব্যবহারের জন্য ইত্যাদি ধরনের ক্যালকুলেটর আছে। এসব ক্যালকুলেটরের প্রধান অংশ চারটি–১. ইনপুট, ২. মেমোরি, ৩. প্রসেসর, ৪. আউটপুট। ইনপুট হল কতকগুলি সুইচযুক্ত কী-বোর্ড, যার সাহায্যে যন্ত্রটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। মেমোরি অংশে থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ সংবলিত তথ্যাদি। প্রসেসরের কাজ হল ইনপুটের তথ্যসমূহকে মেমোরির নির্দেশানুসারে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আউটপুটে থাকে একটি ডিস্‌প্লে এবং ডিস্‌প্লে কোডার। এটি তৈরি হয় বিশেষ ধরনের LED দিয়ে। এতে নির্ণেয় সমাধান ভেসে ওঠে। কোনো কোনো ক্যালকুলেটরে আউটপুটে ডিস্‌প্লে ছাড়াও কাগজে (দ্র) তথ্যাদি ছাপা হয়। এদের বলে ডেক্সটপ ক্যালকুলেটর।

স. রা.

ক্যালরি (calorie)

ক্যালরি হচ্ছে তাপশক্তির একটি একক। এক গ্রাম পানিকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস. তাপমাত্রায় তুলতে যে পরিমাণ তাপশক্তি প্রয়োজন, তাকে এক ক্যালরিরূপে আগে সংজ্ঞায়িত করা হত। কিন্তু এই তাপের পরিমাণ পানির তাপমাত্রার ওপর কিছুটা নির্ভর করে। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এখন পানির সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৫.৫ ডিগ্রিতে তুলতে প্রয়োজনীয় তাপশক্তিকে এক ক্যালরি বলা হয়। এক ক্যালরি তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তির একক জুলের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা পাই এক ক্যালরি সমান ৪.১৮৬৮ বা মোটামুটিভাবে ৪.২ জুল (দ্র)।

আমরা যখন খাবার থেকে পাওয়া তাপশক্তির একক-রূপে ক্যালরি শব্দটি ব্যবহার করি সেই ক্যালরি আসলে বড় ক্যালরি এবং আমাদের সংজ্ঞায়িত ক্যালরির হাজার গুণ। এই বড় ক্যালরিকে বড় হাতের ইংরেজি অক্ষর C দ্বারা বোঝানো হয়। এই হিসাব অনুসারে এক জন কায়িক পরিশ্রমকারী বড় মানুষের দৈনিক প্রয়োজন প্রায় তিন হাজার বড় ক্যালরিশক্তি।

তাপশক্তি পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় ক্যালোরিমিটার (দ্র)।

আ. আ.

ক্যালসিয়াম (calcium)

ক্যালসিয়াম দেখতে সাদা রঙের ও নরম এক প্রকার মৌলিক ধাতব পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Ca, পারমাণবিক ওজন ৪০.০৮, পারমাণবিক সংখ্যা ২০, এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ প্রকৃতিতে নানাভাবে ও নানা আকৃতিতে ছড়িয়ে আছে। এর হাইড্রক্সাইড সাধারণ চুন $Ca(OH)_2$, ক্যালসিয়াম কার্বনেট $CaCo_3$ হল খড়িমাটি (চক) ও বিভিন্ন পাথর। শুষ্ক ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড $CaCl_2$ অন্য পদার্থের পানি (দ্র) শুষে নেয়। রঞ্জন শিল্পে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ক্যালসিয়াম সালফেট, $CaSO_4$ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে শক্ত হয় বলে এ দিয়ে প্লাস্টার অব প্যারিস তৈরি হয়। প্রাণীদেহের হাড় ও দাঁতের প্রধান উপাদান হল এই ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে (CaO) কুইকলাইম

www.pathagar.com

বলে। এর মধ্যে পানি দিলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড $Ca(OH)_2$ যার রাসায়নিক নাম হল স্লেক্‌ড্ লাইম, সাধারণ চুন। স্যার হামফ্রি ডেভি (দ্র) সর্বপ্রথম ১৮০৮ সালে এটিকে নিষ্কাশিত করেন। ধাতুটি প্রকৃতিতে ব্যাপকভাবে এবং নানা যৌগিকে বিরাজ করে, যেমন— ক্যালসিয়াম কার্বনেট $CaCO_3$ (লাইমস্টোন, চক, মার্বেল), ক্যালসিয়াম সালফেট $CaSO_4, 2H_2O$ (জিপসাম [দ্র], অ্যালাবেস্টার) এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট, যা প্রাণিদেহের হাড়সমূহের এক প্রধান উপাদান। অন্য একটি মূল্যবান খনিজ হিসাবে বিরাজ করে, যার নাম হল ফ্লুরাইট বা ফ্লুয়োস্পার CaF_2। সাধারণভাবে বলা যায় যে এর রাসায়নিক প্রকৃতি অনেকটা বেরিয়াম (Ba) ধাতুটির মতো। আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৬ ও গলনাঙ্ক ৮৫১° সে., স্ফুটনাঙ্ক ১৪৪০° সে.। উদ্বায়ী বস্তু শিখায় লালচে কমলা রঙ দেয়। ক্যালসিয়াম ধাতুটি পানি ও পাতলা অ্যাসিডে (দ্র) গলে যায় এবং হাইড্রোজেন (দ্র) গ্যাস উৎপন্ন করে। এটি অধাতুর সঙ্গে যথেষ্ট সক্রিয়ভাবে বিক্রিয়া করে অত্যধিক উত্তাপের সৃষ্টি করে। ক্যালসিয়ামের হাইড্রাইডের প্রকৃতি নেগেটিভ হাইড্রোজেন আয়নিক হিসাবে ব্যবহার করে এবং বিশেষ জোরালোভাবে পানিতে গলে যায় এবং নাইট্রোজেনের (দ্র) মতো সক্রিয় নয় এমন রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের সঙ্গে অনেক কম উষ্ণতায় বিক্রিয়া করে এবং অধিক উষ্ণতায় কার্বনের সঙ্গে মিলিত হয়ে কারবাইড তৈরি করে (যেমন CaC_x)। ক্যালসিয়াম অক্সাইড সাদা রঙের এবং অধিক তাপসহ পানির সঙ্গে জোরালোভাবে বিক্রিয়া করে সাদা রঙের হাইড্রক্সাইড তৈরি করে। ক্যালসিয়াম অক্সাইড (কুইকলাইম— quicklime) যা পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে $Ca(OH)_2$ অর্থাৎ Slaked lime তৈরি করে তা ব্যাপকভাবে বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

আ. হ. খ.

ক্যালেইডোস্কোপ (kaleidoscope)

ক্যালেইডোস্কোপ দুই বা ততোধিক আয়নার সাহায্যে তৈরি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর একটি খেলনা। একটি ফ্রেমের মধ্যে দু'টি বা তিনটি সমতল আয়না খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে দিলে এই আয়নাগুলো পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোণ উৎপন্ন করবে। এবার কয়েকটি রঙিন কাচের টুকরা একটি সমতল জায়গায় রেখে পিরামিডের মতন দাঁড় করানো ও পরস্পরের সঙ্গে আটকানো আয়নাগুলোকে যদি ঘোরানো যায়, তা হলে প্রতি বার সামান্য ঘোরালেই নতুন নকশা সৃষ্টি হবে। এর কারণ, কাচের প্রতিটি রঙিন টুকরো প্রথম আয়নাতে যে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করবে সেই প্রতিবিম্ব অন্য আয়নাতে প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করবে। উপর্যুপরি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবার ফলে অনেকগুলো কাচের টুকরো একত্রে যে প্রতিবিম্বের প্যাটার্ন তৈরি করবে তা হবে বৈচিত্র্যময়। আয়নাগুলো পরস্পরের সঙ্গে কোণ করে আছে বলে সামান্য ঘোরালেও এই প্রতিবিম্বের নকশা অনেকটা বদলে যাবে। কত বিপুল সংখ্যক প্যাটার্ন যে এভাবে তৈরি করা সম্ভব তা গুণে শেষ করা যাবে না। এই প্যাটার্ন দেখার জন্য দাঁড় করানো আয়নাগুলোর উপর থেকে তাকাতে হবে। কাচের টুকরাগুলো স্থির রেখে আয়নার ফ্রেমটি স্বাধীনভাবে ঘোরাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ক্যালেইডোস্কোপ ব্যবহার করে যে অসংখ্য নকশা পাওয়া সম্ভব তার ছবি তুলে নানা রকম ডিজাইনের (দ্র) কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে।

আ. আ.

ক্যালোরিমিটার (calorimeter)

গবেষণাগারে ব্যবহৃত তাপ পরিমাপের যন্ত্রবিশেষ। এর সাহায্যে কোনো বস্তুর তাপ শোষণ বা বর্জনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতা, আপেক্ষিক তাপ ও ভরবিশিষ্ট দু'টি বস্তু (একটি তরল অন্যটি তরল বা কঠিন) এই যন্ত্রের মধ্যে মিশিয়ে মিশ্রণের তাপমাত্রা নিরূপণ করা হয়। 'গরম বস্তুটি যে পরিমাণ তাপ বর্জন করে, ঠাণ্ডা বস্তু এবং যন্ত্রের ধারক পাত্রটি সেই পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে' এই তত্ত্ব থেকে গাণিতিক হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে তাপ পরিমাপ করা হয়।

ক্যালোরিমিটারের মূল অংশ বেলনাকৃতি একটি ধাতব

www.pathagar.com

পাত্র। এর মধ্যে থাকে একটি নাড়নকাঠি। এটিও একই ধাতুর তৈরি, নিচের অংশ কুণ্ডলী পাকানো। পাত্রটিকে দু'টি ছোট্ট ছিদ্রযুক্ত একটি ঢাকনা দিয়ে তাপ-নিরোধক বাক্সের মধ্যে বসানো হয়। ঢাকনার একটি ছিদ্রপথে নাড়নকাঠির হাতল বেরিয়ে থাকে। এবং দ্বিতীয় ছিদ্রটির মধ্য দিয়ে একটি তাপমানযন্ত্রের কুণ্ডলীটি পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

তাপ পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্যালোরিমিটার ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রেনোর ক্যালোরিমিটার, বম্ব ক্যালোরিমিটার, গ্যাস ফুয়েল ক্যালোরিমিটার ইত্যাদি।

স. রা.

ক্যাসেট ও টেপ রেকর্ডার

টেপ রেকর্ডার ও ক্যাসেট রেকর্ডার সঙ্গীত, কথা বা যে কোনো ধরনের শব্দ ধারণ করে রাখার জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক একটি ব্যবস্থা। যে কোনো শব্দ সৃষ্টির সময় যে কম্পন উৎপন্ন হয়, তা প্রথমে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত করা হয় মাইক্রোফোনের (দ্র) সাহায্যে। পরিবর্তনশীল এই বিদ্যুৎপ্রবাহ আনুপাতিক হারে চৌম্বক ক্ষেত্র (দ্র) তৈরি করে রেকর্ডিং হেডে। এই রেকর্ডিং হেডের ফাঁকের পাশ দিয়ে চৌম্বক টেপ যখন পার হয়ে যায় তখন এই টেপের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌম্বক অক্সাইডকণিকা যে ধারণ করা আছে তা বিন্যস্ত হয়ে পড়ে। প্লাস্টিক ফিতার মধ্যে নিহিত চৌম্বক কণিকাগুলো অনেকটা স্বাধীনভাবে নড়তে পারে বলে শব্দের তীব্রতা অনুপাতে ও এর কম্পনহারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেদেরকে সাজায়। এই রেকর্ডকৃত ফিতা তখন অন্য একটি রীলের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়। এই টেপ বাজাবার সময় তা অন্য একটি হেডের ফাঁকের পাশ দিয়ে টেনে নেওয়া হয়। এই বাজাবার হেডের কাজ হল চৌম্বক টেপের মধ্যে সাজানো চৌম্বক কণিকার প্রভাব অনুসারে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করা। এই মৃদু তড়িৎসঙ্কেতকে প্রথমে বিবর্ধিত করা হয় এবং পরে লাউড স্পিকারের সাহায্যে শব্দে রূপান্তরিত করা হয়।

চৌম্বক রেকর্ডিং প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৮ সালে। ডেনমার্কের প্রকৌশলী ভাল্‌ডেমার্ পুল্‌সেন্ (Valdemar Poulsen) ফিতার পরিবর্তে তারের উপর চৌম্বক কণিকা স্থাপন করে এই রেকর্ডিং করেন। ১৯৪০ সালে আধুনিক রেকর্ডিং টেপের প্রবর্তন ঘটান জার্মান বিজ্ঞানীরা। ক্ষুদ্রাকার ক্যাসেট রেকর্ডারের প্রচলন ঘটে ১৯৬০ সালের দিকে, যেখানে জাপানি বিজ্ঞানীদের অবদান রয়েছে।

আ. আ.

ক্রাইম্ অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট্ অপরাধ ও শাস্তি দ্র

ক্রিকেট

ক্রিকেট বর্তমান বিশ্ব-ক্রীড়াজগতে অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে এক দিনের সীমিত ওভারের ক্রিকেট ম্যাচ চালু হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা পূর্বাপেক্ষা বেড়েছে। কবে, কখন এবং কোথায় প্রথম ক্রিকেট খেলা হয় তার সঠিক তথ্য বা ইতিহাস পাওয়া না গেলেও বিশেষজ্ঞদের মতে 'ক্রোসি এবং ক্রিগ' খেলা থেকেই ক্রিকেটের সৃষ্টি। প্রাচীন কালের খেলা 'ক্যাট এণ্ড ডগ', 'হ্যাণ্ড ইন হ্যাণ্ড আউট', 'স্টল বল' প্রভৃতি খেলার সঙ্গেও ক্রিকেটের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

তবে ক্রিকেটের উৎপত্তি বা জন্ম যে ইংল্যাণ্ডে সে ব্যাপারে সবাই একমত। তাই ইংল্যাণ্ডকে ক্রিকেটের জনক বলা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের আমলের একটি বইতে ক্রিকেট খেলার উল্লেখ রয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ক্রিকেট খেলার কথা জানা যায়। ক্রিকেট প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

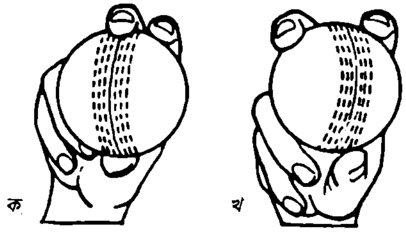

স্যুইং বোলিং
ক. ইনস্যুইংগার বোলিং কৌশল
খ. আউটস্যুইংগার বোলিং কৌশল

www.pathagar.com

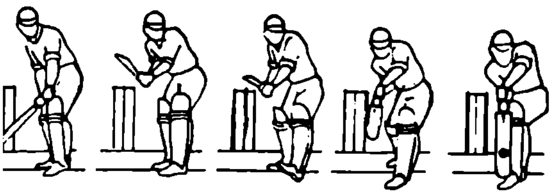

ামনের দিকে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে ব্যাট চালনা

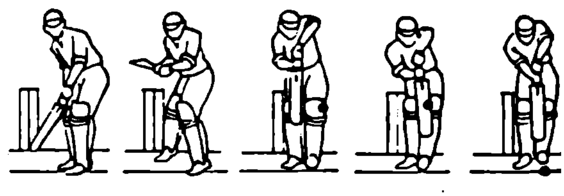

পেছনের দিকে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে ব্যাট চালনা

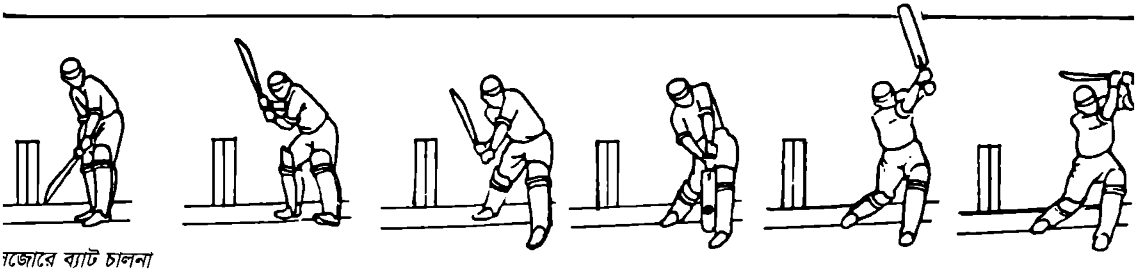

াজোরে ব্যাট চালনা

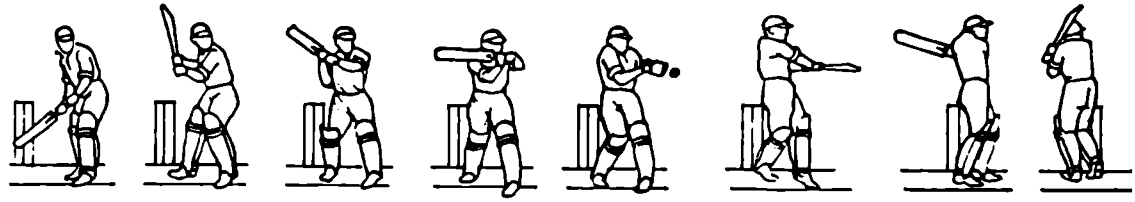

াতের কনুই ভেঙে ব্যাট চালনা

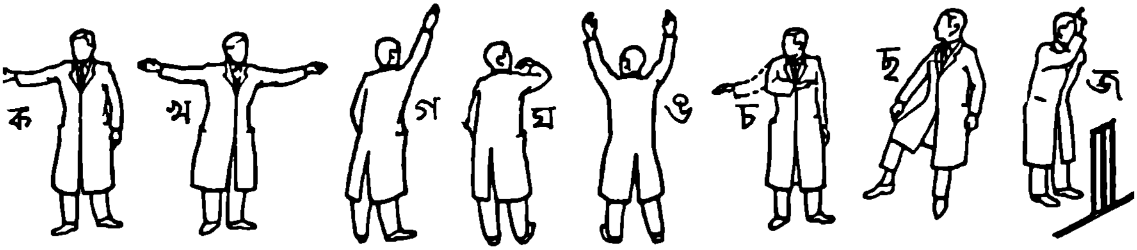

আম্পায়ারের সঙ্কেত

ক. নো বল	খ. ওয়াইড	গ. বাই
ঘ. শর্ট রান	ঙ. ছয়	চ. চার
ছ. লেগ-বাই	জ. আউট	

www.pathagar.com

প্রথম কাউন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ১৭১৯ সালে। এতে অংশ নিয়েছিল লণ্ডন (দ্র) ও কেন্ট দল। কিন্তু ক্রিকেটের নিয়মকানুন চালু হয় ১৭৪৪ সালে। এর ৬ বছর পর কিছু বিত্তশালী ক্রিকেটামোদী বিশ্বখ্যাত "হ্যাম্বল্ডন ক্লাব" প্রতিষ্ঠা করেন, যা ক্রিকেটের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। পরবর্তী কালে এদের প্রচেষ্টায় 'এম সি সি' (মেরিল্‌বোন ক্রিকেট ক্লাব) গঠিত হয়।

এম সি সি বিভিন্ন নিয়মকানুন বেঁধে দিয়ে ক্রিকেটকে আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় করে তোলে। ১৮৭৩ সালে ইংল্যাণ্ডে স্বীকৃতভাবে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়। ক্রিকেট-ইতিহাসে প্রথম টেস্ট অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৭ সালে ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) মধ্যে। এর অনেক পরে ১৯০৯ সালে গঠিত হয় আই সি সি। তখন এর পুরো নাম ছিল ইম্পেরিয়েল ক্রিকেট কনফারেন্স। কিন্তু ১৯৫৬ সালে ইম্পেরিয়েল কথাটা বাদ দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল করা হয় যাতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশ ছাড়াও অন্যান্যরা এর সদস্য হতে পারে।

চার বা পাঁচ দিনব্যাপী টেস্ট ক্রিকেটের একঘেয়েমি দূর করার জন্য ১৯৭১ সালে এক দিনের সীমিত ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ প্রবর্তন করা হয়। প্রথম টেস্ট ম্যাচের মতো প্রথম এক দিনের ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়।

১৯৭৫ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রথম বিশ্বকাপ এক দিনের ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের মাধ্যমে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ১৯৭৯ সালে অস্ট্রেলিয়ায় বেনসন এণ্ড হেজেস এক দিনের বিশ্বসিরিজ, ১৯৮৪ থেকে এশিয়া কাপ, সারজায় চ্যাম্পিয়ন্‌স্ ট্রফি, রথম্যান্‌স্ কাপ, অস্ট্রেলেশিয়া কাপ, নেহরু কাপ প্রভৃতি এক দিনের টুর্নামেন্ট চালু হয়েছে।

এই উপমহাদেশে ১৭২১ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাহাজের নাবিকেরা ক্রিকেটের সূচনা করেন। এর শতাধিক বছর আগে অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্যে ক্রিকেট খেলার কথা জানা যায়।

মূলত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার বিভিন্ন জেলা শহরে নিয়মিতভাবে ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছে।

অ. ব.

ক্রিপ্‌স্ মিশন

ব্রিটিশ-ভারতে বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশক থেকে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আন্দোলনের (শ্রমিক আন্দোলনসহ) তীব্রতা ব্রিটিশ রাজকে অসুবিধাজনক অবস্থানে ফেলে দিয়েছিল। এর উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) আঘাত তার জন্য আরো সঙ্কটের সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চীনা প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাই-শেক (দ্র), অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) বহির্বিষয়ক মন্ত্রী ড. ইভাট, সর্বোপরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট (দ্র) ভারতে (দ্র) স্বদেশী শাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনার জন্য ইংরেজ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এ সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন্ চার্চিলের (দ্র) সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। এ অবস্থায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৎকালীন রক্ষণশীল ইংরেজ সরকার, বিশেষত ৮ই মার্চ জাপানি বাহিনীর হাতে রেঙ্গুনের পতনের পর ১১ই মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনাসহ ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

মার্চ মাসেই স্যার ক্রিপ্‌স্ তাঁর প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ভারতে আসেন। দু' ভাগে বিভক্ত এই প্রস্তাবের তাৎক্ষণিক দিক হল, ভারতীয় জননেতাদের আলোচনামূলক সহযোগিতার ভিত্তিতে যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটেন কর্তৃক ভারত শাসনের ক্ষমতা সংরক্ষণ। দ্বিতীয় বা যুদ্ধোত্তর সময়ের প্রস্তাব হল, ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের অধীনে নতুন ভারতীয় ইউনিয়নের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ('ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস')-এর ব্যবস্থা, যদিও কমনওয়েল্‌থ্ (দ্র) থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার এই ইউনিয়নের থাকবে।

এই প্রস্তাবে আরো ছিল যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই সংবিধান রচনার জন্য কমিটি গঠনের ব্যবস্থা যেখানে নির্বাচিত ও সরকারমনোনীত উভয় ধরনের সদস্যই থাকবে। তা ছাড়া ভারতের যে কোনো প্রদেশ কিংবা দেশীয় রাজ্যের স্ব-ইচ্ছায় ভারতীয় ইউনিয়নের বাইরে থাকার এবং বর্তমান অবস্থা বজায় রাখার অথবা পৃথক ডোমিনিয়ন গঠনের জন্য সংবিধান রচনার অধিকার থাকবে। আর জাতিগত ও

www.pathagar.com

ধর্মগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ব্রিটিশ সরকার ও সংবিধান রচনা কমিটির মধ্যে আপসচুক্তির ব্যবস্থাও থাকবে।

সঙ্গতভাবেই যুদ্ধকালে জাতীয় সরকার গঠনে অস্বীকৃতি এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী অন্যান্য বিষয়ের কারণে ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং ক্রিপ্‌স্‌ মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আ. র.

ক্রিসমাস / বড়দিন

যিশুখ্রিস্টের (দ্র) জন্ম উপলক্ষে নির্দিষ্ট উৎসবের দিনের নাম Christmas, বাংলায় 'বড়দিন'। ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। সমগ্র বিশ্বের খ্রিস্টান সম্প্রদায় অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালন করেন। ক্রিসমাস উৎসবের অনেক আচার-অনুষ্ঠান আছে। তার মধ্যে ইউল লগ (Yule Log) বা শীতে আগুন জ্বালানোর কাঠের টুকরো এই উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বড়দিন উপলক্ষে ঘরবাড়ি সাজানো হয়। ক্যারল (দ্র) সঙ্গীত, উপহার আদান-প্রদান, শুভেচ্ছা-কার্ড বিনিময় ইত্যাদিও বড়দিন অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এই উপলক্ষে ক্রিসমাস ট্রি (Christmas tree) তৈরির প্রথা জার্মানদের অবদান। আর নিউইয়র্কের ওলন্দাজ আচার-অনুষ্ঠান থেকে আমেরিকায় (দ্র) সান্তা ক্লজ (দ্র) -কে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে (দ্র) ২৫শে ডিসেম্বর সরকারি ছুটির দিন।

বি. ব.

ক্রীড়াসংগঠন, বাংলাদেশের

বাংলাদেশের (দ্র) পরিচিতিকে বিস্তৃত করার পেছনে এ দেশের ক্রীড়াসংগঠনগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় তিনটি খেলা ফুটবল (দ্র), ক্রিকেট (দ্র) আর হকির (দ্র) প্রধান পৃষ্ঠপোষক কয়েকটি ক্রীড়াসংগঠন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ক্রীড়াসংগঠনগুলোর সাংগঠনিক তৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। খেলাধুলায় বাংলাদেশ যতটুকু অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, তার পেছনে ক্রীড়াসংগঠনগুলোর অবদানই সবচেয়ে বেশি। নিম্নে বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান সংগঠনের পরিচিতি তুলে ধরা হল :

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব একটি ঐতিহ্যবাহী নাম। মোহামেডানের ইতিহাস সোনালি সাফল্যে সমৃদ্ধ। খেলাধুলায় একের পর এক সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশে গড়ে উঠেছে ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অগণিত সমর্থক।

ঢাকার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জন্মসাল সঠিকভাবে জানা যায় নি। কারো মতে ক্লাবটির জন্ম ১৯৩৩ সালে, আবার কারো মতে ১৯৩৮ সালে। ১৯৩৪ সালে কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম বিভাগে উন্নীত হয়। সেই সময় ভারতবর্ষে কংগ্রেস (দ্র), খেলাফত আন্দোলন (দ্র), চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রেষারেষি চলছিল। প্রথম বিভাগে উন্নীত হবার পর একটানা প্রথম পাঁচ বছর চ্যাম্পিয়ন হয়ে কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব মুসলমানদের মধ্যে নব জাগরণের সৃষ্টি করে।

১৯২৭ সালে ঢাকার হাজারিবাগে 'মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাব' নামে একটি ক্লাব গঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে এই ক্লাবটিই মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে রূপান্তরিত হয়।

কলিকাতা মোহামেডানের কৃতী ফুটবলার মোহাম্মদ শাহজাহান ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সর্বময় দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ক্লাবটি একটি পূর্ণাঙ্গ ফুটবল দলে পরিণত হয়। অনেকে মোহাম্মদ শাহজাহানকে ঢাকা মোহামেডানের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত করে থাকেন।

প্রথমে ফুটবল দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে মোহামেডান ক্লাবের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে ক্রিকেট, হকি, টেবিল টেনিস (দ্র), ব্যাডমিন্টন (দ্র), দাবা (দ্র), ভলিবল (দ্র), অ্যাথলেটিক্স (দ্র) প্রভৃতি খেলায়।

ঢাকার প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে মোহামেডান এ

www.pathagar.com

পর্যন্ত ১৫ বার চ্যাম্পিয়ন এবং ১২ বার রানার্স আপ হয়েছে। এ ছাড়া ফেডারেশন কাপ, ডামফা (Dhaka Metropolitan Football Association) কাপ, মা ও মণি গোল্ডকাপ, স্বাধীনতা দিবস ফুটবলসহ বিভিন্ন ফুটবল টুর্নামেন্টেও মোহামেডান অনেক বার শিরোপা জয় করেছে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল অঙ্গনেও মোহামেডানের যথেষ্ট পরিচিতি আছে। দেশের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল হিসাবে বেশ কয়েক বার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এশিয়ান ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে ইরান, উত্তর কোরিয়া, ইরাক, ভারত (দ্র), নেপাল (দ্র), শ্রীলঙ্কা (দ্র) প্রভৃতি দেশের প্রতিষ্ঠিত ক্লাবগুলোকে পরাজিত করার গৌরব অর্জন করেছে। ১৯৮২ সালে মোহামেডান ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত আশীষ-জব্বার স্মৃতি গোল্ডকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করে।

ফুটবল ছাড়া ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ও দাবা লীগেও মোহামেডান শিরোপা অর্জন করেছে অসংখ্য বার।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কয়েক জন উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া-সংগঠক ও খেলোয়াড় হলেন : ব্রজেন দাস (দ্র), জাকারিয়া পিন্টু, গোলাম সারওয়ার টিপু, মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন, সালাউদ্দিন, এনায়েত, সালাম মুর্শেদী, বাদল রায়, রামা লুসাই, রকিবুল হাসান প্রমুখ।

আবাহনী ক্রীড়াচক্র

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে এক নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আসে এই দল। সঙ্গত কারণেই অনেক ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞ আবাহনী ক্রীড়াচক্রকে বাংলাদেশের ফুটবলে 'আধুনিকতার জনক' বলে আখ্যায়িত করেন।

১৯৭২ সালে আবাহনী ক্রীড়াচক্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। তৎকালীন ইকবাল স্পোর্টিং ক্লাবের নাম পরিবর্তন করে আবাহনী ক্রীড়াচক্র রাখা হয়। অচিরেই ক্লাবটি দেশের অন্যতম ক্রীড়াশক্তিতে পরিণত হয়। ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেট আর হকিতেও আবাহনী ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে।

ঢাকার প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে আবাহনী ক্রীড়াচক্র এ পর্যন্ত ৮ বার চ্যাম্পিয়ন এবং ৮ বার রানার্স আপ হয়েছে। ক্রিকেট ও হকি লীগে সবচেয়ে বেশি বার শিরোপা অর্জনের কৃতিত্ব আবাহনীর। লীগ ছাড়াও ফুটবল, ক্রিকেট ও হকির অন্যান্য টুর্নামেন্টেও আবাহনী বেশ কয়েক বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনেও আবাহনী ক্রীড়াচক্রের সাফল্য রয়েছে। এ দল ভারতে অনুষ্ঠিত ১৯৯০ সালের নাগজি ট্রফি এবং ১৯৯৪ সালের চার্মস্ কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়। চার্মস্ কাপ ফুটবলে অংশ নেয় ভারতের ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মোহামেডানসহ শ্রেষ্ঠ ৬টি দল এবং ঢাকার আবাহনী ক্রীড়াচক্র ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সুতরাং এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আবাহনী এই উপমহাদেশের সেরা ক্লাবের সম্মান পায়।

১৯৮৯ সালে আবাহনী ক্রীড়াচক্রকে লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়।

আবাহনী ক্রীড়াচক্রের কয়েক জন উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় হলেন সালাউদ্দিন, চুন্নু, অমলেশ, নান্নু, মঞ্জু, মোতালেব, ইউসুফ, গাজী আশরাফ হোসেন লিপু, আশীষ ভদ্র, জুম্মন লুসাই প্রমুখ।

ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব

এই ক্লাব ঢাকার ফুটবলে 'তৃতীয় শক্তি' হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফুটবলে মোহামেডান ও আবাহনীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব অনেক বার ঢাকা লীগে চমক সৃষ্টি করেছে।

মূলত ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবের আবির্ভাবের পরেই ঢাকার ফুটবলে 'ত্রিমুখী লড়াই' কথাটির সৃষ্টি হয়।

দেশীয় ফুটবলে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগে আবাহনী ক্রীড়াচক্রের পাশাপাশি ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবও যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবিদার।

ঢাকার গোপীবাগ এলাকায় ১৯৪৯ সালে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, মিজানুর রহমান, হেলালউদ্দিন, লতিফ মোল্লা প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং এলাকার কিছু প্রভাবশালী ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ক্লাবটির ব্যাপক পরিচিতি গড়ে ওঠে ১৯৭৬ সালের পর থেকে। এই ক্লাব ১৯৭৩ সালে ঢাকার তৃতীয় বিভাগ ফুটবল লীগে প্রথম বারের মতো অংশ নিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উন্নীত হয়। প্রথম বছরেই দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সফলতা দেখায় এবং প্রথম বিভাগে উন্নীত হয় এবং ১৯৭৫ সাল থেকে প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে অংশ নিয়ে ব্রাদার্স উন্নত মানের খেলার ধারা অব্যাহত রেখেছে।

তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ব্রাদার্সের প্রথম বিভাগে আত্মপ্রকাশের পেছনে কোচ গফুর বালুচ স্মরণীয় অবদান রাখেন। উন্নত ও দক্ষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি এক দল তরুণ ফুটবলার সমন্বিত ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবকে একটি শক্তিশালী ফুটবল দলে পরিণত করেন। ব্রাদার্স এখন পর্যন্ত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও তাদের উন্নত মানের খেলা সব সময়ই ঢাকার প্রধান দুই ফুটবল শক্তি মোহামেডান ও আবাহনীর জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ফুটবলে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব ফেডারেশন কাপ, ডামফা কাপ ও আগা খান গোল্ডকাপে এক বার করে চ্যাম্পিয়ন হয়। এ ছাড়া ক্রিকেট লীগ, দাবা লীগ ও হ্যাণ্ডবল লীগে ব্রাদার্স একাধিক বার শিরোপা লাভ করে।

ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবের কয়েক জন উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় হলেন কানন, বাবলু, ওয়াসীম, আজমত, রকিব, মানিক, বাদল দাস, বাবলু, পনির, মোহসিন প্রমুখ।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯০৩ সালে ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার নামানুসারে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তেজগাঁও ও কুর্মিটোলার জমিদার সুরেশচন্দ্র দাম, বলধার জমিদারপুত্র নৃপেন রায়চৌধুরী, মুরাপাড়ার জমিদার রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র ব্যানার্জি, জমিদার দীনেশচন্দ্র ব্যানার্জি ও মালখানগরের বসু পরিবারের সুনীলকুমার বসুর মিলিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

শুধুমাত্র ফুটবল দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও তিরিশের দশকে ভিক্টোরিয়ার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয় হকি ও ক্রিকেট।

১৯৪৮ সালে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ঢাকার প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে প্রথম বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়। ষাটের দশকের সাফল্য ক্লাবটির ফুটবল-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে লীগ রানার্স আপ হলেও ১৯৬২ সালে ভিক্টোরিয়া লীগসহ চারটি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়। এর মধ্যে আগা খান গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে শিরোপার্জন উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪ সালেও ভিক্টোরিয়া লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত লীগসহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে একটানা ৫২টি খেলায় অপরাজিত থাকার রেকর্ড রয়েছে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের।

বর্তমানে ভিক্টোরিয়া ঢাকার ফুটবলে মধ্যম সারির একটি দল হিসাবে চিহ্নিত। ১৯৬৪ সালের পর ফুটবল লীগে আর চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও এই দল ১৯৭৭ সালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত রকিবউদ্দিন গোল্ডকাপ এবং ১৯৮২ সালে নোয়াখালিতে অনুষ্ঠিত আবদুল মোতালেব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়।

ফুটবল ছাড়াও ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব হকি, ক্রিকেট, লন টেনিস, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, বক্সিং, রেসলিং ও ভারোত্তোলনে দল গঠন করে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে আসছে।

ওয়ারী ক্লাব

১৮৯৮ সালে কিছু সংখ্যক ক্রীড়াসংগঠকের প্রচেষ্টায় ঢাকার ওয়ারী এলাকায় ওয়ারী ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময়ের তুখোড় ক্রীড়াবিদ রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ রায় ক্লাবটি প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রধান ভূমিকা রাখেন। তাঁকেই ওয়ারী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। প্রথমে ক্লাবের নিজস্ব মাঠ ছিল না, ছিল না ক্লাবঘর। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ওয়ারী ক্লাব সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পল্টনে ওয়ারী ক্লাব একটি মাঠ পায়। সেখানে ক্লাবঘর গড়ে ওঠে।

১৯১০ সালে ব্রিটিশ রাজকীয় প্রাসাদ ফুটবল দলকে পরাজিত করার মাধ্যমে ওয়ারী ক্লাবের প্রথম সাফল্য আসে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের আই এফ এ শীল্ডে

www.pathagar.com

অংশ নিয়ে ঢাকার ওয়ারী ক্লাব একাধিক বার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। ১৯১৭ সালে তদানীন্তন ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন লিংকোলিন ক্লাবকে পরাজিত করে ওয়ারী ক্লাব উপমহাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৩৭ সালে এই উপমহাদেশে পৃথিবীবিখ্যাত আইলিংটন করিন্থিয়ান ফুটবল দলের অপরাজিত থাকার গৌরব ম্লান করে দিয়েছিল ঢাকা একাদশ। সেই দলে ওয়ারী ক্লাবের ১০ জন খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, টেবিল টেনিস ও লন টেনিসে ওয়ারী ক্লাব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ঢাকার ক্রিকেট ও ভলিবল লীগে ওয়ারী ক্লাব পর পর তিন বছর চ্যাম্পিয়ন হয়ে হ্যাট্রিক করার গৌরব অর্জন করেছে। এই ক্লাব ক্রিকেট লীগে ১৯৫১-'৫২, ১৯৫২-'৫৩ এবং ১৯৫৩-'৫৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়। ভলিবল লীগে হ্যাট্রিক করে ১৯৭২-'৭৩, ১৯৭৩-'৭৪ এবং ১৯৭৪-'৭৫ সালের লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে।

ঢাকার ফুটবল লীগে ওয়ারী ক্লাব মাঝেমধ্যেই ঝলসে ওঠে। বড় দলগুলোর জন্য সে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এ দেশের খেলাধুলার বিভিন্ন শাখায় খেলোয়াড় সৃষ্টিতে এই ক্লাব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে।

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের জন্ম। এ ক্লাবের প্রথম সভাপতি ছিলেন এম. এ. কাইউম এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আনোয়ার হোসেন। তৎকালীন অনেক খ্যাতিমান শিল্পী, নাট্যকার, অভিনেতা, কবি, সাহিত্যিক, পুস্তকপ্রকাশক এই ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ক্লাবের জার্সির লাল-হলুদ রঙ নির্বাচন করেন দেশবরেণ্য চিত্রশিল্পী প্রয়াত কামরুল হাসান (দ্র)।

১৯৪৯ সালে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ঢাকার দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগে খেলার যোগ্যতা লাভ করে এবং ১৯৫১ সালে দ্বিতীয় বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে উন্নীত হয়। ১৯৫৮ সালে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৮৫ সালে আজাদ প্রথম বিভাগ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যায়। ক্রীড়াক্ষেত্রে তেমন সাফল্য না থাকলেও আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব জন্মলগ্ন থেকে 'খেলোয়াড় সৃষ্টির কারখানা' হিসাবে খ্যাত। দেশের অনেক খ্যাতিমান ক্রীড়াবিদের জন্ম দিয়েছে এই ক্লাব।

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ফুটবল ছাড়া অ্যাথ্‌লেটিক্স, সাইক্লিং, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলাতেও অংশ নিয়ে থাকে।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া সংগঠন হল ঢাকা ওয়াণ্ডার্স ক্লাব, দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাব, রহমতগঞ্জ, আরামবাগ, অগ্রণী ব্যাংক, ইয়ংম্যান্‌স্ ক্লাব, পি ডব্লিউ ডি, বি জে এম সি, ইস্ট এণ্ড, বাংলাদেশ বিমান, জি এম সি সি, সূর্যতরুণ, অ্যাজাক্স প্রভৃতি।

টি. কি.

ক্রুশ্চেভ্, নিকিতা সের্গেইয়েভিচ্ [১৮৯৪—১৯৭১]

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের (দ্র) অন্যতম প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক সংস্কারের সূচনাকারী হিসাবে খ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ। বাংলায় ক্রুশ্চেভ্ লেখা হলেও তাঁর নামের আসল উচ্চারণ ক্রুশ্‌শোফ্। ১৮৯৪ সালের ১৭ই এপ্রিল ইউক্রেনের কালিনভ্কা গ্রামে তাঁর জন্ম। কয়লাখনির সাধারণ শ্রমিক হিসাবে কিশোর বয়সে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়।

১৯১৮ সালে নিকিতা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এ সময় গৃহযুদ্ধ ও জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য গঠিত লাল ফৌজের সদস্য হয়ে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এর পর ১৯২২ সালে পার্টি থেকে তিন বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তাঁকে ইউক্রেনের টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়। এর পর তিনি পার্টির মস্কো আঞ্চলিক কমিটির প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩২-৩৩ সালে স্তালিনের (দ্র) নির্দেশে তিনি মস্কোতে পরিচালিত শুদ্ধি অভিযান বা ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার কার্যক্রমে

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি তৎকালীন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন। এ সময় তাঁরই পরিচালনায় মস্কো (দ্র)-তে 'মেট্রো' বা পাতাল রেলপথ নির্মিত হয়।

১৯৩৮ সালে ক্রুশ্চেভ্ কমিউনিস্ট পার্টির ইউক্রেন আঞ্চলিক কমিটির ফার্স্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর ক্রুশ্চেভ আবার মস্কোতে ফিরে আসেন এবং পার্টির মস্কো আঞ্চলিক কমিটির প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ স্তালিনের মৃত্যুর পর যৌথ নেতৃত্বের পরিকল্পনায় মালেন্‌কফ্ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেকেণ্ড সেক্রেটারি এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে ক্রুশ্চেভ্ পাটির সেকেণ্ড সেক্রেটারি হন। এর মাত্র কয়েক মাস পর ফার্স্ট সেক্রেটারির পদটি শেষ পর্যন্ত ক্রুশ্চেভেরই করায়ত্ত হয়।

১৯৫৫ সালে মালেন্‌কফ্ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ালে ক্রুশ্চেভ্-সমর্থিত বুল্‌গানিন্ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভ্ পার্টির সর্বোচ্চ শক্তিমান ব্যক্তি হিসাবে আবির্ভূত হন। ঐ বছরই পার্টির ২০তম কংগ্রেসের গোপন অধিবেশনে তিনি স্তালিনের বিরুদ্ধে স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কত্বের অভিযোগ আনেন এবং তাঁর নিজস্ব ধারায় সংস্কারবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন।

১৯৫৮ সালে বুল্‌গানিন্ প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিলে ক্রুশ্চেভ্ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। একই সঙ্গে তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি পদেও বহাল থাকেন এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। ১৯৬৪ সালে তিনি উভয় পদ থেকে অপসারিত হন।

ক্রুশ্চেভের আমলে পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। পারমাণবিক অস্ত্রহ্রাসের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্রুশ্চেভ্ একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। কিউবাতে মোতায়েনকৃত ক্ষেপণাস্ত্রের আংশিক প্রত্যাহারও তাঁর উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপগুলোর অন্যতম।

১৯৭১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ক্রুশ্চেভের জীবনাবসান ঘটে।

সুজ. ব.

ক্রুসেড (Crusade)

ক্রুসেডকে বাংলায় 'ধর্মযুদ্ধ' বলা হয়। শব্দটির উদ্ভব লাতিন crux শব্দ থেকে, যার অর্থ ক্রুশ।

তুর্কি মুসলমানদের দখল থেকে প্যালেস্টাইনের পবিত্র স্থানগুলো (যিশুখ্রিস্টের জন্মস্থান বেথ্‌লেহেম ও মৃত্যুস্থান জেরুজালেম) মুক্ত করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপের (দ্র) খ্রিস্ট–ধর্মাবলম্বীদের বিপুল সামরিক অভিযান। এক কথায় এটি ছিল খ্রিস্টধর্মের (দ্র) সঙ্গে ইসলাম (দ্র) ধর্মের সংঘাত। একাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত মোট আট বার এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে চারটি ধর্মযুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া শিশুদের সামনে রেখেও একটি ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রথম ধর্মযুদ্ধ ১০৯৬ থেকে ১০৯৯ সাল পর্যন্ত, দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ ১১৪৭ থেকে ১১৪৯ সাল পর্যন্ত, তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ ১১৮৯ থেকে ১১৯২ সাল পর্যন্ত এবং চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ ১২০২ থেকে ১২০৪ সাল পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল। এই চারটি ধর্মযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর খ্রিস্টানেরা বাইবেলের (দ্র) একটি কথার ওপর ভিত্তি করে শিশুদের এক বাহিনীকে জেরুজালেম (দ্র) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এতে ফ্রান্সের ত্রিশ হাজার শিশু এবং জার্মানির বিশ হাজার শিশু অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে একজন ফরাসি শিশু এবং ২০০ জন জার্মান শিশু বাদে সকলেই মারা যায়।

ধর্মযুদ্ধগুলো খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপদের আহ্বানে সংঘটিত হয়েছিল।

সুজ. ব.

ক্রেস্কোগ্রাফ জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার দ্র

ক্রোচে, বেনেদেত্তো [১৮৬৬—১৯৫২]

ইতালির বিখ্যাত ঐতিহাসিক, মানবতাবাদী দার্শনিক ও নন্দনতত্ত্ববিদ। ক্রোচে (Benedetto Croce) জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৬ সালে। যুদ্ধে পরাজিত, নৈতিক দিক থেকে ক্ষয়িষ্ণু ও অবক্ষয়ী ইতালীয় জাতির সামনে তিনি একটি উদ্দীপনাময় আদর্শ তুলে ধরেন। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তিসমূহের অন্যতম হল 'লা ক্রিতিকা' নামে একটি উন্নত

www.pathagar.com

মানের সংস্কৃতি-সমালোচনার পত্রিকা প্রকাশ। ক্রোচে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে 'মুক্তির কাহিনী হিসাবে ইতিহাস' (১৯৪১) এবং 'দর্শন, কবিতা ও ইতিহাস' (১৯৫১) শীর্ষক একটি সঙ্কলন। ক্রোচে সব সময় যুক্তি, মানবমুক্তি ও উদার চিন্তার পক্ষে কথা বলেছেন এবং লিখেছেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার শক্তির দর্শন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে। ইতালি এবং ইতালির বাইরে তিনি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক প্রেরণাদায়ী প্রতীকে পরিণত হন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৫২ সালে। তিনি সারা জীবন এক জন আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে গেছেন, বিশেষভাবে নন্দনতত্ত্বের অঙ্গনে।

ক. চৌ.

ক্রোমিয়াম (chromium)

মৌলিক পদার্থ কঠিন ভঙ্গুর, ধূসর ধাতবপদার্থ। এর রাসায়নিক প্রতীক Cr। পারমাণবিক সংখ্যা ২৪, ভর ৫১.৯৯৬, গলনাঙ্ক ১৮৫০° সে., স্ফুটনাঙ্ক ২৬৭২° সে.। ১৭৯৭ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী লুই নিকোলা ভোক্ল্যাঁ (Louis Nicolas Vauquelin : ১৭৬৩-১৮২৯) সর্বপ্রথম ক্রোমিয়াম নিষ্কাশন করেন।

ক্রোমিয়াম ক্ষয়রোধ করে। ঘষলে উজ্জ্বল চকচকে হয়। এজন্য অন্য ধাতুর উপর ক্রোমিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হয়। তাতে ধাতু দীর্ঘস্থায়ী এবং চকচকে হয়। মোটরগাড়ির বাম্পার ও দরজার হাতলে ক্রোমিয়ামের প্লেটিং করা হয়। ইস্পাতে (দ্র) ক্রোমিয়াম মিশিয়ে ক্রোমস্টিল তৈরি হয়। ক্রোমস্টিল অত্যন্ত শক্ত। যুদ্ধজাহাজ, ট্যাঙ্কের বডি, বলবেয়ারিং, কাটিং মেশিনের ব্লেড ইত্যাদি তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়। লোহার (দ্র) সঙ্গে ক্রোমিয়াম ও নিকেল মিশ্রণে তৈরি হয় *স্টেইনলেস স্টিল*। এতে মরচে ধরে না। রান্না ও খাবারের বাসনপত্র, হাতা, গামলা তৈরিতে *স্টেইনলেস স্টিল* বহুল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য মৌলের সঙ্গে ক্রোমিয়াম মিশিয়ে রঙ তৈরি হয়। ক্রোমিয়াম যৌগ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট রঞ্জক হিসাবে চামড়াশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় ক্রোমিয়াম পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লোহা (দ্র) এবং অক্সিজেনের (দ্র) যৌগ ক্রোমাইট (FeO. Cr_2O_3) হিসাবে পাওয়া যায়। আলবেনিয়া, রাশিয়া (দ্র), দক্ষিণ আফ্রিকা, তুর্কিস্থান এবং জিম্বাবুয়েতে ক্রোমাইটখনি উল্লেখযোগ্য।

স. রা.

ক্রোমোজোম (chromosome)

জীবকোষের কেন্দ্রক-এ সুতোর মতো আকৃতিবিশিষ্ট উপাদানের নাম ক্রোমোজোম। রঞ্জকের প্রতি আকর্ষণের কারণে এই নাম। ডি. এন. এ.'র যুগ্মকুণ্ডলীর সঙ্গে প্রোটিন, যৎসামান্য আর. এন. এ. এবং ক্যালসিয়াম-ম্যাগনেসিয়াম আয়ন নিয়ে ক্রোমোজোম গঠিত। বংশগতির একক জীন

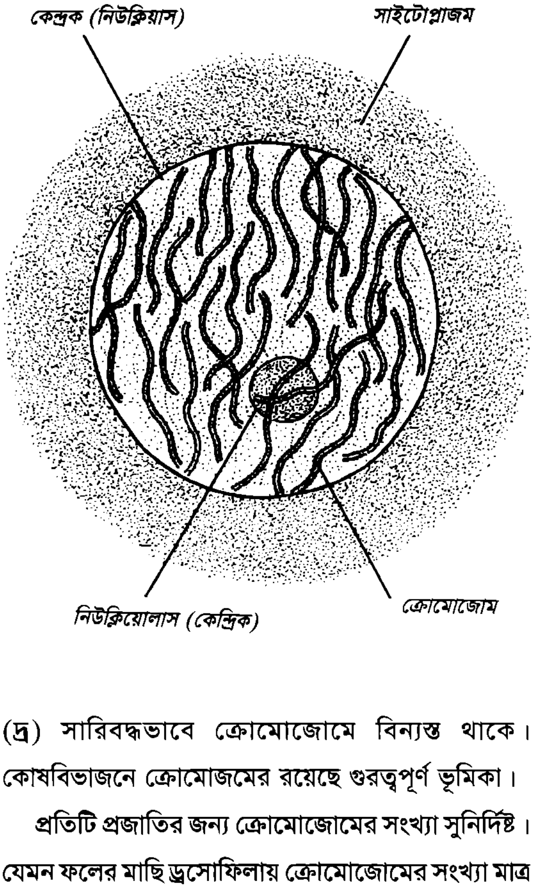

(দ্র) সারিবদ্ধভাবে ক্রোমোজোমে বিন্যস্ত থাকে। কোষবিভাজনে ক্রোমোজমের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

প্রতিটি প্রজাতির জন্য ক্রোমোজোমের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। যেমন ফলের মাছি ড্রসোফিলায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাত্র আট (চার যুগল), কিন্তু শিম্পাঞ্জিতে ৪৮ আর মানব-

www.pathagar.com

দেহকোষে ৪৬। ক্রোমোজোমগুলো দু'টি করে যুক্ত থাকায় মানবদেহে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩ জোড়ায় (pairs)। এর মধ্যে একজোড়া যৌনপরিচয় (পুরুষ কিংবা নারী) নির্ধারণ করে বলে নাম দেওয়া হয়েছে যৌন ক্রোমোজোম ('সেক্স ক্রোমোজোম')। বাকি ২২ জোড়াকে বলা হয় সোমাটিক ক্রোমোজোম বা অটোসোম (autosome), যেগুলোর মাধ্যমে বংশগতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

ক্রোমোজোমের নামটি ওয়ালডেয়ার হার্ৎজ নামক এক জার্মান শারীরস্থানবিদের দেওয়া, ১৮৮৮ সালে। আর যৌন ক্রোমোজোম শনাক্ত করেন আরেক জার্মান কোষতত্ত্ববিদ ১৮৯১ সালে, নাম হেন্‌কিং (Henking)।

রু. হা.

ক্রোম্যানিয়ন মানব (Cro-magnon man)

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের নাম। পঁয়ত্রিশ থেকে আশি হাজার বছর আগে ইউরোপ (দ্র), এশিয়া (দ্র) ও উত্তর আফ্রিকায় এরা বসবাস করত। ১৮৬৮ সালে ফ্রান্সে ক্রোম্যানিয়ন (Cro-magnon) নামের একটি গুহায় এদের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। এ জন্য এরা ক্রোম্যানিয়ন বা ক্রমাইয়ঁ (ফরাসি উচ্চারণে) মানুষ হিসাবে পরিচিত।

হাড়গোড়ের ধরন দেখে মনে হয়, ক্রোম্যানিয়ন মানুষের দেহে যথেষ্ট শক্তি ছিল। এদের উচ্চতা হত প্রায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির মতো (১৭৩ সেন্টিমিটার)। এদের দৈহিক গঠন ছিল আজকের দিনের মানুষের মতোই। শারীরিক দিক দিয়ে এদের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকার মানুষের মিল রয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন ক্রোম্যানিয়ন মানুষই হল বর্তমান কালের মানুষের প্রাথমিক রূপ।

ইউরোপের তীব্র শীত এবং সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রান্তরে ক্রোম্যানিয়ন মানুষ শিকার করে বেড়াত। ইউরোপের বহু স্থানই তখন বরফে আবৃত। পাথর এবং হাড়ের তৈরি বিভিন্ন হাতিয়ার এরা ব্যবহার করত। অস্ত্রের সাহায্যে চামড়া পরিষ্কার করা এবং সেলাইয়ের কায়দা এরা আবিষ্কার করেছিল। স্থানভেদে এসব অস্ত্র ছিল বিভিন্ন ধরনের। খোলা

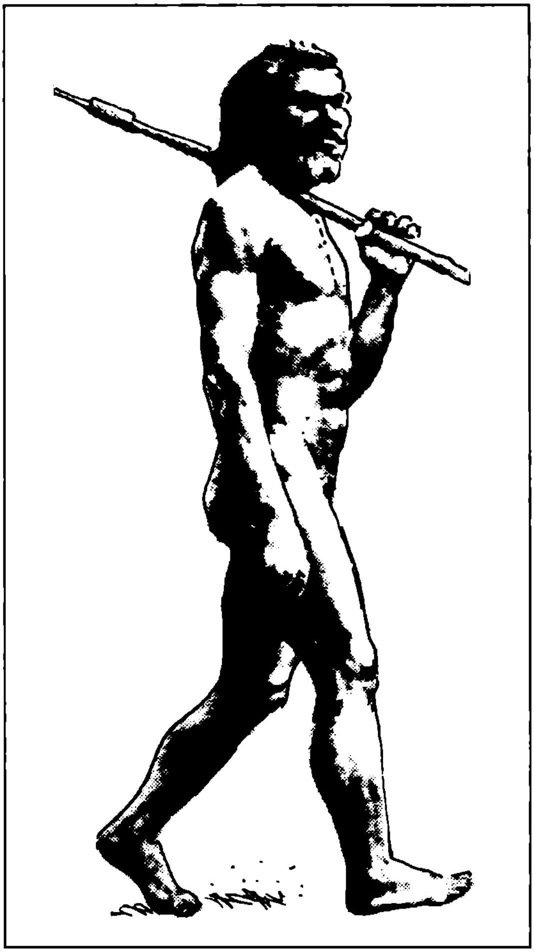

জায়গায় আবাস নির্মাণ করে এরা বসবাস করত। তবে কেউ কেউ গুহাতেও বাস করত।

খাদ্যের অন্বেষণে ক্রোম্যানিয়ন মানুষ স্থান থেকে স্থানে ঘুরে বেড়াত। বিনিময়পদ্ধতি এরা আবিষ্কার করেছিল, যেমন— কোনো একটা বিশেষ ধরনের পাথরের বদলে এক দল অন্য দলের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করত। ক্রোম্যানিয়নদের কেউ কেউ সুন্দর গুহাচিত্র (দ্র) অঙ্কনে পারদর্শী ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্স এবং স্পেনে বিভিন্ন গুহায় এদের চমৎকার শিল্পকাজ আজও রয়েছে। হাড় থেকেও নানা রকম শিল্পকর্ম করতে তারা জানত, জানত মাটি দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি তৈরির কায়দা।

সৈ. আ. ই.

www.pathagar.com

ক্লাইভ, রবার্ট [১৭২৫—১৭৭৪]

ব্রিটিশ সৈনিক, প্রশাসক ও কূটনীতিক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামরিক কর্মকর্তা হিসাবে ক্লাইভ (Robert Clive) একের পর এক কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এসব যুদ্ধের মধ্যে আর্কটের যুদ্ধ (১৭৫১) এবং কলিকাতা (দ্র) ও পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) (দ্র) উল্লেখযোগ্য। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কতিপয় ক্ষমতালিপ্সু এবং বিশ্বাসঘাতক পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিনি ১৭৫৭ সালে পলাশী প্রান্তরে প্রায় বিনাযুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে (দ্র) পরাজিত করেন। তিনি ভারতে ফরাসি (দ্র) শক্তি সম্পূর্ণ খর্ব করে ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। দু'বার বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন এবং গভর্নর হিসাবে তাঁর শাসনকালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ব্রিটিশ প্রভুত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬৭ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ভারতে অবস্থানকালে দুর্নীতির জন্য এবং উৎকোচ হিসাবে মূল্যবান উপহার গ্রহণের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ তদন্তের ফলে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। তবু ১৭৭৪ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন।

মো. ই.

ক্লিওপেট্রা (Cleopatra)

প্রাচীন কালে মিশরের রানী। আকর্ষণীয় রূপ ও ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত। বহু কিংবদন্তির জন্ম দিলেও ক্লিওপেট্রা কল্পনাপ্রসূত চরিত্র নয়। শেক্সপীয়র (দ্র), জন ড্রাইডেন্‌, বার্নার্ড শ (দ্র) প্রমুখ সাহিত্যপ্রতিভা তাঁকে নিয়ে কাব্য (দ্র) ও নাটক (দ্র) রচনা করেছেন। ইতালীয় ও ফরাসি ভাষাতে তাঁকে নিয়ে ট্র্যাজেডি (দ্র) রচিত হয়েছে।

হা. মা.

ক্লোরোফর্ম (chloroform)

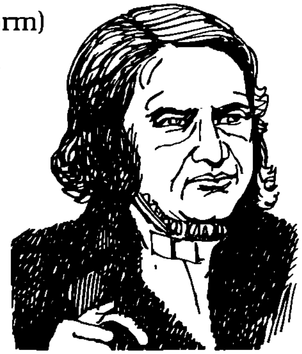

ক্লোরোফর্মের প্রথম ব্যবহারকারী স্যার জেম্‌স্‌ ইয়ং সিম্প্‌সন্‌

বর্ণহীন মিষ্টি গন্ধযুক্ত অদাহ্য তরল যৌগ। এর আণবিক ওজন ১১৯·৩৯, ফর্মুলা $CHCl_3$। ক্লোরোফর্মের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৪৮৯ (২০° সে. তাপমাত্রায়) এবং এর স্ফুটনাঙ্ক ৬১·২° সে. (১৪২° ফারেনহাইট)। এটা পানিতে অদ্রবণীয়, কিন্তু জৈব দ্রাবকে (দ্র) দ্রবণীয়। অতি-বেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে কিংবা অন্ধকারে ক্লোরোফর্ম ধীরে ধীরে বিক্রিয়া ঘটিয়ে অত্যন্ত বিষাক্ত ফসজিন গ্যাস তৈরি করে। এ জন্য বাণিজ্যিক ক্লোরোফর্মে এই বিক্রিয়া নিরোধক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এটা একটি শক্তিশালী চেতনানাশক পদার্থ। কিন্তু বেশিক্ষণ ব্যবহার করলে শরীরের বিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এর ফলে হৃৎপিণ্ড (দ্র), যকৃৎ (দ্র) এবং কিডনি (দ্র) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ জন্য আজকাল আরো নিরাপদ চেতনানাশক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। দ্রাবক হিসাবে ক্লোরোফর্মের ব্যবহার রয়েছে। রঙ এবং ঔষধ (দ্র) শিল্পেও এটা ব্যবহার করা হয়।

সা. এ.

ক্লোরোফিল (chlorophyll)

প্রায় সকল গাছের পাতা সবুজ। কোনো কোনো গাছের কাণ্ড ও ডালপালা সবুজ। বাতাসে (দ্র) ঝুলে থাকা দু'-একটা গাছের মূলও সবুজ। ফুলের বৃতি সবুজ। এত সবুজ যে উপাদানটির জন্য তার নাম ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিলের পরিভাষা করা হয়েছে 'পত্রহরিৎ'। হরিৎ শব্দের অর্থ সবুজ। বিজ্ঞানীরা বলেন, ক্লোরোফিল সৃষ্টি না হলে জীবজগৎ (দ্র) টিকত না। প্রাণিজগৎ (দ্র) প্রায় পুরোপুরি উদ্ভিদজগতের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণী তৈরি খাবার খায়। উদ্ভিদ (দ্র) কারো ওপর বিশেষ নির্ভরশীল নয়। উদ্ভিদ নিজ দেহে খাদ্য তৈরি করতে পারে। উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা নেয় ক্লোরোফিল বা পত্রহরিৎ। ক্লোরোফিলের অণু (দ্র) গঠিত হয়

www.pathagar.com

পাইরল নামক এক জাতীয় পদার্থ দিয়ে। পাতা বা কাণ্ডের ক্লোরোপ্লাস্ট নামক অঙ্গাণুতে দু'ধরনের ক্লোরোফিল থাকে। এ দু'ধরনের ক্লোরোফিল হল ক্লোরোফিল 'এ' এবং ক্লোরোফিল 'বি'। উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাতা বা কাণ্ডে খাদ্য তৈরি করে, সে প্রক্রিয়ার নাম ফটোসিন্থেসিস বা সালোক সংশ্লেষণ। এ প্রক্রিয়া দিনের বেলায় সূর্যের আলোকেই সম্পন্ন হয়। এ প্রক্রিয়ায় চারটি মূল উপাদান অংশ নেয়– কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র), পানি (দ্র), সূর্যালোক ও ক্লোরোফিল। প্রক্রিয়াশেষে গাছে খাদ্য তৈরি হয় এবং অক্সিজেন (দ্র) তৈরি হয় উপজাত হিসাবে। ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের উপস্থিতি ছাড়া এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতেই পারে না। কাজেই ক্লোরোফিল বায়ুমণ্ডল (দ্র)-কে বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে মুক্ত করে এবং অক্সিজেন উপহার দেয়। গাছের জন্য খাদ্য তো তৈরি করেই।

ত. চ.

ক্ষিতিমোহন সেন [১৮৮০—১৯৬০]

পিতা ভুবনমোহন সেন, মা দয়াময়ী। জন্ম এবং শিক্ষা কাশীতে (দ্র)। তবে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বিক্রমপুর জেলার সোনারঙ গ্রামের অধিবাসী। তিনি সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করে ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথের (দ্র) আহ্বানে শান্তিনিকেতনে (দ্র) অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। মধ্যযুগে ভারতের (দ্র) ধর্মসাধনা এবং বাংলার বাউল গান ছিল তাঁর গবেষণার অন্যতম বিষয়। তাঁর সংগৃহীত সাধক কবীরের (দ্র) বাণী রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদে ও সম্পাদনায় ১৯১৪ সালে 'ওয়ান হান্ড্রেড পোয়েম্‌স্ অব কবীর' নামে প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ সালে বিশ্বভারতী (দ্র) তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করে এবং ১৯৫৩ সালে তিনি বিশ্বভারতীর (দ্র) অস্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে 'ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা', 'ভারতের সংস্কৃতি', 'বাংলার সাধনা', 'প্রাচীন ভারতে নারী', 'বাংলার বাউল', 'বলাকা কাব্য পরিক্রমা' ইত্যাদি।

মে. খা.

ক্ষুদিরাম বসু [১৮৮৯—১৯০৮]

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'—ক্ষুদিরামের হাসিমুখে

ফাঁসি পরা নিয়ে রচিত এই বিখ্যাত বাউল গানটি আজও বাংলার মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। এই বিপ্লবী বীর ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম ১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর, মেদিনীপুর জেলার মৌবনি গ্রামে। অল্প বয়সেই তিনি বাবা-মা দু'জনকেই হারান। এর পর বড় বোনের আশ্রয়ে থেকে প্রথমে তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুলে এবং পরে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে লেখাপড়া করেন।

কলেজিয়েট স্কুলে লেখাপড়া করার সময়ই বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে কিশোর ক্ষুদিরামের পরিচয় ঘটে। ১৯০২ সালে তিনি বিপ্লবীদের গোপন সংগঠন 'যুগান্তর' দলে যোগ দেন। এ সময় স্বদেশী আন্দোলনের (দ্র) বিভিন্ন কাজকর্মেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯০৬ সালে মেদিনীপুরে এক প্রদর্শনীতে ক্ষুদিরাম বিপ্লবীদের গোপন পত্রিকা 'সোনার বাংলা' বিলি করছিলেন। এ সময় এক পুলিশ তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ পুলিশকে মেরে সেখান থেকে পালিয়ে যান। কয়েক দিন পর তিনি গ্রেপ্তার হন। কিন্তু তাঁর বয়স তখন নিতান্ত কম থাকায় সরকার মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়। ১৯০৭ সালে দলের জন্য তিনি ডাকবিভাগের অর্থ লুট করেছিলেন।

বিপ্লবীরা এ সময় কলিকাতার (দ্র) অত্যাচারী চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর (দ্র) ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়। নিরাপত্তার খাতিরে সরকার এ সময় কিংসফোর্ডকে মজফ্‌ফরপুরে বদলি করে। দুই বিপ্লবী অগত্যা মজফ্‌ফরপুরে

www.pathagar.com

যান। ১৯০৮ সালের ৩০শে অক্টোবর রাতে তাঁরা আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। রাত ৮ টার দিকে স্থানীয় ইউরোপিয়ান ক্লাব থেকে একটি গাড়ি বেরিয়ে আসে। তাঁরা ভুলবশত এটিকে কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে এর ওপর বোমা হামলা চালান। ফলে দু'জন ইংরেজ মহিলা মারা যান।

পরদিন ক্ষুদিরাম বসু পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হয়।

ফ. মা.

ক্ষেত্র/ক্ষেত্রফল

ক্ষেত্রফল হল কোনো বস্তুর পৃষ্ঠ বা তলের পরিমাপ। আমরা জানি, রেখার শুধু দৈর্ঘ্য থাকে অর্থাৎ একটি মাত্রা থাকে; তেমনি ক্ষেত্রফলের রয়েছে দু'টি মাত্রা। রেখার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে বিভিন্ন এককের প্রয়োজন হয়। যেমন— সেন্টিমিটার, মিটার ও ফুট ইত্যাদি। ক্ষেত্রফলের দুটি মাত্রা থাকে বলে এসব এককের বর্গ করলেই ক্ষেত্রফলের একক পাওয়া যায়। একই জাতীয় দু'টি রাশি গুণ করলে রাশিটির বর্গ পাওয়া যায়। যেমন $a \times a = a^2$; a^2 হল a-এর বর্গ। তেমনি ক্ষেত্রফলের এককগুলো হল বর্গসেন্টিমিটার, বর্গমিটার, বর্গফুট ইত্যাদি। পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের বিভিন্ন একক রয়েছে। যেমন— সি. জি. এস. পদ্ধতিতে বর্গসেন্টিমিটার, এম. কে. এস. পদ্ধতিতে বর্গমিটার, এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে বর্গফুট এবং এস. আই. একক হচ্ছে বর্গমিটার। বিভিন্ন ধরনের পৃষ্ঠ বা তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের পদ্ধতি বিভিন্ন। সুষম জ্যামিতিক আকারবিশিষ্ট তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করা হয়। যেমন— আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল=দৈর্ঘ্য × প্রস্থ; সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল = ভূমি × উচ্চতা; বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য x দৈর্ঘ্য = (দৈর্ঘ্য)২; ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল = $\frac{১}{২}$ x (সমান্তরাল বাহুর যোগফল) x উচ্চতা; বৃত্তের ক্ষেত্রফল = π x (ব্যাসার্ধ)২; গোলকের ক্ষেত্রফল = 4π (ব্যাসার্ধ)২ ; সিলিণ্ডারের ক্ষেত্রফল = 2π × ব্যাসার্ধ × দৈর্ঘ্য। এখানে π একটি গ্রিক অক্ষর। এর উচ্চারণ 'পাই'। এটি একটি ধ্রুব সংখ্যা। এর মান মোটামুটি π = ৩.১৪১৫৯। অসমতলের ক্ষেত্রফলও নির্ণয় করা যায়।

হো. আ.

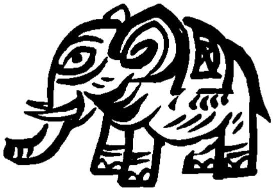

খ

খগেন্দ্রনাথ মিত্র [১৮৯৬—১৯৭৮]

বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক। তিনি ১৮৯৬ সালের ২রা জানুয়ারি কলিকাতায় (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র শিলাইদহে (দ্র) ঠাকুর এস্টেটের মোক্তার ছিলেন।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র শৈশব থেকেই রাজনীতিসচেতন ছিলেন। যৌবনে বাঘা যতীনের (দ্র) অনুপ্রেরণায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। গান্ধীজির (দ্র) অসহযোগ আন্দোলনের (দ্র) সময় কলেজ ত্যাগ করেন। পরে ১৯২০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (দ্র) প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রথমে রেল বিভাগে কর্মজীবন শুরু করলেও অল্প কিছুদিন পর সাহিত্য-সাপ্তাহিক 'বাঁশরী' পত্রিকায় যোগ দেন। এর পর তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'মহিলা', 'পঞ্চপুষ্প' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা শতাধিক। 'ভোম্বল সর্দার', 'বাগদি ডাকাত', 'পাতালপুরীর কাহিনী', 'অতীতের পৃথিবী', 'আবিষ্কারের কাহিনী', 'ঝিলে জঙ্গলে' ইত্যাদি তাঁর জনপ্রিয় বই। তাঁর রচিত 'শতাব্দীর শিশুসাহিত্য ১৮১৮–১৯৬০' বাংলা শিশু-সাহিত্য-গবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য বই। হিন্দি ও রুশ ভাষায় তাঁর 'ভোম্বল সর্দার' বইটি অনূদিত হয়েছে। তিনি

www.pathagar.com

কয়েকটি শিশু-কিশোর সঙ্কলন গ্রন্থও সম্পাদনা করেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর সম্পাদনায় ছোটদের দৈনিক পত্রিকা 'কিশোর' প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ খগেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) 'ভুবনেশ্বরী পদক' ও 'মৌচাক সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে শিশুসাহিত্যে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হন। কিন্তু শিশুসাহিত্যের জন্য এই পুরস্কারের অর্থমান পাঁচ হাজার থেকে কমিয়ে এক হাজার টাকা বরাদ্দ করায় প্রতিবাদস্বরূপ তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সুজ. ব.

খচ্চর

গাধা (দ্র) ও ঘোড়ার (দ্র) মিলনে উৎপন্ন বংশধরদের খচ্চর বলে। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু প্রাণী, সহজে রোগাক্রান্ত হয় না, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কর্মক্ষম থাকে। তাই প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি ভারবাহী জন্তু হিসাবে অনেক দেশেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে খচ্চর নেই বললেই চলে।

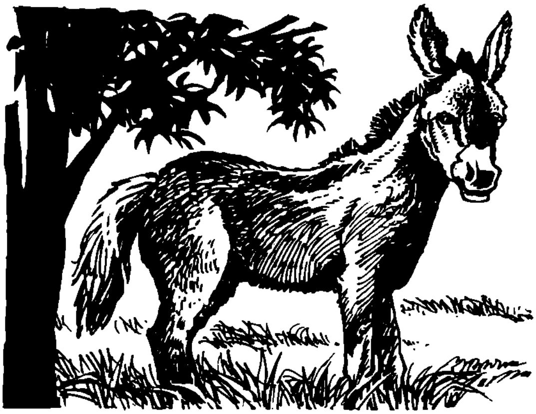

খচ্চর দু'প্রকারের হয়—পুরুষ গাধা ও স্ত্রী ঘোড়ার মিলনে মিউল (mule) এবং পুরুষ ঘোড়া ও স্ত্রী গাধার মিলনে হিনি (hinny)। এদের প্রজননক্ষমতা নেই। মিউল ১.৬–১.৭৫ মিটার উঁচু ও ৫৫০–৭০০ কেজি ওজনের হয় এবং হিনি ১.২–১.৬ মিটার উঁচু ও ২৭৫–৬০০ কেজি হয়।

মিউল সাধারণত বাদামি বা লালচে-বাদামি রঙের হয়। গাধার মতো এদের কান লম্বা, কেশর ছোট, লেজের গোছা বড়, পা চিকন, খুর ছোট। দেহ ঘোড়ার মতো বৃহৎ ও সুগঠিত। মাংসপেশি মজবুত। গলার স্বর গাধার মতো।

খচ্চর ঘোড়া-গাধার মতোই ঘাস খায়, ২০-২৫ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

খড়িমাটি চক দ্র

খণ্ডকাব্য কাব্য দ্র

খনি

আকর, জ্বালানি (দ্র) পদার্থ, পাথর বা বিশেষ কোনো মাটি (দ্র) সংগ্রহের জন্য খোদিত স্থানকে খনি বলে। খনি দু'প্রকার হতে পারে: ভূপৃষ্ঠস্থিত এবং ভূগর্ভস্থ। খনিজ বস্তু যখন ভূপৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠের অল্প নিচে পাওয়া যায় তখন তাকে বলা হয় ভূপৃষ্ঠস্থিত খনি। আবার খনিজ বস্তু যখন ভূ-তলের অনেক নিচে অবস্থান করে, তখন তাকে ভূগর্ভস্থ খনি বলা হয়।

খনিজ বস্তুর ধরন ও অবস্থানভেদে এবং তার চারপাশের শিলার কাঠিন্য অনুসারে ভূগর্ভে খনন-প্রণালীর প্রভেদ ঘটে। খনিজ বা ধারক শিলা যথেষ্ট কঠিন না হলে খোদক যন্ত্র বা শাবল-গাঁইতি দ্বারা কাটা হয়। কঠিন শিলা বা খনিজের ক্ষেত্রে প্রথমে ছোট ছোট ফুটো বা ড্রিলিং করে সরু গর্ত করা হয়, তারপর সেখানে বিস্ফোরক ফাটিয়ে খনিজ বস্তু আহরণের কাজ চলে।

খনির মধ্যে যেসব জায়গায় খনিজ বস্তু ওঠানোর কাজ শেষ হয়ে যায়, সেসব জায়গা অপ্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়। কারণ সব খনিজ কেটে নেওয়ার পর প্রায়ই খনির মধ্যে ছাদ ধসে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

ভূগর্ভস্থ খনিতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা এবং দূষিত বায়ু দূর করা প্রধান এবং প্রথম কাজ। এই উদ্দেশ্যে খনির একেবারে ওপর থেকে খাড়াভাবে এমন সুড়ঙ্গ কাটা হয়, যার সঙ্গে নিচের সবগুলো ধাপের সরাসরি যোগ থাকে। খনির এই সুড়ঙ্গব্যবস্থাকে শ্যাফ্‌ট্ (shaft) বলা হয়। প্রয়োজনবোধে শ্যাফ্‌টের সংখ্যা কমানো বাড়ানো চলে। কোনো একটি শ্যাফ্‌টের মধ্য দিয়ে প্রবল বেগে বাতাস ঢুকিয়ে দিলে তা অন্য দিক দিয়ে দূষিত ও খারাপ গ্যাসযুক্ত বাতাসকে সরিয়ে নিয়ে যায়। আগে খনিতে আলোর জন্য 'ডেভি (দ্র) সেফটি ল্যাম্প' নামে এক ধরনের ল্যাম্প ব্যবহার করা হত। বিদ্যুৎ (দ্র) প্রচলিত হওয়ার পর থেকে বিদ্যুৎই

www.pathagar.com

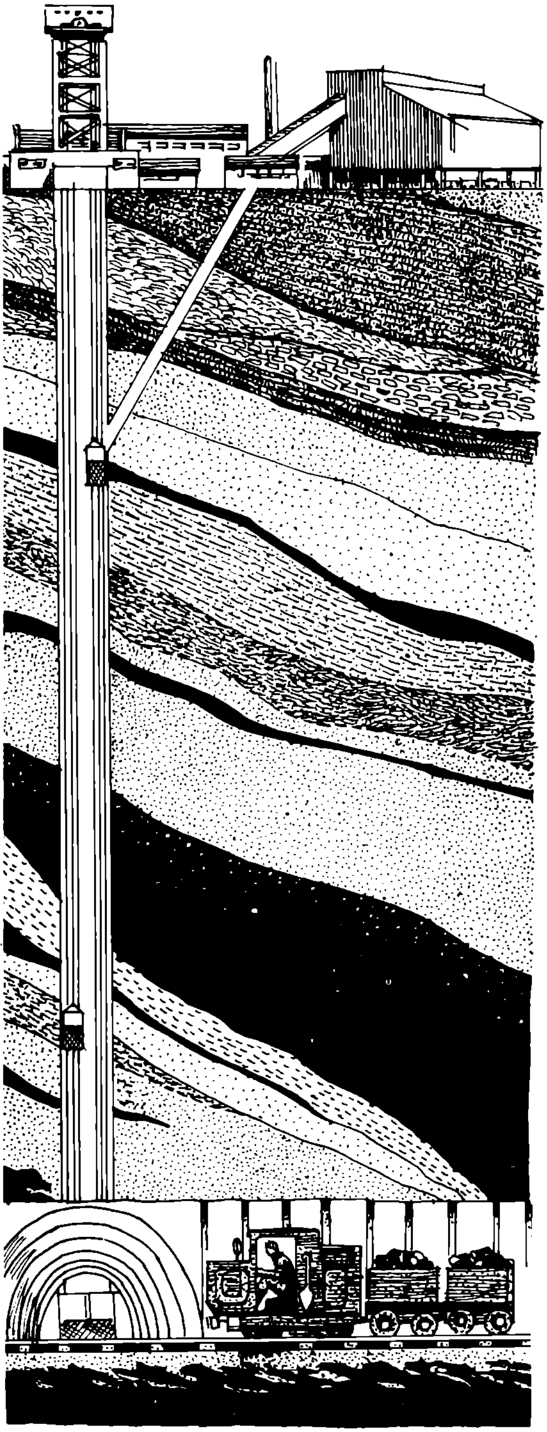

কয়লাখনি থেকে কয়লা তোলা হচ্ছে

ব্যবহৃত হচ্ছে। খনি ভূমধ্যস্থ জলস্তরে পৌঁছলেই জল নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

সুজ. ব.

খমির

রুটি, জিলাপি ইত্যাদি তৈরির সময় ফুলিয়ে ফাঁপা করার জন্য মাখানো ময়দায় লেচির সঙ্গে ছত্রাক জাতীয় এক রকম এককোষী ক্ষুদ্র উদ্ভিদ মেশানো হয়। এটিই খমির বা ঈস্ট (yeast)। বিশেষ করে শর্করা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে এটি নিজেকে বার বার বিভক্ত করার মাধ্যমে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। প্রায় ৬০০ প্রকার খমির রয়েছে— যদিও বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এর মাত্র দু'একটি। তবে এই উদ্ভিদের (দ্র) রেণু বাতাসে (দ্র) উড়ন্ত অবস্থায় সর্বত্র বিরাজমান। যে প্রক্রিয়ায় এটি রুটি বা জিলাপিকে ফুলিয়ে তোলে, একই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আঙ্গুর (দ্র), বার্লি বা তালের রসের মতো চিনি বা শর্করা জাতীয় জিনিসকে গাঁজিয়ে মদে পরিণত করে। সেই বিক্রিয়াটিকে বলে ফার্মেন্টেশন (fermentation) বা খমিরায়ণ। এ সবকে উন্মুক্ত স্থানে রেখে দিলে বাতাসের খমির যুক্ত হয়ে এবং বংশবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ব্যাপারটি ঘটতে পারে। ভাত থেকে পান্তা হওয়াসহ আরো বহু রকম খাদ্যপরিবর্তনে এই একই রকম বিক্রিয়া ঘটে।

খমির সবুজ উদ্ভিদ নয় বলে এটি তার নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না। পুষ্টির জন্য এটি চিনি, শর্করা ইত্যাদি মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে। মাধ্যমের এই খাদ্যকে ভেঙে ফেলার জন্য এটি এনজাইম (দ্র) নামক কিছু বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে। এরকম কয়েকটি এনজাইম চিনিকে ভেঙে অ্যালকোহল (দ্র) আর কার্বন ডাই-অক্সাইডে (দ্র) পরিণত করে। এটিই খমিরায়ণ বিক্রিয়া। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস রুটির লেচিকে ফুলিয়ে তোলে। তন্দুরে রুটি সেঁকার সময় উৎপন্ন অ্যালকোহল উঠে যায় আর খমিরও মরে যায়। মদ জাতীয় দ্রব্যের খমিরায়ণে অ্যালকোহল থেকে যায় আর কার্বন ডাই-অক্সাইড—এর মধ্যে বুদ্বুদ সৃষ্টি করে।

বাতাসের খমিরের ব্যবহার যদিও মানুষ হাজার বছর ধরে করছে, বাজারজাত করার মতো খমির উৎপন্ন হচ্ছে

www.pathagar.com

মাত্র ১৮৮০ সাল থেকে। আজকাল ব্যাপক ভিত্তিতে এটি তৈরি হয় প্রধানত চিটাগুড়ের সাহায্যে।

মু. ই.

খরগোশ

খরগোশ ছোট আকৃতির স্তন্যপায়ী প্রাণী (দ্র)। পৃথিবীর (দ্র) সর্বত্র বন্য খরগোশ অর্থাৎ হেয়ার (hare) ও র‍্যাবিট (rabbit) বাস করে। হেয়ার ও র‍্যাবিটের মধ্যে অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে। বাংলায় খরগোশ বললে দু'টিই বোঝায়। বিশ্বে প্রায় ৬৫টি প্রজাতি আছে। বাংলাদেশে (দ্র) আছে দু'টি। বন্য র‍্যাবিট থেকেই গৃহপালিত খরগোশের উৎপত্তি। ৪০-৫০ জাতের গৃহপালিত খরগোশ আছে। এদের মাংস সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এর লোমযুক্ত চামড়া দামি ফার-কোট, টুপি প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। মাংস ও চামড়ার জন্য খামার ভিত্তিতে এবং শখের বশে খরগোশ পোষা হয়।

এদের দেহ চিকন ও লম্বা, লেজ ছোট, কান বড় বড়। প্রজাতিভেদে কান ৭-২৫ সেমি হয়। কান ঘুরিয়ে যে কোনো দিকের শব্দ এরা শুনতে পারে। এরা হাঁটেও না, দৌড়ায়ও না। এদের পেছনের পা দু'টি অত্যন্ত লম্বা। এগুলোর ওপর ভর করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ঘণ্টায় ২৫-৩০ কিলোমিটার বেগে লাফাতে পারে। বিপদে পড়লে এক লাফে তিন মিটার পর্যন্ত যায়।

প্রজাতিভেদে এদের আকৃতি ও রঙে পার্থক্য থাকে। ২০-৭০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ০.৯-২.৩ কেজি হয়। গৃহপালিত সাদা ফ্লেমিশ জাত ৮ কেজি পর্যন্ত হয়। বন্যগুলো বাদামি বা ধূসর এবং গৃহপালিতগুলো সাদা, কালো, ধূসর, বাদামি বা মিশ্রিত রঙের হয়ে থাকে।

হেয়ার একাকী এবং র‍্যাবিট দলবদ্ধভাবে বাস করে। ঘাস-পাতা, গাছের ছাল, শাক-সবজি, ফল-মূল এদের খাদ্য।

স্ত্রী খরগোশ বছরে বেশ ক'বার বাচ্চা দেয়। প্রজাতিভেদে ২৬-৩২ দিন গর্ভধারণের পর দু' থেকে আটটি বাচ্চা দেয়। র‍্যাবিটের বাচ্চাগুলো হয় লোমহীন, অন্ধ ও অসহায়। দশ দিনে এদের চোখ ফোটে। হেয়ারের বাচ্চাগুলো পূর্ণাঙ্গ। জন্মের অল্পক্ষণ পরেই খরগোশ লাফাতে পারে। ৬-৮ মাসে প্রজননক্ষম হয়। এরা ৫-১০ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম আ. র.

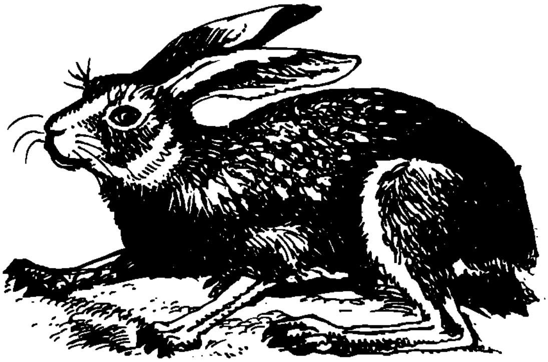

খরতা

খরতা বলতে বোঝায় পানিতে (দ্র) মিশ্রিত খনিজ পদার্থের কারণে পানির স্বাভাবিক অবস্থার ভিন্নতা। সাধারণত ক্যালসিয়াম (দ্র), ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহের (দ্র) বিভিন্ন লবণ (দ্র) (রাসায়নিক) পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকলে সে পানিতে সাবান (দ্র) গুললে ফেনা ভাল হয় না। এক্ষেত্রে লবণগুলির রাসায়নিক ক্রিয়ায় ফ্যাটি-অ্যাসিডের (দ্র) ধাতব লবণ তৈরি হয়। এই ধাতব লবণ সাবানের কার্যকারিতা নষ্ট করে ফেলে। খরতা দুই ধরনের হয়ে থাকে—অস্থায়ী খরতা ও স্থায়ী খরতা। অস্থায়ী খরতার ক্ষেত্রে পানিতে দ্রবীভূত থাকে বিভিন্ন বাই-কার্বনেট সল্ট বা লবণ। এ ধরনের খর পানি গরম করে ফুটিয়ে নিলে পানির খরতা চলে যায়। এটি ঘটে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে।

অন্য দিকে স্থায়ী খর পানির খরতার কারণ হল পানিতে ধাতব সালফেট দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা। এই পানির খরতা দূর করার জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

সু. ব.

খলনায়ক (villain)

সাহিত্যে, বিশেষ করে নাটকে (দ্র) খলনায়ক বা ভিলেন একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে মন্দ স্বভাবের মানুষ। দুষ্ট প্রকৃতির এই মানুষটি কাহিনীর সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নায়কের বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র করে এবং চক্রান্তের মাধ্যমে তাকে ধ্বংস করার প্রয়াসে লিপ্ত থাকে। শেক্সপীয়রের (দ্র) ওথেলো নাটকের ইয়াগোকে অনেকেই বিশ্বসাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী খলনায়ক বলে আখ্যায়িত করেছেন। শহীদুল্লা কায়সার (দ্র) বিরচিত 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) উপন্যাসের

www.pathagar.com

রমজানের ভূমিকায় হুমায়ুন ফরিদী ও অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদার

রমজান চরিত্রটিকে সহজেই খলনায়ক রূপে চিহ্নিত করা যায়।

ক. চৌ.

খলিফা

আরবি শব্দ, একবচন। শব্দটির অর্থ : উত্তরাধিকারী, প্রতিনিধি। এই শব্দের বহুবচন হল খুলাফা; যেমন খুলাফা-ই-রাশিদীন (দ্র) অর্থাৎ সত্যপথের অনুগামী খলিফাবৃন্দ।

পরবর্তী কালে 'খলিফা' শব্দ রসূল (দ্র)-এর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত অর্থে মুসলমানদের প্রধান রাষ্ট্রনেতার পদবি হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। 'খলিফা' শব্দ থেকেই 'খিলাফত' শব্দের উদ্ভব ঘটেছে, যার অর্থ—উত্তরাধিকার, প্রতিনিধিত্ব।

হা. মা.

খাজা নাজিমুদ্দিন [১৮৯৪—১৯৬৪]

রাজনীতিবিদ। ঢাকার (দ্র) নবাব পরিবারে ১৮৯৪ সালে তাঁর জন্ম।

আলিগড় মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ, লণ্ডনের ডানস্টাবল গ্রামার স্কুল, কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি হল ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ব্যারিস্টার ছিলেন।

১৯২২ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৭ সালে শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের (দ্র) নেতৃত্বে গঠিত অবিভক্ত বঙ্গের মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে মন্ত্রিত্বের পদে ইস্তফা দেন।

১৯৪৭ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের (দ্র) প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর পর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

১৯৬২ সালে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতির পদে বহাল থাকেন।

খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির বিরোধিতার কারণে তিনি বাঙালিদের কাছে কুখ্যাত হয়ে আছেন।

আ. হু.

খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি, হযরত [১১৪২—১২৩৬]

হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (র.) ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম বিখ্যাত সুফি ও দরবেশ। তবে, জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ইরানের সিস্তান প্রদেশের সান্‌জা শহরের বাসিন্দা। তাঁর পিতা খাজা গিয়াসুদ্দিন হাসান ছিলেন সিস্তানের এক জন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী।

সচ্ছল পারিবারিক পরিবেশে লালিত হয়েও মঈনুদ্দিনের মধ্যে শ্রেয় ও কল্যাণবোধের স্ফুরণ প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায়। সমসাময়িক মুসলমান সমাজের নানা অবক্ষয়, বিশেষ করে সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতা তিনি মেনে নিতে পারেন নি।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর মঈনুদ্দিন জ্ঞানের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। বিভিন্ন স্থানে তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসেন। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অচিরেই তিনি এক জন সুফি সাধকের মর্যাদায় উন্নীত হন।

www.pathagar.com

মঈনুদ্দিন ১১৯৩ সালে দিল্লিতে আসেন এবং সেখান থেকে আজমীরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সুফি সাধক হিসাবে দিকে দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে নানাবিধ কাহিনী প্রচলিত আছে।

হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (র.) সাধারণত হযরত খাজা গরিবে নেওয়াজ কিংবা সংক্ষেপে 'খাজাবাবা' নামেও পরিচিত।

তিনি ১২৩৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আজমির শরীফে তাঁর মাজার অবস্থিত। এখানে প্রতি বছর ৬—১১ রজব তাঁর ওরস (দ্র) উপলক্ষে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ সমবেত হন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, তাঁর দোয়া কামনা করতে।

মু. মা.

খাজা শফিক আহমেদ [১৯২৫—১৯৭১]

বাংলাদেশে শিল্পকলা আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে যে ছয় জন শিল্পীকে গণ্য করা হয় খাজা শফিক আহমেদ তাঁদের অন্যতম। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (দ্র), কামরুল হাসান (দ্র), আনোয়ারুল হক (দ্র), শফিউদ্দিন আহমেদ ও শফিকুল আমিনের (দ্র) সহকর্মী ও সহযোগী ছিলেন তিনি।

ঢাকার (দ্র) নবাব পরিবারে এই শিল্পীর জন্ম ১৯২৫ সালে। স্কুল পর্যায়ের পাঠ শেষ করে কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করেন ১৯৪৬ সালে। এর পর কলম্বো পরিকল্পনার অধীনে স্কলার হিসাবে ম্যানিলার ফিলিপাইন্‌স্ কলেজ অব আর্টস এণ্ড ট্রেডস থেকে শিল্পশিক্ষার উপকরণ ও পরিচালনা বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং গ্রহণ করেন। চার বছর কলিকাতায় ব্যবহারিক ও ললিতকলায় উন্নতমানের শিক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন।

নিসর্গ : টেম্পেরা মাধ্যমে আঁকা খাজা শফিক আহমেদের একটি চিত্র

১৯৪৮ সালে ঢাকা গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৫০ সালে এই ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। তিনি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এখানে ব্যবহারিক শিল্পকলা বিভাগের (বর্তমান গ্রাফিক ডিজাইন) প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে সপরিবারে তৎকালীন পশ্চিম-পাকিস্তানের করাচিতে যান, কিন্তু সেখান থেকে আর দেশে ফিরতে পারেন নি। ১৯৭১ সালের নভেম্বরে তিনি করাচিতে মৃত্যুবরণ করেন।

সাধারণত তেলরঙ টেম্পেরার মাধ্যমে তিনি ছবি আঁকতেন। তিনি সে সময় পাকিস্তানের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীতে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন। গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। হোটেল পূর্বাণীতে তাঁর একটি মোজাইক মাধ্যমে ম্যুরাল চিত্র বর্তমান।

এক জন আদর্শ শিল্পশিক্ষক হিসাবে তিনি অনেক সুনাম অর্জন করেছিলেন।

হা. খা.

খাড়া মানুষ হোমো ইরেক্টুস্ দ্র

খাদীজা (রা.), হযরত [৫৫৫—৬১৯]

হযরত খাদীজা (রা.) ছিলেন হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর

www.pathagar.com

পত্নী। তিনি আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশে ৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন আবদুল উয্যা গোত্রের খুয়াইলিদ এবং মা ফাতিমা।

জানা যায়, হযরত মুহম্মদ (স.)–এর সঙ্গে বিয়ের আগে তাঁর দুই বার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর উভয় স্বামীরই মৃত্যু হয়।

খাদীজা (রা.) ছিলেন খুবই ধনী। বিভিন্ন স্থানে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। এ কাজের জন্য এক জন বিশ্বস্ত লোক খুঁজতে গিয়েই তিনি যুবক মুহম্মদ (স.)–এর সাক্ষাৎ পান। মুহম্মদ (স.)–এর সততা, আন্তরিকতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দক্ষতা খাদীজা (রা.)–কে মুগ্ধ করে। এরই পরিণতি হিসাবে তিনি হযরত মুহম্মদ (স.)–কে বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন। ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে পঁচিশ বছরের যুবক মুহম্মদ (স.)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এ সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর।

মহিলাদের মধ্যে খাদীজাই (রা.) প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লোকান্তরিতা হন।

মু. মা.

খাদ্যশৃঙ্খল

জীবজগতে একমাত্র সবুজ উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে। বাকি সব জীব খাদ্যের জন্য অন্য জীবের উপর নির্ভর করে। এই নির্ভরশীলতার পরম্পরাকে খাদ্যশৃঙ্খল বলা হয়। গরু (দ্র), হরিণ (দ্র) বা ইঁদুর (দ্র) বাঁচে উদ্ভিদ (দ্র) খেয়ে। তাই এই প্রাণীগুলোকে প্রাথমিক খাদক বলা যেতে পারে। বেজি যদি ইঁদুর খায় বা বাঘ যদি হরিণ খায় তা হলে বেজি বা বাঘকে দ্বিতীয় পর্যায়ের খাদক বলা যায়। চিল বেজিকে খেলে সে হয়ে পড়ে তৃতীয় পর্যায়ের খাদক। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে আরো চলতে পারে। এটি একটি খাদ্যশৃঙ্খল। জলাশয়ের জীবদের লক্ষ করলে আমরা সেখানেও স্পষ্ট একটি খাদ্যশৃঙ্খল দেখতে পাই। সূর্যালোকের সাহায্যে পানির উপরিভাগের সবুজ উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন (দ্র) নিজেই নিজের খাদ্য তৈরি করে। ক্ষুদ্র প্রাণী-প্লাঙ্কটন ওগুলো খেয়ে বাঁচে। ছোট-বড় বহু মাছ এসব উদ্ভিদ বা প্রাণী-

প্লাঙ্কটন খায়। আবার কিছু অপেক্ষাকৃত বড় মাছ খায় ছোট মাছকে। এমনিভাবে শৃঙ্খলপরম্পরা চলতে থাকে। অবশ্য সব রকম শৃঙ্খলেই শেষ অবধি মৃত প্রাণীর মরদেহ পচে গিয়ে প্রাথমিক খাদ্য উদ্ভিদের জন্য উর্বরতার সৃষ্টি করে।

যে ক'টা উদাহরণ আমরা নিলাম সেগুলো সরল খাদ্যশৃঙ্খলের। খাদ্যশৃঙ্খল সাধারণত এত সরল হয় না। বেশ কিছু শৃঙ্খল পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যায় এবং জটিলতর রূপ ধারণ করে। এ যেন এক রকম শৃঙ্খলজাল। একটি বিষয় লক্ষ করার মতো। তা হল খাদ্যশৃঙ্খলের প্রথম দিকের পর্যায়ে খাদ্যের দক্ষতা যত থাকে শেষের দিকে তেমন থাকে না। একটি হিসাব অনুসারে ৩৪৬ কিলোগ্রাম উদ্ভিজ্জখাদ্য বাঁচিয়ে রাখে মাত্র ২৭ কিলোগ্রাম হরিণ। আর ঐ পরিমাণ হরিণ বাঁচিয়ে রাখতে পারে আরো অনেক কম পরিমাণ বাঘকে—মাত্র আধ কিলোগ্রাম। আসলে খাদ্যশৃঙ্খলের প্রত্যেক পর্যায়ে এর বেশ কিছু শক্তির অপচয় ঘটে তাপ হিসাবে। তাই প্রাথমিক খাদকের চেয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ের খাদকের সংখ্যা ক্রমানুসারে কমে যেতে বাধ্য।

অনেক খাদ্যশৃঙ্খল মানুষে এসে শেষ হয়। এই শৃঙ্খলের ভালমন্দের সঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। যেমন

www.pathagar.com

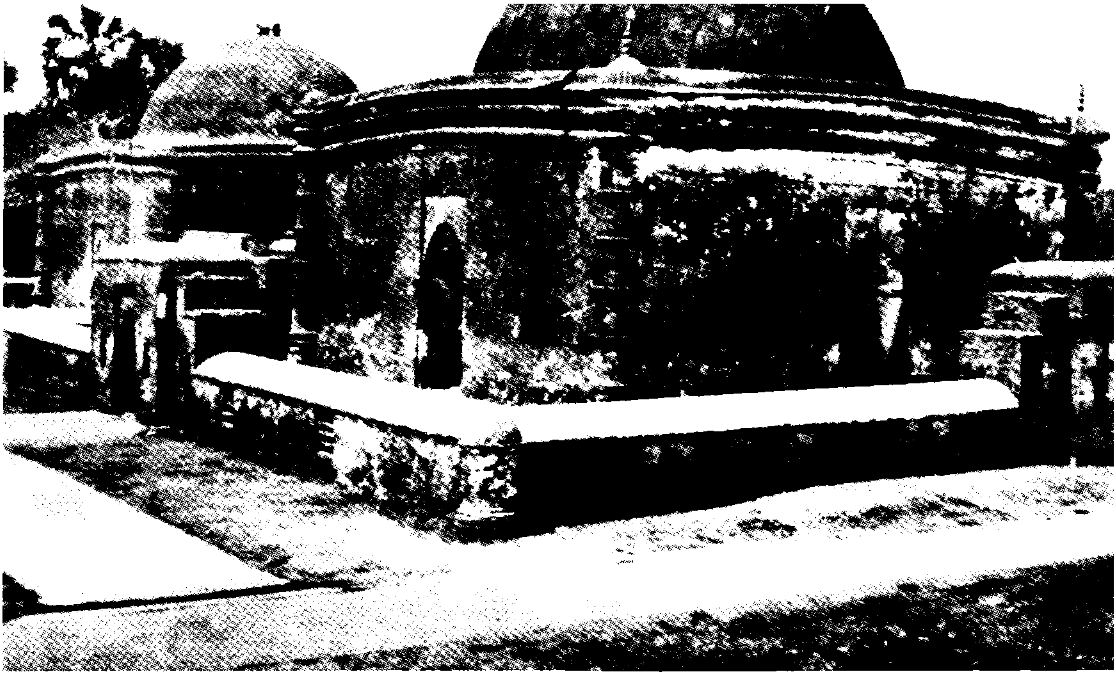

খুলনার বাগেরহাটে খান জাহান আলীর মাজার

খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে কোনো প্রাণী যদি ডিডিটি (দ্র) দ্বারা দূষিত হয়, তবে তা শেষ অবধি আমাদের দেহে এসে হাজির হতে পারে। তা ছাড়া খাদ্যশৃঙ্খল প্রাকৃতিক ভারসাম্যের অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে।

মু. ই.

খান জাহান আলী [? —১৪৫১]

খান জাহান আলী বিখ্যাত ইসলামপ্রচারক ও শাসক ছিলেন। তিনি সুলতানী আমলে বঙ্গদেশে আসেন। প্রথমে যশোর অঞ্চলে ধর্মপ্রচার ও নানা জনহিতকর কাজ শুরু করেন এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এরপর তিনি বৃহত্তর খুলনা জেলার বাগেরহাট অঞ্চলে আস্তানা স্থাপন করেন। সেখানেও তিনি ইসলাম প্রচার ও জনকল্যাণমূলক (যেমন রাস্তাঘাট ও মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, জলাশয় খনন প্রভৃতি) কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যশোর-খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর সেসব কীর্তির চিহ্ন এখনো বিদ্যমান।

খান জাহান আলীর অমর কীর্তি বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ (দ্র)। নামে ষাটগম্বুজ হলেও এই মসজিদে সাতাত্তরটি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'খান জাহান আলীর দিঘি' নামে পরিচিত বিশাল জলাশয়টিও পর্যটকদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

এই মহান সাধক 'খাঞ্জালী পীর' নামে এখনো স্থানীয় জনগণের নিকট প্রিয়। ১৪৫১ সালের ২৫শে অক্টোবর তিনি ইন্তেকাল করেন। ষাটগম্বুজ মসজিদের সামান্য দূরে তাঁর কবর রয়েছে।

মু. মা.

খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ [১৮৭৩—১৯৬৫]

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষাসংস্কারক ও সমাজহিতৈষী। ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বৃহত্তর খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার নলতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকার মধ্য ইংরেজি ও টাকির উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষাজীবন-শেষে তিনি কলিকাতায় (দ্র) যান। তিনি ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯২ সালে

www.pathagar.com

খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ

হুগলি কলেজ থেকে এফ. এ. (F.A. = First Arts), ১৮৯৪–৯৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে যথাক্রমে বি. এ. এবং দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেন।

তিনি ১৮৯৬ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রসারিত তাঁর কর্মজীবনে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সুপারনিউমারারি টিচার, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর, চট্টগ্রামের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর এবং সর্বশেষে বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। এই দেশীয় পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আই ই এস অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হন।

খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ ভারতের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে নিরবচ্ছিন্ন ও একাগ্র ভূমিকা পালন করেন। তাঁর চেষ্টাতেই সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব রহিত করার লক্ষ্য থেকে অনার্স ও এম. এ. পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার পরিবর্তে রোল নম্বর লেখার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়, উচ্চ মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক মাদ্রাসায় শিক্ষার মানের উন্নতিসাধনপূর্বক মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগসহ স্কুল-কলেজে মৌলবীর পদ সৃষ্টি করা হয় এবং পণ্ডিত ও মৌলবীদের মধ্যকার বেতনবৈষম্য দূর করা হয়। শুধু তাই নয়, মক্তবসমূহের জন্য স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচি ও শিক্ষায়তনে মুসলমান লেখকদের রচিত পুস্তক ব্যবহার ও প্রচলনের ব্যবস্থা তাঁরই একান্ত উদ্যোগে গৃহীত হয়।

তাঁর সময়কালে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যখন ইংরেজি (দ্র), ফার্সি ও উর্দু (দ্র) ভাষা (দ্র) শিক্ষা করার প্রবল প্রবণতা বিদ্যমান এবং তার প্রভাব যখন সাধারণ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও কার্যকর, তখন খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ সর্বতোভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজকে বাংলা (দ্র) ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা করার জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর সাহিত্যিক ও জীবনগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অসাম্প্রদায়িক। মুসলমান লেখক-কবিদের উৎসাহিত করা ও তাঁদের রচিত গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য কলিকাতায় 'মখদুমী লাইব্রেরী' ও 'এম্পায়ার বুক হাউস' প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলিকাতা মহানগরীতে 'বেকার হোস্টেল', 'টেলর হোস্টেল', 'কারমাইকেল হোস্টেল' ও 'মোসলেম ইনস্টিটিউট'সহ 'আহছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা তাঁর কীর্তির অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ। শিক্ষা বিভাগের সার্বিক উন্নয়নে নানা ধরনের প্রগতিশীল পদক্ষেপের জন্য তাঁকে 'খান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য', 'History of the Muslim World', 'আল ইসলাম', 'শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমান', 'ইসলাম রবি হযরত মোহাম্মদ (স.)', 'তরিকত শিক্ষা', 'আমার জীবনধারা', 'ছুফি ও সৃষ্টিতত্ত্ব' ইত্যাদি। তিনি নানা বিষয়ে মোট ৭৭টি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ ১৯৬৫ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি নলতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন [১৯০১—১৯৮১]

প্রধানত শিশুসাহিত্যিক। তিনি ১৯০১ সালের ৩০শে অক্টোবর বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার চারিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করার আগেই মাতৃহারা হন। তাঁর পিতাও ছিলেন চিররুগ্‌ণ। ফলে অসুস্থ পিতা ও তাঁর দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য করার জন্য কিশোর মঈনুদ্দীন লেখাপড়ার সাথে সাথে অর্থোপার্জনে প্রয়াসী হন। তিনি দিনের বেলা শ্রমিকের

www.pathagar.com

কাজ শেষে রাতের বেলা নৈশ বিদ্যালয়ে পাঠানুশীলন চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে কলিকাতা করপোরেশন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে তিনি ১৯৩২ সালে শিক্ষকতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্রায় ২০ বছর

যাবৎ কলিকাতা কর্পোরেশন ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি নিজস্ব উদ্যোগ ও মালিকানায় প্রতিষ্ঠা করেন 'আলহামরা লাইব্রেরী' নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। এই প্রকাশনালয় থেকেই তিনি প্রথমত প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক লিখে একাদিক্রমে প্রকাশ করতে থাকেন। খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনের সাহিত্যিক জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশু-কিশোরদের নির্মল চরিত্র গঠনে সহায়ক সাহিত্য সৃষ্টি। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'আমাদের নবী' (১৯৪১), 'লাল মোরগ' (১৯৬১), 'বাবা আদম' (১৯৫৮), 'ডাঃ শফীকের মোটর বোট' (১৯৪৯), 'খুলাফা-ই-রাশেদীন' (১৯৫১), 'আরব্য রজনী' (১৯৫৭), 'স্বপন দেখি' (১৯৫৯) ও 'শাপলা ফুল' (১৯৬২)। এ ছাড়া বড়দের উপযোগী সাহিত্যও তিনি রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'নয়া সড়ক' (১৯৬৭), কবিতাগ্রন্থ 'হে মানুষ' (১৯৫৮), 'মুসলিম বীরাঙ্গনা', 'পালের নাও', 'আর্তনাদ' এবং জীবনীগ্রন্থ 'যুগস্রষ্টা নজরুল' ইত্যাদি।

খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন ১৯৬০ সালে শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র), 'যুগস্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার এবং ১৯৭৮ সালে একুশে পদক (দ্র) লাভ করেন।

তিনি ১৯৮১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

খাপড়া ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ড রাজশাহী জেল হত্যাকাণ্ড দ্র

খালিদ বিন ওয়ালিদ [? — ৬৪১]

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ছিলেন এক জন বীর যোদ্ধা এবং মুসলিম সেনাপতি। তিনি মহানবী (স.)-এর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বস্ত সেনানায়ক হিসাবে বহু যুদ্ধে অসামান্য দক্ষতা ও সাহসের পরিচয় দেন। এমনকি পরবর্তী কালেও অনুরূপ পারদর্শিতায় মুসলিম বাহিনীকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করেন।

তাঁর জন্মতারিখ জানা যায় না। প্রকাশ, প্রথম জীবনে তিনি ইসলাম ধর্ম (দ্র) ও মুসলমানদের ঘোর শত্রু ছিলেন। এমনকি বদর যুদ্ধ (দ্র), উহুদ যুদ্ধ (দ্র) প্রভৃতি ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তিনি মুসলিম বাহিনীর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেছিলেন।

তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং অষ্টম হিজরিতে সর্বপ্রথম মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সেনানায়কের পদ অলঙ্কৃত করেন। এটা ছিল ঐতিহাসিক 'মুতা' যুদ্ধের শেষের দিকের ঘটনা। বস্তুত খালিদের নেতৃত্বেই পরবর্তী কালে মুসলিম বাহিনী তাদের অগ্রযাত্রায় সাফল্য অর্জন করতে থাকে।

মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

খালেদা এদিব হানুম হালেদা এদিব হানুম দ্র

খাসিয়া

বাংলাদেশের (দ্র) বৃহত্তর সিলেট (দ্র) জেলা ও আসামে এই জনগোষ্ঠী বাস করে। সিলেটের খাসিয়ারা সিনতেং বা প্নার (Synteng বা Pnur) গোত্রভুক্ত উপজাতি। মতান্তরে তারা ওয়ার (War) গোত্রভুক্ত। মানবজাতির বিভাগ অনুযায়ী তারা মঙ্গোলীয়। তাদের গায়ের রঙ হলুদাভ, চোখ ছোট ও টানা, গালের হাড় উঁচু। তারা মাথায় উঁচু করে চূড়াবাঁধা পাগড়ি পরে। তারা কৃষিজীবী। ভাত ও মাছ তাদের প্রধান খাদ্য। তারা লাঙ্গলের বদলে কোদাল দিয়ে পাহাড়ের গায়ে চাষ করে, কোথাও কোথাও আগুন দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে 'জুম'(দ্র) প্রথায় চাষ করে। চাল ও বজরা থেকে প্রস্তুত মদ ছাড়া তাদের কোনো অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ হয় না। তাদের

www.pathagar.com

খাসিয়া কিশোরী

মধ্যে কাঁচা সুপারি ও পান খাওয়ার প্রচলন খুব বেশি। তারা বাঁশ ও বেত দিয়ে ঘর তৈরি করে। ঘরের মাঝখানে থাকে চুলা।

খাসিয়াদের সম্পত্তির মালিক মেয়েরা। তাদের বংশ-পরিচয় হয় মেয়েদের দিক থেকে। সম্পত্তি রক্ষা ও পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব মেয়েদের। বৈষয়িক ব্যাপারে মামার মতামত অগ্রগণ্য। সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ, বিয়ের পর স্ত্রীর বাড়িতে স্বামী চলে আসে। তাদের সমাজে সর্প দেবতার পূজা প্রচলিত। তারা পিতৃপুরুষ, ভূতপ্রেত ও নানা রকম দেবদেবীর পূজা করে, মৃতদেহ পোড়ায় ও পরে হাড় সংগ্রহ করে আলাদা জায়গায় মাটিতে পুঁতে ফেলে। আসামের শিলং খাসিয়াদের অঞ্চল। ভারতে এই রাজ্যের নাম মেঘালয়। বর্তমানে তাদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীই বেশি। শিক্ষার হারও সেখানে খুব বেশি। ভাষা অস্ট্রিক বর্গের মোন্‌-খ্‌মের উপশাখার অন্তর্গত। আগে লিখিত কোনো ভাষা ছিল না। ব্রিটিশ শাসনকালে রোমান হরফে খাসিয়া ভাষা লিখিত হত। চা-বাগানের কাজ ছাড়াও তারা পান (দ্র), কমলালেবু (দ্র), মাছ (দ্র) প্রভৃতির ব্যবসা করে।

বি. ব.

খিলাফত আন্দোলন [১৯১৯—১৯২৪]

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন। ভারতের (দ্র) মুসলমানগণ তুরস্কের (দ্র) সুলতানকে সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা বলে মনে করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (দ্র) ভারতের মুসলমানেরা ব্রিটিশকে এই শর্তে সমর্থন দিয়েছিল যে ব্রিটিশেরা তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ও জার্মানি মিত্রশক্তির নিকট পরাজিত হলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পবিত্র মক্কা (দ্র) ও মদিনা (দ্র) খ্রিস্টানদের করতলগত হবার আশঙ্কায় ভারতের মুসলমানগণ ১৯১৯ সালের ৭ই অক্টোবর খিলাফত দিবস পালন করে। মিত্রশক্তি অপমানজনক স্যাভার্সের সন্ধিচুক্তি (Treaty of Sèvres) দ্বারা তুরস্ককে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত করে। ফলে খিলাফত রক্ষাকল্পে ভারতীয় মুসলমানগণ দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। মওলানা মুহম্মদ আলী (দ্র) ও মওলানা শওকত আলী (দ্র) এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। মহাত্মা গান্ধীও (দ্র) খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করেন।

কিন্তু নব্য তুরস্কের নেতা কামাল আতাতুর্কের (দ্র) আবির্ভাবের ফলে সেখানে নব জাগরণের সূচনা হয়। তুর্কী প্রজাতন্ত্র খলিফা-পদের বিলুপ্তি ঘোষণা করলে ভারতে খিলাফত আন্দোলনের যৌক্তিকতা হারিয়ে যায় এবং এর অবসান ঘটে।

খু. জা.

খুত্‌বা

আভিধানিক অর্থ বক্তৃতা, ভাষণ। ইসলামী পরিভাষায় খুত্‌বা হচ্ছে ধর্মীয় উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা।

খুত্‌বার অর্থ ধর্মীয় উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা বা ভাষণ হলেও আমাদের দেশে জুম্মার (দ্র) ফরয্‌ নামাযের আগে এবং দুই ঈদের জামাতের পর খুত্‌বা পাঠ করতে দেখা যায়। বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার নামায (দ্র) শেষেও খুত্‌বা পড়া হয়। অন্যান্য সময়ের ধর্মীয় বক্তৃতাকে সাধারণত 'ওয়াজ' নামে অভিহিত করা হয়।

www.pathagar.com

কুরআন-হাদিসের আলোকে খুত্বার ভাষণ প্রস্তুত করা হয়। খুত্বার মধ্যে স্থানীয় বা জাতীয় সমস্যাদিও আলোচিত হতে পারে।

মু. মা.

খুদা-ই-খিদ্‌মতগার গফ্‌ফার খান, খান আবদুল দ্র

খুলনা

জেলা, শহর ও বিভাগের নাম। এই বিভাগ পুরানো বৃহত্তর জেলাসমূহ অর্থাৎ খুলনা ও কুষ্টিয়া নিয়ে গঠিত। বর্তমানে এই বিভাগের অধীনে নবগঠিত জেলার সংখ্যা ১০টি। জেলাগুলো হল কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট। খুলনা শহর ২৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। শহরের লোকসংখ্যা ৬,০১,০০০ (১৯৯১)। জেলার শিক্ষার হার ৩৪. ৬৩।

খুলনা বিভাগ গঙ্গা বা পদ্মার ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত। এর দক্ষিণে সুন্দরবন (দ্র) এবং তারপর বঙ্গোপসাগর (দ্র)। বৃহত্তর খুলনা জেলার প্রধান নদী রূপসা, ইছামতী, মধুমতী, ভৈরব, পসুর ও মাথাভাঙ্গা। নদীগুলো সুন্দরবন হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। এই জেলা খান জাহান আলী (দ্র) ও প্রতাপাদিত্যের (দ্র) স্মৃতিবিজড়িত। এর ভূমি সমতল, পলিমাটিযুক্ত ও উর্বর। এখানে ধান, পাট, নারকেল, সুপারি ও তামাক প্রচুর জন্মে। সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগরে মৎস্যশিকার হয়। এখানে চিংড়ি চাষও লাভজনক ব্যবসা। জাহাজ মেরামতের কারখানা, আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর মংলা, নিউজপ্রিন্ট কারখানা, বস্ত্র ও পাটশিল্পের জন্য এই নগরী বিখ্যাত।

খুলনা শহরের পূর্বে তালিবপুরে খুল্লনেশ্বরী দেবীর মন্দির ছিল। সম্ভবত তা থেকেই খুলনা নামের উৎপত্তি। ইংরেজ আমলে নীল ও চিনি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ১৮৪২ সালে খুলনা মহকুমা গঠিত হয়। খুলনাই তৎকালীন বঙ্গদেশের প্রথম মহকুমা। এখানে ইংরেজদের নীলকুঠি ছিল। এ সময় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দ্র) খুলনা মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি নীলকর মোরেল ও তাঁর দলবলকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এই জেলার প্রধান

সুন্দরী গাছের বন – সুন্দরবন

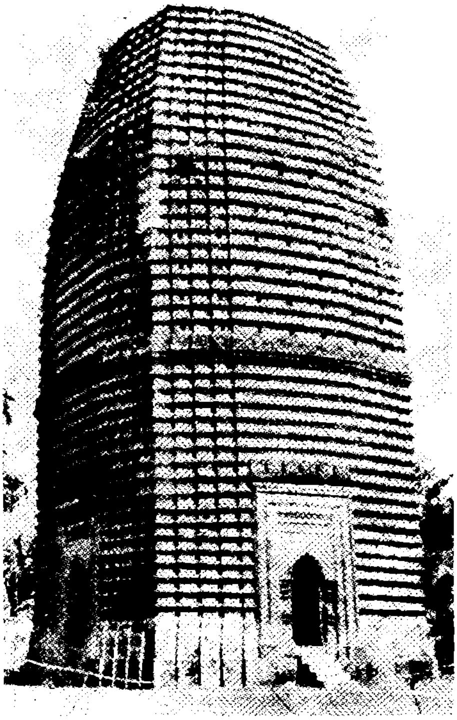

কোদলা মঠ, খুলনা

দ্রষ্টব্য স্থান ও বস্তু—ঈশ্বরীপুরে যশোরেশ্বরীর মূর্তি, ভরতভয়নায় বৌদ্ধস্তূপ, বাগেরহাটের নিকট শিববাড়ির শিবমূর্তি (আসলে তা বৌদ্ধমূর্তি), বাগেরহাটের খান জাহান আলীর ষাটগম্বুজ মসজিদ (দ্র), ধূমঘাটের টেঙ্গা মসজিদ ও ত্রিকোণ মন্দির এবং রাজা প্রজাপাদিত্যের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ, সুন্দরবনের ভিতরে সেকের টেকের মন্দির, বাগেরহাটের কোদলার মঠ, সর্বোপরি সুন্দরবন ও তার

www.pathagar.com

জীবজন্তু (রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ ইত্যাদি)।

খুলনা শহর রূপসার তীরে অবস্থিত শিল্পনগরী। দেশের ব্রডগেজ রেলওয়ের দক্ষিণের শেষ সীমায় এই শহর। নদীর অপর দিকে রূপসা থেকে মিটার গেজ রেলপথ বাগেরহাট পর্যন্ত প্রসারিত (পৌনে ২০ মাইল)। অদূরে মংলা বন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নগরীর উন্নয়ন পরিচালনা করেন। ১৮৮৬ সালে খুলনা জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯৯১ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) স্থাপিত হয়। খুলনা নদীবন্দর থেকে নদীপথে বরিশাল (দ্র), চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঢাকায় যাওয়ার জন্য স্টিমারসার্ভিস রয়েছে। এ ছাড়া স্টিমারযোগে চট্টগ্রামেও যাওয়া যায়। খুলনা বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শিল্পনগরী। খুলনার দক্ষিণে সুন্দরবনের আয়তন ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রায় ৬০০১ বর্গ কিমি (বা ২৩১৭ বর্গ মাইল)।

বি. ব.

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

খুলনা শহর থেকে ১৮–২০ কিলোমিটার দূরে সাতক্ষীরা রোডে গল্লামারিতে অবস্থিত। ১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়েছে। আরবান অ্যাণ্ড রুরাল প্ল্যানিং (Urban and Rural Planning), কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (Computer Science and Engineering), আর্কিটেকচার (Architecture), ফরেস্ট্রি অ্যাণ্ড উড্ টেকনোলজি (Forestry and Wood Technology), মেরিন বায়োলজি (Marine Biology), ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড বিজনেস অ্যাডমিনিসট্রেশন (Management and Business Administration)—এই ছ'টি বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রিতে পাঠদানের প্রাথমিক পরিকল্পনা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়।

মে. খা.

খুলাফা-ই-রাশিদীন

'খুলাফা-ই-রাশিদীন' অর্থ সত্যপথের অনুগামী খলিফাবৃন্দ। সাধারণ অর্থে মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র) এর ইন্তেকালের পর তাঁরই আদর্শ ও শিক্ষা সমুন্নত রেখে যে চার জন খলিফা বা প্রতিনিধি মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দেন, তাঁদেরকে বলা হয় খুলাফা-ই-রাশিদীন।

খুলাফা-ই-রাশিদীন উপাধিপ্রাপ্ত খলিফাগণের নাম হচ্ছে হযরত আবুবকর (রা.) (দ্র), হযরত উমর (রা.) (দ্র), হযরত উসমান (রা.) (দ্র) ও হযরত আলী (রা.) (দ্র)।

মু. মা.

খেজুর

দীর্ঘজীবী শাখাহীন গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম *ফিনিক্স সিলভেস্ট্রিস (Phoenix sylvestris)*। গোত্র পালমী (Palmae)। এই গাছটিই আমাদের দেশে সবখানে দেখা যায়। ৩০–৩৫ ফুটের মতো উঁচু হয়। দীর্ঘ শাখাহীন কাণ্ডের মাথায় পত্রমুকুট থাকে এবং কাণ্ডটি পত্রমূল দ্বারা আবৃত থাকে। পাতাগুলো পক্ষল ও পত্রদণ্ড প্রায় ৭–৮ ফুট লম্বা হয়। দণ্ড থেকে দু'দিকে পাতা বের হয়, আগা কাঁটায় পরিণত হয়। পত্রদণ্ডের গোড়ার দিকে পাতা না হয়ে কাঁটা হয়। খেজুর গাছে পুং ও স্ত্রী পুষ্প পৃথক পৃথক গাছে জন্মায়। ফুল ছোট ও সাদা রঙের। ফল হয় কমলা রঙের, মাংস তেমন থাকে না, বীজ খুব শক্ত হয়। যশোর ও উত্তরবঙ্গে বেশি খেজুর গাছ জন্মে। শীতের আগে গাছের মাথার কাছে কাণ্ডের কিছু অংশ চেঁছে রস সংগ্রহ করা হয়। এই রস সুস্বাদু, সুপেয়। এতে শতকরা ১৪ ভাগ শর্করা ও প্রচুর ভিটামিন থাকে। এই রস কাঁচা খাওয়া যায়। আবার অল্প জাল দিয়ে সামান্য ঘন করে খেতে আরো বেশি সুস্বাদু। রস জাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হয়। রস গাঁজিয়ে 'তাড়ি' নামে মাদক পানীয় তৈরি করা হয়।

আদিকাল থেকে আরব ও পশ্চিম এশিয়ায় খেজুর অন্যতম প্রধান খাদ্য। দক্ষিণ ইরাক, মদিনা (দ্র)-র আশেপাশের মরূদ্যান ও উর্বর অঞ্চল এবং দক্ষিণ আরবের উপকূলীয় এলাকায় শতাধিক রকম খেজুর জন্মে। উন্নত জাতের খেজুরের নামও খুব সুন্দর—সুগন্ধির মাতা, কনের আঙুল, সতী কন্যা, লাল চিনি ইত্যাদি। ইরাক, আরব, ইরান উন্নত জাতের খেজুরের জন্য প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ ইরাক

www.pathagar.com

খেজুর গাছের মাথা ও খেজুর ফল

পৃথিবীর (দ্র) বৃহত্তম খেজুর উৎপাদনকারী এলাকা। আমেরিকা (দ্র) যুক্তরাষ্ট্রেও ভালো খেজুর হয়। সেপ্টেম্বর মাসে খেজুর আহরণ শুরু হয়। পাকা খেজুরের রঙ লাল, অল্প পাকা বা কাঁচা খেজুরের রঙ হয় হলদে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *ফিনিক্স ডেক্টাইলিফেরা (Phoenix dactylifera),* গোত্র পালমী। একে বাংলায় পিণ্ড খেজুর বলে।

খেজুরের গাছ থেকে দোলনা, চাঙ্গাড়ি, হাল্কা নৌকা হয়। পাতা থেকে ঝুড়ি, পাখা এবং গুঁড়ি থেকে ঘর ও খাল-নালার পুল হয়। খেজুর গুঁড়ি আবার খুঁটির কাজেও লাগে। পাকা খেজুরে শতকরা ৫০ ভাগ শর্করা, অল্প পরিমাণ প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ ও অজৈব লবন থাকে।

মহেনজোদারোর (দ্র) ধ্বংস্তূপে প্রাপ্ত প্রচুর খেজুরের বীজ থেকে মনে হয় যে খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার অব্দেও সিন্ধু দেশের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর।

বি. ব.

খেয়াল

রাগসঙ্গীতের চার প্রধান রীতির একটি। বাকি তিনটি হচ্ছে ধ্রুপদ (দ্র), টপ্পা (দ্র) ও ঠুমরি (দ্র)। গুরুত্বের দিক থেকে ধ্রুপদের পরেই খেয়ালের স্থান। কল্পনা বা পরিবেশনের স্বাধীনতা অর্থে খেয়াল বা খয়াল কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই সঙ্গীতরীতি ধ্রুপদের চেয়ে লঘু এবং এর নিয়মকানুন ধ্রুপদের চেয়ে শিথিল। প্রাচীন সঙ্গীতরীতির কোনো না কোনো একটির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় পণ্ডিতগণ মনে করেন যে খেয়াল সঙ্গীতরীতিটি সেই সব প্রাচীন গানেরই কোনো একটির বিবর্তিত রূপ। প্রাচীন কৈবাড়, একতালী, রাসক, আক্ষিপ্তিকা বা রূপক গানের কোনো না কোনো একটির বিবর্তিত রূপই খেয়াল—পণ্ডিতগণ এমন ধারণা পোষণ করেছেন। খেয়ালের এই ধরনের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সবাই নিঃসংশয় নন। আধুনিক কালে বরং এমন ধারণাই প্রামাণ্য বলে বিবেচিত যে কাওয়ালি গানের ধারা থেকে খেয়ালের উৎপত্তি। দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কাওয়াল নামে এক যাযাবর গায়ক সম্প্রদায় বাস করত। তারা যে ভক্তিমূলক গান গেয়ে বেড়াত তার নাম কাওয়ালি। স্বনামধন্য আমীর খসরু (দ্র) কাওয়ালি গানের সংস্কার করে খেয়াল সঙ্গীতরীতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ হিসাবে আমীর খসরু খেয়াল সঙ্গীতরীতির জনক। মনে করা হয় যে খেয়াল বা খয়াল নামটি হয় তাঁর দেওয়া, না হয় তাঁর কোনো শিষ্যের দেওয়া। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শর্কি খেয়াল প্রবর্তন করেন বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেন। তবে এ ব্যাপারে অধিকতর প্রচলিত মত হচ্ছে শর্কি খেয়াল সঙ্গীতকলা সৃষ্টি করেন নি, তিনি আমীর খসরু প্রবর্তিত রীতির সংস্কার করেছিলেন। খসরুর সঙ্গীতরূপটি ছিল মধ্য বা দ্রুত লয়সম্পন্ন। শর্কি তাতে বিলম্বিত লয় প্রযুক্ত করেন।

সেটি ছিল ধ্রুপদ সঙ্গীতের যুগ। রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা ছিল ধ্রুপদের প্রতি। মিঞা তানসেন (দ্র) ও তাঁর বংশধরগণ ছিলেন ধ্রুপদী। ফলে খেয়াল সঙ্গীতরীতির বিকাশ ঘটলেও তেমন বিস্তার ঘটতে পারে নি সে যুগে। এই রীতিটিকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে প্রবলভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌র সভাগায়ক নিয়ামত খাঁ। তাঁর রচিত গানে তিনি সদারঙ্গ নামে ভণিতা করতেন বলে নিয়ামত খাঁ 'সদারঙ্গ' নামে খ্যাত হন। সদারঙ্গ ছিলেন তানসেনের কন্যাবংশীয় সঙ্গীতগুণী। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা ও উচ্চমানের গায়ক। স্বয়ং বহু সংখ্যক

www.pathagar.com

খেয়াল গান রচনা করে, গেয়ে ও যথেষ্ট সংখ্যক শিষ্য তৈরি করে তিনি আধুনিক খেয়াল সঙ্গীতরীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এখনকার খেয়াল গান ও পরিবেশনপদ্ধতি ঐতিহাসিকভাবে সদারঙ্গের সঙ্গীতপদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত। সদারঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্র অদারঙ্গও পিতার প্রবর্তিত সঙ্গীতরীতির বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

আমীর খসরুর আমল থেকে যে গায়ক-বংশক্রমে খেয়াল সঙ্গীতের বিকাশ হয় তাকে কাওয়াল ঘরানা বলা হয়। সদারঙ্গের শিষ্যক্রমে যেসব ঘরানায় খেয়ালের বিকাশ হয় সেগুলো হচ্ছে লখনৌ ঘরানা, গোয়ালিয়র ঘরানা, দিল্লি ঘরানা ও জয়পুর ঘরানা। কালে সকল ঘরানাতেই খেয়াল সঙ্গীত গীত হতে থাকে।

ধ্রুপদ সঙ্গীতে চারটি তুক্ থাকে, খেয়ালে তুক্ দুটি : স্থায়ী (দ্র) ও অন্তরা (দ্র)। ধ্রুপদে অলঙ্কার প্রয়োগের সুযোগ সীমিত, কিন্তু খেয়ালে সকল শ্রেণীর সঙ্গীত-অলঙ্কারই ব্যবহার করা চলে। রাগসঙ্গীতের শাখাসমূহের মধ্যে খেয়ালই সর্বাপেক্ষা প্রচলিত।

ক. গো.

খেলাঘর শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

খেলাপড়া শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

খোদাই শিল্প [engraving]

খোদাই শিল্প হচ্ছে ছাপাইছবি বা ছাপচিত্রের প্রধান একটি শাখা। আর ছাপচিত্র বলতে বোঝানো হয় ছাপ দিয়ে তোলা ছবি। কোনো কিছুতে কালি লাগিয়ে তা অপর একটি সমতল কাগজ জাতীয় কিছুর ওপর বিশেষ পদ্ধতিতে চেপে ধরলে উল্টো ছাপ পড়ে— এভাবে একটি ছবির সৃষ্টি হতে পারে, আর এটাই ছাপাইছবি।

কাঠে বা কোনো ধাতব পাতে খোদাই করে মূল কর্মটি সম্পাদন করতে হয়। সাধারণভাবে কাঠখোদাই বলতে যা বোঝা যায় তাকে ইংরেজিতে বলা হয় wood cut —কিন্তু যখন বলা হচ্ছে 'এনগ্রেভিং' অর্থে খোদাই শিল্প, তখন বুঝতে হবে— তা আরো খানিকটা সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে খোদাই করা; এর জন্য নির্ধারিত বুনি-যন্ত্রও রয়েছে।

এই ধারার চিত্রশিল্পের প্রচলন শিল্পকলার ইতিহাসের প্রায় গোড়া থেকেই। বর্তমানেও রয়েছে। তবে নানাভাবে তা বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। প্রধান শাখাগুলি হচ্ছে: ১. রিলিফ, ২. ইন্ট্যাগ্‌লিও, ও ৩. সার্ফেস পেইন্টিং।

ম. আ.

খোমেনী, ইমাম [১৯০১—১৯৮৯]

আধুনিক ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান (The Islamic Republic of Iran)-এর স্থপতি ইমাম খোমেনী (Imam Khomeini) ১৯০১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর (১৩২০ হিজরির ২০শে জমাদিউস সানি) ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে খোমেইন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। খোমেইন শহরে জন্মেছিলেন বলে তিনি খোমেইনী বা খোমেনী নামে পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম রুহুল্লাহ এবং পরবর্তী কালের নাম আয়াতুল্লাহ আল-মুসাভী আল-খোমেনী। তাঁর পিতার নাম আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুস্তফা মুসাভী এবং মাতার নাম হাজার।

ছয় ভাই-বোনের মধ্যে রুহুল্লাহ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর শিক্ষায় হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর বড় ভাই আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুর্তজা পসন্দিদাহ্‌র নিকট। স্থানীয় মক্তবের লেখাপড়া-শেষে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য প্রথমে আরাক এবং পরে ধর্মতত্ত্বের বিখ্যাত কেন্দ্র কোম নগরীতে যান। ১৯২৭ সালের মধ্যে তিনি ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার সর্বোচ্চ ধাপ শেষ করেন। তিনি আরবি সাহিত্য, দর্শন, তফসির, হাদিস (দ্র), আইনশাস্ত্র, রহস্যবিজ্ঞান (Gnostic Science), ইরফান (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং সুপণ্ডিতরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। আয়াতুল্লাহ হায়েরি, আয়াতুল্লাহ বুরুজার্দি, আয়াতুল্লাহ তাবাতাবাঈ প্রমুখ শিক্ষক তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। ১৯৬১ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানের প্রধান আয়াতুল্লাহ হন।

www.pathagar.com

ইমাম খোমেনী যেমন ছিলেন সফল রাষ্ট্রনায়ক, তেমনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর কবি, সাহিত্যিক, বক্তা ও দার্শনিক। তাঁর রচিত ছোটবড় ৮২টি পুস্তক-পুস্তিকা তাঁর সাহিত্যকীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে। এ ছাড়া তিনি আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করেছেন ৩০০টিরও বেশি। তাঁর কিছু কবিতা বাংলা ভাষা (দ্র)-তেও অনূদিত হয়েছে 'ইমাম খোমেনীর কবিতা' নামে।

ইরানের শাহের বিরুদ্ধাচরণ করায় ১৯৬৩ সালে ইমাম খোমেনীকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। তিনি প্রথমে তুরস্কে (দ্র) এবং পরে ইরাকে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। শাহের সঙ্গে ইরাক সরকারের সহযোগিতার কারণে তিনি ১৯৭৮ সালের ৩রা অক্টোবর ইরাক থেকেও বহিষ্কৃত হন। তখন তিনি ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিদেশে নির্বাসনে থাকলেও স্বদেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। ইমাম খোমেনীর ডাকে এবং নেতৃত্বে ইরানের মানুষ মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে রেজা শাহ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ইমাম খোমেনী ১৯৭৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং ইরানে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন।

১৯৮৯ সালের ৪ঠা জুন ইমাম খোমেনী ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি ৪০ বছরেরও অধিক কাল কোমের যায়জিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। এ সময়েই তাঁর হাতে অনেক যোগ্য ছাত্র তৈরি হয় এবং তাঁরাই ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বর্তমানে তাঁরাই দেশ পরিচালনা করছেন।

শা. হ.

খোল

চর্মাচ্ছাদিত তালবাদ্য। অতি প্রাচীন যন্ত্র (দ্র)। খোলের আকার অনেকটা ঢোলের মতো, তবে এর মধ্যভাগ স্ফীত ও দুই পাশ ঢালু। এর বাম দিকের মুখের চেয়ে ডান দিকের মুখ ছোট। বাম দিকের মুখের আওয়াজ মৃদু ও গম্ভীর, অনেকটা তবলার বাঁয়ার মতো। ডান দিকের মুখের আওয়াজ চড়া ও

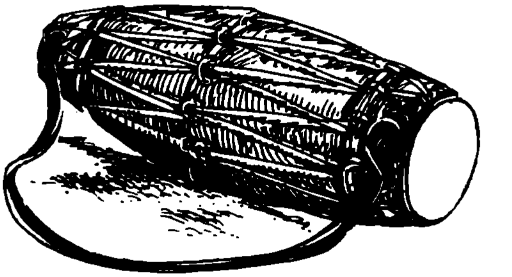

তীব্র, অনেকটা তবলার (দ্র) ডাইনার মতো। খোলের দুই মুখের ছাউনিতেই খরলি থাকে। দুই পাশের চাকই দোয়ালির সাহায্যে টান করা থাকে। তবলার মতো এতে কোনো গুলি থাকে না। ফিতা দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে খোল বাজানো হয়। বসে বাজালে খোলটি কোলে করে বাজাতে হয়। কীর্তনের আবশ্যিক তালবাদ্য হচ্ছে খোল। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও (দ্র) খোলের ব্যাপক ব্যবহার হয়। মণিপুরের গীত-নৃত্যে খোলের ব্যবহার অতি ব্যাপক। খোলের অবয়ব মৃত্তিকায় তৈরি বলে একে মৃদঙ্গ বলা হয়ে থাকে। একে শ্রীখোল বলতেও দেখা যায়। ঝা, খি, ঝিন, দিগি, দাখি, নেতা, খেটা, গুরুগুরু, কুরু কুরু, খি, গে, দা, জা, তৎ প্রভৃতি বর্ণের সাহায্যে খোল বাজানো হয়ে থাকে।

ক. গো.

খ্রিস্টধর্ম

যিশুখ্রিস্টের (দ্র) জীবন, বাণী ও শিক্ষাকে কেন্দ্র করে যে ধর্ম গড়ে উঠেছে, তাকেই বলা হয় খ্রিস্টধর্ম। এই ধর্মের অনুসারীরা খ্রিস্টান নামে পরিচিত। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র।

যিশুর জন্ম একটি ইহুদি পরিবারে। জন্মের পর তাঁকে নিয়ে তাঁর পরিবার মিশরে পালিয়ে যান। কারণ রাজার হুকুমে তখন ইহুদি শিশুদের মেরে ফেলা হচ্ছিল। ত্রিশ বছর পর যিশু দেশে ফিরে এসে নতুন ধর্ম প্রচার শুরু করেন।

যিশুখ্রিস্ট ঘোষণা করেন : "ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বর সবাইকে ভালবাসেন। তাঁকে তোমরা মানতে শেখ। মানুষকে ভালবাস। দয়ালু, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল হও। ইহুদি ধর্মের দোষক্রটিগুলো দূর কর।"

www.pathagar.com

যিশুখ্রিস্ট শিশুদের সঙ্গে

যিশুখ্রিস্টের বাণী ইহুদিদের মনে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে একটি কাঠের ক্রুশে গেঁথে যিশুকে হত্যা করা হয়। তখন যিশুখ্রিস্টের বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর। যিশুর অবর্তমানে তাঁর বারো জন শিষ্য ধর্মপ্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ধীরে ধীরে পৃথিবীর (দ্র) নানা দেশে খ্রিস্টধর্ম বিস্তার লাভ করে।

খ্রিস্টধর্মের মূলকথা হল : ঈশ্বর এবং যিশুখ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস আনতে হবে। মানুষের মঙ্গলবার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন যিশুখ্রিস্ট। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাই শান্তির উপায়।

বর্তমানে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক খ্রিস্টান। প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এই ধর্মের প্রভাব বেশি। খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রধান তিনটি ভাগ রয়েছে—রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট এবং ইস্টার্ন চার্চ।

খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থের নাম বাইবেল (দ্র) এবং উপাসনালয়ের নাম চার্চ বা গির্জা (দ্র)। বাইবেলের প্রথম অংশ লেখা হয়েছে হিব্রু ভাষায়। এই অংশকে ইংরেজিতে বলে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'। আর 'নিউ টেস্টামেন্ট' হল দ্বিতীয় অংশ; লিখিত হয়েছিল গ্রিক ভাষায়। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ রয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের খ্রিস্টানেরা উপাসনার সময়ে তাঁদের মাতৃভাষাতেই বাইবেল পাঠ করেন ও প্রার্থনা করেন।

টি. কি.

খ্রিস্টাব্দ অব্দ দ্র

গ

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬৭—১৯৩৮]

চিত্রকর। ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের (দ্র) মেজ কাকার নাতি, অর্থাৎ সম্পর্কে কবিগুরুর ভাইপো। জন্ম কলিকাতার (দ্র) বিখ্যাত জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে ১৮৬৭ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ছাত্রজীবন-শেষে বিখ্যাত চিত্রকর হরিনারায়ণ বন্দ্যোপধ্যায়ের কাছে তিনি চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেন।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পীজীবনের প্রাথমিক পর্যায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এই সময় তাঁর ওপর জাপানি শিল্পী ইওকোহামা তাইকানের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ছবিতে কালি ও তুলির কাজে তিনি ভারতীয় চিত্রশিল্পে পথিকৃতের মর্যাদার অধিকারী। এদেশে ফরাসি শিল্পভাষা ও রীতি প্রবর্তন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা পুরোগামীর।

ব্যঙ্গচিত্রকর হিসাবে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তাঁর সমকালের বেশ কয়েক জন মনীষী—ব্যক্তিত্বকে নিয়ে অঙ্কিত তাঁর ব্যঙ্গচিত্রসমূহ বর্তমানে ইতিহাসের উপাদান।

বেশ কিছু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেছিলেন তিনি, সেগুলো এ দেশের শিল্প—সংস্কৃতির বিকাশে প্রভূত অবদান রেখেছে। ১৯১৬ সালে বাংলার কারুশিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তিনি স্থাপন করেন

www.pathagar.com

গগন ঠাকুরের আঁকা একটি চিত্র

'বেঙ্গল হোম ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন' এবং এর অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হন। এর আগে ১৯০৭ সালে তিনি গঠন করেন 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর ওরিয়েন্টাল আর্ট'। এই সংগঠনটির তিনি সম্পাদক ছিলেন।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যপট রচনার ক্ষেত্রেও অভিনবত্বের স্বাক্ষর রাখেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন।

১৯০৫ সালে যে স্বদেশী আন্দোলনের (দ্র) সূচনা হয়, তার সঙ্গেও তিনি গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'ভোঁদড় বাহাদুর' বাংলা শিশুসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ রূপে পরিগণিত।

এই পথিকৃৎ বাঙালি চিত্রকরের শিল্পকর্ম ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন হলেও শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন নি বলে, তাঁর কোনো অনুগামী বা অনুসারী নেই। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

গঙ্গা নদী

বাংলাদেশ-ভারত অঞ্চলের প্রধান নদী। ভারতের (দ্র) মধ্য-হিমালয়ের গাড়ওয়াল পার্বত্য অঞ্চলের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে গঙ্গার জন্ম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এখানকার উচ্চতা ৩,৯০০ মিটার। জায়গাটির নাম গোমুখ এবং তুষারে ঢাকা বলে শুকনো মরশুমে তুষারগলা পানি গঙ্গাকে পুষ্ট করে।

গঙ্গোত্রী থেকে ২৮ কিমি পর্যন্ত গঙ্গার পানি কর্দমময়। ঘরবাড়ি বা দোকানপাট এখানে কিছুই নেই। শুধু তীর্থযাত্রীদের পায়ে হাঁটার পথের নিশানা দেখা যায়। তারপর মন্দাকিনী ও অলকানন্দা নদী এসে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে দেবপ্রয়াগে। তারপর পাহাড়-পর্বত থেকে মুক্তি পেয়ে গঙ্গা হৃষিকেশ ও হরিদ্বারে এসে সমভূমিতে পড়েছে। এখানে গঙ্গা স্বচ্ছসলিলা। তারপর হরিদ্বার, এলাহাবাদ (দ্র), বারাণসী—এসব স্থানে গঙ্গার তীরে হিন্দুদের গঙ্গাস্নান-মেলা বসে। হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভমেলা পৃথিবীবিখ্যাত বৃহত্তম মেলা। এখান থেকে গঙ্গা অনেক শান্ত। এলাবাহাবাদে গঙ্গায় মিশিছে বড় নদী যমুনা (দ্র)। এখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী মিশে পবিত্র তীর্থস্থান ত্রিবেণী বা সঙ্গম নাম হয়েছে। গঙ্গার প্রধান উপনদী যমুনা।

গঙ্গাতীরে বারাণসী বা কাশী (দ্র) শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী। হিন্দুদের কাছে এই নগরী পবিত্রতম। শোনপুরের কাছে গঙ্গায় মিশেছে শোন নদী। গোমতী এসে মিশেছে লখ্নৌতে। এই নগরী মুসলিম সংস্কৃতির জন্য আরো বিখ্যাত। গণ্ডক নদী মিশেছে পাটনায়। পাটনার প্রাচীন নাম পাটলীপুত্র। মহামতি অশোকের (দ্র) রাজধানী ছিল এই নগরী।

রাজমহলের পাহাড়ের কাছে গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। এখানে প্রাচীন গৌড় (দ্র)। গৌড় এক সময় প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল। মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহীর (দ্র) কাছে মাথাভাঙ্গা নদী যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তারপর পাবনা জেলা পার হতেই গঙ্গায় (বা পদ্মায়) এসে মিশেছে যমুনা নদী। পাবনা ও কুষ্টিয়ার মাঝে এই নদীতে সারা সেতু বা হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (দ্র) রয়েছে। এর উত্তরকূলে পাকশি ও দক্ষিণ তীরে ভেড়ামারা শহর। গোয়ালন্দ থেকে গঙ্গা ও যমুনার মিলিত ধারা পদ্মা নামে চাঁদপুরে মেঘনার (দ্র) সঙ্গে মিশেছে। যমুনার মিলনস্থানে গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত গঙ্গার অংশকে ভৌগোলিকেরা পদ্মা (দ্র) নদী বলেন। তবে ঐতিহাসিকেরা বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর গঙ্গাকে পদ্মা নামে অভিহিত করতে চান।

www.pathagar.com

পদ্মা চাঁদপুরে মেঘনার সঙ্গে মিশে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে (দ্র) পড়েছে। গঙ্গার দৈর্ঘ্য ২,৪৬৫ কিমি। এই নদীর তীরে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম সভ্যতা প্রাচীন কাল থেকে গড়ে উঠেছে। হাজার হাজার বছর আগে মধ্য-এশিয়া থেকে আর্যরা এখানে এসে বসতি গড়ে তোলে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে গঙ্গার পানি ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে গঙ্গার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়েছে এবং পদ্মা নদীতে পানির প্রবাহ কমে যেতে শুরু করেছে। পদ্মায় চর পড়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গঙ্গা ও পদ্মা তাদের শাখানদী ও উপনদীগুলো নিয়ে একটা নদীগুচ্ছ বা সিস্টেম নদী। হিমালয় থেকে উৎপন্ন বলে একে হিমালয়জাত নদী বলে।

গঙ্গার ব-দ্বীপ অনেক বড়। বঙ্গোপসাগরের ৪৮০ কিমি দূর থেকে এই ব-দ্বীপের শুরু। পদ্মা গঙ্গার প্রধান ধারা। অন্য ধারা পশ্চিমবঙ্গের জাঙ্গীপুরের ৫ মাইল উত্তর-পূর্বে ভাগীরথী নামে এবং নিম্নভাগ হুগলি নামে কলিকাতার (দ্র) পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। গঙ্গা নদীর প্রচুর পলিমাটিতে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সৃষ্টি। এই বিশাল ব-দ্বীপের নিম্নাঞ্চলে সুন্দরবন (দ্র)। সুপ্রাচীন কাল থেকে গঙ্গাতীরের নগরীগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বাস। বহু ধর্ম ও সংস্কৃতি মিলেমিশে আছে বাঙালির মাঝে। সুপ্রাচীন কাল থেকে বাঙালি জাতি এখানে বাস করছে। পদ্মা-গঙ্গা দুই নামে বাঙালিরা একে ডাকে, ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। এর দুই তীরে প্রচুর ফসল হয় বলে জনবসতিও খুব ঘন। পৃথিবীর ঘনবসতি অঞ্চলের মধ্যে গঙ্গাতীর অন্যতম।

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী গঙ্গা স্বর্গের নদী। বহু সহস্র বছর আগে সগরবংশীয় রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথ তাঁর পূর্বপুরুষদের কল্যাণের জন্য তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। স্বর্গ থেকে প্রবল বেগে মর্ত্যে পতনের সময় মহাদেব গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণ করেন। জহ্নু মুনির তপস্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য ক্রুদ্ধ মুনি গঙ্গাকে পান করে ফেলেন। তখন ভগীরথ তপস্যা দ্বারা মুনিকে তুষ্ট করলে মুনি তাঁর জানু ভেদ করে গঙ্গাকে মুক্তি দেন। এ জন্য গঙ্গার আর এক নাম জহ্নুকন্যা বা জাহ্নবী। মর্ত্য থেকে সগরবংশ উদ্ধার করে গঙ্গা পাতালে চলে যায়। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবাহিত বলে গঙ্গার অপর নাম ত্রিপথগা। স্বর্গে গঙ্গার নাম মন্দাকিনী, মর্ত্যে গঙ্গা ও পাতালে ভোগবতী। ভগীরথই গঙ্গা এনে থাকুক বা স্বাভাবিক ভৌগোলিক প্রক্রিয়াতে তার উদ্ভব হয়ে থাকুক, গঙ্গা তার তীরবর্তী মানুষের প্রাণ। গঙ্গা এবং পদ্মা ছাড়া আমাদের চাষবাস সম্ভব নয়, জীবনধারণও অসম্ভব। তাই গঙ্গা ও পদ্মা অথবা এর সঙ্গে মিলিত নদী যমুনা এবং সবশেষে মেঘনা আমাদের কাছে খুব প্রিয় ও পবিত্র। আমাদের সকল নদীই তো আমাদের জীবন—এ জন্য প্রিয় ও পবিত্রতম।

বি. ব.

গঙ্গাফড়িং গাঙফড়িং দ্র

গঙ্গাযাত্রা

মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিকে গঙ্গার তীরে নিয়ে যাওয়া বোঝায়। গঙ্গাগর্ভে বা গঙ্গাতীরে মৃত্যু হলে মৃতের স্বর্গলাভ হয়— এই ধারণা থেকে গঙ্গাযাত্রার প্রচলন। এ জন্য মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে মুমূর্ষুর পা থেকে নাভি পর্যন্ত দেহ গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখা হত। এর নাম নাভিগঙ্গা।

মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে মনে হলে রোগীকে গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করা হত। এই উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীরে অবস্থানের জন্য বিত্তশালী ব্যক্তিরা আগে থেকেই ঘর তৈরি করে রাখতেন। কোনো কারণে গঙ্গাযাত্রীকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে হলে তা অমঙ্গলসূচক বলে মনে করা হত।

প্রাচীন যুগে অন্য জলাশয়েও গঙ্গাযাত্রার মতো অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল বলে ধারণা করা হয়। তার নাম ছিল অন্তর্জল বা অন্তর্জলি যাত্রা।

সুজ. ব.

গজকচ্ছপ

এটি মহাভারতের (দ্র) একটি আখ্যানাংশ। গজ ও কচ্ছপ পূর্বজন্মের বিবাদপরায়ণ অভিশপ্ত দুই ভাই। পরস্পরের অভিশাপে তাঁদের এক জন গজ ও অন্য জন কচ্ছপে পরিণত হন।

বিভাবসু নামে ক্রুদ্ধ স্বভাবের এক মহর্ষি ছিলেন।

www.pathagar.com

তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম ছিল মহাতপা সুপ্রতীক। সুপ্রতীক বড় ভাই বিভাবসুর সঙ্গে একত্রে বাস করতে অসম্মতি জানিয়ে ধন-সম্পদ ভাগ করে দিতে বললে বিভাবসু তাঁকে অভিশাপ দেন যে 'তুমি গজ বা হস্তী হও'। তখন সুপ্রতীকও বিভাবসুকে পাল্টা শাপ দেন যে 'তুমি কচ্ছপ হও'। তারপর তাঁরা গজ ও কচ্ছপে পরিণত হন এবং পূর্বশত্রুতাবশে পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। এক সরোবরে তাঁরা বহুকাল যুদ্ধরত ছিলেন। তাঁদের সেই রুদ্ররূপ ও আক্রমণ ভয়ঙ্কর এবং অমঙ্গলজনক। 'গজকচ্ছপের যুদ্ধ' কথাটি এই কাহিনী থেকেই এসেছে।

এদিকে অমৃত আহরণের জন্য গরুড় স্বর্গগমনকালে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে পিতা কশ্যপের নিকট আহার প্রার্থনা করেন। কশ্যপ তাঁকে নিকটস্থ সরোবরে যুদ্ধরত গজকচ্ছপকে ভোজন করতে বলেন। পিতার নির্দেশে গরুড় এক নখে গজকে ও অপর নখে কচ্ছপকে তুলে এনে জন-মানবহীন এক পর্বতশৃঙ্গে বসে ভোজন করেন।

সুজ. ব.

গজল

এক প্রকার লঘু রাগসঙ্গীত। ধ্রুপদ (দ্র), খেয়াল (দ্র), টপ্পা (দ্র) ও ঠুম্‌রির (দ্র) পরেই এর স্থান। গজল মূলত পারস্য-সঙ্গীত। বর্তমান ইরানের আগেকার নাম পারস্য। সেখানকার শ্রেষ্ঠ সাধক কবিরা এই গানের ধারাটি রচনা করেন। পারস্যে গজল আধ্যাত্মিক সঙ্গীত হিসাবে সমাদৃত। মুসলমানদের ভারতবিজয়ের পর পারস্যের সঙ্গীত-সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের (দ্র) সঙ্গীত-সংস্কৃতির গভীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তখন গজল ভারতীয় কাব্য ও সঙ্গীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। ভারতীয় সঙ্গীতের দু'টি ধারা— হিন্দুস্থানী সঙ্গীত (বা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত) এবং কর্ণাটকী সঙ্গীত (বা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত)। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুম্‌রির মতোই গজলও উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একটি ধারা। শুরুতে গজল উর্দুতে (দ্র) রচিত হয় ও উর্দু কাব্যসাহিত্য অবলম্বনেই এর বিকাশ ঘটে। দিল্লি ও লখ্‌নৌ গজলচর্চার দু'টি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। অতুলপ্রসাদ সেন (দ্র) সর্বপ্রথম বাংলায় কয়েকটি গজল রচনা করেন। তিনি লখ্‌নৌতে থাকতেন এবং গানের সংখ্যাও খুব কম বলে এ বিষয়ে তখন জানাজানি হয় নি। কার্যত কাজী নজরুল ইসলামই (দ্র) বাংলার গজলযুগের সূচনা করেন। অনেক সংখ্যক উৎকৃষ্ট গজল রচনা করে তিনি এই সঙ্গীতরীতিকে বাঙালিদের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন। নজরুলের পরে বাংলা গজলের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয় নি। তবে উর্দু গজলের ধারাটি এখনো সক্রিয় ও জনপ্রিয় রয়েছে।

গজল স্থায়ী (দ্র) ও অন্তরা (দ্র) এই তুকে বা স্তবকে রচিত হয়। গানে একাধিক অন্তরার সমাবেশ ঘটে এবং অন্তরাগুলো একই সুরে গাওয়া হয়। তালহীনভাবে সুরের সাহায্যে আবৃত্তি করে গাইবারও এক বা একাধিক স্তবক থাকে। এদের বলা হয় শেয়র্। গজল লঘু রাগসঙ্গীত হলেও এই সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গটি সুরাবৃত্তির ঢঙে গঠিত। এই ঢঙটি উর্দু গজলে এসেছে ফার্সি গজল থেকে। মির্জা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব (দ্র) উর্দু গজলের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা। ফার্সি গজলের ধারাটি নির্মাণ করেছিলেন রুমি (দ্র), হাফিজ (দ্র) প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য কবি।

ক. গো.

গজলক্ষ্মী

সৌন্দর্য, সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর একটি বিশেষ রূপ। 'লক্ষ্মী'র উল্লেখ শেষ পর্যায়ের বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া গেলেও দেবীর সঙ্গে গজের সম্পর্কের কোনো সূত্র পাওয়া যায় না। তবে এ সম্পর্কে অনুমান করা হয় যে প্রাচীন কালে গজ বা হস্তী শ্রী-সৌন্দর্য এবং উর্বরতার প্রতীক বলে গণ্য হত। বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীদের মধ্যে হস্তীকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। তাই এই প্রাণীর সঙ্গে সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর যোগসম্পর্ক মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

'গজলক্ষ্মী' ধারণাটি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। গুপ্ত-যুগে বা তার কিছু পরবর্তী কালে রচিত 'বিষ্ণু-ধর্মোত্তরমে' গজলক্ষ্মীর রূপকল্পনার সাক্ষাৎ মেলে। তবে খ্রিস্টপূর্ব কালেও

www.pathagar.com

ভারতীয় শিল্পকলায় এই কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ভারহুত, সাঁচী, বুদ্ধগয়া, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ ভাস্কর্যগুলোতে দু'টি হস্তীকে পদ্মের ওপর দাঁড়ানো বা বসা দেবীমূর্তির মাথায় অভিষেকবারি সিঞ্চন করতে দেখা যায়। এটি মূলত উৎপাদিকাশক্তি ও পৃথ্বীমাতার প্রতীক এবং সেই হিসাবে পরবর্তী কালের সৌন্দর্য-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে এর রূপকল্পনা এক বা অভিন্ন। প্রাচীন কালের অনেক মুদ্রা ও মৃৎফলকে এই দেবীমূর্তির ছাপ পাওয়া যায়।

সুজ. ব.

গণ-অভ্যুত্থান '৬৯

বাংলাদেশের (দ্র) জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান।

এক দশকেরও অধিক কাল জুড়ে চেপে-বসা আইয়ুবী স্বৈরশাসন এই অভ্যুত্থানের ফলে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়।

১৯৬৯ সালের সূচনা থেকেই দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের লক্ষণ দেখা দেয়। গণতন্ত্রের সপক্ষে ৭ই ও ৮ই জানুয়ারি ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক ঐক্য 'ডাক' বা ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি (DAC) গঠিত হয়। ১৪ই জানুয়ারি ছাত্রসমাজ আনুষ্ঠানিকভাবে ১১-দফা দাবিনামা ঘোষণা করে এবং গঠিত হয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ। ২০শে জানুয়ারি ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে ছাত্রসমাজের জঙ্গি মিছিল রাজপথ কাঁপিয়ে তোলে এবং পুলিশের গুলিতে নিহত হয় আইনের ছাত্র আসাদুজ্জামান (দ্র)। এই ঘটনার সূত্র ধরে আন্দোলন আরো জঙ্গি ও ব্যাপক হয়ে ওঠে। ২৪শে জানুয়ারি সারা প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয় এবং পুলিশের গুলিতে নিহত হয় কিশোর মতিউর (দ্র), মকবুল, রুস্তম ও আরো অনেকে। আন্দোলন দমনের জন্য রাস্তায় সেনাবাহিনী নামে, জারি করা হয় কারফিউ। কিন্তু তাতেও জনতার প্রতিরোধ স্তিমিত হয় নি। ছয় দফা (দ্র) ও এগারো দফার (দ্র) পক্ষে ক্রমেই জঙ্গি সমর্থন ব্যক্ত হতে থাকে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে আটক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার (দ্র) বন্দি সার্জেন্ট জহুরুল হক (দ্র) সেনাপ্রহরীর গুলিতে নিহত হন। পরদিন তাঁর লাশ নিয়ে শোকমিছিলের পর ঢাকাসহ গোটা দেশে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) শিক্ষকদের প্রতিবাদী মৌন মিছিলে পাকবাহিনীর গুলিতে শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা শাহাদাৎ বরণ করলে বেয়নেট-গুলি-কারফিউ কোনো পীড়ন-ব্যবস্থা দ্বারাই আর বিক্ষুব্ধ জনতাকে রোধ করা সম্ভব হয় নি। অবশেষে ২১শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব শাহী পশ্চাদপসরণ করে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিব (দ্র)-সহ সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দান করে। এর পর বিরোধী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়। গোলটেবিল আলোচনা ব্যর্থ হলে ২৬শে মার্চ ফিল্ডমার্শাল আইয়ুব খান (দ্র) ক্ষমতা থেকে বিদায় নেন। এইভাবে জনগণের অভ্যুত্থানের একটি অধ্যায় সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

www.pathagar.com

গণ-অভ্যুত্থান '৬৯ : পুলিশকে পাল্টা আক্রমণ করছে জনগণ

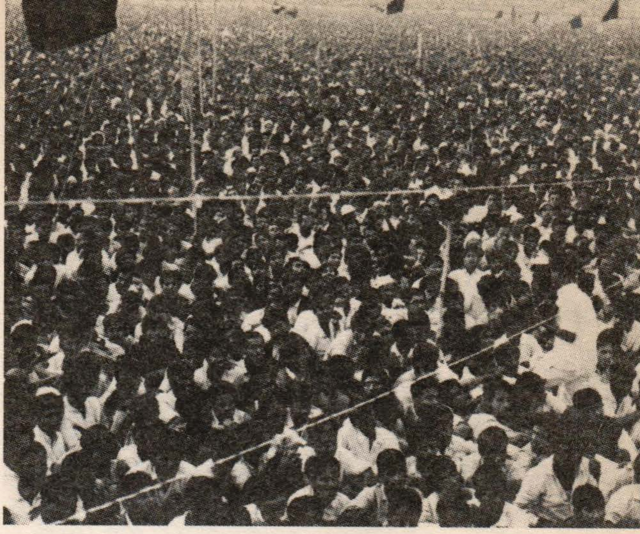

আসাদ গুলিতে নিহত হবার পর পল্টনে জন-সমাবেশ

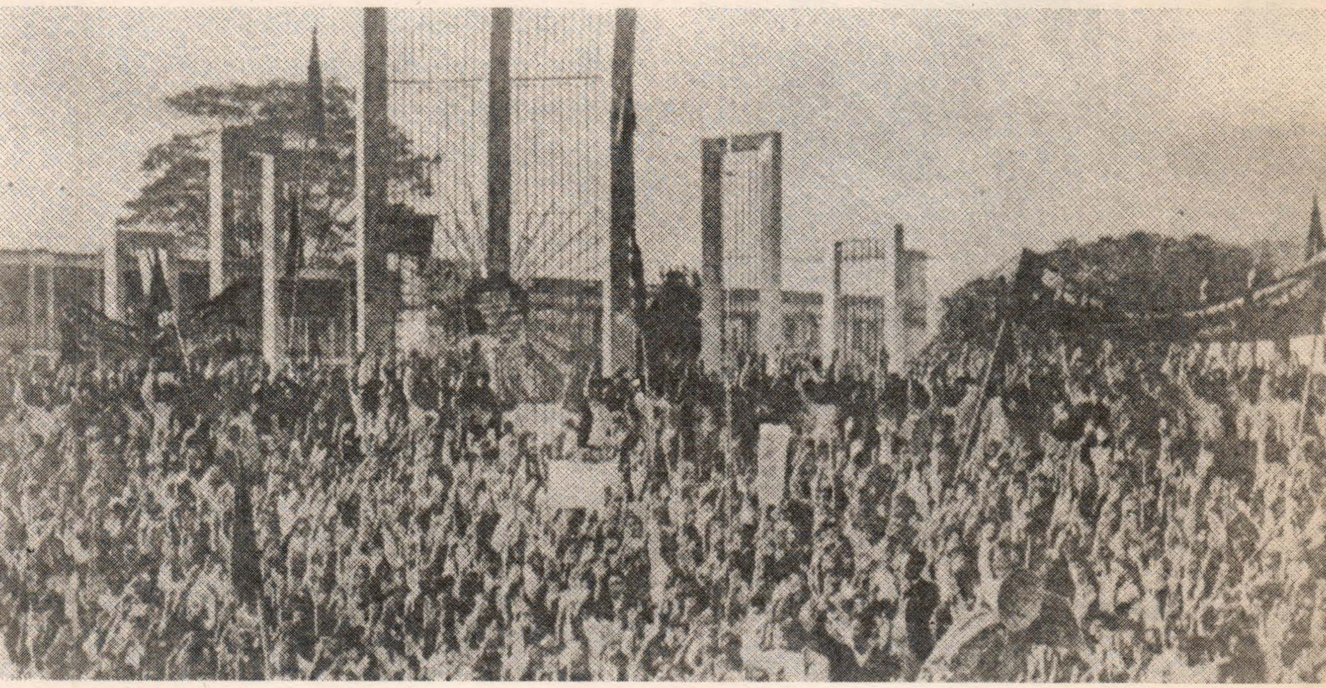

গণ-অভ্যুত্থান ও গণ-আন্দোলনের দুর্জয় শপথের পাদপীঠ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বার খুলে দিয়েছিল। এই অভ্যুত্থান দেশবাসীর জন্য বিশেষ গৌরব বয়ে এনেছে এবং উপজীব্য হয়েছে অনেক কবিতা (দ্র), গান, গল্প-উপন্যাসের (দ্র)।

ম. হ.

www.pathagar.com

স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক : বুকে ও পিঠে এই স্লোগান লিখে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাধারণ শ্রমিক নূর হোসেন। পরক্ষণেই পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করে

গণ-আন্দোলন '৯০

১৯৮২ সাল থেকে বাংলাদেশের (দ্র) ওপর যে স্বৈরাচারী সামরিক শাসন চেপে বসেছিল তার বিরুদ্ধে ঘটমান আন্দোলন নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ১৯৯০ সালের শেষাশেষি তুঙ্গে ওঠে এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকারের পতন ঘটায়। জনতার রুদ্ররোষ ও আন্দোলনের কাছে শক্তিমান একনায়কের নতি স্বীকারের ঘটনায় মহিমান্বিত হয়ে আছে নব্বইয়ের আন্দোলন।

এরশাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের ছিল তিনটি মূল ধারা : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (দ্র) নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট, আওয়ামী লীগের (দ্র) নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের ৫ দলীয় জোট। এ ছাড়া জোটের বাইরে ছিল জামায়াতে ইসলামীর (দ্র) অবস্থান। জোটভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহ যুগপৎ কর্মসূচি পালন করে চললেও তাদের মধ্যে ছিল গুরুতর মতপার্থক্য। আন্দোলনের এই দুর্বলতার সুবিধা ভোগ করছিল এরশাদ সরকার।

১৯৯০ সালের ১০ই অক্টোবর ঐ তিন জোট পৃথকভাবে সচিবালয় অবরোধের কর্মসূচি পালনকালে পুলিশের গুলিতে ছাত্র জেহাদ (দ্র) নিহত হলে শহীদের রক্তভেজা এক ব্যাপক একতা গড়ে ওঠে। 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' নামে গঠিত এই ঐক্যের আওতায় সমবেত হয় তিন জোটের অনুসারী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। ইতঃপূর্বে পেশাজীবীরাও নিজস্ব দাবি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনা করছিলেন। শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরাও ছিলেন রাজপথের আন্দোলনে সক্রিয় ও ঐক্যবদ্ধ।

এমনি পটভূমিকায় ১৯শে নভেম্বর ঘোষিত হয় ৭, ৮ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের ঐতিহাসিক যুক্তঘোষণা। এই ঘোষণায় অবৈধ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠেয় সকল নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হয় এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন, সেই সরকারের অধীনে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সরকার গঠনের রূপরেখা দেওয়া হয়। এরশাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের এই ব্যাপকভিত্তিক ও কার্যকর ঐক্য গঠিত হওয়ার ফলে আন্দোলনে নতুন মাত্রা ও গতিবেগ সঞ্চারিত হয়।

২০শে নভেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় এবং ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন জোটের আন্দোলনের অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষিত হয়। আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে স্বৈরাচারী সরকার নিপীড়নমূলক পন্থা অবলম্বন করে এবং পুলিশ ও বি ডি আর বাহিনী ছাড়াও নিজস্ব পেটোয়া সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেয়। ২৬শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) এলাকায় এদের সৃষ্ট সংঘর্ষে নিমাই (২৮) নিহত হন এবং পরদিন

www.pathagar.com

গণ-আন্দোলন '৯০-এ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মিছিল।
ডানে নিচে : ছাত্র-ঐক্যজোটের মিছিল

প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মমভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন বি এম অ্যা (Bangladesh Medical Association) নেতা ডাক্তার শামসুল আলম খান মিলন (দ্র)। ডা. মিলনের মৃত্যু সর্বস্তরের মানুষকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। সকল মহল থেকে জোরদার প্রতিবাদ জেগে উঠতে থাকে। পুলিশের লাঠিচার্জ উপেক্ষা করে জমায়েত অনুষ্ঠিত করেন সংস্কৃতিকর্মী ও মহিলারা। পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেন সাংবাদিকেরা। সরকারি কর্মচারীসহ বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবীরা স্বৈরাচারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে মিছিল করে নেমে আসেন রাজপথে। চরম একঘরে অবস্থায় উপনীত হয়ে অবশেষে ৪ঠা ডিসেম্বর রাতে জেনারেল এরশাদ নাটকীয়ভাবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, রাজপথে নেমে আসে বিজয়োল্লাসে আনন্দমুখর জনতার ঢল।

৫ই ডিসেম্বর তিন রাজনৈতিক জোটের সর্বসম্মত প্রার্থী হিসাবে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ উপ-রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন এবং পরদিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে গণ-আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের এবং সূচিত হয় গণতন্ত্রের পথে বাংলাদেশের অভিযাত্রা।

ম. হ.

গণচীন চীন দ্র

www.pathagar.com

গণতন্ত্র

ইংরেজি democracy শব্দের বাংলা। এর অর্থ জনগণের শাসন।

গণতন্ত্র হল সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রীয় দর্শনের একটি ধারণা। কিন্তু এ জাতীয় অন্য অনেক ধারণার মতো এটি তত্ত্বমাত্র নয়, মানবসভ্যতায় দীর্ঘকাল যাবৎ এর প্রয়োগ চলে আসছে। গ্রিক নগর-রাষ্ট্রগুলোতে সর্বপ্রথম (খ্রিস্টপূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতাব্দী) গণতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে। রোমক প্রজাতন্ত্রে দেশ শাসনে জনপ্রতিনিধির নীতি চালু ছিল।

পিউরিট্যান (দ্র) আন্দোলন, মার্কিন স্বাধীনতা-আন্দোলন ও ফরাসি বিপ্লবের (দ্র) প্রভাবে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে। ইংরেজ দার্শনিক জন লক্ (John Locke), ফরাসি দার্শনিক জঁ-জাক রুসো (দ্র) ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট টমাস জেফার্সন (দ্র) গণতন্ত্রের প্রভাবশালী তাত্ত্বিক ও প্রবক্তা ছিলেন।

গণতন্ত্র পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ—দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারণ করবে জনগণ, তা সে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যেমনই হোক। নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সকল বয়স্ক নাগরিকের ভোট দ্বারা সরকার নির্বাচিত হয়ে থাকে।

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের (দ্র) অন্যতম মূল রাষ্ট্রীয় নীতি হল গণতন্ত্র।

হা. মা.

গণপরিষদ

নতুন সংবিধান রচনা বা প্রণয়নের প্রস্তাব করার লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক সংস্থাকে বলা হয় গণপরিষদ বা 'কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্ব্লি'(Constituent Assembly)।

এই পরিষদ গঠন করার তত্ত্বগত ভিত্তি হল জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস এবং শাসিতের সম্মতির ওপরই শাসনব্যবস্থা নির্ভরশীল। আধুনিক ধারণা মতে গণপরিষদ গঠিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং তাকে হতে হবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

সপ্তদশ শতকে ব্রিটেনে গণপরিষদের সূচনা। ফ্রান্সে এ ধরনের পরিষদ গঠিত হয় ১৭৮৯ সালের ১৭ই জুন; উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৭ সালে ভারত (দ্র) বিভক্ত হওয়ার পর বর্তমান বাংলাদেশ (দ্র) তখন পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব-পাকিস্তান হিসাবে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের (দ্র) অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী নবগঠিত পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সেই বছরই একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। এটাই ছিল পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের জন্য দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠনের আদেশ জারি করা হয়। ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য শেষ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়।

বাংলাদেশের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ৭ই এপ্রিল 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ (সংশোধনী)' নামে একটি আদেশ জারি করেন। এই আদেশ অনুসারে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত সাবেক পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের আসনসমূহে বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত সকল সদস্য সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর এই পরিষদে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান অনুমোদিত ও চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

আ. হু.

গণসঙ্গীত

উদ্দীপনামূলক গান। সাধারণ মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করে এই গান রচিত। রাশিয়ায় (দ্র) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১৭) এই ধরনের গান রচনায় প্রেরণা দান করে। বাংলায় কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র) প্রথম এই শ্রেণীর গান রচনা করেন। তবে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে অবলম্বন করে বাংলায় এই গানের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে। বিনয়কৃষ্ণ রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস (দ্র), সলিল চৌধুরী (দ্র) প্রমুখ গীতিকবি ও সঙ্গীত রচয়িতা বাংলায় গণসঙ্গীতের যথার্থ ভিত্তিটি রচনা করেন। শোষণহীন

www.pathagar.com

সমাজ সম্পর্কে সাম্যবাদী দলের আদর্শ এই সঙ্গীতের লক্ষ্যকে দৃঢ় সমর্থন দেয়। সারা পৃথিবীর (দ্র) দরিদ্র মেহনতি মানুষ যে যুগ যুগ ধরে একটি নির্মম শাসনব্যবস্থার শিকার এবং এই ব্যবস্থা ভেঙে ফেলতে হবে এমন একটি বক্তব্যও গণসঙ্গীতে প্রকাশ পায়। সাম্রাজ্যবাদ (দ্র), উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি অকল্যাণকর প্রবণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেও এই গানে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। গণসঙ্গীত প্রধানত সম্মিলিতভাবে গাওয়া হয়। এর সুরে ও তালে মানুষকে জাগিয়ে তোলার মতো তীব্রতা প্রকাশ পায়। এই গানের সুর রচনায় লোকসঙ্গীতের ঢঙসমূহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ক. গো.

গণিত

ইংরেজি ম্যাথ্‌ম্যাটিক্‌স্ (mathematics) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ গণিত। ম্যাথ্‌ম্যাটিক্‌স্ শব্দটি গ্রিক *mathemata* থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ'। গণিত একটি বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্র, যার ভিত্তিমূল হচ্ছে সংখ্যা। মানুষ আদিকালে যখন পশুপালন আরম্ভ করল, তখন পশু চরিয়ে ফেরার সময় সবগুলো ঠিক আছে কিনা তা গুণে দেখার দরকার হত। এরূপ গণনা থেকেই গণিতের শুরু। তাই বলা যায়, মূলত গণিত একটি বিজ্ঞান (দ্র), যেখানে সংখ্যা, আকার ও স্থানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অধ্যয়ন বা গবেষণা হয়ে থাকে। গণিতের প্রধান শাখাগুলো হল—পাটিগণিত, বীজগণিত (দ্র), জ্যামিতি, ক্যালকুলাস ইত্যাদি। প্রথম দিকে গণিতের দুটি প্রধান শাখা ছিল—পাটিগণিত ও জ্যামিতি। পাটিগণিত হল সংখ্যার বিজ্ঞান। পাটিগণিতের কাজে সাহায্য করার জন্য অজানা পরিমাণ বা রাশি নিয়ে কাজ করার জন্য আসে বীজগণিত। জ্যামিতি হল বিভিন্ন আকার-আকৃতি ও তাদের সম্পর্কের বিজ্ঞান। যাযাবর জীবন কাটিয়ে মানুষ যখন ফসল ফলাতে শিখল, তাদের শস্য মজুদ ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আকৃতির বস্তু তৈরির প্রয়োজন হল, প্রয়োজন হল জমি মাপজোখের, তখন থেকে জ্যামিতির বিকাশ শুরু হয়। গতি সম্বন্ধে মাপজোখ করতে গিয়ে আসে ক্যালকুলাস। যুদ্ধক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—ক্যালকুলাসের সাহায্যে জানা যায় একটি কামানের মুখ মাটি থেকে ৪৫ ডিগ্রি কোণে রাখলে ঐ কামানের গোলা সবচেয়ে দূরে গিয়ে পড়বে। সাধারণত এক অঞ্চলের মানুষের ভাষা অন্য অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারে না। কিন্তু গণিতকে এমন একটি ভাষা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়, যা দিয়ে পৃথিবীর (দ্র) যে কোনো জায়গার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ভাষার বর্ণমালার মতো গণিতেরও রয়েছে বর্ণমালা। এগুলোকে প্রতীক বলে। যেমন—সংখ্যা তৈরির জন্য সংখ্যাপ্রতীক বা অঙ্ক (১, ২, ৩ বা 1, 2, 3 ইত্যাদি); অজানা সংখ্যার জন্য বর্ণ (x, y, z ইত্যাদি); বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে সম্বন্ধ দেখানোর জন্য সমীকরণ ($x+y=20$ ইত্যাদি)।

মানবসভ্যতার বিকাশে গণিতের অবদান অনেক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় গণিত এক অপরিহার্য সঙ্গী।

হো. আ.

গণেশ

পৌরাণিক দেবতাবিশেষ। শিব ও পার্বতীর পুত্র। গণেশের অন্য নাম গণপতি বা বিনায়ক। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'গণের অধিপতি'। তিনি সিদ্ধিদাতা ও বিঘ্ননাশক। মঙ্গল ও সিদ্ধির জনক বলে যে কোনো দেবতার পূজার পূর্বে গণেশের পূজা করা হয় এবং সকল শুভকর্মের আগে গণেশের নাম নেওয়া হয়। পঞ্চোপাসনার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে হিন্দুদের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে এবং নৈমিত্তিক পূজা-পার্বণাদিতে গণেশ পূজিত হন।

দুর্গাপূজার সময় এবং ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে গণেশের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থী গণেশ চতুর্থী নামে প্রসিদ্ধ।

গণেশের দেহ খর্বাকৃতি। তাঁর ত্রিনয়ন, চার হস্ত, এক দন্ত এবং মস্তক হাতির ন্যায়। তাঁর এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র, তৃতীয় হাতে গদা ও চতুর্থ হাতে পদ্ম। মূষিক তাঁর বাহন। গণেশের গজেন্দ্রবদন সম্পর্কে পুরাণে নানা রূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। গণেশের নাক কেন হাতির শুঁড়ের মতো সে সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদেরও নানা রকম ব্যাখ্যা আছে। এরকম একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় রাহুল

www.pathagar.com

সাংকৃত্যায়নের 'লোকায়ত দর্শন' গ্রন্থে।

মহাভারতের (দ্র) কোনো কোনো সংস্করণ অনুসারে ব্যাসদেব যখন মহাভারত রচনা করেন, তখন গণেশ তার লেখক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সুজ. ব.

গণ্ডার (rhinoceros)

বৃহদাকৃতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। দু'টি গ্রিক শব্দ, রাইনো (অর্থাৎ নাক) এবং সেরস্ (অর্থাৎ শিং) মিলে রাইনোসেরস্। নাকের ঠিক ওপরে শিংয়ের অবস্থান। এই শিং গরু-ছাগলের মতো নয়। ত্বকের বিশেষ ধরনের অনেকগুলো কোণ মিলে এটি তৈরি হয়। সারা জীবন ধরে তা বাড়ে। ভেঙে গেলে আবার গজায়। সাদা গণ্ডারের শিং দেড় মিটার পর্যন্ত হয়।

ঘোড়া-গাধার নিকট-আত্মীয় গণ্ডারের পাঁচটি প্রজাতি রয়েছে। আফ্রিকায় (দ্র) দু'টি এবং এশিয়ায় (দ্র) তিনটি দেখা যায়। ভারতীয় ও জাভার প্রজাতি একশিঙ্গী; আফ্রিকার

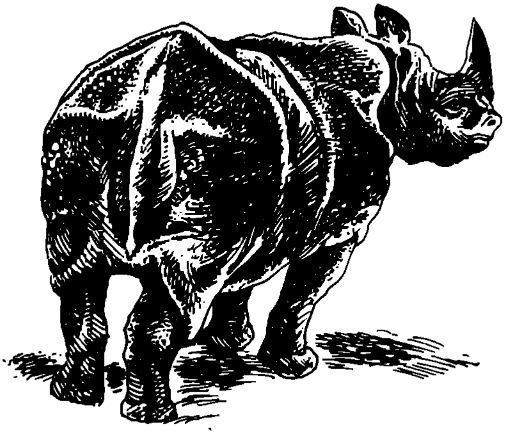

একশিঙ্গী গণ্ডার

সাদা ও কালো এবং সুমাত্রার প্রজাতি দ্বিশিঙ্গী।

বিরাট শরীরের তুলনায় গণ্ডারের পা ছোট। পায়ে তিনটি করে ছোট ছোট খুর রয়েছে। শরীরের চামড়া পুরু হলেও বেশ ঢিলেঢালা। আফ্রিকার গণ্ডারগুলোর চামড়া মসৃণ। ভারতীয় গণ্ডার দেখতে বর্মপরা সৈনিকের মতো। শুধু কান ও লেজেই লোম থাকে। ভারতীয় এবং সাদা গণ্ডার বৃহত্তম : প্রায় ১.৮ মিটার উঁচু ও ৪.৫ মিটার লম্বা হয়, ওজন ৩০০০-৪০০০ কেজি। সুমাত্রার গণ্ডার ক্ষুদ্রতম গণ্ডার : প্রায় ১.৪ মিটার উঁচু ও ১০০০ কেজি ওজনের হয়। গণ্ডার ঘাস, লতা-গুল্ম, পাতাযুক্ত শাখা-প্রশাখা খায়। প্রতিদিন গড়ে ত্রিশ-চল্লিশ কেজি খাবার খায়। পুরুষ-গণ্ডার পাঁচ-সাত বছরে এবং স্ত্রী-গণ্ডার তিন-চার বছরে প্রজননক্ষম হয়। পনেরো-আঠারো মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী-গণ্ডার একটি বাচ্চা প্রসব করে। তবে সুমাত্রার গণ্ডারের গর্ভধারণকাল সাত-আট মাস। ত্রিশ-চল্লিশ বছর বাঁচে। বর্তমানে এরা বিলুপ্তির পথে।

আ. ন. ম. আ. র.

গতি

কোনো বস্তু যখন স্থানের মধ্যে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে তখন সে ঘটনাকে বলা হয় গতি। একটি বস্তু গতিশীল কিনা তা অবশ্য অন্য কোনো বস্তুর সঙ্গে তুলনার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। পৃথিবীতে (দ্র) নানা জীব ও জড়ের গতি এবং আকাশে (দ্র) জ্যোতিষ্কসমূহের গতি মানুষকে হাজার হাজার বছর ধরে গতি সম্বন্ধে উৎসুক করে রেখেছে। গতি সম্পর্কে মানুষের সনাতন অনেক ধারণাই ছিল ভুল। এমনকি আরিস্টোটলের (দ্র) মতো পণ্ডিত দার্শনিকও এ সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা দীর্ঘকাল স্থায়ী করে গিয়েছিলেন। যেমন একটি ধারণা ছিল— যতক্ষণ বস্তুর উপর বলপ্রয়োগ থাকে ততক্ষণই এটি গতিশীল থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনাকারী গালিলেও (দ্র) ও নিউটন (দ্র) এই ভুল ভেঙে দিয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, গতিবেগের পরিবর্তন করতেই শুধু বলের প্রয়োজন হয়, কোনো বাধা না পেলে একটি গতিশীল বস্তু বলপ্রয়োগহীন অবস্থায় সরল রেখায় সমবেগে গতিশীল থাকবে। এটি পদার্থের জড়তার ধর্ম। তাঁরা আরো দেখিয়েছেন যে গতিবেগের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ ত্বরণ (দ্র) বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সঙ্গে সমানুপাতী। অবশ্য বস্তুটির ভর (দ্র) যত কম হবে একই বলপ্রয়োগের কারণে তার ত্বরণ তত বেশি হবে। স্বাভাবিক জড়তার নিয়ম ছেড়ে কোনো বস্তু যখন বক্র পথে চলে তখনো বুঝতে হবে তার উপর কোনো বল (দ্র) কাজ করছে। নিউটন তাঁর বিখ্যাত

www.pathagar.com

গতিসূত্রসমূহে গতির এসব মৌলিক নীতি সুন্দর ও সরলভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রথম সূত্রে বস্তুর গতি-জড়তার কথা আছে। দ্বিতীয় সূত্রে বল, ত্বরণ ও ভরের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তৃতীয় সূত্রে আছে— প্রত্যেক ক্রিয়ার যে একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে, সে কথা। এই গতিসূত্রের ভিত্তিতে গড়া নিউটনীয় গতিবিদ্যা আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব কিছুর গতির নিখুঁত গাণিতিক নির্ণয়ন সম্ভব করে তুলে বিজ্ঞানকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছিল। এর ফলে সারা বিশ্বকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করার দাবি সম্ভব হয়েছে, এবং বিজ্ঞানের নানা শাখার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর একেবারে শুরু থেকে নিউটনীয় গতিবিদ্যায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন বিজ্ঞান (দ্র) ঘটিয়ে তুলেছে। যদিও দৈনন্দিন যেসব বস্তুর গতি নিয়ে পৃথিবীতে আমাদের কাজ করতে হয় সেসব ক্ষেত্রে এই গতিবিদ্যা নির্ভুল, কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আণবিক পর্যায়ের ক্ষুদ্রাকৃতি কণিকার গতির ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম সৃষ্টি করেছে। এর দ্বারা বোঝা গেছে যে এরকম বস্তুর অবস্থান ও গতিকে এক সঙ্গে নির্ণয় করতে গেলে উভয়টিকে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়, একটিকে নির্ভুল করতে গেলে অন্যটিকে অমোঘভাবে কিছু অনিশ্চয়তা মেনে নিতে হয়। নিউটনীয় সুনির্দিষ্টতার বদলে তখন অনেক কিছুকে সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকেই শুধু দেখা সম্ভব হচ্ছে। অন্য দিকে আইনস্টাইনের (দ্র) আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (দ্র) আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে চলমান বস্তুর ভর ও আয়তনের পরিবর্তন ঘটে বলে প্রমাণ করার পর এখানেও নিউটনীয় গতিবিদ্যা থেকে কিছুটা সরে যেতে হয়েছে। সাধারণ কাজে পুরানো গতিবিদ্যা হুবহু অনুসরণ সম্ভব হলেও আণবিক ও মহাজাগতিক ক্ষেত্রে এই দুই নতুন তত্ত্বের মাধ্যমেই অনেক কিছুর ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে— এবং তা খুব সাফল্যের সঙ্গে সম্ভব হচ্ছে।

মু. ই.

গথিক গল্প ড্রাকুলা দ্র

গদর পার্টি

'গদর' শব্দের অর্থ বিদ্রোহ। গদর পার্টি ব্রিটিশ শাসনামলে প্রবাসী শিখদের দ্বারা গঠিত একটি বিপ্লবী সংস্থা। ১৯১৩ সালের প্রথমার্ধে সানফ্রান্সিসকোসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) বিভিন্ন শহরে ভারতীয়দের দ্বারা এর শাখা-প্রশাখা গড়ে ওঠে। সংগঠনটির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন লালা হরদয়াল (১৮৮৪-১৯৬৯) নামের এক জন বিপ্লবী শিখ ছাত্র।

এই সমিতির মুখপত্রের নাম ছিল 'গদর'। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের ১লা নভেম্বর, সানফ্রান্সিসকো শহর থেকে। 'গদর' পত্রিকা ইংরেজিসহ বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত হত এবং সেগুলো বিতরণ করা হত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে, ব্রহ্মদেশ (মায়ান্‌মার) (দ্র) ও শ্যামদেশের (থাইল্যাণ্ড) (দ্র) প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে। ভারতেও (দ্র) পাঠানো হত গোপনে।

ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে গদর পার্টির আন্তঃমহাদেশীয় নানামুখী সাংগঠনিক ও সশস্ত্র বিপ্লবী প্রচেষ্টা এবং ভূমিকা এক গৌরবময় ইতিহাস।

আ. হ.

গদ্য কাব্য কাব্য দ্র

গদ্য ছন্দ ছন্দ দ্র

গন্ধক (sulphur)

গন্ধক আমাদের একটি অতি পরিচিত পদার্থ। বহুকাল আগে থেকেই এটিকে আমরা নানা কাজে ব্যবহার করে আসছি। অনেক খনিতেই (দ্র) গন্ধক বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। পশ্চিম-পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে প্রচুর গন্ধক রয়েছে। তবু পৃথিবীর (দ্র) প্রায় ৯০ শতাংশ গন্ধক আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) লুইজিয়ানা ও টেক্সাসের খনি থেকে। ইতালির সিসিলি দ্বীপ এবং জাপানেও (দ্র) গন্ধকের খনি আছে। লোহা (দ্র), সীসা (দ্র) ও দস্তার (দ্র) খনিতে এদের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় গন্ধক থাকে। তবে এ সকল খনি থেকে গন্ধক তৈরি করা হয় না। খনিজগুলিকে পুড়িয়ে যে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায় তা সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। পিঁয়াজ, রসুন ও মূলার মধ্যে অন্যান্য দ্রব্যের সাথে গন্ধক সংযুক্ত থাকে। এদের স্বাদ ও গন্ধের জন্য গন্ধকই দায়ী। কপির পাতা ও ডিমে (দ্র)-ও গন্ধক থাকে। পচা ডিমের গন্ধের জন্য দায়ী গন্ধক যৌগটির নাম হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস। গ্যাসটি বেশ দুর্গন্ধযুক্ত হলেও এটি একটি

www.pathagar.com

অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য।

সাধারণ অবস্থায় গন্ধকের রঙ উজ্জ্বল হলুদ। এটি পানিতে অদ্রবণীয় হলেও কার্বন ডাই-সালফাইডে বেশ দ্রবণীয়। গন্ধক তাপ ও বিদ্যুৎ (দ্র) পরিবহন করে না এবং কয়েকটি বিভিন্ন রূপে থাকতে পারে। প্রকৃতিতে যে গন্ধক পাওয়া যায় তার দানাগুলি সূচের মতো লম্বা বা নানা পল-বিশিষ্ট হয়। ফুটন্ত অবস্থায় গন্ধককে ঠাণ্ডা পানির মধ্যে ঢেলে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করলে তা জমে গিয়ে অনেকটা রাবারের (দ্র) মতো শক্ত হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে নমনীয় গন্ধক (Plastic sulphur)।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার সূত্রে গন্ধক খুবই সক্রিয় একটি মৌল। তা দু'-একটি বাদে প্রায় সকল ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে যৌগ তৈরি করে। বাতাসে এটি নীল শিখা সহকারে জ্বলে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি করে। গ্যাসটি বিষাক্ত, অত্যন্ত কটু, দম আটকানো গন্ধযুক্ত ও জীবাণুনাশক।

গন্ধকের সঙ্গে কার্বন (দ্র) ও নিশাদল মিশিয়ে বারুদ তৈরি করা হয়। রাবারের সঙ্গে গন্ধক উত্তপ্ত করে রাবারকে ভালকানাইজ (vulcanise) করা হয়। এতে রাবার বেশ শক্ত ও স্থিতিস্থাপক (elastic) হয়। জীবাণুনাশকরূপে ও সালফা ড্রাগ (sulfa drugs) জাতীয় ঔষধ (দ্র) তৈরি করতে গন্ধকের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। দিয়াশলাই, নানা প্রকার রঙ ও সার (দ্র) তৈরি করতে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। কাগজ-শিল্পে সালফার ডাই-অক্সাইডের বেশ ব্যবহার রয়েছে।

গন্ধকের প্রধান ব্যবহার রয়েছে সালফিউরিক অ্যাসিডের উৎপাদনে। খনিজ পেট্রোলিয়াম শোধনে, রঞ্জন-শিল্পে, সঞ্চয়ী বিদ্যুৎকোষে, ইস্পাতের তার তৈরি করতে, নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে এবং আরো বহু কাজে সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবহার রয়েছে।

আ. হ. খ.

গন্ধমাদন

হিমালয় পর্বতের একটি অংশের পৌরাণিক নাম। এটি ঋষভপর্বত ও কৈলাসপর্বতের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত একটি ঔষধিপর্বত। এর শীর্ষদেশে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী— এই চার প্রকার মহৌষধি উৎপন্ন হত। এসব ঔষধিবৃক্ষের গন্ধ সবাইকে মত্ত করত বলে এই পর্বতের নাম হয় গন্ধমাদন।

রামায়ণের (দ্র) লঙ্কাকাণ্ডে গন্ধমাদন পর্বতের উল্লেখ আছে। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় হনুমান দু'বার ঔষধিপর্বত উৎপাটন করে আনেন। প্রথম বার ঔষধির গন্ধ নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ শল্যমুক্ত হন ও বানরেরা সুস্থ হয়। পরে রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ সংজ্ঞা হারালে তাঁর পুনরুজ্জীবনের জন্যও ঔষধির প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু হনুমান এবার সঠিক ঔষধি চিনতে না পেরে সম্পূর্ণ ঔষধিশৃঙ্গ তুলে নিয়ে আসেন।

এই ঘটনা থেকে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাছ-বিচার না করে এক সঙ্গে কোনো বৃহৎ বস্তু আনয়ন করাকে 'গন্ধমাদন পর্বত বয়ে আনা' বলা হয়।

সুজ. ব.

গন্ধরাজ

স্বনামখ্যাত ফুল। বৈজ্ঞানিক নাম *গার্ডেনিয়া ফ্লোরিডা* (*Gardenia florida*)। ফ্লোরিডা শব্দ থেকে বোঝা যায়, উত্তর আমেরিকা (দ্র) এর আদি নিবাস। বয়স্ক গাছ ১০-১৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা শিরাযুক্ত, অনেকটা পেয়ারার পাতার মতো। ফুলের রঙ দুধসাদা। আস্তে আস্তে হলদেটে হতে থাকে। ফুল অতিশয় সুগন্ধি ও চারদিক আমোদিত করে। ফুলের ১২টি দল ও ৬টি কেশর আছে। প্রধানত বসন্তে ও গ্রীষ্মকালে ফোটে। ফল হয় না। ডাল রোপণ করে অথবা কলম থেকে চারা হয়।

বি. ব.

গফ্‌ফার খান, খান আবদুল [১৮৯০—১৯৮৮]

দেশসেবায় নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদ। মতাদর্শ ও কর্মধারার দিক থেকে তিনি বরাবর মহাত্মা গান্ধীর (দ্র) মতো অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাঁকে 'সীমান্ত গান্ধী' বলা হত। 'বাদশাহ খান' নামেও তিনি সমান পরিচিত। ১৮৯০ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ার জেলার উৎমনজাই গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা বাহরাম খান ছিলেন গ্রামের একজন গোত্র-প্রধান।

খান আবদুল গফ্‌ফার খান পেশোয়ারের ইংল্যাণ্ড মিশন স্কুলে এবং পরে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

www.pathagar.com

১৯১২ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে গফ্ফার খান সীমান্তের অনগ্রসর পাঠান সমাজে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে 'আঞ্জুমান ইসলাম-উল-আফগানিয়া' গঠন করেন। ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলনে (দ্র) যোগ দেন এবং পেশোয়ার খিলাফত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এসব কর্মতৎপরতার জন্য সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। ১৯২৯ সালে তিনি 'খুদা-ই-খিদ্‌মতগার' বা লাল কুর্তা বাহিনী গঠন করেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের প্রধান নেতা মহাত্মা গান্ধী (দ্র) লবণ আইন অমান্য, বিদেশী বস্ত্র বর্জন, পরিষদ ত্যাগ ও কর প্রদান বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়ে সত্যাগ্রহ (দ্র) আন্দোলন শুরু করলে গফ্ফার খান সীমান্ত প্রদেশে এই আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। এই জন্য উৎমনজাইতে আয়োজিত এক জনসভা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি খুদা-ই-খিদ্‌মতগারদের নিয়ে কংগ্রেসে (দ্র) যোগদানের কথা ঘোষণা করেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরু হলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ব্রিটেনকে যুদ্ধে পূর্ণ সহযোগিতা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। মহাত্মা গান্ধী এবং গফ্ফার খান এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে কংগ্রেসের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকেন। কারণ তাঁরা দু'জনই ছিলেন যুদ্ধের বিপক্ষে, অহিংসায় বিশ্বাসী। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হলে গফ্ফার খান গান্ধীর সঙ্গে নোয়াখালি ও বিহারের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলো সফর করে শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাণী প্রচার করতে থাকেন। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় একমাত্র তিনিই ভারতবিভাগ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন।

ভারতবিভাগের পর গফ্ফার খান পাকিস্তানের (দ্র) পাঠান অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পাখতুনিস্তান নামক স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন। ফলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।

১৯৫৭ সালে গফ্ফার খান মওলানা ভাসানীর (দ্র) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) (দ্র) সঙ্গে মিলিত হয়ে পাকিস্তানের উভয় অংশে এক ইউনিট প্রথার বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর এই আন্দোলনকে সরকারবিরোধী চক্রান্ত হিসাবে গণ্য করে শাসকগোষ্ঠী তাঁকে আটক করে রাখে। এভাবে বারংবার কারাভোগের ফলে গুরুতর অসুস্থ গফ্ফার খান আফগানিস্তানে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে থাকেন। ১৯৭২ সালে ৮২ বছর বয়সে দেশে ফিরে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করলে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পরে গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে তিনি মুক্তি পান।

গফফার খান (ডান থেকে ২য়)-সহ মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু ও আচার্য কৃপালিনী

১৯৮৮ সালের ২০শে জানুয়ারি ৯৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আজীবন অহিংস পন্থায় আপসহীনভাবে রাজনীতি করার জন্য ভারত সরকার তাঁকে 'নেহরু পুরস্কার (দ্র)' প্রদান করে এবং পরে 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত করে।

সুজ. ব.

গবেষণা, বৈজ্ঞানিক

বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্য হল প্রকৃতির নিয়মগুলো ক্রমাগত শুদ্ধতররূপে জানা এবং তা ব্যবহার করে নানা পরিবেশকে

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ করা। বিজ্ঞানীরা এ জন্য পর্যবেক্ষণ করেন, নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ও তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। সূক্ষ্মভাবে ও নির্ভুলভাবে নানা বস্তু ও ঘটনাকে পর্যবেক্ষণের জন্য বিজ্ঞানীরা নানা যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। যেমন— অণুবীক্ষণ (দ্র) যন্ত্রের উদ্ভাবন ক্ষুদ্র বস্তুকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে এবং দূরবীক্ষণ (দ্র) যন্ত্র সাহায্য করেছে দূরের বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করতে। পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্ত ও তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে ও এদের মধ্যে সম্পর্ক বা নিয়ম অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। তত্ত্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কল্পনা ও অনুমানকে ব্যবহার করেন, হিসাবনিকাশ করেন, অঙ্ক কষেন ও নানা মডেল উপস্থিত করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় একটি মূল বৈশিষ্ট্য ও পূর্বশর্ত হল, যে কোনো উদ্ভাবিত তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে বা সমর্থিত হতে হবে। মেন্দেলিয়েফ্ (দ্র) বিভিন্ন রকম পরমাণুর (দ্র) রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্যায়-সারণি উদ্ভাবন করেন এবং তাঁর তত্ত্ব পরীক্ষার মাধ্যমে

বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ও তাঁর গবেষণাগার

সমর্থন পেয়েছে। নিউটন (দ্র) পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বলবিদ্যার সূত্র ও অভিকর্ষের নিয়ম আবিষ্কার করেন। পরবর্তী কালে নানা পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

টমাস্ এডিসনের (দ্র) গবেষণার ফসলরূপে আমরা পেয়েছি টেপ রেকর্ডার (দ্র), টেলিফোন (দ্র), ক্যামেরা (দ্র) ইত্যাদি। জেম্স্ ওয়াটের (দ্র) গবেষণা দিয়েছে বাষ্পীয় ইঞ্জিন (দ্র), ডারউইনের (দ্র) গবেষণার ফসল হল প্রাণিজগতে বিবর্তনের তত্ত্ব। প্রফেসর সালাম (দ্র) গবেষণার দ্বারা বিশ্বের মৌলিক বলগুলোর মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করেছেন। বড় বড় বিজ্ঞানী ছাড়াও পৃথিবীতে (দ্র) অসংখ্য বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, যন্ত্রনির্মাণ ও তত্ত্ব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। আধুনিক সভ্যতা ও বস্তুগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে কাজ করছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

আ. আ.

গম

দুনিয়ার সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ খাদ্যশস্য হিসাবে গম ব্যবহার করে। শস্য প্রদানকারী ঘাস জাতীয় উদ্ভিদগুলোর মধ্যে গম অন্যতম। এদিক থেকে এটি ধান (দ্র), ভুট্টা (দ্র), বার্লি, রাই, ওট্স ইত্যাদির সমগোত্রীয়। গমের চারা সর্বাধিক দেড় মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। গমের দানার রঙ সাধারণত সাদা, হলুদ বা লাল হয়ে থাকে এবং কোনো কোনো জাতে দানার ওপর দীর্ঘ আঁশ থাকে। দানার খোসা ছাড়ালে এর তিনটি প্রধান অংশ উন্মুক্ত হয়— ভ্রূণ, খুদ এবং শস্যল অংশ। ছোট্ট ভ্রূণটি হল ভবিষ্যতের নতুন চারা। দানার গায়ের কয়েক স্তর পাতলা আবরণ নিয়ে হয় খুদ, যা দানার প্রায় ১৫ শতাংশ। বাকি ৮৩–৮৫ শতাংশ শস্যল অংশটিই গমের প্রধান অংশ, যা শর্করা ও আমিষে সমৃদ্ধ। ভ্রূণ ও খুদে থাকে প্রয়োজনীয় কিছু ভিটামিন (দ্র), খনিজ ও আঁশ। এগুলোসহ পুরো দানাটি গুঁড়ো করলে আমরা আটা পাই, যা পুষ্টির দিক থেকে সবচেয়ে ভাল। ভ্রূণ ও খুদ বাদ দিয়ে শুধু শস্যল অংশ রাখলে আমরা পাই ময়দা— এতে প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য-উপাদান বাদ পড়ে যায়। গোটা দানায় ৭১.৭৭% শর্করা, ১২.৩% আমিষ, ১.৮% তেল, ১.৭% আঁশ আর বাকি ১২.৫% পানি (দ্র)। নানাভাবে দুনিয়ার দেশে দেশে গম থেকে বিচিত্র রুটি, বিস্কুট, পিঠা, সুজি, বিভিন্ন রকমের সেমাই (যেমন স্পেগেটি, নুড্ল্স্) ইত্যাদি খাদ্য তৈরি হয়। তা ছাড়া গমের খৈ, চিঁড়া, গোটা বা আধভাঙা অবস্থায় সেদ্ধ ইত্যাদি রূপেও প্রচুর খাওয়া হয়।

মানবসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে গম চাষের ইতিহাস

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। খুব সম্ভব কৃষির প্রবর্তন হয়েছিল গমকে দিয়েই। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মাঝখানটায় বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত এক স্থানে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা খ্রিস্টপূর্ব ৬/৭ সহস্রাব্দে উৎপাদিত গমের নমুনা খুঁজে পেয়েছেন। মনে করা হয়, কৃষি প্রথমে এখানেই শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতাস্থলে গম ভাঙার যাঁতা, রুটি তৈরির তন্দুর ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। পরে গম চাষের অগ্রগতির মাধ্যমে কৃষির একেকটি অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে পঞ্চাশের দশকের পর থেকে উচ্চ ফলনশীল গমের প্রবর্তনের মাধ্যমেই আধুনিক সবুজ-বিপ্লব বহু দেশে খাদ্যশস্যের অভাব মেটাতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের দেশে গমচাষ তেমন না হলেও এখন এটি ক্রমে জনপ্রিয় হচ্ছে। এতে সেচের পরিমাণ কম বলে অনেকে শুকনো মৌসুমে গম চাষের দিকে ঝুঁকেছেন। অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল ভূমি ও আবহাওয়াতেও এর চাষ সম্ভব। খাদ্য হিসাবেও এটি উন্নতমানের। আমাদের খাদ্যতালিকায় এটি ক্রমেই অধিকতর স্থান পাচ্ছে।

মু. ই.

গম্ভীরা

বাংলা লোকসঙ্গীতের (দ্র) প্রধান পাঁচ রূপের অন্যতম। অন্য চারটি রূপ হচ্ছে— বাউল (দ্র), ভাটিয়ালি (দ্র), ঝুমুর (দ্র), ভাওয়াইয়া (দ্র)। বাংলাদেশের (দ্র) রাজশাহী (দ্র) ও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে গম্ভীরা বিশেষভাবে প্রচলিত। গম্ভীর অর্থে শিবকে বোঝায়। সুতরাং 'গম্ভীরা' শিববিষয়ক গান বা শিবকে উদ্দেশ করে রচিত গান। আদিতে এই অর্থ থাকলেও কালক্রমে গম্ভীরার রচনারীতিতে পরিবর্তন আসে, শিববিষয় ব্যতিরেকেও এই গান রচিত হতে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসব ছিল গম্ভীরা পরিবেশনার প্রধান উপলক্ষ। কালক্রমে তারও পরিবর্তন হয় এবং নানা সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপলক্ষে গম্ভীরা গাওয়া হতে থাকে। রাজশাহী অঞ্চলে বর্তমান কালে যে গম্ভীরা রচিত ও গীত হয় তাতে নানা ও নাতি মুখ্য চরিত্রে অবতীর্ণ হয়। গম্ভীরা বর্ণনামূলক গান। এ গান দলবদ্ধভাবে গাওয়া হয়। ফলে এক জন বা দু' জন মুখ্য চরিত্র থাকে, যেমন নানা-নাতি, বাকিরা দোহারের ভূমিকা পালন করে। গ্রাম-জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিষয়সমূহ কাহিনী আকারে গম্ভীরায় পরিবেশন করা হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সামাজিক দুরবস্থা, দুঃখ বা আতঙ্কজনক কোনো ব্যক্তিগত ঘটনা একটি কাহিনীর মতো করে সাজিয়ে গম্ভীরায় গাওয়া হয়। গম্ভীরায় সমালোচনার ভঙ্গি থাকে। রঙ্গ ও ব্যঙ্গ এই গানের দুই প্রধান উপাদান। যাই উপস্থাপন করা হোক, তাতে খানিকটা হাসির সূত্র থাকা চাই। গম্ভীরা শুধু গান নয়। এতে অভিনয়, নৃত্য, কথকতা, কথোপকথন ও যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার থাকে। ছোট্ট একটি আসর সাজিয়ে গম্ভীরা পরিবেশন করা হয়। প্রধান চরিত্র দাঁড়িয়ে তাদের যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করে, দোহারেরা বসেই তাদের কাজ চালায়। কাহিনীর বর্ণনা অগ্রসর হওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বিরাম দেওয়া হয় এবং বিরামের স্থানে প্রবলভাবে যন্ত্রসঙ্গীত বাজানো হয়। সে সময় প্রধান চরিত্রসমূহ আসরে ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়ায়। প্রধান চরিত্রের সরল ও বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক পোষাক থাকে। গম্ভীরা জমজমাট ও উপভোগ্য সঙ্গীতকলা।

ক. গো.

গরান-বন

গরান একটি গাছের নাম। যে বন এই গাছে ভর্তি থাকে সে বনকে গরান-বন বলা হয়, ইংরেজিতে বলে mangrove (ম্যাঙ্গ্‌গ্রোভ্)। সুন্দরবন (দ্র) এলাকায় গরান-বন রয়েছে। গরান গাছের কাঠ খুব মজবুত ও শক্ত। গরান কাঠের রঙ হলুদ। গাছটি খুব বড় হয় না। মাঝারি আকারের গাছ।

গরান গাছের বাণিজ্যিক মূল্য খুব বেশি। এই গাছের কাঠ ঘরের খুঁটি, ছোট বাঁশের মাচা, ঠেকা দেওয়া ও জ্বালানি (দ্র) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গাছের বাকল থেকে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বের হয়। রাসায়নিক পদার্থ চামড়া ট্যান করার কাজে লাগে। জুতার সুখতলিতে লাগাবার চামড়া এই পদার্থ দিয়ে ট্যান করানো হলে জুতা টেকসই হয়। বাকল থেকে নির্গত এই রাসায়নিক পদার্থের নাম ট্যানিন। ট্যানিন প্লাস্টিক (দ্র) তৈরি ও মাছ ধরার জাল রঙ করার কাজেও লাগে।

ত. চ.

গরিলা

নর-বানরদের মধ্যে গরিলা বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী। বৈজ্ঞানিক নাম *গরিলা গরিলা (Gorilla gorilla)*। গরিলা

www.pathagar.com

আফ্রিকা (দ্র) মহাদেশের (দ্র) ক্যামেরুন, গ্যাবন, জায়ার, উগাণ্ডা, রুয়াণ্ডা, তানজানিয়া প্রভৃতি দেশের সমতল ভূমি ও পাহাড়ি জঙ্গলে বাস করে।

গরিলার মাথা বড়, কান ছোট, নাসিকা প্রসারিত, কাঁধ প্রশস্ত, হাত দুটো অত্যন্ত শক্তিশালী। গরিলা চার হাত-পায়ে চলাফেরা করে। দাঁড়ানো অবস্থায় পুরুষ-গরিলা ১.৭-২.০ মিটার লম্বা হয়। ওজনে ১৩৫-২৭৫ কেজি। স্ত্রী-গরিলা পুরুষ-গরিলার প্রায় অর্ধেক। গায়ের রঙ মিশমিশে কালো, তবে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-গরিলার পিঠ রূপালি। বয়স দশ ছাড়িয়ে গেলেই গায়ের রঙ ধূসর হতে থাকে।

এরা গাছের পাতা, কাণ্ড, বাঁশের কোঁড় ইত্যাদি খায়। দিনে খাবার সংগ্রহ করে, রাতে ঘুমায়। এরা সাধারণত মাটিতেই থাকে, ঘুমানোর সময় গাছে ওঠে। ডালপালা-পাতা দিয়ে শুধু রাতের জন্য বাসা বানায়। এরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ ধরনের স্তন্যপায়ী (দ্র) প্রাণী। বিপদে না পড়লে কাউকে আক্রমণ করে না।

একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-গরিলার নেতৃত্বে এরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। দলে দু' থেকে ত্রিশটি বিভিন্ন বয়সের গরিলা থাকতে পারে। স্ত্রী-গরিলা ২৫০-২৯০ দিন গর্ভধারণের পর একটি বাচ্চার জন্ম দেয়।

গরিলা প্রায় ত্রিশ বছর বাঁচে। বর্তমানে এদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন।

আ. ন. ম. আ. র.

গরু

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু সবচেয়ে উপকারী স্তন্যপায়ী (দ্র) প্রাণী। পৃথিবীর (দ্র) সর্বত্র দেখা যায়। প্রায় ৮,০০০-১০,০০০ বছর পূর্বে মানুষ এদের পোষ মানায়। ইউরোপের (দ্র) বন্য এবং এশিয়ার (দ্র) কুঁজওয়ালা প্রজাতি থেকেই বিভিন্ন জাতের গরুর উৎপত্তি।

গরুর শরীর বড়সড়, লেজ লম্বা, খুর দ্বিধাবিভক্ত। কোনো কোনো জাতের গরুর শিং থাকে না। আকার, আকৃতি ও বর্ণে একেক জাত একেক রকম। ওজনে ২০০-১০০০ কেজি। উচ্চতায় ১-১.৫ মিটার। দুধ উৎপাদনকারী জাতের মধ্যে হলস্টেইন-ফ্রিসিয়ান, জার্সি, আয়ারশায়ার, ব্রাউনসুইস বিখ্যাত। মাংস উৎপাদনকারীর মধ্যে অ্যাবার্ডিন-অ্যাঙ্গাস, ব্রাহ্মণ, চারোলিয়াস, হারফোর্ড উল্লেখযোগ্য।

গরুর ওপরের চোয়ালে কোনো কর্তন-দাঁত নেই। গরু ঘাস বা খড়জাতীয় খাবার খায় বলে জটিল প্রক্রিয়ায় তা পরিপাক হয়। এর পাকস্থলী (দ্র) চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এরা খাদ্য প্রথমে সরাসরি গিলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে জমা রাখে। অবসর সময়ে তা মুখে ফিরিয়ে এনে চিবোয় এবং পুনরায় গলাধঃকরণ করে।

গরুর দুধ ও মাংস পুষ্টিকর। গরুর দুধ থেকে ঘি, মাখন (দ্র), পনির (দ্র), মিষ্টি, আইসক্রিম (দ্র) ইত্যাদি এবং চামড়া থেকে জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি তৈরি হয়। এর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঔষধ (দ্র), সাবান (দ্র), আঠা প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গোবর জৈব সার। এরা লাঙ্গল ও বোঝা টানে।

২৭৫-২৮০ দিন গর্ভধারণের পর গাভী একটি বাছুরের জন্ম দেয়। বাছুর ২-৩ বছরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। গরু ১৫-২০ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

www.pathagar.com

গলগণ্ড (goitre)

গলার সম্মুখভাগে অবস্থিত থাইরয়েড (দ্র) গ্রন্থির বৃদ্ধিকে গলগণ্ড বলা হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন (দ্র) থাইরক্সিন দেহের বৃদ্ধি ও সার্বিক বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সঠিক মাত্রায় থাইরক্সিন উৎপাদনের জন্য দেহে আয়োডিনের (দ্র) দৈনিক চাহিদা মাত্র ১৫০ মাইক্রোগ্রাম। কোনো কারণে দেহে আয়োডিনের দীর্ঘস্থায়ী অভাব দেখা দিলে থাইরয়েড গ্রন্থি কোষবৃদ্ধির মাধ্যমে সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করে। এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে থাইরয়েড গ্রন্থির স্থায়ী বৃদ্ধি দেখা দেয়, যা গলগণ্ড বা সাধারণ 'গয়টার' নামে পরিচিত।

খাদ্যে আয়োডিনস্বল্পতা গলগণ্ডের প্রধান কারণ। বাংলাদেশের (দ্র) উত্তরাঞ্চলে এবং পাহাড়ি এলাকায় গলগণ্ডের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত বেশি। এর কারণ ঐসব অঞ্চলে আয়োডিনের অভাব। আবার কোনো থাইরয়েড-বিরোধী ওষুধ (সালফোনেমাইড, পি.এ.এস.) দীর্ঘকাল গ্রহণের ফলে অথবা উচ্চমাত্রায় দীর্ঘদিন ধরে আয়োডাইড খেলেও গলগণ্ড দেখা দিতে পারে।

গলগণ্ডের প্রতিকার খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি পূরণ। তা সম্ভব না হলে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারই শ্রেয়। গলগণ্ডের চিকিৎসা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে গলগণ্ড অপসারণ, অবশ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাভাবিক থাইরয়েড গ্রন্থি অক্ষত রেখে।

আ. র.

গল্‌ফ্ (golf)

এই খেলাটি রোমানদের কাছ থেকে এসেছে। এখনকার গল্‌ফ্ ধরনের একটা খেলা তারা খেলত, বিগত শ' পাঁচেক বছর ধরে সেই খেলাই পাল্টাতে পাল্টাতে এখনকার গল্‌ফ্ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম এই খেলার সূত্রপাত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্কটল্যাণ্ডে এবং সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে পড়ে। এই খেলা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) সবচেয়ে প্রিয় খেলা। গল্‌ফ্ খেলায় প্রথমে টি-য়িং গ্রাউণ্ড হতে অর্থাৎ এক জায়গায় একটি ছোট উঁচু জিনিসের উপর বল বসিয়ে বলে লাঠির সাহায্যে আঘাত করে খেলা আরম্ভ হয়। বলটি বিভিন্ন ধরনের স্টিক (stick) বা লাঠির সাহায্যে আঘাত করে একটি নির্দিষ্ট গর্তে নিয়ে ফেলার মধ্যে যে সবচেয়ে কম বার মেরে

লক্ষ্য সিদ্ধ করবে সে-ই খেলায় জিতবে।

আধুনিক গল্‌ফ্ খেলায় শক্ত রাবারের বল ব্যবহার করা হয়। এর ওজন ১.৬২ আউন্স। আমেরিকায় ব্যবহৃত বলের ব্যাস ১.৬৮ ইঞ্চি আর ব্রিটেনে ব্যবহৃত বলের ব্যাস হল ১.৬২ ইঞ্চি। গল্‌ফ্ খেলার জন্য ১৪টি বিভিন্ন ধরনের লাঠি আছে। কিছু কিছু লাঠি কাঠ দিয়ে আবার কিছু লাঠি লোহা বা অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়।

খেলার নিয়ম অনুযায়ী টি-ভূমি থেকে বলকে পর পর আঘাত করে গর্তে ফেলতে হয়। ১৮টি গর্তে এক রাউণ্ড খেলা হয়। গল্‌ফ্ কোর্সের আয়তন হল ৫০০০×৭০০০ গজ (৪৫৭২×৬৪০০ মিটার)। প্রতিটি গর্ত অন্য গর্ত থেকে ১০০ থেকে ৫০০ গজ দূরত্বে থাকে। কোনো কোনো গল্‌ফ্ কোর্সে মাত্র ৯টি গর্ত থাকে। গর্তের ব্যাস সওয়া ৪ ইঞ্চি এবং গভীরতা ৪ ইঞ্চি।

দুইভাবে এই খেলা হয়। একটিকে বলা হয় ম্যাচ প্লে, অপরটিকে বলা হয় স্টেক প্লে। ম্যাচ প্লেতে এক জন খেলোয়াড় তার বিরোধী পক্ষের এক জনের সঙ্গেই খেলে, কিন্তু স্টেক প্লেতে এক জন খেলোয়াড়কে বিরোধী টিমের সবার বিরুদ্ধে খেলতে হয়। ছেলেমেয়ে উভয়েই গল্‌ফ্ খেলতে পারে। ১৯৬০ সালের পর বেশ কিছু দেশ এই খেলার পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে। আন্তর্জাতিক শৌখিন গল্‌ফ্ কাউন্সিলের সভ্য রয়েছে ৫১টি দেশ। এশিয়ান গেম্‌সে (দ্র) ১৯৮২ সালে গল্‌ফ্ সংযুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে গল্‌ফ্ খেলার ময়দান খুব বেশি নেই। বস্তুত পূর্বে বিদেশীরাই এই খেলা খেলত, এখন কুর্মিটোলায় ও দেশের অন্যান্য জায়গায় মাঝে মাঝে গল্‌ফ্ টুর্নামেন্ট হয়ে থাকে।

কা. আ. আ.

www.pathagar.com

গাঁজা (hemp)

গাঁজা এক ধরনের মাদকদ্রব্য। সিদ্ধি গাছের ফুল থেকে গাঁজা তৈরি হয়। সিদ্ধি গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *'কানাবিস সেটিভা' (Cannabis sativa)*। এটি বর্ষজীবী, দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ (দ্র)। সিদ্ধি গাছের পুরুষ ও স্ত্রী ভেদ আছে। গাঁজা সংগ্রহ করা হয় স্ত্রী জাতীয় সিদ্ধি গাছ থেকে। সিদ্ধি গাছের ফুল শুকিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে গাঁজা তৈরি করা হয়। সিদ্ধি গাছের পাতা শুকিয়ে ভাং বা হাশিশ (hashish) নামক মাদকদ্রব্য তৈরি করা হয়। এ গাছের আঠা থেকে 'চরস' নামক মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়।

নেশার জন্য গাঁজার ধূম পান করা হয়। গাঁজার নেশার ফলে নেশাগ্রহণকারীর মধ্যে সাময়িক শারীরিক ও মানসিক সুখানুভূতি সৃষ্টি হয়, কখনো কখনো উন্মত্ততাও দেখা দিতে পারে। দীর্ঘকাল গাঁজার নেশার ফলে স্মৃতিবিভ্রম, বুদ্ধিবিভ্রাট, এমনকি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটাও অসম্ভব নয়।

সি. না. হ.

গাঁদা

মেহিকোর (Mexico) গেন্দামেরি নামক জায়গা থেকে এসেছে। এ জন্য তার ইংরেজি নাম মেরিগোল্ড। বৈজ্ঞানিক নাম *টাগেটিস ইরেক্টা (Tagetes erecta* linn*)*, ফ্যামিলি কম্পোজিটি (Compositae)। গুল্মজাতীয় খাড়া গাছ। তিন-চার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা বহুখণ্ডিত, প্রত্যেক খণ্ডের ধার করাতের মতো, কিন্তু কোমল। গাছে ও পাতায় নরম রোঁয়া আছে। শাখা-প্রশাখা অনেক। কাণ্ডের পর্ব থেকে এবং মোটা ডাল থেকে ছোট ছোট শেকড় গজায়। সেসব ডাল কেটে পুঁতলে সেটাও গাছ হয়ে যায়। সেই গাছেও ফুল বড় বড় হয়। নানা রঙের ফুল হয়— হলুদ, গোলাপি, লাল ইত্যাদি। রঙের পার্থক্য থাকলেও একই গণ ও প্রজাতিভুক্ত। বাংলাদেশে (দ্র) সাধারণত শীতের শুরুতে ফুল হয়। ভারতে (দ্র) সারা বছর এই ফুলের চাষ হয়।

ছোট ছোট গাছের চীনা ও জাপানি গাঁদা এখন বাংলাদেশে এসেছে। ফুলও হয় ছোট এবং একই ফুল একাধিক রঙের হয়। আবার বহু পাপড়ি ও একক পাপড়ির গাঁদা আছে।

গাঁদার পাতার রস কানের ব্যথায়, পাঁচড়ায়, চোখের রোগে, ফোড়ায় ও কার্বাঙ্কলে (carbuncle) খুব উপকারী। কেটে গেলে, ছিঁড়ে গেলে গাঁদার পাতা বেঁটে লাগিয়ে দিলে রক্ত-পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

বি. ব.

গাগারিন্, ইউরি [১৯৩৪—১৯৬৮]

পৃথিবীর (দ্র) প্রথম মহাশূন্যচারী, সোভিয়েত নভোচারী। জন্ম ৯ই মার্চ ১৯৩৪, মস্কোর পশ্চিমে গ্ঝাৎস্ক নামক স্থানে। মৃত্যু ২৭শে মার্চ ১৯৬৮। তিনি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ক্যাডেট ট্রেনিং সেন্টার থেকে স্নাতক পাশ করে জেট পাইলট হিসাবে বিমানবাহিনীতে যোগ দেন। সোভিয়েত নভোচারী প্রথম দলের সদস্য হিসাবে ১৯৬০ সালে তিনি মনোনয়ন পান। ১২ই এপ্রিল ১৯৬১, তিনি ভস্তোক্-১ নামের নভোযান নিয়ে মহাশূন্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ

করেন। ভস্তোক্-১-এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৭,৪০০ কিমি (১৭০০০ মাইল)। যাত্রা শুরু থেকে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসতে ভস্তোকের ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট সময় লাগে এবং তা ৮৯.১ মিনিট কক্ষপথে অবস্থান করে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এর সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল ৩২৭ কিমি (২০৩ মাইল)।

গাগারিন্ ১৯৬১-৬৩ সালে ট্রেনিং ডিরেক্টর হিসাবে মহিলা নভোচারীদের প্রশিক্ষণ দেন এবং সইউজ্ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু দুঃখজনক যে তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করার আগেই একটি মিগ প্রশিক্ষণ বিমানের দুর্ঘটনায় মারা যান। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং ক্রেমলিনের দেয়ালে তাঁর দেহভস্ম রাখা হয়। তাঁর

www.pathagar.com

নামানুসারে চাঁদের পিঠের একটি আগ্নেয়গিরির নামকরণ করে পৃথিবীর নভোবিজ্ঞানীরা তাঁকে সম্মানিত ও স্মরণীয় করে রেখেছেন।

স. রা.

গাঙফড়িং (dragon-fly)

গাঙফড়িং বা ফড়িং অতি পরিচিত কীটপতঙ্গ (দ্র)। মাঠে-ঘাটে, পুকুর, জলা বা গাঙের ধারে রঙ-বেরঙের গাঙফড়িং উড়ে বেড়ায়। পৃথিবীতে ৫,০০০ প্রজাতিরও বেশি গাঙফড়িং আছে।

এদের মাথায় দুটো বিরাট যৌগিক চোখ আছে। প্রতিটিতে প্রায় ২০,০০০ পৃথক পৃথক চোখ আছে। চোয়াল বেশ মজবুত। উইপোকা (দ্র), মশা (দ্র), অন্যান্য কীটপতঙ্গ, এমনকি জাতভাইদেরও এটি খেতে পারে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই নিজের ওজনের সমান খেয়ে ফেলে। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে এরা মানুষের বেশ উপকার করে।

এদের পাখা দু'জোড়া। বেশ লম্বা ও মজবুত। এরা সামনে-পেছনে দু'দিকেই দ্রুত উড়তে পারে। ওড়ার সময় এরা হেলিকপ্টারের (দ্র) মতো স্থিরও থাকতে পারে।

জীবনের প্রথম পর্বটা এরা পানিতেই কাটায়। স্ত্রী গাঙফড়িং পানিতে ডুবে থাকা আগাছার ওপর ডিম পাড়ে। দু'-তিন দিনে তা থেকে শিশু-ফড়িং বা নিম্ফ্ বেরোয়। এদের শরীর মোটা। মাথা মুখ বড়; কোনো পাখা নেই। এটি মশার শূককীট, ছোট পোকামাকড়, ছোট-ছোট মাছ, ব্যাঙাচি খেয়ে বড় হয়। এটি ফুলকার মতো অঙ্গের মাধ্যমে শ্বাসকার্য চালায়। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ গাঙফড়িংয়েরা শরীরের পাশের কতকগুলো ফুটোর মাধ্যমে শ্বাস নেয়। শিশু-ফড়িং ৬–৭ মাসে অন্তত ১২ বার খোলস বদলায়। শেষ বার পানি ছেড়ে মাটিতে এসে খোলস বদলায় এবং এরপর পূর্ণাঙ্গ গাঙফড়িং-এ পরিণত হয়। এরা ১ থেকে ৩ মাস বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

গাজী জেহাদ / জিহাদ দ্র

গাজ্জালি, ইমাম [১০৫৮—১১১১]

ইমাম গাজ্জালি মুসলিম জগতের অনন্যসাধারণ পণ্ডিত ও চিন্তানায়ক। পারস্যের (বর্তমান ইরানের) তুস্ নগরে তাঁর জন্ম, ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে।

ইসলামের (দ্র) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং নানাবিধ সংস্কারমূলক মতবাদ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে।

গাজ্জালি তরুণ বয়সেই ইসলামের নানা বিষয় সম্পর্কে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর চিন্তাধারার অন্যতম দিক হল—জটিল বুদ্ধিআশ্রয়ী দর্শন প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের সহায়ক নয়। তাঁর মতে, গবেষণা ও যুক্তি-বুদ্ধির জটিল পথ ধরে নয়, ধর্মীয় বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে হলে প্রয়োজন আনন্দময় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। ধর্মের (দ্র) অলৌকিকত্বের বিষয়ে সংশয়মুক্ত ও দ্বিধাহীন হওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তাঁর এই চিন্তাধারায় তিনি পবিত্র কুরআন (দ্র) ও হাদিস (দ্র) অধ্যয়ন করতে থাকেন, যার প্রতিফলন তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। তাঁর লেখা 'সৌভাগ্যের পরশমণি' ও 'এহিয়া উলুমুদ্দীন' বাংলাদেশে (দ্র) বিপুলভাবে পঠিত পুস্তক। তিনি নানা বিষয় নিয়ে বহু মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। ১১১১ খ্রিস্টাব্দে ইমাম গাজ্জালির মৃত্যু হয়।

মু. মা.

গাটা-পার্চা (gutta-percha)

গাটা-পার্চা হল রাবারের (দ্র) মতো এক ধরনের পদার্থ। মালয়, বোর্নিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে Sapotaceae নামক এক জাতীয় উদ্ভিদ (দ্র) জন্মে। ঐ উদ্ভিদের কাণ্ড বা শাখায় ছিদ্র করলে এক রকম আঠালো রস বের হয়ে আসে। ঐ রস কিছুক্ষণ ফেলে রাখলে জমে যায়। সেই জমাট রস থেকে প্লাস্টিকের (দ্র) মতো এক প্রকার পদার্থ তৈরি করা হয়। সেই

www.pathagar.com

পদার্থের নামই গাটা-পার্চা। গাটা-পার্চা কতকগুলি তার্পিন জাতীয় হাইড্রোকার্বনেরই (দ্র) সংমিশ্রণ। সাদা, পিঙ্গল বা বাদামি রঙের এই পদার্থটি বেশ শক্ত এবং কম প্রসারণশীল। তবে তাপ দিলে এর প্রসারতা বাড়ে। কার্বন ডাই-সালফাইড, বেন্‌জিন্‌, ক্লোরোফর্ম্‌ (দ্র) প্রভৃতি দ্রাবকে (দ্র) গাটা-পার্চা দ্রবীভূত হয়। নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরি হয় এই গাটা-পার্চা দিয়ে। বিশেষত তড়িৎশিল্পে কুপরিবাহী পদার্থ হিসাবে এর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। গাটা-পার্চা অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। তাই আগুনের সংস্পর্শ থেকে একে দূরে রাখাই শ্রেয়।

আ. হ. খ.

গাত্রালঙ্কার

যে বস্তুকে দীর্ঘকাল ধরে বারবার অঙ্গে ব্যবহার করা যায় তাকেই অলঙ্কার বলা হয়। পত্র, পুষ্প, শোলার মতো ভঙ্গুর ও অল্পস্থায়ী জিনিসের ব্যবহারের নাম সজ্জা, তা অলঙ্কার নয়। আদিম মানুষ কুকুর (দ্র) বা অন্যান্য প্রাণীর নখ ও দাঁত, ভালুকের হিংস্র চোয়াল, ঝিনুক (দ্র) বা শুক্তি, রঙিন পাথর ইত্যাদিতে ছিদ্র করে অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করত। তারা মনে করত এতে মঙ্গল হয়, শত্রু-মিত্র সবার ওপর জাদুবলে প্রভাব বিস্তার করা যাবে, স্বাস্থ্য অটুট থাকবে—এভাবে সম্ভবত অলঙ্কার ব্যবহারের শুরু। আদিম কালে নারী অপেক্ষা পুরুষ বেশি অলঙ্কার ব্যবহার করত। কাজেই ধারণা করা হয় দেহের শোভা বাড়াবার জন্য নয়, জাদুশক্তি বা অন্য কোনো কারণে অলঙ্কারের প্রচলন হয়েছিল।

শিল্প পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার যুগে দুর্লভ ও সুলভ যে কোনো উপকরণের অলঙ্কার আদরণীয় ছিল। সবার থেকে আলাদা হওয়ার জন্য মানুষ উজ্জ্বল রঙের পাথর, মণিরত্ন বা হাতির দাঁতের ব্যবহার শুরু করে। প্রস্তর যুগের (দ্র) পর মানুষ তামার (দ্র) অলঙ্কার পরা শুরু করে। এই যুগে লোকজন ধাতুর ওপর পাথর বসানোর ব্যবহার শেখে। মহেনজোদারোতে (দ্র) অলঙ্কারের নমুনা পাওয়া গেছে। মেখলা, কানের দুল বা কানবালা প্রচলিত ছিল। ধনীরা সোনা, রূপা, হাতির দাঁত ও মূল্যবান পাথর ব্যবহার করত। তারপর কাচের ব্যবহার হয়। বর্তমানে কাচ (দ্র) তেমন মূল্যবান নয়।

প্রাচীন যুগে দেবতারা অলঙ্কার পরত। প্রাচীন ভাস্কর্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে সপ্তম শতকে অলঙ্কারে বৈচিত্র্য আসে। গান্ধার ও ইরানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বেড়ে যায়। তখন অলঙ্কার অনেক মার্জিত রুচির হয়ে ওঠে। অজন্তার গুহার চিত্রে নানা ধরনের গহনা দেখা যায়। মুক্তা ও অন্যান্য গোল গহনায় ছিদ্র করে মালার ব্যবহার খুব আদরের ছিল। এর পর গহনার ব্যবহার হ্রাস পেয়ে বলয়, কবচ, কুণ্ডল ইত্যাদি অলঙ্কারের প্রচলন দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের ফলে অলঙ্কারে বৈচিত্র্য আসে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে মণিমুক্তার বড় বড় মালা দেখা যায়। চুনি-পান্না বা হীরার (দ্র) ব্যবহার শুরু হয় গলায়। জাহাঙ্গীরের (দ্র) মহিষী নূরজাহান (দ্র) নতুন নতুন গহনার প্রবর্তন করেন। রাজপুত রাজাদের আমলে রাজস্থানের জয়পুর মণি-কাটা, সংযোজন, সেটিং এবং মিনা-র কাজের জন্য খ্যাতি লাভ করে। ইংরেজ সভ্যতার প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে টায়রা, মাকড়ি, নেকলেস, মুক্তার কলার ইত্যাদির আদর বাড়ে। তারপর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আগে জাতীয়তাবাদী চেতনার ফলে বিদেশী গহনার কদর আবার কমতে থাকে। বর্তমানে পুরনো ধরনের অলঙ্কারের চাহিদা বাড়ছে। এমনকি মাটির গহনার প্রচলনও শুরু হয়ে গেছে।

বি. ব.

www.pathagar.com

গাথা

সাধারণভাবে 'গীতি' বা গাওয়ার যোগ্য পদকেই গাথা বলা হয়; তবে রাজা বা বীরদের প্রশংসাগীতিকেও গাথা বলা হয়। ইংরেজি ব্যালাড (ballad)-ই বাংলার গাথা বা পালা গান। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর (দ্র) আরেকটি প্রাচীন ইরানী ভাষাতেও গাথা শব্দটি পাওয়া যায়। 'আবেস্তা'র (দ্র) একটি অংশের নাম 'গাথা'। জরথুস্ত্রকে (দ্র) 'আবেস্তা'র রচয়িতা বলা হয়। 'আবেস্তা'র এই অংশটি বৈদিক ছন্দের মতোই প্রাচীন ছন্দে গ্রথিত কিছু স্তোত্রের সংগ্রহ। এই অংশের ভাষাও 'আবেস্তা'র অন্যান্য অংশের তুলনায় প্রাচীন।

বেদ ও আবেস্তায় গাথা শব্দটির ব্যবহার থেকে বলা যায় যে আর্য ভাষায় 'গাথা' শব্দটি আদিতে 'ছন্দোবদ্ধ ক্ষুদ্র স্তোত্র' বা 'স্তুতিরূপ গীতি' বা 'শ্লোক' বা 'পদ' অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় পরে এই শব্দটির অর্থ প্রসার লাভ করে। পালি ও মিশ্র-সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সাহিত্যেও ছোট ছোট কবিতা পাওয়া যায়, যা গাথা হিসাবে পরিচিত। পালি ভাষায় (দ্র) লেখা বৌদ্ধ শাস্ত্রের 'থেরগাথা' ও 'থেরীগাথা' ছোট ছোট গাথারই সংগ্রহ। রামায়ণে (দ্র) একটি প্রাচীন প্রবাদকেও 'গাথা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলে গাথা অর্থে স্তুতিবাক্য বা শ্লোক বোঝালেও পরবর্তী কালে অর্থের প্রসার ঘটে। তখন পৌরাণিক বা প্রাচীন কোনো লৌকিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত গাওয়ার যোগ্য ছোট বা নাতিদীর্ঘ কবিতা সুরারোপিত হলে তাও গাথা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

মে. খা.

গাথাসপ্তশতী

সাতবাহন বংশীয় হাল সঙ্কলিত প্রাকৃত ভাষায় (দ্র) গাহা (গাথা) ছন্দে রচিত শ্লোকগ্রন্থ। প্রাকৃত ভাষায় সঙ্কলনটির নাম 'গাহা-সত্তসই'। বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' গাহা-সত্তসইয়ের উল্লেখ থাকলেও সঙ্কলনটির যেসব পুঁথি পাওয়া গিয়েছে সেগুলোর ভাষার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে। তবে এমনও হতে পারে যে সঙ্কলন-কালের পরবর্তী সময়ে এর ভাষাও পরিমার্জিত হয়েছে। নাম 'সপ্তশতী' বা 'সত্তসই' হলেও বিভিন্ন পুঁথিতে শ্লোকসংখ্যার পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো পুঁথিতে শ্লোককর্তার নাম পাওয়া গিয়েছে, এমনকি মহিলা শ্লোককারের নাম পাওয়া গেলেও শ্লোককারদের নাম সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় নি। গাথা সপ্তশতীর সব শ্লোকই কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট নয়, তবে কিছু কিছু শ্লোক যথার্থই কাব্যগুণমণ্ডিত। মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষায় রচিত সাধারণ মানুষের আদৃত গ্রন্থ হিসাবে 'গাথা সপ্তশতী' আজও মূল্যবান।

মে. খা.

গাধা

ঘোড়া (দ্র) ও জেব্রার (দ্র) মতো গাধাও এক-খুরবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী (দ্র) প্রাণী। বুনো গাধার দুটো প্রজাতি আছে। আফ্রিকা (দ্র) মহাদেশের (দ্র) উত্তরাঞ্চলে আফ্রিকার প্রজাতি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এশিয়ার প্রজাতি বাস করে। বর্তমানে এরা বিলুপ্তির পথে। বুনো গাধাগুলো থেকেই গৃহপালিত গাধার উৎপত্তি হয়েছে। বাংলাদেশে (দ্র) কোনো গাধা নেই বললেই চলে।

গাধা ছোটখাটো ও গাঁট্টাগোট্টা প্রাণী। ৯০–১৫০ সেন্টিমিটার উঁচু হয়। বুনো গাধা গৃহপালিত গাধা থেকে বড় হয়। আফ্রিকার গাধা নীলচে-ধূসর থেকে হলদে-বাদামি এবং এশিয়ার গাধা কিছুটা হালকা রঙের হয়ে থাকে। দু'প্রজাতিরই পেটের নিচটা সাদাটে। পিঠ বরাবর ও পায়ে

www.pathagar.com

গাঢ় দাগ আছে। এর পা ছোট, কান লম্বা, কেশরগুলো খাটো ও কালো, লেজের গোছা বড়। এরা ঘণ্টায় ৫৫–৬৫ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে।

গৃহপালিত গাধাগুলোর বেশ কিছু জাত রয়েছে। হালকা জাতেরগুলো দৌড়ের জন্য এবং ভারি জাতের গাধা মাল টানার কাজে ব্যবহৃত হয়। ঘোড়ার মতোই গাধা ঘাস ও শস্যদানা খায়।

ঘোড়া ও গাধার মিলনে খচ্চরের (দ্র) জন্ম হয়। এদের প্রজননক্ষমতা থাকে না। এরা গাধা থেকেও পরিশ্রমী হয়।

১১–১২ মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী গাধা একটি শাবকের জন্ম দেয়। এটি ২–৩ বছরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, প্রায় বিশ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

গান্ধী, ইন্দিরা ইন্দিরা গান্ধী দ্র

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ [১৮৬৯—১৯৪৮]

রাজনীতিতে অহিংস আন্দোলনের প্রবক্তা, রাজনীতিবিদ। বর্তমান ভারত (দ্র) রাষ্ট্রে জাতির পিতা হিসাবে স্বীকৃত। 'মহাত্মা' রূপে তিনি অধিক পরিচিত। সংক্ষেপে তাঁকে 'গান্ধীজি' বলা হয়।

১৮৬৯ সালে ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা করমচাঁদ বা কাবা গান্ধী রাজসভার সদস্য ছিলেন। মাতা পুতলীবাঈ ছিলেন একজন ধার্মিক মহিলা।

গান্ধী দেশে পড়াশোনা শেষ করে আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিলাত গমন করেন। সেখানে এক নিরামিষাশী সমিতির সভ্য হন এবং গীতা (দ্র), বাইবেল (দ্র) ও কুরআন (দ্র)-সহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন।

গান্ধী ১৮৯১ সালে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফিরে

দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যারিস্টার রূপে গান্ধী : ১৯১৪

মুম্বাই (অর্থাৎ বোম্বাই) শহরে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। দু' বছর পর 'দাদা আবদুল্লাহ্ অ্যাণ্ড কোম্পানি'র ব্যবসা সংক্রান্ত মামলার কাজে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা যান। সেখানে বসবাসরত ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং কংগ্রেস (দ্র)-এর ব্রিটিশবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থন জানিয়ে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন।

গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মনীতির মূলকথা ছিল অহিংসা। শত অনাচার অবিচার দমন পীড়ন সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা হিংসার পথে পা বাড়াবে না, এতে বিপক্ষের মনে করুণা জাগ্রত হবে—এই ছিল রাজনীতিতে তাঁর অহিংস নীতির মূলকথা। তিনি মনে করতেন, অহিংস শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সাধারণ মানুষের আয়ত্তে আনা সম্ভব।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গান্ধীজী দৃঢ়ভাবে গণতন্ত্রে (দ্র) বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮ বছর বয়স্ক নাগরিকদের ভোট দানের অধিকার, পঞ্চায়েত গঠন, রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও নির্বাচন সম্পর্কে তিনি বেশ কিছু নতুন প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর এসব ভাবধারার সমষ্টিকে 'গান্ধীবাদ' আখ্যা দেওয়া হয়।

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজী ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির নেতাদের অভিভাবক, পরামর্শদাতা, শান্তি ও

www.pathagar.com

নোয়াখালির গ্রামে সাঁকো পার হচ্ছেন গান্ধী : ১৯৪৫

সৌহার্দ্যের প্রতীক। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। একই উদ্দেশ্যে এক সময় খিলাফত আন্দোলনে (দ্র) সংশ্লিষ্ট হন।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি সান্ধ্যকালীন প্রার্থনাসভায় নাথুরাম গডসে নামে এক আততায়ীর গুলীতে গান্ধীজি নিহত হন।

ইংরেজি, গুজরাটি ও হিন্দি ভাষায় রচিত তাঁর যাবতীয় রচনা পরবর্তী কালে ইংরেজি ভাষায় পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

সুজ. ব.

গান্ধী, রাজীব রাজীব গান্ধী দ্র

গাভাস্কার, সুনীল মনোহর [১৯৪৯—]

ভারতের বিশিষ্ট ক্রিকেট-ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্ম ১৯৪৯ সালের ১০ই জুলাই, ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের মুম্বাই (অর্থাৎ বোম্বাই) শহরে। ক্রিকেটের কিংবদন্তি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ডান-হাতি উদ্বোধনী ব্যাট্স্ম্যান ও স্লো বোলার। ইদানীংকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটবিশেষজ্ঞ ও ভাষ্যকার। টেস্ট ক্রিকেটে বহু রেকর্ডের অধিকারী।

প্রথম টেস্ট খেলেছেন ১৯৭০-৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের (দ্র) বিরুদ্ধে। সর্বাধিক ১২৫টি টেস্টে ২১৪ ইনিংস ব্যাট করে ৩৪টি সেঞ্চুরিসহ ১০ হাজার ১২২ রান করেন। হাফ

সেঞ্চুরি ৪৫টি। সর্বোচ্চ রান ২৩৬। গড় ৫১·১২। ক্যাচ ধরেছেন ১০৮ বার। সেরা বোলিং ১০ রানে ১ উইকেট। ১০১টি এক দিনের ম্যাচ খেলে ২৭৯২ রান করেন। সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ৯২। ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছেন ৪৭টি টেস্টে। জিতেছেন ৯টিতে। ৮টি ড্র হয় এবং বাকি ৩০টিতে হেরেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে ১০ হাজার রান সংগ্রহের প্রথম রেকর্ড করেছেন গাভাস্কার, ১৯৮৭ সালের ৭ই মার্চ ভারতের আহমেদাবাদে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

রেকর্ড : একটানা সর্বাধিক ১০৬টি টেস্ট খেলেন; এক ক্যালেণ্ডার বছরে হাজার রান করেছেন ৪ বার

www.pathagar.com

(১৯৭৬—১০২৪ রান ১১ টেস্টে, ১৯৭৮—১০৪৪ রান ৯ টেস্টে, ১৯৭৯—১৫৫৫ রান ১৮ টেস্টে, ১৯৮৬—১৩১০ রান ১৮ টেস্টে); সর্বাধিক ১২৫টি টেস্ট ও ২১৪ ইনিংস খেলা; সর্বাধিক ব্যক্তিগত টেস্ট-রান ১০১২২, যা ১৯৯৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) বোর্ডার ভেঙেছেন; সর্বাধিক ৩৪টি সেঞ্চুরি; সর্বাধিক ৪৫টি হাফ সেঞ্চুরি; একই টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন ৩ বার; দ্রুততম এক হাজার রান করেন ১৯৭৮-এর ১৬ই অক্টোবর থেকে ১৯৭৯-এর ২রা জানুয়ারি পর্যন্ত মাত্র ৬ টেস্টে ; অভিষেক টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ৭৭৪ রান (১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৪ টেস্টে ৭ ইনিংসে); সর্বাধিক বার ৩৬ টেস্টের ৫৯ ইনিংসে একই জুটির উদ্বোধন (চেতন চৌহানের সঙ্গে)।

বিশ্বখ্যাত এই ক্রিকেটারের জন্মের পরপরই হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। হাসপাতালে এক জেলের ছেলের সাথে বদল হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে সুনীলের মামা মাধব মন্ত্রীর কাছে ব্যাপারটা ধরা পড়ে।

অ. ব.

গামা, ভাস্কো দা ভাস্কো দা গামা দ্র

গামা রশ্মি (gamma rays)

এক্স-রের মতো কিন্তু ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ। কোনো উত্তেজিত পরমাণু (দ্র) যখন উচ্চতর উত্তেজন-অবস্থা থেকে নিম্নতর উত্তেজন-অবস্থায় যায় তখন গামা রশ্মি নির্গত হয়। গামা রশ্মির গতিবেগ আলোর (দ্র) গতিবেগের সমান। এটি আধান (দ্র) নিরপেক্ষ এবং বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র (দ্র) দ্বারা বিচ্যুত হয় না। এই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১০$^{-১০}$ মিটার থেকে ১০$^{-১৪}$ মিটার এবং শক্তি ১০$^{-১৫}$ জুল থেকে ১০$^{-১১}$ জুল (দ্র) হয়। এই রশ্মির ভেদনক্ষমতা খুব বেশি, কয়েক সেন্টিমিটার সীসার (দ্র) পাত ভেদ করে চলে যেতে পারে। গামা রশ্মির একটি পরিচিত উৎস হল কোবাল্ট-৬০। এই রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে। তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে এই রশ্মি নির্গত হতে পারে। এই রশ্মি ফোটন (দ্র) কণিকার স্রোত হিসাবে নির্গত হয়।

শা. ত.

গারিবাল্‌দি, জুসেপ্পে [১৮০৭—১৮৮২]

ইতালির ঐক্য আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী নেতা, বিশিষ্ট স্বদেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা এবং আধুনিক ইতালির অন্যতম স্রষ্টা গারিবাল্‌দি (Giuseppe Garibaldi) আমাদের দেশে গ্যারিবল্ডি নামে অধিক পরিচিত। তৎকালীন ইতালির নিস নগরে ১৮০৭ সালের ৪ঠা জুলাই তাঁর জন্ম।

কিশোর বয়সেই তিনি জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন। তিন পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নৌসেনা বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন। ১৮৩৩ সালে ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিলোপের উদ্দেশ্যে সংগঠিত এক বিপ্লবী অভ্যুত্থানে গারিবাল্‌দি অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দণ্ড এড়াতে তিনি ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে চলে যান। এখানেই মাৎসিনির (দ্র) সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনি 'ইয়ং ইতালি' দলের সদস্য হন।

ফ্রান্স থেকে পরে গারিবল্‌দি চলে যান দক্ষিণ আমেরিকার (দ্র) উরুগুয়েতে। সেখানে এক জন সেনাধ্যক্ষ হিসাবে এবং মন্তেভিদিওর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৪৮ সালে তিনি পুনরায় ইতালিতে ফিরে আসেন এবং অস্ট্রীয় ও ফরাসি সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্য দিয়ে মাৎসিনির নেতৃত্বাধীন রোম প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে এগিয়ে যান। কিন্তু অচিরকালের মধ্যে এই প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটলে পুনরায় স্বদেশের মাটি ছেড়ে পালিয়ে যান।

এর পর এক দশকের পলাতক জীবন। ১৮৫৯ সালে স্বদেশে বিপ্লবের ভেরি বেজে ওঠে। ১৮৬০ সালে তিনি গঠন করেন ১ হাজার সৈন্যবিশিষ্ট 'লাল কুর্তা' বাহিনী এবং স্বদেশে ফিরে এই বাহিনীর সাহায্যে অধিকার করে নেন সিসিলি ও নেপল্‌স্ নামে দক্ষিণ ইতালির দু'টি রাজ্য।

www.pathagar.com

১৮৬১ সালে ইতালি সাম্রাজ্যের নবনিযুক্ত অধিপতি ভিক্তর ইমানুয়েলের হাতে তিনি রাজ্য দুটোর অধিকার তুলে দেন। খণ্ডবিখণ্ড ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল গারিবাল্‌দির জীবনের প্রধান কৃতিত্ব। ইতালির জাতীয় সঙ্গীত 'গারিবাল্‌দি সঙ্গীত' নামে খ্যাত।

১৮৮২ সালের ২রা জুন ইতালির কাপ্রেরাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

আ. হ.

গারো

গারো জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের (দ্র) ময়মনসিংহ জেলায় বসবাসকারী আদিবাসী। ময়মনসিংহ ছাড়া টাঙ্গাইল ও সিলেট (দ্র) জেলাতেও তারা বাস করে। হালুয়াঘাট, শ্রীবর্দী, কমলাকান্দা, বিরিশিরি, বারহাট্টা, মধুপুর গড় ইত্যাদি স্থানে তাদের বেশি সংখ্যায় বাস করতে দেখা যায়। ভারতের (দ্র) মেঘালয়, ত্রিপুরা, আসাম রাজ্যেও তারা বাস করে। তবে মেঘালয় রাজ্যেই তাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

গারোরা মঙ্গোলীয় জাতির বোরো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। গারো এবং তাদের সম-ভাষাভাষী আসামের বোরো উপজাতীয় লোকেরা খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের দিকে মঙ্গোলিয়া ছেড়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আসাম রাজ্যের দিকে এসেছিল। এক সময় তারা সমগ্র ব্রহ্মপুত্র (দ্র) অঞ্চল, ভুটান (দ্র), মণিপুর, নাগা পর্বতের পশ্চিম অঞ্চল, ত্রিপুরা (দ্র) ও বাংলাদেশের নানা স্থানে বাস করত। ১৯২১ সালে গারোদের সংখ্যা ছিল ২,১৬,১১৭ জন।

গারো সমাজে মায়ের পরিচয়েই ছেলেমেয়েদের পরিচয়। মেয়েরা তাদের পরিবারের যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী। গারো ছেলেরা বিয়ে করে স্ত্রীর বাড়িতে থাকে।

গারোদের ধর্মে তাদের স্রষ্টার নাম বাবুগা। তাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের নাম 'ওয়ান গালা'। আশ্বিন মাসে সাত দিন ধরে উৎসব চলে। এ সময় নাচ, গান ও খাওয়ার ধুম চলে। গারোরা খুব সরল ও সাদাসিধে জীবন যাপন করে।

বি. ব.

ক্ষেতে কাজের অবসরে দুই গারো কিশোরী ও মা

গার্ল গাইড্‌স্ (Girl Guides)

বয় স্কাউটের (দ্র) অনুরূপ সাত থেকে আঠারো বছর বয়সী মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আন্দোলন। এটিকে কোনো কোনো দেশে গার্ল স্কাউট্‌স্ আন্দোলনও বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হল খেলাধুলা, সামাজিক সেবাকর্ম ও গার্হস্থ্য প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে মেয়েদের চরিত্র গঠন করতে এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা।

বয় স্কাউটের ন্যায় গার্ল গাইড্‌স্ আন্দোলনেও বিভিন্ন স্তরে দক্ষতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ধাপে ধাপে উন্নতির বিধান রয়েছে। গার্হস্থ্যবিদ্যা, শিল্প-সাহিত্য, খেলার জগৎ, হস্ত ও কুটির শিল্পের মতো বিভিন্ন সৃজনশীল ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রসরতার পেছনে আজ দেশে দেশে গার্ল গাইড্‌স্ জোরালো অবদান রাখছে। বাংলাদেশেও (দ্র) গার্ল গাইড্‌সের কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

বয় স্কাউট্‌স্ আন্দোলনের প্রবর্তক স্যার রবার্ট-ব্যাডেন-পাওয়েল (Robert Baden-Powell : ১৮৫৭-১৯৪১)-এর বোন এগনেস ব্যাডেন-পাওয়েল (Agnes Baden-Powell) ১৯১০ সালে প্রথম ইংল্যাণ্ডে গার্ল গাইড্‌স্ আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯১২ সালে জুলিয়েট গর্ডন লো (Juliet Gordon Low) ব্রিটিশ গার্ল গাইড্‌সের ধারা অনুসরণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) গার্ল গাইড্‌স্ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁর উদ্যোগে গার্ল গাইড্‌স্ আন্দোলন ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে এবং ক্রমে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুজ. ব.

www.pathagar.com

গালভানি, লুইজি [১৭৩৭—১৭৯৮]

ইতালির চিকিৎসাবিদ, বিজ্ঞানী। গালভানির (Luigi Galvani) জন্ম ৯ই সেপ্টেম্বর ১৭৩৭; মৃত্যু ৪ঠা ডিসেম্বর ১৭৯৮। তিনি প্রাণিদেহে বিদ্যুতের প্রভাব সম্পর্কীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পরীক্ষার সূত্র ধরেই আলেসান্দ্রো ভোল্‌তা (দ্র) চলবিদ্যুৎকোষ আবিষ্কার করেন।

গালভানি বলোগ্‌নার মেডিক্যাল স্কুলে পড়াশোনা করেন। স্নাতক হওয়ার পর এই স্কুলেই শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি ভেষজবিদ্যা (দ্র), শল্যবিদ্যা (দ্র) ও শারীরবিদ্যা (দ্র) শিক্ষাদান ও চর্চা করতেন। এই সময় (১৭৮০) তিনি মাংসপেশি এবং স্নায়ুতন্ত্রের (দ্র) উপর স্থির-বিদ্যুতের প্রভাব পরীক্ষা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি চামড়া ছাড়ানো, লবণ-পানিতে সিক্ত একটি ব্যাঙ তামার তার দিয়ে লোহার রেলিং-এর সঙ্গে ঝুলিয়ে দেন। অতঃপর ঐ ব্যাঙের স্নায়ুরজ্জুতে পিতলের আংটা দিয়ে সংযোগ দেওয়া মাত্রই ব্যাঙের মাংসপেশির সংকোচন দেখতে পান। এ থেকে তিনি এই তত্ত্বে উপনীত হন যে প্রাণীর স্নায়ু এবং মাংসপেশিসমূহে তড়িৎদ্রবণ বিদ্যমান। আলেসান্দ্রো ভোল্‌তা পরবর্তী সময়ে দেখান যে এই বিদ্যুৎ (দ্র) মূলত লবণ-পানিতে সিক্ত ধাতব পাত থেকে উৎপন্ন হয়; এর উৎস প্রাণিদেহ নয়। গালভানির এই গবেষণাই ইলেক্ট্রো-ফিজিওলজি বা নিউরো-ফিজিওলজির ভিত্তি। তাঁরই নামানুসারে তড়িৎমাপক যন্ত্রের নাম রাখা হয়েছে গালভানোমিটার (galvanometer) এবং লোহার উপর দস্তার প্রলেপকে বলা হয় গালভানাইজেশন।

বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিদ গালভানি ব্যাঙ নিয়ে পরীক্ষা করে আবিষ্কার করেন ইলেক্ট্রো-ফিজিওলজির ভিত্তি

স. রা.

গালিব, মির্জা [১৭৯৭—১৮৬৯]

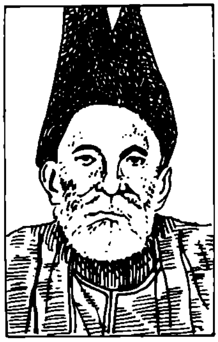

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত উর্দু কবি। পুরো নাম মির্জা নওশা ওরফে আসাদুল্লাহ্ খাঁ গালিব। সচরাচর 'মির্জা গালিব' নামে পরিচিত। তিনি ১৭৯৭ সালে ভারতের (দ্র) আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন।

কবির পূর্বপুরুষেরা তুরস্ক (দ্র) থেকে ভারতে আসেন ভাগ্যান্বেষণে। শৈশবে পিতার মৃত্যু হলে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হন। মাতামহের তত্ত্বাবধানে তাঁর নতুন জীবন শুরু হয়। তিনি চলে আসেন আগ্রায়। ভর্তি হন এখানকার এক মক্তবে। নয় থেকে দশ বছর বয়সেই মুখে মুখে কবিতা রচনা করে সবাইকে অবাক করে দেন। উর্দু ছাড়া ফার্সি ভাষাতেও তিনি 'শেয়র্' অর্থাৎ কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গালিবের বড় কীর্তি ১৮৬২ সালে 'কার্তে-ই বুরহান' নামে একটি সংশোধিত ফারসি শব্দকোষ-গ্রন্থের সম্পাদনা ও প্রকাশনা।

ব্যক্তিজীবনের গভীর উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে। তাঁর বাণী হয়ে উঠেছে সর্বমানবের বাণী।

তাঁর 'দিওয়ান-ই-গালিব' (গালিবের কাব্যসংগ্রহ) উর্দু সাহিত্যেরই শুধু নয়, বিশ্বসাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ।

১৮৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

www.pathagar.com

গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত

জোনাথন সুইফ্‌ট্ (দ্র) রচিত যুগান্তকারী বক্তব্যপ্রধান কাহিনী। ইংরেজি ভাষায় (দ্র) লেখা এই কাহিনী ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আদলে রচিত। ১৭২১ সাল থেকে ১৭২৬ সালের মধ্যে সুইফ্‌ট্ এই লেখা শেষ করেন বলে মনে করা হয়। ১৭২৬ সালের ২৮শে অক্টোবর এই বই প্রকাশিত হয়। ১৮শ শতকে ইংল্যাণ্ডে এই ভ্রমণকাহিনী বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। Gulliver's Travels বইটি বাজারে প্রচলিত ভ্রমণকাহিনীর প্যারডি (দ্র)। এর প্রতিটি অসম্ভব অভিযানের অন্তরালে প্রচলিত ভ্রমণকাহিনীগুলোর প্রতি এক মর্মান্তিক ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই বই ৪ খণ্ডে রচিত। প্রত্যেকটি খণ্ড এক-একটি সম্পূর্ণ কাহিনী, আবার তেমনি সম্মিলিতভাবে সেগুলো একটি উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র গালিভার প্রতিবার ঘরে ফিরে ভ্রমণের নেশায় আবার বেরিয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে তাকে প্রত্যেক বার নতুন দেশে গিয়ে পৌঁছুতে হয়। লিলিপুটের দেশে যাওয়া একটি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, ব্রবডিংনাগে তাকে ফেলে রেখে প্রাণ নিয়ে সহকর্মীদের পলায়ন, লাপুতায় দস্যুদের নিষ্ঠুরতা এবং হুইনিমল্যাণ্ডে (Houyhnhnm-land) যেতে গালিভারকে রীতিমতো খালাসিদের বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে হয়। সুইফ্‌ট্ ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে শেরিডনকে লেখেন, 'মানুষের কাছ থেকে তার সাধ্যের অতীত কিছু আশা করবেন না। দিন দিন দেখবেন ইয়াহুদের সম্পর্কে আমার বৃত্তান্তগুলো কেমন ফলে গেছে।' সুইফ্‌ট্ মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর গুরুত্ব দেন। কিন্তু গালিভারের ভ্রমণকাহিনীতে এই বিশ্বাস বারবার ভঙ্গ হয়েছে। গালিভার যতই নতুন নতুন দেশ দেখছে, মানুষ বা মানবাকৃতির জন্তু-জানোয়ারের হিংস্রতাও তত বেশি প্রত্যক্ষ করছে। আর ততই সে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছে। এর একটি তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে হুইনিমল্যাণ্ড থেকে গালিভারের বহিষ্কৃত হওয়ার পর। হুইনিমল্যাণ্ড হল ঘোড়াদের রাজ্য। এই মহান অশ্বরাজ্যে দু' বছর সসম্মানে বাস করার পর যখন তাকে চলে যেতে হয় তখন সমুদ্রে মানুষের প্রথম সংস্পর্শেই তাকে আত্মগোপন করতে হয়েছিল এবং তীরের আঘাতে আহত হতে হয়েছিল।

এ যেন স্বর্গপ্রাপ্তির পর আবার হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে (দ্র) মানুষের নির্বাসন।

গালিভার লিলিপুটের দেশে গিয়ে ক্ষুদে মানুষের দেখা পায়। ব্রবডিংনাগে দৈত্যাকার মানুষের দেখা পায়। লাপুতার মানুষের মাথা হয় ডান, নয়তো বাঁ দিকে কাত করা। দু'চোখের একটি ভেতরের দিকে ঘোরানো, অন্যটি সোজাসুজি ঊর্ধ্বমুখী। আরো কত তাদের অদ্ভুত সব কাণ্ড! এই চতুর্থ খণ্ডে হুইনিমরা দেবতুল্য এবং ইয়াহুরা (Yahoos) শয়তানতুল্য। এ সবের মধ্যে গালিভার হল দোষেগুণে একমাত্র মানুষ। বিভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণের সময় গালিভারের অসহায়ত্ব, আত্মসমালোচনা, বিভিন্ন ঘটনার উপর চমৎকার মন্তব্য, তার অহঙ্কার, লজ্জা, সহানুভূতিশীল অন্তর ইত্যাদি তাকে একটি সুন্দর সরল ভালমানুষ চরিত্র হিসাবে অমর করে তুলেছে। গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত জোনাথন সুইফ্‌টের অমর সৃষ্টি।

বি. ব.

www.pathagar.com

গালিলেও গালিলেই [১৫৬৪—১৬৪২]

রেনেসাঁস (দ্র) যুগের ইতালীয় বিজ্ঞানী গালিলেও গালিলেই (Galileo Galilei) বাঙালির কাছে সাধারণত গ্যালিলিও নামে পরিচিত। এঁকে আধুনিক পরীক্ষণ- বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। তিনি ১৫৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পিসা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ২০ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা অবস্থাতেই তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'দোলকের নিয়ম' আবিষ্কার করেন। কথিত আছে যে পিসা ক্যাথিড্রালের দীর্ঘ ঝুলন্ত বাতিটির দোলনকাল হাতের নাড়ির সাহায্যে পরিমাপ করেই তিনি এই আবিষ্কারটি করেছিলেন। এ থেকেই দোলক ঘড়ির উৎপত্তি সম্ভব হয়েছিল।

শুরুতে চিকিৎসাবিদ্যা (দ্র) অধ্যয়ন করলেও শেষ অবধি গণিত (দ্র) ও পদার্থবিদ্যাই (দ্র) তাঁর বিষয় হয় এবং ২৫ বছর বয়সে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর আগেই তিনি তাঁর বিখ্যাত 'পড়ন্ত বস্তুর নিয়ম'টি আবিষ্কার করেন। প্রাচীন গ্রিক আমল থেকেই যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল তা হল—একই উচ্চতা থেকে ফেললে হালকা বস্তুর আগে ভারি বস্তু মাটিতে পড়বে। গালিলেও পড়ার গতির ত্বরণ (দ্র) সম্পর্কে তাঁর নির্ভুল ধারণা থেকে দেখান যে নিচে পড়ার গতি ওজনের উপর নির্ভর করে না। এ সম্পর্কে কাহিনী হল, তিনি পিসার হেলানো গম্বুজের উপর থেকে ভারি ও হালকা জিনিস এক সঙ্গে ফেলে অনেক দর্শকের সামনে প্রমাণ করেন যে এরা এক সঙ্গে মাটিতে পড়েছে। গবেষণাগারে সহজ পরীক্ষণের মাধ্যমে গতিবিদ্যার মৌলিক কিছু সাধারণ সূত্র গালিলেও প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন আদিবেগ ও ত্বরণ জানা থাকলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বেগ কত হবে, কত দূরত্ব অতিক্রম করবে ইত্যাদি। জড়তার (দ্র) নিয়মও গালিলেওর আবিষ্কার। এভাবে তিনি পরবর্তী কালে নিউটনীয় গতিবিদ্যার জন্য পথ করে দেন। তিনিই দেখান যে সমগতিতে চলন্ত বস্তুর প্রত্যেকের নিজস্ব একটি জড়তার কাঠামো রয়েছে। এ রকম এক কাঠামো থেকে অন্য কাঠামোর গতি পর্যবেক্ষণ করলে এদের মধ্যে একটি আপেক্ষিকতা থাকবে, যাকে এখন গালিলীয় আপেক্ষিকতা বলা হয়।

গালিলেও আর যে বিষয়টিতে দৃষ্টিভঙ্গির অগাধ পরিবর্তন এনেছেন তা হল জ্যোতির্বিদ্যা (দ্র)। সেকালের সবচেয়ে উন্নত কিছু দূরবীক্ষণ (দ্র) যন্ত্র তিনি নিজে তৈরি করেন এবং জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণে দূরবীনকে কাজে লাগিয়ে চমৎকার সব আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম প্রচলিত ধারণা ভেঙে দিয়ে দেখান যে চাঁদের ভূমি এবড়োখেবড়ো পাহাড়ে-খাদে ভর্তি, এর আলো ধার করা, ছায়াপথ অসংখ্য তারার সমষ্টি ইত্যাদি। বৃহস্পতির (দ্র) চারটি চাঁদ (দ্র) তিনি আবিষ্কার করেন, শনিগ্রহের (দ্র) অদ্ভুত আকৃতিও তিনিই প্রথম লক্ষ করেন। তাঁর বহু সিদ্ধান্ত অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও মানতে চান নি। কিন্তু তাঁর স্পষ্ট প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে সবাইকে শেষ পর্যন্ত তা মানতে হয়েছে। তাঁর আগে কোপার্নিকাস (দ্র) সূর্যের (দ্র) চারিদিকে পৃথিবীর (দ্র) পরিক্রমণের যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন সেটি সবার কাছে অগ্রহণীয় ও নিন্দনীয় হলেও গালিলেও একে যুক্তিপূর্ণ ও জোরালো সমর্থন দেন। এর ফলে তাঁকে খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের রোষানলে পড়তে হয়। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিজের মত প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে এবং বাকি জীবন তাঁকে নিজ বাড়িতে নজরবন্দি হয়ে থাকতে হয়। শেষ

www.pathagar.com

জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং এ অবস্থায় ১৬৪২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ফ্লোরেন্স নগরীতে সমাহিত হন।

মু. ই.

গালেন্‌ গ্যালেন্‌ দ্র

গিটার (guitar)

পাশ্চাত্য তার-যন্ত্র। লোকযন্ত্র হিসাবেই এর খ্যাতি। এর সমতল পৃষ্ঠদেশ কিঞ্চিৎ গোল হয়ে আসে। দু'পাশের গড়ন

বেহালার (দ্র) মতো। দেখতেও বেহালার সঙ্গে গিটারের সাদৃশ্য আছে। গিটারে সাধারণত ছয়টি তার থাকে। পটরীর ওপর দিয়ে তারসমূহ ওপরের প্রান্ত থেকে নিম্ন প্রান্ত পর্যন্ত লম্বালম্বি টানা থাকে। দুই ধরনের গিটারের প্রচলন দেখা যায়—স্প্যানিশ গিটার ও হাওয়াইয়ান গিটার। স্প্যানিশ গিটার বাম হাতে পর্দা টিপে ডান হাতে তারে আকর্ষণ করে বাজাতে হয়। হাওয়াইয়ান গিটার ডান হাতে তারে আকর্ষণ করে বাম হাতে পর্দার ওপর দিয়ে একটি ক্ষুদ্র ধাতব দণ্ড চালনা করে বাজানো হয়; ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমায় মেজ্‌রাব জাতীয় একটি বস্তু পরিধান করা হয়ে থাকে।

গিটার বর্তমানে আমাদের সঙ্গীতেও একটি বহুল ব্যবহৃত যন্ত্র। ব্যাণ্ড মিউজিকে গিটার, বিশেষত স্প্যানিশ গিটার আবশ্যিকভাবে বাজানো হয়। একক বাদনযন্ত্র হিসাবেও গিটার আমাদের দেশে জনপ্রিয়। অনেকে রাগসঙ্গীতের অঙ্গে গিটার বাজিয়ে থাকেন। আধুনিক গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত (দ্র), নজরুলসঙ্গীত (দ্র) প্রভৃতিতে সহযোগী যন্ত্রবাদনে গিটারের ব্যবহার জনপ্রিয়।

ক. গো.

গিনেস্‌ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুক

এটি একটি বই, সঠিক নাম The Guinness Book of World Records; আমরা ছোট করে একে 'গিনেস্‌ বুক' 'গিনেস্‌ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড', শুধুই 'গিনেস্‌' ইত্যাদি বলে থাকি।

গিনেস্‌ এক প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের নাম Guinness Publishing Ltd; এই প্রকাশনালয় ১৯৫৫ সাল থেকে প্রতি বৎসর বার্ষিকী হিসাবে সারা পৃথিবীর (দ্র) শ্রেষ্ঠ সংবাদসঙ্কলন প্রকাশ করে আসছে। এই বইটি বস্তুতপক্ষে যাবতীয় বিষয়ের শ্রেষ্ঠ খতিয়ান। যেমন এই বার্ষিকীতে এ জাতীয় তথ্য পাওয়া যায় : পৃথিবীর সবচেয়ে বেঁটে/ঢ্যাঙ্গা/স্থূলকায়/কম ওজনের/বেশি ওজনের মানুষের নাম ও দেশ, কিংবা কোন খেলায় কোন খেলোয়াড় কোন সালে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছিল ইত্যাদি এমন সব খুঁটিনাটি—যা অন্য কোনো বইয়ে পাওয়া সম্ভব নয়।

ফলে গিনেস্‌ রেকর্ড বইয়ে নাম ওঠা মানে কোনো না-কোনো দিকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত হওয়া। যেমন, ধরা যাক, কেউ যদি ৬ মাস না-ঘুমিয়ে থাকতে পারে কিংবা বিনা আহারে থাকতে পারে, তার নাম 'দ্য গিনেস্‌ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড'-এ নিশ্চিতভাবে উঠে যাবে। অবশ্য তথ্য-প্রমাণসহ সংবাদটি পৌঁছে দিতে হবে তাদের কাছে।

হা. মা.

গিয়ার চাকা

অধিকাংশ আধুনিক যন্ত্রের (দ্র) জন্য গিয়ার (gear) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গিয়ারের সাহায্যে একটি চাকা বা ধুরার (spindle) গতির (দ্র) দিকপরিবর্তন করা যায়, গতিকে বাড়ানো বা কমানো যায় এবং যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন রকম দাঁত কাটা হয় গিয়ার চাকার উপরে।

www.pathagar.com

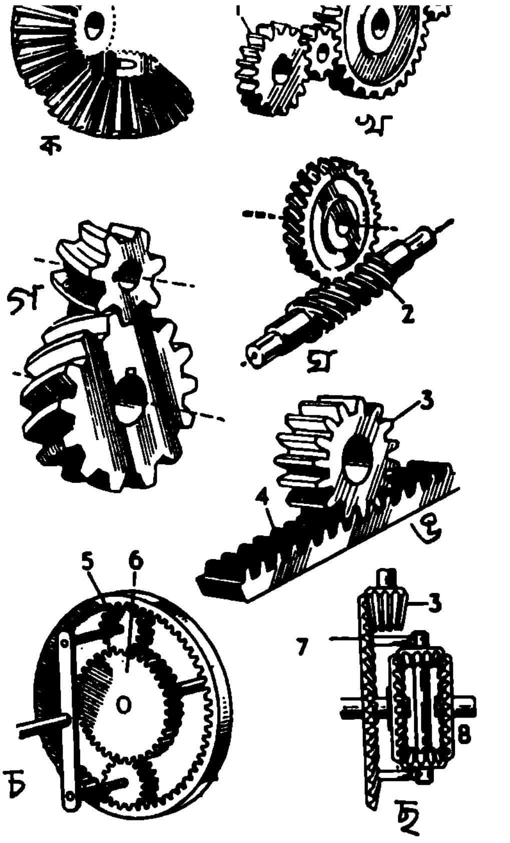

ক. বেভেল গিয়ার খ. গিয়ার সমাবেশ গ. হেলিক্যাল গিয়ার ঘ. ওয়ার্ম গিয়ার ঙ. র‍্যাক ও পিনিয়ন চ. সূর্য ও গ্রহ বা এপিসাইক্লিক গিয়ার-ব্যবস্থা ছ. ডিফারেনশিয়াল গিয়ার :

১. কগ্ বা গিয়ার-চাকা ২. ওয়ার্ম ৩. পিনিয়ন ৪. র‍্যাক

৫. গ্রহ-চাকা ৬. সূর্য-চাকা ৭. মুকুট ৮. ডিফারেনশিয়াল অংশ

মোটরগাড়ি (দ্র), ঘড়ি (দ্র), গম ভাঙার মেশিন ইত্যাদিতে আমরা নানা রকম গিয়ারের ব্যবহার দেখতে পাই। মোটরগাড়ির স্টিয়ারিং হুইল ব্যবহার করে আমরা যখন গাড়ির চাকার দিকপরিবর্তন করি তখন যে গিয়ার ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় ওয়ার্ম গিয়ার। গাড়ির ইঞ্জিনের শক্তিকে পেছনের চাকায় ঘূর্ণনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সঞ্চারণ (transmission) গিয়ার এবং অন্তর (differential) গিয়ার ব্যবহার করা হয়। ইঞ্জিনের শক্তি প্রথমে ফ্লাই হুইলে ঘূর্ণনশক্তিরূপে প্রেরণ করা হয় এবং গিয়ারব্যবস্থা ব্যবহার করে ইচ্ছা মতো চাকার ঘূর্ণনগতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।ইঞ্জিনের গতি ও গিয়ারের ঘূর্ণনগতির অনুপাত বদলাবার জন্য বিভিন্ন গিয়ার ব্যবহার করা হয়। পাহাড়ে ওঠার সময় গাড়ির প্রথম গিয়ার ব্যবহার করা হয়। কারণ বল বাড়াবার জন্য আমরা যান্ত্রিক সুবিধা গ্রহণ করি। সমতল পথে দ্রুত গতির জন্য উচ্চ গিয়ার ব্যবহার করা হয় ইঞ্জিনের চাকার তুলনায় গিয়ারের চাকা বেশি বেগে ঘোরাবার জন্য।

আ. আ.

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ [? — ১৪১০]

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা সুলতান। ইলিয়াসশাহী বংশের (১৩৫১–১৪০৯) সুলতান সিকান্দার শাহ্ তাঁর পিতা।

জানা যায়, সিকান্দার শাহ্ তাঁর জীবদ্দশায় পুত্র গিয়াসউদ্দিনের হাতে রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করেন। কথিত আছে যে, সৎ মায়ের চক্রান্তের কারণে পিতা সিকান্দার শাহের সঙ্গে পুত্র গিয়াসউদ্দিনের মনোমালিন্য হয় এবং তিনি সোনারগাঁয়ে পালিয়ে যান। ভুল বোঝাবুঝি এমনই চরম পর্যায়ে পৌঁছয় যে গিয়াসউদ্দিন সৈন্যসামন্ত নিয়ে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী গোয়ালপাড়া গ্রামে উভয়ের সেনাদল মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধে সিকান্দার শাহ্ পরাজিত ও নিহত হন। পিতার মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দিন গৌড়-বঙ্গের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকার লাভ করেন (১৩৮৯)।

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ অত্যন্ত সাহসী, ন্যায়বিচারক এবং সাহিত্যানুরাগী নরপতি ছিলেন। তিনি নিজে কবিতা (দ্র) রচনায় পারদর্শী ছিলেন। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও সাহিত্যানুরাগী হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজকে (দ্র) তিনি বাংলার সোনারগাঁয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। হাফিজ আসতে পারেন নি; কিন্তু ফার্সি ভাষায় একটি কবিতা লিখে সুলতানের কাছে উপহার পাঠান। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি (দ্র) এবং বাংলা রোমান্টিক কাহিনী-কাব্যের কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর (দ্র) তাঁর আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। এ জন্যই তাঁরা তাঁদের রচনায় গিয়াসউদ্দিনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

উত্তরবঙ্গের ভাতুরিয়ার জমিদার রাজা গণেশের চক্রান্তের

www.pathagar.com

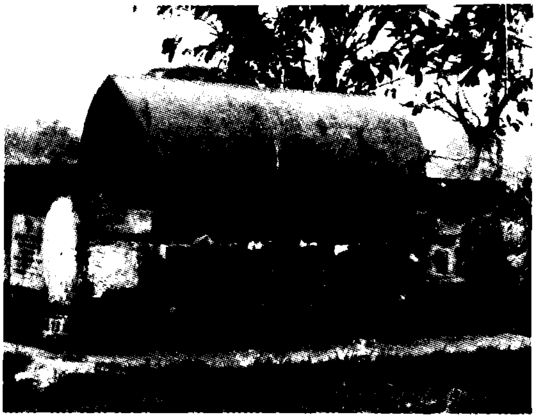

সোনারগাঁয়ে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধি

ফলে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ নিহত হন। নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন সোনারগাঁয়ের মোগরাপাড়ায় অবস্থিত তাঁর সমাধিসৌধের লিখন থেকে জানা যায় যে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মনোরম কষ্টিপাথরে নির্মিত সমাধিসৌধটি দেখার জন্য এখনো পর্যটকেরা ভিড় জমায়।

মু. মা.

গিয়াসউদ্দীন বলবন [শা. ১২৬৬—১২৮৭]

গিয়াসউদ্দীন বলবনের প্রকৃত নাম বাহাউদ্দীন। বলবন তাঁর উপাধি। গিয়াসউদ্দীন তাঁর রাজ-উপাধি।

বলবন জন্মসূত্রে তুর্কি। তাঁর পিতা এক জন তুর্কি নেতা। যৌবনে তিনি মঙ্গোলদের হাতে বন্দি হন। বাগদাদের খাজা জামালউদ্দিন বসরী মঙ্গোলদের হাত থেকে বলবনকে ক্রয় করেন। ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান ইল্‌তুৎমিস (দ্র) তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তিনি নিজ গুণ ও প্রতিভাবলে সুলতানের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল হন। সুলতান নাসিরউদ্দিন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তিনি সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং 'গিয়াসউদ্দীন বলবন' উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বলবন সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে একটি শক্তিশালী গুপ্তচর বাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি ন্যায়বিচারক ছিলেন। ঐতিহাসিক ড. ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, "সুলতানের ন্যায়বিচারের জন্য লোক এতই সন্ত্রস্ত থাকিত যে কেহ কখনো ভৃত্য-ক্রীতদাসদের প্রতিও অসদাচরণ করিতে সাহস করিত না।"

পুত্র বুগ্‌রা খানকে তিনি বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। ১২৮৭ সালে গিয়াসউদ্দীন বলবন পরলোক গমন করেন।

খু. জা.

গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৮৪৪—১৯১২]

বাংলা নাট্যমঞ্চের যুগস্রষ্টা নট ও নাট্যকার এবং রঙ্গমঞ্চ পরিচালক। তিনি ১৮৪৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতার (দ্র) বাগবাজার এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রাথমিক শিক্ষাজীবন স্থানীয় এলাকার বিদ্যালয়ে শুরু হয়। পরে গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয় ও হেয়ার স্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৮৬২ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। তবে পরবর্তী কালে একান্ত নিজস্ব চেষ্টায় তিনি ইংরেজি ভাষা ও হিন্দু পুরাণ বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এরপর তিনি 'অ্যাটকিন্সন্ টিল্‌কন্' কোম্পানির হিসাবরক্ষণ বিভাগে শিক্ষানবিশ হিসাবে যোগ দেন।

গিরিশ ঘোষ ১৮৬৭ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (দ্র) শর্মিষ্ঠা নাটকের গীতিকার হিসাবে নাট্যজগতের সঙ্গে প্রথম যুক্ত হন। ১৮৬৯ সালে দীনবন্ধু মিত্রের (দ্র) 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করে জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

১৮৭২ সালে জোড়াসাঁকোতে মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত থাকলেও, দলের লোকজনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। ফলে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ অবৈতনিক অভিনেতা হিসাবে মঞ্চে অবতরণ করেন।

www.pathagar.com

১৮৭৬ সালে গিরিশ ঘোষ 'ইণ্ডিয়ান লীগ'-এর হেড ক্লার্ক্ ও ক্যাশিয়ার পদে, পরে পার্কার কোম্পানির হিসাব-রক্ষকের পদে যোগ দান করেন। ১৮৭৭ সালে স্বরচিত 'আগমনী' নাটক 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ অভিনীত হয়। পরে তিনি এই রঙ্গালয়ের ম্যানেজার নিযুক্ত হন (১৮৮০)। ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তিনি স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক ও কোহিনুর ইত্যাদি রঙ্গালয় পরিচালনা করেন। ১৯০৮ সালে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং আজীবন এই পদে সমাসীন ছিলেন।

নাটকের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্ট থাকার সময়পর্বকে 'গিরিশ যুগ' বলে এবং তাঁর নাটকে ব্যবহৃত ছন্দ-রীতিকে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে অভিহিত করা হয়। নট হিসাবে তিনি 'বাংলার গ্যারিক' নামেও খ্যাতি লাভ করেন। গ্যারিক (দ্র) ছিলেন অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত ইংরেজ নট। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রায় ৭০টি নাটক, প্রহসন ও গীতিনাট্যের রচয়িতা। বিদেশী কিছু নাটকও তিনি বাংলায় অনুবাদ (দ্র) করেন। এসবের মধ্যে অনুবাদ : 'আগমনী', 'দোললীলা' ও 'মায়াতরু'; পৌরাণিক নাটক : 'জনা', 'পাণ্ডব-গৌরব', 'রাবণবধ' ও 'সীতার বনবাস'; মহাপুরুষদের জীবনীভিত্তিক : 'চৈতন্যলীলা', ও 'বুদ্ধদেব-চরিত'; সামাজিক ও বিয়োগান্তক : 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'হারানিধি' ও 'চণ্ড' প্রভৃতি এবং দেশপ্রেমমূলক ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীর কাসিম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৯১২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

গিরিশচন্দ্র সেন [১৮৩৪—১৯১০]

জন্ম ঢাকা জেলার (বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলার) পাঁচদোনা গ্রাম। তিনি বাংলা ভাষায় (দ্র) প্রথম কুরআন শরীফের (দ্র) সটীক অনুবাদ (দ্র) ও ৯৬ জন খ্যাতনামা সাধকের জীবনী-রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। 'ভাই' গিরিশচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম (দ্র)-অবলম্বী এবং কেশবচন্দ্র সেনের (দ্র) শিষ্য। কেশবচন্দ্রের নির্দেশে তিনি ইসলামধর্ম বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং ইসলামী গ্রন্থমালা ও মুসলমান সাধকদের জীবনী আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হন। কুরআন শরীফের অনুবাদ ছাড়াও তিনি 'মিশকাত শরীফে'র অর্ধেক অনুবাদ করেন। মুসলিম সুফি-দরবেশদের জীবনচরিত বিষয়ে ফার্সিতে লেখা শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তারের 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা' রচনা করেন। গিরিশচন্দ্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'তত্ত্বরত্নমালা' শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তারের 'মানতেকুত্তায়ের' এবং মওলানা জালালুদ্দিন রুমির (দ্র) 'মসনবী শরীফ' অবলম্বনে সঙ্কলিত। এ ছাড়াও তিনি 'দীওয়ান-ই-হাফিজ', 'গুলিস্তাঁ', 'বুস্তাঁ' প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদের পাশাপাশি 'তত্ত্বকুসুম', 'মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবন-চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলার মুসলিম সমাজ তাঁর এই ইসলাম (দ্র) প্রীতি ও সাধনার জন্য ভালবেসে তাঁকে 'ভাই' ও 'মৌলবী' আখ্যায় আখ্যায়িত করতেন।

নারীসমাজের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি সম্পর্কে উৎসাহী গিরিশচন্দ্র 'মহিলা' মাসিকপত্রেরও প্রকাশক এবং সম্পাদক ছিলেন।

মে. খা.

গির্জা

খ্রিস্টানদের সমবেত উপাসনালয় বা প্রার্থনামন্দির। ইংরেজি 'চার্চ' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ গির্জা, তবে চার্চ শব্দে কখনো

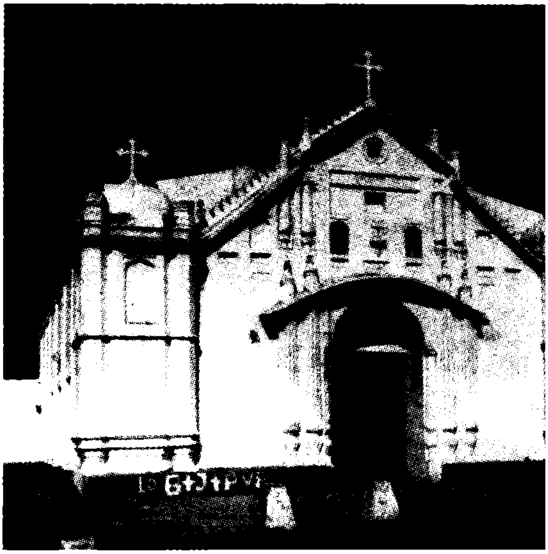

তেজগাঁওয়ে ঢাকার সবচেয়ে পুরানো গির্জা

www.pathagar.com

কখনো খ্রিস্টীয় ধর্মসংঘ বা খ্রিস্টমণ্ডলীও বোঝায়। গির্জা শব্দ এসেছে পর্তুগিজ 'ইগ্রেজা' থেকে এবং ইগ্রেজা এসেছে মূল গ্রিক শব্দ 'এক্লেসিয়া' থেকে।

প্রথম যুগে খ্রিস্টভক্তরা ইহুদিদের সমাজগৃহে বা নবদীক্ষিত কোনো গৃহস্থের বাড়িতে সমবেত হত। খ্রিস্টানদের নিজস্ব প্রথম গির্জাগুলো রোমীয় অট্টালিকার অনুকরণে নির্মিত হয়। রোমীয় আকারের এরূপ প্রাচীন গির্জার নাম বাসিলিকা (Basilica)। মধ্যযুগে নির্মিত পাশ্চাত্য জগতের গির্জাগুলোর নাম গথিক ক্যাথিড্রাল।

ভিন্ন ভিন্ন গির্জার ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রচলিত। বিশপ বা ধর্মযাজকের আসন যে গির্জায় প্রতিষ্ঠিত সেই গির্জার নাম 'ক্যাথিড্রাল'। মঠ বা আশ্রম সংলগ্ন গির্জার নাম 'মিনিস্টার'। বড় গির্জার অন্তর্গত বা আলাদা ও ছোট ভজনালয়ের নাম 'চ্যাপেল'। তীর্থস্থানের প্রার্থনালয়ের নাম 'শ্রাইন'। এক-একটি গির্জা খ্রিস্ট, খ্রিস্টজননী মারিয়া, কিংবা কোনো সাধু-সন্তের নামে পরিচিত, যথা ক্রাইস্ট্স্ চার্চ, সেন্ট মেরিজ চার্চ, সেন্ট পিটার্স্ চার্চ বা সেন্ট পল্স্ ক্যাথিড্রাল।

প্রত্যেক গির্জার প্রধান স্থানে একটি বেদি থাকে, সেই বেদিতে 'প্রভুর ভোজ' অনুষ্ঠানের সময় খ্রিস্টের স্মরণে উৎসর্গীকৃত রুটি ও দ্রাক্ষারস রাখা হয় এবং বেদিতে একটি ক্রুশ-মূর্তি থাকে। বহু গির্জায় উপদেশমঞ্চ বা পুলপিট (pulpit) থাকে। এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ধর্মযাজক উপাসকদের উপদেশ দান করেন। গির্জায় আর একটি থাকে দীক্ষাকুঞ্জ অর্থাৎ দীক্ষার্থীরা খ্রিস্টের নামে যেখানে দীক্ষাস্নাত হয়। গির্জায় যাজক ও সেবকদের পরিধেয় পোশাক ও পাত্রগুলো যেখানে রাখা হয় তার নাম ভেস্ট্রি (vestry) বা স্যাক্রিস্টি (sacristy)। সাধারণত প্রত্যেক গির্জায় এক বা একাধিক বড় বড় ঘণ্টা থাকে। এই ঘণ্টাধ্বনিতে পল্লীবাসী বা এলাকাবাসীদের গির্জায় উপাসনায় আহ্বান করা হয়। অথবা দিনের বিভিন্ন সময় প্রার্থনার সময় স্মরণ করানোর জন্য এই ঘণ্টা বাজানো হয়। ঢাকা (দ্র) শহরে কাকরাইলের আর্চ বিশপের ক্যাথিড্রাল এবং গ্রিক ও আর্মেনীয় গির্জা বিখ্যাত। চট্টগ্রামে (দ্র) পর্তুগিজ আমলের গির্জা প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া বরিশাল (দ্র), যশোর, পটুয়াখালি, চন্দ্রঘোনা প্রভৃতি প্রায় সব বড় বড় শহরেই প্রাচীন গির্জা রয়েছে।

প্রতি রবিবার খ্রিস্টানেরা গির্জায় সম্মিলিত উপাসনার জন্য সমবেত হন। কোনো কোনো গির্জায় প্রতিদিন উপাসনা হয়। বাংলাদেশের (দ্র) গির্জায় দেশীয় সঙ্গীতের আদর্শ ও রীতিতে খ্রিস্টীয় উপাসনাগীত প্রচলিত। গির্জা পরিচালনার ব্যয়ভার খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় বহন করে। সাধারণত একটি গির্জার পরিচালকরূপে এক জন ধর্মযাজক নিয়োজিত হন বিশপের নির্দেশে। অনেক গির্জার সঙ্গে নানা রকম শিক্ষা ও সেবাকেন্দ্র আছে।

বি. ব.

গির্লান্দাইও, দোমেনিকো [১৪৪৯—১৪৯৪]

ইতালীয় রেনেসাঁস (দ্র) অধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। ফ্লোরেন্সে ১৪৪৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

দোমেনিকো গির্লান্দাইও (Domenico Ghirlandaio) ছিলেন তাঁর কালের তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল বহু চিত্রশিল্পী ও ভাস্করের শিক্ষক। এসব ছাত্রের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মিকেলাঞ্জেলো (দ্র)। ফ্লোরেন্সে তিনি যে বিরাট স্টুডিও খুলেছিলেন তাতে তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে দেশ-বিদেশের বহু শিল্পীর হাতেখড়ি হয়।

টেম্পারার (দ্র) চাইতে ফ্রেস্কো (দ্র) বা দেয়ালচিত্রের প্রতি গির্লান্দাইও-র আগ্রহ ছিল প্রবল। ১৪৮১ থেকে ১৪৮২ সালের মধ্যে তিনি শিল্পী বত্তিচেলি ও অন্যান্য সহশিল্পী সহযোগে ভাটিকানের সিস্তিন চ্যাপেলের দেয়ালচিত্র রচনার কাজ সম্পন্ন করেন।

এই উদার প্রকৃতিবাদী শিল্পী তাঁর সমকালে যেমন, তেমনি ঊনবিংশ শতকে সূচিত শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন।

তিনি তাঁর জীবনের যাবতীয় শিল্পকর্ম রচনার কাজ সম্পন্ন করেন ফ্লোরেন্সে বসে। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম ১৪৯০ সালে রচিত 'সান্তা মারিয়া নোভেল্লা'। এটি একটি ফ্রেস্কো বা দেয়ালচিত্র।

গির্লান্দাইও ১৪৯৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

গিল্‌গামেশ্

১২টি ফলকে লিখিত প্রায় ৩০০০ ছত্রের ব্যাবিলনীয়

www.pathagar.com

মহাকাব্য (দ্র)। মেসোপটেমীয় অঞ্চল থেকে যে সাহিত্যের সন্ধান মিলেছে তা ব্যাবিলনীয়-অ্যাসিরীয় যুগের। ইরাকের তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে প্রাচীন কালে বলা হত মেসোপটেমিয়া। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এই সভ্যতা ও সাহিত্যের জন্ম। গিল্‌গামেশ্‌ আনুমানিক সেই সময়ে লেখা হয়। এই মহাকাব্যের নায়ক সুমের অঞ্চলের উরুক্‌ শহরের মহারাজ গিল্‌গামেশ্‌ ছিলেন খুব বড় ও শক্তিশালী রাজা। লোকের ধারণা— রাজা সম্পূর্ণ মানুষ নয়, এক-চতুর্থাংশ মানুষ আর তিন-চতুর্থাংশ দেবতা; তাই সে অমর। এই রাজার দুঃসাহসিক অভিযান, তার হাতে দেবী ইশতারের লাঞ্ছনা, বন্ধু এন্‌কিদুর সঙ্গে শয়তান দেবতাকে পরাজিত করা এবং পরে এন্‌কিদুর মৃত্যু, পূর্বপুরুষ উৎনাপিশ্‌তিম্‌-এর সাহায্যে বন্ধুকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টার কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে।

গিল্‌গামেশ্‌ মহাকাব্য আসলে মানুষের অমরতা-অন্বেষণের কাহিনী। জন্ম ও মৃত্যু এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করার চিরন্তন যে আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন কাল থেকে মানুষ পোষণ করে আসছে তার স্বাক্ষর এতে বিদ্যমান। মহাকাব্যটি রচিত হয়েছে আক্কাদীয় ভাষায় এবং কিউনিফর্ম (দ্র) বা কীলক-লিপিতে। পৃথিবীর (দ্র) প্রাচীনতম লেখ্য ভাষা সুমেরীয় ভাষাকে ভিত্তি করে এই আক্কাদীয় ভাষা গড়ে উঠেছিল। কাব্যে বর্ণিত বিষয় বাদ দিলেও জানা যায় যে উরুক্‌ নগরে গিল্‌গামেশ্‌ নামে সত্যিকারের এক রাজা ছিলেন এবং তিনি ১২৬ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

বি. ব.

গিল্‌টি ইলেক্ট্রোপ্লেটিং দ্র

গীতগোবিন্দ

কবি জয়দেব (দ্র) রচিত বিখ্যাত কাব্য। এটি সংস্কৃত ভাষায় (দ্র) রচিত হলেও বাংলা সাহিত্যে (দ্র) নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। জয়দেব সংস্কৃত ভাষার এক জন শ্রেষ্ঠ কবি। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার কেঁদুলি গ্রাম তাঁর জন্মভূমি। তিনি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। রাধা (দ্র) ও কৃষ্ণের (দ্র) বসন্তলীলা নিয়ে রচিত এই কাব্য ১২টি সর্গে বিভক্ত। এটি ভক্তিমূলক কাব্য। এর গানগুলো কবি কালিদাস রায়সহ অনেকে বাংলায় (দ্র) অনুবাদ করেছেন। স্যার এডউইন আর্নল্ডও ইংরেজি ভাষায় (দ্র) অনুবাদ করে কবিতার আকারে প্রকাশ করেন। গিরিধর দাস এই কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন ১৭৩৬ খিস্টাব্দে। রঘুনাথ দাস, রসময় দাস ও দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ আরো পরে এর বঙ্গানুবাদ করেছেন। গীতগোবিন্দ সেকালের অত্যন্ত জনপ্রিয় গীতিকাব্য ছিল এবং ভক্ত বৈষ্ণব ধর্ম (দ্র)-অবলম্বীদের মধ্যে এখনো সমান আদৃত।

বি. ব.

গীতা / শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

মহাভারতের (দ্র) ভীষ্মপর্বের ১৮টি অধ্যায়কে গীতা বলে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে (দ্র) যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে বলা হয় পঞ্চপাণ্ডব। তাঁদের বিরুদ্ধে ছিলেন কুরু বা কৌরব বংশ। কৌরবদের রাজা দুর্যোধন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ মহাভারতের প্রধান ঘটনা। যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ (দ্র) পঞ্চপাণ্ডবের পক্ষ অবলম্বন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমালা গীতায় বিধৃত আছে। পাণ্ডব ও কৌরবেরা পরস্পরের আত্মীয় বলে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাঁদের বধ করতে হবে ভেবে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। অর্জুনের সারথীরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য উপদেশ দেন। এই উপদেশমালাই হল গীতা বা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। এর প্রধান বক্তা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রোতা বীর অর্জুন। এতে ৭০০ শ্লোক আছে। এ জন্য এর অন্য নাম 'সপ্তশতী'।

গীতায় হিন্দুধর্ম (দ্র) এবং দর্শনের সারমর্ম ব্যাখ্যা করে বোঝান শ্রীকৃষ্ণ। এতে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা আছে। মহাত্মা গান্ধীর (দ্র) মতে, গীতার চরম সার্থকতা কর্মে। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ (দ্র) তথা ভক্তিবাদীগণের মতে, গীতার পরম সার্থকতা ভক্তিতে। শঙ্করাচার্য (দ্র) প্রমুখ দার্শনিকের মতে, জ্ঞানযোগই গীতার চরম আদর্শ।

গীতা একটি অমূল্য ও অপূর্ব দর্শন এবং ধর্মগ্রন্থ। গীতার কতিপয় বিখ্যাত শ্লোক গান্ধীজী তাঁর আশ্রমের প্রাত্যহিক প্রার্থনায় যুক্ত করেন। গীতার শিক্ষার বিষয় সর্বজনীন।

www.pathagar.com

বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা এই শিক্ষার ভিত্তি। গীতায় তৎকালীন ভারতের সমস্ত দর্শনের ছায়াপাত ঘটেছে। বেদ-উপনিষদের আদর্শ, সাংখ্য-বেদান্ত-ভাগবতদর্শন, এমনকি বৌদ্ধদর্শনের প্রভাবও এতে বিদ্যমান। এ জন্য গীতাকে সমন্বয়গ্রন্থ বলা হয়।

গীতার অনুবাদ (দ্র) ও টীকাসমূহ নানা ভাষায়, নানা দেশে নানা রকম হয়েছে। পৃথিবীর (দ্র) প্রায় সমস্ত প্রচলিত ভাষায় গীতার অনুবাদ হয়েছে। এ ছাড়া ভারতের (দ্র) সব প্রাদেশিক ভাষায় এর অনুবাদ হয়। সম্রাট আকবরের (দ্র) সময় অনূদিত হয় উর্দু ভাষায় (দ্র)। তারও আগে আরবিতে এবং আরবি ভাষা (দ্র) থেকে পরে ফার্সি ভাষায় অনূদিত হয়। চার্ল্‌স্ উইল্‌কিন্স (দ্র) সর্বপ্রথম গীতার ইংরেজি অনুবাদ করেন। আধুনিক ভারতে মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক (দ্র) ও শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক গীতার ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও (দ্র) গীতা বিশ্লেষণ করেছেন।

বি. ব.

গীতাঞ্জলি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র.) রচিত কাব্যগ্রন্থ। তিনি মূলত গীতিকবি ছিলেন, তাঁর সব কবিতাই প্রায় গান। গীতাঞ্জলির গান বা কবিতাগুলো ধর্ম (দ্র) ও সৃষ্টিচেতনা–সমৃদ্ধ গীতরসে ভরপুর। গীতের মাধ্যমে স্রষ্টার উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করা হয় বলে এর নাম গীতাঞ্জলি। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে (১৯১০) এটি বই আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এতে মোট কবিতার সংখ্যা ১৫৭। এর অনেক কবিতা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইংরেজিতে অনুবাদ (দ্র) করেন। বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র সেই সব অনুবাদ এবং অন্য আরো কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ থেকে বাছাই করা কবিতার অনুবাদ সংগ্রথিত করে ইংরেজি Gitanjali বা Song Offerings প্রস্তুত করে লণ্ডন থেকে ছাপা (১৯১২) হয় এবং সে বইটির জন্যই কবি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন। এশিয়া (দ্র) মহাদেশে (দ্র) রবীন্দ্রনাথই প্রথম নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক।

পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

বি. ব.

গীতাঞ্জলির কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতিকবিতা

ইংরেজি লিরিক (lyric)-এর প্রতিশব্দরূপে বাংলায় গীতিকবিতা বা গীতিকাব্য কথাটি ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন গ্রিক লেখকেরা lyre বা বীণা বাদনের সঙ্গে পরিবেশিত কবিতা ও গানকে লিরিক বলতেন। পরবর্তী কালে গীতিকবিতার সঙ্গে বীণা বা অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্রের অপরিহার্য সম্পর্ক থাকে নি। এখন গীতিকবিতা বলতে বোঝায় মোটামুটি ছোট যে কোনো কবিতা, যার মধ্যে একটি মানুষের মনের ভাব, অনুভূতি বা চিন্তার সাবলীল প্রকাশ ঘটে। গীতিকবিতায় কোনো গল্প বা কাহিনী বর্ণিত হয় না। গীতিকবিতা আর গান এক নয়। তবে সাধারণত গীতিকবিতায় গানের মতো এমন একটা সুরেলা আবেদন থাকে যা সহজেই পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। গীতিকবি তাঁর কবিতায় প্রধানত নিজের অন্তরের আবেগ-অনুভূতি তুলে ধরেন, তবে কখনো কখনো গীতিকবিতার কথক সম্পূর্ণ এক কল্পিত ব্যক্তিও হতে পারেন। নানা ভাবসম্বলিত দীর্ঘ কবিতার সঙ্গে গীতিকবিতার তুলনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "গীতিকবিতায় একটি মাত্র ভাব জমিয়া মুক্তার মতো টলটল করিয়া ওঠে, আর বড়ো বড়ো কাব্যে ভাবের সম্মিলিত সজ্জ ঝর্ণায় ঝরিয়া পড়িতে থাকে।" গীতিকবিতায় একাধিক ভাবকে প্রশ্রয়

www.pathagar.com

দেওয়া হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (দ্র), জীবনানন্দ দাশ (দ্র), শামসুর রাহমান প্রমুখ বাংলা গীতিকবিতার ভুবনকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

ক. চৌ.

গীতিকা

লোকসাহিত্যের (দ্র) বিভিন্ন রূপের মধ্যে গীতিকা অন্যতম। গীতিকা সাধারণত একটি মাত্র কাহিনী অবলম্বন করে রচিত। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে এতে কাহিনী হয় একরৈখিক, অপ্রয়োজনীয় কাহিনী সতর্কতার সঙ্গে বাদ দিয়ে একান্ত প্রয়োজনীয় কাহিনীটুকু শুধু গৃহীত হয়। এর কাহিনীর গতি হয় দ্রুত। সঙ্কটময় পরিণতির মাধ্যমে কাহিনী সমাপ্ত হয়। কাহিনীই গীতিকার প্রাণ। কাহিনী উপস্থাপনায় থাকে নাটকীয়তা। নাটকের (দ্র) মতো এতে সংলাপের বহুল ব্যবহার হয়। গীতিকার মধ্যে একটি মাত্র কাহিনীর প্রাধান্য থাকে, শাখা-কাহিনী বা উপ-কাহিনী সাধারণত থাকে না। মূল কাহিনীর একটি ধারা দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। কাহিনীর পরিণতির মধ্যে শ্রোতার কৌতূহল নিবৃত্ত হয়।

গাওয়ার উদ্দেশ্যে গীতিকা রচিত হয়। কোথাও কোথাও গীত-বাদ্য ছাড়াও এই কাহিনীর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশিত হয়। গীতের সময় থাকে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র। গীতরীতি প্রধানত গতানুগতিক, সুরের বৈচিত্র্য নেই। কাহিনী যত দীর্ঘই হোক, একই সুরে তা আগাগোড়া গাওয়া হয়। অবশ্য মাঝে মাঝে এক-আধটু বৈচিত্র্য থাকতেও পারে। এর ছন্দ (দ্র) সাধারণত স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান। এই ছন্দকে 'ছড়ার ছন্দ'ও বলে।

দেশের যে অংশের যে সমাজ একটু অগ্রসর, প্রাচীন যুগের স্তর কাটিয়ে ওঠে সেখানে গীতিকার জন্ম হয়। যে জাতি বা সমাজের সংহতি দৃঢ় হয়, সেখানে গীতিকার উদ্ভব হয়। গীতিকা লোকসাহিত্যের শাখা। এক জন প্রতিভাবান পল্লীকবি সমাজের কোনো জনপ্রিয় কাহিনী অবলম্বন করে গীতিকা রচনা করেন। তারপর আস্তে আস্তে সেই কাহিনী নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর নানা গায়ক ও কথকের হাতে পড়ে তা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটি লোকগীতি ও লোককাহিনী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি কাহিনীমূলক রচনা পাঁচালি (দ্র) থেকেও এটি ভিন্ন। কোনো কোনো গীতিকার মধ্যে উঁচু আদর্শ ও ভাব প্রকাশ পায়। সেই ভাব কোনো কোনো সময় এত উঁচু মাত্রায় দেখা যায় যে তা সাধারণ অশিক্ষিত সমাজ থেকে সৃষ্ট বলে মনেই হয় না।

বাংলা সাহিত্যে (দ্র) ড. দীনেশচন্দ্র সেন (দ্র) সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা (দ্র), পূর্ববঙ্গ গীতিকা (দ্র) এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ ছাড়া ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক ১৯৭১-৭৫ সালে ৭ খণ্ডে প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশ করেন। তাতে বহু লোকগীতিকা স্থান পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে নাথ-গীতিকা, গোপীচন্দ্রের গান, মানিকচন্দ্র রাজার গান সুপরিচিত গীতিকা।

বি. ব.

গুজব

ভিত্তিহীন কোনো খবর বা কোনো কথাবার্তা যখন অবিকল সত্যের চেহারা দিয়ে প্রচার করা হয়, তাকেই গুজব বলে। গুজবের অবশ্য বহু রকমফের আছে। এ এমন এক ধরনের প্রচার, যার সত্যাসত্য নিরূপণ বা নির্ধারণ করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন হয়ে পড়ে। যেখানে তথ্য বা সত্য প্রচারে ফাঁক থাকে সেখানে গুজবের সৃষ্টি হয়।

গুজব ছড়ানোর পেছনে অবশ্যই এক শ্রেণীর মানুষের দুরভিসন্ধি বা স্বার্থ কাজ করে। অনেক সময় স্রেফ নির্মল কৌতুক করার জন্যই গুজবের আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। গুজবের জন্ম হয় সাধারণত দেশ বা সমাজের প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনো সঙ্কটকালে। এ সময়ই এর প্রচার হয়ে থাকে সব থেকে বেশি। মানুষ সাধারণত এই সময় মানসিকভাবে চাপের সম্মুখীন হয় বলে কিছুটা বোধবুদ্ধিহারা হয়ে থাকে। মানসিক এই অবস্থাতেই গুজব তার প্রভাব বিস্তার করতে বেশি সক্ষম হয়।

কোনো কোনো গুজব স্বল্পস্থায়ী হয়। কোনো কোনোটি দীর্ঘস্থায়ী। বিস্তৃতি লাভের সুযোগ পেলে কোনো কোনো গুজব ধীরে ধীরে সত্য বিশ্বাসের রূপ ধারণ করে, সমাজে সৃষ্টি করে নানা রকমের বিভ্রান্তি ও জটিলতা।

গুজব তিলকে তাল করে, তালকে করে তিল। তাই গুজবের বিরুদ্ধে কত না সতর্কবাণী। সেই কোন কাল আগে থেকে এ নিয়ে প্রবাদের পর প্রবাদের জন্ম। যেমন, 'গুজবে কান দিও না'; 'যে দেয় গুজবে কান/ তার ভাঙে কোমরখান'; 'গুজবে যে বিশ্বাস করে/দিনেই সে খানাখন্দে পড়ে' ইত্যাদি।

আ. হু.

www.pathagar.com

গুটেন্‌বার্গ, ইওহান্‌ [আনু ১৩৯৮—১৪৬৮]

মুদ্রণশিল্প (দ্র) বিকাশের প্রাচীন ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় ব্যক্তি। গুটেন্‌বার্গ (Johann Gutenberg)-এর আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে আজও পৃথিবীর (দ্র) সর্বত্র লেটার প্রেসের অক্ষর (দ্র) তৈরি ও ছাপার কাজ চলছে। তিনি জার্মানির মাইন্‌ৎস্‌ (Mainz) শহরের এক সাধারণ পরিবারে ১৩৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে সামান্য পড়াশোনা

করলেও তাঁর উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ ঘটে নি। কিশোর বয়সেই তিনি এক স্বর্ণকারের সহকারী হিসাবে কাজ নেন। এই কাজই তাঁর জন্য সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসে।

স্বর্ণকারের কারখানায় সোনার অলঙ্কার ছাড়াও আরো অনেক ধাতব দ্রব্য তৈরি হত। বাল্যকাল থেকে এই কারখানায় কাজ করার ফলে গুটেন্‌বার্গ বিভিন্ন ধাতুর

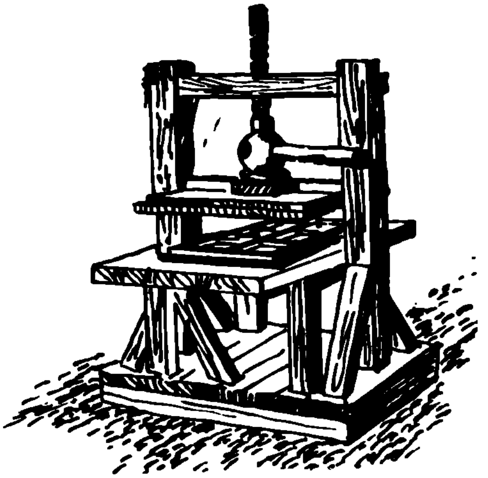

গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র

গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এরপর তিনি মাইন্‌ৎস্‌ ছেড়ে জার্মানির স্ট্রাসবুর্গ (Strassburg) নামক শহরে এসে আরো বড় এক স্বর্ণকারখানায় যোগ দেন। এখানে প্রথমে চাকুরিরত থাকলেও পরে তিনি কারখানার অংশীদার হন। নিজের উদ্যোগে তিনি মণিমুক্তো কাটার এবং আয়না (দ্র) প্রস্তুত করার একটি কারখানা গড়ে তোলেন। এসব কাজ করতে করতে তিনি ধাতব টাইপ আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হন। অবশেষে ১৪৪০ সালের দিকে তিনি বিশ্বে প্রথম ধাতব অক্ষর নির্মাণ করেন।

ইতঃপূর্বে চীনে (দ্র) মুদ্রণশিল্পের উন্মেষ ঘটলেও তখন কাঠ খোদাই করে অক্ষর নির্মাণ করা হত। হাতে-প্রস্তুত কাগজের (দ্র) ওপর স্ট্যাম্পের মতো সেই অক্ষরের ছাপ দিয়ে দিয়ে ছাপা হত বই। কিন্তু এক বার ছাপার কাজে ব্যবহৃত অক্ষর অন্য কাজে আর ব্যবহার করা যেত না। কারণ প্রতিটি অক্ষর আলাদা আলাদা বানানো হত না। আর এ ধরনের অক্ষর দিয়ে এক সঙ্গে অধিক সংখ্যক বই মুদ্রণও অসম্ভব ছিল। গুটেন্‌বার্গই প্রথম আলাদা আলাদা অক্ষর সাজিয়ে বই ছাপার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

১৪৫০ সালে গুটেন্‌বার্গ নিজের শহর মাইন্‌ৎসে ফিরে এসে তাঁর আবিষ্কারকে বাস্তবে প্রয়োগ করার কাজে উদ্যোগী হন। ইওহান্‌ ফুশ্‌ট্‌ (Johann Fust) নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির সহযোগিতায় গুটেন্‌বার্গ ১৪৫২ সালের দিকে একটি প্রেস স্থাপন করেন। কিন্তু ফুশ্‌ট্‌ ও গুটেন্‌বার্গের দৃষ্টিভঙ্গি

www.pathagar.com

ছিল ভিন্ন। ফুশ্‌ট্ চান যেনতেনভাবে ব্যবসা করে আরো ধনী হতে, আর গুটেন্‌বার্গ্ চান নিখুঁতভাবে কাজ করে সুনাম ও দক্ষতা অর্জন করতে। এই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দু'জনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ফুশ্‌ট্ এক পর্যায়ে তাঁর বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরৎ চেয়ে গুটেন্‌বার্গের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলায় গুটেন্‌বার্গ্ হেরে যান এবং আদালত তাঁকে বিপুল অঙ্কের অর্থ ফেরৎ দানের রায় ঘোষণা করে।

মামলায় হেরে গিয়ে গুটেন্‌বার্গ্ ১৪৫৫ সালের ৬ই নভেম্বর প্রেসের কর্তৃত্ব হারান। তখন তাঁর প্রেসে বাইবেল (দ্র) ছাপার কাজ চলছিল। ফুশ্‌ট্ মামলায় জিতে বাইবেলের মুদ্রিত অংশ ও মুদ্রণকাজে ব্যবহৃত যাবতীয় টাইপসহ প্রেসের মালিকানা হস্তগত করে বসেন। এখানে মুদ্রিত বাইবেলটিই ছিল ধাতব টাইপে মুদ্রিত পৃথিবীর প্রথম বই। পরে ১৪৫৭ সালে মুদ্রাকর হিসাবে ফুশ্‌টের নাম নিয়ে এই বাইবেলটি প্রকাশিত হয়। অথচ এই বইতে মুদ্রাকর হিসাবে গুটেন্‌বার্গেরই নাম ছাপা হওয়ার কথা ছিল। তাঁর নাম মুদ্রিত না হলেও এ বইটিই পৃথিবীতে 'গুটেন্‌বার্গ্ বাইবেল' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

গুটেন্‌বার্গ্ পরে অবশ্য মাইন্‌ৎস্-এর আরেক ধনী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় অন্য একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু বার্ধক্যের ফলে তিনি সফল হতে পারেন নি। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। তিনি ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়েন। বড় কষ্টে তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়। ১৪৬৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

গুড ফ্রাইডে (Good Friday)

প্রায় দু' হাজার বছর আগে যিশুখ্রিস্টের (দ্র) দ্বারা খ্রিস্টধর্ম (দ্র) প্রবর্তিত হয়। যিশু ছিলেন জাতিতে ইহুদি। তাঁর প্রথম শিষ্যেরাও ছিলেন ইহুদি। যিশু যখন তাঁর বাণী প্রচার শুরু করেন তখন অনেক ইহুদি তাঁকে 'খ্রিস্ট' বলে স্বীকার করে নেন। কিন্তু ইহুদি ধর্মের (দ্র) নেতৃবর্গ ও ধর্মযাজকগণ যিশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে তাঁকে বিদেশী শাসনকর্তার হাতে সমর্পণ করে। তার পর তাঁকে বহু অপমান ও যন্ত্রণার মধ্যে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। যিশু বিনা প্রতিবাদে সেই মৃত্যু বরণ করেন। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দিনটি ছিল পুণ্য শুক্রবার বা গুড ফ্রাইডে। প্রত্যেক বছর ঈস্টার (দ্র) পর্বের পূর্ববর্তী শুক্রবার শোক ও অনুশোচনাদিবস হিসাবে পালন করা হয়। এই দিন বাইবেলের নির্ধারিত অংশসমূহ পাঠ, গভীর আরাধনা, ক্রুশের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, ভোজনোৎসব ও গুড ফ্রাইডে সঙ্গীত গাওয়া হয়।

বি. ব.

গুণন

গুণন হচ্ছে সমান আকারের একাধিক সংখ্যা যোগ করার দ্রুততর পদ্ধতি। সমান রাশি বা সংখ্যার যোগ-বিয়োগ প্রক্রিয়াকে সংক্ষিপ্ত, সহজ ও দ্রুততর করার জন্য গুণনের আবিষ্কার। যেমন ১২+১২+১২+১২+১২=৬০। এভাবে ১২-কে ৫ বার লিখে যোগ করার চেয়ে ১২-র সঙ্গে ৫ গুণ করলে কাজটি আরো সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। গণিতের (দ্র) নিয়মে একে লেখা হয় ১২x৫=৬০। এখানে ১২-কে গুণ্য, ৫-কে গুণক এবং ৬০-কে গুণফল বলে। আর 'x' হল গুণনের চিহ্ন বা প্রতীক। সুতরাং গুণন হল কোনো বস্তু, দ্রব্য বা সংখ্যা সমান পরিমাণে একাধিক বার বৃদ্ধি পেলে তা গণনা বা যোগ করার প্রক্রিয়া। কোনো সংখ্যা বা রাশি সমানভাবে বৃদ্ধি পেলেই তার সমষ্টি গুণনপ্রক্রিয়ায় নির্ণয় করা যায়; অসমান রাশি বা সংখ্যার সমষ্টি গুণনের সাহায্যে নির্ণয় করা যায় না। যেমন ৫-কে ৪ বার যোগের (৫+৫+৫+৫) কাজটি গুণনের সাহায্যে করা যাবে, কিন্তু ৫-এর সঙ্গে অসমান ৪ বা ৭ যোগ করার (৫+৪+৭) কাজটি গুণনের মাধ্যমে করা যাবে না, এতে যোগপ্রক্রিয়াই ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং কেবল বিশেষ ক্ষেত্রেই গুণনকে যোগের সংক্ষিপ্ত রূপ বলা যায়।

সকল প্রকার গুণনসমস্যাকে যোগের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়, কিন্তু সকল যোগসমস্যাকে গুণন দ্বারা সমাধান করা যায় না। কোনো সংখ্যাকে ১ বা ১-কে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সংখ্যাটির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তাই ১-কে গুণনের অভেদ বা আইডেন্টিটি বলে। যেমন ৭X১=৭ বা ১X৬=৬। কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে গুণফল শূন্য হবে। যেমন ৫X০ =০। গুণ্য ও গুণকের

www.pathagar.com

বিন্যাসে পরিবর্তন করলেও গুণফলের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন ৪X৩=১২ আবার ৩X৪=১২। একে গুণের বিনিময়-বিধি বলে। দুইয়ের অধিক নির্দিষ্ট সংখ্যার ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলোকে যে কোনো দলে ফেলে গুণ করলে গুণফল একই থাকবে। যেমন ৫, ২, ৭-এর ক্ষেত্রে (৫X২)X৭=৭০ আবার ৫X(২X৭)=৭০। একে গুণের সংযোগ-বিধি বলে। দু'টি বাস্তব সংখ্যা গুণ করলে একটি বাস্তব সংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন ৫X৭=৩৫। একে গুণের আবদ্ধতা-সূত্র বলে। মজার ব্যাপার হল ৯ দিয়ে কোনো সংখ্যাকে গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় তার অঙ্কগুলোর সর্বশেষ যোগফল ৯ হয়। যেমন ৪X৯=৩৬, আবার ৩+৬=৯; ৩৫X৯=৩১৫, ৩+১+৫=৯; ১১১X৯=৯৯৯, ৯+৯+৯=২৭, আবার ২+৭=৯; গুণনের পূর্বশর্ত হচ্ছে যোগ-প্রক্রিয়া।

হো. আ.

গুপ্তবংশ

গুপ্তবংশের আদি পুরুষ মহারাজা শ্রীগুপ্ত। তাঁর সময়কাল সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রিক, পার্থিয়ান, শক ও কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী শক্তি ভারতবর্ষে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। এই বিদেশী আধিপত্যের সময়কাল প্রায় পাঁচ শত বৎসর।

এরপর আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে শ্রীগুপ্ত গুপ্তবংশ নামে একটি নতুন রাজবংশের পত্তন করেন। শ্রীগুপ্ত এবং তৎপুত্র ঘটোৎকচ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে গুপ্তবংশের ইতিহাসখ্যাতি শুরু হয় শ্রীগুপ্তের পৌত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় (৩২০-৩৩০) থেকেই। সমৃদ্ধ এবং বিকাশমান গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থপতি তাঁকেই বলা হয়। তিনি গুপ্তাব্দ নামে একটি সনের প্রচলন করেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি শক্তিমান রাজা ছিলেন, বহু রাজ্য জয় করেন এবং সাম্রাজ্যের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্তও পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁর আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্য একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়, শিল্প-সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়।

গুপ্তবংশের পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ইতিহাসে তিনি মহারাজ 'বিক্রমাদিত্য' নামে খ্যাত। তিনি বিদেশী শক (দ্র), হুন (দ্র) প্রভৃতি শক্তিকে পরাভূত করে ভারতবর্ষের বুক থেকে বিদেশী শাসনের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলেন। তাঁর

মুদ্রায় খচিত চন্দ্রগুপ্ত

আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি লক্ষিত হয়। শিল্প-সংস্কৃতিও উন্নতির শিখর স্পর্শ করে। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে।

এরপর গুপ্ত বংশের যে সকল নরপতি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা হলেন কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, পুরুগুপ্ত, বুধগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, তৃতীয় কুমারগুপ্ত এবং বিষ্ণুগুপ্ত। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ, মতান্তরে শেষ ভাগ, পর্যন্ত সুদীর্ঘ দুই শত বছরেরও অধিক কাল গুপ্তশাসন অব্যাহত ছিল।

গুপ্তবংশের শাসনকাল ভারতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। এই সময়ে সংস্কৃত-সাহিত্যের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। মহাকবি কালিদাস (দ্র) গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে বর্তমান ছিলেন। ব্যাকরণ, গণিত (দ্র) এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল এই যুগে। এ ছাড়া গুপ্তযুগে রসায়ন (দ্র), আয়ুর্বেদ (দ্র) প্রভৃতি শাস্ত্র এবং ভাস্কর্যশিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হয়।

মু. মা.

গুপ্তলিপি অক্ষর দ্র

গুয়েভারা, চে চে গুয়েভারা দ্র

গুহাচিত্র

পর্বত-গুহার ভিতরের দেয়ালে বা ছাদে আঁকা বা খোদাই করা ছবিকে গুহাচিত্র বলা হয়। প্রাচীন কাল থেকে গুহার দেয়ালে, ছাদে এবং কখনো কখনো গুহার মেঝেতেও ছবি আঁকার রেওয়াজ ছিল। এই সব গুহাচিত্র ইউরোপ (দ্র),

www.pathagar.com

আলতামিরার গুহাচিত্র

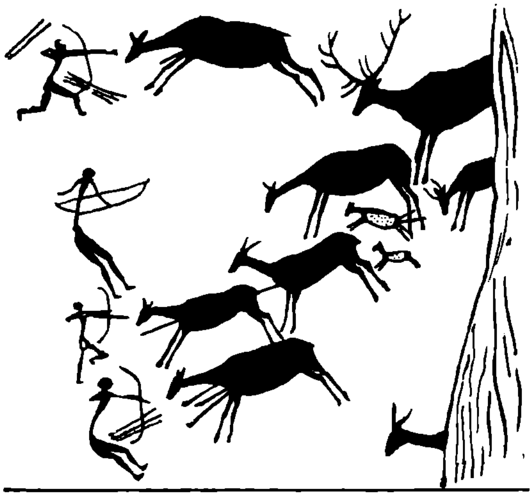

দর্দনে গুহাচিত্র

আমেরিকা (দ্র), এশিয়া (দ্র), আফ্রিকা (দ্র), অস্ট্রেলিয়া (দ্র) প্রভৃতি মহাদেশের (দ্র) বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। গুহাচিত্রগুলোর মধ্যে ফ্রান্সের বর্দো (Bordeaux)-র নিকট দর্দন (Dordogne) নদীর তীরে ১৯৪০ সালে আবিষ্কৃত লাস্কো (Lascaux)-র ছবি এবং ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী এম. সোতুলা (M. Sautoula) আবিষ্কৃত গুহামানুষ অঙ্কিত উত্তর-স্পেনের আলতামিরা (দ্র)-র চমৎকার রঙিন রেখাচিত্রগুলো উল্লেখযোগ্য। এ চিত্রগুলো ২০,০০০ বছরেরও আগে আঁকা হয়েছিল, কিন্তু আজও জীবন্ত বলে মনে হয়। ১৮৯৫ সালে ফ্রান্সের মুৎ (La Mouthe) এবং ১৯০১ সালে ফঁ-দ্য-গোম্ (Font-de-gaume) গুহা দুটো থেকে আরো ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে জর্জ গ্রে উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় আবিষ্কার করেন ছবি-আঁকা বেশ কয়েকটি গুহা। আফ্রিকা মহাদেশের আলজেরিয়া দেশের একটি গুহায় পাওয়া গেছে কুড়াল হাতে মানুষের ছবি। ভারতের অজন্তা ও ইলোরায় আবিষ্কৃত হয়েছে গুহাচিত্র।

আদিম শিল্পীরা সাধারণত খড়িমাটি (দ্র) দিয়ে ছবি আঁকত। তবে প্রয়োজনবোধে রঙও ব্যবহার করত। লাল, হলুদ, কালো, বাদামি ইত্যাদি। ইউরোপে যেসব গুহাচিত্র পাওয়া গেছে, সেগুলোর মূল বিষয় জন্তু-জানোয়ার, যেগুলো শিকার করে তারা মাংস খেত। প্রায় ছবিই অসম্পূর্ণ— দু'চার টানে আঁকা। কিন্তু পাকা শিল্পীর ছাপ স্পষ্ট। তবে এই ছবিগুলো আঁকার ব্যাপারে কোনো নিয়ম-নীতি মানা হত বলে মনে হয় না। কোনো কোনো ছবি অন্য ছবির ওপর আঁকা। তাই বলে তারা নিছক খেয়ালের বশে ছবি আঁকে নি। এর সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের জীবনধারণের বিষয়টি। আর এই ছবিগুলোর সঙ্গে তাদের শিকার অভিযানের সম্পর্ক ছিল। গুহাবাসীরা বিশ্বাস করত যে ছবির সঙ্গে জাদুবিদ্যার সম্পর্ক আছে। তাই শিকারে বের হওয়ার আগে তারা গুহার দেয়ালে বা ছাদে শিকারের ছবি এঁকে তা তীরবিদ্ধ করত। তারা বিশ্বাস করত যে এরূপ করলে শিকার অভিযানে তারা সফল হবে। তাই তীরবিদ্ধ বাইসন, ষাঁড়, হরিণের (দ্র) অনেক ছবি গুহার দেয়ালে অঙ্কিত দেখা যায়।

সবচাইতে পুরনো ছবিগুলোর মধ্যে গতি ছিল না— দেখা যায় স্রেফ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমে চিত্রশিল্পী ছবিগুলোর মধ্যে গতি যোগ করলেন— কোনোটা

www.pathagar.com

আদিম মানুষের আঁকা শিকারের গুহাচিত্র

দৌড়াচ্ছে, কোনোটা ঢুঁসোঢুঁসি করছে, কোনোটা-বা খাবার খাচ্ছে। ছবিগুলো দেখে মনে হয়, শিল্পীরা খুবই মনোযোগ দিয়ে তাঁদের শিকারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। ছবিগুলো গুহার এমন জায়গায় আঁকা হয়েছে যেখানে সহজে যাওয়াও যায় না, সহজে আঁকাও যায় না, আর আলোর অভাবে সেগুলো ভালমতো দেখাও যায় না। শিল্পীরা কুপি জ্বালিয়ে অনেক কষ্টে ছবিগুলো আঁকতেন। ফঁ-দ্য-গোমের গুহায় পঁচিশ রকমের রেখাচিত্র রয়েছে। গুহামুখ থেকে সেগুলো এত দূরে যে একটাও সূর্যের আলো পায় না। পিরেনিজ পর্বতের নিয়ো (Niaux) পাহাড়ের তলায় মঁতেপাঁ (Montespan)-র ছবি দেখতে হলে গুহার প্রায় আটাশ গজ ভেতরে ঢুকতে হয়। নারী, শিশু ও দীক্ষা নেয় নি এমন যুবকের সেই ছবি দেখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এ ব্যাপারে টোটেম (দ্র) সংস্কারের প্রভাব রয়েছে।

শা. হ.

গুহামন্দির

মন্দির হিসাবে ব্যবহৃত গুহার নাম গুহামন্দির। সন্ন্যাসী এবং সাধকেরা সাধনার স্থানরূপে সাধারণত পাহাড়ের ফাটল বা গুহা পছন্দ করে থাকেন। গৌতম বুদ্ধের (দ্র) জীবনের সঙ্গে জড়িত এরূপ কয়েকটি গুহামন্দির ভারতের (দ্র) রাজগির নামক স্থানে আছে। ভারতের (দ্র) অজন্তা ও ইলোরায় বিখ্যাত গুহামন্দির অবস্থিত। তবে পাহাড় খনন করে নির্মিত

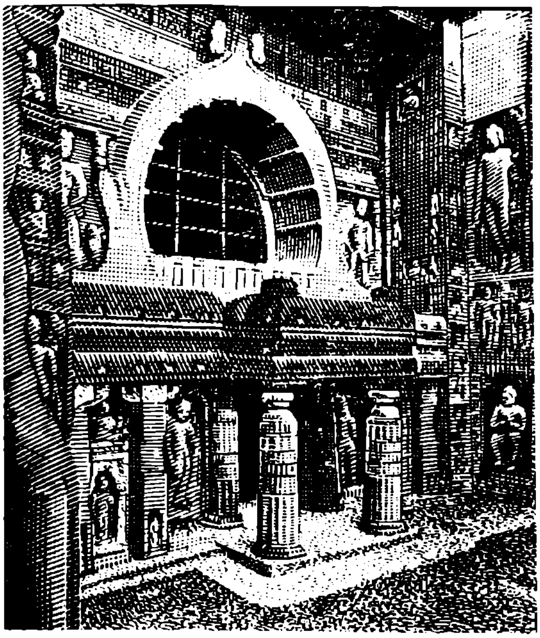

অজন্তা গুহামন্দির

মন্দিরকেই বিশেষভাবে গুহামন্দির বলা হয়ে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক (দ্র) গয়ার কাছে বরাবর পর্বতে যে গুহামন্দির তৈরি করিয়েছিলেন, তাই-ই ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন গুহামন্দির রূপে পরিচিত। ত্রিশটির মতো গুহা গৌতম বুদ্ধের অনুসারীরা খ্রিস্টপূর্ব ২০০ বছর আগে নরম আগ্নেয়শিলা খনন করে বানিয়েছিলেন। প্রায় সাত শ' বছর পরে গুহাগুলি বড় করা হয়েছিল এবং আরো ত্রিশটির মতো নতুন গুহা নির্মিত হয়েছিল। গুহাগুলি অবস্থিত ছিল পর্বতের প্রায় দু' শ' ফুট ওপরে এবং সেগুলি সুশোভিত ছিল স্তম্ভ ও দেয়ালচিত্র দিয়ে। গুহার ভেতরে আছে নানা মূর্তি, এদের মধ্যে কতকগুলি সুন্দর কারুকাজ দ্বারা সমৃদ্ধ, আবার কতকগুলি সাদামাটা— স্রেফ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে তৈরি। খোদিত মূর্তিগুলির নির্মাণকৌশল থেকে শিল্পীদের অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে গুহামন্দিরের সংখ্যা বারো শ'র মতো হবে। ভারতের ঐ সব গুহামন্দির ছাড়াও মিশরীয়, অ্যাসিরীয়, গ্রিক, রোমীয়, আকামেনীয় এবং সাসানীয় শাসনকালীন পারস্যের গুহামন্দিরের কথাও প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায়।

শা. হ.

www.pathagar.com

গেজেটিয়ার (gazetteer)

গেজেটিয়ারকে ভৌগোলিক অভিধানও বলা হয়ে থাকে। সাধারণত এই জাতীয় গ্রন্থে নানা দেশ, অঞ্চল, জেলা, থানা, মহকুমা, নদ-নদী, পাহাড়, গ্রাম, শহর ইত্যাদি সম্পর্কে বহুবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে। এ ছাড়াও এতে নির্দিষ্ট একটি দেশের সব অঞ্চলের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। এতে ভৌগোলিক নাম ইত্যাদি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো থাকে বলে কোনো স্থান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। গেজেটিয়ারগুলোতে মানচিত্রও সন্নিবেশিত থাকে।

গেজেটিয়ার শব্দটি বর্তমানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার প্রথম প্রচলন ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। উনবিংশ শতাব্দীকে গেজেটিয়ার রচনার স্বর্ণযুগ বলা যায়। সাম্প্রতিক কালে যে প্রথায় ভৌগোলিক অভিধান রচনা করা হয়, তার সূচনা সর্বপ্রথম ইউরোপেই (দ্র)। জার্মান ভূগোলবিদ ইওহান্ হাসেল ১৮১৭ সালে যে গেজেটিয়ার প্রণয়ন করেন, এ ক্ষেত্রে সম্ভবত সেটাই পথপ্রদর্শক।

গেজেটিয়ার এমন গ্রন্থ, যার নতুন, সংশোধিত বা পুরাতন উভয় সংস্করণই মূল্যবান। যেমন—এক শ' বছর আগেকার পুরানো কোনো গেজেটিয়ার পাঠ করে কোনো এক অঞ্চলের তখনকার শিল্পব্যবস্থা কেমন ছিল—তার বিবরণ তাতে থাকলে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

ভারতের (দ্র) প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণসম্বলিত তথ্য সিলাক্স্, মেগাস্থিনিস (দ্র), আরিয়ান্ ও টলেমির বিবরণ থেকে জানা যায়। প্রাচীন ভারতীয় গেজেটিয়ারগুলোর মধ্যে এডোয়ার্ড থর্নটন্-এর 'গেজেটিয়ার অব দ্য টেরিটোরি অব দ্য গভর্নমেন্ট অব ই আই কোং অ্যাণ্ড আদার নেটিভ স্টেট্স্ অব দ্য কন্টিনেন্ট অব ইণ্ডিয়া' (১৮৫৮) এবং স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টারের ১৫ খণ্ডবিশিষ্ট 'দ্য ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া' (১৮৮৫-৮৭) উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক অভিধান। ১৯০৮-৯ সালে ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের একটি প্রদেশভিত্তিক সিরিজ বের করা হয়। এ ছাড়া ১৯১০-২১ সালে ভারতের বিভিন্ন জেলার তথ্য সন্নিবেশ করে জেলাওয়ারি গেজেটিয়ার প্রকাশ করা হয়। ব্রিটিশ আমলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলাদেশ আমলেও গেজেটিয়ার প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। আপাত নীরস মনে হলেও গেজেটিয়ারগুলো গবেষকদের কাছে বরাবরই আকরগ্রন্থ হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান।

আ. হ.

গেরিলা যুদ্ধ

শত্রুর দখলে থাকা কোনো স্থানে সুসংবদ্ধ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছোট ছোট গ্রুপের অনিয়মিত আক্রমণাত্মক যুদ্ধের নাম গেরিলা যুদ্ধ। ১৮০৮ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত প্রথম নেপোলিয়নের (দ্র) সঙ্গে উপদ্বীপীয় যুদ্ধ চলাকালে গেরিলা শব্দটি প্রথম বারের মতো ব্যবহৃত হয়। 'গেরিলা' (guerrilla) স্প্যানিশ ভাষার (দ্র) শব্দ, এর অর্থ—লড়াই। লাতিন আমেরিকায় (দ্র) গেরিলা যুদ্ধ বিশেষ

রূপ নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় আরব ও তুর্কি বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিশ শতকের বিশ ও তিরিশ দশকে মাও সে-তুং (দ্র)-এর নেতৃত্বে চীনে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তাতে গেরিলা যুদ্ধের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মাও সে-তুং গেরিলা যুদ্ধের নানা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় গেরিলা যুদ্ধরীতির উন্নতি ঘটে। তখন এই রীতি অবলম্বন করে মিত্রশক্তি (দ্র) বিশেষ

www.pathagar.com

উপকৃত হয়েছিল। দূরে বেতারবার্তা পাঠানো এবং বিমানে করে খাদ্য পাঠানোর সুবিধা থাকা এই উন্নতির অন্যতম কারণ। রাশিয়ার (দ্র) মিলিটারি একাডেমিতে এই পদ্ধতি শেখানো হয়।

ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রীতিই অবলম্বন করেছে। আলজেরিয়া, ভিয়েৎনাম, লাওস, ফিলিপাইন্‌স্‌, ইন্দোচীন (দ্র), সাইপ্রাস প্রভৃতি দেশের মুক্তিসংগ্রামে গেরিলা যুদ্ধই ছিল সংগ্রামের প্রধান উপায়। কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রো চে গুয়েভারার (দ্র) সাহায্যে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমেই তৎকালীন সরকারকে উৎখাত করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের (দ্র) মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মূলত গেরিলা যুদ্ধ করে তাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল।

আ. মা.

গোইয়া, ফ্রান্সিস্কো [১৭৪৬—১৮২৮]

স্প্যানিশ শিল্পকলা-ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী ও সবচেয়ে মৌলিক ব্যক্তিত্বদের অন্যতম। মূলত চিত্রশিল্পী ও ছাপচিত্রকর। তাঁকে চিত্রশিল্পের আধুনিক ভাষা নির্মাণের পথিকৃৎ বলেও অভিহিত করা হয়।

তাঁর পুরো নাম ফ্রান্সিসকো দে গোইয়া লুসিয়েন্তেস্‌ (Francisco de Goya)। ১৭৪৬ সালের ৩০শে মার্চ তিনি স্পেনের আরাগঁর এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিল্পী হিসাবে গোইয়ার জীবনের যখন সূচনা, তখন স্পেন জুড়ে চলছে প্রগতি ও সংরক্ষণশীলতার ভয়াবহ সঙ্কট। এক দিকে ফরাসি প্রভাবে প্রভাবিত আমলা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী, অন্য দিকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের নতুন আবিষ্কারে উদ্দীপ্ত সাধারণ মানুষ। এক দিকে ফরাসি যুক্তিবাদের প্রভাব, অন্য দিকে বংশপরম্পরাগত ঐতিহ্যে লালিত শ্রমজীবী মানুষের নতুন

শিল্পী গোইয়ার আঁকা 'দোসরা মে'

নিচে : 'মৃত্যুই একমাত্র উপায়'

আত্ম-আবিষ্কার—এই রকম পরিবেশেই গোইয়ার শিল্পী হিসাবে হাতেখড়ি ও তাঁর শিল্পীজীবনের বিকাশ।

১৭৭৪ সালের মধ্যেই গোইয়া অসংখ্য ছবি আঁকেন। এই সময় তিনি রাজসভার শিল্পী হিসাবেও প্রতিষ্ঠা পান। ১৭৯২ সালে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে বদলায় তাঁর অঙ্কনরীতি। ১৭৯২ থেকে ১৮০৮ সালের মধ্যে তাঁর 'ক্যাপ্রিসেজ' অধ্যায়ের শুরু হয়। ১৮০৮ থেকে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত স্পেনে চলে প্রতিবিপ্লবী সংরক্ষণশীলতার আঘাতের পর আঘাত। এর ফল—হত্যা, রক্তাক্ত গেরিলা যুদ্ধ (দ্র)। এই পর্যায়ে তিনি আঁকেন তাঁর 'ডিজাস্টার' অধ্যায়ের ছবিসমূহ। ১৮১৯ থেকে ১৮২৪ সাল পর্যন্ত গোইয়ার আঁকা ছবিগুলি 'ব্ল্যাক পেইন্টিং' পর্ব হিসাবে

www.pathagar.com

অভিহিত। এই সময় তাঁর 'ডেস্পারেট্স্' অধ্যায়েরও সূচনা হয়। এর অব্যবহিত পরেই স্পেনে শুরু হয় উদারনৈতিক বিপ্লব এবং ১৮২৪ সালে তার সমাপ্তি ঘটে। গোইয়ার শিল্পকর্মে এসব উত্থানপতনময় রক্তাক্ত ঘটনা আশ্চর্য শৈল্পিক দক্ষতায় বিধৃত। 'দ্য ফায়ারিং স্কোয়াড', 'দোসরা মে' 'বৃদ্ধের অভিশাপ', 'পুত্রভক্ষণরত শয়তান' ইত্যাদি তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ের উজ্জ্বল শিল্পকর্ম।

গোইয়া সারা জীবনে মোট ছবি আঁকেন এক হাজার নয় শতটি। এর মধ্যে সাত শ' ছবিই ১৮০৮ থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যে আঁকা। এই কালকে তাই তাঁর জীবনের সবচাইতে সৃষ্টিশীল অধ্যায় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৮২৮ সালের ১০ই এপ্রিল ফ্রান্সে নির্বাসিত অবস্থায় এই মহত্তম স্পেনীয় শিল্পীর মৃত্যু হয়।

আ. হ.

গোগল্, নিকলাই ভাসিলিয়েভিচ্ [১৮০৯—১৮৫২]

রুশ কথাসাহিত্যে বাস্তবধর্মী রচনার প্রথম সার্থক কথাশিল্পী। জন্ম ১৮০৯ সালের ১৯শে মার্চ উক্রাইনের পল্‌তাভা প্রদেশের সরোচিন্‌ৎসির এক সম্ভ্রান্ত কসাক পরিবারে। শিক্ষা লাভ করেন নিয়েঝিন্ শিক্ষায়তনে।

গোগল্ কাজ করেছেন বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে। কখনো থিয়েটারের (দ্র) অভিনেতা, কখনো অধ্যাপক, কখনো সরকারি চাকুরে এবং শেষে সাহিত্যশিল্পী-নাট্যকার, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক।

সেন্ট পিটার্স্‌বার্গ্ (রুশ উচ্চারণে সাংক্ৎ পিতের্বুর্গ্) শহরে চাকুরির সন্ধানে এসে ব্যর্থতার পর উক্রাইনের জীবন নিয়ে লিখতে শুরু করেন হালকা চালের গল্প। এইসব ক্ষুদ্রায়তন কৌতুকমেশানো গল্প 'দিকান্‌কা গাঁয়ের কাছে এক খামারে সন্ধ্যা' (১৮৩১-৩২) নামে একটি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় এবং রুশ সাহিত্যের তখনকার দুই দিক্‌পাল পুশ্‌কিন্ (দ্র) ও বেলিন্‌স্কির সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৮৩৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'দ্য ইন্সপেক্টর জেনারেল' নাটকে (দ্র) তিনি সমাজে বিদ্যমান দুর্নীতি এবং শঠতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের যে তীব্র কষাঘাত হানেন, তার ধার আজ অবধি অক্ষুণ্ন। বহু দেশের বহু ভাষায় রূপান্তরিত হচ্ছে তাঁর নাটক। আজও বিভিন্ন দেশে এই নাটকের মঞ্চায়ন অব্যাহত রয়েছে।

১৮৪২ সালে প্রকাশিত হয় গোগলের 'মৃত আত্মা' (ইংরেজি অনুবাদে Dead Souls) উপন্যাস। এতে ভূমিদাস কৃষকদের ওপর পরিচালিত শোষণের গভীর বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ঐ একই সালে প্রকাশিত তাঁর 'তারাস্ বুল্‌বা' উপন্যাসে তিনি ষোড়শ শতকের উক্রাইনের ইতিহাসের একটি কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। শেষ জীবনে ধর্মভাবের প্রবলতা এবং সাহিত্য-রচনায় প্রেরণাহীনতা তাঁকে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। 'মৃত আত্মা' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড রচনার কাজ দীর্ঘকাল ধরে চালাবার পর শেষ পর্যন্ত তা পুড়িয়ে ফেলেন। ১৮৫২ সালের ২১শে-ফেব্রুয়ারি অর্ধোন্মাদ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

গোগল্ তাঁর সাহিত্যকর্মে আশ্চর্য নিপুণতায় রোম্যান্টিসিজমের (দ্র) সঙ্গে একান্ত বাস্তবজীবনের গভীর সংযোগ ঘটিয়েছেন। তাঁর রচনার আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর অননুকরণীয় বাচনভঙ্গি, সহজ সাবলীল ভাষা, প্রাণময় বর্ণনা, নিখুঁত চরিত্রচিত্রণ এবং হাস্যরসের দিল্‌খোলা পরিবেশনা। বলা হয়ে থাকে, তৎকালের এবং পরবর্তী কালের সোভিয়েত সাহিত্যের ভ্রূণ হিসাবে কাজ করেছে গোগলের সাহিত্যকর্ম। তাঁর অন্য অনেক রচনার পাশাপাশি 'ওভারকোট' শীর্ষক ছোটগল্পও বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত।

আ. হ.

গোগ্যাঁ, পল্ [১৮৪৮—১৯০৩]

আধুনিক চিত্রকলার ভিত্তি স্থাপনকারী অন্যতম ফরাসি চিত্রকর। গোগ্যাঁ (Paul Gauguin) সহজ সরল অঙ্কনরীতির অনুকূলে বর্ণনামূলক বাস্তববাদকে প্রত্যাখ্যান করে রঙের প্রতীকী ব্যবহারের প্রচলন ঘটান। ইউরোপের (দ্র) জটিল জীবনধারার পরিবর্তে দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের জীবনধারাই

www.pathagar.com

তাঁর চিত্রকর্মের প্রধানতম উপজীব্য বিষয়। এসবই বিংশ শতাব্দীর চিত্রকলার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে।

তাঁর পুরো নাম পল্ ওজ্যান্ অঁরি গোগ্যাঁ (Paul Eugène Henri Gaugin)। ১৮৪৮ সালের ৭ই জুন তিনি প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এক জন উদারনীতিক সাংবাদিক। মাতা ছিলেন সমাজতন্ত্রী লেখক ও পেরুর নারী-অধিকার আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী ফ্লোরা ত্রিস্তানের কন্যা।

১৮৫১ সালে তাঁর পিতা ক্লভি গোগ্যাঁ তাঁর পরিবারকে ছেড়ে পেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু সমুদ্রযাত্রায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত গোগ্যাঁ লিমায় অবস্থান করেন। তাঁর জীবনের গোড়ার দিককার এইসব স্মৃতিই তাঁকে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় হতে প্রেরণা যোগায়। ১৮৬৫ সালে তিনি ফরাসি বাণিজ্যিক নৌবাহিনী এবং ১৮৬৮ সালে ফরাসি নৌবাহিনীতে যোগ দেন। ১৮৭১ সালে তিনি প্যারিসে এসে দালালির কমিশন সংক্রান্ত এক অফিসে কেরানির চাকুরি নেন। এই সময়ই গোগ্যাঁ ইম্প্রেশনিস্ট (দ্র) চিত্রকরদের আঁকা ছবি সংগ্রহ করতে শুরু করেন এবং নিজেকে এক জন শৌখিন চিত্রকরেও পরিণত করেন। তবে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায় বিখ্যাত চিত্রকর কামিল্লো পিসারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর। পিসারোই তাঁকে পুরোমাত্রায় শুধু চিত্রকর হতেই নয়, তাঁর অঙ্কনরীতির পরিবর্তন সাধনেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেন। পরিণতিতে ১৮৮৩ সালে গোগ্যাঁ তাঁর চাকুরি-জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে এক জন পেশাদার চিত্রকরে পরিণত হন। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৮ সালের মধ্যে তাঁর চিত্রকর্মের একাধিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্রকর হিসাবে পল্ গোগ্যাঁর জীবন প্রধান দু'টি ভাগে বিভক্ত : সমন্বয়বাদী কাল ও দক্ষিণ সাগরীয় কাল।

পেশাদার চিত্রকরে পরিণত হওয়ার পর তিনি তাঁর চিত্রকর্ম বিক্রি করতে ব্যর্থ হলে নিদারুণ অর্থকষ্টের শিকার হন। ফলে তিনি প্যারিস শহর ত্যাগ করে চলে যান ব্রিটানির পঁতাভঁ-তে (Pont-Aven, Brittany)। এখানেই তিনি ১৮ বছর বয়স্ক চিত্রকর এমিলি বার্নার্-এর সাক্ষাৎ পান, যিনি গোগ্যাঁকে ইম্প্রেশনিজ্ম্ থেকে সরে এসে এক নতুন রীতির চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি আয়ত্ত করতে সাহায্য করেন। এই রীতি

শিল্পী গোগ্যাঁ তাহিতি দ্বীপে অনেক দিন বসবাস করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলো এখানে বসেই এঁকেছিলেন। উপরের ছবিটি তাহিতি দ্বীপে আঁকা তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি

'সিন্থেসিস্ট স্টাইল' বা 'ক্লইসোনিজ্ম্' নামে অভিহিত। গোগ্যাঁ ১৮৮৭ সালে পানামা ও মার্তিনিক্ সফর করেন। পরবর্তী বছর তিনি স্বল্প সময়ের জন্য আর্লে-তে ভান গখের (দ্র) সঙ্গে একত্রে বসবাস করেন। গোগ্যাঁর এই সময়কার উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম হচ্ছে 'দ্য ইয়েলো ক্রাইস্ট' ও 'জ্যাকব রেস্‌লিং উইথ দ্য অ্যাঞ্জেল'।

১৮৯১ সালে গোগ্যাঁ তাহিতি দ্বীপে যাবার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁর ৩০টি শিল্পকর্ম নিলামে বিক্রি করেন। ১৮৯৫ সালে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ফ্রান্সে আসেন। কিন্তু এখানে নিজের শিল্পকর্ম বিক্রি করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি তাঁর বাদবাকি জীবন দক্ষিণ সাগরের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করেন। শেষ পর্যন্ত তাহিতি দ্বীপই হয়ে ওঠে তাঁর বসবাস ও কাজের প্রধান ক্ষেত্র। এখানে বসেই তিনি শার্ল্ মরিস্ সহযোগে রচনা করেন 'নোয়া নোয়া' (Noa Noa) নামে একটি গ্রন্থ।

তাহিতির ফরাসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে তিনি ১৯০৩ সালে মার্কিসা-র ইভা ওয়া দ্বীপের আতোয়ানায় চলে আসেন। চরম দারিদ্র্যের ভেতরে এখানেই তিনি ১৯০৩ সালের ৯ই মে অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তাঁর রচিত আত্মজীবনীমূলক 'অভঁ ই আপ্রে' (অর্থাৎ আগে এবং পরে) গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করে; পরবর্তী কালে 'দ্য ইন্টিমেইট জার্নাল্স্ অব পল গোগ্যাঁ' নামে এ বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

তাহিতি অবস্থানকালে তাঁর আঁকা বিখ্যাত চিত্রকর্মের

www.pathagar.com

মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হোয়্যার ডু উই কাম ফ্রম ? হু আর উই ? হোয়্যার ডু উই গো ?', 'হর্স্ম্যান অন দ্য বিচ' এবং 'হোয়াইট হর্স্' ইত্যাদি। লুভ্র্ (দ্র)-সহ বিশ্বের নামকরা সব শিল্পসংগ্রহশালায় তাঁর শিল্পকর্ম সংরক্ষিত। চিত্রকর্ম ছাড়া গোগ্যাঁ কাঠখোদাইয়েরও উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন।

আ. হু.

গোপাল গৌড় ও পালবংশ দ্র

গোপাল ভাঁড়

গোপাল ভাঁড়ের পরিচিতি নিয়ে নানা রকমের বিভ্রান্তি রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়ার বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ও হাস্যরসিক এই ব্যক্তি আসলে বিশেষ কেউ নন। তাঁর নামে প্রচলিত গল্পগুলোর স্রষ্টা এক জন মাত্র ব্যক্তি নন বলেও অভিমত পাওয়া যায়। পেশাগতভাবে গোপাল ভাঁড় এক জন নাপিত বলে অনুমান করা হয়।

কোনো কোনো গবেষকের মতে, গোপাল ভাঁড়কে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে মনে করার কেনো হেতু নেই। কেননা, সমসাময়িক ইতিহাস তো দূরের কথা, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক পর্যন্ত এঁর নাম-ঠিকানার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।

আসলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় এক জন দেহরক্ষী ও পার্শ্বচর ছিলেন। তাঁর নাম ছিল শঙ্কর তরঙ্গ। তিনি ছিলেন খুবই বাক্পটু। এমনও হতে পারে, এই শঙ্কর তরঙ্গের চুট্কি গল্পগুলোই গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত। এসব গল্প বা চুট্কির কিছু কিছু নির্মল হাসির উদ্রেক করে এবং বাক্-চাতুর্যে উজ্জ্বল। আবার কোনো কোনোটি কিছুটা অশালীনও বটে।

আ. হু.

গোবিন্দচন্দ্র দেব [১৯০৭—১৯৭১]

দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও শহীদ বুদ্ধিজীবী। তিনি ১৯০৭ সালে সিলেটের (দ্র) লাউতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯২৫ সালে সিলেটের বিয়ানীবাজার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতার (দ্র) রিপন (পরে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯২৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে অনার্সসহ বি. এ. এবং ১৯৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন শেষে গোবিন্দচন্দ্র বোম্বাইয়ের অমলনারে অবস্থিত রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ভারতীয় বেদান্ত দর্শন বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত হন। কিছুকাল পর সেখান থেকে ফিরে কলিকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (দ্র) শুরু হওয়ার পর এই কলেজটি কলিকাতা থেকে দিনাজপুরে স্থানান্তরিত হলে তিনিও দিনাজপুরে চলে আসেন। এখানে অধ্যাপনা করার সময় তিনি ১৯৪৪ সালে 'Reason, Intuition and Reality' শিরোনামে অভিসন্দর্ভ দাখিল করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজটি আবার কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু তিনি কলিকাতায় ফিরে না গিয়ে দিনাজপুরেই থেকে যান এবং এখানে একটি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এর অধ্যক্ষরূপে কাজ করতে থাকেন।

১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে গোবিন্দচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) দর্শন বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ এবং ১৯৬৭ সালে এ বিভাগের অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। এরপর তিনি ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে একাধিক বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) যান।

১৯৬৪ সালে ঢাকায় দর্শনশাস্ত্রের চর্চা ও প্রচারের জন্য গোবিন্দচন্দ্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে 'দর্শন ভবন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তিনি বহুকাল তদান্তীন পাকিস্তান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেসের সম্পাদক এবং ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা-সংস্কার কমিশনের সদস্য এবং বাংলা একাডেমী (দ্র) কার্যকরী কমিটির সদস্য মনোনীত হন। তিনি যুক্তরাজ্যের

www.pathagar.com

'দ্য ইউনিয়ন অব দ্য স্টাডি অব গ্রেট রিলিজিয়নস্' এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফিলসফি অব সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন'–এরও সভ্য ছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র ইংরেজি (দ্র) এবং বাংলা (দ্র) উভয় ভাষাতেই ছিলেন সমান দক্ষ। উভয় ভাষাতেই তিনি দর্শনচর্চা করে গেছেন। ১৯৫২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর ডক্টরেট থিসিসটি 'Idealism and Progress' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে। তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ হল 'Idealism : A New Defence and a New Application' (১৯৫৮), 'Aspiration of the Common Man' (১৯৬৩), 'The Philosophy of Vivekananda and the Future of Man' (১৯৬৩), 'আমার জীবনদর্শন' (১৯৬৭), 'তত্ত্ববিদ্যাসার' (১৯৬৬) এবং 'Buddha the Humanist' (১৯৬৯)। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বহু প্রবন্ধ অগ্রন্থিত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর সমগ্র রচনাকর্মের মাধ্যমে তিনি দেশে-বিদেশে বিশিষ্ট দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ভাববাদ, ধর্ম, বিজ্ঞান, যুক্তি ইত্যাদির সমন্বয়বোধই তাঁর দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য। তিনি এসব উপাদানকে একটি অখণ্ড রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। আজীবন দর্শনচর্চাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তিনি চিরকুমার ছিলেন। পুরো নাম গোবিন্দচন্দ্র দেব হলেও সংক্ষেপে তিনি জি. সি. দেব নামে অধিক পরিচিত।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (দ্র) শুরুর প্রাক্কালে হানাদার পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক তিনি তাঁর বাসস্থান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলোয় নিহত হন। সেদিন নিহত আরো অনেক ছাত্রের সঙ্গে তাঁকেও জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে পুঁতে ফেলা হয়।

সুজ. ব.

গোবিন্দদাস

বৈষ্ণব পদাবলী (দ্র)-সাহিত্যে গোবিন্দদাস নামে কয়েক জন পদকর্তা আছেন। এক জন গবেষক পাঁচ জন গোবিন্দদাসের কথা বলেছেন। তবে গোবিন্দদাসের সংখ্যা যতই হোক, গোবিন্দদাস কবিরাজ মাত্র এক জন। তিনিই পদাবলীর সুবিখ্যাত পদকর্তা। অসংখ্য বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন তিনি, এর প্রায় সবগুলিই ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। বাংলা পদ তিনি রচনা করেছিলেন কিনা সন্দেহ; করলেও হয়তো দু'একটা। গোবিন্দদাসের নামে যেসব বাংলা পদ আছে সেগুলো প্রকৃত গোবিন্দদাসের কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কেউ বলছেন তিনি ব্রজবুলি ছাড়া অন্য ভাষায় পদ রচনা করেন নি। আনুমানিক ষোল শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে তাঁর জন্ম, আর মৃত্যু সতেরো শতকের দ্বিতীয় দশকে। নিজের লেখা 'সঙ্গীত মাধব' নামের সংস্কৃত গ্রন্থে গোবিন্দদাসের পারিবারিক পরিচিতি আছে।

গোবিন্দদাসের পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন, মায়ের নাম সুনন্দা। গোবিন্দদাসের মাতামহ দামোদর সেন এক জন প্রখ্যাত পণ্ডিত, তা ছাড়া কবিও ছিলেন তিনি। গোবিন্দদাসের বড় ভাইয়ের নাম রামচন্দ্র কবিরাজ। তিনিও এক জন পণ্ডিত এবং কবি। গোবিন্দদাসেরা শ্রীখণ্ড শাখার বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীখণ্ড বর্ধমান জেলার একটি বিশিষ্ট এলাকা। চৈতন্যের মৃত্যুর পর শ্রীখণ্ডও বৈষ্ণবদের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন নরহরি সরকার। গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্জীব চৈতন্যের খুব অনুরাগী ছিলেন। তিনি নরহরি সরকারের কাছে বৈষ্ণবধর্মে (দ্র) দীক্ষিত হন। রামচন্দ্রও চৈতন্য–পরবর্তী কালের বিখ্যাত বৈষ্ণব নেতা শ্রী নিবাস আচার্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন। কিন্তু মাতামহ দামোদর পণ্ডিতের মতো গোবিন্দদাসও ছিলেন শাক্ত অর্থাৎ শক্তির উপাসক। বড় ভাইয়ের দেখাদেখি গোবিন্দদাসও শ্রী নিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করেন। অন্য একটা কারণও ছিল। গুরুতর এক রোগে ভুগছিলেন গোবিন্দদাস। শ্রী নিবাস আচার্য তাঁকে সারিয়ে তোলেন। কৃতজ্ঞ গোবিন্দদাস বৈষ্ণব হন এবং স্ত্রী মহামায়া ও পুত্র দিব্য সিংহকেও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণে প্রেরণা দেন। বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে গোবিন্দদাস অতি নিষ্ঠার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে থাকেন। তিনি আগে থেকেই কবি; এখন বৈষ্ণব হয়ে বৈষ্ণবের আদর্শে রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে পদ রচনা করেন। বৈষ্ণব সমাজে গোবিন্দদাসের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা হয়। বৃন্দাবনে থাকতেন বাংলার বৈষ্ণব সমাজের প্রধান তাত্ত্বিক শ্রী জীব গোস্বামী। তাঁর কাছে গোবিন্দদাস চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আর মাঝেমধ্যে নিজের লেখা পদও পাঠাতেন তাঁর কাছে। বৈষ্ণবধর্ম

www.pathagar.com

অনুযায়ী কতখানি ভাল কবিতা হল তা জানার জন্য আগ্রহ। গোবিন্দদাসের কবিত্ব দেখে জীব গোস্বামী তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই থেকে তিনি হলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। খেতরির মহা বৈষ্ণব উৎসবে গোবিন্দদাসও অংশ নিয়েছিলেন।

বাঙালির ছেলে গোবিন্দদাস, কিন্তু ব্রজবুলিকেই পদ রচনার যথার্থ ভাষা-মাধ্যম হিসাবে বেছে নিলেন। হয়তো সে আমলে এইটিই ছিল রীতি। বলা হয়, রাধা (দ্র) ও কৃষ্ণ (দ্র) লীলা করতেন ব্রজে অর্থাৎ বৃন্দাবনে। সে জন্য তাঁদের লীলার ভাষা হল ব্রজবুলি। কিন্তু ব্রজবুলি বৃন্দাবনের ভাষা নয়, আসলে এটি কবিতা রচনার জন্য একটি কৃত্রিম ভাষা। মৈথিলী আর বাংলা মিলিয়ে ব্রজবুলি। এই ভাষায় বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন অনেক কবি। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্রজবুলি ভাষার আদর্শ রূপ ফুটেছে গোবিন্দদাসের কলমে। এই কৃত্রিম কাব্য-ভাষার প্রকৃত নির্মাতা হলেন গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাস এক জন সত্যিকারের শিল্পী।

কবিতার শব্দে, ছন্দে (দ্র) ও অলঙ্কারে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য। বিদ্যাপতির (দ্র) মতো তিনি কবিতা লিখতেন। এ জন্য তাঁকে বিদ্যাপতির অনুসারী বলা হয়। মৈথিলী আর ব্রজবুলি প্রায় কাছাকাছি। মৈথিলী পরে বিশুদ্ধতা হারিয়ে ব্রজবুলিতে রূপ নিয়েছে। এই ভাষা ব্যবহারের জন্য এবং শব্দে ও অলঙ্কারে বিশেষ যত্নের জন্য এই দুই কবিকে একই দলভুক্ত করা হয়। রাধা-কৃষ্ণের জীবনলীলার বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে গোবিন্দদাস পদ লিখেছেন। তবে বেশি ভাল লিখেছেন ঋতু বিষয়ক পদ। ছন্দে তাঁর হাত খুব পাকা। গোবিন্দদাস কবিতা লিখেছেন এক জন সাধকের মতো। এক জন ভাস্কর যেমন পাথর কেটে কেটে মূর্তি তৈরি করেন, গোবিন্দদাসও তেমনি ভাষাকে কেটে অর্থাৎ মার্জিত করে কবিতা লিখেছেন। অসংখ্য পদ রচনা করেছেন তিনি। তাঁর নামে প্রায় চার শ' পদ প্রচলিত আছে।

আ. ক.

গোয়টে, ইওহান্ ভোল্ফ্গাঙ্ ফন্ [১৭৪৯–১৮৩২]

গোয়টে (Johann Wolfgang von Goethe) বিশ্বসাহিত্যের অসামান্য কৃতী পুরুষ। তাঁর জন্ম ১৭৪৯ সালে। তিনি জন্মসূত্রে জার্মান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছিলেন বিশ্বনাগরিক। বাংলা সাহিত্যের (দ্র) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) মতো—জন্মসূত্রে যিনি বাঙালি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বনাগরিক। গোয়টে জন্মগ্রহণ করেন জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে, তবে তাঁর বিশাল কর্মময় জীবনের প্রধান অংশ অতিবাহিত হয় ভাইমার (Weimar) প্রজাতন্ত্রে। ভাইমারে বাস করার সময় গোয়টে সাহিত্য রচনার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক

কবি গোয়টে

দায়িত্বও পালন করেন।

গোয়টের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে চর্চা করেছেন, রঙ নিয়ে গবেষণা করেছেন, উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যয়ন করেছেন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য দ্বারা পরবর্তী শিল্পভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তবে তাঁর প্রধানতম অবদান সৃজনশীল সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে। গোয়টের কাব্যনাটক দু'খণ্ডে সমাপ্ত 'ফাউস্ট' (১৮০৮, ১৮৩২) (দ্র) বিশ্বসাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। আপন প্রতিভার জাদুবলে গোয়টে প্রাচীন এক রূপকথার কাহিনীকে তাঁর 'ফাউস্ট' কাব্যনাটকে মহাকাব্যের (দ্র) মর্যাদা দান করেছেন। জ্ঞানতৃষ্ণা, সৌন্দর্যানুরাগ, কামনা-বাসনা, কল্পনাশক্তি, ক্ষমতার মোহ, অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য এবং আরো বহু মানবিক বিষয় 'ফাউস্ট'-এ বিস্ময়করভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। গ্রন্থটি পরিকল্পনা ও রচনা করতে কবিগুরু গোয়টের

www.pathagar.com

প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছিল।

কাব্যনাটক 'ফাউস্ট' ছাড়াও গোয়টে উপন্যাস (দ্র), ভ্রমণসাহিত্য, কাহিনীকাব্য, নীতিকবিতা ও গদ্যনাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে 'ক্লাভিগো' (১৭৭৪), 'তরুণ ভের্টেরের দুঃখ' (১৭৭৪), 'ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মেইস্টারের শিক্ষানবিশী' (১৭৯৫-১৭৯৬), 'পূর্ব-পশ্চিমের দিওয়ান' (১৮১৬) 'ইতালীয় ভ্রমণ' (১৮১৬-১৮১৭), 'ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মেইস্টারের ভ্রাম্যমাণ বছরগুলি' (১৮২১-১৮২৯)।

কাজী আবদুল ওদুদ (দ্র) বাংলা ভাষায় (দ্র) গোয়টের জীবনী প্রথম প্রকাশ করেন। গোয়টের 'ফাউস্ট' বিশ্বের নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাদেশে(দ্র) কবি-প্রাবন্ধিক-কথাসাহিত্যিক আহমদ ছফা 'ফাউস্ট'-এর প্রথম খণ্ডের বাংলা কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেন ১৯৮৬ সালে।

গোয়টেই সর্বপ্রথম 'বিশ্বসাহিত্য' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর প্রেরণাদায়ী বিপুল সৃষ্টিকর্ম দ্বারা বিশ্বসাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে কবিগুরু গোয়টে ভাইমারে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন ১৮৩২ সালে।

ক. চৌ.

গোয়াল্‌দি মসজিদ

গোয়াল্‌দি মসজিদ এক-গম্বুজবিশিষ্ট একটি প্রাচীন ইমারত। নারায়ণগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক জনপদ সোনারগাঁও থানার গোয়াল্‌দি গ্রামে এই সুপ্রাচীন মসজিদটি অবস্থিত।

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (দ্র) রাজত্বকালের শেষ বছর অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ই আগস্ট তারিখে জনৈক হিজাবর আকবর খাঁ এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

গোয়াল্‌দি মসজিদ বর্গাকার আকৃতির একটি ছোট্ট ইমারত। দেয়ালগুলো পাঁচ ফুট পুরু। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন এই মসজিদটিতে রয়েছে অলঙ্কৃত তিনটি মেহরাব। এর মধ্যে মাঝখানের মেহরাবটি কালো পাথরের ওপর নিপুণভাবে খোদাই-করা নানা প্রকার ফুল, লতাপাতায় সজ্জিত।

প্রায় পাঁচ শ' বছরের ঐতিহ্য বহন করে আজও মসজিদটি দাঁড়িয়ে আছে।

মু. মা.

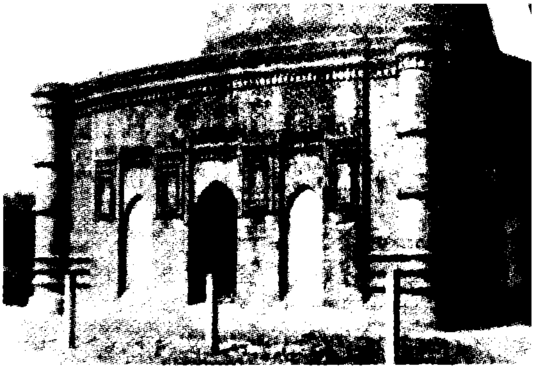

গোয়ালদি মসজিদ

গোয়েন্দা-গল্প

গোয়েন্দা-গল্প বা ডিটেকটিভ-গল্পের মূল আকর্ষণ রহস্যের জটাজাল সৃষ্টি ও সেই জাল ছিন্ন করার কৌশলের মধ্যে নিহিত। এখানে সাধারণত এক বা একাধিক অপরাধী চুরি ও হত্যাসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করে। তারপর গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভ তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিশ্লেষণদক্ষতা, অসীম সাহস, দৈহিক শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি দ্বারা নানা রকম সূত্র অনুসরণ করে অপরাধীকে খুঁজে বের করে। গোয়েন্দা গল্পের কাহিনী জটিল। নানা রকম রহস্যময় ও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে তা অগ্রসর হয়। গোয়েন্দা-গল্পকে বাংলায় রহস্যগল্প নামেও অভিহিত করা হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে গোয়েন্দা-কাহিনীর লেখক হিসাবে শার্লক্‌ হোমস্‌ (দ্র)-এর স্রষ্টা স্যার আর্থার্‌ কোনান্‌ ডয়েল্‌ (দ্র) এবং হার্কিউল্‌ পোয়ারো-র (Poirot) স্রষ্টা আগাথা ক্রিস্টি (১৮৯০-১৯৭৬) বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলা ভাষায় (দ্র) পাঁচকড়ি দে (১৮৭৩-১৯৪৫), হেমেন্দ্রকুমার রায় (দ্র), সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্র), কিরীটি রায়ের (দ্র) স্রষ্টা নীহাররঞ্জন গুপ্ত (দ্র) এবং ফেলুদার স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় (দ্র) সাহিত্যের এই শাখাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

ক. চৌ.

গোর্কি, মাক্সিম্‌ [১৮৬৮—১৯৩৬]

বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের(দ্র) সবচেয়ে খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী লেখক।

www.pathagar.com

মাক্সিম্ গোর্কির আসল নাম আলেক্সিয়েই মাক্সিমভিচ্ পেশ্‌কোফ্। অর্থাৎ পেশ্‌কোফ্ বংশের মাক্সিমের ছেলে আলেক্সিয়েই। গোপন ও নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী ও লেখক হিসাবে তিনি 'গোর্কি' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন; রুশ ভাষায় (দ্র) 'গোর্কি' শব্দের অর্থ— তেতো, ঝাল, বিস্বাদ। জন্মেছিলেন ১৮৬৮ সালের ১৬ই মার্চ নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরদ্ শহরে। তাঁর নামানুসারে শহরটির নতুন নাম এখন গোর্কি। বাবা-মার প্রথম সন্তান ছিলেন তিনি।

ছোট বেলাতেই তিনি বাবা-মা হারিয়েছিলেন। খুবই দরিদ্র ছিলেন। বাবা ছিলেন অনাথ এবং কাঠমিস্ত্রি। মা অবশ্য ছিলেন বড়লোকের মেয়ে। পয়সার অভাবে গোর্কি স্কুলে যেতে পারেন নি। লেখাপড়া শিখেছিলেন সবটুকুই নিজের অদম্য ইচ্ছায় ও অকল্পনীয় পরিশ্রমে। বেঁচে থাকার জন্য এমন কোনো কাজ নেই যা তাঁকে করতে হয় নি। একেবারেই ভবঘুরের মতো জীবন ছিল তাঁর। এভাবেই যত রকমের মানুষজন চিনেছিলেন, যত অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল সে সবই কাজে লাগিয়ে তিনি পরে গল্প (দ্র)-উপন্যাস (দ্র)-নাটক (দ্র) ইত্যাদি সাহিত্যরচনা করেছিলেন। পরে অবশ্য সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। গোর্কি বিয়ে করেছিলেন সাতাশ বছর বয়সে, একাতেরিনা পাভ্‌লভ্‌না ভোল্‌ঝিনা নামের এক প্রুফ-রিডারকে। তাঁদের দুটি সন্তান হয়েছিল : মাক্সিম্ আলেক্সিয়েভিচ্ (ছেলে) আর একাতেরিনা আলেক্সিয়েভ্‌না (মেয়ে)। উভয়েই তাঁর জীবদ্দশাতেই মারা যায়।

চব্বিশ বছর বয়সে তিনি লেখা শুরু করেন। সারা রাশিয়ায় (দ্র) কথাসাহিত্যিক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা পান ১৮৯৮ সালের মধ্যে। বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষদের নিয়ে ১৯০২ সালে তাঁর নাটক 'নিচু তলা' প্রকাশিত হলে বিদেশেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তবে তাঁর প্রধান পরিচয় ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসাবে।

তাঁর লেখক-জীবনকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। ১৮৮৫ সালে তাঁর বড়গল্প 'চেল্‌কাশ্' বেরয়। 'মাকার্ চুদ্রা' (১৮১২), 'ফোমা গর্দাইয়েফ্' (১৮৯৯) ও 'মা' (১৯০৭) তাঁর প্রথম পর্বের রচনা।

১৯০৭ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সময়কে দ্বিতীয় পর্ব ধরা হয়। ১৯০৭ সালে গোর্কি ইতালির কাপ্রি-তে চলে গিয়ে ১৯১৩ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। এর মধ্যে তিনি তাঁর আত্মজীবনী লেখা সমাপ্ত করেন, সেগুলো 'আমার শৈশব', 'পৃথিবীর পথে' ও 'পৃথিবীর পাঠশালায়' নামে বাংলা ভাষায় (দ্র) অনূদিত হয়েছে।

তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষ পর্ব ১৯১৭ থেকে ১৯৩৬ সাল। এর মধ্যে 'আর্তামনফ্‌দের ক্রিয়াকলাপ' ও 'ক্লিম্ সাম্‌গিন্' উপন্যাস দু'টি তাঁর প্রধান রচনা।

গোর্কি তাঁর যুগের সর্বপ্রধান সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। নিজে লিখেছেন, লেখক তৈরি করেছেন, বিপন্ন লেখকদের আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর সংগঠনক্ষমতাও ছিল বিপুল। বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে রুশ ভাষা ও সাহিত্যকে পুষ্ট করার জন্য যে প্রকাশনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি তাঁর প্রধান কর্মীপুরুষ ছিলেন। পরবর্তী কালে সাহিত্যে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা বা সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজ্‌ম্ ধারণার উদ্ভব তাঁর রচনাবলিকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। লক্ষণীয় যা তা হল: তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন না, অথচ তাঁর সম্মান ও প্রভাব এত সর্বব্যাপী ছিল যে তিনি দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির নীতি নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন।

অত্যন্ত দুঃখকষ্টে মানুষ হওয়ার ফলে কখনোই তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। যক্ষ্মায় (দ্র) আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং রোগমুক্ত হতে পারেন নি। সম্ভবত এ অসুখেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে ১৯৩৬ সালে।

হা. মা.

গোলাপ (rose)

ঘন কাঁটাভরা গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ (দ্র)। পাতা দেখতে অনেকটা গোলাকার ও এর কিনারা করাতের মতো খাঁজকাটা। পাতার শিরায় মাঝে মাঝে কাঁটা দেখা যায়। কচি কাণ্ডের আগায় ঘন পাপড়িবিশিষ্ট ফুল হয়। ফুল কয়েক দিন ধরে আস্তে আস্তে ফোটে। গন্ধ চমৎকার। আবার গন্ধহীন

www.pathagar.com

গোলাপও আছে। গন্ধহীন বা সুগন্ধ সব গোলাপই দেখতে খুব সুন্দর। এর বীজ হয় টোপাকুলের মতো। বীজ, কলম বা ডাল কেটে পুঁতলেও গাছ হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *রোজা দামাস্‌কেনা* (*Rosa damascena* Mill), গোত্র রোজাসি (Rosaceae)। বাংলায় প্রচলিত নাম গোলাপ। হিন্দি ও ইউনানী চিকিৎসকদের কাছে এর নাম গুলাব্। প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃতে এর নাম শতপত্রী বা শেউতি। প্রাচীন কয়েকটি প্রজাতির বুনো গোলাপের উৎপত্তিস্থান হিমালয়ের (দ্র) পাদদেশের বন-জঙ্গল। গোলাপের প্রাচীন প্রজাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে দামেশ্‌ক্ গোলাপ। এ জন্য বোটানিক্যাল নামের পাশে 'দামাসকেনা' যুক্ত আছে।

গোলাপ গোত্রে ঔষধি, গুল্ম ও বৃক্ষ এই তিন ধরনের উদ্ভিদ আছে। অনাদিকাল থেকে গোলাপ পৃথিবীর (দ্র) সর্বত্র জনপ্রিয়। বাগানের ছোট্ট গোলাপ থেকে দীর্ঘগুল্ম বা লতানে গোলাপসহ শত শত রকমের গোলাপ রয়েছে। প্রধানত ৭টি প্রজাতি থেকে আধুনিক সঙ্কর গোলাপের উৎপত্তি। বহু শতাব্দী থেকে ক্রমাগত নির্বাচন, বিস্তার এবং সঙ্করায়ণের ফলে নানা রঙের হাজার জাতের আধুনিক গোলাপের উদ্ভব। মুসলমানদের ভারতে (দ্র) আগমনের পর উদ্যানজাত গোলাপ পারস্য থেকে ভারতে আসে। বিচিত্র রং, সুগন্ধ ও নয়নাভিরাম ফুলের জন্য মানুষ গোলাপ ভালবাসে। টবে বা জমিতে সবখানে গোলাপ ভাল জন্মে। উন্মুক্ত, উঁচু, রৌদ্রময় ঝড়ো বাতাসহীন উর্বর জমিতে গোলাপ ভাল জন্মে। ঈষৎ বালুময় দো-আঁশ মাটি গোলাপ চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এতে গোবর ও খৈল উপকারী। অন্যান্য দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র (দ্র), ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য (দ্র), ইতালি, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশ গোলাপ চাষের জন্য বিখ্যাত। গোলাপ থেকে আতর, সুগন্ধি, গোলাপজল, রোজ (rose) সিরাপ প্রভৃতি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরি হয়। গোলাপের গবেষণার জন্য লণ্ডনের ন্যাশনাল রোজ সোসাইটির (স্থাপিত ১৮৭৬) অবদান উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যে গোলাপের মহিমা প্রাচীন কাল থেকে এখনো অম্লানভাবে গাওয়া হচ্ছে। রোজ (rose) থেকে প্রসাধন দ্রব্য 'রুঝ'-এর সৃষ্টি। আর বস্‌রাই ও পারসিক গোলাপের মহিমার কথা কে না জানে।

বি. ব.

গোলাম মোস্তফা [১৮৯৭—১৯৬৪]

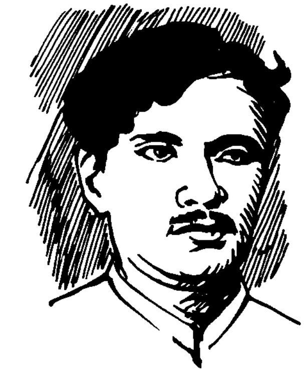

কবি, গদ্যকার, গীতিকার, সুরকার ও শিক্ষক। ১৮৯৭ সালে যশোর জেলার শৈলকূপা থানার মনোহরপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোলাম রব্বানী ও পিতামহ কাজী গোলাম সরোয়ার। পিতা ও পিতামহ দু' জনই লোককবি ছিলেন।

গোলাম মোস্তফা ১৯১৮ সালে কলিকাতার (দ্র) রিপন কলেজ থেকে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষাজীবন-শেষে শিক্ষকতাকেই তিনি পেশা হিসাবে বেছে নেন। বিভিন্ন সরকারি স্কুলে সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শেষ হয়। ১৯৪৯ সালে তিনি তৎকালীন পূর্ব-বাংলা সরকার কর্তৃক গঠিত ভাষা-সংস্কার কমিটির সচিব ছিলেন।

পিতা ও পিতামহের প্রভাবে কিশোর বয়সেই সাহিত্যের প্রতি গোলাম মোস্তফার আগ্রহ জন্মায় এবং তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৯১৩ সালে তিনি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র, তখন 'মাসিক মোহাম্মদী' (দ্র) পত্রিকায় প্রথম তাঁর লেখা 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর সাহিত্যসাধনা চলতে থাকে।

রবীন্দ্র-ধারা অনুসারী কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পরবর্তী কালে গোলাম মোস্তফা ইসলামী ভাবাদর্শে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি সাহিত্যপরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হল : কাব্য—'রক্তরাগ' (১৯২৪), 'খোশরোজ' (১৯২৯), 'কাব্যকাহিনী' (১৯৩২), 'সাহারা' (১৯৩৬), 'হাস্নাহেনা' (১৩৩৪ ব.), 'বনি-আদম' (১৯৫৮), 'তারানা-ই-পাকিস্তান' (১৯৪৮); উপন্যাস—'ভাঙাবুক' (১৩২৮ ব.), 'রূপের নেশা', 'এক মন এক প্রাণ'; জীবনী—বিশ্বনবী' (১৯৪২); ইসলাম বিষয়ক গ্রন্থ—'ইসলাম ও জেহাদ', 'ইসলামে কমিউনিজম',

www.pathagar.com

'মরুদুলাল'; প্রবন্ধপুস্তক—'আমার চিন্তাধারা' (১৯৬২); অনুবাদ—'মুসাদ্দাস-ই-হালী' (১৯৪৯), 'কালাম-ই-ইকবাল' (১৯৫৭), 'আল-কোরআন' (১৯৫৮), 'শিকওয়া ও জওয়াব-ই শিকওয়া' (১৯৬০), এবং 'জয়পরাজয়' ইত্যাদি।

গোলাম মোস্তফার সমগ্র রচনাকর্মের মধ্যে 'বিশ্বনবী' গ্রন্থটি সুধী সমাজ কর্তৃক বেশি সমাদৃত হয়। তাঁর কাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সহজ সাবলীল শিল্পসম্মত প্রকাশ ও ছন্দলালিত্য। তাঁর রচিত কয়েকটি দেশাত্মবোধক গান খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি কিছু পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলোর খুবই সমাদর ছিল। তাঁর নিজের সুরারোপিত কয়েকটি গানের রেকর্ডও পাওয়া যায়।

কবি হিসাবে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৫২ সালে তিনি যশোর সাহিত্য সংঘ কর্তৃক 'কাব্যসুধাকর' এবং ১৯৬০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় (দ্র) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

গোলাম রহমান [১৯৩১—১৯৭২]

১৯৩১ সালের ২৮শে নভেম্বর কলিকাতায় (দ্র) জন্ম। পিতার নাম শেখ আবদুর রহিম এবং মাতার নাম আবেদা খাতুন। কলিকাতার মডার্ন স্কুল থেকে ১৯৪৭ সালে প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৯৪৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ে (রিপন কলেজ) ভর্তি হন; কিন্তু ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে ঢাকা (দ্র) চলে আসেন।

'দৈনিক ইনসাফ' পত্রিকায় যোগদান করেন এবং এর শিশুবিভাগ 'সবুজমেলা' পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'দৈনিক ইত্তেহাদ'-এর 'ভাই বোনের আসর' এবং সাপ্তাহিক 'পূর্বদেশ' পত্রিকার 'চাঁদের হাট' পরিচালনার দায়িত্বেও তিনি নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (ভাদ্র ১৩৬৭) তাঁর সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক শিশুপত্রিকা 'মধুমেলা'র আত্মপ্রকাশ ঘটে। ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শেষ সংখ্যাটি (৩য়-৪র্থ) যুক্ত সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয় কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৬০) সনে।

গোলাম রহমান মূলত শিশুসাহিত্যিক। শিশুদের জন্য রচিত ও প্রকাশিত গল্পের বই : 'রকমফের' (১৯৫৩), 'বাড়ী নিয়ে বাড়াবাড়ি' (১৯৫৩), 'বুদ্ধির ঢেঁকি' (১৯৫৮), 'পানুর পাঠাগার' (১৯৫৯), 'চকমকি' (১৩৬৭ ব.), 'ঈশপের গল্প', (২য় সং, ১৯৬৬), 'জ্যান্ত ছবির ভোজবাজি' (১৩৬৭ ব.) 'রূশদেশের রূপকথা' (১৩৬৭ ব.)। সম্পাদিত গ্রন্থ : 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৩৬৭ ব.) ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' (১৯৬২)। জীবনী : 'আমাদের বীর সংগ্রামী' (১৯৭০)। বড়দের জন্য গ্রন্থ : 'নেতা ও নারী' (উপন্যাস ১৩৬২ ব.); 'কাফে দ্য খোরাসান' (রম্যরচনা ১৯৬৭)। গোলাম রহমান রচিত বইগুলো, দু-একটি বাদে, তাঁরই বিভিন্ন নামের প্রকাশনা সংস্থা, যথা—ইউনিটি বুক এজেন্সী, সেঞ্চুরী পাবলিশার্স, মধুমেলা প্রকাশনী, প্রিমিয়ার বুকস ইত্যাদি থেকে প্রকাশিত হয়।

গোলাম রহমান ১৯৬৯ সালে শিশু সাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) পান। তিনি ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

শা. হ.

গোল্ডফিশ (goldfish)

গোল্ডফিশ বা সোনালি মাছ একটি বাহারি মাছ হিসাবে পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *ক্যারসিয়াস অরেটাস*

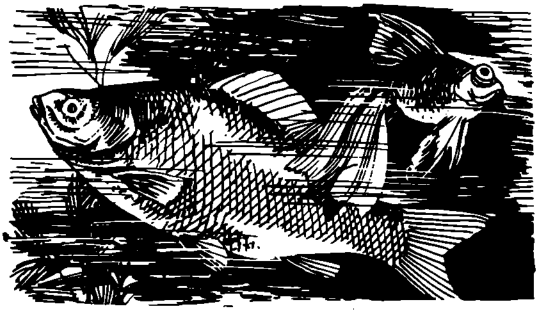

(Carossius auratus)। শৌখিন মৎস্যচাষীরা অ্যাকোয়ারিয়ামে (দ্র) এই মাছ শখ করে লালনপালন করেন।

সোনালি মাছ পুঁটি জাতীয় মাছ। এদের মাইনর কার্প

www.pathagar.com

বলা হয়। এই মাছের দেহ অনেকটা সোনালি হওয়ার ফলে এদের দেহ সোনালি দেখায়, ঝক্‌মক্‌ করে। গোল্ডফিশের অনেকগুলো প্রজাতি বা জাত রয়েছে। এদের প্রায় সবার দেহই সোনালি রঙের, তবে কারো কারো দেহে রূপালি রঙের ছোপও থাকে। দেহের বাইরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য এদের জাতে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন— কারো কারো নাকের উপর ফুলকপির মতো অঙ্গবিশেষ থাকে, কারো চোখ বাইরের দিকে বের করা, কারো চোখের নিচে ফোলানো থলি ইত্যাদি। তবে দেহের গড়ন যা-ই হোক না কেন সব জাতের গোল্ডফিশই সুন্দর। প্রায় সব শৌখিন অ্যাকোরিয়াম-মালিক গোল্ডফিশকে বিশেষ আদরের সঙ্গে পোষেন। অনেক দোকানে অ্যাকোয়ারিয়ামে প্রদর্শন করার জন্য এই মাছ রাখা হয়। এতে দোকানের সৌন্দর্যও বাড়ে।

সাধারণত গোল্ডফিশ অ্যাকোয়ারিয়ামে প্রজনন করতে পারে। তবে শৌখিন অ্যাকোয়ারিয়াম-মালিকগণ নিজস্ব প্রচেষ্টায় এদের ছানা-পোনা তৈরি করেন।

অ্যাকোয়ারিয়ামে লালনপালনের সময় গোল্ডফিশকে বড়ির মতো খাবার খেতে দেওয়া হয়। এ ধরনের খাবার বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। গোল্ডফিশের আয়ু কয়েক বছর পর্যন্ত হতে পারে। তবে জলের কারণে বা খাবারের কারণে অসুখ হয়েই গোল্ডফিশ বেশি মারা যায়।

ত. চ.

গোল্লাছুট

গোল্লাছুট বাংলাদেশের (দ্র) একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ খেলা। কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয় বিনোদনমূলক এই খেলাটি গ্রামবাংলার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে ও নিয়মকানুনের কিছুটা অদলবদল করে খেলা হয়ে থাকে। তবে খেলার পদ্ধতি একই। খেলার মাঠে বা উন্মুক্ত বাধাহীন জায়গায় এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। দুই দলেই সমান সংখ্যক ছেলেমেয়ে থাকে। এক দল অপর দল থেকে প্রায় ২০ থেকে ৪০ ফুট দূরে মুখোমুখি দাঁড়ায়। একটা ইট বা ঐরূপ কিছু একটা দূরত্ব-চিহ্ন স্বরূপ বসানো হয়। এই ইটের উপর চতুর খেলোয়াড়কে অর্থাৎ গোল্লাকে বসতে বলা হয়। সে বসলে প্রতিপক্ষের সবাই তাকে বন্দির মতো করে ঘিরে পাহারা দিতে থাকে। বন্দির দলের লোকদের কাজ তাকে উদ্ধার করা। এই জন্য তাদের মধ্যে এক জন বিড়বিড় করে "কিট কিট" ইত্যাদি অর্থহীন ধ্বনি করে এক নিঃশ্বাসে প্রতিপক্ষ দলের প্রহরীদের ছুঁতে চেষ্টা করে। যদি সে ছুঁয়ে নিজের স্থানে ফিরতে পারে তবে তারা 'আউট' বলে গণ্য হবে। কাজেই প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য এদিক ওদিক দৌড়ে তার নাগালের বাইরে থাকার চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে বন্দি খেলোয়াড় যদি প্রহরীদের বেষ্টনী ভেঙে দৌড়ে নিজের দলে চলে আসতে পারে, তবে ঐ দলের জয় হয়। যদি প্রতিপক্ষের কেউ ইতোমধ্যে দৌড়ে এসে তাকে ছুঁয়ে দিতে পারে, তা হলে প্রতিপক্ষের জয় হয়। দুই পক্ষ পালাক্রমে এইভাবে খেলতে থাকে। যে দল তাদের পক্ষের বন্দিকে নিরাপদে পর পর সাত বার উদ্ধার করতে পারে সেই দলই জয়ী হয়। এই খেলায় কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই।

কা. আ. আ.

গৌড়

বাংলাদেশের (দ্র) অঞ্চলবিশেষের প্রাচীন নাম। এই অঞ্চল জুড়ে গুড় উৎপাদনের প্রাচুর্যের কারণেই 'গৌড়' নামের উৎপত্তি। তবে এই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান বা সীমা নিয়ে নানা মতভেদ প্রচলিত। কারো কারো মতে, পশ্চিম-বাংলার মালদহ-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে প্রাচীন গৌড় দেশ অবস্থিত ছিল। রুশ ইতিহাসবিদ কোকা আন্তোনভার মতে, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে উত্তর ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্র বলতে ছিল গৌড় (উত্তর ও পশ্চিম-বাংলা), রাজধানী কনৌজসহ মৌখরি রাজ্য (দোয়াব বা গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ ভূভাগ এবং গঙ্গা নদীতীরবর্তী মধ্য এলাকা) এবং রাজধানী স্থানেশ্বরসহ পুষ্যভূতি-রাজ্য (উত্তর দোয়াব, বর্তমান দিল্লির চারপাশের অঞ্চল এবং সির্‌হিন্দ্‌)। তখন এই তিনটি রাজ্য অনবরত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। এই কারণে কারো কারো অভিমত, গৌড়ের ভৌগোলিক সীমা কখনো প্রসারিত, কখনো সঙ্কুচিত হয়েছে।

গৌড়ের রাজা প্রথম শশাঙ্ক (দ্র) ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মগধ এবং প্রয়াগ (দ্র) পর্যন্ত পশ্চিমের সমস্ত ভূভাগ তিনি জয় করেন। পূর্বদিকে তিনি অধিকার করেন মহেন্দ্রগিরি নামের

www.pathagar.com

পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল (এগুলোর সমন্বয়েই আধুনিক ওড়িশা রাজ্য গঠিত)।

মধ্যযুগে সাধারণত বাংলার পশ্চিমাঞ্চল 'গৌড়' এবং পূর্বাঞ্চল 'বঙ্গ' নামে অভিহিত হত। এমনকি সমস্ত বাংলাদেশ বোঝাতেও গৌড় কিংবা বঙ্গ নাম ব্যবহৃত হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ে যে চরম বিশৃঙ্খলা বা অরাজক অবস্থা চলছিল, তা দূর করার জন্য প্রজাবৃন্দ গোপালকে রাজা নির্বাচিত করেন। এই গোপালই বাংলা ও বিহারের সুবিখ্যাত পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাল রাজাদের গৌড়, বঙ্গ এবং বঙ্গাল দেশের অধীশ্বর বলা হত। গোপালের পুত্র ধর্মপাল (আনু. ৭৭০-৮১০) পালবংশের (দ্র) শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন।

পালবংশীয় মদনপালের রাজত্বকালে (১১৪৩-৬১) বঙ্গদেশে সেনবংশের (দ্র) অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে সেন রাজারা গৌড়েশ্বররূপে অভিহিত হতে থাকেন এবং লক্ষ্মণ সেন (আনু. ১১৭৯-১২০৬) গৌড়ের কাছাকাছি গড়ে তোলেন লক্ষ্মণাবতী নগরী।

১২০০ খ্রিস্টাব্দের অল্প কিছুকাল আগে তুর্কি মুসলমান সেনাপতি ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খল্‌জি (দ্র) বিহার অধিকার করলে লক্ষ্মণ সেন তাঁর হাতে পরাজিত হন এবং পালিয়ে আসেন আজকের বাংলাদেশের বিক্রমপুর অঞ্চলে। পরবর্তী কালে মুসলমান শাসকবৃন্দকেও গৌড়ের রাজা বলে অভিহিত করা হত।

গৌড়ের মুসলমান শাসকেরা দিল্লির সুলতানের অধীনে থাকলেও মাঝে মাঝেই নিজেদের স্বাধীন শাসক হিসাবে ঘোষণা করতেন। সমগ্র বাংলাদেশে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর পশ্চিমে গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী, পূর্বে সোনারগাঁ এবং দক্ষিণে সপ্তগ্রাম— এই তিন জায়গায় তাঁদের শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সুলতানদের আমলে গৌড়ে ক্ষমতা দখলের লড়াই, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং হত্যাকাণ্ডের ঘটনা লেগেই ছিল। এই পটভূমিতে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবর (দ্র) বঙ্গদেশ অধিকার করলে ক্রমে গৌড়ের রাজনৈতিক প্রভাব বিলুপ্ত হয়।

বর্তমান গৌড় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। চারদিকে ভগ্ন সৌধ আর শুকিয়ে যাওয়া দিঘি ইত্যাদি পাল ও সেন যুগের দেব-দেবীর মূর্তি ও মুসলিম শাসনামলের বহু মলিন স্থাপত্যকীর্তি এখনো দেখতে পাওয়া যায়।

গৌড় দেশের সীমার ভেতরে পাল ও সেন রাজাদের শাসনামলেই স্থাপিত হয় বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি। এই সময়ই সংস্কৃতে 'গৌড়ীরীতি' গৃহীত হয়। প্রচলন ঘটে নতুন মূর্তিশিল্পের। বৌদ্ধ (দ্র) ধর্মীয় গুরুদের হাতে এই ধর্ম পায় নতুন রূপ। সিদ্ধাচার্যরা দেশীয় ভাষায় রচনা করেন সাধনসঙ্গীত 'চর্যাপদ' (দ্র)। প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা ভাষা ও বাঙালির সৃজনশক্তি। মুসলিম ভাবসম্পদ এই দেশের মাটিতে খুঁজে নেয় তার উদার সমন্বয়ের পথ।

আ. হু.

গৌতম বুদ্ধ [৬২৩—৫৪৩ খ্রি. পূ.]

সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয় খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে। তাঁর পিতার নাম রাজা শুদ্ধোদন, তিনি শাক্যদের রাজা ছিলেন। কপিলবাস্তু ছিল রাজধানী। সিদ্ধার্থের জননীর নাম মায়াদেবী বা মহামায়া। মায়াদেবীর পিত্রালয় দেবদহ নগরে যাওয়ার পথে কপিলবাস্তু থেকে কয়েক মাইল দূরে লুম্বিনী নামক বনে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুমার সিদ্ধার্থ ভূমিষ্ঠ হন। এই লুম্বিনী কানন অবস্থিত নেপালের তরাই অঞ্চলে। সিদ্ধার্থের জন্মের ৩০০ বছর পর মহামতি আশোক (দ্র) এক পাষাণস্তম্ভ প্রোথিত করে স্থানটি নির্দিষ্ট করে দেন। স্তম্ভটি এখনো সেখানে আছে।

সিদ্ধার্থের বিভিন্ন নাম— সূর্যবংশ, আঙ্গিরস, শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি, শাক্য, শৌদ্ধোদনি, আদিত্য বন্ধু, সিদ্ধার্থ, তথাগত, সর্বার্থসিদ্ধ ও গৌতম। গৌতমের জন্মকাল থেকে বুদ্ধত্বলাভের সময় পর্যন্ত তাঁকে বোধিসত্ত্ব (দ্র) বলা হয়। সিদ্ধার্থের জন্মের এক সপ্তাহ পরে তাঁর মাতা মায়াদেবী পরলোক গমন করেন এবং তাঁর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন মাসী তথা বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী। এ জন্য সিদ্ধার্থের নাম হয় গৌতম। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার পর কুমার সিদ্ধার্থকে সংসার বিষয়ে উদাসীন ও অধিক চিন্তাশীল দেখে রাজা শুদ্ধোদন প্রতিবেশী কোলিয় (কারো কারো মতে শাক্য) গণতন্ত্রের রাজকন্যা যশোধরার (বা গোপাদেবী) সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেন। সিদ্ধার্থও কিছুকাল সংসারী হয়ে গৃহে অবস্থান করতে থাকেন। ২৯ বছর বয়সে পুত্র রাহুল জন্মগ্রহণ করলে সিদ্ধার্থ ভাবলেন যে এই পুত্র তাঁকে

www.pathagar.com

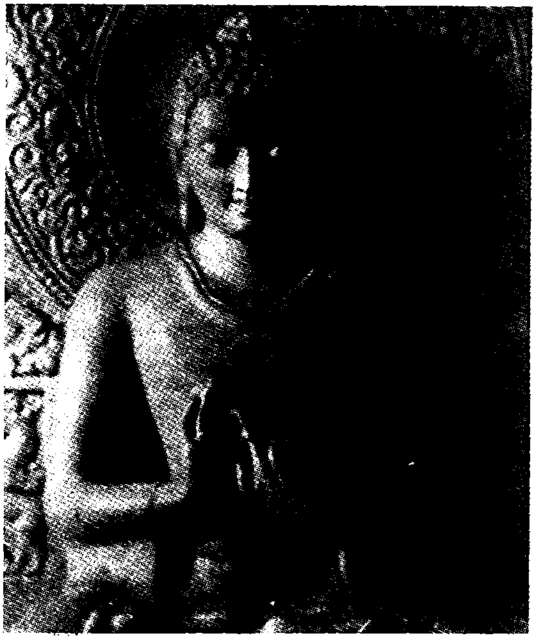

ধ্যানমগ্ন গৌতম বুদ্ধ

সংসারজালে আবদ্ধ করে অশেষ দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত করবে।

এ সময় তিনি বৃদ্ধ, রোগী, মৃতদেহ ও সন্ন্যাসী— এই চার দৃশ্য দেখে সংসারের প্রতি বিমুখ হন। পুত্রের জন্মের সপ্তম দিবসে আষাঢ়ী পূর্ণিমা (দ্র) তিথিতে তিনি সারথি (অর্থাৎ তাঁর রথের চালক) ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে চিরকালের জন্য রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন।

তপস্যার শেষে বুদ্ধত্ব লাভের পর এক দিন তিনি বললেন, "মা যেমন নিজের শিশুকে রক্ষা করে, প্রত্যেকের উচিত প্রত্যেক প্রাণীকে তেমনি ভালবেসে বিপদ থেকে রক্ষা করা।"

সকল প্রাণীর প্রতিই ছিল গৌতম বুদ্ধের অপরিসীম দয়া ও মমতা। তাঁর জীবনের প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কথা হল মৈত্রী (বা মহামৈত্রী)। বুদ্ধ পৃথিবীর (দ্র) সকল প্রাণীর জন্য এই ভালবাসা— মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ (দ্র) অর্থাৎ সকল প্রাণের প্রতি মৈত্রী পোষণ করতেন। এই মৈত্রীবোধই তাঁকে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করেছে। বোধিসত্ত্ব অবস্থায়ও তিনি তাই করেছেন। তাই তাঁর নির্বাসনের পরেও সবাই তাঁর মৈত্রী ও করুণার কথা স্মরণ করে, এ জন্য তাঁর নাম 'মহাকারুণিক বুদ্ধ'।

তিনি তৃষ্ণা, ভোগ ও বাসনা জয় করেছিলেন। জয় করেছিলেন অসন্তোষ, ক্ষুধা, পিপাসা ও রিপু। তিনি ছয় বছর কঠোর তপস্যা করে ৩৫ বছর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বা বুদ্ধপূর্ণিমায় (দ্র) রাতের প্রথম প্রহর থেকে ধাপে ধাপে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তাঁর জ্ঞানদর্শন এই যে : দুঃখ আছে, দুঃখের হেতু আছে, দুঃখের বিনাশ আছে এবং দুঃখ চিরতরে বন্ধ করার উপায় আছে। গৌতম বুদ্ধের এই জ্ঞানদর্শনের নাম 'চতুরার্যসত্য' (দ্র)।

বৌদ্ধ দর্শনের মূল সুর অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। পৃথিবীর সবকিছুই অনিত্য, দুঃখই সত্য, আর চিরস্থায়ী আত্মা বলে স্থির কিছু নেই। অদৃশ্য কোনো কিছুর প্রতি, অলৌকিক কিছুতে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেন নি। তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ঈশ্বর ছিল না, ছিল মানুষ ও মানুষের সমাজ।

বুদ্ধ ছিলেন মিতাহারী, পরিশ্রমী, সৌন্দর্যপ্রিয়, শৃঙ্খলাপ্রিয়, সুবক্তা, যুক্তিবাদী এবং উত্তম সংগঠক। তাঁর ধর্মের (দ্র) মৌলিকতার জন্য ভারতবর্ষের বাইরে শ্রীলঙ্কা (দ্র), ব্রহ্মদেশ (দ্র), চীন (দ্র), জাপান (দ্র), কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া, থাইল্যাণ্ড (দ্র), লাওস, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া (দ্র), মালয়েশিয়া (দ্র), তিব্বত (দ্র) প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম (দ্র) এখনো বিদ্যমান। তাঁর অহিংস নীতি পরবর্তী কালে মহাত্মা গান্ধী (দ্র) ও মার্টিন লুথার কিং (দ্র) গ্রহণ করে জগদ্বিখ্যাত হন। তাঁর দর্শন পরবর্তী কালে ইউরোপীয় দর্শনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

গৌতম বুদ্ধ ৪৫ বছর আপন ধর্ম ও দর্শন জগতে প্রচার করে ৮০ বছর বয়সে খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে কুশীনারায় (বর্তমান কসয়া, জেলা গোরখপুর, ভারতে) মল্লদের শালবনে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

বি. ব.

গৌরী সেন

বিখ্যাত ধনী ও প্রবাদপ্রতিম দানশীল ব্যক্তি। 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'— বাংলা প্রবাদটি তাঁর দান-খ্যাতি থেকেই প্রচলিত হয়। তাঁর এই প্রসিদ্ধির কারণ হল— তিনি দেনার দায়ে বা অন্যায়ভাবে রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের উদার হস্তে অর্থসাহায্য দিয়ে কারামুক্ত করতেন। তাঁর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। তবে তিনি ১৭শ/১৮শ

www.pathagar.com

শতাব্দীর মানুষ বলে ধারণা করা হয়। তাঁর জন্মস্থান নিয়েও মতান্তর আছে। কারো মতে আঠারো শতকে হুগলি জেলার বালি গ্রামে, আবার কারো মতে বহরমপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বংশগতভাবে তিনি সুবর্ণবণিক সমাজভুক্ত ছিলেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ সেনের সহায়তায় বিপুল অর্থোপার্জন করে তিনি কলিকাতার (দ্র) আহেরিটোলায় প্রতিষ্ঠিত হন। অনেকের ধারণা—তিনি হুগলির 'গৌরীশঙ্কর' শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

সুজ. ব.

গৌরীদান

আট বছর বয়সী মেয়ের বিয়ে দেওয়া হিন্দু সমাজে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে এক সময়ে মনে করা হত। এই প্রথাটিই গৌরীদান নামে পরিচিত।

মে. খা.

গ্যারিবল্ডি গারিবাল্‌দি, জুসেপ্পে দ্র

গ্যারিক, ডেভিড [১৭১৭—১৭৭৯]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ নট, নাট্যদলের অধিকর্তা, পরিচালক ও নাট্যকার। গ্যারিক (David Garrick) জন্মগ্রহণ করেন ১৭১৭ সালে। অল্প বয়সেই তিনি নাট্যকলার প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথম দিকে তিনি নাটক (দ্র) রচনা ও নাটক সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভার প্রকৃত স্ফুরণ ঘটে অভিনয়কলায়। কমেডি (দ্র), প্রহসন (দ্র) ও ট্র্যাজেডি (দ্র) এই তিন ক্ষেত্রেই গ্যারিক তাঁর অভিনয়দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি শেক্সপীয়রের (দ্র) অনেকগুলো নাটক মঞ্চে পরিবেশন করেন এবং ঐ সব নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে যেমন নিজে বিপুল খ্যাতির অধিকারী হন, তেমনি শেক্সপীয়রকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন। তবে সমকালীন রুচির প্রতি লক্ষ রেখে তিনি অনেক সময় শেক্সপীয়রের নাটককে যেভাবে সম্পাদনা করে রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত করেন, পরবর্তী কালে তা সাহিত্যরসিক ও নাট্যকর্মী কারোরই অনুমোদন লাভ করে নি। কিন্তু এক জন অত্যন্ত প্রতিভাবান ও শক্তিশালী অভিনেতা হিসাবে গ্যারিক সর্বজনীন ও সর্বকালীন স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁর অভিনয়ের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সাবলীলতা। মুহূর্তের মধ্যে তিনি নিজের মুখের ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বরের ওঠানামা নাটকের পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারতেন এবং সেটা করতে পারতেন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। ডেভিড গ্যারিক তাঁর কালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতারূপে নন্দিত হন। নাট্যজগৎ থেকে অবসর নেওয়ার প্রাক্কালে তিনি শেষ বারের মতো তাঁর প্রিয় চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেন। এগুলির মধ্যে ছিল শেক্সপীয়রের নাটকের ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেট (দ্র), রাজা লীয়র এবং বেনেডিক আর ভল্‌ত্যার্ (দ্র) ও বেন জনসনসহ আরো কতিপয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সৃষ্ট কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তাঁর জীবদ্দশাতেই 'গ্যারিক' নামটি নাট্যজগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছিল। বাংলা নাট্য-জগতের প্রতিভাবান অভিনেতা, নাট্যকার, নাট্যদলের অধিকর্তা ও পরিচালক গিরিশচন্দ্র ঘোষ (দ্র)-কে অনেক সময় 'বাংলার গ্যারিক' বলে অভিহিত করা হত।

ডেভিড গ্যারিক তাঁর উজ্জ্বল নাট্যাভিনয় দ্বারা অষ্টাদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের রঙ্গমঞ্চকে দীর্ঘকাল প্রাণবন্ত করে রেখেছিলেন। তাঁর অভিনয়রীতি পরবর্তী কালের বহু অভিনেতাকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে। ১৭৭৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিলেতের বিখ্যাত ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে শেক্সপীয়রের মূর্তির পাদদেশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ক. চৌ.

গ্যালভানাইজ ইলেক্ট্রোপ্লেটিং/তড়িৎপ্রলেপন দ্র

গ্যালাক্সি (galaxies)

নক্ষত্রমণ্ডলীর এক বিশাল ঝাঁক, এই মহাবিশ্বের (দ্র) প্রধান উপাদান। নক্ষত্র (দ্র) ছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস (দ্র) ও সূক্ষ্ম মহাজাগতিক ধূলিকণা।

গ্রিক 'গ্যালাক্সি' শব্দের অর্থ হল ছায়াপথ (দ্র)। প্রথম দিকে রাতের আকাশকে বেষ্টন করে যে তারকারাজি দেখা যায়, সেটিকে বোঝানোর জন্য গ্যালাক্সি শব্দটি ব্যবহার করা হত। পরবর্তী সময়ে জানা যায়, এরূপ নক্ষত্র-ঝাঁক মহাবিশ্বে লক্ষ লক্ষ রয়েছে। তখন থেকে সাধারণভাবে নক্ষত্র-

www.pathagar.com

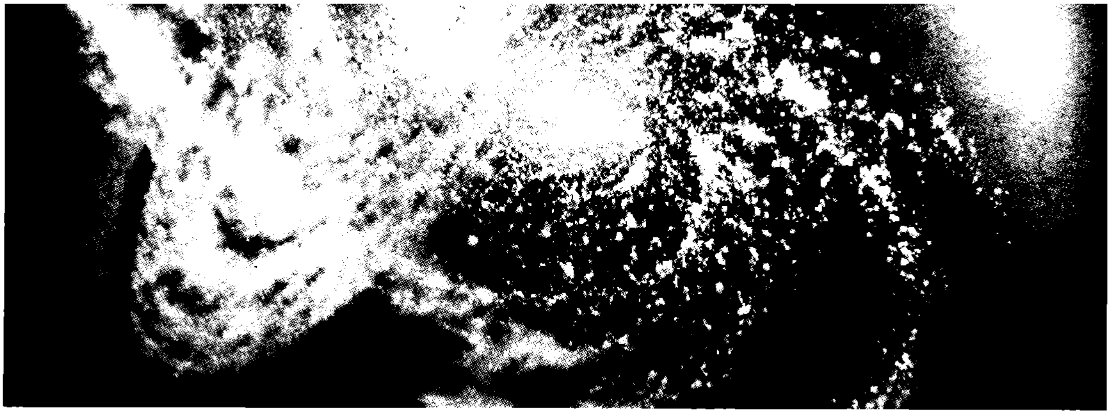

একই সঙ্গে দু'টি গ্যালাক্সির অবস্থান

ঝাঁককে গ্যালাক্সি এবং রাতের আকাশে দৃশ্যমান নক্ষত্র-ঝাঁকটিকে ছায়াপথ (The Milky Way) নামে অভিহিত করা হয়।

বিগ্ ব্যাং তত্ত্ব (দ্র) অনুযায়ী মহাবিস্ফোরণের পর মহাবিশ্বের কোনো কোনো স্থানে অভিকর্ষের (gravity) তারতম্য দেখা দেয়। এর ফলে ঐ স্থানের গ্যাস ও ধূলিকণা জমাট বেঁধে মাতৃছায়াপথ বা প্রোটোগ্যালাক্সি সৃষ্টি হয়। এই প্রোটোগ্যালাক্সিতে পরবর্তী সময়ে নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি হয়। গ্যালাক্সির একটি কেন্দ্র থাকে এবং এর নক্ষত্ররাজি ও অন্যান্য উপাদানসমূহ ঐ কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হয়। গ্যালাক্সিগুলো ঝাঁক বেঁধে থাকে। গড়পড়তা প্রতিটি ঝাঁকে কয়েকটি থেকে কয়েক হাজার গ্যালাক্সি থাকে।

আমাদের নিকটতম গ্যালাক্সির নাম হল ম্যাজেলানিক মেঘ (Magellanic Clouds) এবং এটি পৃথিবী (দ্র) থেকে ১৫০,০০০ আলোকবর্ষ (দ্র) দূরে।

এ পর্যন্ত জানা মহাবিশ্বের ১০ হাজার কোটি ($১০^{১১}$), গ্যালাক্সির মধ্যে আমাদের কাছ থেকে সবচেয়ে দূরেরটি ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে।

ম. হা.

গ্যালিলিও গালিলেও গালিলেই দ্র

গ্যালেন [১৩০—২০০]

রোমান শাসনামলে যে গ্রিক চিকিৎসক সর্বাধিক খ্যাতি ও বৈষয়িক সাফল্য অর্জন করেন তাঁর নাম গালেন (Galen)। আমাদের দেশে অবশ্য সবাই তাঁকে বলে গ্যালেন। তাঁর জন্ম ১৩০ খ্রিস্টাব্দে। চিকিৎসা পেশায় পারদর্শিতার জন্য তিনি রোম সম্রাট মার্কুস অরেলিউসের (দ্র) সভায় রাজবৈদ্য পদে নিযুক্ত হন। গ্যালেনের প্রতিভা ছিল বহুমুখী।

পরীক্ষামূলক শারীরতত্ত্বের (দ্র) প্রতিষ্ঠাতা গ্যালেন একাধারে ছিলেন দক্ষ পেশাজীবী ও চিকিৎসাশাস্ত্রের (দ্র) শিক্ষক। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার জন্যই তার খ্যাতি সবচেয়ে বেশি। শারীরস্থান, শারীরতত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, ভেষজচিকিৎসা (দ্র), ফার্মেসি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৯টি, ১৭টি, ৬টি, ১৪টি ও ৩০টি। এ ছাড়াও রয়েছে নাড়ি (দ্র) সম্পর্কিত ১৬টি প্রবন্ধ (দ্র)। তাঁর বিশালায়তন রচনাবলি তৎকালীন চিকিৎসাজ্ঞানের বিশ্বকোষ (দ্র) হিসাবে পরিচিত। গ্যালেনের ব্যবহৃত ভেষজ ঔষধের নিষ্কাশগুলোকে বলা হয় 'গ্যালেনিক্যাল্স্'।

এতসব সত্ত্বেও তাঁর রচনায় তথ্যগত ভুলভ্রান্তি কম নয়, বিশেষ করে আন্তরযন্ত্রের বর্ণনায়। সেকালে মানুষের শবদেহ ব্যবচ্ছেদের উপর ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা হয়তো এসব ভ্রান্তির অন্যতম কারণ। এ ছাড়াও গ্যালেনের সঞ্জীবনীতত্ত্ব (ভাইটালিজ্ম্), পূঁজতত্ত্ব, কিংবা হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অংশ থেকে বাম অংশে রক্তপ্রবাহের তত্ত্ব ছিল আগাগোড়া ভুল।

তবু গ্যালেনের রচনা যেমন তাঁর জীবদ্দশায়, তেমনি তাঁর মৃত্যুর (২০০ খ্রিস্টাব্দে) পরও প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে চিকিৎসাশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। এর প্রভাব চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও নতুন উদ্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। রেনেসাঁস (দ্র) যুগের প্রতিভাবান চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটান।

রু. হা.

www.pathagar.com

গ্যাস (gas)

যে অবস্থায় পদার্থের অণু (দ্র) বা পরমাণু (দ্র) পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত শিথিল বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং স্বাধীনভাবে ছুটোছুটি করতে পারে তাকে গ্যাস বলা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস যদি আমরা নিই তার নির্দিষ্ট ওজন থাকবে। কিন্তু এর নির্দিষ্ট আয়তন বা আকার থাকবে না। আদর্শ গ্যাসের বেলায় অণুগুলোর নিজস্ব আয়তন এদের দখল করা জায়গার আয়তনের তুলনায় নগণ্য। এদের মধ্যে কোনো আকর্ষণবলও কাজ করে না। এর অণুগুলো সম্পূর্ণ মুক্তভাবে চলতে পারে বলে আয়তনবৃদ্ধির সময় কোনো কাজ করে না। বাস্তব গ্যাসের বেলায় অণুদের মধ্যে কিছুটা আকর্ষণ কাজ করে। ফলে আয়তন বৃদ্ধির সময় গ্যাসের অণুদের কিছু কাজ করতে হয়। এই গ্যাস বিস্তারলাভ করার সময় কিছুটা গতিশক্তি হারায় ও ঠাণ্ডা হয়। রিফ্রিজারেটরে (দ্র) এই নীতি ব্যবহার করে রিফ্রিজারেটরের ভিতরটা ঠাণ্ডা করা হয়। আদর্শ গ্যাসের বেলায় এর আয়তন, চাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে একটি সুন্দর সূত্র আমরা ব্যবহার করতে পারি। এই সূত্রটি হল $pV= nRT$ এখানে p হচ্ছে গ্যাসের চাপ, V এর আয়তন, T পরম তাপমাত্রা, R হচ্ছে গ্যাস ধ্রুবক এবং n হচ্ছে কত মোল গ্যাস নেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা। গ্যাসের এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা গ্যাস থার্মোমিটার (দ্র) তৈরি করতে পারি। গ্যাসের গতিতত্ত্ব অনুসারে, গ্যাসের তাপমাত্রা আসলে গ্যাসের অণুর ছোটাছুটির কারণে উৎপন্ন গতিশক্তিরই প্রকাশ। গ্যাসের আর একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হল, যে ধরনের অণুই হোক না কেন, একই তাপমাত্রা, চাপ ও আয়তনে একই সংখ্যক গ্যাস-অণু থাকবে।

আ. আ.

গ্যাস, টিয়ার টিয়ার গ্যাস দ্র

গ্যাস, নিষ্ক্রিয়

কিছু কিছু পরমাণু (দ্র)—হিলিয়াম (দ্র), আর্গন (দ্র), ক্রিপ্টন, জেনন ও র‍্যাডন সাধারণভাবে অন্য কোনো মৌলের (দ্র), সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় না। এর কারণ হল : এই সব পরমাণুর বাইরের ইলেক্ট্রনকক্ষে যতগুলো ইলেক্ট্রন (দ্র) অনুমোদিত, তা পূর্ণ। রাসায়নিক বিক্রিয়া মানেই দুই বা ততোধিক পরমাণুর মধ্যে ইলেক্ট্রনের আদান-প্রদান ও বাইরের ইলেক্ট্রনকক্ষের ইলেক্ট্রনসমূহের নতুন বিন্যাস ঘটানো। সাধারণ পরমাণুর বেলায় এটি ঘটে বলে বিভিন্ন পরমাণুর রাসায়নিক বন্ধনে নানা রকম অণু (দ্র) সৃষ্টি হয়। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের বেলায় সাধারণভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া না ঘটলেও ফ্লুরিন (দ্র), অক্সিজেন (দ্র) ও কিছু কিছু ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব হয়েছে এবং কেলাসিত যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করা গেছে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অনেক ব্যবহার আছে রাসায়নিক কারখানায় ও ল্যাবরেটরিতে। যেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া বন্ধ রাখা প্রয়োজন সেখানে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের একটি পরিবেশ রাখা হয়ে থাকে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে নোব্‌ল্ গ্যাস বা বিরল গ্যাসও বলা হয়ে থাকে।

আ. আ.

গ্যাস, প্রাকৃতিক

প্রাকৃতিক গ্যাস খনি (দ্র) থেকে পাওয়া গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন (দ্র), যা জ্বালানি (দ্র) ও শিল্প-কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যে একটি মাত্র খনিজ জ্বালানি আমাদের দেশে বেশ খানিকটা রয়েছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে তা হল এই প্রাকৃতিক গ্যাস। এটি আমাদের মূল্যবান সম্পদগুলোর অন্যতম। প্রাকৃতিক গ্যাসের অধিকাংশই হল সবচেয়ে হালকা হাইড্রোকার্বন মিথেন (দ্র)। এর সঙ্গে অল্প পরিমাণে জটিলতর হাইড্রোকার্বন ইথেন, প্রোপেন ও বুটেন মেশানো থাকে। অবিশুদ্ধ প্রাকৃতিক গ্যাসে কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) ও নাইট্রোজেন (দ্র) গ্যাসও থাকতে পারে।

প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেলের মতোই পেট্রোলিয়াম (দ্র) জাতীয় পদার্থ। উভয়ের উৎসও একই রকম এবং অনেক ক্ষেত্রে এদেরকে একই খনিতে এক সঙ্গে পাওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ বছর আগে আজকের স্থলভাগের অনেক অংশ সমুদ্রতলে ছিল। তখন সেখানকার ক্ষুদ্র জলীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী যা প্লাঙ্কটন (দ্র) নামে পরিচিত, সেসবের মরদেহ ক্রমে সমুদ্রতলে জমে উঠেছিল। পরে স্তরে স্তরে পলি তার উপর জমা হয়ে সেগুলো চাপা পড়ে যায়। বহু কাল ধরে প্রচণ্ড চাপ, তাপ আর জীবাণুর ক্রিয়ায় সেগুলোই পরিণত হয়েছে গ্যাস ও তেলে। এসব গিয়ে জমেছে সচ্ছিদ্র বেলেপাথর আর

www.pathagar.com

চুনাপাথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্যে। শিলার ভাঁজ সৃষ্টির মাধ্যমে যেখানে ধনুকাকৃতির শক্ত অপ্রবেশ্য শিলাস্তর তেল-গ্যাসপূর্ণ সচ্ছিদ্র স্তরকে ঢেকে সেই তেল বা গ্যাসকে আটকে ফেলেছে সেখানে কূপ খনন করে তা পাওয়া যায়। ভূতাত্ত্বিক জরিপে এবং পদার্থবিদ্যার (দ্র) আধুনিক কিছু কৌশল ব্যবহার করে এ রকম খনি আবিষ্কারের প্রাথমিক সম্ভাবনা যাচাই করা হয়। ইতিবাচক লক্ষণ দেখা গেলে তখন কূপ খনন করে দেখা হয় আদৌ তেল বা গ্যাস আছে কিনা। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দেশে সম্ভাবনা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সাইস্‌মিক সার্ভে বা ভূকম্পন জরিপ একটি বড় ভূমিকা পালন করে। এতে মাটির কিছু গভীরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভূকম্পনতরঙ্গগুলো বিভিন্ন শিলাস্তরে কীভাবে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে তা বিশ্লেষণ করা হয়। এ থেকে শিলাস্তরের প্রকৃতি, পরম্পরা, ধনুকাকৃতি ভাঁজ আছে কিনা ইত্যাদি বোঝা যায়।

পৃথিবীর (দ্র) অনেক দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্প-কারখানায়, বিদ্যুৎ (দ্র) উৎপাদনে এবং বাড়ির কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে বিদ্যুতের শতকরা ৮৮ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস দহনের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। শিল্প-কারখানায়, ইটের ভাটায় এবং বেশ কিছু শহরে রান্নার চুলায়ও জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশসচেতনতা জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে। কারণ তেল, কয়লা (দ্র) ইত্যাদির তুলনায় এতে বায়ুদূষণ (দ্র) কম হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের অন্য প্রধান ব্যবহার হল শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে। আমাদের দেশে ইউরিয়া (দ্র) সার (দ্র) তৈরির কাঁচামাল হিসাবে বিভিন্ন সার-কারখানায় প্রচুর গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। বহু দেশে ঔষধ (দ্র), প্লাস্টিক (দ্র), ডিটারজেন্ট, রঙ, সিনথেটিক কাপড় ইত্যাদি উৎপাদনের যে পেট্রোকেমিক্যাল্‌স শিল্প, তাতে প্রাকৃতিক গ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে এর সাধারণ অংশটি যথারীতি সরবরাহ করার আগে এর তরল হাইড্রোকার্বন উপাদানগুলো আলাদা করে নিয়ে মূল্যবান তরল জ্বালানি ও কাঁচামাল পাওয়া যায়। এভাবে বুটেন ও প্রোপেনের মিশ্রণ এল পি জি (দ্র) অর্থাৎ লিক্যুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস অথবা কনডেনসেট নামে পরিচিত খনিজ তেল-সদৃশ পেন্টেন, হেক্সেন ও হেপ্টেনের মিশ্রণ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে (দ্র) প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ যদিও একেবারে নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবু সর্বশেষ অনুমান অনুসারে ১০.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ আবিষ্কৃত খনিগুলোতে আছে সম্ভবত। এখন উত্তোলিত গ্যাসের ৪৫% বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি হিসাবে, ২৩% অন্যান্য জ্বালানি হিসাবে এবং ৩২% ইউরিয়া সার উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যথেষ্ট নতুন মজুদ আবিষ্কৃত না হলে উৎপাদনহার বর্তমানের কাছাকাছি রাখলেও দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ আগামী ১৫-২০ বছরের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে। এর দক্ষ ও যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ তাই দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

মু. ই.

গ্যাস, লাফিং লাফিং গ্যাস দ্র

গ্রন্থপঞ্জি

কোনো লেখক বা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের গ্রন্থ বা রচনার নিয়মবদ্ধ সুবিন্যস্ত তালিকার নাম গ্রন্থপঞ্জি। ইংরেজিতে (দ্র) একে বলা হয় বিবলিওগ্রাফি (bibliography)। প্রাচীন কাল থেকেই গ্রন্থপঞ্জি রচনার রেওয়াজ চলে আসছে। প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে অনেকগুলি তালিকার মধ্যে দু'টি তৈরি হয়েছিল টলেমি ফিলাডেলফাসের নির্দেশে। এদের একটি ছিল ট্র্যাজেডির তালিকা এবং অন্যটি কমেডির। গ্রন্থাগারিক কালিমাকুস (Callimachus : আনু. ৩১০–আনু. ২৪০ খ্রি.পূ.) পিনাকেস্‌ (Pinakes) নামে একখানি গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করেছিলেন। সেটি গ্রন্থাগারের প্রধান প্রধান বইয়ের পঞ্জি। লেখকের নাম অনুসারে সাজানো বইগুলিকে নাট্যকাব্য (দ্র), মহাকাব্য (দ্র), গীতিকাব্য, আইনশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, বাগ্মিতা, ব্যাকরণ ইত্যাদি আটটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার নিনেভেতে কাদামাটির তৈরি একাধিক খোদাই করা ফলকের বিবরণী আবিষ্কৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

বর্তমানে মুদ্রণশিল্পের (দ্র) উন্নতির ফলে এবং লোকের মধ্যে লেখাপড়া চর্চার ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে গ্রন্থপঞ্জির গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঠক বা গবেষকের পক্ষে প্রতিদিন প্রকাশিত বিপুল পরিমাণ মুদ্রিত বস্তুর খবর রাখা সব সময় সম্ভব হয় না। তাই তথ্যের জন্য তাঁদের নির্ভর করতে হয় গ্রন্থপঞ্জির ওপর। গ্রন্থপঞ্জি কয়েক প্রকার হতে পারে :

১. সর্বজনীন (General)—এটি নির্দিষ্ট লেখক, বিষয়, দেশ বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ;
২. লেখক (Author)—কোনো নির্দিষ্ট লেখকের রচনা এবং সেই লেখক সম্পর্কিত রচনা সংবলিত তালিকা;
৩. বিষয় (Subject)—নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জি;
৪. জাতীয় বা আঞ্চলিক (National or regional)—এই প্রকার গ্রন্থপঞ্জির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে কোনো দেশ বা অঞ্চল সম্পর্কিত তথ্য;
৫. ব্যবসা (Trade)—ব্যবসা ও কেনাবেচা সংবলিত তথ্য।

গ্রন্থপঞ্জির সাহায্যে বই ও পাণ্ডুলিপির (দ্র) উৎপত্তি, প্রকাশ-তারিখ, প্রকাশকের নাম, প্রকাশ-স্থান, সংস্করণ, পৃষ্ঠাসংখ্যা, লেখক, পাঠ্যবস্তু, খণ্ড ইত্যাদি বিষয় যাচাই করা ও জানা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি সম্পূর্ণ হতে পারে—এতে থাকতে পারে কোনো বিশেষ ধরনের বা বিষয়ের সকল রচনা, অথবা এটি হতে পারে নির্বাচিত বই বা বিষয়ের তালিকা। গ্রন্থপঞ্জি বর্ণনামূলক হতে পারে, এতে থাকতে পারে সংক্ষিপ্ত টীকা; আবার তা হতে পারে মূল্যায়নধর্মী। অর্থাৎ এতে থাকতে পারে অন্তর্ভুক্ত রচনার সমালোচনামূলক মন্তব্য অথবা এটি একই সঙ্গে হতে পারে বর্ণনামূলক ও মূল্যায়নধর্মী।

বইয়ের মধ্যে, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ (দ্র), বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) (দ্র) এবং অন্যান্য বরাতি বইয়েও (reference book) গ্রন্থপঞ্জি দেখা যায়। যে কোনো বিষয়ে তথ্য সন্ধানের ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জি অতিশয় প্রয়োজনীয় উৎস। মোট কথা, বই বা লিখিত বস্তু সম্পর্কে অতি দ্রুত তথ্য সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের অবস্থান নির্দেশ করাই গ্রন্থপঞ্জির মূল কাজ।

শা. হ.

গ্রন্থসাহেব

শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। শিখ ধর্মগুরু গুরু নানকের বাণীর সঙ্কলন (দ্র) এই গ্রন্থে শিখদের জীবন ও ধর্মীয় আচরণ সম্বন্ধে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শিখদের প্রতিটি গুরুদ্বার বা উপাসনাকেন্দ্রে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রন্থসাহেব সংরক্ষণ করা হয়।

মে. খা.

গ্রন্থস্বত্ব কপিরাইট দ্র

গ্রন্থাগার (library)

সংগৃহীত গ্রন্থরাজির সুরক্ষিত প্রতিষ্ঠান। এই সব গ্রন্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার বা বিশেষ একটি শাখার হতে পারে। গ্রন্থ সংরক্ষণই কেবল গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য নয়। নিরন্তর জ্ঞান অনুশীলনে মানুষকে অনুসন্ধিৎসু করার মধ্য দিয়ে সমাজকে শিক্ষিত ও উন্নত করাই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য। সুতরাং গ্রন্থ এবং পাঠকের সঙ্গে গ্রন্থাগারের ত্রিমুখী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগারের কাজ একই সঙ্গে গ্রন্থের সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ এবং গ্রন্থসেবাকে সংগঠন। গ্রন্থ ছাড়াও জ্ঞানচর্চার জন্য মুদ্রিত বা লিপিবদ্ধ যাবতীয় উপাদান যেমন সংগ্রহণের বিষয়, তেমনি সেসব উপাদান সযত্নে সংরক্ষণ এবং পাঠকপাঠিকা যাতে যথাযোগ্য ও ফলপ্রসূভাবে তা ব্যবহার করতে পারে সে জন্য গ্রন্থাগারকর্মীদের সার্ভিস বা সেবাদান সংগঠিত করার দায়িত্বও গ্রন্থাগারের আওতাভুক্ত।

অতি প্রাচীন কালে পোড়ামাটির ফলক অর্থাৎ পাতলা ইট, পোড়ামাটির তক্তি, তাম্রপত্র, শিলা, তালপাতা, ভূর্জপত্র, প্যাপিরাস (দ্র), পশুর চামড়া প্রভৃতি লেখনকার্যের জন্য ব্যবহৃত হত বলে এসবই 'পুস্তক'রূপে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ছাপাখানা প্রচলনের আগে ইউরোপে (দ্র) ও আমাদের দেশে সব ধরনের বই হাতে লেখা হত। তাই ব্যয়ের আধিক্য ও বইয়ের সংখ্যার স্বল্পতার কারণে গ্রন্থাগারের আকার তখন সীমিত ছিল। সেসব গ্রন্থাগার ছিল অভিজাত ব্যক্তি, সম্রাট, চার্চ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন।

প্রথম যুগে চার ধরনের গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের কথা

www.pathagar.com

জানা যায়। যেমন—মন্দির-কেন্দ্রিক, সরকারি রেকর্ড, ব্যবসায়িক ও পারিবারিক সংগ্রহ। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে আসিরিয়ায় ও ব্যাবিলনে এগুলো স্থাপিত হয়েছিল। খ্রিস্টের জন্মের তিন শত বছর আগে গ্রিসের প্রধান প্রধান শহরে বেশ কিছু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত প্রাচীন কালের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং বৃহত্তম গ্রন্থাগার ছিল মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া জাদুঘর। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন কালের অপর বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল পারগামাম (Pergamum)-এ।

মধ্যযুগে গ্রিস থেকে আইসল্যাণ্ড পর্যন্ত সাধারণত গ্রন্থাগার ছিল মন্দির ও গির্জা (দ্র)-সংলগ্ন। এগুলোই একই সঙ্গে ধর্মচর্চা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। মুসলিম বিশ্বে অর্থাৎ দামাস্কাস, বাগদাদসহ অপরাপর অনেক শহরেও গ্রন্থাগার ছিল। কিন্তু সেগুলো ত্রয়োদশ শতকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছাপাখানার আবিষ্কার হলে বই ছাপানোর কাজ সহজতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিকভাবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সপ্তদশ শতকে পাবলিক লাইব্রেরির সূচনা হয়। এরপর ইউরোপ এবং আমেরিকায় বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের প্রচলন ঘটে। ছাপাখানা ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধিক হারে যেমন বইপত্র প্রকাশিত হতে থাকে, তেমনি সেসব বইয়ের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের উত্তরোত্তর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

গ্রন্থাগারকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায় : সংহত এবং ক্রমবর্ধমান। সংহত গ্রন্থাগার নির্দিষ্ট গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে সীমিত থাকে আর ক্রমবর্ধমান গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংগ্রহ ও সমৃদ্ধির কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। ক্রমবর্ধমান গ্রন্থাগারকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার : এ ধরনের গ্রন্থাগার সাধারণত সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশিত ও মুদ্রিত প্রায় সকল বই এতে সংগৃহীত থাকে। দেশের যে কোনো নাগরিক এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে। যেমন ব্রিটেনের 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম' (দ্র), ফ্রান্সের 'বিব্‌লিওত্যাক্ নাৎসিওনাল', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

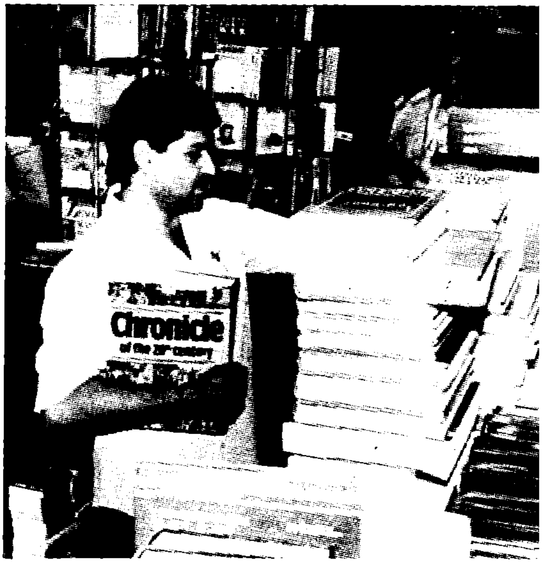

(দ্র) 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস' (দ্র) এবং ভারতের (দ্র) কলিকাতাস্থ 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি'।

২. বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজ লাইব্রেরি : প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কিত অর্থাৎ পাঠ্য ও সাধারণ পুস্তকের মধ্যেই এই ধরনের গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সীমিত থাকে। গবেষণার উপযোগী গ্রন্থরাজিও এগুলোতে পাওয়া যায়। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণই এই শ্রেণীর গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন।

৩. বিশেষ গ্রন্থাগার : সাধারণ স্কুল-কলেজ ছাড়া বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপযোগী সংগ্রহ নিয়ে এই ধরনের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এতে বিশেষ কোনো বিষয় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার প্রকাশনা সংগ্রহ করা হয় এবং বিশেষ শ্রেণীর পাঠক এটি ব্যবহার করে। অন্ধদের গ্রন্থাগার, হাসপাতালের গ্রন্থাগার, নাবিকদের গ্রন্থাগার, জেলখানার গ্রন্থাগার হল এ ধরনের বিশেষ গ্রন্থাগার।

৪. সাধারণ গ্রন্থাগার : সরকারি আইন অনুসারে জনসাধারণের অর্থে গঠিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগারই সাধারণ গ্রন্থাগার নামে পরিচিত। ইংরেজিতে একে বলা হয় পাবলিক লাইব্রেরি। এই গ্রন্থাগার সম্পূর্ণরূপে আধুনিক গণতান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি। এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আন্দোলন প্রথম শুরু হয় ইংল্যাণ্ডে। সেখানকার ব্যবস্থা বর্তমানে এত উন্নত যে

www.pathagar.com

অন্য যে কোনো দেশের পক্ষে তা আদর্শ হতে পারে।

বাংলাদেশে (দ্র) ১৯৫৩ সালে ঢাকায় (দ্র) কেন্দ্রীয় (central) পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির সহযোগিতায় শতাধিক সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগার দেশের প্রধান প্রধান স্থানে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরিকে অনুদান দিয়ে থাকে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জের সুধীজন পাঠাগার একটি সুপরিচালিত লাইব্রেরি। এ ছাড়া কুষ্টিয়া, যশোর, সিলেট (দ্র), কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে (দ্র) উন্নত মানের বেশ কিছু সাধারণ পাঠাগার আছে।

সর্বসাধারণের শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার প্রসারকল্পে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন এত বেশি যে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা বা ইউনেস্কো (দ্র) সব দেশে, বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোতে, ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট রয়েছে।

সুজ. ব.

গ্রন্থাগারবিজ্ঞান / গ্রন্থাগারবিদ্যা

জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন শাখার চর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই স্বীকৃত। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা এক নতুন রূপ ধারণ করেছে। এই কাজ একদিকে যেমন ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠছে প্রভূত গুরুত্বসম্পন্ন, তেমনি এর পরিচালন-ব্যবস্থা আরো নিখুঁত ও বিধিবদ্ধ করার জন্য অবলম্বন করা হচ্ছে নতুন নতুন বিজ্ঞানসম্মত উপায়। সাম্প্রতিক কালে তাই গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব একটা বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় বলে পরিগণিত। এই শিক্ষণীয় বিষয়কেই বলা হয় গ্রন্থাগারবিদ্যা, গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বা লাইব্রেরি সায়েন্স (Library Science)।

বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় উন্নতির যুগে মুদ্রণব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঘটেছে বৈপ্লবিক ও জাদুকরী পরিবর্তন। ফলে বিশ্বের উন্নত দেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও জ্ঞানরাজ্যের জানা-অজানা অসংখ্য বিষয়ে অশেষ কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ প্রকাশের সংখ্যা আগের যে কোনো সময়ের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। আর সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রন্থ বাছাই, সংরক্ষণ ও আগ্রহী পাঠকের কাছে তা সহজলভ্য করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রন্থাগারিকের কাজের গুরুত্ব ও সীমান্ত প্রসারিত হয়েছে আগের যে কোনো সময়ের চাইতে বেশি। এবং এ প্রেক্ষাপট থেকেই গ্রন্থাগারবিদ্যার উৎপত্তি।

আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি মূল সূত্র হচ্ছে : ১. ব্যবহারের জন্যই গ্রন্থের অস্তিত্ব; ২. প্রত্যেক পাঠকের প্রয়োজনীয় প্রকৃত পুস্তক প্রাপ্তি; ৩. প্রত্যেক পুস্তকের উপযুক্ত পাঠক-সংযোগ; ৪. পাঠকের সময়ের মূল্য; এবং ৫. গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধমান সংস্থা।

আমেরিকার (দ্র) প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক মেলভিল ডিউই (Melvil Dewey) উদ্ভাবিত কিছু পদ্ধতি গ্রন্থাগারবিদ্যার উন্নয়নে বিশেষ স্মরণীয়। এ ছাড়াও আমেরিকার 'নৈয়ার্ক' ও ব্রিটেনের 'ব্রাউন' পদ্ধতি এবং প্রখ্যাত ভারতীয় গ্রন্থাগারিক এস. আর রঙ্গনাথন উদ্ভাবিত 'কোলন বর্গীকরণ' পদ্ধতি আধুনিক ও যুগোপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও তা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রেখেছে। শুধু তাই নয়, উন্নত দেশগুলোতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণে বেশ কিছুকাল ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে কম্পিউটার (দ্র) ও মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিশ্ ইত্যাদি পদ্ধতি।

আ. হু.

গ্রহ

সন্ধ্যার পর রাতের অন্ধকার আকাশের (দ্র) দিকে তাকালে অসংখ্য তারা বা জ্যোতিষ্ক ঝলমল করতে দেখা যায়। রাত যত গভীর হতে থাকে আকাশে জ্যোতিষ্কের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে। এই জ্যোতিষ্ক সব এক রকম নয়। কতকগুলো জ্যোতিষ্কের আলো স্থির আর কতকগুলো মিটমিট করে জ্বলে। যেসব জ্যোতিষ্কের আলো স্থির তাদের গ্রহ বলে এবং যেগুলো মিটমিট করে জ্বলে তাদের নক্ষত্র (দ্র) বলে। গ্রহের নিজের আলো নেই, নক্ষত্রের নিজস্ব আলো রয়েছে, নক্ষত্রের আলোয় গ্রহ আলোকিত হয়। সৌরজগতে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত ৯টি গ্রহ সূর্যের (দ্র) চারিদিকে অনবরত ঘুরছে। সূর্য একটি নক্ষত্র। সূর্য থেকে ক্রমান্বয়ে বাইরের দিকে অবস্থিত ৯টি গ্রহ হচ্ছে যথাক্রমে বুধ (দ্র), শুক্র (দ্র), পৃথিবী (দ্র), মঙ্গল (দ্র), বৃহস্পতি (দ্র), শনি (দ্র), ইউরেনাস (দ্র), নেপচুন (দ্র) ও প্লুটো (দ্র)। বুধ সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম ও

www.pathagar.com

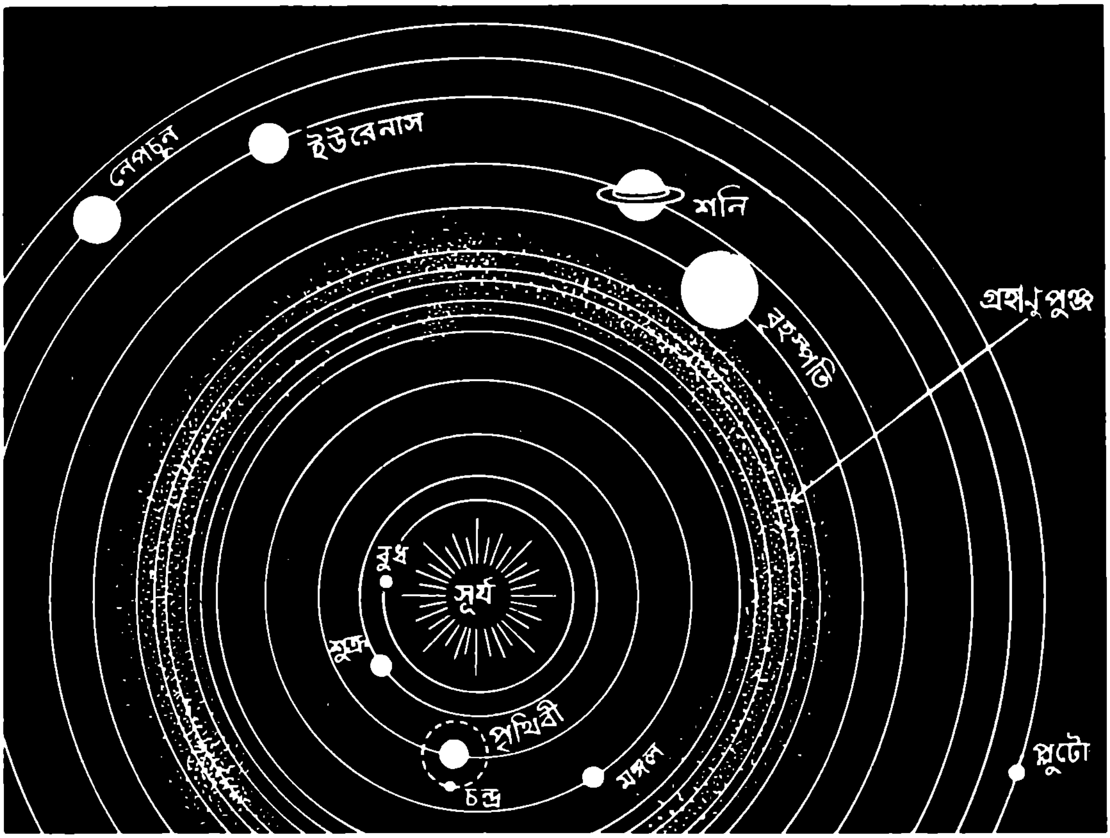

সূর্য ও তার নয়টি গ্রহ

সূর্যের নিকটতম গ্রহ। এ জন্য এর তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি। এ গ্রহে জীবের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সূর্যের দ্বিতীয় নিকটতম গ্রহ শুক্র পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ। শুক্রকে পৃথিবী থেকে খুব উজ্জ্বল দেখায়। শুক্রের আবহাওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডের (দ্র) ঘন মেঘে পরিপূর্ণ। সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ পৃথিবী সৌরজগতের গ্রহগুলো থেকে একটু স্বতন্ত্র। এটি মানুষ ও প্রাণীর মতো জীবের বসবাসের উপযোগী গ্রহ। এর চার ভাগের তিন ভাগ পানি, যা জীবের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। মহাশূন্য থেকে পৃথিবীকে মনে হয় একটি নীল গ্রহ। সৌরজগতে পৃথিবীর পরেই মঙ্গলের স্থান। সূর্য থেকে ২২ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে। মঙ্গলের পৃষ্ঠতলকে কমলা-লাল চূর্ণ ও পাথরের মরুভূমি (দ্র) বলা যায়। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ৭৭ কোটি কিলোমিটার। মঙ্গল গ্রহে পানি নেই এবং আবহাওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডের পাতলা আস্তরণে ছাওয়া। এতে পৃথিবীর মতো ঋতুচক্র রয়েছে। সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি। পৃথিবীর মতো ১৩০০ গ্রহ এতে পুরে রাখা যায়। বৃহস্পতির বেশ ক'টি উপগ্রহও রয়েছে। শনি গ্রহকে বৃহস্পতির ক্ষুদ্রতম সংস্করণ বলা চলে। একে একটি গ্যাসের বলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই গ্রহের চারদিকে রয়েছে আকর্ষণীয় বলয় বা রিং। বুধ থেকে শুরু করে শনি পর্যন্ত সব গ্রহই খালি চোখে দেখা যায়।

ইউরেনাস হল প্রথম গ্রহ যা টেলিস্কোপের সাহায্যে আবিষ্কার করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে ১৭৮১ সালে উইলিয়াম হার্শেল (William Herschel) ইউরেনাস আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এর পরই আসে নেপচুন। ইউরেনাস ও নেপচুন উভয়ই গ্যাসের বল এবং পৃথিবীর চার গুণ বড়। সূর্য থেকে

www.pathagar.com

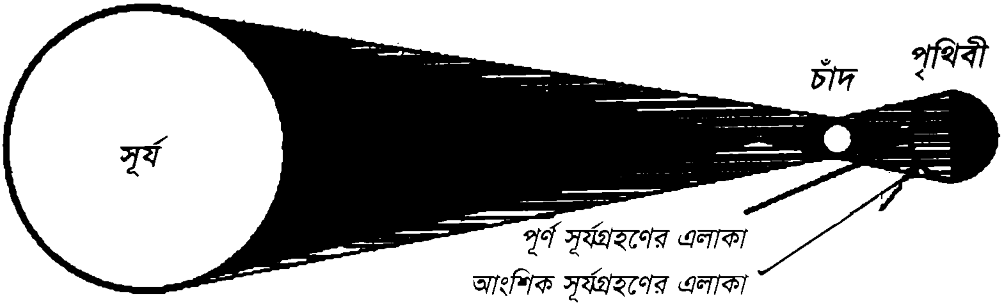

সূর্যগ্রহণ
ডানপাশে : পূর্ণ সূর্যগ্রহণের ছবি
নিচে : গ্রহণের একটি পর্যায়—ডায়মণ্ড রিং

সবচেয়ে দূরের গ্রহ হচ্ছে প্লুটো। এটি বেশ ঠাণ্ডা ও আকারে চাঁদের চেয়েও ছোট।

সে. শা.

গ্রহণ

আমরা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কথা শুনেছি এবং কখনো তা দেখেছিও। মহাশূন্যে যখন পৃথিবী (দ্র), চাঁদ (দ্র) ও সূর্য (দ্র) একই রেখা বরাবর অবস্থান করে তখন যে ঘটনা ঘটে বা আমরা যা দেখতে পাই তা-ই গ্রহণ। পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে যখন চাঁদ একই রেখা বরাবর অবস্থান করে এবং তার ফলে পৃথিবীতে চাঁদের ছায়া পড়ে তখনই সূর্যগ্রহণ হয়। আর সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে যখন পৃথিবী একই রেখা বরাবর অবস্থান করে এবং চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। গ্রহণ আংশিক বা পূর্ণ হতে পারে। সূর্যগ্রহণ খুব অল্প সময় স্থায়ী হয়। একে পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে সহজে দেখা যায় না। চাঁদ মাসে এক বার পৃথিবীর চারদিক ঘুরে আসে, কিন্তু বছরে এক বার কি দু'বার এটি সরাসরি সূর্যের সামনে আসে। তখন পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনো কোনো জায়গা থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। ঘটনাক্রমে কখনো যদি পৃথিবী থেকে চাঁদ ও সূর্যের আকার সমান দেখা যায়, তখনই সূর্যের পূর্ণগ্রহণ ঘটে এবং এই গ্রহণ মাত্র কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়। পূর্ণগ্রহণের সময় আকাশ (দ্র) অন্ধকার হয়ে যায় এবং চাঁদের কালো চাকতিটির (black disk) চারপাশে সূর্যের আলোকচ্ছটা দেখা যায়। সূর্যের পূর্ণগ্রহণ কদাচিৎ দেখা যায়। যখন চাঁদ সূর্যের অংশবিশেষ ঢেকে দেয় তখন আংশিক সূর্যগ্রহণ ঘটে। সূর্যের আংশিকগ্রহণই সচরাচর দেখা যায়। গ্রহণের সময় পৃথিবীর যেসব জায়গায় চাঁদ ওঠে সেসব জায়গা থেকে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায়। চন্দ্রগ্রহণ কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদকে বেশ অন্ধকার ও লালচে দেখায়, কিন্তু চাঁদ সম্পুর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায় না।

ডায়মণ্ড রিং

সে. শা.

গ্রহাণু / গ্রহাণুপুঞ্জ

মহাশূন্যে মঙ্গল (দ্র) গ্রহ (দ্র) পেরুলেই গ্রহাণুর দেখা পাওয়া যায়। গ্রহাণুর ইংরেজি প্রতিশব্দ অ্যাস্টিরয়েড (asteroid), যার অর্থ ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক (little star)। গ্রহাণু কিন্তু তারকা বা জ্যোতিষ্ক নয়। গ্রহাণু আসলে নিরেট পাথরের টুকরোর মতো বস্তু। এই বস্তু বা গ্রহাণুগুলো মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে থেকে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। মহাশূন্যে হাজার হাজার গ্রহাণু রয়েছে। প্রত্যেক গ্রহাণু নিজ

www.pathagar.com

পথে চলাচল করে। কিছু কিছু গ্রহাণু একত্রে কাছাকাছি থেকে দল বেঁধে চলাচল করে। ফলে তাদের মৌমাছির (দ্র) ঝাঁকের মতো দেখায়। বিজ্ঞানীরা গ্রহাণুর সঠিক সংখ্যা বের করতে পারেন নি। গ্রহাণুগুলো বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। কতকগুলো গ্রহাণু এত ছোট যে এদের দূরবীক্ষণ (দ্র) যন্ত্র (দ্র) দিয়ে দেখতে হয়। আবার কতকগুলো আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রহাণুটির নাম সেরেজ (Ceres)। এর ব্যাস ৭০০ কিলোমিটার। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের গ্রহাণুগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন। বিজ্ঞানীরা এদের আকৃতির কথা জেনেছেন এবং এদের মজার মজার আকৃতির কথা বলেছেনও। গ্রহাণু গ্রহের মতো গোল নয়। এবড়োখেবড়ো ধারবিশিষ্ট গ্রহাণুগুলোর জ্বালামুখ (craters) রয়েছে। বেশ কিছু গ্রহাণু গোল আলুর মতো দেখতে। কিছু কিছু গ্রহাণু দেখতে ভেঙে যাওয়া খণ্ডের মতো। গ্রহাণু সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু তথ্য দিতে পারলেও গ্রহাণুর রহস্য ভেদ করতে পারেন নি। মঙ্গল আর বৃহস্পতির (দ্র) মধ্যে এত ফাঁক দেখে বিজ্ঞানী কেপ্‌লার (দ্র) ধারণা করেছিলেন যে এই ফাঁকা জায়গায় আরেকটি গ্রহ রয়েছে। তাঁর এই ধারণা থেকে পরবর্তী বিজ্ঞানীরা গ্রহ খুঁজে পান নি বটে, তবে হাজার হাজার গ্রহাণুর সন্ধান পেয়েছেন। বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, অনেক অনেক আগে হয়তো এখানে কোনো আস্ত গ্রহই ছিল এবং সেই গ্রহ ভেঙেই এই গ্রহাণুর সৃষ্টি হয়েছে।

সে. শা.

গ্রাফাইট (graphite)

কার্বন (দ্র) নামক মৌলের (দ্র) একটি কেলাসিত রূপ। গ্রাফাইট একটি ধূসর রঙের পদার্থ এবং ধাতুর মতো এর ঔজ্জ্বল্য আছে। পদার্থটি তাপ (দ্র) ও তড়িতের (দ্র) উত্তম পরিবাহী। গ্রাফাইট একটি নরম পদার্থ। একে স্পর্শ করলে সাবানের (দ্র) মতো পিচ্ছিল বলে মনে হয়। একে কাগজে ঘষলে কালো দাগ পড়ে। কাঠপেন্সিলের (দ্র) সীস ও পিচ্ছিলকারক তেলের উপাদান হিসাবে গ্রাফাইটের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। তড়িৎদ্বাররূপে এবং অগ্নিসহমুচি (crucible) তৈরির কাজেও এ জিনিসটির ব্যবহার রয়েছে। গ্রাফাইট একটি খনিজ পদার্থ। ভূগর্ভের অত্যধিক উত্তাপে কয়লার (দ্র) পরমাণু স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে কেলাসিত (দ্র) গ্রাফাইটে পরিণত হয়। অতি উৎকৃষ্ট কয়লার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে কৃত্রিম উপায়ে গ্রাফাইট তৈরি করা যায়। সাধারণ তাপমাত্রায় এটি সক্রিয় নয়, নিষ্ক্রিয়। উচ্চ তাপে (প্রায় ৭০০ সে.) গ্রাফাইট অক্সিজেনের (দ্র) সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) গ্যাস তৈরি করে। তড়িৎশলাকা হিসাবে এর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। টর্চ-ব্যাটারির মধ্যে যে কালো শলাকাটি থাকে সেটি গ্রাফাইটের তৈরি। কাদার সঙ্গে গ্রাফাইট মিশিয়ে কাঠপেন্সিলের সীস তৈরি করা হয়। কাদা মেশানোর ফলে এটি বেশ শক্ত হয় এবং সহজে ভাঙে না।

আ. হ. খ.

গ্রামদেবতা

গ্রামবাসী জনগণের ধর্মাচরণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রচলিত দেবদেবীর পাশাপাশি গ্রামদেবতা হিসাবে আরো কিছু দেবতার পূজা প্রচলিত রয়েছে। এই সব গ্রামদেবতার কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই, পূজার্চনারও নির্দিষ্ট বিধি নেই। এই সব গ্রামদেবতার মধ্যে চাঁদ (দ্র), সূর্য (দ্র), গ্রহ-নক্ষত্র (দ্র), সাপ (দ্র), বাঘ (দ্র), বানর (দ্র), চিল (দ্র), ভূত-প্রেত, ডাকিনী (দ্র)-যোগিনী, শীতলা, ওলাবিবি সবই রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের গ্রামদেবতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী। এই সব দেবতার সঙ্গে আর্য দেবদেবীর কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে কখনো কখনো দেবতার নামান্তর বা সম্পর্কিত বলে চিহ্নিত করা হয়। আঞ্চলিক বৈষম্য ছাড়া এসব দেবতার পূজা-পার্বণও প্রায় একই। ধর্ম ও শ্রেণীভেদহীনভাবে এসব দেবতার পূজা করা হয়, পূজারীও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অব্রাহ্মণ।

মে. খা.

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা কাঙ্গাল হরিনাথ দ্র

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামের ভূমিহীন ও বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে ব্যাংক থেকে ঋণের সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্য থেকেই নতুন চরিত্রের এই

www.pathagar.com

ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। এর মূল লক্ষ্য ছিল ব্যাংকঋণের সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে কোনো ধরনের বন্ধকী ছাড়াই ঋণ প্রদান করা, যাতে করে তাঁরা মহাজনদের খপ্পর থেকে রক্ষা পান এবং প্রাপ্ত অর্থ কোনো উপার্জনমূলক কাজে ব্যবহার করে নিজেদের কর্মসংস্থান করতে পারেন।

এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনুস। উল্লিখিত লক্ষ্য সাধনে তিনি ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী জোব্‌রা গ্রামসহ আরো কয়েকটি গ্রামে 'গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প হাতে নেন। প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত ড. ইউনুস এরপর বাংলাদেশ ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত সকল বাণিজ্যিক ও কৃষি ব্যাংকের সহযোগিতায় ১৯৭৯ সালে এই প্রকল্পের কার্যক্রম টাঙ্গাইল জেলায় সম্প্রসারণ করেন। টাঙ্গাইলেও সাফল্য অর্জিত হলে ঐ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয় আরো ৪টি জেলায়।

১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক সরকারি অধ্যাদেশবলে প্রকল্পকাঠামো থেকে এটিকে 'গ্রামীণ ব্যাংক' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'গ্রামীণ ব্যাংক'-এর প্রধান বা কেন্দ্রীয় কার্যালয় রাজধানী ঢাকায় (দ্র) মিরপুরের দুই নম্বর সেকশনে অবস্থিত।

বর্তমানে এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৫ কোটি টাকা। ব্যাংকের শতকরা ৮৮ ভাগ শেয়ারের মালিক বর্তমানে ঋণগ্রহীতা সদস্যবৃন্দ। অবশিষ্ট শতকরা ১২ ভাগ শেয়ারের মালিক সরকার।

গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ অনুসারে ১৩ সদস্যের একটি পরিচালকমণ্ডলী এর নীতি নির্ধারণ করে থাকেন। এঁদের মধ্যে ৯ জন ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা শেয়ারমালিকদের দ্বারা নির্বাচিত। এঁরা পরিচালনাপর্ষদে ব্যাংকের ভূমিহীন সদস্যবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। পরিচালকমণ্ডলীর অপর ৪ জন সদস্য সরকার নির্বাচিত। ব্যবস্থাপনাপরিচালক এই ব্যাংকের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্মকর্তা।

বর্তমানে এই ব্যাংকের ১২টি জোনাল বা এলাকাভিত্তিক অফিস রয়েছে। জোনাল অফিস ও শাখা অফিসের মাঝখানে এরিয়া অফিসের অবস্থান। সাধারণত একটি এরিয়া অফিসের অধীনে ১০টি শাখা থাকে।

গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তার ১০৩৫টি শাখার মাধ্যমে প্রায় ৩৪ হাজার গ্রামে ১৭ লক্ষ সদস্য/সদস্যার মধ্যে মোট ২,২৯৩ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে। ঋণ পরিশোধের হার প্রায় ৯৮ ভাগ। বর্তমানে এর ঋণগ্রহীতা সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৯৪ ভাগই মহিলা। এ ছাড়াও এই ব্যাংকের আওতায় রয়েছে 'গৃহনির্মাণ ঋণ'-দান, শাকসবজির বীজ সরবরাহ করা এবং পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির সহায়ক কর্মসূচি।

আ. হু.

গ্রামোফোন, ফোনোগ্রাফ ও রেকর্ড প্লেয়ার

টিনের পাতের সিলিণ্ডার ব্যবহার করে টমাস আলভা এডিসন (দ্র) ১৮৭৭ সালে প্রথম ফোনোগ্রাফ (phonograph) আবিষ্কার করেন। ১৮৮৭ সালে এমিল বার্লিনার (Emile Berliner: ১৮৫১-১৯২৯) প্রথম পাত বা ডিস্ক (disc) প্রবর্তন করেন। ১৯২৫ সালে বৈদ্যুতিক রেকর্ডিং উপায় উদ্ভাবিত হওয়ার পর এর ক্ষমতা বেড়ে যায় বহুগুণ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) এর নাম হয় রেকর্ড প্লেয়ার (record-player) এবং আধুনিক লং প্লেয়িং ডিস্ক্‌-ও এর অন্তর্ভুক্ত। লং প্লেয়িং রেকর্ড অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে ঘোরে এবং ১৯৪৮ সালে তা প্রথম তৈরি হয়। এতে আওয়াজ উন্নততর হয় এবং একটি পাতে অধিক পরিমাণ শব্দ রেকর্ডিং এতে সম্ভবপর। এমিল বার্লিনার প্রথম বাণিজ্যিকভাবে ডিস্ক রেকর্ডিং পদ্ধতি আবিষ্কার করে তা বাজারজাত করেন। গ্রামোফোন (gramophone) শব্দটিও তিনি প্রথম ব্যবহার করেন। (মূল শব্দটা ছিল গ্রাম-ও-ফোন বা Gram-O-Phone)।

সঙ্গীত ছাড়াও গ্রামোফোন বা ফোনোগ্রাফ অন্যান্য অনেক রকম কাজে ব্যবহৃত হয়—রেডিও (দ্র) ও থিয়েটারের

www.pathagar.com

প্রথম দিকের গ্রামোফোন

(দ্র) জন্য দরকার মতো শব্দ উৎপাদন করা, ভবিষ্যতে রেডিওতে প্রচারের জন্য আগে থেকে রেকর্ডিং করে রাখা, অন্ধদের জন্য কথা-বলা-বই (talking books) এবং শিক্ষার্থীদেরকে ভাষা শিক্ষাদানের জন্য পাঠসমূহের রেকর্ড তৈরি করা ইত্যাদি। আবার এসব কাজ ক্যাসেট-টেপ রেকর্ডারের আবিষ্কারের ফলে তা দিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে। ডিক্টাফোনও এক রকম ফোনোগ্রাফ, এতে টাইপিস্টদের জন্য শ্রুতলিপি রেকর্ড করা হয়।

ফ্রান্সিস বারো (Francis Barraud)-র হিজ মাস্টার্স ভয়েস (His Master's Voice) ১৯০০ সালে প্রবর্তিত হয়ে সারা বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এতে একটি ছবি আঁকা আছে—একটি কুকুর মনযোগ সহকারে তার মৃত প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনছে। এই ট্রেড মার্কের গ্রামোফোন কোম্পানির নাম আর সি এ (Record Company of America) ভিক্টর।

বি. ব.

গ্রিক ভাস্কর্য ও চিত্রকলা

গ্রিকেরা খ্রিস্টের জন্মের প্রায় চার শ' বছর আগে ভাস্কর্যে দেহ-সৌন্দর্যকে এমন এক ভঙ্গিমা দান করেন, যা আজও বিশ্বের মানুষের কাছে বিস্ময়কর হয়ে আছে। এঁদের মধ্যে খ্যাতিমান হলেন ফিডিয়াস (Pheidias)—যিনি দেবী এথেনার সোনার মূর্তির ভাস্কর।

আরেক জন ভাস্করের নাম মাইরন (Myron)। মাইরনের 'ডিস্কোবোলোস্' (অর্থাৎ ডিস্কাস থ্রোয়ার বা চাকতি-নিক্ষেপকারী) নামে বিখ্যাত ভাস্কর্যটিতে দেখা যায় গতি এবং ভারসাম্য ও শৈল্পিক নৈপুণ্যের চূড়ান্ত বিকাশ।

খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৪৫০ অব্দে এই ভাস্কর্য নির্মিত। আরো এক জন ভাস্করের নাম আমরা পাই, তিনি হচ্ছেন ম্নেসিক্লেস্ (Mnesikles)। এসব ভাস্কর যাঁদের মূর্তি গড়েছেন তাঁরা সবাই ছিলেন গ্রিক দেবদেবী, বীর যোদ্ধা, খেলোয়াড় বা ব্যায়ামবিদ। কখনো-কখনো জন্তু, জানোয়ার এবং সাধারণ মানুষের মূর্তিও তাঁরা গড়েছেন। আরেক ধরনের মূর্তি তাঁরা গড়তেন, সেটা হল মিশ্র মূর্তি; অর্থাৎ অর্ধেক মানুষের অর্ধেক জন্তুর বা আলাদা আলাদা দুই জন্তুর আকৃতিকে মিশিয়ে নতুন ধরনের জন্তুর আকৃতি দান করতেন—যা বাস্তবে নেই। প্রাচীন গ্রিসে আরো অনেক বিখ্যাত মূর্তি আছে। যেমন—গ্রিক মহাকবি হোমারের (দ্র) আবক্ষ মূর্তি। দেবতা জিউসের মূর্তি, সূর্যদেবতা আপোলোর মূর্তি, বীর হেরাক্লেস্-এর মূর্তি, লাওকুন্ (দ্র)-এর মূর্তি, পুরুষমূর্তি কৌরস্ এবং নারী মূর্তি কৌরাই। এই মূর্তি দু'টি সম্ভবত পোড়ামাটির। তবে বেশির ভাগ ভাস্কর্যই তৈরি হয়েছে শ্বেত পাথর অর্থাৎ মার্বেল, সোনা ইত্যাদি দিয়ে।

চিত্রাঙ্কনেও গ্রিকেরা সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু তাঁদের গড়া অপরূপ কিছু পাত্রের গায়ে কলাবিদ্যার নিদর্শন এখনো অম্লান। লাল মাটির পাত্রের গায়ে কালো রঙ আঁকা, আবার কখনো কালো জমিনে লালচে মেটে রঙে আঁকা এসব চিত্র। আর বিষয়বস্তু হল নানা ধরনের নকশা, যূথবদ্ধ নর-নারীর নানান ভঙ্গিমায় মূর্তি। তবে বেশির ভাগ চিত্রের বিষয় গ্রিক দেব-দেবীর কাহিনী।

গ্রিক এসব ভাজ্ (vase) বা পোড়ামাটির পাত্রে আমরা গ্রিক শিল্পীদের অপূর্ব চিত্রণক্ষমতার আভাস দেখতে পাই। কিন্তু এসব পটচিত্রে মূর্তিগুলি পাশের দিক থেকে ঠিক বাস্তবসম্মত নয়, গ্রিক ভাস্কর্যের সঙ্গে এর ঠিক মিল পাওয়া

www.pathagar.com

গ্রিক ভাস্কর্য : ডিস্কাস নিক্ষেপকারী
নিচে : ভাজ্ বা মাটির পাত্রে গ্রিক শিল্পীদের খেলাধুলা বিষয়ে চিত্রণ। পাশে : একটি চিত্রিত ভাজ্ অ্যাম্ফোরা

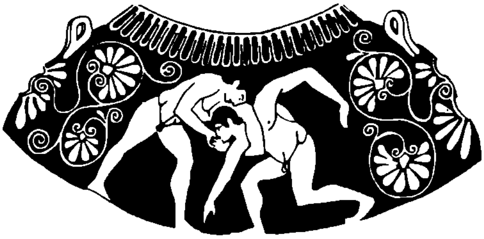

যায় না, শুধুমাত্র কাহিনী-সাদৃশ্যই এক। কারণ গ্রিক ভাজ্ পেইন্টিংয়ের উদ্দেশ্য ছিল ছবি হিসাবে উৎকর্ষ দান। গ্রিক ভাস্কর্যের মতো এগুলো দেখে মনে হবে না জ্যান্ত জিনিস।

এসব ভাজ্ বা মাটির পাত্রের মজার মজার সব নাম আছে : 'অ্যাম্ফোরা', 'কাইলিকেস্', 'এস্কোস্', 'ওইনোকোয়েস্' 'লোকথোস্' ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের এসব পাত্র ব্যবহৃত হত জল, মদ, তেল, মলম ও গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি রাখার জন্য।

সেই আমলে শুধু যে মাটির পাত্রের উপরে ছবি আঁকা হত তা নয়। এর বাইরেও অনেক ছবি আঁকা হয়েছে। এসব ছবিকে চিত্রসমালোচক আখ্যা দিয়েছেন বোকা-বানানো ছবি অর্থাৎ একেবারে বাস্তবধর্মী চিত্র।

আর এসব বোকা-বানানো শিল্পীদের মধ্যে খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন জিউক্সিস (Zeuxis)। তিনি ছিলেন গ্রিক। খ্রিস্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে জিউক্সিস বেঁচেছিলেন। প্রবাদ আছে যে তিনি একটি ছবি এঁকেছিলেন যাতে একটি ছেলে এক থোকা আঙুর নিয়ে যাচ্ছে। ছবিটি এমন জলজ্যান্ত হয়েছিল যে পাখি এসে ছবির আঙুর ঠুকরে খেতে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

এই ছবিটা তিনি এক প্রতিযোগিতায় দিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন আরেক বিখ্যাত শিল্পী, নাম পারাসিউস্ (Parrhasius), খুব জোর লড়াই, সকলেই ভাবল জিউক্সিসই জিতবেন। পারাসিউস্ ছবি নিয়ে এলেন। ছবির সমুখে একটা পর্দা টানা। জিউক্সিস নিজের ছবি দেখালেন। তারপর পারসিউস্‌কে বললেন—এখন পর্দা টেনে আপনার ছবি সকলকে দেখান।

পারাসিউস্ বললেন পর্দাটাই তো আমার ছবি, পিছনে তো কোনো ছবি নেই। পারাসিউস্ জিউক্সিসকে বললেন— তুমি এত বুদ্ধিমান লোক, এত তীক্ষ্ণ তোমার চোখ, তাও তুমি ভুল করলে, তা হলে আমিই জিতলাম; কারণ তুমি পাখিকে বোকা বানিয়েছ আর আমি তোমাকে বোকা বানিয়েছি।

এ দু' জন শিল্পী ছাড়াও ছিলেন আরেক জন শিল্পী। তিনি হচ্ছেন- গ্রিক চিত্রকলার আদি পুরুষ। নাম 'পলিগ্নোটাস্'। তাঁর সমসাময়িক লেখকেরা বলেছেন- পলিগ্নোটাস ছিলেন আশ্চর্য শিল্পী, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তার একটা ছবিও আজ আর নেই।

মিশর বা আসিরিয়ার ছবি আমরা দেখি কিন্তু শিল্পীর নাম জানি না আর গ্রিকদের বেলায় এর উল্টো। শিল্পীদের নাম আমরা জানি, কিন্তু ছবির চিহ্ন নেই। কারণ এসব চিত্র দেওয়ালে আঁকা হত না। এখন যেমন সব জিনিসে ছবি আঁকা হয়, তখনো তেমন হত—যা কিনা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করা যায়, ফলে ঠাঁই নাড়ানাড়ি করতে করতে ছবি যায় নষ্ট হয়ে, যায় হারিয়ে। এই ভাবেই সব গ্রিক ছবি নষ্ট হয়ে গেছে।

গ্রিসের সবচেয়ে বিখ্যাত চিত্রমালা ছিল একটি হলের মেঝে, এই মেঝে ভর্তি ছিল সব ছবি। সেসব ছবি আঁকা হত ফলের খোসা, আঁশ, খাবারের উচ্ছিষ্ট দিয়ে; এই হলের নাম ছিল 'ঝাঁট-না-পড়া দালান'। গ্রিকেরা এর গর্বে ছিল আত্মহারা।

আরেক জন সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম অপেলিজ্। অপেলিজ্ ছিলেন বীরযোদ্ধা আলেকজাণ্ডারের (দ্র) বিশেষ বন্ধু। অপেলিজ্ অসম্ভব খাটতেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল প্রতিদিনই তিনি কিছু না কিছু কাজ (অর্থাৎ ছবি) করবেনই। তিনি বলতেন— 'লাইন নেই, দিন নেই' অর্থাৎ এমন দিন যাবে না আমি একটা ভাল ছবিও আঁকতে পারব না।

দু' হাজার বছরের ওপর হয়ে গেল, এখনো আমরা এসব কথা বলি, ছবি আঁকার ক্ষেত্রে এসব শিল্পী এখন কিংবদন্তির পুরুষ। আর তাঁদের সব কাজ এবং কথা আজ প্রবাদ হয়ে গেছে।

সে. এ.

গ্রিক সভ্যতা

বিশ্বের সমৃদ্ধ সভ্যতার অন্যতম। শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য—প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অবদান বিশ্বসভ্যতার উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

হোমারের (দ্র) মহাকাব্যে (দ্র) বর্ণিত আকিয়ানেরা যে গ্রিকভাষী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সভ্যতার বিকাশে ও সমৃদ্ধিতে আকিয়ানসহ দোরিয়ান ও আয়োনিয়ানদের অবদান অনস্বীকার্য। খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার সাল নাগাদ তারা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গ্রিসে প্রবেশ করতে শুরু করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১১৩০ অব্দ সময়সীমার মধ্যে মিকোনাই, টিরিনস্ ও পিলস্ অঞ্চলে বিকশিত হয় এক অগ্রসর ব্রোঞ্জ সভ্যতা।

গ্রিস সে সময় কতকগুলো ছোট-বড় স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে ছিল দুর্গপ্রাকারময় প্রাসাদ। আমলাতন্ত্রের একাধিপত্য, ক্রীতদাস-প্রথা ও শ্রমবিভাগ প্রচলিত ছিল এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে।

গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি নগর-রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত অবিচ্ছেদ্যভাবে। এই সভ্যতা বিকাশ লাভ করে প্রথমে ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে, এশিয়া মাইনরের (দ্র) ইজিয়ান উপকূলবর্তী শহরগুলোতে, এথেন্সে, এরও পরে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালির গ্রিক উপনিবেশগুলোতে। গ্রিকদের ধর্মবিশ্বাস ছিল প্রবল। তাদের দেবদেবীর সংখ্যা ছিল অনেক। উপাসনাপ্রথাও প্রচলিত ছিল। যেমন—বৃক্ষ, শিলাখণ্ড ও নানা ধরনের জীবজন্তুর আরাধনা। তাদের বিশ্বাস ছিল, এই সব দেবদেবীই তাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা।

গ্রিক সভ্যতার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পর্ব হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চাশ শতক থেকে শুরু করে এর কয়েক দশক পর্যন্ত স্থায়ী এথেন্সে পেরিক্লিসের শাসনামল। এই সময় বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা ও দর্শনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম সাফল্য অর্জিত

www.pathagar.com

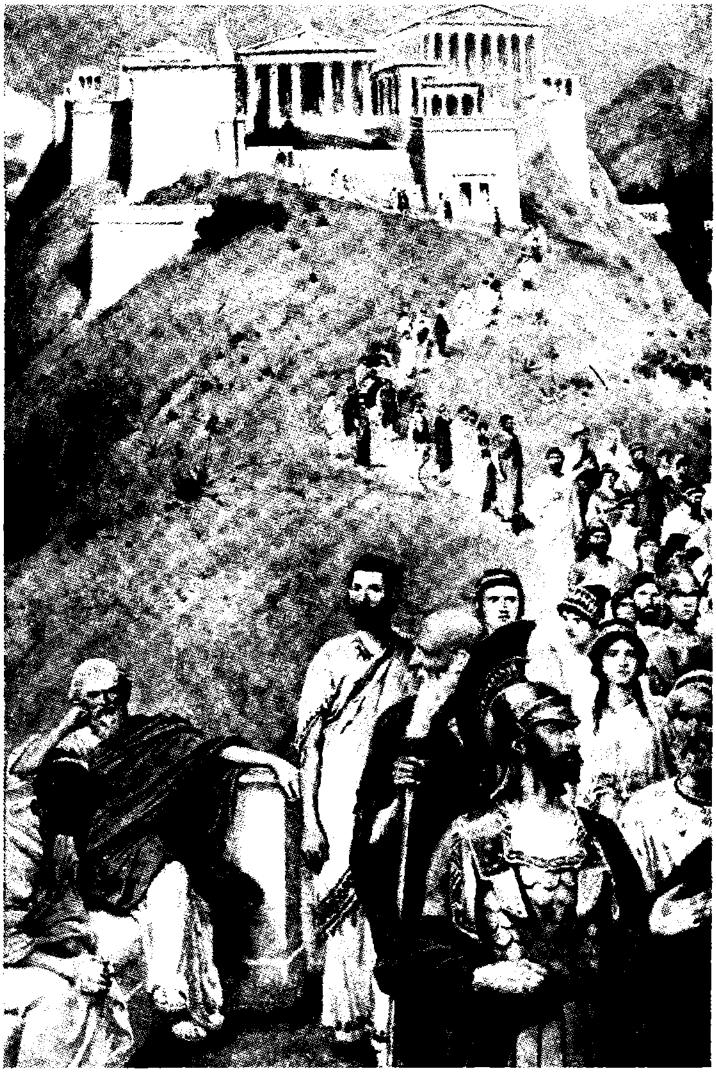

এথেন্সের আক্রোপলিসের সামনে শিষ্য ও অনুসারীদের সঙ্গে সক্রেটিস

হয়। সমবেত সঙ্গীত ও সুরযোগে গীত, গীতিকবিতার (দ্র) যে চরমোৎকর্ষ সাধিত হয় এই কালে, পৃথিবীর (দ্র) বহু দেশের কাব্য ও সঙ্গীতের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। এই সব গীতিকবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পিন্দার (Pindar), আর্কিলোকুস্ (Archilochus) ও সাফো (Sappho)।

পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০-৪৮০ অব্দ) জয়লাভ করার পর এথেন্স হয়ে ওঠে এই সভ্যতার পীঠস্থান। এই সময় বিশ্ববিখ্যাত কালজয়ী বিভিন্ন গ্রিক ট্র্যাজেডি (দ্র) ও কমেডি (দ্র) রচিত ও অভিনীত হয়। এই সব নাটকের (দ্র) রচয়িতাদের মধ্যে প্রধানতম হলেন ঈস্কাঈলাস্ (দ্র), সোফোক্লেস (দ্র), এউরিপিদেস্ (দ্র) ও আরিস্তোফানেস। বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার (দ্র) প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অবদান গ্রিকদেরই।

ইতিহাসশাস্ত্রেরও সূত্রপাত হয় প্রাচীন গ্রিস থেকেই। হেরোদোতাসকে (দ্র) বলা হয় ইতিহাসের জনক। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রিক দর্শনের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত করেন থালেস। এরপর আবির্ভূত হন এক এক জন দিকপাল দার্শনিক— সক্রেটিস(দ্র), প্লেটো(দ্র), আরিস্টোটল(দ্র), আনাক্সিমান্দর, আনাক্সিমেনেস, হেরাক্লিটাস, ডিমোক্রিটাস (দ্র), পার্মেনিদেস ও আনাক্সোগোরাস প্রমুখ। এঁদেরই সৃষ্ট দর্শন সমগ্র পাশ্চাত্য ও আধুনিক জগতের চিন্তার গোড়াপত্তন করে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রিক সভ্যতার অবদান অতুলনীয়। গণিত শাস্ত্রের সূচনাকারী হিসাবে পিথাগোরাস (দ্র) অমর হয়ে আছেন। কোপার্নিকাসেরও (দ্র) আগে পৃথিবী যে সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, সে সম্পর্কে প্রথম অনুমান এবং এ-সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রচার করেন আরিস্তার্কাস। হিপোক্রেটিস (দ্র) চিকিৎসাশাস্ত্রকে (দ্র) কুসংস্কারমুক্ত করে দাঁড় করান বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর।

খ্রিস্টপূর্ব দশম থেকে সপ্তম শতাব্দী সময়সীমার মধ্যে গ্রিক ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার বিকাশ হতে শুরু করে। এথেন্সের নগরদুর্গ আক্রোপলিস, পেন্টেলিক মর্মর পাথরে তৈরি দোরিক মন্দির পার্থেনন, দেবী আথেনার মূর্তি এবং দিওনুসুস প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি গ্রিক ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পের অননুকরণীয় নিদর্শন।

www.pathagar.com

হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ' (দ্র) ও ওদিসি' (দ্র) এবং হেসিওদ-এর ' থেওগনি' বিশ্বসাহিত্যের কালজয়ী সম্পদ।

গ্রিসের অলিম্পিক ক্রীড়াকলার অনুসরণে বর্তমান কালে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেম্‌স্ (দ্র) এই সভ্যতার কালোত্তীর্ণ প্রভাবকেই তুলে ধরে।

আ. হু.

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া (greenhouse effect)

শীতপ্রধান দেশে ফুল, ফল ও শাক-সবজি সারা বছর ফলানোর জন্য এক ধরনের কাচের ঘর ব্যবহার করা হয়। কাচের ঘর নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারে। ফলে গ্রীষ্মের শাক-সবজি শীতে, শীতের শাক-সবজি গ্রীষ্মে ফলানো সম্ভব হয়। এই কাচের ঘরের নাম গ্রিনহাউস (greenhouse)। গ্রিনহাউস সূর্যের (দ্র) আলো প্রবেশে বাধা দেয় না, তবে তাপশক্তির কিছু অংশ আচ্ছাদনের মধ্যে ধরে রাখে।

এক জন সুইডিশ বিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ ১৮৯৬ সালে প্রথম পৃথিবীর (দ্র) বায়ুমণ্ডল (দ্র) ও গ্রিনহাউসের মধ্যে মিল খুঁজে পান। তিনিই প্রথম গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া (effect) কথাটি ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানীর নাম স্‌ভান্তে আরেনিয়াস (Svante Arrhenius)। গ্রিনহাউস ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উভয়ই কিছু তাপ ধরে রাখে। সূর্যালোক গ্রিনহাউসে যখন প্রবেশ করে তখন তাপ ভিতরের মাটি ও উদ্ভিদকে উষ্ণ করে। পরে উদ্ভিদ ও মাটি (দ্র) কিছু তাপ ছেড়ে দেয়। কিন্তু গ্রিনহাউসের অভ্যন্তর বেশ উষ্ণ থাকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাপ যেভাবে অবস্থান করে তার প্রক্রিয়া একটু জটিল। কিন্তু ফলাফল গ্রিনহাউসের অনুরূপ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের রশ্মি আসতে বাধা দেয় না, তবে সূর্যের আলো জীবমণ্ডল ও পৃথিবীপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করার পর কিছু তাপ জীব ও পৃথিবী থেকে ফিরে আসে। ছেড়ে দেওয়া এ তাপ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র), নাইট্রাস অক্সাইড (দ্র), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, ওজোন (দ্র) ইত্যাদি দ্বারা শোষিত হয়। এসব গ্যাসকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলে। তাপ শোষণের ফলে গ্যাসগুলো উষ্ণ হয় এবং বায়ুমণ্ডল সবদিকে তাপ পাঠাতে থাকে। কিছু তাপ মহাশূন্যে যায়। বাকিটা পৃথিবীতে ফিরে আসে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, বায়ুমণ্ডলে মানুষের ক্রিয়াকাণ্ড ও অন্যান্য কিছু প্রাকৃতিক কারণে গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের পরিমাণ বাড়ছে। সুতরাং তাপমাত্রা ধরে রাখার জন্য বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমশ পুরু একটি গ্যাসের স্তর। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ছেড়ে দেওয়া তাপ-শোষণের পরিমাণ বাড়বে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। উষ্ণতা বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াই হল গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া।

ত. চ.

গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়

গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত দুই ভাই ইয়াকোব লুড্‌ভিগ্ কার্ল

গ্রিম (Jacob Ludwig Carl Grimm : ১৭৮৫–১৮৬৩) এবং ভিল্‌হেল্‌ম্ গ্রিম (Wilhelm Grimm : ১৭৮৬–১৮৫৯) অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। রোমক আইন সম্পর্কে লেখাপড়া করার সময় ইয়াকোব গ্রিম পুরাতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রাচীন গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করেন। এই সময়ে তিনি ভাষাতত্ত্ব এবং লোককথা সম্পর্কেও অধ্যয়ন করেন।

বিদ্যাশিক্ষা শেষ করে দুই ভাই-ই বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত থাকার পর অবশেষে গ্যোটিঙ্গেনের গ্রন্থাগারে চাকুরি পান। ১৮৪০ সালে গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় বার্লিনে অধ্যাপনার সুযোগ পান এবং বাকি জীবন সেখানেই কাটান। এই সময়ে তাঁরা ভাষাতত্ত্বমূলক অভিধান (দ্র) প্রণয়নের কাজেও হাত দেন। তবে ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে পরিচিতির চেয়ে রূপকথা (দ্র) সংগ্রাহক হিসাবেই তাঁদের পরিচিতি বেশি। ১৮১২–১৮১৫ সাল এই তিন বছর গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় বিভিন্ন বই, পাণ্ডুলিপি (দ্র) ও লোকশ্রুতি থেকে রূপকথা সংগ্রহ করেন এবং সম্পাদনা করে ১৮১৫ সালেই প্রকাশ করেন। এর ফলে এক দিকে যেমন লৌকিক রূপকথার অবিস্মরণীয় সংগ্রহ

www.pathagar.com

তাঁরা গড়ে তোলেন, অন্য দিকে ইয়াকোব গ্রিম তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে একই শব্দের উচ্চারণ কীভাবে পরিবর্তিত হয় সে সম্পর্কে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই তত্ত্ব ভাষাতাত্ত্বিক মহলে 'গ্রিম্‌স্‌ ল' (Grimm's Law) নামে পরিচিত। গ্রিমের ব্যাকরণ আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তিন খণ্ডের এই গ্রন্থে জার্মানসহ সমগোত্রীয় ভাষার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দাংশ ও অক্ষরের উচ্চারণপদ্ধতি উচ্চারণরীতিসহ তিনি লিপিবদ্ধ করেন। গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিটি বিষয়ে গভীর মননশীলতা ও সাধনার স্বাক্ষর রেখে সমানভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মে. খা.

গ্রিয়ারসন, জর্জ আব্রাহাম [১৮৫১—১৯৪১]

আইরিশ ভাষাতাত্ত্বিক। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের চাকুরি নিয়ে গ্রিয়ারসন (George Abraham Grierson) ১৮৭৩ সালে ভারতে (দ্র) আসেন। তাঁর উৎসাহ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উপমহাদেশের প্রথম ভাষাতাত্ত্বিক জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়। এই ভাষাতাত্ত্বিক জরিপের প্রতিবেদনই 'লিঙ্গুইস্‌টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' (Linguistic Survey of India) নামে পরিচিত, যা উনিশ খণ্ডে ১৮৯৪-১৯২৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। হালে, ডাবলিন, কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানে সম্মানিত করে। ১৯০৬ সালে সিভিল সার্ভিসের চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের আগে তিনি ভারতীয় ভাষা-জরিপ বিভাগের বিশেষজ্ঞ পদে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে উৎসাহী গ্রিয়ারসন শুধু ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে জরিপই করেন নি, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাও শিখেছিলেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লেখা বই অনুবাদের পাশাপাশি ভাষাগুলোর ব্যাকরণ ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কেও তিনি গবেষণা করেছিলেন। তাঁর এই গবেষণার প্রমাণ তাঁর রচনাবলি। তাঁর রচনাবলির মধ্যে 'Handbook of Kanthi Character', 'Grammar and Cristomethy of the Maitheli Language', 'Seven Grammars of the Bihar Dialects', 'Manual of the Kashmiri Language' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মে. খা.

গ্রেট ব্রিটেন যুক্তরাজ্য দ্র

গ্লাইকোজেন (glycogen)

গ্লাইকোজেন আসলে গ্লুকোজের পলিমার (দ্র)। এর অণু (দ্র) দীর্ঘ এবং অনেক শাখাবিশিষ্ট। প্রাণীদেহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনরূপে জমা থাকে। এ জন্য গ্লাইকোজেনকে প্রাণিজ শর্করাও বলা হয়। মাংসপেশি এবং যকৃতে (দ্র) গ্লাইকোজেন জমা থাকে। অনেক সরল প্রাণী, ছত্রাক (দ্র), ঈস্ট (দ্র) এবং ব্যাক্টেরিয়ামের কোষেও গ্লাইকোজেন দেখতে পাওয়া যায়।

অদানাদার সাদা এই পলিস্যাকারাইড সহজেই ঠাণ্ডা পানিতে গলে যায় এবং অস্বচ্ছ কলয়েড দ্রবণ (দ্র) তৈরি করে। গ্লাইকোজেনের আণবিক ওজন খুব বেশি এবং উৎস ও প্রস্তুতির ধরন অনুসারে এটা নানারকম হতে পারে।

যকৃতে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে গ্লাইকোজেনেসিস (glycogenesis) বলা হয়। অবশ্য ফ্রুক্টোজ (দ্র), কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড (দ্র) এবং গ্লিসারল থেকেও গ্লাইকোজেন তৈরি হয়। গ্লাইকোজেন ভেঙে সরল উপাদান তৈরি হওয়াকে গ্লাইকোজেনোলাইসিস (glycogenolysis) বলা হয়।

শরীরে শক্তি সরবরাহে ঘাটতি হলে যকৃৎ থেকে গ্লাইকোজেনোলাইসিসের ফলে গ্লুকোজ তৈরি হয়। মাংসপেশিতে সঞ্চিত হয়ে থাকা গ্লাইকোজেনও প্রয়োজনে পেশির শক্তি যোগায়। যকৃতে গ্লাইকোজেন জমা থাকার ফলে রক্তে (দ্র) গ্লুকোজের মাত্রা সব সময় একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে। মানুষের যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন প্রায় ১২ ঘণ্টা শক্তি যোগাতে পারে।

সা. এ.

গ্লাইকোলাইসিস (glycolysis)

বিভিন্ন এনজাইমের (দ্র) বিক্রিয়ার ফলে ধাপে ধাপে গ্লুকোজ ভেঙে পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে গ্লাইকোলাইসিস বলা হয়। জীবকোষে গ্লুকোজ (দ্র) বিপাকের এটি প্রধান উপায়। অক্সিজেনের (দ্র) উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে এটা ঘটতে পারে। অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে গ্লাইকোলাইসিসের ফলে উৎপন্ন পাইরুভিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়। কিন্তু ঈস্ট (দ্র) জাতীয় ছত্রাকে পাইরুভিক অ্যাসিড

www.pathagar.com

অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে ইথাইল অ্যালকোহল (দ্র) উৎপন্ন করে।

সা. এ.

গ্লাইডার (glider)

গ্লাইডার হচ্ছে ইঞ্জিনবিহীন প্লেন, যা পাখিদের ডানার ও তাদের ওড়ার কৌশল অনুকরণ করে নির্মাণ করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে গ্লাইডার নির্মাণ শুরু হয়। এর আগে মানুষ আকাশে (দ্র) ওড়বার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে হাইড্রোজেন (দ্র) গ্যাসের (দ্র) বেলুন (দ্র) ব্যবহার করে। গ্লাইডারের ডানা, লেজ, দেহ এবং নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি অনেকটা ইঞ্জিনচালিত প্লেনের মতোই। গ্লাইডারের ডানা একটু কাত করা থাকে। ফলে তা বাতাসের মধ্য দিয়ে চলার সময় একটি ঊর্ধ্বচাপ লাভ করে। এই ঊর্ধ্বচাপ গ্লাইডারের ওজনকে বহন করে।

রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (দ্র) প্রথমে গ্লাইডার ব্যবহার করে উড়তে শেখেন। তাঁদের এই অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে তাঁরা পরে পেট্রোল-ইঞ্জিনচালিত প্লেন উদ্ভাবন করেন ১৯০৩ সালে। গ্লাইডার চালাবার সময় কোনো পাহাড়ের ধার থেকে চালক লাফিয়ে পড়েন গ্লাইডার নিয়ে। অনেক সময় ইঞ্জিনচালিত গাড়ির সাহায্যে বা দড়ি টেনে গ্লাইডারকে প্রাথমিক গতি দেওয়া হয়। গ্লাইডার প্লেন এত হালকা যে বাতাসের গতিকে সম্বল করে বহুদূর ও বহু উঁচু পর্যন্ত এটি উড়তে পারে। ১২,০০০ মিটার উচ্চতায় ওড়বার ও ৬৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রমণের রেকর্ড আছে গ্লাইডারের। গ্লাইডার চালনার প্রতিযোগিতা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক একটি ক্রীড়া।

আ. আ.

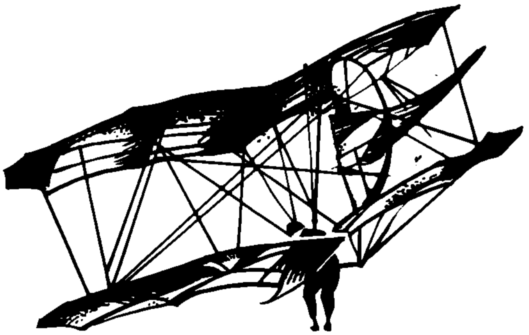

গ্লাইডার

গ্লিসারিন (glycerin)

গ্লিসারিন বা গ্লিসারল একটি বর্ণহীন, সিরাপ জাতীয় পদার্থ। ফর্মুলা $C_3H_5(OH)_2$। স্বাদে মিষ্টি এবং পানিতে সর্বতোভাবে দ্রবণীয়। কার্ল ভিল্‌হেল্‌ম শিলে (Carl Wilhelm Scheele: ১৭৪২-৮৬) ১৭৭৯ সালে এটিকে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এটি ২৯০ সে. তাপে সামান্য ভেঙে ফোটে এবং সাদা দানাদার অবস্থায় ১৭ সে. তাপে গলে যায়। প্রাণী ও সবজির চর্বি এবং তেলে গ্লিসারিন অংশগ্রহণ করে। অনেক জৈব অ্যাসিড (দ্র) যেমন—স্টিয়ারিক, পামিটিক ও অলিয়িক অ্যাসিড গ্লিসারিনের এসটার। সাবান (দ্র) তৈরির ক্ষেত্রে এটি উপজাত দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায়। সাবান পৃথক করার পর যে মিষ্টি পানি বা 'স্পেন্ট লাই' (spent lie) পাওয়া যায়, সেই মিষ্টি পানিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করা হয়। প্রাণীজ কাঠকয়লা দ্বারা বিরঞ্জিত করে বাষ্পীভূত করলে গ্লিসারিন পাওয়া যায়।

ঔষধ (দ্র) হিসাবে গ্লিসারিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হেক্টোগ্রাফিক কালি ও অন্যান্য কালির উপাদান হিসাবে গ্লিসারিন ব্যবহৃত হয় এবং নানা ধরনের শিল্পক্ষেত্রে নানাজাতীয় শিল্পদ্রব্য তৈরি করার জন্য এর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় মোটরগাড়ির রেডিয়েটরে ব্যবহার করা হয় যাতে শীতকালে এটি জমে না যায়। নাইট্রোগ্লিসারিন তৈরি করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে গ্লিসারিন ব্যবহৃত হয়। কিসেল্‌গুর নামে একটা জিনিসে নাইট্রোগ্লিসারিন দ্রবীভূত করে ডিনামাইট (দ্র) তৈরি করা হয়।

আ. হ. খ.

গ্লুকোজ (glucose)

পাকা আঙুর (দ্র), মধু ও অধিকাংশ মিষ্ট ফলে গ্লুকোজ থাকে। রক্তে (দ্র) এবং বহুমূত্র রোগীর মূত্রে সামান্য পরিমাণে গ্লুকোজ আছে।

প্রস্তুতি : গবেষণাগারে অ্যালকোহলের (দ্র) উপস্থিতিতে চিনিকে HCl বা H_2SO_4 দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষিত করে গ্লুকোজ প্রস্তুত করা যায়।

www.pathagar.com

$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O = C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}C_6$

গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ

অ্যালকোহলে গ্লুকোজ অপেক্ষা ফ্রুক্টোজ অধিক দ্রবণীয় হওয়ায় দানায়ন পদ্ধতিতে গ্লুকোজ পৃথক করার জন্য দ্রাবক হিসাবে অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয়।

গবেষণাগারে প্রস্তুতি : একটি পাত্রে ৪ সি সি গাঢ় HCl ১০০ সি সি ৯০% ইথাইল অ্যালকোহল এবং ৪০ গ্রাম চূর্ণ চিনি নিয়ে ৫০ উষ্ণতায় গরম করা হয়। পাত্রটিকে মাঝে-মাঝে ঝাঁকানো হয় যে পর্যন্ত না চিনি সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়। এতে করে চিনি আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ তৈরি হয়। মিশ্রণটিকে ঠাণ্ডা করে এতে কেলাসনের সাহায্য করার জন্য কিছু গ্লুকোজের দানা যোগ করলে কম দ্রবণীয় গ্লুকোজ দানায়িত হয় এবং দ্রবণে ফ্রুক্টোজ থেকে যায়। এই গ্লুকোজকে ছেঁকে পৃথক করার পর অ্যালকোহলে পুনরায় দানায়িত করলে প্রায় বিশুদ্ধ গ্লুকোজ পাওয়া যায়।

শিল্পক্ষেত্রে প্রস্তুতি : স্টার্চ বা শ্বেতসার জাতীয় দ্রব্যকে পাতলা অ্যাসিড (দ্র) দিয়ে ভেজালে গ্লুকোজ তৈরি হয়।

$(C_6 H_{10}O_5)n + nH_2O \rightarrow nC_6 H_{12}O_6$

শ্বেতসার গ্লুকোজ

চাউল, আলু (দ্র), ভুট্টা (দ্র) প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় দ্রব্য অতিরিক্ত পানি ও পাতলা H_2SO_4-এর সঙ্গে উচ্চ চাপে উত্তপ্ত করলে তা আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়। সোডিয়াম কার্বনেট দ্বারা অতিরিক্ত অ্যাসিড প্রশমিত করার পর মিশ্রণটি ছেঁকে নেওয়া হয়। পরিশ্রুত দ্রবণকে সক্রিয় কয়লা (activated charcoal) দিয়ে বর্ণহীন করে তাপে গাঢ় করে ঠাণ্ডা করলে দানার আকারে গ্লুকোজ পৃথক হয়ে যায়। এই গ্লুকোজে সামান্য পরিমাণে মল্টোজ ও ডেক্সট্রিন থাকে। মিথাইল অ্যালকোহলে আবার দানায়িত করলে প্রায় বিশুদ্ধ গ্লুকোজ পাওয়া যায়।

ধর্ম : গ্লুকোজ একটি মিষ্ট স্বাদযুক্ত সাদা দানাদার দ্রব্য। পানিতে দানায়িত করলে গ্লুকোজের প্রতি অণুতে একটি করে পানির অণু থাকে এবং এই পানিযুক্ত গ্লুকোজের গলনাঙ্ক ৮৬° সে.। অনার্দ্র গ্লুকোজের গলনাঙ্ক ১৪৬° সে.। এটি পানিতে অত্যন্ত দ্রবণীয়। অ্যালকোহলে সামান্য দ্রবণীয়, ইথারে অদ্রবণীয়। এটি চিনির চেয়ে কম মিষ্ট। গ্লুকোজের অণুতে একটি —CHO মূলক এবং ৫টি OH মূলক থাকায় এটি অ্যালডিহাইড ও অ্যালকোহল উভয়ের মতো বিক্রিয়া করে থাকে।

১. অ্যালডিহাইডের মতো বিক্রিয়া : ক্লোরিন বা ব্রোমিনের পানির দ্রবণ গ্লুকোজকে জারিত করে গ্লুকোনিক অ্যাসিডে পরিণত করে। গাঢ় HNO_3 দ্বারা জারিত হলে গ্লুকোজ স্বাভাবিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

খ. সোডিয়াম পারদ ও পানি দ্বারা গ্লুকোজকে বিজারিত করলে এটি সরবিটলে পরিণত হয়।

গ. HCN -এর সঙ্গে গ্লুকোজ সায়ান হাইড্রিন তৈরি করে।

ঘ. হাইড্রোক্সিল অ্যামিনের সঙ্গে অক্সাইন গঠন করে।

ঙ. ফিনাইল হাইড্রাজিনের সঙ্গে গ্লুকোজ তিনটি স্তরে বিক্রিয়া করে ফিনাইল গ্লুকোসাজোন তৈরি করে।

চ. গ্লুকোজ অ্যামোনিয়াযুক্ত সিলভার নাইট্রেট দ্রবণও ফিনাইল গ্লুকোসাজোন ফেহ্‌লিং দ্রবণকে বিজারিত করে যথাক্রমে ধাতব সিলভার ও কিউপ্রাস্ অক্সাইড তৈরি করে এবং নিজে গ্লুকোনিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

২. অ্যালকোহলের মতো বিক্রিয়া :

গ্লুকোজ অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড বা অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে পেন্টা অ্যাসিটাইল গ্লুকোজ উৎপন্ন করে।

খ. Hcl গ্যাসের উপস্থিতিতে গ্লুকোজ মিথাইল অ্যালকোহোলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে মিথাইল গ্লুকোসাইড নামে ইথার তৈরি করে।

$C_6H_{12}O_5OH + OH{-}CH_3 \rightarrow C_6H_{12}O_5\text{-}O\text{-}CH_3 + H_2O$

গ্লুকোজ মিথাইল গ্লুকোসাইড

৩. রেজিন গঠন : গ্লুকোজকে ক্ষারের সঙ্গে ফোটালে প্রথমে হলুদ, পরে বাদামি এবং সবশেষে রেজিন জাতীয় পদার্থ তৈরি হয়।

৪. গাঁজন ক্রিয়া : গ্লুকোজ ঈস্টের প্রভাবে গাঁজন ক্রিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহলে পরিণত হয়।

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$

ইথাইল অ্যালকোহল

৫. চুনের পানির সঙ্গে গ্লুকোজ পানিতে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট তৈরি করে।

$C_6H_{12}O_6 + CaO \rightarrow C_6H_{12}O_6.CaO$

www.pathagar.com

ব্যবহার : ১. গ্লুকোজ রোগীর খাবার হিসাবে, ২. ফলমূল সংরক্ষণে, ৩. ভিটামিন-সি প্রস্তুতিতে, ৪. উত্তম মদ তৈরি করতে, ৫. ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট হিসাবে ঔষধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরীক্ষা : ১. গ্লুকোজ ফেহ্‌লিং দ্রবণকে বিজারিত করে Cu_2O -এর লাল অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে। ২. গ্লুকোজ সিলভার নাইট্রেটকে বিজারিত করে ধাতব সিলভার তৈরি করে এবং কাচকে আয়নার মতো চকচকে করে।

ক. ১৫% অ্যালকোলীয় ন্যাপথলে ∝ গ্লুকোজ ও গাঢ় H_2SO_4 যোগ করলে গাঢ় বেগুনি রঙ তৈরি করে।

গঠন-সংকেত :

```
   CHO
    |
 H—C—6H
    |
HO—C—H
    |
 H—C—OH
    |
 H—C—OH
    |
   CH2OH
```

আ. হ. খ.

গ্লোকোমা চক্ষুরোগ দ্র

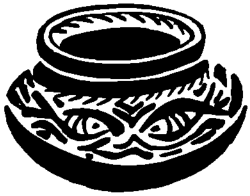

ঘ

ঘট

কুম্ভ, কলস প্রভৃতি মাটির পাত্রকে ঘট বলে। এই ঘট বিশেষ কাজে ব্যবহার করা হয়। ঘটের গায়ে ছবি বা আল্পনা আঁকা থাকে। এটি বহু প্রাচীন লোকশিল্প। এই চিত্র পটের ওপরও আঁকা হয়। পটে ছবি আঁকার মতো ঘটের গায়ে ছবি আঁকাও প্রাচীন রীতি। মাটির তৈরি পাত্রে ছবি এঁকে পোড়ালে খুব সুন্দর হয়। আবার পাত্র পোড়ানোর পরও ছবি আঁকা চলে। মাটির পাত্রে জ্যামিতিক নকশা, ফুল-পাতা, পশু-পাখি, মানুষ, দেব-দেবীর মূর্তি আঁকা যায়। পূজা-অর্চনার জন্য ঘট প্রয়োজন হয়। আবার ঘরে ব্যবহারের জন্যও ঘট, কলসি ইত্যাদিতে আল্পনা আঁকা হয়। বিবাহ ইত্যাদির কাজেও ঘট, সরা, পিঁড়ি ও কুলা চিত্রিত করা হয়। এই চিত্রকর্মের কাজে মেয়েরা খুব পটু। এতে লাল, নীল, হলুদ, শাদা, কালো ও মেটে রঙ ব্যবহার করা হয়। হরতুকি, গিরিমাটি, হিঙ্গুল, নীল, চকখড়ি, ভুসোকালি ইত্যাদি থেকে এ রঙ তৈরি হয়। আবার গাছের পাতা থেকেও রঙ তৈরি হয়। রঙ স্থায়ী ও উজ্জ্বল করার জন্য গর্জন তেল ও তেঁতুল বিচির গাদ মেখে তার ওপর তার্পিন তেল বা রজন-গোলার প্রলেপ লাগানো হয়।

মনসার ঘটের ওপর প্রথমে শাদা রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। তার ওপর লাল, কালো, নীল ও হলুদ রঙ দিয়ে দেবীর মূর্তি আঁকা হয়। এ দেবী লাল শাড়ি পরিহিতা এবং তাঁর চারটি হাত। তাঁর চার হাতে চারটি সাপের ফণার মতো অস্ত্র। তাঁর গায়ের রঙ হলুদ, মাথার উপর সাপের ফণাবিশিষ্ট সর্পছত্র। ঘটগুলো লম্বা, গলার অংশ সরু, কান চওড়া। বরিশাল (দ্র), ফরিদপুর, ঢাকা (দ্র) ও খুলনায় (দ্র) নানা রকম ঘট তৈরি হয়। এ ছাড়া কার্তিক ঘট, নবগ্রহ ঘট প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটের প্রচলন আছে।

বি. ব.

ঘড়ি

যা-কিছু সময় নিরূপণ করতে সাহায্য করে তা-ই 'ঘড়ি'। সদূর অতীতে জলঘড়ি, বাতিঘড়ি, সূর্যঘড়ি ইত্যাদি সময় হিসাব করার কাজে ব্যবহৃত হত, কারণ এদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কিছু সময়ের সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এখন অবশ্য ঘড়ি বলতে আমরা টাওয়ারঘড়ি, দেওয়ালঘড়ি, টেবিলঘড়ি, পকেটঘড়ি, হাতঘড়ি ইত্যাদিই বুঝি। এগুলো হয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাকা ইত্যাদির গতির মাধ্যমে চালিত অথবা বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় চালিত। এসব ঘড়ির কলকজার তিনটি কাজ—ঘড়ির চলার শক্তি সরবরাহ করা, সময় নিরূপণ করা এবং সময় দেখানো। যান্ত্রিক ঘড়িতে চলার শক্তি আসে হয় মাঝে মাঝে উপরে তুলে

www.pathagar.com

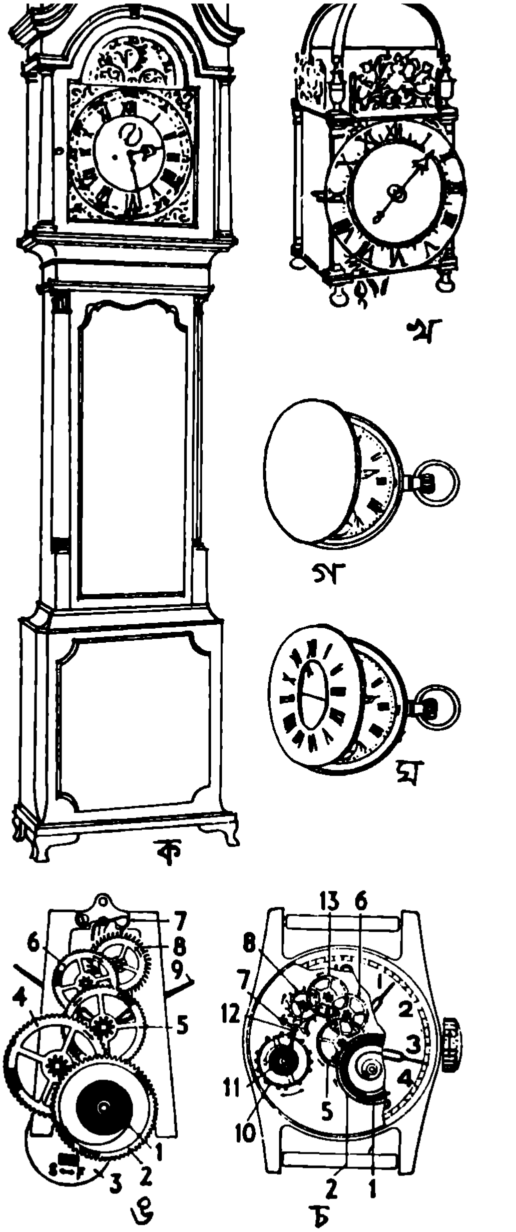

ক. গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়ি খ. লণ্ঠন ঘড়ি
গ. শিকারীর ট্যাঁক-ঘড়ি ঘ. আধা-শিকারী ঘড়ি
ঙ. পেণ্ডুলাম ঘড়ির কলকব্জা
চ. স্প্রিং-চালিত হাতঘড়ির কলকব্জা :
১. মেইন স্প্রিং ২. প্রধান চাকা (ব্যারেল) ৩. পেণ্ডুলাম ৪. মধ্যবর্তী চাকা ৫. সেন্টার হুইল ৬. তৃতীয় চাকা ৭-৮. এস্কেপমেন্ট ৯. ঘণ্টার কাঁটা ১০. ব্যালান্স ১১. হেয়ার স্প্রিং ১২. লিভার ১৩. চতুর্থ চাকা

দেওয়া ঝুলন্ত ভারি বস্তুর ক্রমপতনের দ্বারা অথবা দম দেওয়া স্প্রিং ধীরে ধীরে খুলে যাওয়ার দ্বারা। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটাই অধিক প্রচলিত। যান্ত্রিক ঘড়িতে সময় নিরূপণের কাজ করে বার বার একই হারে পুনরাবৃত্ত হয় এমন কোনো গতি। সাধারণত দোলকের দোলন অথবা হেয়ার স্প্রিং নামক স্প্রিং-এর বারংবার গোটানো আর খুলে যাওয়ার কারণে এক বার এদিক আরেক বার ওদিক আবর্তনশীল চাকা ব্যালেন্স হুইল এই কাজ করে।

ঘড়িতে পতনশীল ভার অথবা দম দেওয়া মেইন স্প্রিংকে নিজ গতিতে পড়ে যেতে বা খুলে যেতে দেওয়া হয় না। এস্কেপ্ হুইল নামের একটি চাকা গিয়ারের মাধ্যমে ঘড়ির মূল চালনাশক্তির সাহায্যে ঘুরতে থাকে, কিন্তু ঘোরার সময় দোলক অথবা ব্যালেন্স হুইল তার পুনরাবৃত্ত গতির প্রত্যেক বার এস্কেপ্ হুইলকে খানিকক্ষণ আটকে রাখে আবার একটু চলতে দেয়। এই একটু একটু করে চলাটাই বিভিন্ন গিয়ারব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন হারে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডের কাঁটায় সঞ্চারিত হয়। এস্কেপ্ হুইলকে বাধা দেওয়ার আঘাতেই ঘড়ির চিরপরিচিত টিকটিক শব্দ সৃষ্টি হয়। ঐ একই প্রক্রিয়ায় দোলক অথবা ব্যালেন্স হুইল নিজেও মূল চালকশক্তির কাছ থেকে একটু একটু ধাক্কা খেয়ে তার হারিয়ে ফেলা শক্তিটুকু পূরণ করে নেয়।

যান্ত্রিক ঘড়ি চীন (দ্র) দেশে এক হাজার খ্রিস্টাব্দের দিকে এবং ইউরোপে (দ্র) দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রথম চালু হলেও তাতে সময় নিরূপণের কাজটি ভালভাবে হত না। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে দোলকঘড়ি এবং একই শতাব্দীর শেষ দিকে স্প্রিংভিত্তিক ব্যালেন্স হুইল উদ্ভাবনের পরই ঘড়ি যথেষ্ট নিখুঁত সময় নির্দেশ করতে সমর্থ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যান্ত্রিক ঘড়ির উৎকর্ষ প্রায় আজকালকার মতো অবস্থাতেই পৌঁছে যায়। নাবিকদের প্রয়োজনে অতি নিখুঁত ঘড়ি ক্রনোমিটার তখন প্রথম তৈরি হয়। স্প্রিং ব্যালেন্স ঘড়িকে ক্রমাগত ছোট করে পরে পকেটঘড়ি ও হাতঘড়ি হিসাবে ব্যক্তিগত পরিধানের জিনিসে পরিণত করে।

বৈদ্যুতিক ঘড়ি ব্যাটারিচালিত হলে এতে সময় নির্দেশের কাজ করে দোলক, ব্যালেন্স হুইল অথবা কোয়ার্জ কেলাসের সৃষ্ট বৈদ্যুতিক স্পন্দন। মেইন্‌স্ সরবরাহ থেকে আসা পরবর্তী বিদ্যুতের সুনির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি বা পর্যাবৃত্তিহার

www.pathagar.com

থাকে বলে তাকেই মেইন্‌সের বিদ্যুৎচালিত ঘড়িতে সময় নির্দেশের কাজে ব্যবহার করা যায়। বৈদ্যুতিক ঘড়িতে সময় দেখানোর কাজ বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে কাঁটা অথবা সংখ্যা লেখা ফিতা ঘুরিয়ে হতে পারে, আবার সরাসরি বৈদ্যুতিক বর্তনীর ক্রিয়ায় সংখ্যার ছবি ফুটিয়ে তুলেও হতে পারে। শেষোক্ত পদ্ধতিটিকে বেশি ব্যবহার করা হয় আজকাল ছোট্ট 'চিপ' বা একটুখানি সিলিকন (দ্র) চিলতের ভিত্তিতে তৈরি ইলেক্ট্রনিক সমন্বিত বর্তনীর ডিজিটাল ঘড়িতে। এর সঙ্গে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে নামে পরিচিত ব্যবস্থাটি ব্যবহৃত হয় সংখ্যা ফুটিয়ে তোলার জন্য। এসবে কোনো গতিশীল অংশ থাকে না, সব কিছুতে বিদ্যুৎ খরচ হয় অতি সামান্য—ছোট্ট একটি ব্যাটারিতে বহু দিন চলে যায়।

কোয়ার্জ (দ্র) কেলাসের স্পন্দনভিত্তিক ঘড়ি ত্রিশের দশক থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো খুব নিখুঁত সময় দেয়। আর চল্লিশের দশকে পারমাণবিক স্পন্দনকে সময় নিরূপণের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে এমন ঘড়ি উদ্ভাবিত হয় যাতে এক লক্ষ বছরে দুই সেকেণ্ডের চেয়ে বেশি ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। সত্তরের দশকে যে ডিজিটাল ঘড়ি চালু হয়েছে তার জনপ্রিয়তা প্রধানত অতি সস্তা ও বহুমুখী হবার কারণে।

প্রাচীন কাল থেকেই ঘড়ির সঙ্গে সময় নির্দেশের কাজ ছাড়াও শোভা বর্ধনের কাজেরও সম্পর্ক ছিল। প্রাসাদের বিশাল ঘড়ির জবড়জং ভাস্কর্যেই হোক আর ছোট্ট হাতঘড়ির সূক্ষ্ম অলঙ্করণেই হোক, এই দিকটি বরাবর মনোযোগ পেয়েছে, এখনো পাচ্ছে তার আধুনিক সংস্করণে।

মু. ই.

ঘড়িয়াল

ঘড়িয়াল (gharial), ঘড়েল, গেভিয়াল, মেছো কুমির বা বাইশাল বিরল প্রজাতির মিঠা পানির কুমির। বৈজ্ঞানিক নাম

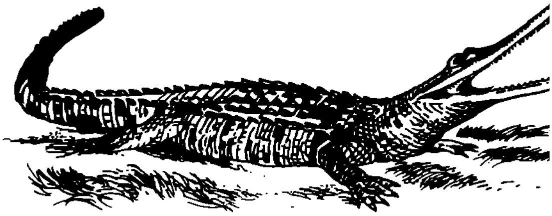

গেভিয়ালিস গেনজেটিকাস (Gavialis gangeticus) । অত্যন্ত লম্বা নাক ও চোয়ালের জন্য এটি অন্যান্য কুমির থেকে আলাদা। এর ০.৯–১.২ মিটার লম্বা চোয়ালটি মাছ ধরার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। পুরুষ ঘড়িয়ালের ওপরের চোয়ালে, নাকের ঠিক ওপরে কলস বা ঘড়া আকৃতির একটি পিণ্ড থাকে। শোনা যায়, এ থেকেই ঘড়িয়াল নামের উৎপত্তি। শুধু ভারত (দ্র), নেপাল (দ্র) ও বাংলাদেশের (দ্র) কয়েকটি নির্দিষ্ট নদীতে এর দেখা মেলে।

অন্যান্য কুমিরের মতোই এর পিঠ ও লেজ কাঁটাযুক্ত শক্ত আঁশে মোড়ানো। সরীসৃপ (দ্র)-জাতীয় প্রাণী হলেও এর হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। এর হাতে পাঁচটি ও পায়ে চারটি করে আঙুল ও নখর রয়েছে। চোখ অপেক্ষাকৃত বড়। চোয়ালে দাঁতের সংখ্যা শতাধিক। এগুলো লম্বায় ৪.৫–৯ মিটার হতে পারে। পুরুষ ঘড়িয়াল আরো মিটার খানেক বড় হয়। এর গায়ের রঙ কালচে-ধূসর হলেও বাচ্চাগুলো কিছুটা উজ্জ্বল।

চৈত্র এদের প্রজনন ঋতু। স্ত্রী ঘড়িয়াল বালিতে ৬০–৯০ সেন্টিমিটার গর্ত করে একসঙ্গে চল্লিশ–পঞ্চাশটি ডিম পাড়ে। ক্যাপসুল আকৃতির ধবধবে সাদা ডিমগুলো প্রায় ১০ সেন্টিমিটার লম্বা। ষাট থেকে পঁচাত্তর দিনে ডিম ফুটে ২৫–৩০ সেন্টিমিটার লম্বা বাচ্চা বের হয়। এটি তিন বছরেই ১.৫ মিটার লম্বা হয়ে যায়। ঘড়িয়াল চার-পাঁচ বছরে প্রজননক্ষম হয়। এরা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

www.pathagar.com

ঘনত্ব

কোনো বস্তুর ঘনত্ব বলতে সেই বস্তুর প্রতি একক আয়তনের ভরকে বোঝায়। যেমন আমরা যদি এক ঘন সেন্টিমিটার পানি নিই, তার ওজন হবে এক গ্রাম। পানির ঘনত্ব তা হলে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে এক গ্রাম। আমরা যদি পানির আয়তন ঘন সেন্টিমিটারের পরিবর্তে ঘন মিটারে মাপি, তা হলে দেখা যাবে, এক ঘন মিটার পানির ভর দাঁড়াবে দশ লক্ষ গ্রাম বা এক হাজার কিলোগ্রাম। (কারণ এক ঘন মিটার = ১০,০০,০০০ ঘন সেন্টিমিটার)। তা হলে S I এককে পানির ঘনত্ব হল প্রতি ঘন মিটারে এক হাজার কিলোগ্রাম। আমরা যদি একই আয়তনের বিভিন্ন বস্তু নিই, তা হলে তাদের ভর বিভিন্ন হবে। ঘনত্বকে পরমভাবে নির্ধারণ না করে তুলনামূলকভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে। একে বলা হয় আপেক্ষিক ঘনত্ব। একই আয়তনের পানির তুলনায় সীসার ভর ১১.৩ গুণ এবং সোনার ভর ১৯.৩২ গুণ। এ জন্য পানির তুলনায় সীসার আপেক্ষিক ঘনত্ব ১১.৩ এবং সোনার আপেক্ষিক ঘনত্ব ১৯.৩২। যেসব বস্তুর ঘনত্ব পানির চেয়ে কম তা পানিতে ভাসে। বরফের ঘনত্ব পানির চেয়ে কম বলে বরফ পানিতে ভাসে।

নির্মাণকাজে কোনো বস্তু ব্যবহার করার সময় অনেক সময়ই ঘনত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। উড়োজাহাজ নির্মাণের সময় হালকা ধাতু, যেমন অ্যালুমিনিয়াম, পছন্দ করা হয়। লোহার (দ্র) জাহাজ (দ্র) যে পানিতে ভাসে তার কারণ জাহাজের মধ্যে অনেক ফাঁকা জায়গা আছে এবং জাহাজের সার্বিক ঘনত্ব পানির তুলনায় সে জন্য কম। যে কোনো বস্তুর ঘনত্ব নির্ধারণ করবার সাধারণ সূত্র হল :

$$\text{ঘনত্ব} = \frac{\text{বস্তুর ভর}}{\text{বস্তুর আয়তন}}$$

তরল পদার্থের আপেক্ষিক ঘনত্ব নির্ধারণের জন্য হাইড্রোমিটার ব্যবহার করা হয়।

আ. আ.

ঘনাদা প্রেমেন্দ্র মিত্র দ্র

ঘনীভবন

কোনো বস্তুকে এর গ্যাসীয় দশা থেকে ঠাণ্ডা করে এনে তরল দশায় নিয়ে যাওয়াকে ঘনীভবন বলা হয়। গ্যাসীয় অবস্থায় অণুগুলোর গতিশক্তি বেশি থাকে এবং এরা ছুটোছুটি করে। কোনো ঠাণ্ডা বস্তুর সংস্পর্শে এসে বা অন্যভাবে গ্যাসের অণুগুলো যদি গতিশক্তি হারায়, তা হলে এরা একত্রিত হয়ে জমাট বাঁধতে পারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে জলীয় বাষ্প উপরে গিয়ে ঠাণ্ডা হয় ও ঘনীভূত হয়ে জলকণার সৃষ্টি করে। শীতের দিনে টিনের চাল বা ধানের শীষে যে শিশিরবিন্দু জমে, সেটাও জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন। কোনো ক্ষুদ্র ধূলিকণা বা আর কোনো অবলম্বন পেলে এই ঘনীভবনের কাজ ত্বরান্বিত হয়। একটি ট্রের মধ্যে বরফ (দ্র) রেখে তার নিচে কেৎলিতে পানি গরম করে জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করলে এই ঘনীভবনপ্রক্রিয়া সহজে দেখানো যায়।

কোনো হাঁড়িতে পানি জ্বাল দিলে একটু উপরে যা ধোঁয়ার মতো দেখা যায়, তা আসলে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে জলকণা সৃষ্টি হয়, ঘনীভবনের ভিতর দিয়ে সেটাই দৃশ্যমান হয়ে উঠে ধোঁয়ার সৃষ্টি করে।

আ. আ.

ঘরানা

সঙ্গীত (দ্র) পরিবেশনের বৈশিষ্ট্যময় রীতি। কোনো সঙ্গীতগুণী যখন নিজ প্রতিভাবলে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গায়ন বা বাদনরীতি প্রবর্তন করেন এবং তা যখন তাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্যক্রমে প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত হয়, তখন তাকে বলা হয় ঘরানা। অলঙ্কারের ব্যবহার, সুরের কাজ, ছন্দবিন্যাস ও লয়কারি, রাগরূপ উপস্থাপনের ব্যাপারে স্বরের ব্যবহার, ভাব প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্যই ঘরানাসমূহের মধ্যে পরপর পার্থক্য নির্দেশ করে। কিরানা ঘরানায় যেমন সুমিষ্ট সুরের কাজ বেশি, আবার গোয়ালিয়র ঘরানায় ছন্দবিন্যাস ও লয়কারির কাজ বেশি। ঘরানার নাম দু'ভাবে প্রচলিত হয় : উৎপত্তিস্থলের নাম অনুসারে (যেমন—বিষ্ণুপুর ঘরানা, আগ্রা ঘরানা, কিরানা ঘরানা) এবং প্রচলনকারীর নাম অনুসারে (যেমন—সেনী ঘরানা, মিশ্র ঘরানা, প্রসদ্দু-মনোহর ঘরানা)।

চতুর্দশ শতকের প্রথম দিক থেকেই ঘরানার উদ্ভব বলে মনে করা হয়। কলাবন্ত ঘরানা ও কাওয়াল ঘরানা দু'টি হচ্ছে প্রাচীনতম ঘরানা। সেনী ঘরানা সবচেয়ে প্রভাবশালী ঘরানা। এই ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং তানসেন (দ্র)। তাঁর

www.pathagar.com

পুত্রবংশ ও কন্যাবংশে ক্রমে সেনী ঘরানার বিস্তার হয়। ডাগর ঘরানা ও তিলমন্তি ঘরানা সেনী ঘরানার মতোই দু'টি প্রাচীন ঘরানা। ঘরানাসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত হয় : গায়ক ঘরানা, বাদক ঘরানা ও নর্তক ঘরানা। গায়ক ঘরানার শাখা চারটি : ধ্রুপদ (দ্র) ঘরানা, খেয়াল (দ্র) ঘরানা, টপ্পা (দ্র) ঘরানা ও ঠুংরি (দ্র) ঘরানা। বাদক ঘরানার প্রধান শাখা দু'টি : ততবাদক ঘরানা ও আনদ্ধবাদক ঘরানা। নর্তক ঘরানার শাখা তিনটি : লখ্নৌ কথক ঘরানা,জয়পুর কথক ঘরানা ও বারাণসী কথক ঘরানা। প্রতিটি প্রধান শাখা আবার বহু উপবিভাগে বিভক্ত।

ক. গো.

ঘর্ষণ

আমরা যখন কোনো মসৃণ তলকে অন্য একটি মসৃণ তলের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাই, তখন বেশি বেগ পেতে হয় না। কিন্তু অমসৃণ কোনো তলের উপর দিয়ে অন্য একটি অমসৃণ তলকে টেনে নিয়ে যেতে বেশ বলপ্রয়োগ করতে হয়। বরফের উপর দিয়ে স্কেটিং করার সময় ক্রীড়াবিদদের খুব অল্প বলপ্রয়োগ করতে হয়। একটি সাধারণ অমসৃণ পথের উপর এই স্কেটিং সম্ভব নয়। কোনো তলের ওপর দিয়ে অন্য একটি তলকে টেনে নেবার সময় যে বল এই চলাকে বাধা দেয় তাকেই ঘর্ষণ বলা হয়। থেমে থাকা অবস্থায় এই ঘর্ষণ কাজ করে না। চলতে শুরু করলেই ঘর্ষণবল কাজ করতে শুরু করে। গতি যত বেশি হয় এবং টেনে নেওয়ার বস্তু যত ভারি হয়, ঘর্ষণবলও তত বৃদ্ধি পায়। তেল বা পিচ্ছিলকারক কোনো বস্তু ব্যবহার করে ঘর্ষণ কমানো যেতে পারে। মানুষ যে আগুন আবিষ্কার করেছিল, তা পাথরের সঙ্গে পাথর বা কাঠের সঙ্গে কাঠের ঘর্ষণকে ব্যবহার করে। ঘর্ষণবলের বিরুদ্ধে কোনো বস্তুকে সরাতে গেলে কাজ করতে হয়। এই কাজ তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আমরা দিয়াশলাই জ্বালাবার সময় বারুদকে গরম করতে ঘর্ষণ ব্যবহার করি। পথ চলার সময় জুতার তলা ও মাটির মধ্যে ঘর্ষণ না থাকলে আমরা হাঁটতে পারতাম না। গাড়ি থামাতে যে ব্রেক ব্যবহার করা হয় তা ঘর্ষণবলকে ব্যবহার করে। চলন্ত গাড়ির ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে যে তাপ সৃষ্টি হয়, তা শোষণ করার জন্য ও ঘর্ষণকে কমাবার জন্য মবিল ব্যবহার করা হয়।

আ. আ.

ঘাস

উদ্ভিদজগতে খুব বিচিত্র, সর্বব্যাপ্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্ভিদপরিবার হল ঘাস, উদ্ভিদবিদ্যার ভাষায় যে পরিবারের নাম গ্রামিণী। যত্রতত্র মাটিকে সবুজ করে রাখে দূর্বা প্রভৃতি সাধারণ ঘাস; ধান, গম, ভুট্টা, যব, বার্লি ইত্যাদি শস্য; আখ ও বাঁশের মতো দীর্ঘ শক্ত কাঠের গাছ—এরা সবাই ঐ ঘাসপরিবারের অন্তর্গত। এগুলোর মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো সবই ঘাস। সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল এদের পাতা। কাণ্ডের বিপরীত থেকে পরপর একটি করে পাতা বের হয়। গাঁটে গাঁটে বিভক্ত কাণ্ডের প্রত্যেক গাঁটের উপরটায় পাতার নিম্নাংশ আবরণী দিয়ে মোড়ানো থাকে। পাতার অন্য প্রধান অংশ ফলকটি সরু এবং চ্যাপ্টা ফিতার মতো। আবরণী আর ফলকের সংযোগস্থলে লিগুইল নামক ছোট আর একটি অংশ থাকে। এটি অনেকটা সারিবদ্ধ কিছু আঁশের আকৃতির। কাণ্ডের দু'টি গাঁটের মাঝখানটা অনেক ক্ষেত্রে ফাঁপা হয়ে থাকে। সব রকম ঘাসের ফুল আসে ফুলগুচ্ছের আকারে। এর পরাগ-সংযোগ হয় পরাগ বাতাসে উড়ে গিয়ে। ঘাসের মূল হয়ে থাকে ঝাঁকড়া গুচ্ছমূল।

সব রকম ঘাসকে সাধারণত ছয় প্রকারে ভাগ করা যায়। এগুলো হল : পশুচারণের ঘাস, ভূমি আচ্ছাদনের ঘাস, শস্য জাতীয় ঘাস, আখ এবং কাষ্ঠময় ঘাস (যেমন বাঁশ)। দুনিয়ার প্রধান খাদ্যশস্যের সবগুলো উৎস ঘাস স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। আমাদের দেশের একটি প্রধান নির্মাণসামগ্রী বাঁশের জন্যও এটি মূল্যবান। আমাদের চিনি আসছে আখ থেকে। পশুপালন বিশেষভাবে নির্ভর করছে কাঁচা ঘাস আর খড়ের উপর। ঘাসের গুচ্ছমূল মাটিকে ঘন জালের মতো আঁকড়ে রাখে বলে ঘাসে আবৃত ভূমি সহজে ক্ষয় হতে পারে না। সবুজ কার্পেটসদৃশ ঘাস সৌন্দর্য আস্বাদনে, হেঁটে বেড়াতে বা খেলার মাঠে যে প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনে তা বলাই বাহুল্য। ঘাসের একটি চমৎকার গুণ হল, এর মূল কাণ্ডের গোড়া থেকে অনেকগুলো নতুন নতুন পার্শ্বকাণ্ড গজায়। ওপর থেকে ছেঁটে দিলে বা গরু-ছাগলে মুড়িয়ে খেয়ে ফেললে এই পার্শ্বকাণ্ড গজাবার কাজ বরং ত্বরান্বিত হয়। আমাদের পরিচিত শস্যগুলোর মতো কোনো কোনো ঘাস মৌসুমশেষে মরে যায়। আবার অন্য কিছু ঘাস বহুবর্ষজীবী।

মু. ই.

www.pathagar.com

ঘাসফড়িং

ঘাসের রঙের মতো সবুজ বর্ণের এক ধরনের পোকার নাম ঘাসফড়িং। শীতের ভোরে শিশিরে ভেজা ঘাস বা ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলার সময় এদেরকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে দেখা যায়। ইংরেজিতে এদের নাম গ্রাস্‌হপার (grass-hopper)। গ্রাস অর্থ ঘাস; হপার মানে যারা লাফিয়ে চলে। অর্থাৎ ঘাসে ঘাসে লাফিয়ে চলা প্রাণীটির নাম গ্রাস্‌হপার। ঘাসফড়িং নানা জাতের হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও (দ্র) এর বেশ কয়েকটি প্রজাতি দেখা যায়। ভারত (দ্র), পাকিস্তান (দ্র), আফগানিস্তান, নেপাল (দ্র), ভুটান (দ্র), শ্রীলঙ্কা (দ্র), মায়ানমার (দ্র), থাইল্যাণ্ড (দ্র), চীন (দ্র), ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া (দ্র), ইন্দোনেশিয়া (দ্র) ও ভিয়েতনামে ঘাসফড়িং রয়েছে। ঘাসফড়িং-এর দেহ সরু। এর দেহে তিন জোড়া উপাঙ্গ থাকে—দেহের প্রতি পাশে তিনটি করে উপাঙ্গ। পেছনের উপাঙ্গজোড়া সম্মুখের ও মাঝের উপাঙ্গজোড়ার

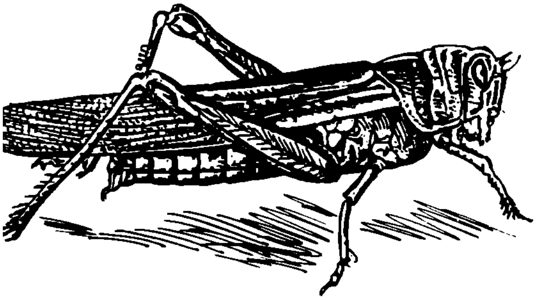

তুলনায় অনেক বড়। মাথার আকৃতি ত্রিকোণ। পূর্ণবয়স্ক ঘাসফড়িং-এর শুঙ্গ দেহের দৈর্ঘ্যের তুলনায় খাটো। পেছনের উপাঙ্গের উপর চাপ দিয়েই ওরা জোরে লাফ দেয়। শুঙ্গ স্পর্শকাতর। শুঙ্গ দিয়ে ঘাসফড়িং কোন্‌টা খাদ্য, কোনটা অখাদ্য, শত্রুর উপস্থিতি ইত্যাদি অনুভব করে। স্ত্রী ঘাসফড়িং ক্ষেতের মাটিতে বা ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে, যথা ধান (দ্র), গম (দ্র), ভুট্টার (দ্র) গোড়ায় গুচ্ছে গুচ্ছে ডিম পাড়ে। এরা ঘাস, ধান, গমসহ অনেক প্রকার শস্যের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে। শীতকালে ঘাসে বা জঙ্গলে ঘাসফড়িং শীতনিদ্রা যাপন করে। এটি ওদের পরিপূর্ণ বিশ্রামের সময়।

ত. চ.

ঘুঘু

ঘুঘু মাঝারি পাখি। কবুতর (দ্র) ও ঘুঘু একই গোত্রভুক্ত। পৃথিবীতে এর ৩০০ প্রজাতি আছে। সবচেয়ে বড় ঘুঘু রক ডাভ (৩৩ সেন্টিমিটার)। ছোট হচ্ছে গ্রাউণ্ড ডাভ (১৫ সেন্টিমিটার)। ওজন ২৮ গ্রাম।

ঘুঘুর ঘাড় ও পা খাটো। লম্বাটে লেজ। ছোট গোল মাথা। মসৃণ পালক। দ্রুত উড়তে পারে। স্ত্রী-পুরুষ দেখতে একই। প্রজাতিভেদে ধূসর বাদামি, নীলচে, সবুজ ইত্যাদি বর্ণের হয়। অনেকের গলায় বলয় থাকে।

বন, বাগান, পাহাড়ি এলাকা ও মাঠে সর্বত্রই ঘুঘু আছে, শহরেও। উল্লেখযোগ্য ঘুঘুরা হচ্ছে–রক ডাভ, স্টক ডাভ, কালার্ড ডাভ, টার্টেল ডাভ, মোর্নিং ডাভ।

ঘুঘু শস্যদানা, বীজ, ছোট নরম ফল খায়। এরা লতাপাতা খড়কুটো দিয়ে গাছে, ঝোপঝাড়ে ও খরগোসের পরিত্যক্ত গর্তে বাসা তৈরি করে। দর-দালানের ছাদেও বাসা তৈরি করে কেউ কেউ।

এরা হজম করা খাবার বাচ্চাদের খেতে দেয়। মুখে মুখ পুরে পাম্পিং করে খাবার ঢুকিয়ে দেয়। মায়ের গলার নিচের খাদ্যথলি থেকে এক ধরনের ঘিয়ে রঙের তরল পদার্থ খাদ্যের সঙ্গে মিশে যায়। একে বলে কবুতরের দুধ (pigeon milk)।

ঘুঘু নিরীহ পাখি। মোর্নিং ডাভের ডাক কান্নার মতো করুণ। এরা দ্রুত উড়তে পারে। অনেকের ডানার শব্দ হয় ওড়ার সময়। এই শব্দ তাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।

ঘুঘুর দুটো সাদা ডিম হয়। ডাক হচ্ছে কুরু, কুরু, কুরুউ ....। ১৭/১৮ দিনে ডিম ফোটে।

এরা ২ থেকে ৬ বছর বাঁচে। বাংলাদেশে (দ্র) ঘুঘুর ৭টি প্রজাতি আছে। বড় হচ্ছে ধবল ঘুঘু (কালার্ড ডাভ)।

শ. খা.

www.pathagar.com

ঘুড়ি

কাগজের (দ্র) সঙ্গে বাঁশের (দ্র) চিকন কঞ্চির হালকা কাঠামো লাগিয়ে আমাদের সাধারণ পরিচিত ঘুড়ি তৈরি হয়। বিশেষভাবে সুতোয় বেঁধে একে দীর্ঘ সুতোর প্রান্তে আকাশে (দ্র) ওড়ানো বহু দেশেই একটি মজার খেলা

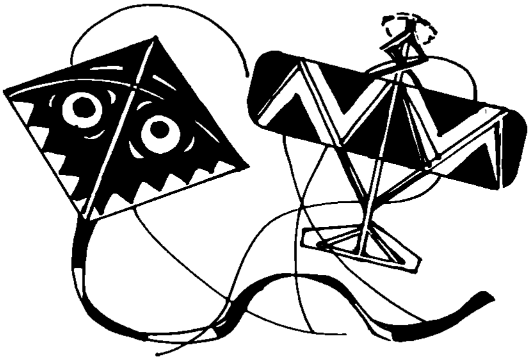

হিসাবে বিবেচিত। ঘুড়ির আকাশে ওড়ার কৌশলটি নির্ভর করে এর উপর দিয়ে বাতাসের (দ্র) প্রবাহের উপর। বায়ুপ্রবাহ যে দিক থেকে আসছে সেটি বুকের দিকে রেখে সঠিক কোণে নাক উঁচিয়ে ঘুড়ি খাড়া থাকলেই তা বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। এ অবস্থায় এর সামনের দিকে বাতাসের উর্ধ্বমুখী চাপ পিঠের দিকের নিম্নমুখী চাপের তুলনায় বেশি থাকে। ঘুড়ি যেভাবে তৈরি হয়, এতে সুতা যেভাবে বাঁধা হয় এবং তাতে যেভাবে টান পড়ে, তার ফলেই ঘুড়ি সঠিক কোণ করে খাড়া থাকতে পারে। ঘুড়ি ওড়াবার জন্য একটি ন্যূনতম বায়ুপ্রবাহের প্রয়োজন হয়। ওড়া শুরু করার সময় সুতা টেনে টেনে বা তা নিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঘুড়ির উপর বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। উপরেও কোনো সময় বায়ুপ্রবাহ কমে গেলে এমনি করে টেনে টেনে ঘুড়িকে আরো উপরে এমন স্তরে আনার চেষ্টা করা হয় যেখানে নিরবচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ রয়েছে।

আমাদের পরিচিত ঘুড়ির চেয়ে আকারে, চেহারায় ভিন্ন বহু রকমের ঘুড়ি নানা দেশে প্রচলিত আছে। খুবই আলাদা রকমের একটি ঘুড়ি হল বাক্সঘুড়ি—ছাদ ও তলাবিহীন এক বা একাধিক বাক্সের আকারে এটি তৈরি হয়। ঘুড়ি যদিও চীন (দ্র) দেশে হাজার বছর আগে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত প্রচলিত, বাক্সঘুড়ি কিন্তু উদ্ভাবিত হয়েছে মাত্র ১৮৯৩ সালে। এর পরপর মানুষের বিমান তৈরির প্রচেষ্টায় বাক্সঘুড়ির নির্মাণকৌশলটি একটি বড় ভূমিকা রেখেছে। প্রথম বিমানের

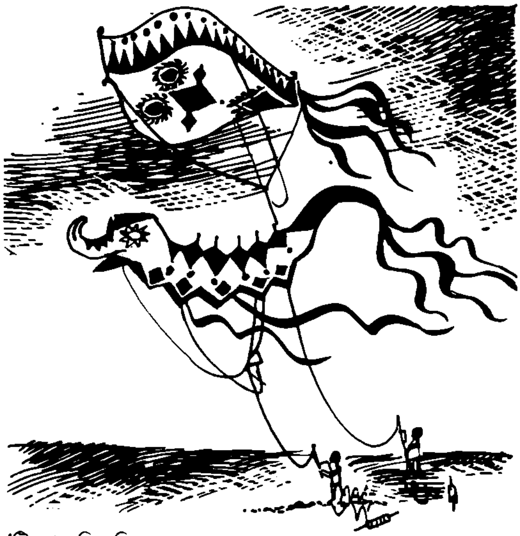

দু'টি জাপানি ঘুড়ি

উদ্ভাবক রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ও (দ্র) বাক্সঘুড়ি নিয়ে কাজ করেছেন।

দেশে দেশে আমোদ-উৎসবের জন্য নানা বাহারি ঢঙের ঘুড়ি ওড়াবার রীতি আছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ কাজেও অতীতে ঘুড়ি ব্যবহৃত হত। ১৭৫২ সালে আমেরিকায় (দ্র) বজ্রসঙ্কুল এক ঝড়ের দিনে ঘুড়ি উড়িয়ে বজ্রের স্থির বিদ্যুৎ সংগ্রহ করেছিলেন বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন্ (দ্র)—এ কথা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সুবিদিত। এক সময় আবহাওয়া (দ্র) বিভাগ বাক্সঘুড়ির সঙ্গে পরিমাপ যন্ত্রপাতি আকাশে পাঠাত। সমুদ্রে জীবনতরী থেকে রেডিওসংকেত দেওয়ার জন্য ঘুড়ি উড়িয়ে অ্যান্টেনা (দ্র) তুলে দেওয়া হত।

মু. ই.

ঘুড়ি ওড়ানো

ঘুড়ি ওড়ানো একটি অতি প্রাচীন খেলা। কিংবদন্তি আছে যে খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে গ্রিসের বিজ্ঞানী আর্চিটাস ঘুড়ি উদ্ভাবন করেন। কিন্তু এশিয়া (দ্র) মহাদেশের (দ্র) লোকেরা এরও বহু যুগ আগে ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারে দক্ষ ছিল। এই খেলাটি জাতীয় উৎসব হিসাবে কোরিয়া, চীন (দ্র), জাপান (দ্র) ও মালয়েশিয়ায় (দ্র) প্রচলিত রয়েছে। পূর্বে কুসংস্কার ছিল, যে বাড়ির ওপর ঘুড়ি উড়বে সেটা মন্দ আত্মার প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে। এশিয়ায় বহু দেশে ঘুড়ি ওড়ানোর সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসের সংযোগ রয়েছে।

বিদেশে অনেক ধরনের ঘুড়ি ওড়ানো হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

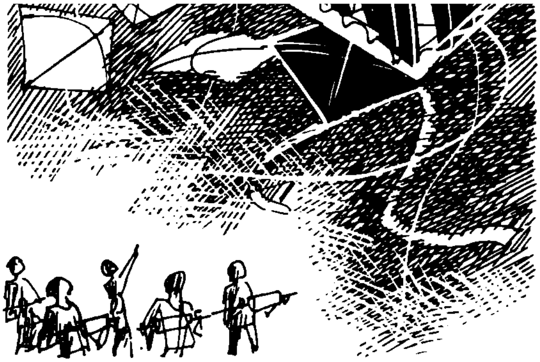

এগুলি নানা রঙিন কাগজ দিয়ে বানানো হয়। ঘুড়ি বিভিন্ন প্রতিকৃতির হয়ে থাকে, যেমন—কোনোটা পাখির, কোনোটা মানুষের, কোনোটা জীবজন্তুর আকার অনুসারে তৈরি করা হয়। আবার কোনোটা চ্যাপ্টা বাক্সের মতো, কোনোটা গোল কিংবা লম্বা কিংবা চৌকোণা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে (দ্র) ঘুড়ি ওড়ানো একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন খেলা। গ্রামে-গঞ্জে যে ঘুড়ি ওড়ানো হয় সেই ঘুড়িকে ডাউস ঘুড়ি বলে। এই ঘুড়ি আকারে ৮ থেকে ১৫ ফুট পর্যন্ত বড় হয়ে থাকে। মোটা গুনের দড়ি দিয়ে এগুলি ওড়ানো হয়। আকাশে ওড়ানো অবস্থায় এগুলি বাতাসের প্রবাহের সঙ্গে শোঁ শোঁ শব্দ করে থাকে। ২/৩ দিন পর্যন্ত এগুলি ওড়ানো অবস্থায় রেখে দেওয়া যেতে পারে। তবে, শহরে যেসব ঘুড়ি ওড়ানো হয়, সেগুলি সুতোয় মাঞ্জা দিয়ে গুল্লি সুতো বা মোটা সুতোর সাহায্যে ওড়ানো হয়। এই ঘুড়িগুলি এক ফুট থেকে তিন ফুটের মতো বড় হয়ে থাকে ও নানা রঙিন কাগজে তৈরি বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে। প্রতিটি ঘুড়ির এক একটি আলাদা নাম আছে। যথা—পঙ্খি, চাটাইদার, রুমালদার, পেট কাট্রি, কানা পঙ্খি, লেণ্টেন দোবাজ, নাক পান্দান ইত্যাদি।

দলবদ্ধভাবে দশ নাটাই, পনেরো নাটাই অর্থাৎ নাটাইয়ের সংখ্যা অনুযায়ী দুই দলে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। কোন দল বিপক্ষের কতটা ঘুড়ি কাটল, তার ভিত্তিতে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে থাকে। ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য নাটাইয়ে সুতা পেঁচিয়ে রাখতে হয়। আর সুতায় মাঞ্জা দেওয়া হয়। কাচের মিহি চূর্ণ, শিরীষ, আঠা, এরারুট ও রঙ দিয়ে মশলা বানিয়ে তা দিয়ে সুতায় মাঞ্জা দিতে হয়। পৌষসংক্রান্তিতে সবাই ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ করে থাকে।

কা. আ. আ.

ঘুম

ঘুম শরীরের এমন প্রক্রিয়া, যা মানুষের দিন-রাত্রির অনেকটা সময় হরণ করে নেয়। বিজ্ঞানীদের মতে, ঘুম পেশির নিষ্ক্রিয় অবস্থা, যা নির্দিষ্ট বিরতিতে সক্রিয় অবস্থায় ফিরে আসে এবং ঘুম দেহের উপর পরিবেশের উদ্দীপক সংবেদী ক্রিয়াকে হ্রাস করে। অর্থাৎ ঘুম নির্দিষ্ট বিরতিতে সংঘটিত চেতনাহ্রাসকারী একটি প্রক্রিয়া। এক জন বয়স্ক ব্যক্তির জন্য দৈনিক ৪ থেকে ১০ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। যারা ৪ ঘণ্টার কম ঘুমায় তারা অধিক কর্মচঞ্চল ও সচেতন থাকে। তবে ৪ ঘণ্টার কম ও ১০ ঘণ্টার বেশি যারা ঘুমায়, তারা স্বল্পায়ু হয় বলে অনেকের ধারণা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের পরিমাণ কমে ও বাড়ে। সদ্যোজাত শিশু (দ্র) দিনে ১৬–২০ ঘণ্টা ঘুমায়। এই শিশু যৌবনে ঘুমায় এর অর্ধেক সময়। ৬০ বছর বয়স থেকে ঘুম কমে যায়।

অতি ঘুম ও অতি জাগরণ দুটোই দেহের জন্য ক্ষতিকর। যারা অতিরিক্ত কাজ ও লেখাপড়ার জন্য পর পর রাত জাগে এবং দিনেও ঘুমায় না, তাদের দেহে কঠিন সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। এক নাগাড়ে ৬০ থেকে ২০০ ঘণ্টা জেগে থাকলে দেহে ক্লান্তি নামে, মেজাজ খিটখিটে হয়। যারা এভাবে জেগে থাকে, তাদের বোধশক্তি কমে যায় এবং গভীর মনঃসংযোগের অভাব ঘটে। যদি তাদের জাগরণের মাত্রা আরো বাড়ে, তা হলে তারা বিভ্রান্তিজনক ও ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতে থাকে। এক সময় কাজে একেবারে অমনযোগী হয়। প্রলাপ বকে এবং খ্যাপামি করে। এমন ব্যক্তির কাজের গতি ও নৈপুণ্য হ্রাস পায়। পরবর্তী কালে তার হাত কাঁপা, চোখের পাতার অবশতা, মুখে কথা আটকে যাওয়া, আলাপের সময় ভুল শব্দ প্রয়োগ এবং অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ ইত্যাদি দেখা দেয়, এমনকি শেষে সে পাগলও হয়ে যেতে পারে। অধিক ঘুম মনে বিরক্তিভাব ও বিমর্ষতার উদ্রেক করে। এতে হঠাৎ করে পেশি অবশ হয়ে যেতে পারে 'ক্লেইন-লেভিন সিণ্ড্রোম' নামের একটি উপসর্গও দেখা দেয়। বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে অধিক ঘুম ও খাদ্যগ্রহণ এই রোগের লক্ষণ। রামায়ণ (দ্র) মহাকাব্যের (দ্র) কুম্ভকর্ণ (দ্র) হয়তো এই রোগে ভুগেছিল।

ত. চ.

www.pathagar.com

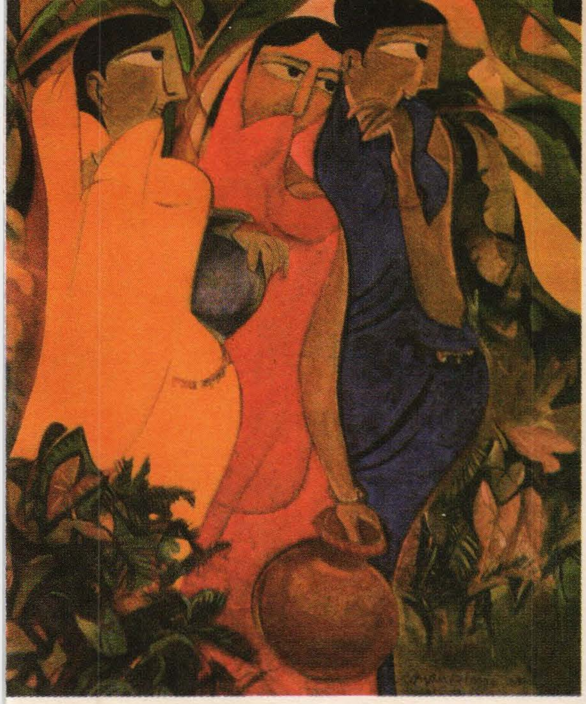

কামরুল হাসানের ছবি

১. তিন কন্যা : তেলরঙ

২. গরুর গাড়ি : তেলরঙ

৩. নিসর্গ : জলরঙ

www.pathagar.com

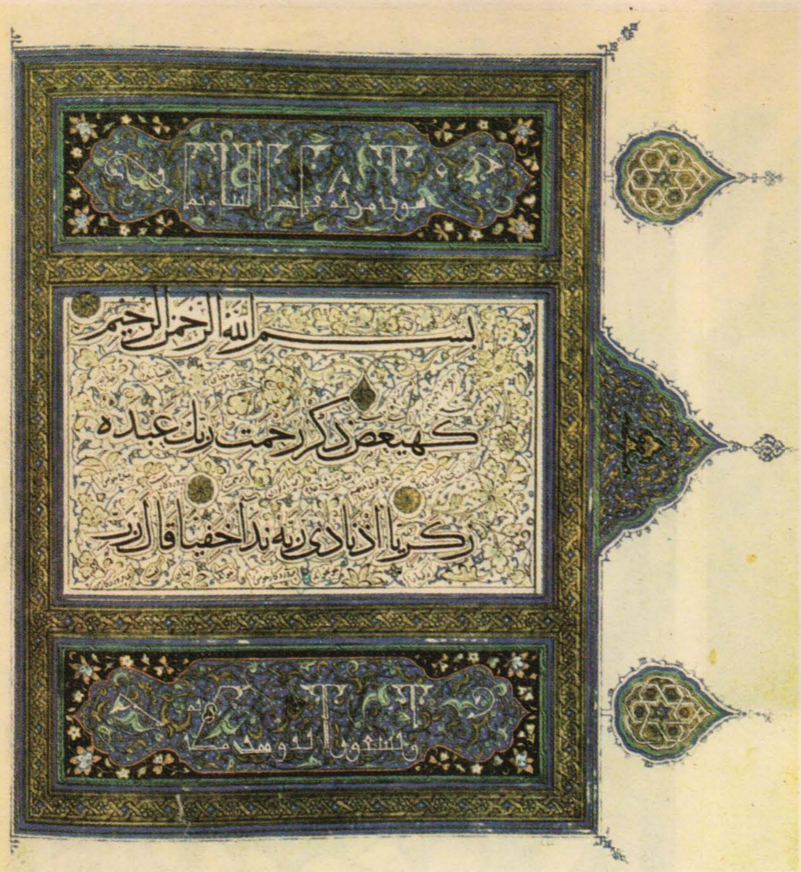

কুরআন শরীফের একটি চিত্রিত পৃষ্ঠা। তুরস্কে প্রাপ্ত এই কুরআন শরীফটি ক্যালিগ্রাফি ও নকশার অপূর্ব নিদর্শন

কদম ফুল

ফটো : পাভেল রহমান

www.pathagar.com

খাসিয়া শিশু ও
খাসিয়া গ্রাম শ্রীমঙ্গল
ফটো : হাশেম খান

www.pathagar.com

চীবর

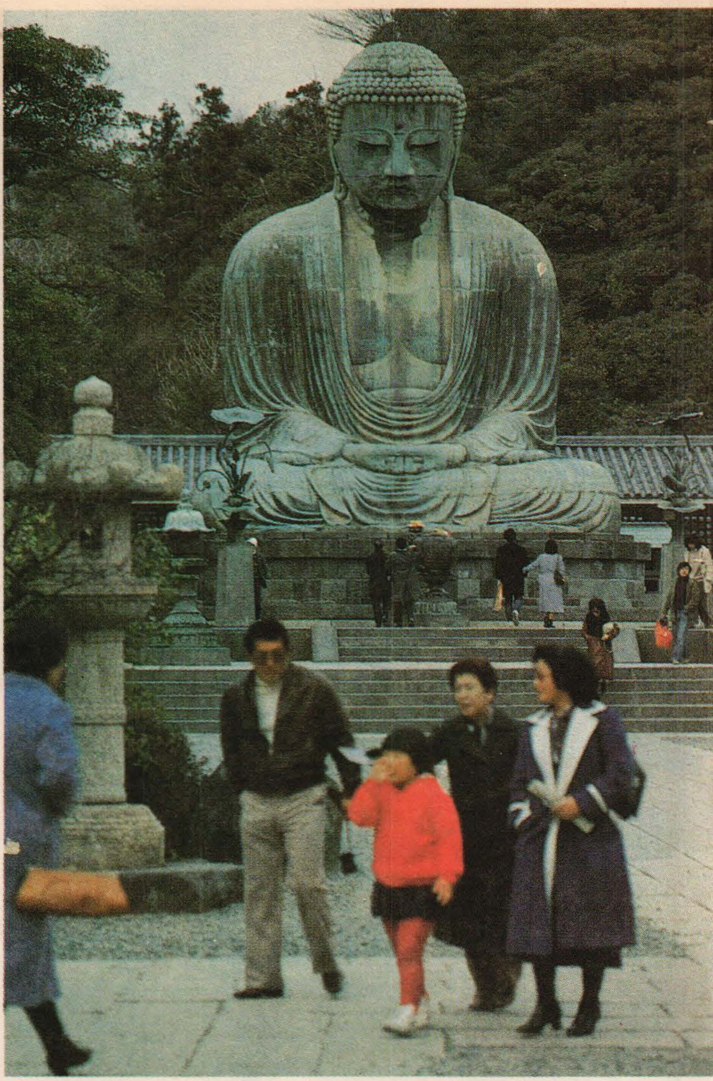

জাপানের কামাকুরায় বুদ্ধের বিশালাকার ভাস্কর্যমূর্তি

চরকা

www.pathagar.com

চাকমা মেয়েরা : পার্বত্য চট্টগ্রাম
ফটো : পাভেল রহমান

www.pathagar.com

জবা ফুল
ফটো : শিহাব উদ্দিন

জয়নুল আবেদিনের জলরঙ ছবি : দুম্‌কা—সাঁওতাল পরগানা

www.pathagar.com

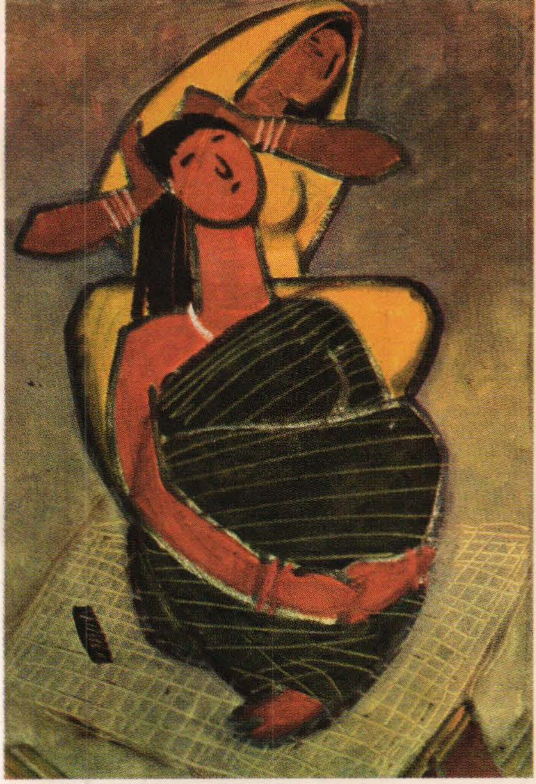

প্রসাধন

জয়নুল আবেদিনের ২টি তেলরঙ ছবি

সাঁওতাল

www.pathagar.com

একাত্তরের ঘাতক দালাল বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী জাহানারা ইমাম ও অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ড. আহমদ শরীফ, সৈয়দ হাসান ইমাম, আবদুর রাজ্জাক ও অন্যান্য
ফটো : পাভেল রহমান

www.pathagar.com

ঘুরী, মুইজউদ্দিন মুহম্মদ [? —১২০৬]

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আফগানিস্তানের ঘুর রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম মুহম্মদ বিন সাম শিহাবউদ্দিন। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি 'মুইজউদ্দিন বিন সাম' নাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারতের (দ্র) ইতিহাসে তিনি মুহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত।

১১৭৩ সালে মুহম্মদ ঘুরী তাঁর বড় ভাই ঘুরের সুলতান গিয়াসউদ্দিন মুহম্মদ কর্তৃক গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১১৭৫ সালে তিনি প্রথম ভারত আক্রমণ করে মুলতান অধিকার করেন। এরপর তিনি গুজরাট ও পাঞ্জাব অধিকার করেন। ১১৯১ সালে মুহম্মদ ঘুরী দিল্লির দিকে অগ্রসর হলে দিল্লি ও আজমীরের চৌহান রাজ পৃথ্বীরাজের হাতে পরাজিত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু পরের বছর আরো শক্তিবৃদ্ধি করে তিনি ভারত আক্রমণ করেন এবং রাজা পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও হত্যা করেন। তাঁর সুযোগ্য প্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন আইবক (দ্র) মীরাট, দিল্লি, রণথম্বোর, গুজরাট, কালিঞ্জর প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। অপর সেনাপতি ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খল্‌জি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ জয় করেন। ১২০৩ সালে ঘুরের সুলতান গিয়াসউদ্দিন মুহম্মদের মৃত্যু হলে মুহম্মদ ঘুরী গজনী, ঘুর এবং দিল্লির প্রকৃত অধিপতি হন।

১২০৬ সালে মুহম্মদ ঘুরী গুপ্তঘাতকের হাতে নির্মম-ভাবে নিহত হন।

খু. জা.

ঘূর্ণিঝড় ঝড় দ্র

ঘেরাও

বাংলা 'ঘের' শব্দের পিঠাপিঠি শব্দ 'ঘেরাও'। 'ঘের' অর্থ 'বেড়া' বা পরিবেষ্টিত স্থান'। 'ঘের' শব্দযুক্ত বাক্য বা বাক্যবন্ধ সেই সুদূর প্রাচীন কাল থেকে বাঙালির দৈনন্দিন লোকাচারে বা জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন: 'জালের ঘের দিয়ে মাছ ধরা', 'বেড়ার ঘের দিয়ে বাগানের গাছপালা রক্ষা করা' ইত্যাদি। অর্থাৎ 'ঘের' দেওয়া বা 'ঘেরাও' করার প্রতীকী অর্থ হচ্ছে শিকার যেন তার চারদিকের বেষ্টন ভেদ করে কোনো মতেই পালাতে সক্ষম না হয়, সে যেন বেষ্টনের ভেতরে নিরাপদে থাকে, তাকে যেন 'ঘের' দিয়ে বা 'ঘেরাও' করে রেখে ইচ্ছেমতো খেলানো যায় কিংবা এভাবে চাপের মধ্যে রেখে তাকে করতলগত বা সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করা যায়। 'ঘেরাও' শব্দের নিহিত মনস্তাত্ত্বিক অর্থ তাই প্রভূত তাৎপর্য বহন করে।

ঘেরাও আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত, তাৎক্ষণিক এবং সংগঠিত উভয় রূপেই সংঘটিত হতে পারে। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সৃষ্ট বা উদ্ভূত পরিস্থিতির চরিত্রের ওপর এবং যার বা যাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী জনগণের বা শ্রেণী-গোষ্ঠীর আন্দোলন বা সংগ্রাম পরিচালিত, তাদের উভয়ের কৌশল, সচেতনতা, প্রতিরোধপ্রস্তুতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

'ঘেরাও' কখনো শান্তিপূর্ণ, কখনো ধ্বংসাত্মক হতে পারে। বিষয়টি পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ক্ষমতাসীন সরকার এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যকার সমঝোতাগত পরিস্থিতি এবং সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতার ওপর নির্ভরশীল।

ভারত (দ্র) উপমহাদেশে 'ঘেরাও' বা 'অবরোধ' আন্দোলনের ইতিহাস যুগপ্রাচীন হলেও ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকেই বস্তুত এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এর সাক্ষ্য মেলে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে এদেশের সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত, কখনো-বা সংগঠিত আন্দোলনসম্পৃক্ত বিভিন্ন ঘটনা থেকে। এই আন্দোলনের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৮৭৭ সালে মধ্যভারতের অন্যতম শহর নাগপুরে একটি বস্ত্রকলে সংঘটিত প্রথম শ্রমিক ধর্মঘটের ভেতর দিয়ে।

১৯২০ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে ভারতের মাটিতে ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষকসংগঠন তথা পেশাভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন (দ্র) গড়ে উঠতে থাকে। এই সব ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে কারখানা

www.pathagar.com

সত্তরের দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অনেকগুলো সফল ঘেরাও আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন জননেতা মওলানা ভাসানী

অথবা মালিকপক্ষের দফতর কিংবা বাসভবন 'ঘেরাও' করে তাৎক্ষণিকভাবে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের ঘটনা বিরল নয়। ১৯৪০, ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে 'ঘেরাও' ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় বাংলাদেশে 'ঘেরাও' কর্মসূচি রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের অন্যতম জনপ্রিয় আন্দোলনগত পন্থার রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৯০-এর দশকের সূচনায় এরশাদের স্বৈরশাসনের পতনেও 'ঘেরাও' কর্মসূচি পালন করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

১৯২০-এর দশক পর্যন্ত প্রকাশিত কোনো ইংরেজি অভিধানে 'ঘেরাও' শব্দটির অন্তর্ভুক্তি লক্ষ করা যায় না। তবে ১৯৬০-এর দশকে প্রকাশিত কোনো কোনো ইংরেজি অভিধানে এই খাঁটি বাংলা শব্দটি স্থান করে নিয়েছে তার জনপ্রিয়তা ও তাৎপর্যগত নিজস্ব গুণেই।

আ. হু.

ঘোড়দৌড়

অশ্বারোহীদের প্রতিযোগিতামূলক দৌড়। নির্দিষ্ট কোনো মাঠে বা প্রাঙ্গণে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পণ বা বাজি ধরাই এর প্রধান আকর্ষণ।

ঘোড়দৌড় বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন—১. নির্দিষ্ট কয়েক মাইল আয়তনের একটি মাঠে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর অন্তর স্থাপিত বেড়া বা নালা ইত্যাদির বাধা ডিঙিয়ে কম সময়ে গন্তব্যে যাওয়া। এর নাম স্টিপল্ চেজ (Steeple-chase)। ২. কেবল বিভিন্ন প্রকারের বেড়া ডিঙিয়ে কম সময়ে ক্ষেত্র উত্তরণ। একে হার্ডল্ রেস (Hurdle-race) বলা হয়। ৩. সমতল ভূমিতে সোজা দৌড়। ঘোড়দৌড়ের খেলাগুলোর মধ্যে এটি বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয়।

প্রাচীন কালে বুনো ঘোড়াকে পোষ মানাবার অল্পকাল পরেই ঘোড়দৌড় খেলা প্রবর্তিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। অতীতে বিভিন্ন জাতি অশ্বারোহণে পারদর্শিতা অর্জন করলেও ইংল্যাণ্ডেই প্রথম ঘোড়দৌড়ের খেলার সূচনা হয়। সম্ভবত ক্রুসেড (দ্র) অভিযান শেষে ইংল্যাণ্ডের নাইটগণ (Knights) মধ্যপ্রাচ্যের (দ্র) জাতিসমূহের অশ্বারোহণচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজেদের জাতীয় ব্যসন 'জুয়া খেলা'র সঙ্গে মিলিয়ে এ যুগের ঘোড়দৌড় প্রবর্তন করেন। এ সময় মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইংল্যাণ্ডে অভিজাত ঘোড়ার আমদানি শুরু হয়। দ্বিতীয় হেনরির রাজত্বকালে ১১৭৪ সালে লণ্ডন শহরের প্রবেশদ্বারের বাইরে স্মিথফিল্ড পল্লীতে প্রতি শুক্রবার ঘোড়া বিক্রির বাজার বসত। প্রথম রিচার্ড-এর রাজত্বকালে

নগদ অর্থ বাজি রেখে ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবত এটিই ইংল্যাণ্ডে বর্তমানে প্রচলিত রীতির প্রথম ঘোড়দৌড়।

ঘোড়দৌড় বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও অভিজাত খেলা। প্রজননের উৎকর্ষ সাধন করে দ্রুতগতির অশ্ব জন্মানো সম্ভব হওয়ায় এখন ঘোড়ার দৌড়ের গতি অনেক বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে এবং এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। ইউরোপ (দ্র), উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা (দ্র), এশিয়া (দ্র) এবং আফ্রিকার (দ্র) প্রায় সকল দেশেই এটি একটি

www.pathagar.com

আকর্ষণীয় খেলা। ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজেরা এদেশে ঘোড়দৌড় খেলা প্রবর্তন করেন।

বাংলাদেশের (দ্র) রাজধানী ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানেও (দ্র) এক সময় ঘোড়দৌড় হত। তাই আগে এই উদ্যানকে বলা হত রেসকোর্স ময়দান।

সুজ. ব.

ঘোড়া

হাজার হাজার বছর ধরে ঘোড়া উপকারী জন্তু হিসাবে পরিচিত। রেলগাড়ি (দ্র) ও মোটরগাড়ি (দ্র) আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ঘোড়াই ছিল স্থলপথের একমাত্র বাহন। পূর্বে যুদ্ধ, মাল টানা ইত্যাদিতে ঘোড়া ব্যবহৃত হত। বর্তমানে প্রধানত খেলাধুলাতেই ঘোড়া ব্যবহৃত হয়।

ঘোড়া এক-খুরবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী (দ্র) প্রাণী। পৃথিবীর (দ্র) প্রায় সব অঞ্চলেই ঘোড়া দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, ২৫–৩০ সেন্টিমিটার উঁচু ইওহিপ্পাস (eohippus) নামক প্রাণী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে ঘোড়ার উৎপত্তি হয়েছে। এরা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে বাস করত।

ঘোড়ার মাংসপেশি অত্যন্ত মজবুত। এর লম্বা পাগুলো শক্তিশালী। তাই ঘোড়া ঘণ্টায় ৬০–৬৫ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। এর ঘ্রাণ, শ্রবণ, দৃষ্টি ও স্মৃতি-শক্তি অত্যন্ত প্রখর।

পৃথিবীতে প্রায় ১৫০ জাতের ঘোড়া রয়েছে। আকার–আকৃতিতে একেকটি ঘোড়া একেক রকম। ঘাড়ের উচ্চতা ১৪৭ সেন্টিমিটারের কম হলে পোনি (pony) অর্থাৎ টাট্টু ঘোড়া এবং বেশি হলে ঘোড়া বলা হয়। এর ওজন ৩৫০–১০০০ কেজি হয়। ৭৬ সেন্টিমিটার উঁচু আর্জেন্টিনার ফ্যালাবেলা পোনি ক্ষুদ্রতম ঘোড়া। ব্রিটেনের ১৭৩ সেন্টিমিটার উঁচু শায়ার ঘোড়া বৃহত্তম। এ ছাড়া থরোব্রেড, স্ট্যাণ্ডার্ডব্রেড, অ্যারাবিয়ান, বেলজিয়ান, শেটল্যাণ্ড পোনি, ওয়েল্‌শ্‌ পোনি উল্লেখযোগ্য জাত।

ঘোড়ার শক্তিশালী দাঁত থাকলেও ঘোড়া শুধু ঘাস ও শস্যদানা খায়। প্রায় ১১ মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী ঘোড়া একটি শাবক প্রসব করে। এটি ২–৩ বছরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ঘোড়া সাধারণত বিশ থেকে তিরিশ বছরের মতো বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

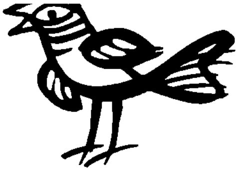

চ

চক (chalk)

খড়িমাটি, প্রকৃতিজাত ক্যালসিয়াম (দ্র) কার্বনেট। প্রাচীন কালের সামুদ্রিক আণুবীক্ষণিক জীবের (দ্র) কঠিন খোলস জমে খড়িমাটির সৃষ্টি হয়েছে। চক হল চুনা পাথরের (দ্র) নরম, সাদা ও ভঙ্গুর আকার। ইংল্যাণ্ডের সমুদ্র-উপকূলে প্রায় হাজার ফুট উঁচু চকের পাহাড় দেখা যায়। চককে উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) গ্যাস ও চুন (দ্র) পাওয়া যায়। কৃত্রিমভাবে তৈরি চককে প্রেসিপিটেড চক বলে। অম্ল-রোগের চিকিৎসায় এই জিনিসটি ব্যবহৃত হয়। স্কুল-কলেজে ব্ল্যাক বোর্ডে যে পেন্সিল-চক দিয়ে লেখা হয়, তা সাধারণত ক্যালসিয়াম সালফেট দ্বারা তৈরি হয়, কার্বনেট দ্বারা নয়।

আ. হ. খ.

চকোলেট (chocolate)

এক ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবার। কোকো (দ্র) নামক এক ফলের বীজ থেকে এটি উৎপাদিত হয়। কোকো ফল পাকলে ভেতর থেকে বীজ বের করে গাঁজন, সিদ্ধ, পেষণ ইত্যাদি নানা পদ্ধতিতে প্রথমে কোকোমাস বা চকোলেট লিকার উৎপাদন করা হয়। সেই লিকারের সঙ্গে দুধ (দ্র), চিনি (দ্র), অতিরিক্ত কোকো বাটার ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরি করা হয় চকোলেট। পৃথিবীর (দ্র) অনেক কিছুর মতো চকোলেটও মানুষের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফল।

ব্রাজিলের আমাজন অঞ্চলে প্রথম কোকো গাছ আবিষ্কৃত হলেও ইংল্যাণ্ডেই প্রথম চকোলেট পানীয় কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু সেগুলো তেমন সাফল্য দেখাতে পারে নি। ১৭৬৫ সালে নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে আমেরিকার (দ্র) ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ অঙ্গরাজ্যে বিশ্বের প্রথম আধুনিক চকোলেট পানীয় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৮ সালে কন্‌রাড ভন্‌ হাউটেন্‌ নামে এক ওলন্দাজ রসায়নবিদ তরল চকোলেট

www.pathagar.com

থেকে অতি তৈলাক্ত চকোলেট বাটার নিংড়ে নিয়ে তা দিয়ে কোকো পাউডার প্রস্তুত করেন। এর পরে আরো দু' দশক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে কোকো বাটার এবং চিনি মিশিয়ে চকোলেট পেস্ট তৈরি করা হয়। এই চকোলেট পেস্ট থেকেই খাবার চকোলেট প্রস্তুত হতে থাকে।

১৮৭৬ সালে সুইজারল্যাণ্ডের একটি চকোলেট তৈরির কারখানা কোকো বীজের গুঁড়ো (কোকোনিব), চিনি, চর্বি (দ্র) ও ঘনীভূত দুধ সহযোগে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম উন্নত ধরনের চকোলেট প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। পিঠার আকারে সংরক্ষণযোগ্য এই চকোলেটই পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে ছোট–বড় সবার জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এখন শুধু মিষ্টি চকোলেটই তৈরি হয় না, টক, ঝাল, মিটেকড়া হরেক স্বাদের চকোলেট হয়ে থাকে। এ ছাড়াও কেক-পেস্ট্রি-বিস্কুট, কাস্টার্ড, পুডিং, আইসক্রিম (দ্র), সস্ ইত্যাদি তৈরির কাজেও পাউডার চকোলেট বা তরল চকোলেট ব্যবহৃত হয়।

সুজ. ব.

চক্ষু / চোখ

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখ হচ্ছে দর্শন-ইন্দ্রিয়। মানুষের দুটো চোখ আকৃতিতে মোটামুটিভাবে বলের মতো গোল। অক্ষিগোলকের প্রতিটি একটি করে অক্ষিকোটরে অবস্থিত। চোখের কার্যক্রমের সঙ্গে ক্যামেরার (দ্র) কার্যক্রমের তুলনা করা হয়।

চোখের উপরে ও নিচে চোখের পাতা থাকে। চোখের পাতা চোখকে আঘাত, ধুলোবালি ও রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করে। প্রতিটি চোখের সঙ্গে সংযুক্ত ছয়টি মাংসপেশির সাহায্যে চোখকে বিভিন্ন দিকে ঘোরানো যায়।

অক্ষিগোলক চোখের প্রধান অংশ। অশ্রুগ্রন্থি অক্ষিগোলকের উপরে থাকে। এই গ্রন্থি অশ্রু তৈরি করে এবং চোখের আর্দ্রতা বজায় রাখে।

অক্ষিগোলকের তিনটি স্তর : স্ক্লেরা (sclera), কোরয়ড (choroid) ও রেটিনা (retina)। স্ক্লেরা বাইরের স্তর, যা শক্ত কোষকলা দিয়ে তৈরি। স্ক্লেরার সামনের স্বচ্ছ অংশের নাম কর্নিয়া (cornea)। কর্নিয়ার মধ্য দিয়ে চোখে আলো প্রবেশ করে। চোখের পাতার অভ্যন্তরভাগ এবং কর্নিয়া ও

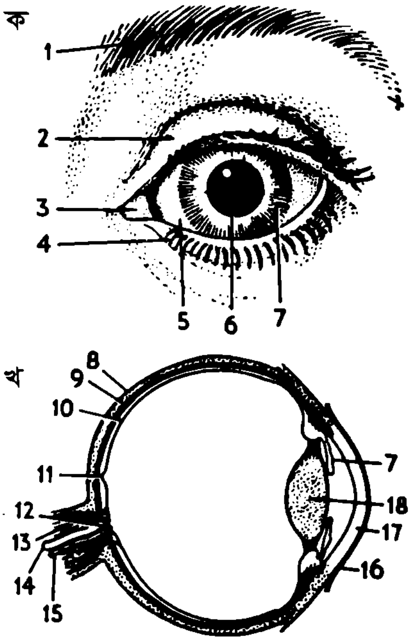

মানবচক্ষু : ক. বহিরঙ্গ খ. চক্ষুগোলকের আনুভূমিক কর্তিত রূপ ১. ভুরু ২. চোখের পাতা ৩. চোখ মিটমিট করায় সংশ্লিষ্ট ঝিল্লি ৪. চোখের পাতার লোম ৫. নেত্রগোলক ৬. তারারন্ধ্র ৭. কনীনিকা খ. ৮. শ্বেতপটল ৯. কৃষ্ণমণ্ডল বা রঞ্জক স্তর ১০. অক্ষিপট ১১. হলুদবিন্দু (ম্যাকুলা ল্যুটিয়া) ১২. কৃষ্ণবিন্দু বা অক্ষিচক্র ১৩. রক্তবাহ ঘিরে অক্ষিস্নায়ু ১৪. অক্ষিপট ধমনী ১৫. অক্ষিপট শিরা ১৬. নেত্রবর্ত্ম (নেত্রঝিল্লি) ১৭. অচ্ছোদপটল (নেত্রস্বচ্ছ) ১৮. পরকলা (লেন্স)

স্ক্লেরার মধ্যকার অংশ কন্‌জাংটিভা (conjunctiva) নামক পাতলা ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে।

কোরয়ড নামক মধ্যস্তরে অসংখ্য রক্তনালি ও কালো রঞ্জক পদার্থ (pigment) রয়েছে। কোরয়ডের সামনের দিকে সিলিয়ারি (ciliary) ও আইরিস (iris) নামক দুটো পেশি যুক্ত থাকে।

আইরিস অনৈচ্ছিক মাংসপেশি দিয়ে তৈরি গোল পর্দা। আইরিসের মাঝখানে চোখের মণি (pupil) বা চক্ষুতারা নামক একটি ছিদ্র থাকে। আইরিসের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে চক্ষুতারা ছোট ও বড় হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য ভেতরে আলোকরশ্মির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।

কোরয়ড চোখের লেন্সের (lens) বা পরকলার অবস্থান নিশ্চিত করে। লেন্সের সামনে ও পেছনে তরল ও জেলি সদৃশ পদার্থে ভর্তি প্রকোষ্ঠ রয়েছে।

রেটিনা চোখের অভ্যন্তরে অবস্থিত আলোকসংবেদী

www.pathagar.com

স্তর। রেটিনাতে রড্স্ (rods) ও কোন্স্ (cones) নামক আলোকরশ্মিগ্রাহী বিশেষ স্নায়ুকোষ থাকে। রড্স্ অল্প আলোতে এবং কোন্স্ বেশি আলোতে দেখতে সাহায্য করে। রেটিনা থেকে স্নায়ুগুচ্ছ একত্রিত হয়ে অক্ষিস্নায়ু (optic nerve) গঠন করে মস্তিষ্কে পৌঁছেছে। এর মাধ্যমেই দর্শন-উদ্দীপনা মস্তিষ্ককোষে পৌঁছায়।

কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব পর্যায়ক্রমে কর্নিয়া, জলীয় পদার্থের প্রকোষ্ঠ, লেন্স ও জেলির মতো পদার্থের মধ্য দিয়ে রেটিনার উপর পড়ে উল্টো প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। কিন্তু মস্তিষ্ককোষের ক্রিয়ায় সেই প্রতিবিম্ব আমরা সোজাভাবে দেখি।

চোখে বিশেষ ধরনের জীবাণু সংক্রমণের নাম চোখ ওঠা। কোনো কারণে কর্নিয়া সাদা অস্বচ্ছ হয়ে গেলে মৃত ব্যক্তির কর্নিয়া সংযোজন করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া যায়।

চোখ ভাল রাখার উপায় হচ্ছে নিয়মিত চোখ পরিষ্কার করা এবং সুষম ও ভিটামিন (দ্র)-যুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা।

আ. আ. হা.

চক্ষুরোগ

চোখের বিভিন্ন অংশে সৃষ্ট রোগ (দ্র) চক্ষুরোগ নামে অভিহিত। নানা ধরনের চক্ষুরোগের মধ্যে চোখে ছানিপড়া, গ্লোকোমা, চোখে জীবাণু সংক্রমণ, রাতকানা রোগ, চোখের প্রদাহ, অন্ধত্ব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চোখে ছানিপড়া (cataract) রোগ সাধারণত বার্ধক্যজনিত কারণে দেখা দেয়। তবে ডায়াবেটিস (দ্র) রোগে অল্প বয়সেও ছানি পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এ রোগে চোখের লেন্সের কিছুটা অথবা সম্পূর্ণ অংশ অস্বচ্ছ হয়ে যায়। ফলে আলোকরশ্মি চোখে প্রবেশ করতে না পারায় রোগীর দেখতে অসুবিধা হয়। ছানি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অস্বচ্ছ লেন্স অপসারণ করার পর চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স (contact lens) চোখে পরিধানের মাধ্যমে ছানিপড়া রোগী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে থাকে।

চোখের উপরিভাগে কর্নিয়া নামক অংশে আঘাত, সংক্রমণ বা অস্বচ্ছতা দেখা দিতে পারে। অস্বচ্ছ কর্নিয়া অন্ধত্বের অন্যতম কারণ। এর চিকিৎসার একমাত্র উপায় কর্নিয়া সংস্থাপন।

গ্লোকোমা (glaucoma) রোগে চোখের ভেতরকার তরল পদার্থের সঞ্চলন ও বিশোষণে গোলযোগ দেখা দেওয়ার কারণে উক্ত তরল পদার্থের চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে অক্ষিস্নায়ুতে চাপ পড়ে এবং চোখে ব্যথা অনুভূত হয়। সময় মতো চিকিৎসা করা না হলে চাপের কারণে অক্ষিস্নায়ু (optic nerve) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অন্ধত্ব সৃষ্টি হতে পারে। ঔষধ (দ্র) সেবন এবং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এর চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

জীবাণু (দ্র) সংক্রমণের ফলে চোখের বিভিন্ন অংশে রোগ দেখা দিতে পারে। তার মধ্যে চোখের পাতায় গুটি আকৃতির আঞ্জনি (sty) সৃষ্টি, চোখের পাতার ভেতরে প্রদাহ বা 'চোখ ওঠা' (conjunctivitis) উল্লেখযোগ্য। 'চোখ ওঠা' রোগ খুবই ছোঁয়াচে।

শরীরে ভিটামিন (দ্র)-এ'র ঘাটতি পড়লে শিশুদের 'রাতকানা' রোগ, এমনকি অন্ধত্বও দেখা দিতে পারে। অক্ষিগোলকের পেছন দিকে অবস্থিত অক্ষিপট বা রেটিনা (retina) নামক অংশে ক্যান্সার (দ্র), চিকিৎসাবিহীন রাতকানা রোগ, দীর্ঘকালীন ডায়াবেটিস রোগ, বিশেষ ধরনের রক্তাল্পতা ইত্যাদি কারণে রেটিনা নষ্ট হয়ে অন্ধত্ব সৃষ্টি করতে পারে। এ ছাড়াও চোখে ক্ষীণদৃষ্টি (myopia), দীর্ঘদৃষ্টি (hypermetropia) ইত্যাদি দৃষ্টিসংক্রান্ত গোলযোগ সচরাচর দেখা যায়, যা চশমা গ্রহণের মাধ্যমে নিরাময়যোগ্য।

সি. না. হ.

চট্টগ্রাম

শহর, বন্দর, জেলা ও বিভাগ। চট্টগ্রাম বিভাগ বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা, বান্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও কুমিল্লা নিয়ে গঠিত। বর্তমানে এই বিভাগে আছে নবগঠিত জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালি, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন। চট্টগ্রাম জেলা ২০টি থানা নিয়ে গঠিত।

এ পর্যন্ত চট্টগ্রামের ৪৮টি নাম পাওয়া যায়—সুহ্মদেশ, ক্লীং, রম্যভূমি, চাতগাঁও, চট্টল, চৈত্যগ্রাম, সপ্তগ্রাম, চট্টলা, চক্রশালা, শ্রীচট্টল, সাতগাঁও, রোসাং, চাটিগাঁ, পুষ্পপুর, চরতল, চিতাগঞ্জ, শ্যাৎ-গাঙ্গ, চিৎ-তৌৎ-গৌং, চাটিগ্রাম ইত্যাদি। পণ্ডিত বার্ণোলির মতে, আরবি শব্দ 'শ্যাৎ' অর্থ

www.pathagar.com

উপরে : চট্টগ্রাম শহরে সাধারণ রাস্তা
নিচে : কোর্ট বিল্ডিং

বদ্বীপ, 'গাঙ্গ' অর্থ গঙ্গা নদী—এই দু'টি শব্দ যুক্ত করে তৈরি শ্যাৎগাঙ্গ শব্দ বিবর্তিত হয়ে চট্টগ্রাম নামের উদ্ভব হয়েছে। আবার জানা যায়, খ্রিস্টীয় ১০ম শতকের মধ্যবর্তী কাল অবধি ফেনী নদীর দক্ষিণ তীর থেকে নাফ নদীর উত্তর তীরের মধ্যবর্তী ভূভাগটির বর্তমান নাম চট্টগ্রাম প্রচলিত হয় নি। তখন এই অঞ্চলটি আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। সেই সময়কার আরাকানরাজ সুলত ঈং চন্দয় ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে নিজ অধিকৃত রাজ্যের উত্তরাংশে বিদ্রোহী সুরতনকে দমন করে সসৈন্য কুমিরায় এসে পৌঁছান। সেখানে একটি পাথরের বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করে তাতে 'চিৎ-তৌৎ-গৌং' বাণী লিখে দেন। এই বাণীর অর্থ 'যুদ্ধ করা অনুচিত'। তখন থেকে এই ভূভাগটির নাম হয় চিৎ তৌৎ গৌং এবং আস্তে আস্তে এই শব্দ বিবর্তিত হয়ে 'চট্টগ্রাম' নামের উদ্ভব হয়েছে। আবার চাটিগাঁ, চাটগাঁও থেকে পরে চট্টগ্রাম হয়েছে বলেও মনে করা হয়। পর্তুগিজেরা ১৭শ শতকে এই শহরের নাম দিয়েছিল পোর্তোগ্রান্দে (Porto Grande), মোগলেরা এর নাম দেয় ইসলামাবাদ।

এই জেলা প্রাচীন কালে হিন্দুরাজ্যের অংশ ছিল, ৯ম শতকে আরাকানের বৌদ্ধ রাজা কর্তৃক শাসিত হয়, ১৩শ শতকে মুসলিম অধিকারে যায়, ১৬শ শতকে আরাকানের রাজার অধীন হয়, ১৭শ শতকে মোগলেরা জয় করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নবাব মীর কাশিমের (দ্র) নিকট থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে এর দখল পায়। ১৯৪৭ সালে ইংরেজেরা চলে যায়।

চট্টগ্রাম জেলায় মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও কিছু উপজাতি বাস করে। এই জেলায় মুসলমান, হিন্দু ও বৌদ্ধদের কয়েকটি তীর্থস্থান রয়েছে। সীতাকুণ্ড, বাড়বকুণ্ড ও কৈবল্যধাম হিন্দুদের তীর্থস্থান। এখানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সীতাকুণ্ডের শৃঙ্গে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ শিলালিপি আছে। চট্টগ্রাম 'বারো আউলিয়ার দেশ' নামে খ্যাত।

চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাঞ্চল পার্বত্য, পশ্চিমে দীর্ঘ সমুদ্রতটভূমি। পূর্বাংশে একটি অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী উপকূলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থিত। এরূপ তিনটি সমান পর্বতশ্রেণী আছে। মধ্যের শ্রেণীটির উত্তরাংশের নাম সীতাকুণ্ড। জেলার সর্বোচ্চ স্থান সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ, উচ্চতা ৩৪৬ মিটার বা ১৫৫ ফুট। ফেনী, হালদা, সাঙ্গু ও কর্ণফুলি এই জেলাকে বিধৌত করছে। ধান (দ্র), চা (দ্র), রাবার

www.pathagar.com

(দ্র), চামড়া ও সার (দ্র) প্রধান ফসল ও উৎপন্নদ্রব্য। পর্বতগুলো বেলে মাটি ও কাদা থেকে উৎপন্ন পাথরে গঠিত। এ ছাড়া বাকি অংশ নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত।

শহর চট্টগ্রাম কর্ণফুলি নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরের (দ্র) তীরে অবস্থিত। মোহনা থেকে ১০ মাইল ভেতরে বন্দরের জেটি আছে। এখানে জাহাজ থেকে জিনিসপত্র ওঠানো-নামানো হয়। এক সময় এই নগরীতে রেলওয়ে সদর দফতর ছিল। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের (দ্র) বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর। এই বন্দর দিয়ে পাট (দ্র), চা, কাঁচা চামড়া, তৈরি পোশাক, সার, চিংড়ি ইত্যাদি রপ্তানি হয় এবং পেট্রোল, পেট্রোলিয়াম (দ্র)-জাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, গাড়ি, ভোজ্য তেল, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি আমদানি হয়। চট্টগ্রাম শহরের লোকসংখ্যা ১৫,৬৬,০০০ (১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী)।

নগরীতে স্থানে স্থানে পাহাড় থাকায় ভূদৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। বাটালি পাহাড় ও কাছারি পাহাড় থেকে সারা শহর দেখা যায়। শহরে মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাডেট কলেজ, রেলকারখানা, তেল-শোধনাগার, ড্রাই ডক, ইস্পাত ও সার কারখানা, বস্ত্র ও পাটকল, কার্পেট তৈরির কারখানা, গাড়ি সংযোজনের কারখানা ইত্যাদি রয়েছে। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পনগরী। চট্টগ্রামে হালিশহর এলাকায় রপ্তানি প্রক্রিয়া জোন (EPZ= Export Processing Zone) অবস্থিত। পতেঙ্গায় একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে। শহরের অদূরে আছে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিদ্যালয়। কাঠ ও আসবাবপত্রশিল্পের জন্য এই শহর প্রসিদ্ধ। এই শহরে পর্তুগিজ আমলের গির্জা, শিখদের গুরুদ্বার, চট্টেশ্বরী মন্দির, বৌদ্ধ বিহার (দ্র) আছে। জামে মসজিদ, বায়েজিদ বুস্তামির (দ্র) দরগাহ্, হযরত বদরুদ্দীন আল্লামা ও হাজী আমানত শাহের (দ্র) দরগাহ্ বিখ্যাত। নগরীর ফয়'স লেক (Foy's Lake)—যা লোকমুখে ফয়েজ লেক নামে চালু হয়ে গেছে— দর্শনীয় স্থান।

চট্টগ্রাম মৎস্যবন্দর হিসাবে বিখ্যাত। এই জেলায় অনেকগুলো চিংড়ি উৎপাদনের খামার আছে। বঙ্গোপসাগর থেকে ধৃত মাছ এবং শুঁটকির জন্য এই নগরী বিখ্যাত। দেশের প্রয়োজনীয় লবণ (দ্র) উৎপন্ন হয় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার (দ্র) জেলায়।

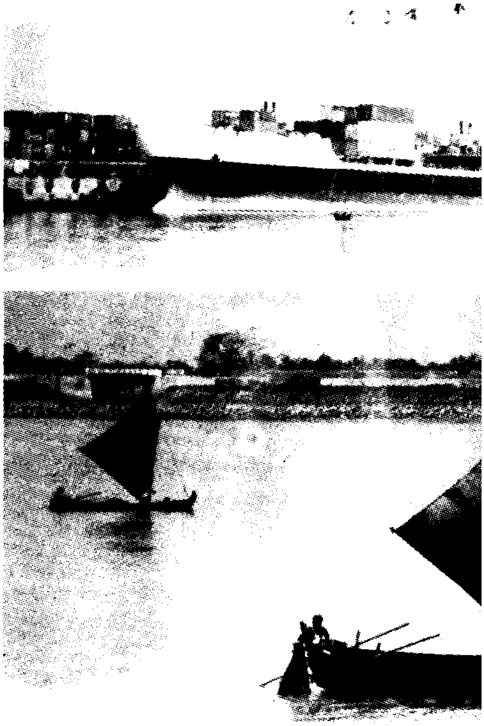

কর্ণফুলি নদীর তিনটি দৃশ্য

ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য এই জেলা ও শহর 'বীর চট্টলা' নামে খ্যাত। মাষ্টারদা সূর্য সেনের (দ্র) নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে ইংরেজদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের (দ্র) শুরুতে কালুঘাটে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র' স্থাপিত হয় এবং সেখান থেকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়। পরে এই বেতারকেন্দ্রের নাম হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' (দ্র)।

চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দ্বারা প্রভাবিত। এ জন্য এখানে আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি। বছরে গড় বৃষ্টিপাত ৩০৫০ মিমি বা ১২২ ইঞ্চি। গড় আর্দ্রতা ৮১%। গ্রীষ্মকালে গড় উত্তাপ ২৮° সেলসিয়াস, শীতকালে ২১° সেলসিয়াস। জেলায় প্রায় প্রত্যেক বছর ঘূর্ণিঝড় (দ্র) ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হয় এবং এতে প্রচুর প্রাণহানি হয়।

বি. ব.

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম (দ্র) শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তরে হাটহাজারীতে ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭টি অনুষদ, ২১টি বিভাগ ও ২টি ইনস্টিটিউট আছে। ১৯৯০-৯১ সালে এখানে শিক্ষার্থী ছিল ৬,৯৯৭ জন, শিক্ষক ছিলেন ৪২৬ জন এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিলেন ১,৬২৩ জন। আবাসিক হল আছে ৭টি। ১৯৯০-৯১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বই ও সাময়িকী ছিল ১,৪৮,৯৫১টি। ১৯৯০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় ১৪,৭৪০ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ সংক্ষেপে 'চাকসু' নামে পরিচিত।

মে. খা.

চড়ুই

এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি পাখি। চড়ই, চড়াই ও চটকা নামেও এ পাখি পরিচিত। চড়ুই পাস্‌সেরিফর্মেস্ (Passeriformes) বর্গের ফ্রিঙ্গিল্লিদি (Fringillidae) গোত্রভুক্ত। এরা গাছের

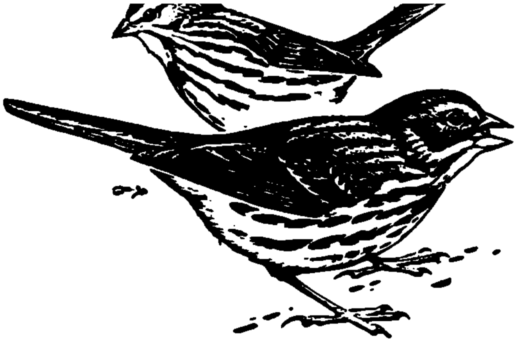

ডালে ও ভূমিতে বিচরণ করে। এদের দেহের দৈর্ঘ্য ১৪–১৮ সেমি (৫–৭ ইঞ্চি) পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের প্রতি পায়ে চারটি আঙুল থাকে। আঙুলগুলোর একটি পেছনের দিকে এবং অপর তিনটি সামনের দিকে ছড়ানো। আঙুলের এই বিশেষ ধরনের বিন্যাস চড়ুইকে এক দিকে মাটির উপর এবং অপর দিকে গাছের ডালে বিচরণে সাহায্য করে। এদের ঠোঁট ছোট, দৃঢ় এবং ব-এর মতো। এরা গাছের নতুন পাতা, মুকুল, ছোট ফল, শস্যবীজ এবং কীটপতঙ্গ (দ্র) খেয়ে থাকে। সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে এরা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রচণ্ড কলরব করে। বাংলাদেশ (দ্র), ভারত (দ্র) ও নেপালের (দ্র) বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক জাতের চড়ুই দেখা যায়। এদের মধ্যে গৃহ-চটক (house-sparrow), তরু-চটক (tree-sparrow), খয়েরি তরু-চটক (brown tree-sparrow) ও পীতগণ্ড চটক (yellow throated sparrow) উল্লেখযোগ্য। গৃহ-চটক লোকালয়ে নীড় বেঁধে বাস করে এবং লোকালয় থেকেই খাদ্য জোগাড় করে। বছরে কয়েক বার বাসা বেঁধে প্রতি বারে এরা ৩ থেকে ৫টি ডিম পাড়ে। বাসা বাঁধার কাজে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই অংশ নেয়। পীতগণ্ড চড়ুই বনাঞ্চলে গাছের কোটরে নীড় নির্মাণ করে। খয়েরি চটক ও তরু-চটক লোকালয়ের কাছাকাছি ফসলের জমিতে ও বনভূমিতে চলাফেরা করে।

মু. আ.

চণ্ডাল

নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। স্মৃতিশাস্ত্রে চণ্ডালকে হিন্দু সমাজের নিম্নতম ও অস্পৃশ্য (দ্র) জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ চণ্ডালের ছোঁয়ায় উচ্চবর্ণের লোকদের দেহ অশুদ্ধ বা অপবিত্র হত। উচ্চবর্ণের লোককে স্পর্শ করার

www.pathagar.com

অপরাধে চণ্ডালের লাঞ্ছিত হবার কথাও স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতকেও (দ্র) এই ধরনের অনেক কাহিনী আছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের সূচনালগ্নে ভারত (দ্র) ভ্রমণকারী চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (দ্র)-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে চণ্ডালদের আবাস ছিল নগরের বাইরে। শহরে বা বাজারে প্রবেশ করার সময় দু'টি কাঠির সাহায্যে শব্দ করে তাদের আগমনবার্তা জানিয়ে দিতে হত, যাতে অন্যরা তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে যেতে পারে। বর্তমানে বাংলায় প্রচলিত চাঁড়াল শব্দটি প্রাচীন চণ্ডাল শব্দেরই রূপান্তর। উনবিংশ শতকেও বাংলার চাঁড়াল এবং দক্ষিণ ভারতের 'পারিয়া' জাতির অবস্থা চণ্ডালদের অনুরূপ ছিল।

সুজ. ব.

চণ্ডী

পার্বতীর নানা রূপ। রূপভেদে তিনি দুর্গা (দ্র), তিনি কালী (দ্র)। আবার তিনি চণ্ডী। চণ্ডী বা চণ্ডিকার অর্থ প্রচণ্ডা দেবী। তিনি মহিষাসুরকে এবং শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুই দৈত্যকে বধ করেছিলেন। চণ্ডী দেবীর প্রাচীনতম নাম দু'টি হল উমা বা হৈমবতী ও দুর্গা। ইনিই গৌরী। দুর্গা নামের আসল অর্থ ছিল দুর্গম স্থানের অধিষ্ঠাত্রী। পরে অর্থ হয়েছে দুর্গে অর্থাৎ সঙ্কটে ত্রাণকর্ত্রী। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে (দ্র) চণ্ডীমঙ্গলের (দ্র) কাহিনী-কাব্য আছে। এতে দুর্গ বা অরণ্যের চণ্ডীর মাহাত্ম্য গাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁর বিশিষ্ট নাম অভয়া (বা অভয়দায়িনী) চণ্ডী। ইনি অরণ্যনিবাসিনী এবং এঁর বাহন (বা প্রতীক) গোধা বা গো-সাপ।

উমা-হৈমবতী ও দুর্গা-চণ্ডী নামের মধ্যে দু'টি স্বতন্ত্র দেবী কল্পনা করা হয়। উমা-হৈমবতী সুবেশা ও সুন্দরী। তিনি মহারাজ হিমালয়ের কন্যা এবং পরমপুরুষ শিবের (দ্র) গৃহিণী। আর দুর্গা-চণ্ডী সরাসরি শিবের গৃহিণী নন, তিনি শিবগৃহিণীতে রূপান্তরিতা হয়েছেন। তিনি উগ্রা, বাহু-অস্ত্রধারিণী, দৈত্য বধ করার সময় দশভুজা বা অষ্টভুজা। তাঁর বাহন সিংহ। এ জন্য তাঁর আরেক নাম সিংহবাহিনী। বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীতে এই উমা-হৈমবতী ও দুর্গা-চণ্ডী প্রায় এক হয়ে গেছেন। এ ছাড়াও দেবী চণ্ডীর অনেক রূপ—বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নেকড়াই-চণ্ডী, ইটাল-চণ্ডী, বসন্ত-চণ্ডী, বোয়াঁই-চণ্ডী, সগড়াই-চণ্ডী ইত্যাদি। চণ্ডীমঙ্গলের দেবতা বা দেবী অভয়া মঙ্গলচণ্ডী হিন্দুসম্প্রদায়ের নারী-সমাজে গৃহকল্যাণের দেবী। এ জন্য যাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধা করেন তাঁদের বাড়িতে নববধূর একটি করে মঙ্গলচণ্ডীর ঝাঁপি থাকে। এই ঝাঁপিই দেবীর প্রতীক।

বি. ব.

চণ্ডীদাস

বৈষ্ণব পদাবলীর (দ্র) কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস সবচাইতে খ্যাতিমান। বাংলা সাহিত্যের (দ্র) পাঠক মাত্রেই তাঁর নাম জানেন। বৈষ্ণব পদের আলোচনায় চণ্ডীদাসের নাম সবার আগে মনে পড়বে। কিন্তু পদাবলীর চণ্ডীদাস এক নয়, একাধিক। পদাবলী আধ্যাত্মিক প্রেমের গান। এ গানে কৃষ্ণকে (দ্র) ভগবান আর রাধাকে (দ্র) ভক্তরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ষোল শতকে বাংলাদেশে (দ্র) বৈষ্ণবধর্মের (দ্র) প্রসারের ফলে রাধাকৃষ্ণ পদাবলী রচিত হতে শুরু করে। কিন্তু সে সময়ে পদাবলী ভক্ত বৈষ্ণবদের ও কীর্তনগায়কদের মুখে মুখে ফিরত। আঠারো শতক থেকে সেগুলো এক সঙ্গে সঙ্কলিত হতে থাকে। প্রত্যেকটি পদাবলীসঙ্কলনে চণ্ডীদাসের পদ থাকত, যেহেতু চণ্ডীদাস সবচেয়ে পরিচিত কবি। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদগুলো পড়ে দেখা যায়, কোনো পদ খুব ভাল, আবার কোনো পদ খুব খারাপ। একই কবি খুব ভাল লিখবেন আবার খুব খারাপ লিখবেন, এ হতে পারে না। এতেই সন্দেহ হল যে চণ্ডীদাস নামের পদকার এক জন নয়। ভাষাভঙ্গি দেখেও বোঝা গেল, এগুলি এক কবির লেখা নয়। এ ছাড়া চণ্ডীদাস নামেরও নানা ভনিতা পাওয়া গেল। কোনো চণ্ডীদাস দ্বিজ, কোনো চণ্ডীদাস দীন, কোনো চণ্ডীদাস আদি। পরে সহজিয়া চণ্ডীদাস নামের আরেক চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া গেল। এভাবে পদাবলীতে ভিন্ন ভিন্ন চণ্ডীদাসের নাম জানা যায়। চণ্ডীদাসের সঠিক সংখ্যা যে কত তা নিয়ে যে জটিলতা, তাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বলা হয় 'চণ্ডীদাস-সমস্যা'। এ সমস্যা আরো জটিল হল ১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ নামের এক পণ্ডিত কর্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথি আবিষ্কারে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস। সুতরাং বড়ু ভনিতায় আরেক চণ্ডীদাসকে পাওয়া গেল। এত সব চণ্ডীদাসের মধ্যে চণ্ডীদাস প্রকৃতপক্ষে কত জন এবং এঁরা কোন্ কোন্ সময়ের কবি তা নিয়ে বাংলা

www.pathagar.com

সাহিত্যের পণ্ডিতেরা দীর্ঘ বিতর্ক করেছেন। এ বিতর্কের স্থায়ী কোনো মীমাংসা হয় নি। তবে চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানে এখন পর্যন্ত সবচাইতে ভাল আলোচনা করেছেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (দ্র)। তিনি নানা যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন, চণ্ডীদাস তিন জন—বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং দীন চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা এবং তিনি শ্রীচৈতন্যের (দ্র) আগের কবি। দ্বিজ ও দীন পদাবলীর কবি। তবে দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্যের সমসাময়িক আর দীন চণ্ডীদাস চৈতন্যের পরবর্তী কবি ও তাঁর বেশির ভাগ পদের মান ভাল নয়।

চৈতন্যের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করে জানা যায়, চৈতন্যদেব এক জন চণ্ডীদাসের পদ শুনে পরম তৃপ্তি পেতেন। পণ্ডিতদের অনুমান, যে চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে বড়ু-দ্বিজ-দীন ইত্যাদি কোনো ভনিতা নেই, সেই চণ্ডীদাসের পদই চৈতন্য শুনতেন। এঁকেই এক নামে পদাবলীর চণ্ডীদাস বলা হয়। ইনিই সেই বিখ্যাত কবি।

এঁর নামে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। বলা হয়, এর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে। তিনি চৌদ্দ শতকের শেষের দিকের অথবা পনের শতকের প্রথম দিকের কবি। নান্নুরে বাসলি বা সরস্বতী দেবীর মন্দির আছে। চণ্ডীদাসের পিতা এই মন্দিরের পূজারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর চণ্ডীদাস মন্দিরের পূজার কাজের দায়িত্ব পান। এতে বলা হয়, চণ্ডীদাসের জন্ম ব্রাহ্মণ বংশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে পদাবলীর আরেক বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতির সাক্ষাতের কথাও চালু আছে। আসলে এসব কাহিনী কতখানি সত্য তা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু চণ্ডীদাসের নামে জাদু আছে। আমরা বিভিন্ন ভনিতার আড়ালে এক জন চণ্ডীদাসকেই কল্পনা করি। এঁর পদ খুবই সুন্দর এবং সহজেই মন আকর্ষণ করে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মতো অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় কবিতা লেখেন নি। খুব সহজ সরল সাধারণ ভাষায় তিনি পদ লিখেছেন আর তাতেই তাঁর অসাধারণ কবিত্বশক্তি ফুটে উঠেছে। তাঁর পদ পড়লে মনের মধ্যে নিবেদনের ভাব সৃষ্টি হয়। খুবই আন্তরিক কবি তিনি। তিনি এমন কিছু পদ রচনা করেছেন, যেগুলি পদাবলী সাহিত্যের চিরকালের সম্পদ হিসাবে মর্যাদা পেয়েছে। সে জন্য চণ্ডীদাসের নাম ঘরে ঘরে।

আ. ক.

চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডী (দ্র) এক জন দেবী। তিনি পার্বতীর রূপভেদ। তাঁর অন্য এক নাম দুর্গা। এই চণ্ডী দেবী ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা অনার্যদের দেবী বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। তারপর এই দেবীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের নানা প্রভাব পড়ে। ১৬শ শতকের চণ্ডীকাব্যে চণ্ডী দেবী স্থায়ী আসন করে নেন।

চণ্ডী দেবীকে অবলম্বন করে যে মঙ্গলকাব্য রচিত হয় তার নাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (দ্র)। তাঁর উপাধি ছিল কবিকঙ্কণ। তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলায়। পরে তিনি মেদিনীপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হন। সেখানে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। মানসিংহের সময় তিনি জীবিত ছিলেন। মুকুন্দরামের এই কাব্যে দু'টি পৃথক কাহিনী পাওয়া যায়। প্রথমটিতে ব্যাধদম্পতি কালকেতু ও ফুল্লরার জীবন প্রসঙ্গে চণ্ডীদেবীর বরপ্রদান ও নানা মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় কাহিনী খুল্লনা ও লহনাকে নিয়ে লেখা। এই কাহিনীতে ধনপতি খুল্লনার ছেলে শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল (দ্র) গমনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানেও চণ্ডী দেবীকে অবহেলা ও পরে শ্রদ্ধাভক্তি করায় ধনপতির সুখ-সমৃদ্ধি ফিরে আসে। এই কাব্য রচনার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের (দ্র) উপন্যাসের (দ্র) বীজ নিহিত আছে বলে গণ্য করা হয়। বাঙালি জীবনের ঘরকন্না, সুখ-দুঃখ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা এখানে পাওয়া যায়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য বিখ্যাত কবিরা হলেন মানিক দত্ত ও দ্বিজমাধব। দ্বিজমাধব পূর্ববঙ্গে কাব্যচর্চা করতেন।

বি. ব.

চতুরার্যসত্য

চতুরার্য বা চারি আর্যসত্য বৌদ্ধধর্মের (দ্র) মূল ভিত্তি। গৌতম বুদ্ধ (দ্র) প্রচার করেন—মানবজীবন দুঃখময়। জন্মমাত্রেই দুঃখ, পৃথিবী দুঃখময়। দুঃখ ছাড়া মানবজীবন কল্পনা করা যায় না। এ জন্য অন্যকে কষ্ট দিয়ে, অন্যের ক্ষতি করে, এমনকি অপরকে মেরেও মানুষ নিজে সুখী হতে চায়। এ জন্য মানুষ কখনো হিংস্র, কখনো কুটিল, কখনো শঠ,

www.pathagar.com

কখনো ছল-চাতুর্যের পথ ধরে, তোষামোদ করে। শুধু মানুষ নয়, প্রাণী মাত্রেরই জীবনধারণ দুঃখকর। মানুষের জীবন উদয়াস্ত পরিশ্রমের। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করে মানুষকে জীবনধারণ করতে হয়। এই জীবনধারণের যুদ্ধে মানুষ হয় হিংস্র।

গৌতম বুদ্ধ প্রথম আর্যসত্যে সকল প্রাণীর দুঃখের সমাবেশ করেছেন। জীবজগতের (দ্র) ব্যাপক কর্ম ও দুঃখ উপলব্ধি করে তিনি বলেছেন : জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, রোদন, অশান্তি হল দুঃখ। অপ্রিয় লোকের সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, অভিপ্রেত বস্তু না-পাওয়া দুঃখ, অনভিপ্রেত বস্তু লাভ দুঃখ। সংক্ষেপে জীবন দুঃখময়। এই তাঁর প্রথম আর্যসত্য।

বুদ্ধ বলেছেন দুঃখের মূল কারণ আছে। এর কারণ আত্মা বা প্রকৃতি নয়। চিরন্তন আত্মা বলে কিছু নেই। দুঃখের মূল কারণ তৃষ্ণা। দুঃখ কোথা থেকে এল এই প্রশ্ন নিরর্থক। তৃষ্ণা যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখ উৎপন্ন হবেই। এর নাম দ্বিতীয় আর্যসত্য।

তৃষ্ণার বিনাশ সাধন করে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়। এর নাম তৃতীয় আর্যসত্য।

তৃষ্ণানাশের উপায় হচ্ছে দুই অন্তে না যাওয়া। দুই অন্ত বলতে কঠোর সাধনাও নয়, আবার প্রবল সুখভোগে গা ভাসিয়ে দেওয়াও নয়। এই দুই অন্ত ত্যাগ করে মধ্যম পথ অবলম্বন করতে হবে। সংসারে থেকে এই মধ্যম পথ অবলম্বন করে মুক্তি সম্ভব। এই দুই অন্তের মধ্যবর্তী পথ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (দ্র)—এর নাম চতুর্থ আর্যসত্য।

বি. ব.

চতুর্দশপদী কবিতা কাব্য দ্র

চন্দ্রকীর্তি

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ আচার্য, পণ্ডিত ও লেখক। তিব্বতীয় ঐতিহাসিকদের মতে তিনি আচার্য দিঙ্‌নাগের পরবর্তী এবং চন্দ্রীগোমি ও ধর্মকীর্তির (দ্র) পূর্ববর্তী কালের মানুষ। তাঁর জন্ম সম্ভবত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে। তিনি নালন্দা (দ্র) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ছিলেন। নাগার্জুনের (দ্র) 'মাধ্যমিক শূন্যবাদ' তত্ত্বের ওপর 'প্রসন্নপদা' নামে ব্যাখ্যামূলক একটি টীকাগ্রন্থ রচনা করে বিখ্যাত হন। তিব্বতী ভাষায় লেখা তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে 'শূন্যতা সপ্ততি টীকা', 'যুক্তিষষ্টিকারিকা-টীকা' 'মধ্যমকাবতার', 'প্রদীপপদ্যোতনা' ইত্যাদি।

সুজ. ব.

চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তবংশ দ্র

চন্দ্রগ্রহণ গ্রহণ দ্র

চন্দ্রশেখর, সুব্রহ্মণ্যম [১৯১০—১৯৯৫]

সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর এক জন জগৎবিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবেত্তা। চন্দ্রশেখরের জন্ম ১৯শে অক্টোবর ১৯১০ সালে, লাহোরে। চন্দ্রশেখরের বাবা সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর আয়ার ব্রিটিশ ভারতে এক জন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁর বড় পরিচয় হল, তিনি ছিলেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় বিজ্ঞানী সি. ভি. রামনের ভাইপো। সি. ভি. রামন ১৯৩০ সালে তাঁর আবিষ্কৃত রামনক্রিয়ার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার, পঞ্চাশ বছর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর ১৯৮০ সালে একই সম্মান অর্জন করেন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদানের জন্য। চন্দ্রশেখর তাঁর গবেষণার অবদান রেখেছেন পদার্থবিদ্যার (দ্র) বিভিন্ন ক্ষেত্রে। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী শোয়ার্জচাইল্ড-এর (Schwarzschild) মতে বিজ্ঞানের (দ্র) এই শাখায় এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে চন্দ্রশেখর অবদান রাখেন নি। চন্দ্রশেখরের সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কার হল 'চন্দ্রশেখর সীমানা'। এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে কোনো মৃত নক্ষত্রের ভর যদি সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের বেশি হয়, তা হলে তা ক্রমাগত সঙ্কুচিত হতে থাকবে। কোনো বলই এই সঙ্কোচনকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। ১৯৩০ সালে চন্দ্রশেখর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এসসি. পাশ করে কেম্ব্রিজে ভর্তি হন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা করতে। তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক স্যার আর্থার এডিংটনের ছাত্র ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি আমেরিকার (দ্র) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর অনেকগুলো বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণবিবরের ওপর লেখা 'কৃষ্ণবিবর সম্পর্কে গাণিতিক তত্ত্ব' (The Mathematical Theory of Black Holes)। তিনি শিকাগোয় ১৯৯৫ সালের ২১শে আগস্ট পরলোক গমন করেন।

আ. আ.

www.pathagar.com

চন্দ্রাবতী

বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার ফুলেশ্বরী নদীর তীরে পাতুয়ারী গ্রামে চন্দ্রাবতীর জন্ম। পিতার নাম বংশীদাস ভট্টাচার্য। চন্দ্রাবতী ১৬০০ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি 'দস্যু কেনারামের পালা' ও 'রামায়ণ পালা' রচনা করেন। কেউ কেউ মনে করেন, 'মলুয়া পালা'ও তাঁর রচনা। চন্দ্রাবতী বাল্যকালে জয়ানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ কুমারকে মন দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় নি। জয়ানন্দ পরে আসমানীকে বিবাহ করে ধর্মান্তরিত হন। এতে চন্দ্রাবতী মনে খুব আঘাত পান। পিতার উপদেশে চন্দ্রাবতী 'রামায়ণ' (দ্র) বিষয়ে পালা রচনা করেন। কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ চন্দ্রাবতীর জীবন অবলম্বন করে 'চন্দ্রাবতী পালা' লেখেন। এতে চন্দ্রাবতীর দুঃখময় জীবনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই পালাটিতে ৩৫৪টি ছত্র আছে। এর সঙ্গে চন্দ্রাবতী রচিত 'দস্যু কেনারামের পালা' ও 'মহুয়া পালা' দু'টি অত্যন্ত উন্নত মানের রচনা হিসাবে খ্যাত। রামায়ণ পালা পূর্ব-ময়মনসিংহের ঘরে ঘরে বহুকাল ধরে গাওয়া হত।

বি. ব.

চম্পূকাব্য কাব্য দ্র

চরক

আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার বিখ্যাত আচার্য এবং এই বিষয়ের ওপর 'চরকসংহিতা' গ্রন্থের প্রণেতা। 'চরকসংহিতা'কেও সংক্ষেপে চরক বলে। আয়ুর্বেদ-চিকিৎসাশাস্ত্রে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী এই চরক যে কে ছিলেন তা পরিপূর্ণরূপে জানা যায় না। আচার্য চরক তাঁর বিশাল গ্রন্থে চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, রোগ (দ্র) ও রোগনিরাময় এই চার রকম বিষয় বিভাগ করে শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। 'চরকসংহিতা' বাংলায় পাঁচ বার অনূদিত ও টীকাকৃত হয়েছে। এই অসামান্য গ্রন্থ থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের রোগ ও রোগের প্রতিকারের বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বর্তমান আয়ুর্বেদ শাস্ত্র (দ্র) এই গ্রন্থের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

চরককে কেউ কেউ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করেন। আবার বৌদ্ধ ত্রিপিটকের (দ্র) চীনা অনুবাদের সাক্ষ্য অনুসারে অনেকে স্থির করেছেন, চরক ছিলেন খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে সম্রাট কনিষ্কের খাস চিকিৎসক। চরকের নাম মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত 'নাবনীতক' নামে এক চিকিৎসাগ্রন্থে পাওয়া যায়। ৭ম-৮ম শতকে আরব-পারসিকদের ভাষায় চরকের অনুবাদ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ৯ম শতকে 'রাজী' নামে এক আরব চিকিৎসক তাঁর গ্রন্থে 'চরকসংহিতা' উদ্ধৃত করেছেন। আবুসীনা, অববূসী ও অবূসরাবী নামে আরবি চিকিৎসাগ্রন্থের লাতিন অনুবাদে একাধিক বার চরকের উল্লেখ আছে। আল মনসুর চরকের সর্পচিকিৎসার অনুবাদ করিয়েছিলেন। আলবেরুনীর (দ্র) উক্তিতেও চরকের অনুবাদের কথা জানা যায়।

আচার্য চরকের অমর বাণী—"চিকিৎসকের নিজের জীবন বিপন্ন হলেও রোগীর অপকার হয় এমন কোনো কাজ করা চলবে না, রোগীর আরোগ্যের জন্য চিকিৎসক সমস্ত অন্তর দিয়ে যত্ন করবেন।"

বি. ব.

চরকা আন্দোলন

সুতা কাটার জন্য হাতে চালিত এক ধরনের দেশী যন্ত্রের নাম চরকা। চরকায় কাটা কার্পাস সুতোয় তৈরি মোটা কাপড়কে বলা হয় খাদি বা খদ্দর; এই শব্দটি এসেছে গুজরাট থেকে।

বাংলায় এক সময় বস্ত্রকল ছিল না। তখন এই এলাকার লোকেরা কাপড় তৈরির জন্য সুতা কাটত চরকায়। মহাত্মা গান্ধী (দ্র) বাংলার এই স্বাবলম্বিতার প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলা যদি কলে তৈরি কাপড় বয়কট করত, তবে ভাল হত। তিনি আরো বলেছিলেন যে কলই ভারতকে গরিব করেছে। ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার ভারতের যে ক্ষতি করেছে তার তুলনা নেই। ম্যাঞ্চেস্টারের কারণেই ভারতীয় হস্তশিল্প উধাও হয়েছে। তিনি মিল-মালিকদের মিলের সংখ্যা না বাড়িয়ে ঘরে ঘরে ঐতিহ্যমণ্ডিত তাঁত স্থাপন করতে এবং তাঁতে বোনা কাপড় কিনতে পরামর্শ দেন। গান্ধীজী আরো বলেন যে মিল-মালিকেরা এসব করুন বা না-ই করুন, জনগণ কলের তৈরি পণ্য বর্জন করতে পারে। তিনি ১৯১৮ সালে সবরমতী আশ্রমে তাঁর অনুসারীদের সহযোগিতায় চরকার সাহায্যে খদ্দর উৎপাদন করেন। ১৯২১ সালে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি চরকা পুনঃপ্রবর্তনের আন্দোলন শুরু করেন। সারা ভারতে

www.pathagar.com

চরকা আন্দোলন সংগঠিত করবার জন্য কোকোনাদ কংগ্রেসের প্রস্তাবক্রমে ১৯২৩ সালে 'খাদি বোর্ড' এবং এর তিন বছর পর ১৯২৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর 'অখিল ভারত চরকা সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু গান্ধীজীর মৃত্যুর পর চরকা আন্দোলনে ভাটা পড়ে।

বঙ্গদেশে চরকা আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনের (দ্র) পাশাপাশি জনপ্রিয় ছিল এবং ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ঐ সময় বিদেশী পণ্য, বিশেষ করে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের জোয়ার এসেছিল এবং বিদেশী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরকায় কাটা সুতায় তৈরি খদ্দর পরিধান করা ছিল গৌরবের বিষয়। কেউ কেউ নামের শেষে 'খদ্দর' পদবি পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন। কুমিল্লার খাদি প্রতিষ্ঠান আজও তার পূর্বগৌরব বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে।

অনেক কবি-সাহিত্যিকও চরকা আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন এবং কবিতা (দ্র) ও গান লিখে আন্দোলনের গতিকে বেগবান করেছিলেন। প্রসঙ্গত কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র) ও চারণ কবি মুকুন্দ দাসের (দ্র) নাম উল্লেখযোগ্য। বিশেষত, মুকুন্দ দাস চরকা আন্দোলনকে তাঁর গানের মাধ্যমে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। নজরুল এবং মুকুন্দ দাসের চরকা প্রশস্তি দু'টির অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত করা হল :

ঘোর রে ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর
স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর ॥
তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সদাই শুনতে যেন পাই
ঐ খুলল স্বরাজ–সিংহ দুয়ার, আর বিলম্ব নাই।

* * *

শাসতে জুলুম নাশতে জোর
খদ্দর-বাস বর্ম তোর রে অস্ত্র সত্য-ডোর,
তুই ঘোর ঘোর ঘোর।
মোরা ঘুমিয়ে ছিলাম, জেগে দেখি চলছে চরকা রাত্রি ভোর ॥
(কাজী নজরুল ইসলাম)

মায়ের কৃপায় পেলেম ফিরে চরকা হেন ধনে—
তাই রেখেছি আমি অতি যতনে আমার চরকা-ধনে।
চরকা আমার মাতা-পিতা, চরকা বন্ধু সখা,
চরকায় ভাত কাপড় পরি জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা।
মুকুন্দ দাসে বলে ভাল সুযোগ পেলে
তোমরা সবে ধর চরকা হবে সুখ কপালে।
(মুকুন্দ দাস)

শা. হ.

গান্ধীজীর চরকা আন্দোলন

চরস গাঁজা দ্র

চরিতসাহিত্য কাব্য দ্র

চর্বি তেল-চর্বি দ্র

চর্মরোগ

দেহ-ত্বকে সৃষ্ট রোগসমূহ চর্মরোগ নামে পরিচিত। জীবাণু (দ্র), ভাইরাস (দ্র), ছত্রাক (দ্র) ও অন্যান্য পরজীবী (দ্র)-সংক্রমণ, দাহ, প্রদাহ (দ্র), এলার্জি (দ্র) ইত্যাদি নানা কারণে চর্মরোগ দেখা দিয়ে থাকে।

জীবাণু (দ্র)-সংক্রমণের ফলে ত্বকে ফোড়া সৃষ্টি হয়ে থাকে, ত্বকে পুঁজভর্তি ফোস্কা এবং অনুরূপ ক্ষত দেখা দিয়ে থাকে। ছত্রাকসংক্রমণে ত্বকে কিংবা বা পায়ের আঙুলের ফাঁকে ঘা, দাদ (ring-worm) ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। ভাইরাসের সংক্রমণে ঠোঁটে জ্বরঠোসা বা জ্বরঠুঁটো (cold sores) দেখা দিতে পারে।

প্রদাহের ফলে যেসব চর্মরোগ সচরাচর দেখা দেয়, সেসবের মধ্যে একজিমা (eczema) উল্লেখযোগ্য। এ রোগে ত্বক লাল হয়ে যাওয়া, ত্বকে চুলকানি সৃষ্টি হওয়া,

www.pathagar.com

আক্রান্ত স্থান থেকে রস নিঃসৃত হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। আগুন, বৈদ্যুতিক স্পর্শ, রাসায়নিক পদার্থ, প্রচণ্ড রোদের তাপ ইত্যাদির প্রভাবে ত্বক পুড়ে যাওয়ার ফলেও চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। ত্বকে টিউমার (দ্র) বা ক্যান্সার (দ্র) জাতীয় চর্মরোগও কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বয়ঃসন্ধিকালে অনেকেরই ব্রণ (দ্র) নামক চর্মরোগ দেখা দেয়। মুখমণ্ডল, বুক, পিঠ প্রভৃতি স্থানে ব্রণ দেখা দিতে পারে। শ্বেতী (দ্র), সেবোরিয়া খোসপাঁচড়া ইত্যাদিও চর্মরোগের অন্তর্গত। অধিকাংশ চর্মরোগ খুব ছোঁয়াচে। তাই চর্মরোগের সংস্পর্শ থেকে সতর্ক থাকা এবং এগুলোর আশু চিকিৎসা দরকার।

সি. না. হ.

চর্যাপদ / চর্যাগীতি

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। এই পদ বা গানগুলোর নাম চর্যাগীত, চর্যাগীতি বা চর্যাপদ। একে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা 'আশ্চর্যচর্যাচয়' নামেও অভিহিত করা হয়। চর্যা শব্দের অর্থ কারো কারো মতে আচরণীয়। শব্দটি বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের অঙ্গ, আবার এক শ্রেণীর গানের নামও হয়। বৌদ্ধ সহজিয়া বলতে বৌদ্ধধর্মের (দ্র) একটি মতবাদ বোঝায়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (দ্র) ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার থেকে চর্যাপদের একখানা পুঁথি আবিষ্কার করেন। এর সঙ্গে ছিল সরহপাদ এবং কাহ্নপাদের দু'টি দোহাকোষ। প্রায় দশ বছর পরে এই পুঁথিখানি তিনি 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' (সংক্ষেপে 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রচলিত) নামে প্রকাশ করেন বাংলা ১৩২৩ সনে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বইটির প্রকাশক। অনুমান করা হয়, পুঁথিটিতে আদিতে ৫০টি পদ ছিল, কিন্তু মোটের ওপর ৪৬টি সম্পূর্ণ ও একটি খণ্ডিত পদ পাওয়া যায়। ২৪ জন পদকর্তা এগুলো রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কাহ্নপাদ, সবরপাদ, ভুসুকপাদ, শান্তিপাদ, লুইপাদ, ডোম্বীপাদ প্রসিদ্ধ। পদ বা গানগুলোর দৈর্ঘ্য ১০ থেকে ১২ পঙ্ক্তি। গানে ভনিতা আছে। এই ভনিতায় রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রত্যেক পদের শুরুতে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—পটমঞ্জরি, গবড়া, অরু, গুর্জরা, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, শবরী, ধনসী প্রভৃতি।

চর্যাগীতি থেকে বৈষ্ণব পদাবলী, গজল-গীতি কবিতার উদ্ভব। চর্যাপদ 'সন্ধ্যাভাষা'য় রচিত। সন্ধ্যা কোনো ভাষার নাম নয়। এটি একটি বিশেষ রীতি। এই রীতিতে শব্দের দু'টি অর্থ—একটি তার সাধারণ অর্থ, অন্যটি ভিতরের গোপন অর্থ। চর্যাপদ-রচয়িতাগণ বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক ছিলেন। ধর্মের তত্ত্বকথা থাকলেও এর মধ্যে সাধারণ মানুষ ও বাঙালি জীবনের নিখুঁত ছবি অনেক জায়গায় ফুটে উঠেছে।

চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, খ্রিস্টীয় একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এগুলো রচিত হয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (দ্র) মনে করেন, আনুমানিক ৬৫০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দে চর্যাপদ রচিত হয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (দ্র) মনে করেন, চর্যাপদের রচনাকাল ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ।

কাহ্নপাদ বা কাহ্নুপাদানাম রচিত ১৩ নম্বর চর্যাপদের নমুনা এখানে দেওয়া হল—

তিশরণ নাবী কিত্তু অঠক মারী।
নিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরী।।

অর্থাৎ, ত্রিশরণ-লীন নৌকা করি আট মারি।
করুণা শূন্যের যোগ নিজ দেহে হেরি।।

বি. ব.

চলচ্চিত্র

শব্দটির অর্থ গতিশীল বা চলমান চিত্র। ইংরেজিতে একেই বলে 'মোশন পিক্‌চার', 'মুভিজ' বা 'ফিল্ম' (দ্র)।

বিশ্বের বহুতর শিল্পমাধ্যমের ইতিহাসে বয়সে কনিষ্ঠতম এই মাধ্যমটি কথাসাহিত্য, চিত্রকলা (দ্র), সঙ্গীত (দ্র) ও বিজ্ঞানের (দ্র) নানা শাখার সুবিধাকে ব্যবহার করে আজ সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয়তম মাধ্যমে পরিণত হলেও এর উদ্ভাবনের ইতিহাস খুবই প্রাচীন এবং পর্যায়ক্রমিক।

ইতিহাস : চলচ্চিত্রের প্রাক-ইতিহাসের সূচনা প্রাচীন গ্রিসে আরিস্টোটল (দ্র), ইউক্লিড (দ্র) ও আর্কিমিডিসের (দ্র) আলোকতত্ত্বের চর্চার ভেতর দিয়ে। আরব দেশীয় বিজ্ঞানী আবু আলী আল্ হাসানের বিশ্লেষণ থেকে প্রথম বেরিয়ে আসে অনিয়ত দৃষ্টির তত্ত্ব, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'পারসিস্‌টেন্স্ অব ভিশন' (persistence of vision)। এই তত্ত্বই চলচ্চিত্র সৃষ্টির মূল সূত্র বলে অভিহিত।

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র নির্মিত হওয়ার বহু আগে থেকে অবশ্য জাপান (দ্র), চীন (দ্র), জাভা, বালি দ্বীপ ও তুরস্কে ছায়ানাট্যের একটি ধারা গড়ে ওঠে। আগ্রহোদ্দীপক সব গল্প আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিসহকারে প্রদর্শনযোগ্য এই শিল্পমাধ্যমের প্রধান সহায়ক আলো আর ছায়ার খেলা।

আরব বিজ্ঞানী আল্ হাসানের গবেষণাসূত্রকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে রজার বেকন (Roger Bacon : ১২১৪-১২৯২) প্রতিফলনতত্ত্ব ও লেন্স (দ্র) নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। বেকনই প্রথম বলেন, আলো ক্ষুদ্র কণিকার প্রবাহ নয়, গতির প্রবাহ। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পুরোধাপুরুষ বহুমুখী মৌলিক প্রতিভার অধিকারী লেওনার্দো দা ভিঞ্চি (দ্র) একটি কৃত্রিম চোখ তৈরি করে তার ওপর কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি কী রূপ ধারণ করে তার ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। তাঁর 'ক্যামেরা অব্‌স্‌ক্যুরা' (Camera Obscura) চলচ্চিত্রের প্রাথমিক যান্ত্রিক ভিত্তি স্বরূপ। জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইওহানেস্ কেপ্‌লারের (দ্র) আবিষ্কৃত দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে আলোর ঔজ্জ্বল্যের ওঠা-পড়া সংক্রান্ত তত্ত্বও চলচ্চিত্র সংক্রান্ত তত্ত্বের সূত্রায়নে প্রভূত অবদান রাখে।

১৮২৪ সালে বিখ্যাত ইংরেজি শব্দকোষ 'থেসরাস' (thesaurus) এর সঙ্কলক ও সম্পাদক পিটার মার্ক্ রজেট (১৭৭৯-১৮৬৯) তাঁর উদ্ভাবিত একটি তত্ত্বের মাধ্যমে বলেন, মানুষের চোখ যে কোনো দৃশ্যই দেখুক না কেন, সেটা আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে মুছে যায় না, ধরে রাখে কিছুটা সময়। এই ধরে রাখার সময়ের পরিমাপ হচ্ছে এক সেকেণ্ডের ১২ ভাগের ১ ভাগ। এক সার ছবি যদি এমনভাবে দেখানো হয় যাতে প্রতি সেকেণ্ডে ১২ বার করে ছবি দেখতে পাওয়া যায়, তবে আড়ালটা আর ধরা পড়বে না। মনে হবে, স্থির ছবিগুলো সচল, নড়াচড়া করছে।

এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই অসংখ্য বিজ্ঞানী নানাভাবে স্থির ছবিকে চলমান করার চেষ্টা করতে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীতে স্থির চিত্রকে চলমান করার যেসব যন্ত্র জনপ্রিয় হয়েছিল, সেগুলো যেমন বিচিত্র, তেমনি নানা নামে অভিহিত হত।

চলচ্চিত্র গ্রহণ ও প্রদর্শনের কৌশল প্রথম কে আবিষ্কার করেন এ নিয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উদ্ভাবক মোটামুটি একই সময়ে চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণাকাজে ব্যাপৃত হন। এঁদের মধ্যে ফরাসি দেশের

ই. জে. মারের ক্যামেরা—ফটোগ্রাফিক গান

লুমিয়্যার ভ্রাতৃদ্বয়

এতিয়েন্ জুল্ মারে (Étienne Jules Marey : ১৮৩০—১৯০৪) ইংল্যাণ্ডের ইড্‌উইয়ার্ড মাইব্রিজ (Eadweard Muybridge) এবং আমেরিকায় টমাস আলভা এডিসনের (দ্র) গবেষণাগারে নিযুক্ত ইংরেজ গবেষক কে. এল. ডিকসনের (K. L. Dickson : ১৮৬০—১৯৩৫) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই চলচ্চিত্র কোনো একক ব্যক্তির নয়, বিভিন্ন উদ্ভাবকের উদ্ভাবনী কৃতিত্বের সমষ্টিগত ফসল।

ফরাসি শারীরবিজ্ঞানী এতিয়েন্ জুল্ মারে ১৮৮২ সালে আবিষ্কার করেন 'ফোটোগ্রাফিক গান' (photographic gun)। বন্দুকের মতো দেখতে এই ক্যামেরা চলমান বস্তুর ছবি তোলার ব্যাপারটিকে সম্ভব করে তোলে। ছবি দেখানোর যন্ত্রের উদ্ভাবনেরও শুরু হয় এ সময়ই। ফ্রান্সের লুই ল্যাপ্রাঁস্ (Louis Leprince) সেলুলয়েড ফিল্ম

www.pathagar.com

গ্রিফিথের 'বার্থ অব এ নেশন' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য : ১৯১৫

চার্লি চ্যাপলিনের 'গোল্ডরাশ'-এ চার্লি চ্যাপলিন ও অন্য এক অভিনেতা : ১৯২৫

উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। ১৮৮৯ সালে জর্জ ইস্ট্‌ম্যান (George Eastman : ১৮৫৪-১৯৩২) আবিষ্কার করলেন কোডাক ফিল্ম ও কোডাক ক্যামেরা। এরপর শুরু হল ছবি তৈরির পালা। এডিসনের স্টুডিওতে তৈরি হল পৃথিবীর (দ্র) প্রথম চলচ্চিত্র 'হাঁচি'। ঐ একই সময়ে ইংল্যাণ্ডে উইলিয়াম ফ্রিজ-গ্রিন (William Friese-Green : ১৮৫৫-১৯২১) সচল ছবি তোলার ক্যামেরা উদ্ভাবন করে চালু করলেন ছবি দেখানোর পদ্ধতি। ইংল্যাণ্ডে তৈরি হল প্রথম চলচ্চিত্র স্টুডিও রবার্ট উইলিয়াম পলের (Robert William Paul : ১৮৬৯-১৯৪৩) উদ্যোগে।

চলচ্চিত্র তার প্রকৃত রূপে : এর পর চলচ্চিত্র নির্মাণের যেন জোয়ার এল। ফ্রান্সের লুমিয়্যার (Lumière) ভাইদের (ওগুস্ত্‌ ও লুই লুমিয়্যার) তোলা ছবি ১৮৯৫ সালে প্যারিসে লোক ডেকে দেখানো হল। আস্কার মেস্টার (Askar Messter : ১৮৬৬-১৯৪৩) জার্মানিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে এ ক্ষেত্রে সে দেশের অগ্রপথিকে পরিণত হলেন।

উনিশ শতকের চলচ্চিত্রের অধিকাংশই ছিল স্বল্প দৈর্ঘ্যের এবং বিষয়বস্তু ছিল সহজসরল—চলন্ত ট্রেন ও তীরের ওপর নদী বা সমুদ্রের ঢেউয়ের আছড়ে পড়া ইত্যাদি। অথচ এ সবই দর্শকদের বিস্ময়াভিভূত করল অপরিমেয়ভাবে। নিউজ রিল বা সংবাদচিত্রও প্রথম নির্মিত হয় এ যুগেই।

১৮৯৬ সালে ফরাসি দেশের জর্জ মেলিয়্যা (Georges Méliès) নামের এক জন জাদুকর চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এর নানা জাদুকরী সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন। তাঁর উদ্ভাবিত নানা ধরনের কৌশল বা 'ট্রিক' এখনো চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন একই ব্যক্তিকে দুই বেশে একই সিকোয়েন্স কিংবা শট-এ হাজির করা। অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্য মেলিয়্যা চিত্রনাট্যের ধারা অনুসরণ করে চলচ্চিত্র নির্মাণে আত্মনিবেদিত হন। এই ধারায় তিনি 'সিণ্ডারেলা' ও 'জার্নি টু দ্য মুন' নামের চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তাঁর সময়কালে শুধু চাঞ্চল্যই সৃষ্টি করেন নি, চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করেছেন নিজের নাম।

জর্জ মেলিয়্যার পথ অনুসরণ করে চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে আসেন মার্কিন চলচ্চিত্রকার এডউইন এস. পোর্টার (১৮৭০-১৯৪১)। তাঁর পরিচালিত 'দ্য লাইফ অব আমেরিকান ফায়ারম্যান' নামক চলচ্চিত্রে মেলিয়্যার চলচ্চৈত্রিক রীতিকে পোর্টার আরো প্রসারিত করেন।

www.pathagar.com

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তাঁর প্রধানতম অবদান হল সম্পাদনা বা এডিটিং প্রথার প্রচলন, একটি চলচ্চিত্র নির্মাণে পরবর্তী কালে ও এখন পর্যন্ত যা আবশ্যিক রীতি হিসাবে বিবেচিত। পোর্টারের আরো একটি অবদান চলচ্চিত্রে ক্লোজ-আপ বা নিকটদৃষ্টির প্রবর্তন করা। তাঁর হাতেই সম্পাদনা ও প্রয়োজনানুসারে ক্যামেরার দূরত্ব পরিবর্তনের সাহায্যে আধুনিক চলচ্চিত্রের মূল ভিত্তির প্রতিষ্ঠা। তাঁর নির্বাক ছবি 'দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি' চলচ্চিত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মাইলফলকস্বরূপ।

১৯০৮ সালে ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ (David Wark Griffith : ১৮৮০-১৯৪৮) এর আবির্ভাবে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সূচনা হল নবযুগের। চলচ্চিত্রকে মঞ্চরীতির প্রভাব থেকে মুক্ত করে এবং ক্যামেরার দৃষ্টিকোণে বিভিন্নতা এনে অর্থাৎ নিকটদৃষ্টি (ক্লোজ-আপ) ও দূরদৃষ্টির (লং শট) উপযুক্ত ও শৈল্পিক ব্যবহারের মাধ্যমে, দৃশ্যবস্তুর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে নাটকীয় বৈচিত্র্য ইত্যাদি এনে তিনি চলচ্চিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করলেন স্বতন্ত্র মহিমায়। তাঁর তৈরি ছবি 'বার্থ্ অব এ নেশন' ও 'ইন্টলারেন্স' ছবি দু'টিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চলচ্চিত্রের নব উদ্ভাবিত ভাষা ও রীতিকে অবলম্বন করে চার্লি চ্যাপলিন (দ্র) এই মাধ্যমকে আরো অগ্রসর করে নিতে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর 'দ্য গোল্ডরাশ'-সহ অন্যান্য চলচ্চিত্রকর্ম হাস্যরসোজ্জ্বল অথচ অর্থময় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এক নবতর সংযোজন।

১৯২৫ সালের দিকে রুশ চলচ্চিত্রকার সের্গিয়েই আইজেন্‌স্টাইন্ 'ব্যাট্‌ল্‌শিপ পতিওম্‌কিন্' তৈরি করে চলচ্চিত্রের সম্পাদনারীতির ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে আনলেন বিপ্লব। ১৯২৯ সালে ডেনমার্কের চলচ্চিত্রকার কার্ল্ টেওডোর ড্রেয়ার 'দ্য প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক্' (১৯২৮) ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে আলো-ছায়ার ব্যবহারের চরম নন্দনতাত্ত্বিক পরিচয় তুলে ধরলেন। চলচ্চিত্রকে ধাপে ধাপে প্রকৃত অর্থে চলচ্চিত্র করে তুলতে বিশ্ব-চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আর যাঁদের সৃজনশীল মেধাগত অবদান অনস্বীকার্য, তাঁরা হলেন রোবের্ট ভিনে (জার্মান), রবার্ট ফ্লাহার্টি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), এরিখ ফন স্ট্রোহাইম (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), জর্জ ভিলহেল্ম্ পাব্‌স্ট্ (জার্মানি), ফ্রিডরিশ ভিলহেল্ম্ মুর্নাউ

সের্গেই আইজেনস্টাইন পরিচালিত চলচ্চিত্র 'ব্যাট্‌ল্‌শিপ পতিওম্‌কিন্' : ১৯২৫

কার্ল ড্রেয়ার পরিচালিত 'দ্য প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক' চলচ্চিত্রের দৃশ্যে মাদাম ফাল্‌কোনিও : ১৯২৯

www.pathagar.com

(জার্মানি), ফ্রিৎস্ লাঙ্ (জার্মানি), আর্নস্ট লুবিৎস্ (জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), জোসেফ ফন স্টার্নবার্গ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), জন ফোর্ড (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ভ্লাদিমিরভিচ্ কুলেশোফ্ (রাশিয়া), সের্গিয়েই আইজেনস্টাইন্ (রাশিয়া) এবং অর্সন্ ওয়েলস্ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।

উল্লিখিত চলচ্চিত্রকারদের কেউ কেউ নির্বাক ও সবাক উভয় ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণে কৃতিত্বের অধিকারী।

সবাক চলচ্চিত্র : ১৯২৭ থেকে ১৯২৯-৩০ সাল সময়কালের মধ্যে শব্দ ও সংলাপ যুক্ত হয়ে সূচনা হল সবাক চলচ্চিত্র যুগের। এর অত্যল্পকালের মধ্যে তৈরি হতে শুরু করে রঙিন ও কালো বা উভয় শ্রেণীর চলচ্চিত্র তার যাবতীয় উন্নতির ধারাটিকে সমুন্নত রেখেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বের ঘরে ঘরে টেলিভিশন(দ্র) যন্ত্রের প্রসারের মুখে দেশে দেশে বৃহৎ আকারের চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা বেড়ে চলে। ৩৫ মিলিমিটার চলচ্চিত্রের পাশাপাশি ১৬ মিলিমিটার ও ঘরোয়াভাবে ব্যবহারের জন্য ৮ মিলিমিটার ছবি তৈরিরও প্রচলন শুরু হয়। বিস্তৃত হতে থাকে চলচ্চিত্র নানা শাখা-প্রশাখায়। যেমন— কাহিনীচিত্র, প্রামাণ্য চিত্র, সংবাদচিত্র, শিক্ষামূলক চিত্র, বিজ্ঞাপন-চিত্র, অ্যানিমেটেড ও পাপেট ফিল্ম ইত্যাদি।

যেহেতু চলচ্চিত্র নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং এ ক্ষেত্রে বহু জনের সংঘবদ্ধ শ্রমের প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় কারিগরি নানা ধরনের বিভাগীয় সাহায্য, তাই অচিরেই এই শিল্পমাধ্যম বিশ্বের দেশে দেশে গড়ে ওঠে একটা পৃথক শিল্প বা 'ইণ্ডাস্ট্রি' হিসাবে। অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয় তিনটি প্রধান কর্মবিভাগেরও, যেমন—নির্মাণ, পরিবেশনা ওপ্রদর্শন। চলচ্চিত্র নির্মাণে কারিগরি সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে সাধিত হয়ে থাকে। সরকারনিয়ন্ত্রিত স্টুডিওর পাশাপাশি বেসরকারি স্টুডিওর সহায়তাও এ ক্ষেত্রে পালন করে থাকে ভূমিকা। বিশ্ব-চলচ্চিত্রের প্রধানতম তীর্থস্থান হিসাবে অভিহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড, ভারতের বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কলিকাতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের কিছু কৃতী পরিচালক : এ সময়কালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহু কৃতী পরিচালকের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে যাঁদের সৃজনশীল মেধার স্পর্শে বিশ্ব-চলচ্চিত্র সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইতালির লুচিনো ভিস্কন্তি, পিয়েরে পাওলো পাসোলিনি, ফেদেরিকো ফেলিনি, ভিত্তোরিও দে সিকা, রবার্তো রসেলিনি; ফ্রান্সের অল্যাঁ রন্যা, ফ্রাসোয়াঁ ক্রুফো, জঁ-লুক্ গদার্; ব্রিটেনের টনি রিচার্ড্সন, জ্যাক্ ক্লেটন, ক্যারেল্ রিজ; সুইডেনের ইঙ্গমার বার্গম্যান; পোল্যাণ্ডের আঁদ্রেই ভাইদা, রোমান্ পোলান্স্কি; জাপানের আকিরা কুরোসওয়া, ইয়াসুজিরো ওজু; স্পেনের লুই বুনুয়েল এবং ভারতের সত্যজিৎ রায় (দ্র)।

ভারত ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : ১৮৯৫ সালের ৭ই জুলাই ভারতের বোম্বাই শহরের একটি হোটেলে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। নির্দিষ্ট প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে দর্শকসাধারণ ফ্রান্সের লুমিয়্যার্ ভ্রাতৃদ্বয় উদ্ভাবিত 'সিনেমাটোগ্রাফ'-এর সাহায্যে এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনীটি দেখবার সুযোগ লাভ করেন। ১৯০০ সালে সখারাম ভাটবাড়েকর নামের এক জন ভারতীয় কতকগুলো সংবাদচিত্র তৈরি করে তা প্রদর্শন করেন। তাঁর নির্মিত 'লাইফ অব ক্রাইস্ট' জনপ্রিয়তা অর্জন করলে ডি. জি. ফাল্‌কে 'রাজা হরিশচন্দ্র' নামে একটি কাহিনীচিত্র নির্মাণ করেন ১৯১৩ সালে। এর দৈর্ঘ্য ছিল ৩ হাজার ৭ ফুট। ছবিটি নির্বাক হলেও দর্শকদের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারতের মাটিতে এই প্রথম কাহিনী-চিত্র নির্মাণ করার সুবাদেই ডি. জি. ফালকেকে 'ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক' হিসাবে অভিহিত করা হয়। তবে কোনো কোনো গবেষকের মতে, বাংলার হীরালাল সেন (দ্র) যেহেতু ১৯০০, ১৯০১ কি ১৯০৩ সালে মঞ্চে অভিনীত কতকগুলো নাটকের দৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন এবং ভারতে এ ধরনের কাজ প্রথম করার কৃতিত্ব তাঁর, সেহেতু তিনিই ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক। কিন্তু বিষয়টি বিতর্কিত। এখনো এর নিষ্পত্তি হয় নি।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও কলিকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। তাই চলচ্চিত্র ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনার মুখে কলিকাতা ও বোম্বাই শহর চলচ্চিত্র নির্মাণের দু'টি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং অচিরকালের মধ্যে বেশ কিছু চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও নির্মাণসংস্থা গড়ে ওঠে। এসব সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি', 'ম্যাডান থিয়েটার্স', 'অরোরা সিনেমা কোম্পানি', 'দ্য ইণ্ডো-ব্রিটিশ ফিল্ম

www.pathagar.com

কোম্পানি', 'দ্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান্‌স্ ফিল্মস্ লিমিটেড', 'ভেনাস থিয়েটার', ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টস্', 'তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি', 'আর্য ফিল্ম' ও 'বোম্বে টকিজ'। এ ছাড়াও ছিল প্রায় অর্ধশতাধিক এ জাতীয় ছোট-বড় সংস্থা এবং সেই সঙ্গে চলচ্চিত্র স্টুডিও। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বড় স্টুডিও ছিল 'নিউ থিয়েটার্স'। চলচ্চিত্রব্যবসা জমজমাট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাসহ সারা ভারতবর্ষে পাল্লা দিয়ে গড়ে ওঠে অসংখ্য প্রেক্ষাগৃহ। ১৯১৮ সালে ভারতে সর্বপ্রথম জারি করা হয় 'সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট'। ১৯২০ সাল নাগাদ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে গড়ে ওঠে ফিল্ম সেন্সর বোর্ড।

ভারতে প্রথম নির্বাক কাহিনীচিত্র তৈরি হয় ১৯১৩ সালে এবং সবাক চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ঘটে ইউরোপ-আমেরিকার সমতালে অর্থাৎ ১৯২৯-৩০ সাল সময়কালের মধ্যেই।

১৯১৩ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় চলচ্চিত্রের অধিকাংশই ছিল পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর। দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে এগুলো ছিল নাটকেরই চলচ্চিত্ররূপ মাত্র। ১৯৫৬ সালে সত্যজিৎ রায় নির্মিত 'পথের পাঁচালী' (দ্র) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ভারতীয় চলচ্চিত্রে নব তরঙ্গের সূচনা হয়। তাঁর সমসাময়িক অন্য দু'জন চলচ্চিত্রকার যথাক্রমে ঋত্বিক ঘটক (দ্র) ও মৃণাল সেন তাঁর সৃষ্ট চলচ্চিত্রের উল্লিখিত ধারারই যোগ্য উত্তরসূরি। তাঁদের তৈরি চলচ্চিত্র শুধু ভারতের নয়, বিশ্ব-চলচ্চিত্রেরও অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত।

১৯৪৭ সালে এখানে অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনী-চলচ্চিত্র নির্মাণের উপযোগী কোনো স্টুডিও ছিল না। সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে।

বাংলাদেশে (দ্র) চলচ্চিত্রশিল্পের গোড়াপত্তনে উদ্যোগী ও পুরোধা পুরুষ নাজীর আহমদ (দ্র) পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই তৈরি করেন স্বল্পদৈর্ঘ্য দু'টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র যথাক্রমে 'ইন আওয়ার মিড্‌স্ট্' (১৯৪৮) ও 'সালামত' (১৯৫৩)। দু'টি ছবিই বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জনক হচ্ছেন আবদুল জব্বার খাঁ (দ্র)। কেননা, তাঁরই একান্ত উদ্যোগ ও পরিচালনায় সম্পূর্ণ দেশীয় কলাকুশলী ও সীমিত যান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা

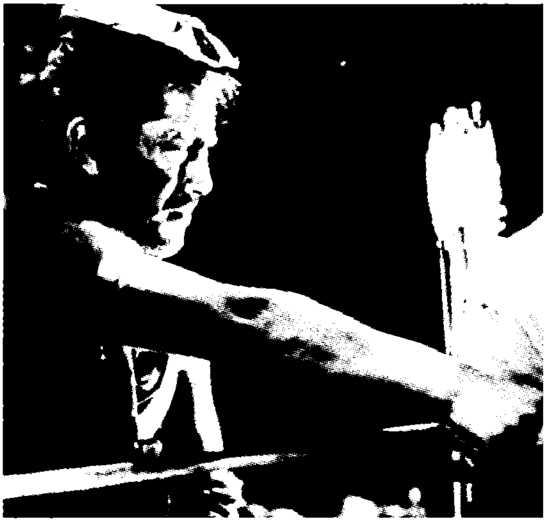

উপরে : ঈঙ্গমার বার্গম্যানের 'দ্য সেভেন্থ সিল' : ১৯৫৬
মাঝে : আকিরা কুরোসওয়ার চলচ্চিত্র 'রশোমন' : ১৯৫০
নিচে : জঁ লুক্ গদারের 'ভিভ্রা সা-ভী'-এর একটি দৃশ্য

www.pathagar.com

ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক ফালকে-নির্মিত রাজা হরিশচন্দ্র : ১৯১৩

নাজীর আহমদ

আবদুল জব্বার খাঁ

জহির রায়হান

বাম পাশের ছবি : ওবায়েদ-উল হক পরিচালিত কলিকাতায় তৈরি 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' ছবিতে ফতেহ লোহানী (কিরণকুমার রূপে) ও রেণুকা রায় : ১৯৪৬

ব্যবহার করে নির্মিত হয় দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র 'মুখ ও মুখোশ' (১৯৫৬)। এর এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে নির্মিত হয় আজকের এফ ডি সি (FDC = Film Development Corporation) বা চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (দ্র)। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন এই সংস্থা বর্তমানে যাবতীয় যান্ত্রিক সুবিধাদি দ্বারা সজ্জিত। বছরে এখান থেকে এখন ৫০টিরও বেশি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র নির্মিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের গোড়াপত্তন এবং এর বিকাশে যাঁদের অবদান স্মরণীয়, তাঁরা হলেন নাজীর আহমদ, আবদুল জব্বার খাঁ, ফতেহ লোহানী (দ্র) ও জহির রায়হান (দ্র)।

বিশ্বের একাধিক অনুন্নত ও ছোট দেশ যেখানে চলচ্চিত্র নির্মাণের সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও প্রকৃত জীবন ও নানা নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ করে দেশের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি বয়ে আনছে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সে বিচারে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে, এখনো বহু পেছনে পড়ে রয়েছে। ফলে কেবলই অবাস্তব, অতিনাটকীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি এখনো ক্ষীণ হলেও বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের বিকল্প প্রয়াস। ইতোমধ্যেই এই আন্দোলন, বয়স বেশি না হলেও, সৎ চলচ্চিত্রের অনুকূলে আশার সঞ্চার করেছে।

আ. হু.

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র উৎসব

একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী বিখ্যাত কিছু চলচ্চিত্রের পর্যায়ক্রমিক প্রদর্শনীকে চলচ্চিত্র উৎসব বলা হয়। এই উৎসব আন্তর্জাতিক এবং জাতীয়—উভয় রূপেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে অর্থাৎ একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, অন্যটি জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসব। দু'টি উৎসবেরই চরিত্র হতে পারে প্রতিযোগিতামূলক বা সাধারণ অর্থাৎ প্রতিযোগিতাহীন। এ ছাড়া কোনো এক জন বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারের সবগুলো বা বাছাই-করা একগুচ্ছ ছবির প্রদর্শনীকেও এ অভিধায় অভিহিত করা হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয় ইতালির ভেনিসে ১৯৩২ সালে 'ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব' নামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর 'কান্' (ফ্রান্স) চলচ্চিত্র উৎসব (১৯৪৬) ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। বর্তমানে এই উৎসব বিশ্বের নামীদামী চলচ্চিত্রকার ও চলচ্চিত্রামোদীদের একটি প্রিয় অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক মিলন বা যোগাযোগকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই 'কান্' চলচ্চিত্র উৎসবেই ১৯৫৬ সালে সত্যজিৎ রায়ের (দ্র) 'পথের পাঁচালী' (দ্র) শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার লাভ করে।

বিশ্বের প্রধান ও মর্যাদাসম্পন্ন চলচ্চিত্র উৎসবগুলো হচ্ছে 'ভেনিস', 'কান্, 'বার্লিন, 'লোকার্নো' (সুইজারল্যাণ্ড), 'মস্কো' ও 'কার্লোভিভারি'।

এ ছাড়া এ জাতীয় আরো কয়েকটি উৎসব রয়েছে। এগুলো 'এডিনবরা,' 'কর্ক্', 'মার দেল-প্লাতা', 'নিউইয়র্ক,' 'রিও-ডি জেনিরো' এবং 'সান ফ্রান্সিসকো' চলচ্চিত্র উৎসব নামে পরিচিত।

প্রতিবেশী দেশ ভারতেও এক বছর অন্তর প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অন্য বছরগুলোয় দেশটির বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রযোজনাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সাধারণ চলচ্চিত্র উৎসব। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। ১৯৯২ সাল থেকে এখানেও এরকম উৎসব করা হচ্ছে বেসরকারি উদ্যোগে।

ইতালিতে বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করা ও তাদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বেনিতো মুসোলিনি (দ্র) ১৯৩২ সালে ভেনিসে প্রথম যে চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, তার প্রাথমিক উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে এই উৎসব বর্তমানে ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ছোট ও বড় মিলিয়ে এ ধরনের উৎসবের সংখ্যা দেড় শতাধিক। এগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সরকারি ও বেসরকারি দুই পর্যায়েই।

'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্র তৈরির সময় অপু ও দুর্গাকে অভিনয় বুঝিয়ে দিচ্ছেন সত্যজিৎ রায় : ১৯৫৩

চলচ্চিত্র উৎসবের মূল উদ্দেশ্য স্বদেশের ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রের নির্মাণধারা ও সেগুলোতে বিধৃত জীবনদর্শনের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি ভাবের আদান-প্রদান করা।

এসব উৎসবে শুধু পরিচালকই নন, এই শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। এ ছাড়া ছবি বিক্রি ও তার প্রচার ইত্যাদির কাজও হয়।

আ. হু.

চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এফ ডি সি দ্র

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডি এফ পি)

এটি বাংলাদেশ (দ্র) সরকারের তথ্যমন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি প্রচারধর্মী প্রতিষ্ঠান।

Department of Films and Publications (সংক্ষেপে D F P) বা 'চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর' ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে এটি ছিল তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি শাখা-প্রতিষ্ঠান। করাচিতে অবস্থিত ছিল এর প্রধান কার্যালয়। এক জন ডেপুটি সেক্রেটারির তত্ত্বাবধানে তখন এর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হত।

কিন্তু তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কোনো স্টুডিও চালু করার আগেই নাজীর আহমদ (দ্র)-এর পরিচালনায় নির্মিত হয় তথ্যচিত্র 'ইন আওয়ার মিড্স্ট্' ও স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র 'সালামত'। এই দু'টি চলচ্চিত্রের সাফল্য সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের মাটিতে চলচ্চিত্র নির্মাণে সহায়ক পূর্ণাঙ্গ স্টুডিও গড়ে তোলার কাজকে ত্বরান্বিত করে। এরই পরিণতিতে তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার একটি ফিল্ম ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার জন্য ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা অনুমোদন করেন। এই অর্থ দিয়ে তৎকালীন বিজি প্রেসের অভ্যন্তরভাগের একটি শূন্য ভবনে ল্যাবরেটরি, প্রিন্টিং মেশিন, রেকর্ডিং ও প্রোজেকশান বিভাগ গড়ে তোলা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর কাজ শুরু হয় ১৯৫৫ সালের ১৯শে জুন থেকে। এটি গড়ে ওঠার পর সাময়িকভাবে আর্থিক সমস্যা দেখা দিলেও তার মধ্যেই বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হুইল' ও '১৯৫৫'। নবগঠিত এই দপ্তরের চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান ছিলেন নাজীর আহমদ (দ্র)। তাঁরই উদ্যোগে মূলত প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি গড়ে ওঠে।

৬০-এর দশকের মাঝামাঝি ডি এফ পি-র দফতর বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তন শেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বর্তমান ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০ ঠিকানায় উঠে আসে।

বর্তমানে সরকারি অর্থে পরিচালিত 'ডি এফ পি' বা 'চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর' তার তৎপরতা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেছে। কয়েকটি ভবন জুড়ে এর বিভিন্ন বিভাগ অবস্থিত। এসব বিভাগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক ভবন, হিসাব সংরক্ষণ বিভাগ, প্রকাশনা বিভাগ, চলচ্চিত্র ও পাঠাগার বিভাগ। সরকারের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রচারমূলক পোস্টার, পুস্তিকা ও পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করার পাশাপাশি তথ্যচলচ্চিত্র নির্মাণ করাও এর সার্বিক কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ডি এফ পি সরকারি অর্থে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চলচ্চিত্র নির্মাণ করে থাকে। ১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত এখান থেকে ১৬ মিলিমিটারে ১৯০টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ১১৬টি বিশেষ সংবাদচিত্র এবং ৩৪৩টি সংবাদচিত্রসহ ২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে নির্মিত ১৬ মিলিমিটারের স্বল্পদৈর্ঘ্যের যাবতীয় চলচ্চিত্রের পরিস্ফুটন ডি এফ পি-তেই হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের সরকারি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত যাবতীয় পত্র-পত্রিকার সরকারি বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ করারও দায়িত্বপ্রাপ্ত।

ডি এফ পি 'নবারুণ' (দ্র) নামের একটি মাসিক কিশোর সাময়িকীসহ আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে।

আ. হ.

চশমা

বিশেষ লেন্সে (দ্র) তৈরি চশমার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দৃষ্টির কোনো কোনো ত্রুটির প্রতিবিধান করা যায়। অবশ্য অতিরিক্ত আলো থেকে চোখকে আরাম দেবার জন্য, বিশেষ বিশেষ কাজ করতে গিয়ে চোখের নিরাপত্তার জন্যও কখনো কখনো চশমা ব্যবহার করতে হয়। দৃশ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো অক্ষিগোলকের পিছনে অবস্থিত সংবেদনশীল রেটিনার (দ্র) উপর স্পষ্টভাবে পড়লে তবেই আমরা ঠিক মতো দেখি। কিন্তু চোখের কোনো ত্রুটির জন্য এরকম ফোকাস করা অনেক সময় সম্ভব না হওয়ায় ঝাপসা দেখা যেতে পারে। চশমা আলোকরশ্মিকে বাঁকিয়ে এর প্রতিবিধান করে।

দূরবর্তী বস্তু থেকে আসা আলো রেটিনায় পৌঁছানোর আগেই ফোকাস-তলে উপনীত হলে তার দৃশ্য ঝাপসা মনে হবে। এই ত্রুটিকে বলা হয় নিকটদৃষ্টি বা মায়োপিয়া। যথাযথ অবতল লেন্স (মাঝখানে পাতলা, কিনারায় পুরু) ব্যবহার করে এই ফোকাস-তলকে যথাস্থানে নেওয়া যায়। এরকম লেন্সের পাওয়ার ঋণাত্মক। এর বিপরীত ত্রুটি হল

www.pathagar.com

দূরদৃষ্টি বা হাইপারমেট্রোপিয়া—খুব কাছের বস্তু থেকে আসা আলো ফোকাস হওয়ার আগেই রেটিনাতে পৌঁছে যাওয়া। উত্তল লেন্স (মাঝখানে পুরু) ব্যবহার করে এর প্রতিবিধান হয়, যার পাওয়ার ধনাত্মক। সাধারণত বয়স চল্লিশের ওপরে গেলে সবারই এরকম ত্রুটি দেখা দেয় এবং কাছের জিনিস দেখার জন্য চশমার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় শিশুদের ট্যারা চোখের প্রতিকারেও চশমা ব্যবহার করা হয়। আলোকরশ্মি চোখের দুই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় একত্রিত হলে অ্যাস্টিগ্‌মেটিজ্‌ম্ নামে আরেকটি ত্রুটি দেখা যায়, যা সিলিণ্ড্রিক্যাল বা বেলনাকৃতি লেন্সে সারে। ছানি (দ্র) পড়ে অস্বচ্ছ হয়ে গেলে চোখের নিজস্ব লেন্স সরিয়ে ফেলে হয়তো অভ্যন্তরীণ প্রান্তিক লেন্স দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করতে হয় অথবা বহিঃস্থ চশমা দিয়ে আলো ফোকাস করার ব্যবস্থা করতে হয়। নিকটদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি উভয় ত্রুটিই এক সঙ্গে থাকলে বাইফোকাল চশমা নেওয়া যায়। এতে লেন্সের দুই অংশের দু'রকম পাওয়ার থাকে।

চক্ষুচিকিৎসক চোখ পরীক্ষা করে, নানারকম লেন্সের মধ্য দিয়ে তাকাতে দিয়ে চশমার ব্যবস্থাপত্র দেন। অপটিশিয়ানেরা সেই অনুসারে চশমা তৈরি করে দেন। ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো (দ্র) ১২৭৫ সালের দিকে চীন (দ্র) ভ্রমণের সময় সেখানে চশমার ব্যবহার দেখেছেন। ইউরোপে (দ্র) এটি প্রচলিত হয় আরো পরে। ১৭৮৪ সালে আমেরিকার (দ্র) বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন্ (দ্র) বাইফোকাল চশমা উদ্ভাবন করেন। আজকাল চশমার বিকল্প হিসাবে কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করা হয়। এতে প্লাস্টিকের ছোট্ট নরম লেন্স সরাসরি চোখের মণির উপরে পাতলা অশ্রু-স্তরের উপর ভাসে। সূর্যালোকের ছটায় আরামে দেখার জন্য আজকাল পোলারায়িত চশমা রয়েছে। ফটোক্রোমিক লেন্সের চশমা আলো অনুযায়ী স্বচ্ছ-সাদা অথবা গাঢ় রঙ ধারণ করে।

মু. ই.

চাইকোফ্‌স্কি, পিওৎর্ ইলিচ্ [১৮৪০—১৮৯৩]

বিখ্যাত রুশ সঙ্গীতকার। অর্কেস্ট্রা (দ্র) রচনায় অসামান্য অবদানের জন্য প্রশংসিত। ১৮৪০ সালে জন্ম। একেবারে অল্প বয়সে চাইকোফ্‌স্কি পিয়ানো (দ্র) বাজাতে শেখেন। ক্রমেই সঙ্গীতে (দ্র) তাঁর অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। উনিশ বছর বয়সে কেরানির চাকরি নেন। কিন্তু সঙ্গীত শিক্ষার তাড়নায় কাজে মনোনিবেশ করতে পারতেন না। তেইশ বছর বয়সে একই সঙ্গে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভর্তি হন ও স্বয়ং সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেন। সাতাশ বছর বয়সে চাইকোফ্‌স্কি প্রথম পিয়ানোর জন্য সঙ্গীত রচনা করেন। পরপরই রচনা করেন একটি অর্কেস্ট্রা (দ্র)। ১৮৬১ সালে তিনি মস্কোতে (দ্র) সঙ্গীতশিক্ষকের কাজ পান। এ সময় থেকেই তাঁর সিম্ফনি (দ্র) রচনা শুরু। তখন থেকে অপেরায় (দ্র) ওভর্চর রচনায়ও তিনি হাত দেন। চাইকোফ্‌স্কির এসব রচনা প্রথম দিকে জনপ্রিয় হয় নি। ফলে মানসিক ও আর্থিক কষ্টে তিনি ভেঙে পড়েন। সে সময় জনৈক বিত্তবান মহিলা চাইকোফ্‌স্কিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তিনি চাইকোফ্‌স্কির সকল দেনা শোধ করে দেন ও তাঁকে বার্ষিক বৃত্তি মঞ্জুর করেন। এর ফলে তিনি নতুন উদ্যাগে কাজ করতে সমর্থ হন। তাঁর বিখ্যাত 'প্যাথেটিক সিম্ফনি'-সহ অনেক ধরনের সঙ্গীত রচনা এই সময়েই সম্পন্ন হয়। ১৮৯৩ সালে কলেরায় (দ্র) আক্রান্ত হয়ে সাংক্‌ৎ পিতের্বুর্গ্ অর্থাৎ সেন্ট পিটাসবার্গে চাইকোফ্‌স্কি মারা যান। তখন সেখানে কলেরার মহামারী (দ্র) চলছে, সবাই পানীয় জল সেদ্ধ করে নিচ্ছেন। কিন্তু সকলের নিষেধ সত্ত্বেও চাইকোফ্‌স্কি এক দিন এক গ্লাস সেদ্ধ না-করা জল পান করে ফেললে কলেরায় আক্রান্ত হন।

চাইকোফ্‌স্কির নানা ধরনের সঙ্গীত রচনা জনপ্রিয় হয়। তবে অর্কেস্ট্রার জন্য রচিত সঙ্গীতই তাঁকে সর্বাধিক খ্যাতি এনে দেয়। রুশ সঙ্গীতকারদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন।

ক. গো.

চাঁদ

চাঁদ পৃথিবীর (দ্র) একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার। এ ছাড়া পৃথিবী থেকে এর নিকটতম দূরত্ব ৩,৫৬,৪১০ কিলোমিটার ও সর্বোচ্চ দূরত্ব ৪,০৬,৭০০ কিলোমিটার। নিজ অক্ষরেখার চারদিকে চাঁদের আবর্তনকাল এবং পৃথিবীর চারিদিকে এর পরিক্রমণকাল একই। এ কারণে পৃথিবী থেকে চাঁদের কেবল এক পিঠই দেখা যায়। এর অপর পিঠ কখনোই দেখা যায় না। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অ্যাপোলো-৮ নভোযানযোগে চাঁদ

www.pathagar.com

অ্যাপোলো-১২ মহাকাশযানের যাত্রীরা চাঁদের বুকে নেমে যন্ত্রপাতি বসাচ্ছেন

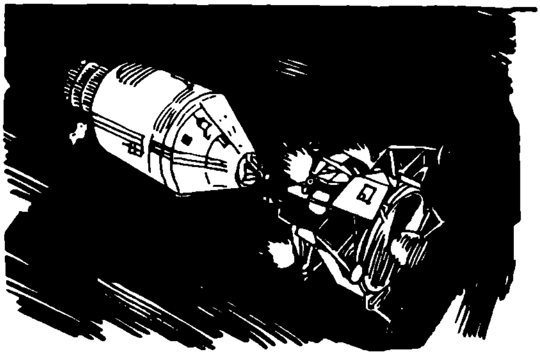

মহাকাশযান কলম্বিয়া থেকে চাঁদের ভেলা 'ঈগল' বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদের মাটিতে নামছে

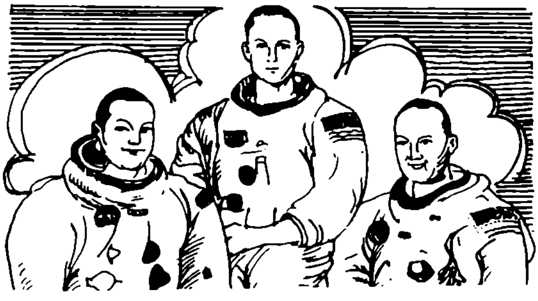

বাঁ দিক থেকে আর্মস্ট্রং—যিনি প্রথম চাঁদে নামেন, তারপর কলিন্স এবং অলড্রিন

প্রদক্ষিণকালে তিন জন মার্কিন নভশ্চর (দ্র) সর্বপ্রথম চাঁদের অপর পিঠ দেখেন। চাঁদ সাড়ে উনত্রিশ দিনে পৃথিবীকে এক বার প্রদক্ষিণ করে। চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের (দ্র) মধ্যে অবস্থান করে তখন অমাবস্যা হয়। অপরদিকে পৃথিবী যখন চাঁদ ও সূর্যের মধ্যে অবস্থান করে তখন পূর্ণিমা হয়।

চাঁদের বুকে বেশ কিছু সমভূমি, পাহাড়-পর্বত এবং বিরাট বিরাট গর্ত আছে। যে পরিমাণ সূর্যের আলো চাঁদের পিঠে পড়ে তার শতকরা ৭ ভাগ প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীর কেন্দ্র এবং পানির ওপর চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণের পার্থক্যের কারণে জোয়ার-ভাটা (দ্র) হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে অবশ্য সূর্যের আকর্ষণের চেয়ে চাঁদের আকর্ষণ সোয়া দুই গুণ বেশি। চাঁদের এ আকর্ষণশক্তি স্থলভাগের কেন্দ্রস্থলে ও ভূপৃষ্ঠের জলরাশির উপর কার্যকর। আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সামনে আসে সেই অংশে এবং তার বিপরীত অংশে সমুদ্রের পানি ফুলে উঠলে জোয়ার হয়। স্থান দু'টির মাঝামাঝিতে সমকোণে অবস্থিত অপর স্থান দু'টিতে পানি নেমে ভাটা হয়।

১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই (ওয়াশিংটন সময় রাত ১০.৪৬ মিনিটে) নীল আর্মস্ট্রং সর্বপ্রথম চাঁদের মাটিতে পা রাখেন।এ কাজে অ্যাপোলো-১১ নভোযানের 'ঈগল' নামক লুনার মড্যুল ব্যবহার করা হয়। ঈগলের 'পাইলট' ছিলেন এডউইন ই. অল্‌ড্রিন। আর্মস্ট্রং এবং অল্‌ড্রিন যখন চাঁদের পিঠে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, তখন 'কলম্বিয়া' নামক মূল যান বা 'কমাণ্ড মড্যুল'-এর পাইলট মাইকেল কলিন্স চাঁদ প্রদক্ষিণকাজে নিয়োজিত ছিলেন।

চাঁদ থেকে সংগ্রহ করে আনা শিলাখণ্ড পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে চাঁদে কোনো পানি নেই এবং কোনো জৈব পদার্থ নেই। এ ছাড়া চাঁদে বাতাস নেই, তাই সেখানে কোনো শব্দও নেই। চাঁদের বুকে শৈত্য ও উত্তাপের পার্থক্য অনেক বেশি। নিরক্ষরেখা বরাবর চাঁদের উপরিভাগের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা −১৭১° সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১১৭° সেলসিয়াস। মানুষের বসবাসের জন্য চাঁদের পরিবেশ তাই মোটেও অনুকূল নয়।

মু. আ.

www.pathagar.com

চাঁদ সুলতানা [? —১৬০০]

দাক্ষিণাত্যের (দ্র) আহমদনগরের সুলতান হুসেন নিযাম শাহের কন্যা এবং বিজাপুর রাজ্যের রাজার বিধবা পত্নী।

সম্রাট আকবরের (দ্র) বিশাল মোগল বাহিনী দাক্ষিণাত্য জয়ের উদ্দেশ্যে ১৫৯৩ সালে আহমদনগর দুর্গ অবরোধ করে। আহমদনগরের রাজঅভিভাবিকা চাঁদ সুলতানার নেতৃত্বে তাঁর সৈন্যবাহিনী মোগল বাহিনীকে বীরত্বের সঙ্গে বাধা প্রদান করে। মোগলদের সঙ্গে চাঁদ সুলতানার সন্ধি-চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে বেরার প্রদেশ মোগলদের ছেড়ে দেওয়া হয় এবং আহমদনগরের শিশু সুলতান সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে রাজ্যের এক দল সৈন্য মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বিদ্রোহীদের চক্রান্তে ১৬০০ সালে চাঁদ সুলতানা নিহত হন। চাঁদ সুলতানা 'চাঁদ বিবি' নামেও পরিচিত।

খু. জা.

চাঁদের পাহাড়

অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (দ্র) লেখা ছোটদের জন্য রোমাঞ্চকর কাহিনী বা অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস। সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত মাসিক 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রায় এক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বের হয়। বই হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। এ উপন্যাসটিই বিভূতিভূষণের প্রথম শিশু-কিশোরপাঠ্য বই। 'চাঁদের পাহাড়ে'র মতো শ্বাসরুদ্ধকর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বাংলায় দু-চারটির বেশি নেই।

গল্পের নায়ক শঙ্কর। পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের ছেলে এফ. এ. (এখনকার এইচ. এসসি.) পাশ করে ঘরে বসে রয়েছে। এর বেশি পড়াশোনা করার আর্থিক সামর্থ্য নেই। তবে সে ছিল প্রখর বুদ্ধিমান, সাহসী, ডানপিটে এবং একেবারে বইয়ের পোকা। যাক, শেষ পর্যন্ত সে এক আত্মীয়ের কল্যাণে চাকুরি পায়। তবে, সে চাকুরি দেশে নয়, বিদেশে; এবং যে-সে বিদেশে নয়, একেবারে জঙ্গুলে আফ্রিকায় (দ্র)। স্বাভাবিকভাবেই, 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসের পটভূমি, ঘটনা, চরিত্র সবই আফ্রিকার। আশ্চর্যের ব্যাপার, লেখক নিজে কখনো সে দেশে যান নি। উপন্যাসের গোড়াতেই তিনি বলে দিয়েছেন : "চাঁদের পাহাড় কোনো ইংরেজি উপন্যাসের অনুবাদ নয়, বা ঐ শ্রেণীর কোনো বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বইয়ের গল্প ও চরিত্র আমার কল্পনাপ্রসূত। তবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রকৃত অবস্থার অনুযায়ী করবার জন্য আমি স্যার এইচ. এইচ. জনস্টন, রোসিটা ফর্‌বস প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি।"

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে (দ্র) প্রকৃতি বর্ণনার ও প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের শ্রেষ্ঠ লেখক। আফ্রিকা মহাদেশের বিশেষত্বই হল তার বিপদসঙ্কুল অরণ্য, অচেনা প্রাণিজগৎ এবং সভ্যতার আদিম পর্যায়ে রয়ে-যাওয়া অনেক মানবগোষ্ঠী। লেখক সেই অদেখা রহস্যময় জগতে এক বাঙালি যুবককে নিয়ে গিয়ে কত কাণ্ডই না ঘটিয়েছেন। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদার লিখেছেন যে 'চাঁদের পাহাড়' বিশ্বের শিশুসাহিত্যের যে কোনো দরবারে সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

হা. মা.

চাঁদের হাট শিশুসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র

চাঁপা

সুন্দর, উঁচু ও হরিৎ বৃক্ষ। এ গাছের কাণ্ড লম্বা, সোজা ও গোল। এর উচ্চতা তেত্রিশ মিটারেরও বেশি হতে পারে। ভাল গাছের গুঁড়ি বেশ মোটা হয়ে থাকে এবং তেমন ক্ষেত্রে কাণ্ডের বেড় পাঁচ মিটারেরও বেশি হয়। চাঁপার বৈজ্ঞানিক নাম *মাইকেলিয়া চম্পকা (Michelia champaca)* / এ গাছ ম্যাগনোলিয়াসি (Magnoliaceae) গোত্রভুক্ত। এ গাছের কাঠ খুব দামী। ভাল আসবাবপত্র তৈরির কাজে তা ব্যবহার করা হয়। এর সার-কাঠের রঙ কিঞ্চিৎ হলদে এবং অসার-কাঠের রঙ সাদা। অসার-কাঠ অবশ্য পরিমাণে কম। কাঠ সোজা ও আঁশযুক্ত, তাই সহজে পালিশ করা যায়। এ গাছের ফুল থেকে সুগন্ধি তেল পাওয়া যায়। অন্যান্য সুগন্ধি তৈরিতেও তা ব্যবহার করা হয়। চাঁপা ফুল থেকে এক রকম রং পাওয়া যায় এবং তা দিয়ে রেশমি কাপড় রঙ করা হয়।

মু. আ.

চা

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় পানীয়ের মধ্যে চা অন্যতম। শুষ্ক

www.pathagar.com

চা-পাতার ওপর ফুটন্ত পানি (দ্র) ঢেলে এটি তৈরি হয়। মাথাপিছু সর্বাধিক চা পানের পরিমাণ দেখা যায় আয়ারল্যাণ্ডে—বছরে জনপ্রতি ১৬০০ কাপ। তার পরেই ব্রিটেন আর নিউজিল্যাণ্ডের স্থান। প্রতি বছর সারা বিশ্বে ১৮০ কোটি কিলোগ্রাম শুষ্ক চা-পাতা উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় ভারতে (দ্র), চীনে (দ্র) তার চেয়ে কিছুটা কম। অন্যান্য উৎপাদনকারীর মধ্যে অগ্রণী হচ্ছে শ্রীলঙ্কা (দ্র), রাশিয়া (দ্র), বাংলাদেশ (দ্র), কেনিয়া ও ইন্দোনেশিয়া (দ্র)।

উষ্ণ, আর্দ্র আবহাওয়ায় (দ্র) পানি জমে না এমন ঈষৎ ঢালু ভূমিতেই চা গাছ ভাল জন্মে। এর জন্য আদর্শ উচ্চতা হল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯০০ থেকে ২০০০ মিটার। এরকম উচ্চতায় চা গাছ বাড়ে ধীরে, কিন্তু এর স্বাদ হয় ভাল। চা গাছকে অবাধে বাড়তে দিলে ৯ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। কিন্তু বাগানে একে ছেঁটে মাত্র ১ মিটারের মতো উচ্চতায় রাখা হয়। নতুন চারা ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে চা দিতে পারে। এ সময় তা থেকে দু'টি পাতা ও একটি কুঁড়ির সমন্বয়ে নিত্যনতুন কচি শাখা বের হতে থাকে। চা সংগ্রহকারীরা এগুলোই ছিঁড়ে নিয়ে তাদের পিঠে ঝোলানো ঝুড়ির মধ্যে ফেলে। আমাদের অধিক পরিচিত কালো চা তৈরির জন্য পাতাকে তাকে তাকে মেলে দিয়ে এবং তার উপর বায়ুপ্রবাহ বইয়ে দিয়ে শুকিয়ে ফেলা হয়। এর পর দুই রোলারের মধ্যে নিষ্পেষণে এর কিছু রস বের করে আনা হয়। এ অবস্থায় একটি বিশেষ কক্ষে সঠিক উষ্ণতা ও আর্দ্রতা রেখে এর মধ্যে খমিরায়ন বিক্রিয়া ঘটতে দেওয়া হয়। সবশেষে উত্তাপের মধ্যে শুকিয়ে নিলে এটি খয়েরি-কালো রঙ ধারণ করে। সবুজ চা তৈরির জন্য শুরুতে পাতাকে বড় বড় পাত্রে বাষ্পের মধ্যে রাখা হয় যাতে পরে পাতার সবুজ রঙ পরিবর্তিত না হয়। খমিরায়ন করাটা বাদ দিলে বাকি পদ্ধতি কালো চায়ের মতোই।

বিভিন্ন দেশের চায়ের, এমনকি একই দেশের বিভিন্ন বাগানের চায়েরও স্বাদ-গন্ধ ও অন্যান্য গুণের তফাৎ ঘটে। চা-কোম্পানি অভিজ্ঞ চা-আস্বাদনকারী নিয়োগ করে; এঁরা স্বাদ-গন্ধ পরখ করে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকমের চা নির্বাচন করেন এবং সঠিক অনুপাতে মিশিয়ে কোম্পানির জনপ্রিয় ব্র্যাণ্ডের চা-এর মান ঠিক রাখেন। চায়ে থাকা ক্যাফিন নামক (দ্র) একটি তিক্ত স্বাদের গন্ধহীন উপাদানের কারণে চা পানে শরীরে একটু চাঙ্গা ভাব আসে। তবে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করলে ক্যাফিন কারো কারো জন্য অস্থিরতা, অনিদ্রা, মাথাধরা, পরিপাকের গোলযোগ ইত্যাদি সৃষ্টি করে। তা ছাড়া চায়ে ট্যানিন্ নামের অরেকটি উপাদানের আধিক্যও ক্ষতিকারক। পাতা বেশি সেদ্ধ করলে এগুলো বেশি নির্গত হয়।

চা পানের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে রচিত চীনা সাহিত্যে। চীন দেশে এর বহু আগে থেকেই চা প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। চা এখান থেকেই জাপানে (দ্র) এবং পূর্ব-এশিয়ায় বিস্তৃত হয়। ১৬০০ সালের দিকে ইউরোপীয়রা পূর্ব-এশিয়া থেকে চা প্রথম তাদের দেশে আমাদানি শুরু করে এবং অচিরেই সেখানে খুবই জনপ্রিয় পানীয়ে পরিণত হয়। আমাদের দেশে চা প্রচলিত হয়েছে ব্রিটিশ আমলে।

মু. ই.

চাকমা

চাকমা জনগোষ্ঠী রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়িতে বাস করে ও এই তিনটি জেলার প্রধান আদিবাসী। ১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে চাকমাদের সংখ্যা ২,২৪,২৭৯ জন। এ ছাড়া কক্সবাজারেও (দ্র) চাকমারা বাস করে। চাকমারা

www.pathagar.com

নিজেদেরকে চাঙমা বলে। বাংলাদেশ (দ্র) ছাড়া ভারতের(দ্র) ত্রিপুরা, মিজোরাম, আসাম, মেঘালয় ও অরুণাচলে চাকমা জনগোষ্ঠী আছে। বার্মার (দ্র) আকিয়াব জেলাতেও চাকমাদের একটি সম্প্রদায় আছে।

চাকমারা মঙ্গোলীয় জাতির একটি শাখা। ধর্মের (দ্র) দিক থেকেও মঙ্গোলীয়দের মতো তারা বৌদ্ধ (দ্র)। বুদ্ধপূর্ণিমা (দ্র) ও অন্যান্য প্রধান পূর্ণিমা ছাড়া বিজু (দ্র) তাদের প্রধান আনন্দ-উৎসব। বাংলা বছরের শেষ দুই দিন ও নববর্ষের প্রথম দিন নিয়ে তারা বিঝু উৎসব পালন করে।

চাকমা মেয়েরা নিজেদের তাঁতে কাপড় বুনছে
নিচে : একটি অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে

কৃষি তাদের প্রধান জীবিকা। জুম (দ্র) চাষের মাধ্যমে তারা পাহাড়ের গায়ে ও ঢালুতে ধান (দ্র), ভুট্টা (দ্র), তুলা (দ্র), আদা, হলুদ, ওল, মার্ফা (শসা জাতীয় ফল) ইত্যাদি শস্য ফলায়। বাঁশের কোঁড় বা কচি বাঁশ তাদের একটি প্রিয় খাদ্য। বাঁশ ও বেতের আসবাবপত্র তৈরিতে এবং কাপড় বোনায় তারা পারদর্শী। লেখাপড়া ও শিক্ষাদীক্ষায় চাকমারা অন্য সব উপজাতির চেয়ে অগ্রসর। শিক্ষার হার বাঙালিদের চেয়ে কম নয়।

চাকমারা একাধিক শাখা ও উপশাখায় বিভক্ত। নিজ নিজ উপশাখা বা গোছার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। প্রত্যেক গোছায় এক জন করে প্রধান বা 'দেওয়ান' থাকে। চাকমাদের এক জন রাজা আছে। এই রাজার উপাধি রায়। দেবাশীষ রায় বর্তমানে চাকমাদের রাজা।

তাদের ভাষার নাম চাকমা। চাকমাকে ভাষাতাত্ত্বিকগণ বাংলা ভাষারই একটি উপভাষারূপে গণ্য করেন। বাংলার

www.pathagar.com

দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের উপভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ হলেও চাকমা ভাষার মধ্যে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য এসে গেছে যে একে প্রায় একটি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দেওয়া যায়। ব্যাকরণের দিক থেকে চট্টগ্রাম (দ্র) অঞ্চলের বাংলার সঙ্গে চাকমা ভাষার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। চাকমা ভাষা খ্মের্ লিপিতে লেখা হয়ে থাকে।

বি. ব.

চাকমা বিদ্রোহ

ইংরেজদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী চাকমা আদিবাসীগণ ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৯ সাল সময়কালের মধ্যে চারটি পর্যায়ে যে সশস্ত্র আন্দোলন ও লড়াই পরিচালনা করেন তা-ই 'চাকমা বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

চাকমা আদিবাসীরা সেই সুদূর প্রাচীন কাল থেকে অনুর্বর পার্বত্য জমিতে কার্পাস তুলার ফসল ফলিয়ে তা চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে নিয়ে আসত এবং বিনিময়ে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করত। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের অধিকারী হওয়ার পর তারা বাইরের কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কার্পাস-কর আদায়ের চুক্তি করে তাকে পার্বত্য অঞ্চল ইজারা দিতে শুরু করে। ফলে ইজারাদারেরা বিভিন্ন কৌশলে এই সব সরল পাহাড়ি অধিবাসী চাকমাদের কাছ থেকে রাজস্বের নির্দিষ্ট পরিমাণের চাইতেও কয়েক গুণ বেশি তুলা আদায় করত এবং চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা ইংরেজদের কাছে জমা দিয়ে বাদবাকি তুলা আত্মসাৎ করত।

এই সব অন্যায়ের অবসান ঘটাতে ১৭৭৬ সালে চাকমারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ চলে ১৭৭৭ সাল পর্যন্ত। এতে নেতৃত্ব দেন চাকমা দলপতি 'রাজা' শের দৌলত খাঁ ও তাঁর সেনাপতি রামু খাঁ। এই বিদ্রোহে ইংরেজদের নিযুক্ত বহু কর্মচারী হতাহত হয়।

চাকমাদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ১৭৮২ সালে। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন প্রয়াত শের দৌলত খাঁর পুত্র 'রাজা' জানবক্স্ খাঁ। তৃতীয় ও চতুর্থ বিদ্রোহও (১৭৮৪-৮৯) সংঘটিত হয় তাঁরই নেতৃত্বে। এই বিদ্রোহ ছিল বর্তমান কালের গেরিলা যুদ্ধেরই অনুরূপ।

চাকমাদের এইরূপ পৌনঃপুনিক বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ শাসকদের টনক নড়ে। ফলে তারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে একটি আপস-রফায় আসতে বাধ্য হয়। ১৭৮৯ সালের জুন মাসে ইংরেজ শাসকগণ স্থির করেন যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইজারা-প্রথা রহিত করা হবে এবং কার্পাস-কর তুলে দিয়ে 'জুমিয়া' বা চাকমা সর্দারদের সঙ্গে পরিমিত জমা (টাকা) ধার্য করা হবে। পরে আপসের শর্তানুসারে চাকমা সর্দারগণই এই রাজস্ব সংগ্রহ করতেন এবং সরকারি কালেক্টরের অফিসে তা নিজেরাই জমা দিতেন।

আ. হু.

চাকসু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দ্র

চাকা

চাকা কবে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কে প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছে তা জানা যায় নি। কিন্তু এশিয়া (দ্র)-তে খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দে যে চাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই চাকার মাঝখানে কোনো ফাঁক ছিল না। কাঠের বেলনাকার গুঁড়ি থেকে তৈরি দুটো চাকার চক্রকেন্দ্রের ভিতর দিয়ে একটি দণ্ড প্রবেশ করানো হয়। এই দণ্ডকে বলা হয় অক্ষধুরা বা চক্রনেমি। চাকার যে বিন্দুর ভিতর দিয়ে

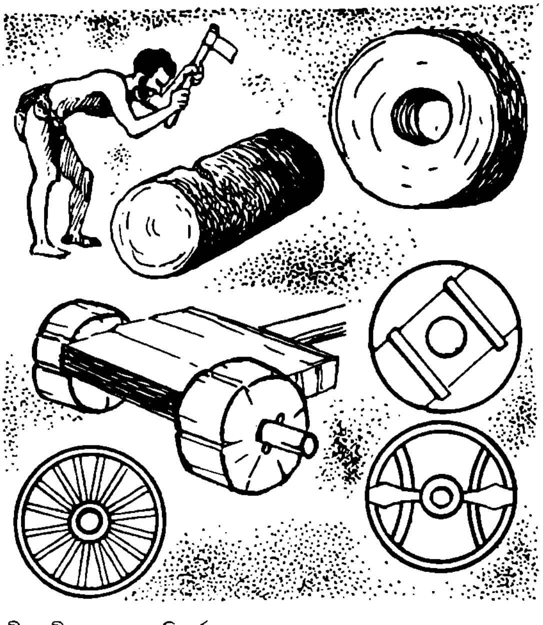

ধীরে ধীরে চাকার পরিবর্তন হয়েছে

www.pathagar.com

অক্ষধুরা প্রবেশ করে তাকে বলা হয় বিয়ারিং। অক্ষধুরার ওপরে গাড়ির ওজন চাপানো হয়। চাকা ঘুরবার সময় অক্ষধুরা স্থির থাকে এবং চাকার চক্রকেন্দ্র বা চক্রনাভির সঙ্গে এর ঘর্ষণ হয়। এর ফলে বেশ কিছু শক্তি খরচ হয় এবং তাপ উৎপন্ন হয়। এতে গাড়ির গতি যেমন মন্থরিত হয় তেমনি চক্রনাভি ও অক্ষধুরা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় দ্রুত।

দীর্ঘ সময় ধরে চাকার ব্যবহারে নানা উদ্ভাবন ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দে মিশরে মাঝখানে ফাঁকা ও অরযুক্ত চাকার উদ্ভাবন ঘটে। এর ফলে চাকা অনেকটা হালকা হয় ও তাতে ঘোড়ায় টানা গাড়িগুলো বেশ দ্রুত চলতে পারে। চক্রনাভি ও অক্ষধুরার মধ্যে ঘর্ষণ কমাতে বলবিয়ারিং-এর প্রচলন ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এ ক্ষেত্রে অনেকগুলো ইস্পাতের বল চক্রাকারে বসানো থাকে চক্রনাভি ও অক্ষধুরার মধ্যে। চক্রনাভি এর ফলে অক্ষধুরার সঙ্গে ঘর্ষণ খেতে খেতে না চলে ঘুরে ঘুরে চলে এবং ঘর্ষণ অনেক কমে যায়। ঘর্ষণ কমাবার জন্য এখানে তেল বা গ্রিজও ব্যবহার করা হয়। চাকার পরিধির উপরে রাবারের (দ্র) টায়ার ও টিউব ব্যবহার করার ফলে ঝাঁকুনিও কম লাগে।

ডাঙায় চলা সব রকম যানবাহন, যেমন— বাইসাইকেল, রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি, মোটরগাড়ি (দ্র) বা রেলগাড়িতে (দ্র) চাকা ব্যবহৃত হয়, এমনকি প্লেনও উড়তে পারত না রানওয়ের ওপরে ছোটবার জন্য চাকা না থাকলে। চাকা মনুষ্যসভ্যতার একটি বড় ভিত্তি।

আ. আ.

চাণক্য

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর বিখ্যাত কূটনীতিবিশারদ পণ্ডিত। কৌটিল্য নামেও তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর অন্য নাম বিষ্ণুগুপ্ত। তিনি তক্ষশীলায় জন্মগ্রহণ করেন। নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মগধের নন্দবংশীয় রাজার পণ্ডিতসভায় অপমানিত হলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা নিয়ে রাজসভা ত্যাগ করেন। পরে তাঁর পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দবংশ ধ্বংস করে মগধের রাজা হন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৩২১–২৯৮ অব্দ। চাণক্য পরে চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী হয়ে দক্ষতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করেন। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানগ্রন্থ 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' তাঁর রচনা। এই গ্রন্থে সরকার ও প্রশাসন বিষয় ছাড়াও চিকিৎসাশাস্ত্র, খনিজ উত্তোলন, লোকগণনা, আবহতত্ত্ব, জলযান তত্ত্ব, জরিপ তত্ত্ব ও ইত্যাদি রয়েছে। সমসাময়িক ভারতীয় জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে খুঁটিনাটি বিবরণ এতে আছে। প্লেটো (দ্র) ও আরিস্টোটলের (দ্র) রচনাবলি থেকে এই বই অধিক ব্যবহারোপযোগী কিন্তু এর নৈতিকতার মান খুব উন্নত নয়। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কৌশলের জন্য তাঁকে প্রাচ্যের মাকিয়াভেল্লি (দ্র) বলা হয়। তাঁর আর একটি গ্রন্থের নাম 'চাণক্য-রাজনীতিশাস্ত্র'।

বি. ব.

চারণিক নাট্যগোষ্ঠী অমলেন্দু বিশ্বাস দ্র

চারুকলা ইনস্টিটিউট

১৯৪৮ সালে 'গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট' নামে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের (দ্র) প্রভূত অবদান রয়েছে।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার বর্তমান সাংগঠনিক রূপে সরাসরি উন্নীত হয় নি। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এর ক্লাস, দাপ্তরিক বা প্রশাসনিক কাজকর্ম চলত জনসন রোডে অবস্থিত তখনকার ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের জীর্ণ গৃহে। সূচনালগ্নে এর বিভাগ ছিল মাত্র ৪টি—প্রাথমিক বিভাগ, সুকুমার কলা বিভাগ, বাণিজ্যিক শিল্প বিভাগ এবং রেখাচিত্রণ বিভাগ। ১৯৫৫ থেকে ১৯৭২ সাল সময়ের মধ্যে এই সব বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রাচ্যকলা বিভাগ (১৯৫৫), মৃৎশিল্প বিভাগ (১৯৬২), ভাস্কর্য বিভাগ (১৯৬৫) এবং কারুশিল্প বিভাগ (১৯৭২)।

১৯৫১ সালে এটি স্থানান্তরিত হয় সেগুনবাগিচার একটি বাড়িতে (যে বাড়িতে এক সময় সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ছিল)। অবশেষে ১৯৫৪ সালে এটি উঠে আসে বর্তমান ভবনে। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আর্ট ইনস্টিটিউটের এই নতুন নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি সংলগ্ন এই ভবনের প্রশস্ত চত্বরটি এক সময় ঢাকার নবাববাড়ির উদ্যান ছিল বলে এতে প্রচুর গাছপালার সমারোহ। ইনস্টিটিউটের মূল ভবনের কাজ

www.pathagar.com

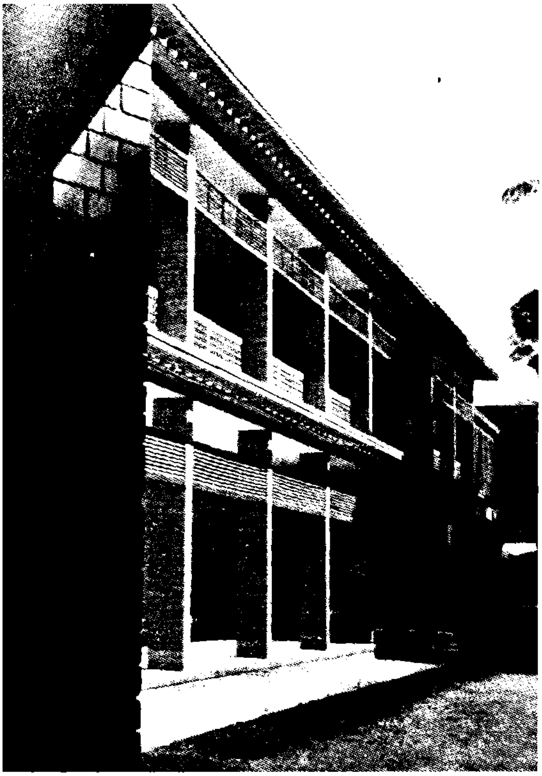

স্থাপত্য শিল্পকলার এক নান্দনিক নিদর্শন চারুকলা ইনস্টিটিউট : ১৯৫৬ স্থপতি মাজহারুল ইসলাম

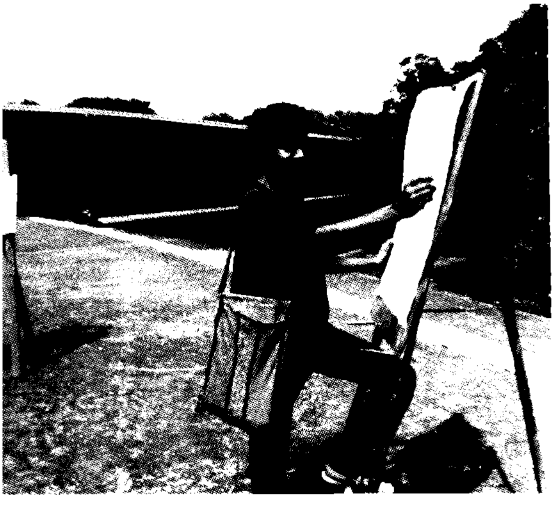

শেষ হয় ১৯৫৬ সালে। এর নকশাবিদ দেশের প্রখ্যাত স্থপতি মাজহারুল ইসলাম। মোট ১১ বিঘা জমির ওপর এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত।

১৯৬৩ সালে এটি উন্নীত হয় একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে এবং এর নতুন নাম হয় 'বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়'। এখানে প্রবর্তন করা হয় ৫ বছরের সার্টিফিকেট কোর্সের পরিবর্তে ২ বছরের প্রাথমিক কোর্সসমেত ৫ বছরের বি. এফ. এ. ডিগ্রি কোর্স।

মাত্র ৬৬ জন ছাত্র থাকবার উপযোগী একটি ছাত্রাবাস রয়েছে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। এটি অবস্থিত নিউ মার্কেটের পেছনে।

১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের এক সিদ্ধান্তক্রমে 'বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়'কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে নিয়ে আসা হয় এবং এর নতুন নাম হয় 'চারুকলা ইনস্টিটিউট'। ১৯৯৩ সালে এখানে প্রবর্তন করা হয় অনার্স কোর্স এবং মাস্টার্স কোর্স। স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্যাদাসম্পন্ন এই ইনস্টিটিউট বর্তমানে এর একাডেমিক কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত। ইনস্টিটিউটের আর্থিক ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যাবতীয় শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট। প্রতিষ্ঠানটির সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্মকর্তা এর ডিরেক্টর বা পরিচালক।

বর্তমানে চারুকলা ইনস্টিটিউটের বিভাগের সংখ্যা ৮টি—১. পেইন্টিং বিভাগ, ২. ছাপচিত্র বিভাগ, ৩.ভাস্কর্য বিভাগ, ৪. ক্রাফ্‌ট্‌স্ বিভাগ, ৫. গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ৬. ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং বিভাগ, ৭. মৃৎশিল্প বিভাগ এবং ৮. হিস্ট্রি অব আর্টস বিভাগ (কেবল স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য)। প্রতিটি বিভাগের এক জন করে 'চেয়ারম্যান' অর্থাৎ বিভাগীয় প্রধান রয়েছেন। অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের সংখ্যা ৩০ জনের মতো। প্রশাসনিক ভবনের নিচে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব আর্ট গ্যালারি রয়েছে, যেখানে প্রায়শ নবীন ও প্রবীণ অঙ্কনশিল্পীদের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী হয়ে থাকে।

আ. হু.

www.pathagar.com

চার্চিল, স্যার উইনস্টন [১৮৭৪—১৯৬৫]

ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, সৈনিক ও লেখক। উইনস্টন লেনার্ড স্পেন্সার চার্চিল (Sir Winston Leonard Spencer Churchill) লেখাপড়া করেন ব্রাইটন এবং হ্যারো শহরে। সতেরো বছর বয়সে স্যাণ্ডহার্স্ট সামরিক একাডেমীতে ভর্তি হন। ১৮৯৬ সালে সৈনিক হিসাবে কর্মজীবনের শুরু। প্রথম কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ। রাজনীতি বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা করেন এ সময়। ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত মর্নিং পোস্ট পত্রিকার যুদ্ধ বিষয়ক সংবাদদাতা হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান করেন। তাঁর লেখা রিপোর্ট বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। উদারনৈতিক দল, রক্ষণশীল দল ও টোরি দলের হয়ে একাধিক বার পার্লামেন্টে সদস্য ও মন্ত্রী হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় চার্চিল যুদ্ধাস্ত্র-মন্ত্রী এবং যুদ্ধের পরে যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ এবং পরে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। এর আগে দু'বার নৌবাহিনীর প্রধান কর্তাও নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। ইংরেজি ভাষায় রচিত 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস'(৬ খণ্ড), 'বিশ্বসঙ্কট' (৪ খণ্ড) এবং 'ইংরেজিভাষী জনগণের ইতিহাস' (৪ খণ্ড), 'সমকালের মহৎ কয়েক জন মানুষ' ও 'বিজয়' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি ১৯৫৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ও নাইট উপাধি পান।

আ. মা.

চার্জ আধান দ্র

চার্বাক দর্শন/লোকায়ত দর্শন

চার্বাক মুনি প্রণীত দর্শনকে বলে চার্বাক দর্শন। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন নাস্তিক। তাঁর মতে— বেদ, শাস্ত্র সবই ভুল এবং পরলোক, স্বর্গ, মুক্তি কিছুই নেই। তিনি বাস্তববাদের প্রচারক। তাঁর মতে—সচেতন দেহ ছাড়া আত্মা নেই। প্রত্যক্ষভাবে দেখাই প্রমাণ, অনুমানের দ্বারা কিছু প্রমাণিত হয় না। সুখই পরম কাম্য। মৃত্যুই জীবনের শেষ। তাই পরলোক বা পরকালের সুখভোগের আশায় ইহলোক অবহেলা করা মূর্খতা। 'ঋণ করেও ঘি খাও'—এসব আপাতভাবে সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন বলে তাঁর নাম চার্বাক (অর্থাৎ চারু বাক্, যিনি সুন্দর কথা বলেন), আর তাঁর দর্শনের নাম চার্বাক দর্শন। আবার কেউ কেউ বলেন যে চার্বাক বলে কেউই ছিলেন না, লোক পরম্পরায় এসব কথা প্রচলিত; এবং তাই এর নাম লোকায়ত দর্শন। আবার বৃহস্পতিকে চার্বাক মতের প্রবর্তক বলা হয়। এই বৃহস্পতিকে দেবতাদের গুরু বলেও মনে করা হয়।

বি. ব.

চার্লি চ্যাপলিন চ্যাপলিন, চার্লি দ্র

চালতা

মাঝারি আকৃতির চিরহরিৎ ও ছায়াদানকারী এক প্রকার গাছ। এর ইংরেজি নাম এলিফ্যান্ট অ্যাপ্‌ল্ (Elephant apple) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *ডিলেনিয়া ইণ্ডিকা লিন্* (*Dillenia indica* Linn)। এ গাছ ডিলেনিয়েসীঈ (Dilleniaceae) গোত্রভুক্ত। বাংলাদেশ (দ্র), ভারত (দ্র), শ্রীলঙ্কা (দ্র), নেপাল (দ্র) ও মালয়েশিয়াতে (দ্র) চালতা গাছ ভাল জন্মে।

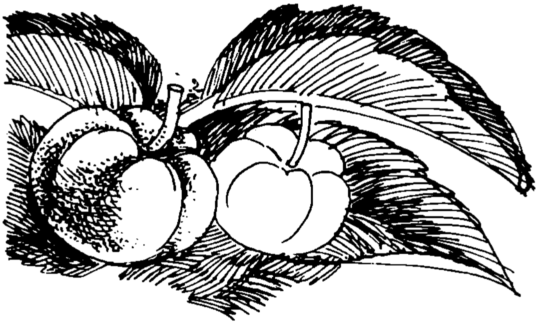

www.pathagar.com

এ গাছের কাণ্ড নাতিদীর্ঘ এবং এর শাখা-প্রশাখা এলোমেলোভাবে প্রসারিত। চালতা গাছের পাতার আকৃতি ও বিন্যাস বেশ আকর্ষণীয়। চালতার কাঠ মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী। তাই এ কাঠ নৌকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বন্দুকের বাঁট তৈরিতে এবং জ্বালানি হিসাবেও এ কাঠ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চালতার ফুল একক, বৃহৎ, সাদা ও সুগন্ধযুক্ত। বর্ষার শুরুতে চালতা গাছে ফুল ফোটে। এর ফল টক। এ টক ফল চাটনি ও টক সবজি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

চালতা ফলের রস চিনি ও পানির সঙ্গে মিশিয়ে সেবন করলে গলাব্যথা কমে যায়।

মু. আ.

চিংড়ি

চিংড়ি কাঁকড়ার (দ্র) সমগোত্রীয় খোলসযুক্ত অমেরুদণ্ডী (দ্র) প্রাণী। মিঠা ও লোনা পানিতে বাস করে। এটি পৃথিবীর (দ্র) সর্বত্র সুস্বাদু খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চিংড়ির নরম দেহটি শির, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত। শির ও বক্ষ শক্ত খোলসে আবৃত। এর উনিশ জোড়া উপাঙ্গ আছে। এটি হাঁটা ও সাঁতারের কাজে পাঁচ জোড়া ব্যবহার করে এবং খাবার ধরা, গর্ত করা, মারামারি প্রভৃতি কাজে প্রথম ২-৩ জোড়া চিমটাযুক্ত উপাঙ্গ ব্যবহার করে।

প্রজাতিভেদে চিংড়ির আকার, আকৃতি ও বর্ণে পার্থক্য থাকে। এরা ২–৩০ সেন্টিমিটার বড় হয়। মিঠা পানির চিংড়ির মধ্যে গলদা, গোদা, ছটকা, গুঁড়া উল্লেখযোগ্য। লোনা পানির মধ্যে বাগ্‌দা, চাকা, লালিয়া উল্লেখযোগ্য।

এরা নিশাচর প্রাণী। শেওলা (দ্র), জলজ আগাছা, ক্ষুদ্রাকার জীব (দ্র), গলিত জৈব পদার্থ প্রভৃতি খায়। একেক প্রজাতির জীবনপ্রণালী একেক রকম। তবে ডিম পাড়ার জন্য সব প্রজাতিকেই সমুদ্রে যেতে হয়। ডিম থেকে পর্যায়ক্রমে নপালিয়াস, জুইয়া, মেটাজুইয়া, পোস্ট লার্ভা স্তর পার হয়ে পূর্ণাঙ্গ চিংড়ি হয়। খোলস বদলানোর মাধ্যমে এদের বৃদ্ধি ঘটে। চিংড়ি ১–৩ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

চিকিৎসাবিজ্ঞান / চিকিৎসাবিদ্যা

রোগের (দ্র) চিকিৎসা এবং দেহের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জ্ঞান ও কৌশল চিকিৎসাবিজ্ঞান নামে অভিহিত। বাংলায় চিকিৎসাবিজ্ঞান শব্দটি ইংরেজি 'মেডিক্যাল সায়েন্স'-এর অনূদিত রূপ হলেও ইংরেজি 'মেডিসিন' শব্দটিও সাধারণভাবে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই ব্যবহারিক ত্রুটি এখনো চলছে। অর্থাৎ 'মেডিসিন' শব্দটির ব্যবহার দ্বিবিধ। এক, মেডিক্যাল সায়েন্স হিসাবে; দুই শল্য-চিকিৎসার বাইরে মেডিসিন নামক চিকিৎসাশাখা হিসাবে।

মেডিক্যাল সায়েন্স অর্থে চিকিৎসাবিজ্ঞান বলতে চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত সকল বিভাগই বোঝায়। যেমন—মেডিসিন বিভাগ, যেখানে চিকিৎসার মাধ্যম প্রধানত ঔষধ (দ্র), তেমনি সার্জারি বা শল্যবিদ্যা (দ্র) বিভাগের চিকিৎসাপদ্ধতি প্রধানত অস্ত্রোপচার ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা, যদিও ঔষধ বাদ দিয়ে নয়। আবার প্রসূতিবিদ্যা ও স্ত্রীরোগবিদ্যায় (অবস্টেট্রিক্স ও গাইনিকোলজি) মেডিসিন ও সার্জারি দু'য়েরই ব্যবহার রয়েছে। শিশুরোগবিদ্যার (পেডিয়াট্রিক্স) চিকিৎসা প্রধানত ঔষধভিত্তিক। আর রেডিওথেরাপির (দ্র) অবলম্বন বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি।

এ ছাড়াও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধীনে রয়েছে মৌলিক ও সংশিষ্ট কয়েকটি বিভাগ; যেমন—শারীরস্থান (এনাটমি), শারীরবিদ্যা (ফিজিওলজি), ভেষজবিদ্যা (ফার্মাকোলজি), অণুজীববিদ্যা (মাইক্রোবায়োলজি), রোগবিদ্যা (প্যাথোলজি), কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন, রেডিয়োলজি ইত্যাদি। ফিজিক্যাল মেডিসিন ও মনোরোগবিদ্যা (সাইকিয়াট্রি) আধুনিক সংযোজন হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসার স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ।

মেডিসিন বিভাগের মতো শল্যবিদ্যারও একাধিক উপবিভাগ রয়েছে, যেমন—অর্থোপেডিক্স, পেডিয়াট্রিক সার্জারি ইত্যাদি। এ সবকিছু মিলেই মেডিক্যাল সায়েন্স। অন্য দিকে মেডিসিন শব্দের সীমাবদ্ধ প্রয়োগে রয়েছে ঔষধ-চিকিৎসানির্ভর এবং একাধিক উপবিভাগসমৃদ্ধ মেডিসিন বিভাগ।

চিকিৎসাশাস্ত্রের সূচনা সুপ্রাচীন কালে মানবসভ্যতার বিশেষ এক পর্যায়ে। প্রাগৈতিহাসিক কালের চিকিৎসার কথা বাদ দিলেও প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, চীন (দ্র), ভারতবর্ষ, গ্রিস ইত্যাদি দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা ভেষজ ও শল্য-চিকিৎসা দুইই ধারণ করেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্যদের অনুসৃত চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদ (অর্থ—আয়ু সম্পর্কিত জ্ঞান) ভেষজ ও শল্যচিকিৎসা দুই দিকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নিজস্ব

www.pathagar.com

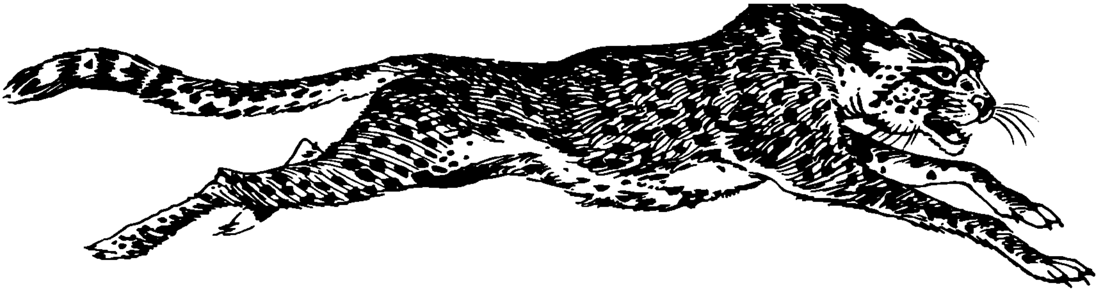

পশু-পাখির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত দৌড়ায় চিতা

বৈশিষ্ট্য নিয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র (দ্র) এখনো ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত চিকিৎসাবিধি। অন্য দিকে মধ্যযুগে ইরানে মূলত ভেষজজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ইউনানি চিকিৎসাবিদ্যা (দ্র) আয়ুর্বেদের মতোই প্রচলিত ছিল। তেমনি আঠারো শতকের শেষ দিকে প্রচলিত ছিল সামুয়েল্ হানেমান্ (দ্র) প্রবর্তিত হোমিওপ্যাথি (দ্র) নামক চিকিৎসাপদ্ধতি।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যুগান্তকারী আবিষ্কার চিকিৎসাশাস্ত্রকে তার নিজস্ব আবিষ্কার ছাড়াও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। চিকিৎসাশাস্ত্র সত্যিকার অর্থে হয়ে উঠেছে চিকিৎসাবিজ্ঞান। এই অগ্রগতিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে অণুজীববিদ্যা (দ্র) ও ভেষজবিদ্যার (দ্র) গবেষণা ও আবিষ্কার। এ ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানের (দ্র) হাত ধরে চিকিৎসাবিজ্ঞান গড়ে তুলেছে নতুন নতুন শাখা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রা এখন তাই বহুমুখী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক।

আ. র.

চিতা ও চিতাবাঘ

চিতা (Cheetah) বিড়াল জাতীয় স্তন্যপায়ী (দ্র) প্রাণী। দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন চিতা স্বল্প দূরত্বে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। এরা মধ্য ও পূর্ব-আফ্রিকার ঘাসপূর্ণ সমতলভূমিতে বাস করে। এরা বর্তমানে বিলুপ্তির পথে।

চিতা ও চিতাবাঘ এক নয়। শরীরের গঠন ও দেহাবরণের ছোপের ধরনে এদের অনেক পার্থক্য। চিতার মাথা ছোট, শরীর চিকন, পা সরু ও নাক লম্বা। ০.৯ মিটার উঁচু চিতার ওজন প্রায় ৪৫ কেজি। নাক থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত ১.৮–২.১ মিটার লম্বা। দেহাবরণ বাদামি-হলদে, তাতে কালো বুটি বুটি ছোপ। গলার নিচ, বুক ও পেটের রঙ হালকা; সেখানে কোনো বুটি নেই। লেজের ডগা সাদা, কানের গোড়া কালচিটে। অন্যান্য বিড়ালজাতীয় প্রাণীর মতো এরা পায়ের নখ সম্পূর্ণভাবে চামড়ার আড়ালে লুকাতে পারে না।

মাংসাশী চিতা সচরাচর দিনে শিকার করে। হরিণ (দ্র) বা অ্যান্টিলোপ এদের প্রিয় খাদ্য। এরা ঝোপের আড়ালে পেটে ভর দিয়ে চুপি চুপি শিকারের দিকে এগোয়। ১৪০–১৮০ মিটারের ভেতর এসে গেলেই বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারকে কাবু করে।

নিজের নির্দিষ্ট এলাকায় চিতা একাকী থাকতে ভালবাসে। তিন মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী চিতা দুই-চারটি বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা প্রায় পনেরো মাস মায়ের সঙ্গে থাকে। চিতা বিশ-পঁচিশ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু [১৮৭০—১৯২৫]

আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। সংক্ষেপে 'দেশবন্ধু' নামে সুপরিচিত। ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর কলিকাতা (দ্র) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকা (দ্র) জেলার বিক্রমপুরের তেলিরবাগগ্রামে। পিতা ভুবন-মোহন দাশ ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের এটর্নি।

কলিকাতার লণ্ডন মিশনারি স্কুলে পড়াশোনার পর

www.pathagar.com

১৮৯০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে আইনশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বিলেত গমন করেন। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৮৯৩ সালে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের (দ্র) কলিকাতা প্রতিনিধি হন। বিখ্যাত বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের (দ্র) পক্ষে দক্ষতার সঙ্গে রাজদ্রোহ মামলা পরিচালনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৭ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এর পর মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার, পাঞ্জাবে সরকারি দমননীতি ও জালিয়ানওয়ালাবাগ (দ্র) হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ-আন্দোলনে অংশ নেন। মহাত্মা গান্ধীর (দ্র) অসহযোগ আন্দোলনকে (দ্র) সফল করার জন্য তিনি সহস্র টাকা মাসিক আয়ের ব্যারিস্টারি পেশা ত্যাগ করেন। এই অসামান্য ত্যাগের জন্য বাংলার মানুষ তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯২১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে (দ্র) অংশ নেওয়ার কারণে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাংগঠনিক বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তিনি ১৯২২ সালে কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং 'স্বরাজ্য দল' গঠন করেন। ১৯২৩ সালে তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য রক্ষার জন্য স্বরাজ্য দল এবং মুসলমান নেতাদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে খ্যাত। চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে পর পর দু'বার মেয়র নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি চাকুরির ক্ষেত্রে অবহেলিত মুসলমানদের অধিক হারে সুযোগ দানের নীতি গ্রহণ করেন। রাজনীতির মধ্যে থেকেও তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি সে সময়ের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। 'মালঞ্চ', 'সাগর সঙ্গীত' ও 'অন্তর্যামী' গ্রন্থের জন্য তিনি কবি ও লেখক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে রচিত রবীন্দ্রনাথের (দ্র) অমর পঙ্‌ক্তি—"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান" —স্মরণীয় হয়ে আছে।

সুজ. ব.

চিত্রকলা

চিত্রকলার যাত্রা শুরু সেই আদিকাল থেকে। মানবজীবনের সবচেয়ে পুরানো এই সংস্কৃতিচর্চা সর্বকালে সর্ব-সমাজে বিভিন্নভাবে যেমন বিরাজমান তেমনি প্রতিদিনই নতুন মাত্রায়, নতুন তালে তার বিকাশ ঘটে চলেছে। ভাষার দুর্বোধ্যতা থাকলেও চিত্রকলার মাধ্যমেই মানুষ বিভিন্ন যুগের কথা, বিবর্তনের কথা, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কথা জানতে পেরেছে।

'চিত্রকলা' হাতে-কলমের কাজ। তৈরি হয় সাধারণত কাগজে, ক্যানভাসে, বিভিন্ন রকম কাপড়ে। চিত্রকলার জন্যে বিশেষ কাগজ ও ক্যানভাস তৈরি হয়ে থাকে। যখন কাগজ আবিষ্কৃত হয় নি, কাগজ ছিল না, তখনো মানুষ ছবি এঁকেছে; সে ছবি গুহার পাথুরে দেয়ালে, পশুর চামড়ায়, মাটিতে। এখনো দেয়ালে ছবি আঁকা হয় ভবনের ছাদে, মেঝেতে ও পাথরের গায়েও। চিত্রকলার প্রয়োজনে পাথর, সিমেন্ট (দ্র), মাটি (দ্র) ও বিভিন্ন ধাতুতে 'দেয়াল' তৈরি হয়। তাতে নানা রকম প্রক্রিয়ায় শিল্পীরা ছবি আঁকেন।

চিত্রকলার সহজ উপকরণ-হাতিয়ার হল রঙ, তুলি, কাগজ, ক্যানভাস, ছুরি, কাঁচি, পাথর, কাঠ, বালি-সিমেন্ট, গাম ইত্যাদি। যে শিল্পী যেভাবে ছবি আঁকবেন তিনি তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী উপকরণ বেছে নেবেন।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ চিত্রকলার সংগ্রহ ও সংরক্ষণকে খুব গুরুত্ব দিয়ে আসছে। উন্নত সব দেশে, সব জাতিতে গড়ে ওঠেছে বিরাট বিরাট শিল্প–সংগ্রহশালা বা গ্যালারি, জাদুঘর ইত্যাদি। সেখানে বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করা হচ্ছে হাজার হাজার চিত্রকলা ও অন্যান্য শিল্পকর্ম। চিত্রকলা মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

হা. খা.

চিত্রগুপ্ত

প্রাচীন ভারতীয় পৌরাণিক কল্পকথার সুবিদিত চরিত্র। নরকের অধীশ্বরের নাম যম। তিনি দেবতা, এবং দেবতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুণ্যবান বলে তাঁর নাম ধর্মরাজ। তিনি

www.pathagar.com

জীবগণের পাপ–পুণ্যের কর্তা। তাঁর অধীনে এই পাপ–পুণ্যের হিসাব রাখেন তাঁর মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত। মানুষ মৃত্যুর পর নরকে গমন করলে সেখানে চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতা খুলে প্রত্যেকের পাপ–পুণ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে চিত্রগুপ্তের জন্ম। ব্রহ্মা (দ্র) যখন জগৎ সৃষ্টির জন্য ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন, তখন তাঁর অঙ্গ থেকে নানা বর্ণে চিত্রিত এক পুরুষ দোয়াত ও কলম হাতে উদ্ভূত হন। জন্মের পর তিনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁকে কাজ করতে হবে কিনা। ব্রহ্মা পুত্রকে বললেন, মানুষের পাপ–পুণ্য বিচার করার জন্য তুমি যমের কাছে যাও। সেই থেকে পাপ–পুণ্যের চিত্রবিচিত্র হিসাব গুপ্ত রাখেন বলে তাঁর নাম চিত্রগুপ্ত। তিনি মানুষের ললাটে ভাবী শুভাশুভ ফলও লিখে থাকেন। কার্তিক মাসে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ায় চিত্রগুপ্তের পূজা হয়।

বি. ব.

চিত্রনাট্য

চলচ্চিত্র (দ্র) নির্মাণকাজে দু'টি স্পষ্ট পর্যায় বর্তমান—একটি পরিকল্পনার, অন্যটি প্রয়োগের। পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে প্রধানত রচনাকর্ম। নির্মীয়মাণ একটি ছবির ভিত্তি হিসাবে কাজ করে এই রচনাকর্ম কিংবা কাগজ-কলমের ছক এবং একেই বলা হয় চিত্রনাট্য।

চিত্রনাট্য আসলে এক বিশেষ ধরনের রচনাকর্ম। এটি যিনি রচনা করেন তাঁকে বলা হয় চিত্রনাট্যকার। এই চিত্রনাট্যকারের দায়িত্ব পালন করে থাকে চলচ্চিত্রকার বা চিত্রপরিচালক নিজে কিংবা তাঁর পছন্দসই এ বিষয়ে অভিজ্ঞ দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি।

চিত্রনাট্য দু'ধরনের হয়ে থাকে–১. খসড়া চিত্রনাট্য, যাতে নির্মীয়মাণ চলচ্চিত্রের প্রাথমিক রূপরেখা নির্দেশ করা হয়, এবং ২. চূড়ান্ত চিত্রনাট্য বা শুটিং স্ক্রিপ্ট, যাতে থাকে নির্মীয়মাণ চলচ্চিত্রটির বিভিন্ন কারিগরি নির্দেশনা, যেমন—ক্যামেরা (দ্র)-দৃষ্টিকোণ, সেটের অনুপুঙ্খ বর্ণনা, ইমেজের কম্পোজিশন, পাত্র–পাত্রীর পোশাক–পরিচ্ছদের বিবরণ এবং ধ্বনি ও সঙ্গীত বিষয়ে নির্দেশাবলি, সেই সঙ্গে সংলাপও। অর্থাৎ চূড়ান্ত চিত্রনাট্যে মূল কাহিনীর প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক অংশসমূহকে বিভিন্ন দৃশ্যের অসংখ্য শট্-এ বিভক্ত করে নেওয়া হয়। বিশ্বের অনেক নামীদামী চিত্রপরিচালক প্রায় প্রতিটি প্রধান প্রধান দৃশ্যখণ্ড কিংবা শট্-এর লিখিত বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছবি এঁকেও চূড়ান্ত চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কিংবা এখনো করে থাকেন। এতে করে শুটিং-এর সময়ই শুধু বাঁচে না, পরিচালক কী চান, উল্লিখিত শট্-এর আঁকা ছবি দেখে ক্যামেরাম্যান সহজেই সেলুলয়েডের ফিতেয় সেটা মূর্ত করে তুলতে পারেন। তাই যে কোনো চিত্রনাট্যকারকে শুধু সৃজনশীল কল্পনার অধিকারীই হতে হয় না, চিত্রমাধ্যম সম্পর্কেও হতে হয় পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

চিত্রনাট্যকার যদি প্রতিটি শট্-এর যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে পারেন, কাহিনী-বিন্যাস-সহায়ক চলচ্চিত্রের পরিভাষা ব্যবহার করে প্রায়োগিক নির্দেশ দিতে সক্ষম হন, অর্থাৎ চিত্রনাট্য যদি নিখুঁত হয়, তা হলে সম্পাদনাটেবিলে চলচ্চিত্র-সম্পাদকের কাঁচি চালাবার খুব একটা সুযোগ থাকে না। এর প্রমাণ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিরল নয়।

বিশ্বনন্দিত বাঙালি চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায় (দ্র) এ সম্পর্কে বলেন, "চিত্রনাট্য হল ছবির কাঠামো। ইমেজ ও ধ্বনির দ্বারা পর্দায় যা ব্যক্ত হবে, এ হল তার লিখিত ইঙ্গিত।... চিত্রনাট্য তাই অবহেলার জিনিস নয়। এতে যদি খুঁত থাকে, ছবির অঙ্গসৌষ্ঠবে তার প্রতিফলন হতে বাধ্য, তা সে পরিচালনা যতই সুষ্ঠু হোক। আবার চিত্রনাট্য ভাল হলেও নিশ্চিত হওয়া চলে না, কারণ দুর্বল পরিচালনার ফলে তা নষ্ট হতে পারে।"

আ. হু.

চিত্রলিপি

অক্ষর সৃষ্টির আগে মানুষ ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত। ছবি দিয়ে এই লেখাকে তাই চিত্রলিপি বলা হয়। প্রাচীন কালে প্রায় সব দেশেই লেখার কাজে চিত্রলিপি ব্যবহৃত হত। ঐ সব দেশের মধ্যে মিশর, মেসোপটেমিয়া, ক্রিট, আনাতোলিয়া (দ্র) ইত্যাদি দেশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিন্ধু, ইস্টার আয়ল্যাণ্ড এবং আরো কয়েকটি জায়গার লিপি এখনো পড়া যায় নি।

লেখালেখির আদিতে মানুষ কোনো জিনিস বোঝাতে চাইলে তার ছবি আঁকত এবং ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত। নানা ধরনের ছবি এঁকে নানা জিনিস বোঝানো হত। শিল্পী ছবি আঁকত পুরো জিনিসটির। কতকগুলো ছবি

www.pathagar.com

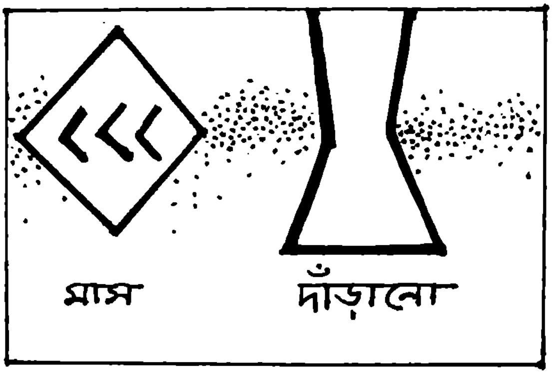

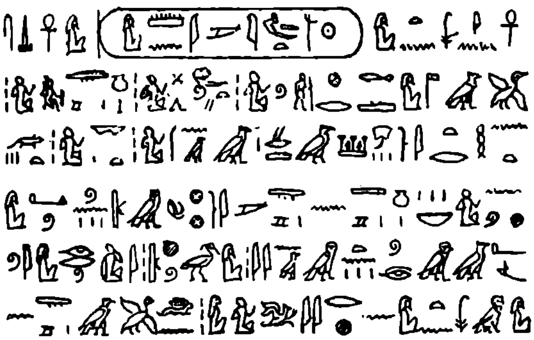

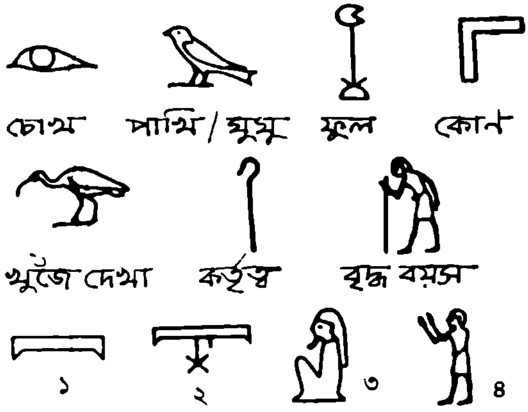

হায়ারোগ্লিফিক
চিত্রলিপির কিছু নমুনা
নিচে : চীনা চিত্রলিপি

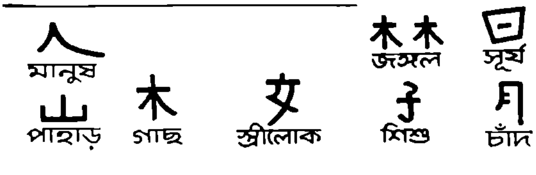

একটার পর একটা সাজিয়ে তৈরি হত একেকটা কাহিনী—একেকটি গল্প।

সুন্দর করে পুরো ছবি আঁকতে সময় লাগত। জীবিকার জন্য মানুষের অবসর দিন দিন কমছিল। পুরো ছবি আঁকবার মতো সময়ও তার কমে আসছিল। তাই ছবি সংক্ষিপ্ত হতে লাগল। এখন ছবিটির শুধু আদল বোঝা গেলেই হল। কিন্তু ঘন ঘন এবং তাড়াতাড়ি আঁকতে আঁকতে এক সময় জিনিসটির আদলও হারিয়ে গেল। ছবিটির জায়গা দখল করে নিল শুধু কতকগুলি রেখা। রেখাগুলি কালক্রমে সৃষ্টি করল অক্ষর। বিভিন্ন দেশে মাছের ছবি বিভিন্নভাবে আঁকা হয়েছে। একেবারে প্রাচীন কালের ছবিতে মাছের ধাঁচ ছবির মধ্যে স্পষ্ট। ক্রমে সেই ছবি লেখায় যে রূপ নিয়েছে তার সঙ্গে মাছের চেহারার একটুও মিল নেই।

ছবি দিয়ে লেখার অসুবিধাও ছিল। সবাই তো আর একই ছবি একইভাবে আঁকে না। তাই অনেক সময় একের আঁকা ছবি অন্যের পক্ষে বোঝা সহজ না-ও হতে পারে। শিল্পী যা বোঝাতে চান, সাধারণ পাঠক তা না বুঝে অন্য কিছু বুঝতে পারে। ফলে ভুল বোঝাবুঝি হওয়া বিচিত্র নয়। তাই ছবির ধাঁচ বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। এমনি করে ছবি আঁকলে এই বুঝতে হবে, ছবিতে এই এই জিনিস থাকলে তার অর্থ এই ধরে নিতে হবে, যেমন—এক জোড়া শিং দেখলে বুঝতে হবে সেটা একটা গরু, তীর আর ধনুক থাকলে বুঝতে হবে শিকারির কথা বলা হচ্ছে।

যে জিনিস দেখা যায়, তার ছবিও আঁকা যায়; যেমন—পাখি, তাঁবু, গাছের পাতা, মানুষ ইত্যাদি। তবে যে জিনিস চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, যেমন—মাস (দ্র), দাঁড়ানো ইত্যাদির ছবিতে আঁকা সহজ নয়। কিন্তু মেসোপটেমিয়াবাসীরা প্রায় চার হাজার বছর আগেই এই ধরনের কথা প্রকাশ করতে পারত।

প্রথম ছবিতে বোঝানো হয়েছে 'মাস'। চৌকা ঘরটি সূর্য। এর মধ্যে তিনটি দাগ আছে। একেকটি দাগ দিয়ে বোঝানো হয়েছে দশ দিন। ছবিটির অর্থ হল ত্রিশ দিন অর্থাৎ এক মাস। দ্বিতীয় ছবি পা দিয়ে 'দাঁড়ানো' ভাবটি বোঝানো হয়েছে। এর পর শুধু যা দেখছি, তাই-ই এঁকে বোঝানো হচ্ছে না, যা ভাবা হচ্ছে তা-ও বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে। দেখা এবং ভাবা—এই দু'টি জিনিস মিলে যে নতুন লেখার সৃষ্টি হল, তা চিত্রলিপির উন্নত অবস্থা। এই লিপিকে বলা হয়

www.pathagar.com

ভাবব্যঞ্জক লিপি। ভাবব্যঞ্জক লিপি চালুর পর লিপির মধ্যে চিত্রের ভাব কমে এল।

ছবি এঁকে লেখার রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এখনো চীন (দ্র) ও জাপানে (দ্র) হরফের পাশাপাশি চিত্রলিপির ব্যবহার দেখা যায়। ছবি এঁকে শুধু কথাই প্রকাশ করা হত না, সংখ্যাও প্রকাশ করা হত সেই প্রাচীন কালে। চিত্রলিপির মধ্যে হায়ারোগ্লিফ্ (hieroglyph) ও কিউনিফর্ম্ (cuneiform) লিপি বেশ পুরানো। হায়ারোগ্লিফ লিপির বেশির ভাগই তৈরি নানা পশু-পাখির ছবি দিয়ে। এদের মধ্যে সিংহ, প্যাঁচা, ঈগল, সাপ, সারস, হাঁস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শা. হ.

চিত্রাঙ্গদা

মহাভারতের (দ্র) একটি চরিত্র। চিত্রাঙ্গদা মণিপুররাজ চিত্রভানুর কন্যা। মহাদেবের তপস্যা করে চিত্রভানুর পূর্বপুরুষ অপুত্রক রাজা প্রভঞ্জন বর লাভ করেন যে তাঁর বংশের প্রত্যেক পুরুষই একটিমাত্র সন্তান লাভের অধিকারী হবেন। সুতরাং চিত্রাঙ্গদা চিত্রভানুর একমাত্র সন্তান। তাই চিত্রভানু কন্যাকে পুত্রের মতো লালনপালন করেন ও শিক্ষা দেন।

এদিকে দ্রৌপদীর (দ্র) সঙ্গে বিবাহের শর্ত ভঙ্গ করে অর্জুন বনবাসে বেরিয়ে মণিপুরে পৌঁছে সুন্দরী চিত্রাঙ্গদাকে দেখে তাঁর পাণিপ্রার্থী হন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত সন্তান মণিপুর রাজ্যের বংশধর হবে—এই শর্তে অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার বিবাহ হয়। অর্জুন মণিপুরে তিন বছর অবস্থান করেন এবং তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয়। তাঁর নাম বভ্রুবাহন।

পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব রক্ষার কাজে নিযুক্ত হয়ে অর্জুন আবার মণিপুরে আসেন। তখন অর্জুনের অন্য পত্নী নাগকন্যা উলূপীর প্ররোচনায় বভ্রুবাহন যজ্ঞাশ্ব আটক করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সেই যুদ্ধে অর্জুন জ্ঞান হারান। তখন উলূপী সঞ্জীবনী-মণি বক্ষে স্থাপন করে অর্জুনের চৈতন্য ফিরিয়ে আনেন। চিত্রাঙ্গদা স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও যজ্ঞকালে হস্তিনাপুরে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাস করতে থাকেন।

মহাভারতের এই কাহিনী অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ (দ্র) তাঁর অনবদ্য নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' রচনা করেছিলেন।

সুজ. ব.

চিনি

কার্বোহাইড্রেট (দ্র) বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে চিনি অন্যতম। এটি সাধারণত মিষ্টি স্বাদের হয় এবং খাদ্যকে মিষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। গ্লুকোজ (দ্র) সরলতম কার্বোহাইড্রেট। রক্তের (দ্র) মধ্যে যাওয়া এই চিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রুক্টোজ (দ্র) নানা ফল ও সবজির মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের পরিচিত চিনি প্রধানত আখ (দ্র) অথবা সুগারবীট থেকে তৈরি হয়। এটি মূলত সুক্রোজ (sucrose)। দুধের চিনি হল ল্যাক্টোজ আর শস্য থেকে পাওয়া চিনি প্রধানত মল্টোজ। মৌমাছির চাক থেকে পাওয়া মধুতে গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ প্রায় সমান অনুপাতে থাকে। খেজুর গাছের রসে এবং অনুরূপ মেপ্‌ল্ সিরাপে থাকে প্রধানত সুক্রোজ। ভুট্টা (দ্র) থেকে পাওয়া কর্ন্ সিরাপে থাকে গ্লুকোজ এবং মল্টোজ।

আমাদের দেশসহ বেশ কিছু দেশে ব্যবহার্য চিনি বলতে আখ থেকে তৈরি চিনিই বোঝায়। চিনিকলে আখ মাড়াই করে এবং পানিতে ভিজিয়ে রস নিষ্কাশন করে নেওয়া হয়। রস উত্তপ্ত করে তার সঙ্গে চুন মেশালে অবাঞ্ছিত উপাদানগুলো নিচে থিতিয়ে পড়ে। উত্তাপে ঘন করা রসের সিরাপকে বায়ুশূন্য পাত্রে আরো উত্তপ্ত করে চললে সিরাপ থেকে চিনির কেলাস (দ্র) দানা বাঁধতে থাকে। বায়ুশূন্য করার কারণ হল রসের স্ফুটনাঙ্ককে নামিয়ে আনা যাতে সিরাপে বা চিনিতে পোড়া লাগার মতো উত্তাপে না গিয়েই পানি বাষ্পীভূত করা যায়। পরে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের তীব্র ঘূর্ণনে চিনির কেলাস থেকে সিরাপকে আলাদা করে ফেলা হয়। এভাবে তৈরি হলুদ-খয়েরি কাঁচা চিনি থেকে ধবধবে সাদা শোধিত চিনি পেতে হলে একে ধুয়ে, আবার দ্রবীভূত করে বিস্তারিত ছাঁকনব্যবস্থায় ছেঁকে আবার কেলাসিত করতে হয়। এভাবে সাদা চিনির জন্য কাজ আর ব্যয় অনেক বাড়লেও এতে চিনির পুষ্টি-উপাদান না বেড়ে বরং কমে যায়। কারণ যা বাদ দেওয়া হয় তার সঙ্গে চলে যায় বেশ কিছু প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ ও আঁশ। সরাসরি গুড় তৈরি করে খেলে পুষ্টি-উপাদানের দিক থেকে কাঁচা খয়েরি চিনির চেয়েও ভাল হয়। কিন্তু তবুও সাদা শোধিত চিনিরই কাটতি বেশি।

আখ থেকে চিনি তৈরির পদ্ধতির সর্বপ্রাচীন প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতে (দ্র), খ্রিস্টজন্মের বহু পূর্বে।

www.pathagar.com

আনুমানিক ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের আগে ইউরোপে (দ্র) এ চিনি প্রচলিত হয় নি। সুগারবীট থেকে চিনি তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় ১৭৯৯ সালে। মূলা জাতীয় এই স্ফীত মূল থেকে এখন দুনিয়ার ৪০ শতাংশ চিনি উৎপন্ন হয় প্রধানত রাশিয়াতে (দ্র)। চিনি সর্বাধিক উৎপন্ন হয় ব্রাজিলে এবং আখ থেকে। সব মিলে প্রতি বছর দুনিয়াতে ন' কোটি টন চিনি উৎপাদিত হয়। অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের কিছু চিনি আমাদের দেশের চিনিকলগুলোতে উৎপন্ন হয়। চিনি শরীরে শক্তি-উৎপাদক খাদ্য-উপাদান। তবে সরাসরি চিনিই এ জন্য খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং দেহে দ্রুত মেদ সঞ্চয়, দাঁতের অবক্ষয় ইত্যাদি কারণে অধিক চিনি বর্জনীয়। এসব এড়াতে এবং বিশেষ করে ডায়াবেটিস (দ্র) রোগে চিনি নিষিদ্ধ হলে অনেকে কৃত্রিম মিষ্টিকারক দ্রব্য চিনির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করেন। তবে সে ক্ষেত্রে অন্য রকম কিছু ঝুঁকি থাকতে পারে।

মু. ই.

চিপ

চিপ হল সিলিকনের (দ্র) ছোট্ট পাতলা চিল্‌তে, যার ভিত্তিতে অনেকগুলো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ সমন্বিত করা হয়। কাগজের মতো পাতলা এই চিপ সাধারণত দৈর্ঘ্যে প্রায় চার মিলিমিটারের চেয়ে বড় হয় না। অথচ এর মধ্যেই রচিত হয় হাজার হাজার ট্রানজিস্টর (দ্র), ডায়োড (দ্র), রেজিস্টর (দ্র), ক্যাপাসিটর (দ্র) ইত্যাদি। চিপের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি খুবই ক্ষুদ্র হয়ে আসায় এর জন্য বস্তুর পরিমাণ, নির্মাণব্যয়, প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি সবই অভাবনীয় রকম কমে গেছে। যেমন একটি শক্তিশালী কম্পিউটারের (দ্র) মূল প্রসেসিং অংশ অথবা মেমোরি এখন একটিমাত্র চিপের অবয়বে চলে আসতে পেরেছে, যা কম্পিউটারকে ছোট করেছে, সরল করেছে এবং অতি সস্তা করেছে। আধুনিক ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি, বিশেষ করে কম্পিউটার প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের পেছনে রয়েছে এই চিপ।

চিপ তৈরির কাজ শুরু হয় সিলিকনের পাতলা চাকতি নিয়ে। চিপের উপর রচিত হবার জন্য সমন্বিত বর্তনীর একটি নকশা বড় করে এঁকে ফটোগ্রাফির (দ্র) মাধ্যমে তার একটি অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ তৈরি করা হয়। নকশার স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ অংশের মধ্য দিয়ে সংবেদী পাতের ওপর আলোকসম্পাত করা হয় এবং সেই অনুসারে তা ক্ষয় করিয়ে একটি ছাঁচ তৈরি করা হয়। এভাবে পূর্ণ নকশা অনুসারে বেশ কয়েকটি ছাঁচ তৈরি হয়। পরপর এসব ছাঁচের একেকটির মধ্য দিয়ে যথাযথ বিজাতীয় বস্তু সিলিকন্ পাতের বিশেষ বিশেষ স্থানে ঢুকিয়ে এবং প্রয়োজন মতো অন্তরক বা ধাতব পাতলা পর্দা দিয়ে তা ঢেকে দিয়ে পরস্পরসংলগ্ন ট্রানজিস্টর ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এক বার ডিজাইন (দ্র) হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় পুনরাবৃত্তভাবে উৎপাদন সম্ভব হয় বলে এবং খুবই কম বস্তু ব্যবহৃত হয় বলে চিপের নির্মাণব্যয় খুব কম।

এখন গবেষণা ও উন্নয়নের বড় প্রচেষ্টা হল ক্রমাগত আরো বেশি যন্ত্রাংশ একই চিপের উপর সমন্বিত করা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই একটি চিপের উপর একত্রিশ লক্ষ ট্রানজিস্টর সমন্বিত করতে সক্ষম হয়েছে।

মু. ই.

চিয়াং কাই-শেক [১৮৮৭—১৯৭৫]

চীনা রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা। চীনের (দ্র) এবং তাইওয়ান দ্বীপের জাতীয়তাবাদী সরকারের নেতৃত্ব দেন ১৯২৮ থেকে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।

জন্ম চেকিয়াং প্রদেশে ১৮৮৭ সালের ৩১শে অক্টোবর। উত্তর চীন ও জাপানের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবনশেষে ১৯০৮ সালে যোগ দেন চিং (মাঞ্চু) রাজতন্ত্রকে উৎখাত করার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত একটি বিপ্লবী সংগঠনে। এই দলের নেতৃত্বেই ১৯১১-১২ সালে উল্লিখিত রাজতন্ত্রকে উৎখাত করা হয়।

সান্ ইয়াৎ-সেন্ (দ্র) রাশিয়ার (দ্র) সাহায্যে কুওমিণ্টাং (দ্র) গঠন করলে চিয়াং কাই-শেক ১৯২০ সালের পর তাঁর সঙ্গে যোগ দেন এবং ১৯২৪ সাল নাগাদ পার্টির সামরিক একাডেমীর প্রধান নিযুক্ত হন। সান্ ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় তাঁর দ্রুত উত্থান ঘটে।

www.pathagar.com

তিনি ১৯২৮ সালে নান্‌কিং-এ নতুন জাতীয়তাবাদী সরকারের নেতৃত্ব দেন। এই সময় চীনা কমিউনিস্টদের নির্মূল করাই তাঁর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩১ সালে তিনি মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি হামলা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হন। ১৯৩৭ সালে জাপান চীন আক্রমণ করলে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হয়। চিয়াং কাই-শেক এই সময় বাধ্য হন কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঐক্যমোর্চা গড়ে তুলতে। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের (১৯৩৭-৪৫) সময়টুকু ছাড়া তিনি নিরলসভাবে লড়ে গেছেন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। ১৯৪৯ সালে শেষতক তাঁর বাহিনী কমিউনিস্টদের হাতে পরাজিত হলে তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মার্কিন অর্থ ও সামরিক সাহায্যে চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে তাইওয়ানে জাতীয়তাবাদী চীনা সরকার গঠন করেন। তিনি চীনা জাতীয় সরকারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ১৯২৮-৩১ এবং ১৯৪৩-৪৯ সাল পর্যন্ত। তিনি তাইওয়ানে প্রতিষ্ঠিত ফরমোজা সরকারের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন। এখানেই ১৯৭৫ সালের ৫ই এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস (দ্র) ১৭৯৩ সালে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা Permanent Settlement (পার্মানেন্ট সেট্‌ল্‌মেন্ট) প্রথা চালু করেন। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রথমে এক-সালা এবং পরে দশ-সালা বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করে। কিন্তু কোনোটাই কার্যকর না হওয়ায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হয়। এই নিয়মে জমিদারগণ কর্তৃক সরকারকে এবং প্রজাগণ কর্তৃক জমিদারকে দেয় বার্ষিক খাজনা স্থায়ীভাবে স্থিরীকৃত হয়। জমির রাজস্বকিস্তি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে দিতে অসমর্থ হলে জমি নিলামে বিক্রি করার অধিকার সরকারের হাতে থেকে যায়। তাই এই প্রথাকে 'সূর্যাস্ত আইন'ও বলা হয়।

'সূর্যাস্ত আইন'-এর ফলে নির্দিষ্ট দিনে খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে বহু পুরাতন জমিদার তাদের জমিদারি হারায়। নিলামকৃত জমিদারি অনেক সময় জমিদারদের উৎপীড়ক কর্মচারী ও মহাজনদের হাতে চলে আসে। ফলে নতুন এক জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এরা ইংরেজশাসনের গোঁড়া সমর্থক শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং পরবর্তী কালে রাজা, মহারাজা, নবাব প্রভৃতি উপাধি লাভ করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রাজস্ব আদায় ছাড়া সরকারের নিকট জমিদারদের অন্য কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় তারা ক্রমে প্রজাপীড়ক, বিলাসী ও অত্যাচারী হয়ে ওঠে। ভারতে (দ্র) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একমাত্র বঙ্গদেশেই বলবৎ ছিল।

খু. জা.

চিল

ফালকোনিফর্মেস (Falconiformmes) বর্গের আক্কিপিট্রিডি (Accipitridae) গোত্রভুক্ত। এরা সাহসী ও শিকারি পাখি। এদের উপরের ঠোঁট ধারালো, বাঁকা এবং বেশ শক্ত। এদের পায়ের আঙুলের নখ খুব চোখা। এদের দৃষ্টিশক্তিও খুব প্রখর। বহু দূর থেকে এরা শিকার দেখতে পায়। এরা উচ্চ স্বরে চি-চি শব্দ করে ডাকে।

চিল কয়েক প্রকার : গোদা চিল বা সাধারণ চিল, শঙ্খচিল ও কৃষ্ণচিল। গোদা চিলের বৈজ্ঞানিক নাম *মিলভস মিগ্রান্স (Milvus migrans)*। এরা লোকালয়ের কাছাকাছি

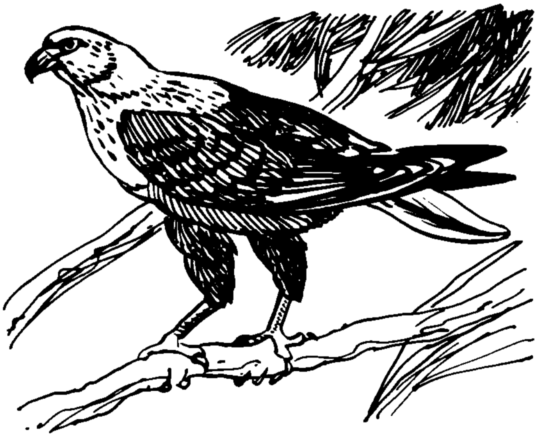

থাকে। এদের দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার। মৃত প্রাণী, আবর্জনা, জীবিত পতঙ্গ, পাখি, ইঁদুর (দ্র) প্রভৃতি এরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। পরে গাছের ডালে বা অন্য কোথাও বসে শক্ত ঠোঁট দিয়ে শিকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। শঙ্খচিলের বৈজ্ঞানিক নাম *হালিআস্টর ইণ্ডাস (Haliastur indus)*। এরা জলাশয়ের কাছাকাছি থাকে এবং মাছ শিকার করে খায়। ব্যাঙ (দ্র) এবং সরীসৃপও (দ্র) এরা খেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

এদের মাথা ও বুকের রঙ সাদা এবং ডানার রঙ বাদামি হয়ে থাকে। এদের লেজের শেষাংশ গোলাকার। দৈর্ঘ্যে এরা ৪৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কৃষ্ণচিলের বৈজ্ঞানিক নাম *এলানাস সিরুলিয়স (Elanus caeruleus)*। এরা হাল্কা বনাঞ্চল ও ক্ষেত-খামারের আশেপাশেই থাকে। এদের দেহ ও ডানা হাল্কা ধূসর রঙের। তবে কাঁধের কাছাকাছি ডানার রঙ কালো। এদের চোখের রঙ লাল এবং দৈর্ঘ্যে এরা ৪০ সেন্টিমিটার।

মু. আ.

চীন

পৃথিবীর (দ্র) সর্বপ্রাচীন সাম্রাজ্য চীন ১৯২১ সালে গণচীনে পরিণত হয়। জাপান (দ্র) ১৯৩৭ সালে চীন আক্রমণ করে এবং ১৯৩৮ সালে চীনের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে (দ্র) জাপান পরাজিত হলে চীনে জাপানি আধিপত্যের অবসান ঘটে। বহু শত বছর আগে মঙ্গোলীয়দের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চীন 'গ্রেট ওয়াল' বা মহাপ্রাচীর তৈরি করে।

গণচীন আয়তনে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ও জনসংখ্যায় পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র। এর আয়তন ৯৫,৫২,৯৭০ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা প্রায় ১১৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ১১ হাজার। খাস চীন, মাঞ্চুরিয়া, অন্তমঙ্গোলিয়া, সিনকিয়াং ও তিব্বত (দ্র) নিয়ে গণচীন গঠিত। চীনের এক-তৃতীয়াংশ উর্বর সমভূমি

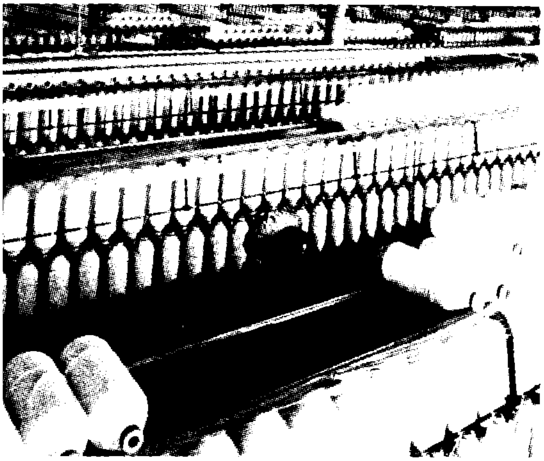

চীনের সাংহাইয়ে একটি বস্ত্র কারখানা

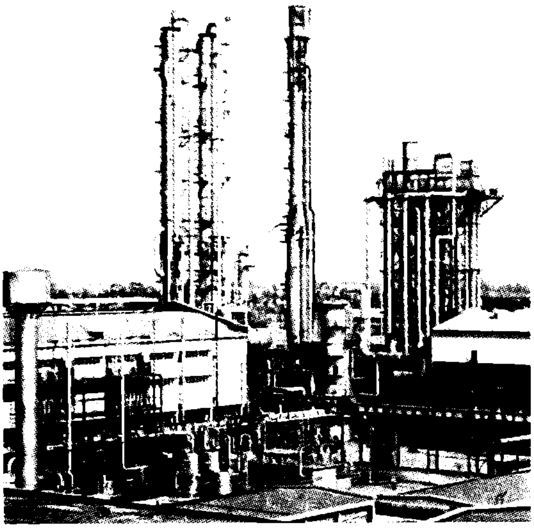

সিচুয়ান প্রদেশে একটি রাসায়নিক কারখানা

ও ব-দ্বীপ দ্বারা গঠিত এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশ পর্বতময় ও মরুপ্রায় অঞ্চল। খাস চীনের পূর্বাংশে হোয়াংহো, ইয়াং সিকিয়াং ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকা এবং পশ্চিমাংশে মধ্য-এশিয়ার উচ্চ পর্বত ও মালভূমি। সিনকিয়াং-এর অধিকাংশ অঞ্চলই মরুময়। এর দক্ষিণ দিকে কুনলুন পর্বত ও তিব্বতের মালভূমি এবং মধ্যস্থলে তিয়েন্‌শান্‌ পর্বত অবস্থিত। মঙ্গোলিয়ায় মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব ও পশ্চিমাংশ পর্বতময় এবং মধ্যভাগে মালভূমি। চীনের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। উত্তর চীনে জলবায়ু শীতল-নাতিশীতোষ্ণ। পশ্চিমাংশের জলবায়ু মহাদেশীয়। তবে দক্ষিণ-পূর্বাংশে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

চীন কৃষিপ্রধান দেশ। চীনের আয়তনের ২০ শতাংশ স্থান স্বাভাবিক বনভূমি এবং ২৫ শতাংশ স্থান তৃণভূমির অন্তর্গত। ইয়াংসি ব-দ্বীপে সারা বছর ধরে অতি উৎপাদনক্ষম কৃষিপদ্ধতিতে চাষ করা হয়। দক্ষিণ চীনে ধান, মধ্যচীনে ধান (দ্র) ও গম (দ্র) এবং উত্তর চীনে গম প্রধান কৃষিদ্রব্য। চীন পৃথিবীর অন্যতম প্রধান চা (দ্র) উৎপাদনকারী দেশ। পৃথিবীর সর্বাধিক রেশম (দ্র) চীনে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে তেলবীজ, তুলা (দ্র), ভুট্টা (দ্র), তামাক (দ্র), সবজি ও ফল প্রধান। চীনদেশে প্রচুর কয়লা (দ্র) ও লৌহ

www.pathagar.com

চীনের ঐতিহাসিক চিকিৎসাপদ্ধতি—আকুপাংচার

(দ্র) পাওয়া যায়। পৃথিবীর অর্ধেক অ্যান্টিমনি, দস্তা ও টাংস্টেন (দ্র) চীনে পাওয়া যায়। ম্যাঙ্গানিজ, তামা (দ্র), সীসা (দ্র), বক্সাইট, জিপসাম (দ্র) চীনের অন্যান্য খনিজ দ্রব্য।

চীন দেশের কুটিরশিল্প সুপরিচিত। কার্পাস ও রেশম দিয়ে বস্ত্র বয়ন এ দেশের অন্যতম কুটিরশিল্প। বৃহৎ শিল্পের মধ্যে কাপড়ের কল, লোহা ও ইস্পাত কারখানা, কাগজের কল, সিমেন্ট ও যন্ত্রনির্মাণ-শিল্প প্রধান।

চীনের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত-ব্যবস্থায় জলপথ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। দেশের আয়তনের তুলনায় চীনে সড়ক ও রেলপথের দৈর্ঘ্য কম। ৫৫২৫ কিমি দীর্ঘ ইয়াংসি নদী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভ্যন্তরীণ জলপথ।

বেইজিং (পূর্বনাম পিকিং) একটি প্রাচীন সুরম্য শহর এবং গণচীনের রাজধানী। ইয়াংসি নদীর মোহনার অদূরে অবস্থিত সাংহাই চীনের শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। তিয়েনসিং একটি বন্দর ও বড় শহর। সিকিয়াং নদীর তীরে অবস্থিত গুয়াংজৌ (ক্যান্টন) চীনের বৃহত্তম নগর। ইয়াংসি নদীর তীরে অবস্থিত নানকিং চীনের প্রাচীন রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। হ্যাংচো একটি বন্দর ও শিল্পশহর।

মু. এ.

চীন-ভারত যুদ্ধ [১৯৬২]

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্তবিরোধের কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

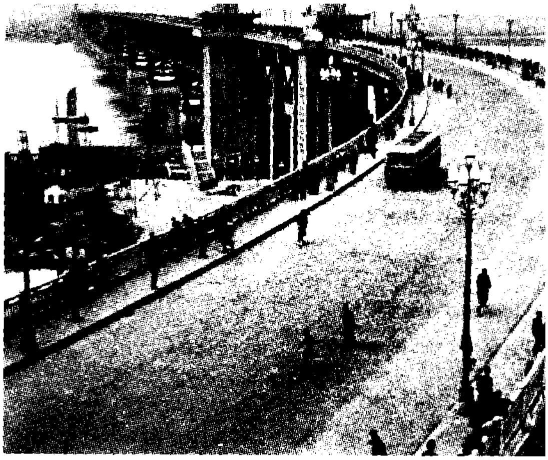

চীনের নানকিং-এ ছাংজিয়াং দোতলা সেতু। উপরে সড়কপথ, নিচে রেলপথ। দৈর্ঘ্য ৬৭৭২ মিটার

১৯১৩ সালে ব্রিটেনের সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে তিব্বত (দ্র) স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বর্তমানে চীনের অন্তর্ভুক্ত তিব্বত তখন লাভ করে স্বাধীন দেশের মর্যাদা। ১৯১৩ সালের জুলাই থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ভারতের (দ্র) সিমলায় চীন (দ্র), ভারত (দ্র) ও তিব্বতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, নির্ধারিত হয় তিন দেশের সীমানা। পরাধীন ভারতের পক্ষে সীমানা নির্ধারণ করে ম্যাকমাহন কমিশন। চীন সীমানা নির্ধারণের চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে নি।

১৯৫০ সালে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র চীন পুনরায় তিব্বত দখল করে নেয়। এর পর ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর সীমান্তবিরোধজনিত কারণে চীন–ভারত যুদ্ধ বাধে। চীনের মতে ১৯১৪ সালে ম্যাকমাহন কমিশন তিব্বতের যে অংশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল সেই অংশ পুনরুদ্ধারের জন্য এই যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে চীনের সেনাবাহিনী ভারতীয় সীমানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বেশ কিছু অংশ দখল করে নেয়। ১৯৬২ সালের ২১শে নভেম্বর চীন একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলে যুদ্ধের অবসান ঘটে।

দখলকৃত এলাকা থেকে চীন তার সৈন্য সরিয়ে নেয়। তবে মোট ২৪০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা তার দখলে থেকে যায়।

আ. মা.

www.pathagar.com

চীনা বিপ্লব

সান্ ইয়াৎ-সেন

বিশ শতকের শুরুর দিকে ১৯১২ সালে সান্ ইয়াৎ-সেন (দ্র)-এর নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক হানাহানি ও নিজস্ব সেনাবাহিনীসমেত বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রধানদের মধ্যে বিরোধ প্রজাতন্ত্রের ভাগ্য বিপর্যস্ত করে তোলে। জাতীয় ঐক্য গড়ে এই সঙ্কট মোচনের লক্ষ্যে সান্ ইয়াৎ-সেন -এর কুওমিন্টাং (দ্র) দল উদারবাদী নীতি গ্রহণ করে দেশের অপর প্রধান দল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (দ্র) সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে। কিন্তু পরবর্তী কুওমিন্টাং নেতা চিয়াং কাই-শেক (দ্র) ১৯২৬ সালে ক্ষমতা হাতে নিয়ে আঞ্চলিক যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিবর্তে কমিউনিস্টদের দমনে জোর তৎপরতা শুরু করেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী সরকার দেশের বেশির ভাগ এলাকা দখল করে নিলেও দূর গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্টদের প্রভাব বজায় থাকে।

এদিকে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয় এবং চীনের উত্তর ভূখণ্ড আক্রমণ করে। চীনের জাতীয়তাবাদী সরকার বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো প্রয়াস না নিয়ে বরং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে লিপ্ত থাকে। জিয়াংসি অঞ্চলে মাও সে-তুং (দ্র)-এর নেতৃত্বাধীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সামরিক বাহিনীকে তারা ঘেরাও করে ফেলে। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে এই অবরোধ ভেঙে মাও সে-তুংয়ের বাহিনী ঐতিহাসিক লং মার্চ বা দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু করে। এক বছর পর বিপ্লবী গণবাহিনী ৬০০০ মাইল হেঁটে উত্তর-পশ্চিম চীনের দূরবর্তী পাহাড়ি শাংক্সি অঞ্চলে পৌঁছে নতুন করে ঘাঁটি গড়ে তোলে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একই সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিন্টাং সরকার ও জাপানি বৈদেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলে।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে মিত্রশক্তির কাছে জাপান আত্মসমর্পণ করলে চীনে ক্ষমতার লড়াই তীব্র আকার ধারণ করে। কুওমিন্টাং সরকারের অধীনে দেশের তিন-চতুর্থাংশ এলাকা থাকলেও তাদের দুর্নীতি, শোষণ, অকর্মণ্যতা ও অসাধুতার কারণে জনমনে ছিল তীব্র ক্ষোভ। পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট আয়ত্তাধীন এলাকায় জমির ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের তৎপরতা ইত্যাদি কারণে তাদের প্রতি জনসমর্থন বাড়ছিল। মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তি সংহত করে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে নতুন আক্রমণ-অভিযান শুরু করে। কুওমিন্টাং সরকার পিছু হটতে হটতে রাজধানী নানজিং থেকে ক্যান্টনে ও পরে চোংকিং-এ সরিয়ে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাইওয়ানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। গোটা চীনা মূল ভূখণ্ডের ওপর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন জনযুদ্ধের

১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চেয়ারম্যান মাও সে-তুং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন

www.pathagar.com

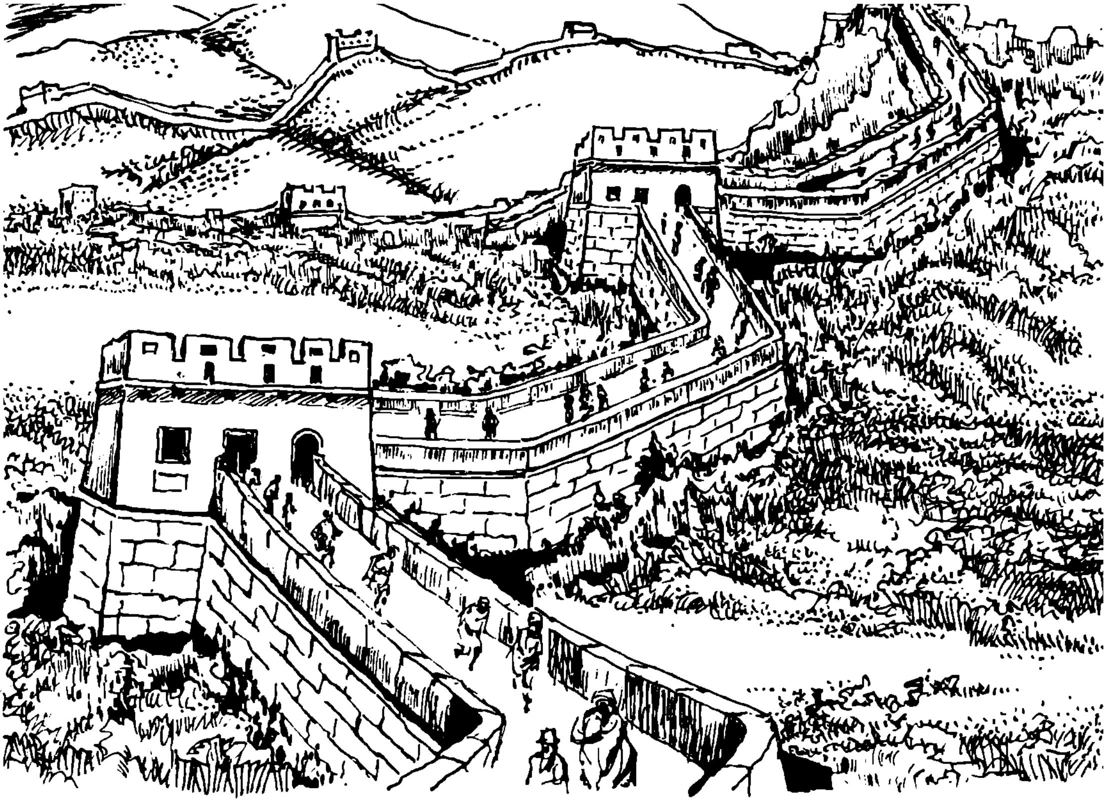

চীনের মহাপ্রাচীর খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়েছে। প্রাচীন চীনের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই প্রাচীর ৎসিন্ রাজবংশ খ্রিস্টপূর্ব ২২১ থেকে ২০৭ অব্দে নির্মাণ করে

বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের ৯ই অক্টোবর পিকিংয়ের (বর্তমানে বেইজিং) বিশাল সমাবেশে মাও সে-তুং বিপ্লবের বিজয় ঘোষণা করেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু হয় নয়া চীনের অভিযাত্রা।

ম. হ.

চীনা সভ্যতা

বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও নদীকেন্দ্রিক সমৃদ্ধ সভ্যতা। অনেকের মতে, এর উদ্ভব চীনের (দ্র) উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের তারিম্ উপত্যকায়। কুয়েন্‌লুং পর্বত অতিক্রম করে অধিত্যকা ধরে পীত (হোয়াং হো) নদীর তীর বরাবর গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতা। উত্তর চীনে বর্তমানে যে জাতীয় মানুষের বসবাস, প্রস্তর যুগেও (দ্র) তাদের অনুরূপ আকার-আকৃতিবিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর বসতি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারা ব্যবহার করত পাথরের তৈরি ছুরি, তীরের ফলা, কুঠার ও হাড়ের তৈরি নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। কাপড় বোনা ও মাটির পাত্রনির্মাণপদ্ধতিও তাদের আয়ত্তে ছিল। অবশ্য চীনা পুরাণে বলা হয়েছে, কুয়াং তি'র রাজত্বকালে (খ্রিস্টপূর্বাব্দ ২৬৯৭-২৫৯৫) উত্তর-পশ্চিম থেকে যেসব জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে, তাদের সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসীদের যুদ্ধবিগ্রহ হয়। এই সব আগন্তুকের দল ছিল মূলত মঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত। চীন দেশে কালক্রমে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে, মূলত তা মঙ্গোলীয় সভ্যতা।

চীনা সভ্যতা মূলত কৃষিভিত্তিক। এখানকার প্রাচীন জনগোষ্ঠী হোয়াং হো নদীর দু'পাশের উর্বর এলাকা জুড়ে চাষ করত জোয়ার, গম (দ্র), ধান (দ্র) ও নানা ধরনের শাক-সবজি, লালনপালন করত বিভিন্ন জাতের পশু। তারা জানত রেশমকীটের চাষাবাদ পদ্ধতি। এর সুতো দিয়ে তারা বানাত

www.pathagar.com

পিকিং মানবের প্রাগৈতিহাসিক গুহা

মজবুত ও সুন্দর সুন্দর বস্ত্রাদিও। খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতক থেকে চীনে এই শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। রেশম চাষের প্রথম প্রবর্তক ও বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক প্রচলনকারী হিসাবে চীনা জনগণের অবদান অনস্বীকার্য।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ পর্যন্ত চীনে বহু খণ্ডবিখণ্ড রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। এর ইতিহাস বিভিন্ন রাজবংশ ও তাদের শাসনামল দ্বারা বিভক্ত। যেমন : ফু সি (খ্রি. পূ. ২৮৫২-২৭৩৮), স্যাং বা ইন্ (খ্রি. পূ. ১৭৬৬-১১২২), চৌ (খ্রি. পূ. ১১২২-২৪৯), হান্ (খ্রি. পূ. ২০৬-২২১ খ্রি.), সিন (২৬৫-২৯০ খ্রি.) সুই (৫৮১-৬১৮ খ্রি.), তাং (৬১৮-৯০৮ খ্রি.), পঞ্চ রাজবংশ (৯০৭-৯৬০ খ্রি.) সুং (৯৬০-১২৭৯ খ্রি.) ও ইউয়ান রাজবংশ (১২৭৯-১৩৬৮ খ্রি.) ইত্যাদি।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে থসিন্ নামের জনৈক রাজা সমগ্র চীন অধিকার করে নেন এবং চীনকে একটি একক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলেন। এরপর তিনি দেশকে মঙ্গোলীয়দের পৌনঃপুনিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে গড়ে তোলেন ৪ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এক প্রাচীর, যা চীনের 'মহাপ্রাচীর' নামে খ্যাত। স্থাপত্যশিল্পের অভিনব নিদর্শন এই প্রাচীর বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের (দ্র) অন্যতম।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয় কাগজ (দ্র) ও কম্পাস (দ্র)। এ দু'টি জিনিস আবিষ্কারের কৃতিত্ব চীনেরই। কাগজের আবিষ্কার বিশ্বসভ্যতার বিকাশে রেখেছে এক কালজয়ী প্রভাব।

চীনে লিপি আবিষ্কৃত হয় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে। অক্ষর হিসাবে চীনা জনগণ ব্যবহার করত চিত্রলিপির বর্ণমালা। প্রাচীন কালে তারা হাড়, রেশমি কাপড় এবং বাঁশের চটার ওপরে লিখত। লিখিত বাঁশের চটাগুলো পরে এক সঙ্গে গোছা করে তারা তৈরি করত এককেটি গ্রন্থ।

খ্রিস্টজন্মের আগেই চীনের মাটিতে বারুদ ও খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার মানব- সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে প্রভূত অবদান রেখেছে। প্রাচীন অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের মধ্যে চীনামাটির কারুকার্যখচিত বাসনপত্র অতুলনীয় শৈল্পিক মর্যাদার অধিকারী।

আবাসস্থল ও পিকিং মানব। ডানে পাশে নিচে : চীনা প্রাচীন গ্রন্থ 'তিন সম্রাটের প্রেম-উপাখ্যান' কাঠের তৈরি ব্লকে মুদ্রিত—ষোড়শ শতক

www.pathagar.com

চীনা সভ্যতা বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও রাষ্ট্রগত নানা অভ্যন্তরীণ বিরোধে বিপর্যস্ত হয়েছে। তবু তার মধ্যেই চীনে বহু বিশ্ববিশ্রুত মনীষী, ধর্মগুরু ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কনফুসিয়াস (দ্র) এবং লাও-ৎসু (দ্র)। এ ছাড়া সিনাৎ সিয়ানের নামও সবিশেষ স্মরণীয়। চীনের প্রাচীন ইতিহাস জানার পক্ষে তাঁর রচিত 'ঐতিহাসিক কড়চা' একটি অপরিহার্য গ্রন্থবিশেষ। চীনা লোককাহিনী, লোকগীতি ও পুরাণকথার অনেক কিছুই কালজয়ী সাহিত্যকর্মের মর্যাদা অর্জন করেছে।

প্রাচীন চীনা চিকিৎসকগণ বিভিন্ন ব্যাধি ও ক্ষত নিরাময়ের ভেষজ ও শল্য চিকিৎসা জানতেন। চীনা আকুপাংচার (দ্র)-পদ্ধতি এখনো প্রচলিত। বলকারক ঔষধ হিসাবে তাঁরা চায়ের ব্যবহার জানতেন। পানীয় হিসাবে সেই চা (দ্র) আজ বিশ্বসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

চীনের প্রাচীন ঘরবাড়ি, উপাসনালয় ইত্যাদি, যা স্থাপত্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত, কাঠের তৈরি ছিল বলে সেসবের কোনোকিছুই বর্তমান কাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি। তবে পাথর, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির তৈরি বহু প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে, যেগুলো তৎকালীন চীনা জীবনধারা ও ধর্মবিশ্বাসের অনেক কিছুই তুলে ধরে।

চীনে বৌদ্ধধর্ম (দ্র) বিস্তারলাভের ফলে ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প নতুন মাত্রা অর্জন করে।

আ. হু.

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি

১৯২১ সালের জুলাই মাসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন চেন্ হু মিউ। ১৯২২ সালে তিনি মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিন্টার্নের চতুর্থ অধিবেশনে যোগ দেন। ১৯২৭ সালে চেন্‌কে অপসারণ করে পার্টির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন লি লি সান্। তিনি মধ্যচীনের হ্যানিয়াং-এর এক লৌহ-কারখানায় একটি কমিউনিস্ট সংঘ গড়ে তোলেন। পরবর্তী কালে মাও সে-তুং (দ্র) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

তবে ১৯২৩ সালের দিকে রুশ কমিউনিস্ট নেতা ও সংগঠক মিখাইল্ বরোদিন্ চীনে এলে দেশটিতে বলশেভিক (দ্র) ধরনের কমিউনিস্ট তৎপরতা ক্রমে জোরদার হতে থাকে। কিন্তু মাও সে-তুং অন্ধভাবে রুশনীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মত ছিল : চীন একটি কৃষিপ্রধান দেশ, তাই শ্রমিক নয়, কৃষকদেরই সংগঠিত করে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে। তাঁর এই লক্ষ্য ও আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে অন্যতম সহায়ক ছিলেন মার্শাল চু'তে।

১৯২৫ সালে চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াৎ-সেন্ (দ্র) মারা গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন কট্টর কমিউনিস্টবিরোধী নেতা চিয়াং কাই-শেক (দ্র)। তিনি ক্ষমতাসীন হয়েই কমিউনিস্টনিধনযজ্ঞ শুরু করেন। এই অবস্থায় ১৯৩৪ সালে মাও-এর নেতৃত্বে শুরু হয় ইয়েনান অভিমুখে ৩ হাজার মাইল দীর্ঘ পদযাত্রা, যা ঐতিহাসিক 'লং মার্চ' (দ্র) নামে খ্যাত।

অবশ্য চীনের মাটিতে জাপানের (দ্র) আগ্রাসন প্রতিরোধে মাও-এর নেতৃত্বে এই পার্টি চিয়াং কাই-শেক-এর নেতৃত্বাধীন কুওমিণ্টাং (দ্র)-এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে তোলে এবং ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তারা 'অষ্টম পদাতিক বাহিনী' গঠন করে সম্মিলিতভাবে জাপানি সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা করে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হলে দল দু'টির মধ্যে পুনরায় শুরু হয় রক্তাক্ত সংঘাত। অবশেষে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বাহিনী চিয়াং কাই-শেক-এর অনুগত বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয় এবং ১৯৪৯ সালে তারা চীনের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। ফলে চিয়াং কাই-শেক তাঁর অনুগত বাহিনীসহ চীনের মূল ভূখণ্ড ছেড়ে ফরমোজা দ্বীপে চলে যেতে বাধ্য হন।

১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে চীনকে একটি স্বাধীন 'গণপ্রজাতন্ত্র' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

৬০-এর দশকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত উগ্র নীতির পর ক্রমবর্ধমান নমনীয়তা লক্ষণীয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 'বিপ্লব রফতানি'র নীতিও চীন পরিত্যাগ করেছে। 'বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস'—মাও সে-তুংয়ের এই বাণীও আর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে উচ্চারিত হয় না।

আ. হু.

www.pathagar.com

চীবর ও কঠিন চীবর

ভিক্ষুদের পরিধেয় রঙিন বস্ত্র। গৌতম বুদ্ধের (দ্র) সময় শ্মশানে বা পথে-প্রান্তরে ফেলে দেওয়া জীর্ণ বস্ত্র ভিক্ষুরা সংগ্রহ ও শেলাই করে পরিধান করতেন। এখনো ভিক্ষুরা নতুন বা পুরানো কাপড় বিশেষ মাপ ও পদ্ধতিতে জোড়া দিয়ে পরিধান করেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা (দ্র) থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন চান্দ্র মাস ভিক্ষুরা একই বিহারে অবস্থান করে তিন মাস নিরবচ্ছিন্ন ধর্মীয় জীবন যাপন করেন। একে বলে বর্ষাবাস। বর্ষাবাসের পর একটি বিহারে (দ্র) গ্রামবাসী মিলে ভিক্ষুদের 'কঠিন চীবর' দান করে থাকে। এই চীবর সমবেতভাবে এবং বছরে এক বার মাত্র দান করা চলে। প্রাচীন কালে এবং এখনো কোনো কোনো স্থানে এক দিনে প্রস্তুত করে এই চীবর দান করা হয়। এ জন্য এর নাম কঠিন চীবর। আশ্বিনী পূর্ণিমার পরদিন থেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত কঠিন চীবর দানোৎসব চলে।

চীবরের তিনটি অংশ—সংঘটী, উত্তরাসঙ্গ ও অন্তরবাসক। সংঘটী ঊর্ধ্ব অঙ্গে থাকে—কাঁধ থেকে সারা দেহ আবৃত করে। ভিক্ষুরা বাইরে যাওয়ার সময় এটি ব্যবহার করেন। উত্তরাসঙ্গও কাঁধ থেকে সারা শরীর আবৃত রাখে। এটি বিহারের ভেতরে-বাইরে সবখানে ব্যবহৃত হয়। অন্তরবাসক— এক রকম ছোট ধুতি বা লুঙ্গি। পরলে কোঁচা অল্প থাকে। এই তিনটি চীবরের প্রত্যেকটি ১৫খানি টুকরো সেলাই করে তৈরি হয়। তিনটিকে একত্রে বলে ত্রিচীবর।

বি. ব.

চুইংগাম / চুয়িংগাম (chewing gum)

প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক (synthetic) গাম, ক্ষার (base), রজন (resin), চিনি (দ্র) ও ভুট্টা (দ্র) সিরাপের (corn syrup), সাহায্যে তৈরি রাবারের (দ্র) মতো এক জাতীয় লজেঞ্চুষ, যা চুষতে হয় না, ক্রমাগত চিবাতে হয়। এতে রঙ আর সুগন্ধদ্রব্যও যুক্ত থাকে। এটি আমেরিকার (দ্র) একটি অভিনব উদ্ভাবন। ১৮৬০ সালে রাবারশিল্প নিয়ে গবেষণা চালানোর সময় এর সূত্র পাওয়া যায়। তবে এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে ১৮৬৯ সালে।

চিউইং (chewing) শব্দের অর্থ চর্বণ বা চিবানো। মানুষের চিবানোর অভ্যাস থেকেই চুইংগামের (বাংলায় এভাবেই আমরা বলে থাকি, যদিও ইংরেজিতে-এর উচ্চারণ 'চিউইংগাম') সৃষ্টি। চুইংগাম আবিষ্কারের আগে মেক্সিকো ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের লোকদের মধ্যে 'চিক্‌ল্ (chicle) নামের এক রকম জিনিস চিবানোর অভ্যাস ছিল। চিক্‌ল্ মধ্য-আমেরিকার সেপোডিলা (sapodilla) নামের এক গাছের ছাল থেকে তৈরি গাম। এই চিক্‌ল্ চিবানো থেকেই কালক্রমে চুইংগাম তৈরি শুরু হয় এবং চিক্‌ল্‌ই এখন চুইংগামের প্রধান কাঁচামাল। চুইংগামে মোটামুটি এ ধরনের অনুপাতে বিভিন্ন উপাদান থাকে : ২২% থেকে ২৫% গাম বেস, ৫০% থেকে ৬০% পাউডার চিনি, ১২% থেকে ২০% ভুট্টা সিরাপ এবং ১% থেকে ২% রঙ ও সুগন্ধদ্রব্য।

প্রথমে গামকে ধুয়ে সিদ্ধ করে গলিয়ে ফিল্টারের সাহায্যে শোধন করা হয়। তারপর এর সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান মিশিয়ে জ্বাল দিতে থাকলে ধীরে ধীরে তা শক্ত এবং চিবানোর উপযোগী হয়ে ওঠে। এর জন্য তাপমাত্রা দরকার হয় ৭৯.৪° সেলসিয়াস (১৭৫° ফারেনহাইট)। ছাঁচের মধ্যে গাম ভালভাবে জমাট বাঁধলে ঠাণ্ডা করে তা কাটা হয় এবং প্যাকেট করা হয়।

পৃথিবীতে নেদারল্যাণ্ডের মানুষেরাই সবচেয়ে বেশি চুইংগাম খেয়ে থাকে। সেখানে বছরে মাথাপিছু ০.৯ কেজি (২ পা.) চুইংগাম বিক্রি হয়।

সুজ. ব.

চুন ও চুনাপাথর

ক্যালসিয়াম অক্সাইড নামক একটি রাসায়নিক পদার্থের নাম চুন। চুনাপাথর, খড়িমাটি (দ্র) প্রভৃতি পদার্থ হল ক্যালসিয়াম কার্বনেট। বাতাসে চুনাপাথর বা খড়িমাটিকে দগ্ধ করলে চুন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) গ্যাস উৎপন্ন হয়। চুনে অপদ্রব্য হিসাবে সামান্য পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, বালি, ফেরিক অক্সাইড প্রভৃতি থাকে। আমাদের দেশে শামুকের খোলা, ঝিনুক, ঘুঁটে ইত্যাদি পুড়িয়েও চুন উৎপাদন করা হয়। চুনের ঢেলাতে পানি দিলে চুন উত্তপ্ত হয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে। তখন যে কাদার মতো চুন পাওয়া যায় তাকে বলে কলিচুন। সিমেন্ট ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড উৎপাদনে

www.pathagar.com

চুনের ব্যবহার আছে। গন্ধক (দ্র)-চূর্ণের সঙ্গে মেশানো অবস্থায় চুন কীটনাশকের (দ্র) কাজ করে। বাতাস (দ্র) থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করতে, খর-পানিকে মৃদু করতে এবং কাঁচা চামড়া থেকে লোম তুলে ফেলতে চুন ব্যবহৃত হয়। চুনা পাথরের রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট। শামুক, ঝিনুক (দ্র), গুগলি ও ডিমের খোলস প্রধানত ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি। ঝিনুকের ভেতর যে মুক্তা পাওয়া যায় তাও ক্যালসিয়াম কার্বনেট।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অতি প্রাচীন কালের সূক্ষ্ম সামুদ্রিক জীবের কঠিন খোলস জমে চুনাপাথরের সৃষ্টি হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মাটির নিচে চাপা থাকার ফলে অত্যধিক চাপ ও তাপের প্রভাবে খোলসগুলি ভেঙে ও একত্রিত হয়ে কঠিন চুনাপাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। চুনাপাথর উচ্চ চাপ ও তাপে শক্ত মার্বেলপাথরে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ মার্বেল দেখতে সাদা, কিন্তু ধূসর বা কালো রঙেরও হতে পারে। পালিশ করলে মার্বেলপাথর খুব মসৃণ হয়। তাজমহল (দ্র) মার্বেলপাথর দিয়ে তৈরি। নরম ও দীপ্তিহীন চক (দ্র) বা খড়িমাটিও চুনাপাথর। চুনাপাথর ও মার্বেলপাথর কেটে অতি সুন্দর দালান-কোঠা তৈরি করা যায়। চুনাপাথর ছাড়া সিমেন্ট (দ্র) তৈরি করা যায় না। চক দাঁতের মাজন তৈরি করতেও ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর সর্বত্র চুনাপাথর পাওয়া যায়। বাংলাদেশের (দ্র) সিলেটে চুনাপাথরের খনি (দ্র) আছে।

আ. হ. খ.

চুম্বক

কোনো কোনো বস্তুর বিশেষ ধরনের একটি বলের মাধ্যমে অন্য বস্তুকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে। ওরকম বস্তুকে চুম্বক এবং বলটিকে চৌম্বক বল বলা হয়। একটি চুম্বক প্রধানত তার দু'টি প্রান্ত বা মেরু থেকে এক ধরনের বলক্ষেত্র চারিদিকে বিস্তৃত করে, যার মধ্যে এলে অন্য চুম্বক বা বিশেষ বিশেষ কিছু চৌম্বক পদার্থ প্রভাবিত হয়। এটি চৌম্বক ক্ষেত্র (দ্র) নামে পরিচিত। আমাদের পৃথিবীরও এরকম চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে, যার প্রভাবে যে কোনো শলাকা আকৃতির চুম্বক অবাধে ঘোরার সুযোগ পেলে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর হয়ে থাকে। কম্পাস (দ্র) নামে পরিচিত এরকম শলাকা বহু কাল ধরে দিগ্‌দর্শনের কাজে মানুষকে সহায়তা দিয়ে আসছে, বিশেষ করে সমুদ্রে নাবিকদেরকে।

যে কোনো পদার্থের পরমাণুই (দ্র) আসলে একটি ছোট্ট চুম্বকের মতো। চুম্বক ও চৌম্বক পদার্থের সামগ্রিক চৌম্বক-গুণ এই পারমাণবিক চুম্বকগুলোরই কিছু সম্মিলিত ফল। লোহা (দ্র), নিকেল (দ্র), কোবাল্ট এবং আরো কিছু ধাতু ও ধাতু-সঙ্করে এরকম চৌম্বক-গুণ দেখা যায়। কিছু কিছু ধাতু অক্সিজেনের (দ্র) সঙ্গে মিশে ধাতব না হয়ে বরং সিরামিকের (দ্র) মতো পদার্থরূপে চৌম্বক-গুণ প্রাপ্ত হয়। ফেরাইট নামে পরিচিত এ রকম পদার্থের বহু আধুনিক ব্যবহার রয়েছে। কোনো কোনো চৌম্বক পদার্থের চুম্বকত্ব কঠিন প্রকৃতির—এদেরকে এক বার চুম্বকে পরিণত করলে সে গুণ স্থায়ীভাবে থেকে যায়। অন্য কোনো কোনোটির চুম্বকত্ব নরম প্রকৃতির—মূল উৎস সরিয়ে নিলে এটি চলে যায়। শক্তিশালী চুম্বকের কাছে এনে বা তার সঙ্গে ঘষে চুম্বক তৈরি করা যায়। একটি তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সেটি চুম্বকের মতো আচরণ করে—এটি বিদ্যুৎচুম্বক (দ্র)। কুণ্ডলীর ভিতর কিছু নরম প্রকৃতির একটি চৌম্বক পদার্থ রাখলে বিদ্যুৎচুম্বক আরো প্রবল হয়। সব চুম্বকের দু'টি মেরু থাকে— উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। বিদ্যুৎপ্রবাহের দিকের উপর নির্ভর করে বিদ্যুৎচুম্বকেরও এই দু'টি মেরু থাকে।

বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব আসলে পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত—এরা পদার্থবিদ্যায় (দ্র) একই বিদ্যুৎ চৌম্বক বলের দু'টি ভিন্ন প্রকাশ। চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে একটি বর্তনীর তারের নড়াচড়া ঘটলে তাতে পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। আবার চৌম্বক ক্ষেত্রে রেখে একটি তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে তাতে নড়াচড়া বা ঘূর্ণনের সৃষ্টি হয়। এসব নিয়মের সুযোগে বিদ্যুৎ জেনারেটর, মোটর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফের মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে, যা আধুনিক জীবনের চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

চুম্বকের তীব্রতা মাপা হয় সাধারণত গাউস (gauss) এককে। একটি ছোট খেলনা-চুম্বকের তীব্রতা কয়েক গাউস হতে পারে। এ পর্যন্ত ১০০০ গাউসের মতো স্থায়ী চুম্বক ও ৩০,০০০ গাউসের মতো বিদ্যুৎচুম্বক সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

তবে ঝলকে ঝলকে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎচুম্বক আড়াই লক্ষ গাউস পর্যন্ত সৃষ্টি করা গেছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত অপেক্ষাকৃত উচ্চ উত্তাপের বিদ্যুৎ অতিপরিবাহিতা ভবিষ্যতে শক্তিশালী চুম্বকের বড় বড় ব্যবহারের সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। যেমন এর সাহায্যে অতি দ্রুত বেগে ভারি ট্রেন চালানো যেতে পারে।

মু. ই.

চুল

স্তন্যপায়ী (দ্র) প্রাণিদেহের ক্যারোটিনসমৃদ্ধ ত্বকের মধ্য থেকে সুতার মতো যেসব সরু বস্তু বেরোয় সেগুলোকে লোম বলা হয়। সাধারণত মানুষের মাথায় গজানো লোম চুল হিসাবে পরিচিত। ক্যারোটিন ত্বকের উপরিপৃষ্ঠের অ্যালবুমেনসমৃদ্ধ পদার্থ, নখ, পালক ও লোম ইত্যাদিতে ক্যারোটিনের ভাগ বেশি থাকে। ক্যারোটিন আমিষ-দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে সালফার (দ্র) এবং

নানারকম চুলের বিন্যাস

সিটিন ও আরজিনিন নামের অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে। চুলের রঙ কালো হয় ত্বকে মেলানিন নামক পদার্থ থাকার কারণে। চুলের গোড়া যা ত্বকের মধ্যে থাকে তা-ই কেবল জীবন্ত। ত্বকের উপরের চুল মৃত। তাই চুল বা লোম তাপ-অপরিবাহী। এ কারণে ঘন লোমশ প্রাণী শীতের কামড় থেকে লোমের কারণে রক্ষা পায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানুষের দেহে ভ্রূণ অবস্থাতেই চুল গজাতে শুরু করে। কিন্তু শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তা ঝরে যায় এবং পরে ধীরে ধীরে গজাতে থাকে। পুরুষের মুখে দাড়ি গজায়। মহিলাদের সাধারণত দাড়ি গজায় না। দাড়ি এক প্রকার লোম। পুরুষের দেহে বিশেষ এক ধরনের হর্‌মোন্ (দ্র) থাকে। এই হর্‌মোনের কারণে দাড়ি গজায়। বৃদ্ধ বয়সে দেহের যাবতীয় চুল পেকে যায়। ত্বকে মেলানিন কমে যেতে থাকলে চুল সাদা হতে শুরু করে। অনেক সময় অল্প বয়সেও চুলের রঙ সাদা হয়ে যায়। এটি বংশগতির কারণে বা রোগের জন্য হতে পারে।

ত. চ.

চুলা / চুল্লি

রান্নার কাজে ঘরে ঘরে নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে চুলা, আর তাতে কোনো-না-কোনো জ্বালানি (দ্র) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। শহরাঞ্চলে যদিও গ্যাসের চুলা ও কেরোসিনের চুলার কিছু প্রচলন রয়েছে, আমাদের দেশের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি মানুষ লাকড়ি, ডাল-পাতা, খড়কুটো, ঘুঁটে ইত্যাদি জ্বালানি ব্যবহার করে সনাতন ধরনের মাটির চুলাতে। গ্রামের দরিদ্র মানুষ সাধারণত গাছপালা ও কৃষি-বর্জ্য থেকে চুলার জ্বালানি সংগ্রহ করে আনে। এতে মূল্যবান বনসম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কৃষিতে খড়, গোবর ইত্যাদি সার (দ্র) হিসাবে ব্যবহৃত না হওয়ায় কৃষি ক্রমেই রাসায়নিক সারনির্ভর হয়ে পড়ছে। অবস্থা বেশি খারাপ হতে পেরেছে আমাদের প্রচলিত চুলা অত্যন্ত অদক্ষ বলে। যে জ্বালানি এতে ব্যবহার করা হয় তার মাত্র শতকরা দশ ভাগের মতো রান্নার কাজে লাগে, বাকি সবই অপচয় হয়।

সনাতন চুলায় পাতিলের অনেক নিচে চুলার তলায় জ্বালানি জ্বলে, জ্বালানি দেবার মুখ দিয়ে বাতাস ঢুকে জ্বালানির উপর দিয়ে চলে যায়। আগুনের (দ্র) শিখা যেখানে সবচেয়ে গরম হবার কথা, বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস সরাসরি সেখানে গিয়ে তার উত্তাপ কমিয়ে ফেলে। অথচ জ্বালানি ও বাতাসের মিশ্রণের জায়গায় উচ্চ উত্তাপ না থাকলে জ্বালানি ভাল করে জ্বলতে পারে না। তা ছাড়া খুব কাছাকাছি মাখামাখি হয়ে এই দুইয়ের মিশ্রণ ভাল করে না ঘটলেও দহন ভাল হয় না। বাতাস জ্বালানির উপর দিয়ে এসে উপর দিয়েই চলে গেলে সেটি ঘটে না। সনাতন চুলাতে এভাবে জ্বালানির পূর্ণ দহন হয় না বলে এটি অদক্ষ হয়। দহন-না-

www.pathagar.com

হওয়া জ্বালানিকণা ও গ্যাস ধোঁয়ার সৃষ্টি করে, যা রোজ রোজ নিঃশ্বাসে গিয়ে শরীরের বড় রকমের ক্ষতি করতে পারে। যেটুকু তাপ তৈরি হয় তাও সব পাতিল পর্যন্ত পৌঁছয় না। আবার উঁচু ঝিকার ফাঁক দিয়েও অনেক তাপ বাইরে চলে যায়।

সনাতন চুলার এই অসুবিধাগুলো দূর করে দক্ষতা শতকরা ৩০-৪০ ভাগ পর্যন্ত উন্নীত করেছে নতুন উদ্ভাবিত উন্নত চুলা। বহু প্রকারভেদ থাকলেও প্রায় সব ক'টিতে পাতিল থেকে সঠিক দূরত্বে জ্বালানি রেখে এর নিচে থেকে চুলার চারিদিকের কিছু ছিদ্রপথে বাতাস ঢুকবার ব্যবস্থা থাকে। ফলে জ্বালানি বাতাসে মেশে ভাল, শিখায় পৌঁছানোর আগে বাতাস খানিকটা গরম হতে পারে। উন্নত চুলা তৈরি সনাতন চুলার তুলনায় খুব বেশি পরিশ্রম বা ব্যয়সাধ্য নয়। দেশের ঘরে ঘরে এটি চালু হলে বনসম্পদ ও কৃষিবর্জ্যের বিনষ্টি কমবে এবং মহিলারা স্বাস্থ্যহানিকর রান্নাঘরের পরিবেশ থেকে রেহাই পাবে।

মু. ই.

চেখফ্, আন্তোন্ পাভ্‌লভিচ্ [১৮৬০—১৯০৪]

রুশ ছোটগল্প লেখক ও নাট্যকার। আজফ্ সাগরের এক বন্দরশহর তাগান্‌রোগ্-এ জন্ম, ১৮৬০ সালের ১৭ই জানুয়ারি।

মুদির ছেলে, তাঁর পিতামহ ছিলেন চাষী। বোঝাই যায়, স্বচ্ছল পরিবারে জন্ম নেন নি। ডাক্তার হবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে সব খরচপাতি তাঁকে টিউশনি করে এবং বিভিন্ন কৌতুক-পত্রিকায় লেখালেখি করে জোগাড় করতে হয়েছিল। কিছুদিন ডাক্তারি করলেও পরে ঠিক করেন যে সাহিত্যচর্চাই করবেন। বহু ছোটগল্পের জনক। কিছু বড় গল্পও লিখে গেছেন : ৬ নম্বর ওয়ার্ড, স্তেপ, চাষী, বিষণ্ন কাহিনী এগুলোর অন্যতম। নাটক লিখে গেছেন কয়েকটি– 'ইভানফ' (১৮৮৭), 'গাঙচিল' (১৮৯৬), 'কাকা ভানিয়া' (১৮৯৭), 'তিন বোন' (১৯০১) এবং 'চেরি বাগান' (১৯০৩)। মূলত উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশক থেকেই খ্যাতি পান। এ শতাব্দীর বিশের দশকে পশ্চিম ইউরোপে এবং আমেরিকায় ব্যাপকভাবে তাঁর প্রভাব লক্ষ করা যায়। ক্যাথরিন ম্যান্সফিল্ড, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ এবং আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (দ্র) তো সরাসরি তা উল্লেখ করেই গেছেন।

প্রায় সারাজীবনই যক্ষ্মারোগে ভুগেছেন, এ রোগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ অবশ্য যক্ষ্মা ছিল না; ১৯০৪ সালের জুন মাসের শেষ দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হন, ২রা জুলাই ইহলোক ত্যাগ করলেন।

সৌ. মা.

চে গুয়েভারা [১৯২৮—১৯৬৭]

সমাজতান্ত্রিক ভাবনানুসারী লাতিন আমেরিকান বিপ্লবী, তাত্ত্বিক ও গেরিলানেতা। চে (Che Guevara)-র জন্ম ১৯২৮ সালের ১৪ই জুন আর্জেন্টিনায়। পেশায় ছিলেন চিকিৎসক।

আর্জেন্টিনার একনায়ক হুয়ান পেরনের বিরুদ্ধে কিছুকাল রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর পর চে গুয়েভারা গুয়াতেমালায় যান। ১৯৫৩ সালে যোগ দেন সে দেশের হাকোবো আর্বেন্‌জ্-এর বামপন্থী সরকারে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে এই সরকারের পতন ঘটলে গুয়েভারা মেক্সিকোতে চলে যান এবং সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে ফিদেল কাস্ত্রোর (Fidel Castro) সঙ্গে। অচিরেই তিনি কাস্ত্রোর বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত কিউবার রাজধানী হাভানা দখলের লড়াইয়ে

নানারকম বেশে চে গুয়েভারা

গুয়েভারা কাস্ত্রোর অনুগত বাহিনীর সদস্য হিসাবে অংশ নেন। ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি কিউবার ক্ষমতাসীন সরকারপ্রধান বাতিস্তাকে ক্ষমতাচ্যুত ও বিতাড়িত করে কাস্ত্রো নতুন সরকার গঠন করলে তিনি তাতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদসহ শিল্পমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। এই সব পদে তিনি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত কাজ করেন।

তবে শান্তিপূর্ণ শাসনকার্যের চাইতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় লাতিন আমেরিকা (দ্র) জুড়ে বিপ্লবী যুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। ১৯৬৫ সাল থেকে তাঁকে আর জনসমক্ষে দেখা যায় নি। এ বছরেই কোনো এক সময়ে গুয়েভারা গেরিলা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে বলিভিয়ায় যান। ১৯৬৭ সালে সান্তা ক্রুজের কাছে তাঁর নেতৃত্বাধীন গেরিলা বাহিনী বলিভীয় সেনাবাহিনীর হাতে নির্মূল হয় এবং গুয়েভারা নিজেও ধরা পড়েন। ১৯৬৭ সালের ৯ই অক্টোবর তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

গুয়েভারার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'গেরিলা ওয়ারফেয়ার' (১৯৬১) এবং 'গেরিলা ওয়ারফেয়ার : এ মেথড' (১৯৬৬)।

আ. হ.

চেঙ্গিস খান ও তাঁর দলবল

চেঙ্গিস খান [১১৫৫—১২২৭]

দিগ্বিজয়ী মঙ্গোল সম্রাট এবং মঙ্গোল সাম্রাজ্যের স্থপতি। পূর্ব-সাইবেরিয়ার অন্তর্গত ওনোন (Onon) নদীর নিকটবর্তী ডোলন বোলডক নামক স্থানে (মঙ্গোল পঞ্জিকানুসারে ১১৫৫ খ্রি., কিন্তু চীনা পঞ্জিকানুসারে ১১৬২ খ্রি.) তাঁর

www.pathagar.com

জন্ম। পিতা ইয়েসুকাই কাতুর ছিলেন মঙ্গোল উপজাতিসংঘের সর্দার।

চেঙ্গিস খানের আদি নাম ছিল তেমুজিন বা তেমুচিন (অর্থ : শ্রেষ্ঠ লৌহ বা ইস্পাত)। মঙ্গোলিয়া বিজয় সমাপ্ত ও কারাকোরামে নিজের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে তিনি চেঙ্গিস খান (নির্ভীক যোদ্ধা বা সাহসী বীর) উপাধি লাভ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর চেঙ্গিস খান প্রথমে মঙ্গোলীয় কনফেডারেসির সরদার হন। নিজ প্রতিভাবলে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঙ্গোল উপজাতিকে সুসংগঠিত করে তাদের সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যে পরিণত করেন। এরপর বহু যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম মঙ্গোলিয়ায় তিনি পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন।

১২১৩ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খান উত্তর চীনের চীন বংশীয় সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী ইয়েনচিং (বর্তমান নাম বেইজিং)সহ অধিকাংশ এলাকা অধিকার করেন। ১২১৮ থেকে ১২২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তুর্কিস্থান, ট্রান্স অক্সনিয়া ও আফগানিস্তান জয় এবং পারস্য ও দক্ষিণ রাশিয়ার রাজ্যগুলো আক্রমণ করেন। এভাবে তাঁর সময়ে মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সীমা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত এবং সাইবেরিয়া থেকে হিমালয় ও আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে চীন রাজবংশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকালে তিনি নিহত হন।

চেঙ্গিস খান প্রধানত যোদ্ধা হলেও দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যে যেমন কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল, তেমনি ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধি। তিনি জনস্বার্থে প্রধান প্রধান রাজপথে ডাক বিভাগের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং পুলিশ-প্রহরার ব্যবস্থা করে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাঁর উদ্যোগে চীনা লিপি প্রবর্তিত হয়।

চেঙ্গিস খানের বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভক্ত হয়। তাঁর পৌত্রদের মধ্যে হালাকু খান ও কুব্‌লাই খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুব্‌লাই খান চীন বিজয় সম্পূর্ণ করেন। তৈমুর লং (দ্র) তাঁর বংশধর ছিলেন।

সুজ. ব.

চেতনাপ্রবাহ

আধুনিক গল্প-উপন্যাসে ব্যবহৃত একটি বর্ণনাপদ্ধতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এ আঙ্গিক যথার্থভাবে বিকশিত হয়। লেখক এর সাহায্যে চরিত্রের চেতন ও অর্ধচেতন মনে যেসব স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবনা, অনুভূতি, স্মৃতি ও নানা আপাতবিচ্ছিন্ন অনুষঙ্গ জেগে ওঠে তার সব কিছু বর্ণনা করার চেষ্টা করেন। চেতনাপ্রবাহ (stream Of consciousness) পদ্ধতিতে ঘটনা ও কালের ধারাবাহিকতা এবং পারম্পর্য রক্ষিত হয় না, যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতার বিষয়টি গুরুত্ব পায় না।

ইংরেজি ভাষার (দ্র) ঔপন্যাসিক জেম্‌স্ জয়েস (দ্র) 'ইউলিসিস' (১৯২২) এবং ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ 'মিসেস ড্যালোওয়ে' (১৯২৫) উপন্যাসে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। নোবেল পুরস্কার (দ্র)-বিজয়ী মার্কিন ঔপন্যাসিক উইলিয়াম ফক্‌নার (Willium Faulkner) তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য সাউণ্ড অ্যাণ্ড দ্য ফিউরি'-তে (১৯২৯) অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে এ আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের (দ্র) ক্ষেত্রে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭) ও 'মোহানা' (১৯৪৩) এবং গোপাল হালদার তাঁর 'একদা' (১৯৩৯), 'অন্যদিন' (১৯৫০) ও 'আর এক দিন' (১৯৫১) নামের ত্রয়ী উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ-পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (দ্র) 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৫৪) এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) উপন্যাস দু'টির মধ্যেও আমরা চেতনাপ্রবাহ আঙ্গিকের ব্যবহার লক্ষ করি।

ক. চৌ.

চেরাপুঞ্জি

চেরাপুঞ্জি উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া পর্বতের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। পূর্বে এটি জেলা সদর ছিল। প্রায় ১৩৬০ মি. উঁচু মালভূমির উপর অবস্থিত এই অঞ্চলটিতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পৃথিবীতে (দ্র) সর্বাধিক বলে পরিচিত। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখাটি মায়ানমারের (দ্র) আরাকান উপকূলে বাধা পেয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে (অর্থাৎ বাংলাদেশের উপর দিয়ে) ভারতের (দ্র) পূর্বাংশে প্রবেশ করে। মেঘালয়ে

www.pathagar.com

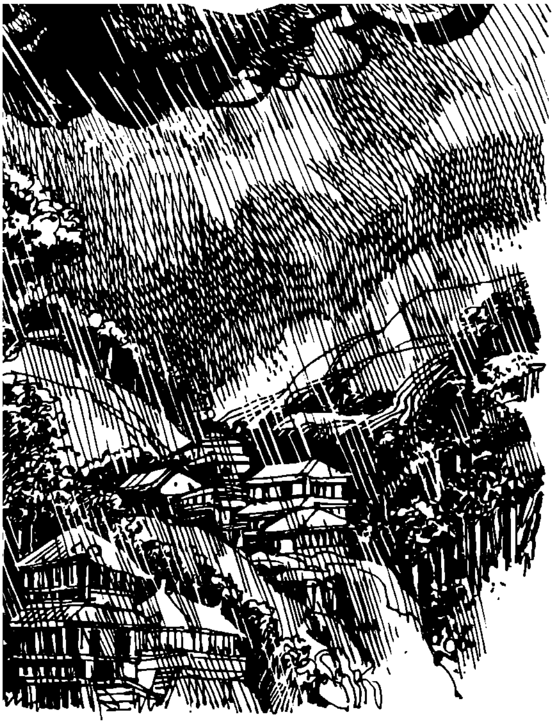

চেরাপুঞ্জিতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়

খাসিয়া পাহাড়ে বাধা পেয়ে এই বায়ুপ্রবাহ অনেক উঁচুতে উঠে যায় এবং প্রবল ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হয়ে পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়। এখানে গড়ে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১২৫০ সেমি। কখনো কখনো ২৪ ঘণ্টায় ১০০ সেমি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে এখানে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। তার পরিমাণ ছিল ২,২৬২ সেমি বা ৯০৫ ইঞ্চি। ঐ বছর কেবল জুলাই মাসেই ৩৬৬ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছিল। চেরাপুঞ্জিতে এত বৃষ্টি কেবল বর্ষাকালেই হয়ে থাকে। শীতকালে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে।

চেরাপুঞ্জিতে অনেকগুলো জলপ্রপাত আছে। তার মধ্যে মুশমই এবং নোহ্‌ফালিকা বিখ্যাত। শিলং-এর সঙ্গে সারা বছর যোগাযোগ রাখার জন্য পাকা রাস্তা আছে। কাচশিল্প ও মৃৎশিল্পের উপযোগী বেলেপাথর এখানে পাওয়া যায়। তা ছাড়া এখানে একটি ছোট সিমেন্ট (দ্র) কারখানাও আছে।

মু. এ.

চোখ চক্ষু / চোখ দ্র

চৌ এন-লাই [১৮৯৮—১৯৭৬]

চীনের রাষ্ট্রনেতা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। জন্ম চেকিয়াং প্রদেশের শাওচিংয়ে এক উচ্চবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে, ১৮৯৮ সালে। নানকিং বিশ্ববিদ্যলয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি নেওয়ার পর উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য তিনি প্যারিসে যান।

১৯১৯ সাল থেকে চীনে সূচিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে চৌ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করেন। ১৯২০ সালে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তিনি গ্রেফতার হন।

প্যারিসে অধ্যয়নকালে চৌ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (দ্র) ফরাসি শাখায় যোগ দেন। ১৯২৪ সালে স্বদেশে ফিরে আসার পর থেকে তিনি একাধিক বার সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র) সফর করেন।

কমিউনিস্টবিরোধী রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতেও চৌ এন-লাই ছিলেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোত্তম মধ্যস্থতাকারী এবং বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের (দ্র) সময় (১৯৩৭-৪৫) তিনি ছিলেন কুওমিণ্টাং (দ্র)–এর সঙ্গে কমিউনিস্ট বাহিনীর তরফ থেকে সংযোগরক্ষাকারী (লিয়াজোঁ) প্রতিনিধি। ১৯৩৬ সালে তিনিই কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিণ্টাংয়ের মধ্যে ঐক্যসাধনের ধারণাকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেন। ১৯৪৯ সালে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন পদে রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধান হন।

চৌ এন-লাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৫০ সালে সম্পাদিত চীন-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর, ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত ইন্দোচীন (দ্র) সংক্রান্ত জেনেভা সম্মেলনসহ ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর বান্দুং সম্মেলনে (দ্র) তাঁর ভূমিকা এবং ১৯৭২ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সাংহাই ইশ্‌তাহার।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর এক জন প্রভাবশালী সদস্য হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

১৯৭৬ সালের ৮ই জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

আ. হ.

চৌম্বক ক্ষেত্র

চৌম্বক ক্ষেত্র বলতে সেই প্রভাববলয়কে বোঝায়, যেখানে কোনো চৌম্বক মেরু আকর্ষণ বা বিকর্ষণ অনুভব করে। চৌম্বক ক্ষেত্রকে বোঝাবার জন্য চৌম্বক বলরেখার ধারণা উদ্ভাবন করেন ফ্যারাডে (দ্র)। চৌম্বক বলরেখা চুম্বকের উভয় মেরু থেকে সূচিত হয়ে দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে পৌঁছয় এবং চুম্বকের ভিতর দিয়ে উত্তর মেরুতে গিয়ে শেষ হয়। অর্থাৎ চৌম্বক বলরেখায় কোনো মুক্ত প্রান্ত নেই। এই বলরেখার দিক হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক এবং এই বলরেখার ঘনত্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা নির্ধারণ করে। যে কোনো স্থায়ী চুম্বকের চার পাশে চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। এর তীব্রতা স্বভাবতই চৌম্বক মেরুর কাছে বেশি। কোনো তারের ভিতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ ঘটিয়েও চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়। এ ক্ষেত্রে চৌম্বক বলরেখাগুলো তড়িৎপ্রবাহের দিককে কেন্দ্র করে বৃত্ত সৃষ্টি করে। আমাদের পৃথিবী (দ্র) একটি চুম্বক বলে এর চার পাশে চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে। চৌম্বক ক্ষেত্রের একক হচ্ছে cgs সিস্টেমে উর্স্‌টিড্‌ (দ্র) এবং SI সিস্টেমে টেসলা। এদের প্রকাশ করা হয় H ও T দ্বারা। চৌম্বক ক্ষেত্রের গুরুত্ব আধুনিক তড়িৎ-চুম্বক বিভিন্ন যন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চৌম্বক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে কোনো চার্জযুক্ত কণিকা ছুটতে থাকলে তার ওপরে একটি বল কাজ করে ও এর পথকে বাঁকিয়ে দেয়। চার্জযুক্ত কণিকাকে চক্রাকারে ঘোরাতে বা এর পথ নিয়ন্ত্রণ করতে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োজন হয়। কোনো একটি কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটলে সেই কুণ্ডলীতে একটি বৈদ্যুতিক চাপ সৃষ্টি হয়। ফ্যারাডের আবিষ্কৃত এই চৌম্বক আবেশের নিয়ম ব্যবহার করে জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

আ. আ.

চৌরপঞ্চাশিকা

পঞ্চাশটি শ্লোক সম্বলিত একখানি সংস্কৃত খণ্ডকাব্য (দ্র)। এটি বসন্ততিলক ছন্দে রচিত। 'চৌরী সুরতপঞ্চাশিকা,' 'চোরপঞ্চাশৎ' 'বিহ্লন কাব্য' নামেও এর পরিচিতি রয়েছে। বিহ্লন (খ্রিস্টীয় ১১শ শতক) এর রচয়িতা বলে জানা যায়। কিন্তু এর রচয়িতা হিসাবে চোর কবি, সুন্দর কবি এবং বররুচির নামও আরোপ করা হয়ে থাকে।

চৌরপঞ্চাশিকা কাব্যের (দ্র) বিষয়বস্তু হল বিরহী নায়ক কর্তৃক নায়িকার সঙ্গ-সুখের স্মৃতি বর্ণনা। এক রাজকন্যার সঙ্গে গোপন প্রণয়ে আবদ্ধ এক যুবক রাজদরবারে অভিযুক্ত হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলে বধ্যভূমিতে প্রণয়ের স্মৃতিস্নিগ্ধ বিবরণপূর্ণ কাব্যখানি আবৃত্তি করেন। এতে রাজা তুষ্ট হয়ে তাঁকে কন্যাদান করেন।

বাংলায় এই কাব্য বিদ্যাসুন্দর (দ্র) কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারতচন্দ্র (দ্র) কালীপক্ষে এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করেছেন।

সুজ. ব.

চ্যাপলিন, চার্লি [১৮৮৯—১৯৭৭]

চলচ্চিত্রজগতে এক অবিস্মরণীয় পুরুষ চার্লস স্পেন্সর চ্যাপলিন বা সংক্ষেপে চার্লি চ্যাপলিন (Charlie Chaplin)। ১৮৮৯ সালের এপ্রিলে আমেরিকার (দ্র) টমাস্ আল্‌ভা এডিসন্ (দ্র) আবিষ্কার করলেন আজকের মুভি ক্যামেরার আদি উৎস 'কিনোটোস্কোপ'। ঐ বছর এপ্রিলেই অস্ট্রিয়ার এক কাস্টমস্ অফিসারের পরিবারে জন্ম নিলেন আডোল্‌ফ্ হিটলার (দ্র)। আর ঐ এপ্রিলেই লণ্ডনে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিলেন পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান চার্লি চ্যাপলিন। বাবা চার্লস ও মা হানা লিলি দু'জনেই ছিলেন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গীতশিল্পী ও অভিনেতা। চার্লির ১২ বছর বয়সে বাবা মারা যান এবং চার্লি সে সময় দারিদ্র্যের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করেন। মা-ও অর্থকষ্টে ও অপুষ্টিতে পাগল হয়ে যান। তারপরও চার্লি ভেঙে পড়েন নি। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি পরে জগদ্বিখ্যাত হন। চার্লি ছোটকাল থেকে নাচের দলে যোগ দেন, নাটকে অভিনয় করেন। তিনি থিয়েটারে (দ্র) ও শার্লক্ হোম্‌স্ (দ্র) নাটকে অভিনয় করেন। তিনি সার্কাস দলেও

www.pathagar.com

অনন্য ভঙ্গিমায় চার্লি চ্যাপলিন

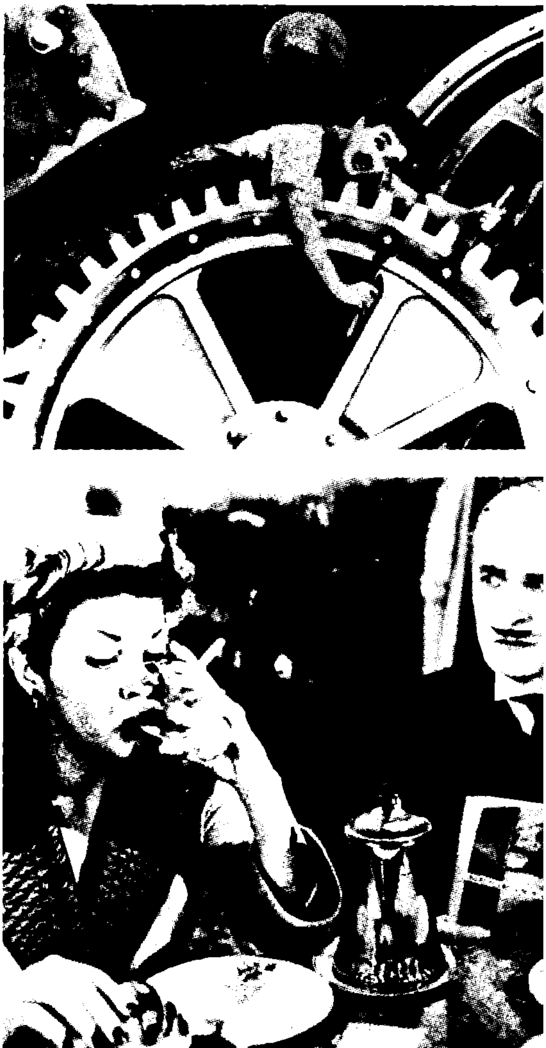

উপরে : 'মডার্ন টাইমস' ছবিতে। নিচে : 'মসিয় ভের্দু' ছবিতে চার্লি চ্যাপলিন

যোগ দেন। ভ্রাম্যমাণ নাট্যসংস্থা, হলিউডের চলচ্চিত্রসংস্থা, কোথায় না তিনি কাজ করেছেন।

সারা জীবন তিনি অসংখ্য ছবি করেন, দেশে-বিদেশে অজস্র সম্মানে ভূষিত হন, প্রায় সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেন। তাঁর কয়েকটি সেরা ছবি হল 'দ্য গোল্ড রাশ', 'দ্য সার্কাস', 'সিটি লাইট', 'মডার্ন টাইমস', 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর', 'মসিয় ভের্দু', 'লাইমলাইট', 'এ কিং ইন নিউ ইয়র্ক' ইত্যাদি। শিশুদের জন্য তাঁর বেশ কয়েকটি বিখ্যাত ছবি আছে। তাঁর অনেক ছবি নির্বাক যুগের (অর্থাৎ চলচ্চিত্রে তখনো কথা বা সংলাপ যুক্ত হয় নি), সেগুলোতে পরে আবার সংলাপ ও সঙ্গীত যোগ করে নতুন প্রিন্ট তৈরি হয়। তাঁর জীবনের অজস্র সম্মানের অন্যতম হল রাণী এলিজাবেথ কর্তৃক প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি।

১৯৭৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তিনি সুইজারল্যাণ্ডের কর্সিয়ার-এ মারা যান। তাঁর শেষকৃত্য হয় ঐ দেশের ভিভে-তে। পরের বছর ১লা মার্চ তাঁর শবদেহ চুরি যায় এবং যোল দিন পর তা উদ্ধার করে আবার সমাহিত করা হয়।

বি. ব.

www.pathagar.com

ছ

ছড়া

ছন্দোবদ্ধ সমিল বা অমিল পদ্য বিশেষ। তবে পদ্য বা কবিতার (দ্র) সঙ্গে এই শ্রেণীর রচনার পার্থক্য অনেক। অর্থের গভীরতা নয়, শিশুসুলভ সরলতাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুরময় ধ্বনিই এর প্রাণ। শব্দের নূপুর-নিক্কণ ধ্বনি আর পদে পদে ছড়ানো কথার একেকটি ছবির সমন্বয়ে কোনো ছন্দময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টির নামই ছড়া।

ছড়ার ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন এবং সেই ঐতিহ্য লৌকিক। লোকসমাজের মুখে মুখে এর সৃষ্টি। প্রাচীন কালে ছড়া 'লেখা' হত না, মুখে মুখে 'কাটা' হত। আর সেই ছড়া মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত জন থেকে জনতায়, যুগ থেকে যুগে। শুধু বাংলা ভাষায় (দ্র) নয়, পৃথিবীর (দ্র) সকল দেশের সকল ভাষায় ছড়া প্রথমে ছিল মৌখিক ঐতিহ্য। লোকসাহিত্য (দ্র) হিসাবে সংগৃহীত হতে হতে অনেক পরে এর লৈখিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। একটি জনপ্রিয় লোকছড়ার উদাহরণ :

আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা
মাছ কাটলে মুড়ো দেব
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
সোনার থালে ভাত দেব
রাজার মেয়ে বিয়ে দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

প্রাচীন কালের এসব ছড়ায় শিশুকে খাওয়ানো, নাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, খেলাধুলা, ব্রতকথা, রহস্য-কৌতুক ইত্যাদি বিষয়ের সমাবেশ দেখা যায়। এসব ছড়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিছক আনন্দরস পরিবেশন করা।

যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ছড়া রচনার উদ্দেশ্য, বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক-কলেবর বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছড়া এখন নিয়মিত চর্চার বিষয়। একটি মর্যাদাবান সাহিত্য-মাধ্যম হিসাবে ছড়া এখন সর্বজনস্বীকৃত। শিশুতোষ ছড়ার মেজাজ নিয়ে শতাব্দী কাল আগে যে ছড়ার যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা এখন ক্ষতবিক্ষত জীবন ও সমাজের নানা সমস্যা ও অসঙ্গতিকে প্রকাশ করতে সক্ষম। ছড়া এখন শাণিত ছুরির মতো দ্যুতিময়।

সুজ. ব.

ছত্রাক (fungi)

ছত্রাক সমাঙ্গবর্গের এক প্রকার সহজ ধরনের উদ্ভিদ (দ্র)। এরা নানান ধরনের বহুবিধ জীবের একটি বড় দল। এদের আকারও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এদের কোনোটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না, আবার কোনোটি অনেক বড় আকারের হয়ে থাকে। এরা বাস করে মাটিতে (দ্র), পানিতে (দ্র) এবং জীবিত ও মৃত জৈব পদার্থ-সমৃদ্ধ পরিবেশে। এরা বাতাসেও (দ্র) বাস করে। এদের প্রজাতির সংখ্যা ১০,০০০।

ছত্রাকের প্রকৃত মূল, কাণ্ড এবং পাতা নেই। এদের দেহে ক্লোরোফিলও (দ্র) নেই। তাই এরা নিজেরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে না। এরা পরজীবী (দ্র) এবং মৃতজীবী হিসাবে বাস করে। কোনো কোনো ছত্রাক এককোষী, কোনোটি আবার বহুকোষী। বেশির ভাগ ছত্রাকের দেহ চিকন সুতোর মতো অংশ দিয়ে গঠিত। এগুলোকে 'হাইফা' (hypha) বলে। অনেকগুলো 'হাইফা' একত্রে সূক্ষ্ম নলের মতো দেখালে তাকে 'মাইসেলিয়াম' (mycelium) বলে। জীবিত বা মৃত দেহে যেখানেই ছত্রাক জন্মায় সেখানেই মাইসেলিয়াম ছড়িয়ে পড়ে এবং খাদ্য শোষণে সহায়তা করে। ছত্রাকের পরিবহণতন্ত্র নেই। দেহের গঠন অনুসারে ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ চার শ্রেণীতে বিভক্ত : ১. ফিকোমাইসিটিস্, ২. অ্যাসকোমাইসিটিস্, ৩. ব্যাসিডিওমাইসিটিস্ ৪. ফানজাই ইম্পার্ফেক্টি।

আণুবীক্ষণিক ছত্রাকদল 'ঈস্ট' (দ্র) এবং 'মোল্ড' বা ছাতা—এ দু'ভাগে বিভক্ত। পাউরুটি তৈরিতে ঈস্ট ব্যবহৃত হয়। মোল্ড তিন ভাগে বিভক্ত। ভাগগুলো হচ্ছে মিল্‌ডিউ, স্মাট্ এবং রাস্ট্। কোনো কোনো উদ্ভিদনাশক মিল্‌ডিউ কাপড়চোপড়, ভেজা জায়গা ও খাদ্যদ্রব্যের উপর জন্মে। স্মাট্ ও রাস্ট্ বেশ কিছু উঁচু স্তরের উদ্ভিদে রোগের কারণ ঘটায়। অপরাপর বিভিন্ন প্রকার ছত্রাকের আক্রমণের কারণে জীবদেহে নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। অপর দিকে

www.pathagar.com

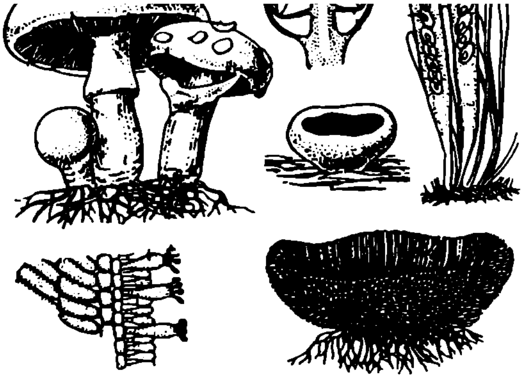

বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক

পেনিসিলিয়াম (penicillium) জাতীয় ছত্রাক থেকে জীবন রক্ষাকারী পেনিসিলিন ঔষধও (দ্র) পাওয়া যায়।

কিছু কিছু ছত্রাক পুষ্টিকর আহার্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে অ্যামানিটাসহ কয়েক প্রকার ব্যাঙের ছাতা (দ্র) ভয়ানক বিষাক্ত। বিশেষ করে যেসব ব্যাঙের ছাতায় দুধের (দ্র) মতো রস থাকে এবং যেগুলো খুব রঙিন হয় সেগুলো বিষাক্ত। এ ছাড়া যেসব ছত্রাক কাটলে কাটা অংশ দ্রুত নীল হয়ে যায় এবং যেগুলোর দেহে আঁশ থাকে সেগুলোও বিষাক্ত হয়ে থাকে।

মু. আ.

ছন্দ

ছন্দ মানে সুসমঞ্জসতার সৌন্দর্য। কবিতার (দ্র) ক্ষেত্রে ছন্দ বলতে পদে মাত্রার বিন্যাস-রীতিকে বোঝায়। কবিতার চরণের অন্তর্গত শব্দসমষ্টির বিভিন্ন অংশে বিশেষ মাত্রার পারিপাট্য বা সামঞ্জস্য সুরক্ষা করার ফলে অনির্বচনীয় এক দোলার সৃষ্টি হয়। এই দোলা বা তরঙ্গের সাহায্যে বাক্যকে রসাত্মক এবং ভাষাকে সুষমামণ্ডিত ও শ্রুতিমধুর করা হয়।

বাংলা কাব্যে ছন্দ প্রধানত তিন প্রকার। যথা—স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত। সাধারণভাবে কতগুলো উপাদানের ভিত্তিতে এসব ছন্দ গড়ে ওঠে। ছন্দের উপাদানগুলো হল—মাত্রা, অক্ষর, যতি, পর্ব, চরণ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে মাত্রা ও অক্ষর ছন্দের মূল উপাদান। প্রসঙ্গত, ছন্দের 'অক্ষর' (দ্র) কিন্তু বর্ণ নয়; যেমন— 'বসন্ত' শব্দে বর্ণ আছে তিনটি ব+স+ন্ত, কিন্তু ছন্দের অক্ষর হল এ রকম : ব+সন্+ত।

বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে উচ্চারণের ক্ষুদ্রতম ধ্বনি-একককে অক্ষর বা ইংরেজিতে syllable (সিলেব্‌ল্‌) বলা হয়। ধ্বনি আবার দু' প্রকার। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনির নির্বাধ উচ্চারণ সম্ভব তা-ই স্বরধ্বনি। যেমন—অ, আ, ই, উ ইত্যাদি। এগুলো নিজেই উচ্চারিত হতে পারে। কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন— ক্+অ, খ্+অ, গ্+অ ইত্যাদি। পূর্ণাঙ্গ অক্ষরের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 'বসন্ত' শব্দে মোট ধ্বনি পাওয়া যায় সাতটি— ব্-অ-স্-অ-ন্-ত্-অ, কিন্তু শব্দটি উচ্চারণ করলে পাওয়া যায় তিনটি অক্ষর ব(অ)-সন্-ত(অ)। এভাবে প্রত্যেক শব্দের অন্তর্গত অক্ষরের সংখ্যা জানতে হলে শব্দটিকে একটু টেনে উচ্চারণ করলে বিভিন্ন অক্ষরের পার্থক্য কানে ধরা পড়ে।

অক্ষর দু'রকমের। যেমন—স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত। ব্যঞ্জনান্তকে হলন্তও বলা হয়। যে সকল অক্ষর স্বরধ্বনিজাত অথবা অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি আছে, তাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে, যেমন—না (=ন্+আ), কি (=ক্+ই), সু(=স্+উ) ইত্যাদি। এসব স্বরান্ত অক্ষরকে মুক্তাক্ষর বা ইংরেজিতে open syllable বলা হয়। মুক্তাক্ষর উচ্চারণের শেষে বাক্‌প্রত্যঙ্গ খোলা থাকে। অন্য দিকে ব্যঞ্জনধ্বনিতে যেসব অক্ষরের সমাপ্তি ঘটে তাকে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বলে বা হলান্ত অক্ষর বলে। যেমন — রাত্, দিন্, কাল্ ইত্যাদি। ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে বদ্ধাক্ষর বা ইংরেজিতে closed syllable বলে। বদ্ধাক্ষর উচ্চারণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌প্রত্যঙ্গ বন্ধ হয়ে যায়। অক্ষর উচ্চারণের শেষে বাক্‌প্রত্যঙ্গ খোলা থাকে, না বন্ধ হয়ে যায়—তা লক্ষ করেও মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর নির্ণয় করা চলে।

স্বরান্ত অক্ষরকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন —মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর। একটি মাত্র অযুক্ত স্বরধ্বনি নিয়ে যে অক্ষর গঠিত হয়, তা মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর যেমন— অ, আ, কা, রা ইত্যাদি। মৌলিক অক্ষরের শেষে যদি আরো উচ্চারিত স্বরধ্বনি থাকে এবং সব ক'টি ধ্বনিই যদি জিহ্বার অবিরাম গতি দ্বারা উচ্চারিত হয়, তা হলে তাকে যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর বলে। যেমন- ঐ, ঔ, খাও ইত্যাদি।

এভাবে অক্ষরের শ্রেণীবিভাগে মোট তিন ধরনের অক্ষর পাওয়া যায়: ১. মৌলিক স্বরান্ত; ২. যৌগিক স্বরান্ত;

www.pathagar.com

৩. ব্যঞ্জনান্ত বা বদ্ধাক্ষর। এই তিন প্রকার অক্ষরের মধ্যে মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর অযুগ্ম ধ্বনি এবং যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর যুগ্মধ্বনি হিসাবে বিবেচিত। অযুগ্ম ধ্বনি সব ছন্দেই এক মাত্রার মর্যাদা পায়। কিন্তু যুগ্ম ধ্বনি কোথাও এক মাত্রার আবার কোথাও দু'মাত্রার হয়ে থাকে।

মাত্রা কী ? অক্ষর উচ্চারণের কালপরিমাণকে মাত্রা (mora) বলা হয়। অর্থাৎ একটি অক্ষর উচ্চারণের জন্য যে সময় বা কাল (duration) প্রয়োজন, সে সময় অনুসারেই প্রতিটি অক্ষরের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ছন্দ বিশ্লেষণে কবিতার প্রত্যেক অক্ষরের প্রকৃতি বিচার করে অযুগ্ম ধ্বনি হলে অক্ষরের ওপর অর্ধবৃত্ত (∪) চিহ্ন এবং যুগ্মধ্বনি হলে ড্যাশ (—) চিহ্ন দেওয়ার নিয়ম আছে। যেমন— ∪ — গোলাপ।

ছন্দের অন্য দু'টি উপাদান হল— যতি ও পর্ব। যতি বা ছেদ বলতে উচ্চারণে বিরতি বোঝায়। আর কবিতার চরণে অর্ধযতি বা হ্রস্বযতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ধ্বনিসমষ্টির নাম পর্ব। যতির অবস্থানের জন্যই কবিতার চরণগুলো কয়েকটি পর্বে বিভক্ত হয়। এবার তিন প্রকার ছন্দের প্রকৃতি ও দৃষ্টান্তসহ মাত্রা বিশ্লেষণ করা যাক।

১. স্বরবৃত্ত ছন্দ : যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্বদাই এক মাত্রা ধরা হয় এবং যে ছন্দের প্রত্যেক পর্বের প্রথমে শ্বাসাঘাত পড়ে, তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলা হয়। পর্বের প্রথমে বল বা শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত পড়ে বলে এই ছন্দকে বলপ্রধান বা শ্বাসাঘাতপ্রধান বা স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ এর নামকরণ করেছেন 'ছড়ার ছন্দ' বা 'লৌকিক ছন্দ'।

∪—∪ — —∪∪∪ — ∪∪ — ∪∪∪
হেমন্ত যায় | হিম ছড়িয়ে | শীত আসে বেশ | জাঁকিয়ে
∪∪∪ — — ∪∪ — —∪∪∪ ∪∪∪
ঋতু সে নয়, | শীত যেন এক | মস্ত বড় | আঁকিয়ে

উপরের চরণ দু'টিতে লম্বা দাঁড়ি (|) চিহ্নগুলো যতি এবং পর্বের অবস্থান নির্দেশ করছে। এর প্রতি পর্বে ব্যবহৃত মাত্রার হিসাব যতির অবস্থান থেকেই বোঝা যায়। দু'টি পঙ্‌ক্তিতেই তিনটি করে পর্ব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্ত্যমিলের শব্দগুলো— যেমন জাঁকিয়ে, আঁকিয়ে— অতিপর্ব (অর্থাৎ বাড়তি পর্ব) হিসাবে গণ্য হয়।

স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রত্যেক পর্বে সাধারণত চারটি করে মাত্রা থাকে। ওপরের পর্বগুলোতেও যুগ্মধ্বনি অযুগ্মধ্বনি মিলিয়ে চার মাত্রা করে আছে। সব পর্বে মাত্রার এই সমতা রক্ষা করতে হয়।

স্বরবৃত্ত ছন্দের লয় বা গতি দ্রুত। দ্রুত তালে উচ্চারণেই এর ঝঙ্কার ফোটে। এটি মাত্রাবৃত্তের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ছন্দ।

২. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ : মাত্রাবৃত্ত বিলম্বিত লয়ের ছন্দ, কিন্তু স্বরবৃত্ত দ্রুত লয়ের। যুগ্মধ্বনি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে দুই মাত্রার মর্যাদা পায়।

∪ — —∪ — — ∪∪ ∪— ∪∪∪ ∪—
বাতাস আঁকলে | ঢেউয়ের ছবি | দিঘির রুপোলি | খাতায়
— — — — — ∪∪ ∪— ∪∪∪ ∪—
টলমল জল | কল কল রবে | মধুর মিতালি | পাতায়

উপরের পর্বগুলোর প্রতিটির যুগ্মধ্বনি দু' মাত্রা করে ধরলে দেখা যায় প্রত্যেক পর্বে মাত্রার সংখ্যা হয় ছয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এই ছয় মাত্রার পর্বের চালই বেশি। তবে সাত ও আট মাত্রার পর্বও এই ছন্দে পাওয়া যায়। এ ছাড়া ছয় মাত্রার কম অর্থাৎ পাঁচ ও চার মাত্রার পর্ববিশিষ্ট কবিতাও হয়ে থাকে। সেগুলোকে সরাসরি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ না বলে স্বরমাত্রিক ছন্দ বলা হয়।

স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে শেষ পর্ব ছাড়া অন্যান্য পর্বের মাত্রার সংখ্যা সমান থাকে অর্থাৎ এক পর্ব যত মাত্রার হবে অপরাপর পর্বও তত মাত্রার হবে।

৩. অক্ষরবৃত্ত ছন্দ : অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বৈচিত্র্যধর্মী। এই ছন্দকে 'পয়ার' বা 'যৌগিক ছন্দ'ও বলে। এর নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই এই ছন্দে স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তের মতো পর্বে মাত্রার সমতা থাকে না। তবে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, অমিত্রাক্ষর ইত্যাদি অক্ষরবৃত্ত-জাতীয় ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখ্যার বিশেষ রীতি আছে। সাধারণভাবে অক্ষরবৃত্ত হল সেই ছন্দ যাতে শব্দের শেষে যুগ্মধ্বনি থাকলে দু' মাত্রা এবং প্রথমে বা মধ্যে থাকলে এক মাত্রা ধরা হয়।

∪ ∪ ∪∪— ∪∪ — ∪— ∪∪
সে তো সেদিনের কথা | বাক্যহীন যবে |
∪∪∪∪ ∪∪— ∪∪ — ∪∪
এসেছিনু প্রবাসীর | মতো এই ভবে |
∪∪ ∪∪ ∪∪— —∪ —∪ ∪∪
বিনা কোনো পরিচয়, | রিক্ত শূন্য হাতে |
——∪ —— — — ∪∪ ∪∪
একমাত্র ক্রন্দন সম্ | বল লয়ে সাথে |

www.pathagar.com

এর প্রত্যেক চরণ দু' পর্বের। চরণের মাত্রাসংখ্যা ১৪ এবং মাত্রাবিন্যাস ৮+৬। চরণের শেষে অন্ত্যমিল আছে। একে লঘু পয়ার বা দ্বিপদীও বলা হয়। আট মাত্রা ও ছয় মাত্রার যতি অবলম্বন করে এর ধ্বনিগাম্ভীর্য প্রকাশ পায়।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পর্ব সাধারণত দীর্ঘ হয়। এর লয় বা গতি ধীর। এ জন্য এতে বিশেষ একটি টান বা তান সৃষ্টি হয়, যা ধ্বনিগাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলে। দশ, আট ও ছয় মাত্রার পর্বই সাধারণত এ ছন্দে দেখা যায়। তবে এর মূল বা প্রথম পর্ব আট বা দশ অক্ষরে গঠিত হয়।

৪. গদ্যছন্দ : স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত ছাড়াও আধুনিক কালে গদ্যছন্দ নামে এক ধরনের ছন্দের প্রচলন হয়েছে। কাব্যকে ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কবিতাকর্মীরা যে সমস্ত পন্থার আশ্রয় নিয়ে থাকেন, গদ্যছন্দ সেগুলোর একটি। গদ্যছন্দে বাক্যের সামগ্রিক রূপ অপেক্ষা প্রতিটি শব্দের ও বাক্যাংশের সূক্ষ্মকারুকার্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের (দ্র) হাতে প্রথম এই ছন্দের বিকাশ ঘটে এবং পরবর্তী কবিরা একে আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন। বাংলা কবিতায় বর্তমানে গদ্যছন্দেরই আধিপত্য চলছে।

সুজ. ব.

ছবি বিশ্বাস [১৯০০—১৯৬২]

বাংলা চলচ্চিত্রের (দ্র) বিখ্যাত চরিত্রাভিনেতা। তিনি ১৯০০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে কলিকাতায় (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনেতা হিসাবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ।

ছবি বিশ্বাস ছিলেন যে কোনো চরিত্র রূপায়ণে স্বাভাবিক অভিনয়-প্রয়াসী অভিনেতা। তাঁর অভিনীত কয়েকটি স্মরণীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম 'চোখের বালি', 'কাবুলিওয়ালা', 'শুভদা', 'প্রতিশ্রুতি', 'জলসাঘর', 'দেবী', 'সবার উপরে', 'কাঞ্চন-জঙ্ঘা,' ও 'হেডমাস্টার' ইত্যাদি। ১৯৩০ থেকে ১৯৬০-এর দশক জুড়ে তিনি একাদিক্রমে বহু বাংলা চলচ্চিত্রে চরিত্রাভিনেতা হিসাবে অভিনয় করে যান এবং ব্যাপক দর্শকনন্দিত হন।

তিনি নাট্যাভিনেতাও ছিলেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহের অন্যতম 'সমাজ', 'ধাত্রী পান্না', 'মীর কাসিম', 'দুই পুরুষ', 'বিজয়া' ইত্যাদি।

উপরে : 'জলসাঘর' ছবিতে ছবি বিশ্বাস
নিচে : 'কাবুলিওয়ালা' ছবিতে ছবি বিশ্বাস ও শিশুশিল্পী টিংকু ঠাকুর

ছবি বিশ্বাস কয়েকটি চলচ্চিত্র পরিচালনাও করেন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রতিকার' (১৯৪৪) ও 'যার যেথা ঘর' (১৯৪৯)।

১৯৫৯ সালে তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতিস্বরূপ 'সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার' লাভ করেন।

বাংলা ছায়াছবির প্রতিষ্ঠালগ্নের শক্তিমান এই অভিনেতা ১৯৬২ সালের ১১ই জুন কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ

www.pathagar.com

ছয় দফা

আওয়ামী লীগ (দ্র) নেতা শেখ মুজিবুর রহমান (দ্র) পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন।

দাবিগুলো হচ্ছে : ১. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরকার নির্বাচিত হবে। এ সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। আইনসভা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে।

২. কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের অধীনে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিভাগ (রাজনৈতিক) থাকবে। বাকি সব বিষয়ে অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশগুলোর ক্ষমতা হবে নিরঙ্কুশ।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম -পাকিস্তানের জন্য দু'টি পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা থাকবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে। অথবা, দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা চালু থাকলে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানে অর্থপাচার বন্ধ রাখতে হবে। এবং এই জন্য দুই অঞ্চলের জন্য দু'টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪. কর ও রাজস্ব ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে রাজ্য সরকারের (প্রাদেশিক সরকার) হাতে। আদায়কৃত অর্থের একটি অংশ রাজ্য সরকার ফেডারেল সরকারের তহবিলে জমা দেবে।

৫. ক. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে।

খ. পূর্ব-পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব -পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম-পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে।

গ. ফেডারেশন প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারে আদায় করবে।

ঘ. দেশজাত দ্রব্য উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিনা শুল্কে আমদানি-রফতানি চলবে।

ঙ. ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশের সঙ্গে যাবতীয় চুক্তি সম্পাদন ও বিদেশে ট্রেড-মিশন স্থাপনের যাবতীয় ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে।

৬. পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার জন্য পৃথক প্যারা-মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী থাকবে। পূর্ব-পাকিস্তানে একটি অস্ত্রনির্মাণ কারখানা, একটি পূর্ণ সামরিক একাডেমী এবং নৌবাহিনীর সদর দফতর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ছয় দফা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : ১৯৬৬

খু. জা.

ছানি চক্ষুরোগ দ্র

www.pathagar.com

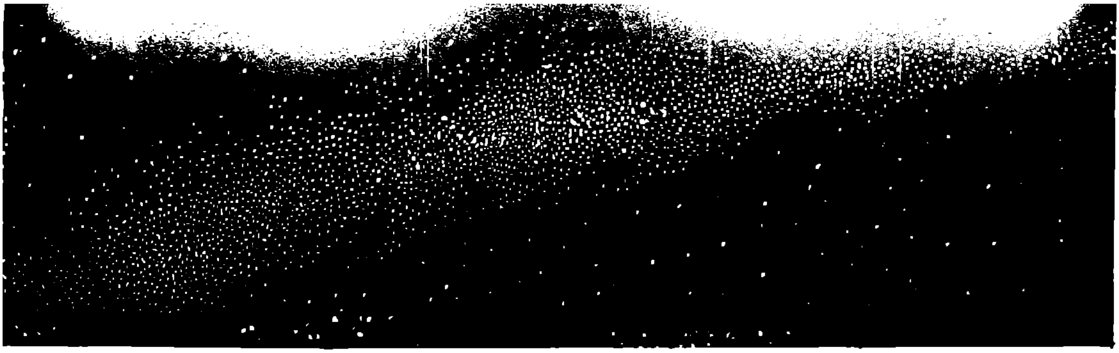

ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা

ছায়াপথ (The Milky Way)

অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের বুকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এক দীর্ঘ নক্ষত্রখচিত পথ দেখা যায়। অন্ধকার আকাশে দীপ্তিমান পথের মতো দেখায় বলে প্রাচীন কালে একে ছায়াপথ (the Milky Way) বলা হত। 'মিল্কি ওয়ে' শব্দটি অবশ্য গ্রিক গ্যালাক্সি (দ্র) শব্দের অর্থ। পরবর্তী কালে জানা যায়, ওই ছায়াপথ আসলে আমাদের গ্যালাক্সিরই অংশ বিশেষ। এর পর আমাদের গ্যালাক্সিকে বোঝানোর জন্যও বাংলায় ছায়াপথ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ছায়াপথ মহাশূন্যকে একটি মহাবৃত্তের মতো বেষ্টন করে রেখেছে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা এটিকে 'সুরগঙ্গা', 'আকাশগঙ্গা', 'স্বর্গগঙ্গা' প্রভৃতি নামে অভিহিত করতেন।

আমাদের ছায়াপথ হল স্থানীয় গ্রুপ (local group) নামে একটি গ্যালাক্সি-ঝাঁকের সদস্য। এই ছায়াপথে রয়েছে প্রায় $১০^{১১}$ টি নক্ষত্র।

ছায়াপথের গঠন অনেকটা ডিসকাস থ্রো খেলার চাকতির মতো—মধ্যস্থলে স্ফীত এবং বাইরের দিকে পাতলা হতে হতে সর্পিল বাহুর আকৃতিতে শেষ হয়েছে। এই চাকতির সর্বমোট ব্যাস প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ (দ্র) এবং এর গড়পড়তা পুরুত্ব ১,৭০০ আলোকবর্ষ। তবে কেন্দ্রস্থলে এর ঘনত্ব অনেক বেশি, প্রায় ১৬,০০০ আলোকবর্ষ। ধারণা করা হয়, ছায়াপথের কেন্দ্রে রয়েছে একটি বিশাল কৃষ্ণবিবর (দ্র)। ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে পরিধির দুই-তৃতীয়াংশ দূরে সৌরজগতের অবস্থান। এই স্থানে ছায়াপথের চাকতির পুরুত্ব প্রায় ২,৬০০ আলোকবর্ষ। সূর্য (দ্র) তার গ্রহপরিবারসহ প্রতি সেকেণ্ডে ২৫০ কিলোমিটার বেগে ছায়াপথের কেন্দ্রের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে।

মু. হা.

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

বাংলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বা ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে একে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়। এক দিকে নবাব এবং অপরদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি—এই দুই পক্ষের দ্বৈত শাসনের ফলে বঙ্গদেশের মানুষের আর্থিক দুর্গতি চরমে পৌঁছায়। পরপর দুই বছর অনাবৃষ্টিতে দেশে অজন্মা হয়। ফলে সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এতৎসত্ত্বেও ইংরেজ শাসকগণ সাহায্যের পরিবর্তে জনগণের উপর রাজস্ব আদায়ের জন্য অত্যাচার চালাতে থাকে। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীতে (দ্র) দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়।

দুর্ভিক্ষের পূর্বে গড়ে বছরে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ টাকা। এই চরম দুর্ভিক্ষের সময়েও কোম্পানির আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা। এতেই বোঝা যায়, কী পরিমাণ অত্যাচার চালিয়ে জনগণের নিকট থেকে তখন কর আদায় করা হয়েছিল।

খু. জা.

ছোটগল্প

ছোটগল্প হচ্ছে গদ্যরচনা, কথাসাহিত্যের অন্তর্গত। এর রচনারীতি ও আঙ্গিক উপন্যাসের (দ্র) মতো হয়েও উপন্যাসের মতো নয়। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের একটা পার্থক্য

www.pathagar.com

রয়েছে আকারের দিক থেকে। ছোটগল্পে উপন্যাসের বিস্তার নেই। ইংরেজ ঔপন্যাসিক এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ (দ্র) বলতেন, ছোটগল্প দশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে পড়ে শেষ করার মতো হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে আকারে ছোট হলেই ছোটগল্প হয় না। লেখক যখন জীবনের কোনো ক্ষুদ্র খণ্ডকে আকর্ষণীয় করে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন, যখন সকল প্রকার বাহুল্য, অনাবশ্যক চরিত্র ও ঘটনার ভিড় পরিহার করে তাঁর রচনাকে একটা সুন্দর ব্যঞ্জনায় ভূষিত করতে পারেন তখনই ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়। আধুনিক ছোটগল্পের বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র তার পরিবেশনভঙ্গিও তেমনি বিচিত্র ও বহুমাত্রিক। কখনো চরিত্র, কখনো ঘটনা, কখনো বর্ণনার ঔজ্জ্বল্য, কখনো সংলাপের ভঙ্গি, কখনো শুধু আবহ ও পরিমণ্ডল, কখনো ইঙ্গিতময়তা বা রূপক-প্রতীক ছোটগল্পকে বিশিষ্ট করে তোলে। বাংলা ভাষায় (দ্র) রবীন্দ্রনাথ (দ্র), রুশ ভাষার আন্তোন্‌ চেখফ্‌ (দ্র) এবং ফরাসি ভাষার গী দ্য মোপার্সাঁ (দ্র) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের অন্যতম বলে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছেন।

ক. চৌ.

গাছেরও জীবন আছে

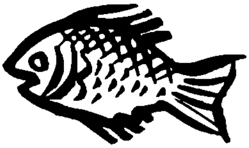

জ

জগত্তারিণী স্বর্ণপদক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দ্র

জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার [১৮৫৯—১৯৩৭]

এক জন প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানী। ১৮৫৯ সালের ৩০শে নভেম্বর ময়মনসিংহে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ফরিদপুরে এক জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। প্রথমে ফরিদপুরের গ্রামীণ বিদ্যালয়ে

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি রূপে জগদীশচন্দ্র বসু : ১৯২৭

এবং পরে 'সেন্ট জেভিয়ার্স' স্কুল ও কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। ১৮৮০ সালে বি. এ. পাশ করার পর ঐ বছরই তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে যান। ইংল্যাণ্ডে তাঁর শিক্ষাকাল ছিল ১৮৮০-৮৪ সাল। ঐ সময়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিজ্ঞানে অনার্সসহ বি. এ. এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এসসি. অনার্স পাশ করেন। ১৮৮৫ সালে তিনি কলিকাতার (দ্র) প্রেসিডেন্সি কলেজে

www.pathagar.com

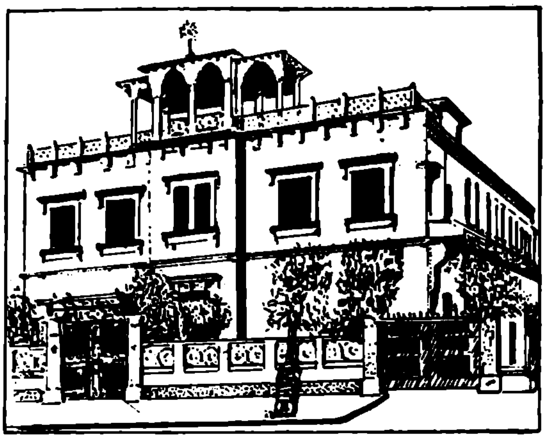

বসু বিজ্ঞান-মন্দির

(দ্র) অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯৬ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এসসি. উপাধি লাভ করেন।

জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণাকাল তিন পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায় : ১৮৯৫-৯৯ সাল, দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯০০-১৯০২ সাল এবং তৃতীয় পর্যায় : ১৯০৩-৩২ সাল। তাঁর পর্যায়ভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্র ছিল : বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, জৈব ও অজৈব পদার্থের উত্তেজনার প্রতি সাড়া প্রদানের সমতা এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশির তুলনামূলক শারীরবৃত্ত। ১৯১৬ সালে তিনি অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর দু'বছরের মধ্যে (৩০শে নভেম্বর, ১৯১৭) তিনি 'জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই বিজ্ঞানমন্দিরে গবেষণা পরিচালনা করেন।

জগদীশচন্দ্র বসুই প্রথম ভারতীয় যিনি ১৯০২ সালে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নিযুক্ত হন। বিজ্ঞানে বিশিষ্ট অবদানের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডে 'নাইট' উপাধিতে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে সম্মানসূচক ডি. এসসি. উপাধিতে ভূষিত হন। জগদীশচন্দ্র বসু বেশ কিছু নবতর গবেষণাপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এগুলোর মধ্যে উদ্ভিদের (দ্র) বৃদ্ধি রেকর্ড করার জন্য 'ক্রেস্কোগ্রাফ' আবিষ্কার এবং অতি সীমিত মাত্রায় নড়াচড়াকে এক কোটি গুণ বিবর্ধন করে দেখানো উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি ঘুম (দ্র), বাতাস (দ্র), খাদ্য ও ঔষধ (দ্র) প্রভৃতির প্রভাব প্রদর্শনের জন্য যন্ত্রপাতিও উদ্ভাবন করেন। ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্র বসু গিরিডিতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্ত্রী লেডি অবলা বসুর কোনো সন্তান ছিল না। তিনি এক জন সমাজকর্মী ছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুর বাংলা রচনাবলি 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়।

মু. আ.

জগন্নাথ দেবের মন্দির

ওড়িশার (উড়িষ্যার) পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির বা শ্রীক্ষেত্র অবস্থিত। পুরাণ মতে, সূর্যবংশের এক রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ইতিহাস মতে, ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা ভীম বর্তমান মন্দির তৈরি করেন। তারও পরে গজপতি রাজাদের দ্বারা এর সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল মন্দিরের রত্নবেদীতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাসহ সাতটি কাঠের মূর্তি রয়েছে। কাঠের তৈরি বলে ১৪ বছর পর পর মূর্তিগুলো বদল করতে হয়। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তিগুলো অসম্পূর্ণ, হাত-পা নির্মিত হয় নি। তিথিমত ২১টি বেশে সাজানো হয় মূর্তিগুলোকে, দিনেও বেশ বদল করা হয়। রথযাত্রার সময় এখানে বিরাট উৎসব হয়। এই জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি জড়িত। শ্রীচৈতন্য (দ্র) পুরীতে ১৮ বছর ছিলেন এবং পুরীতেই দেহত্যাগ করেন।

নি. অ.

জড়/জড়তা

যেসব বস্তু প্রাণহীন এবং নিজে থেকে চলাচল করতে পারে না তাদের জড় বস্তু বলা হয়। আমরা দেখতে পাই যে, স্থির কোনো বস্তুই নিজে থেকে চলতে শুরু করে না, যদি না এর উপরে বলপ্রয়োগ করা হয়। আমরা যদি একটি থেমে থাকা ট্রেন বা বাসে বসে থাকি এবং সেই ট্রেন বা বাস যদি হঠাৎ চলতে শুরু করে, আমরা ট্রেন চলার উল্টো দিকে পড়ে যেতে চাই। এর কারণ, ট্রেনের আসনে বসে থাকার ফলে দেহের নিচের অংশ ট্রেনের গতি নিতে পারে, কিন্তু দেহের উপরের অংশ আগের অবস্থায় থেকে যেতে চায়। স্থিরবস্তুর এই স্থির থাকার প্রবণতাকে স্থিতির জড়তা বলা হয়। ঠিক একইভাবে একটি চলন্ত ট্রেন যদি হঠাৎ থেমে যায়, এর যাত্রী

www.pathagar.com

সামনের দিকে পড়ে যেতে চায়। এর কারণ, ট্রেনটা যখন হঠাৎ থেমে যায় বা গতি মন্থর করে, তখন দেহের নিচের অংশ ট্রেনের সঙ্গে যুক্ত বলে থেমে যায়, কিন্তু দেহের উপরের অংশ আগের গতিতেই ছুটতে চায়। অর্থাৎ একটি গতিশীল বস্তু গতিশীল অবস্থায় থাকতে চায় এবং বল প্রয়োগ না করলে থামতে চায় না। গতিশীল বস্তুর এই গতি বজায় রাখার প্রবণতাকে বলা হয় গতির জড়তা। কোনো বস্তুর ভর (দ্র) যত বেশি তার জড়তা হয় তত বেশি। বস্তুত বস্তুর ভরই হচ্ছে বস্তুর জড়তার উৎস ও এর পরিমাপক। নিউটনের (দ্র) বলবিদ্যার সূত্র থেকে আমরা পাই যে কোনো বস্তুর স্থিতির জড়তা অথবা গতির জড়তা কাটিয়ে উঠতে, অর্থাৎ স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে বা গতিশীল বস্তুকে থামাতে বল প্রয়োগ করতে হয়।

নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে প্রযুক্ত বল=জড়তা × গতির পরিবর্তনের হার, বা বল= ভর × ত্বরণ (দ্র)।

আ. আ.

জণ্ডিস (jaundice)

শরীরের জলীয় অংশে এবং রক্তে (দ্র) বিলিরুবিন (bilirubin) নামক পিত্ত-উপাদানের আধিক্যের কারণে শরীরের ত্বক ও শ্লেষ্মাঝিল্লি (mucous membrane) হলুদ বর্ণ ধারণ করার ফলে সৃষ্ট রোগের নাম জণ্ডিস। একে বাংলায় পাণ্ডুরোগ, কামলারোগ, ন্যাবা বলা হয়।

যে সকল কারণে শরীরে বিলিরুবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সেগুলো হল রক্তে লোহিত কণিকা ভাঙনের ত্রুটি, বিভিন্ন ঔষধের (দ্র) প্রতিক্রিয়া, কোনো কোনো রোগসংক্রমণ (যেমন ম্যালেরিয়া), ভাইরাসঘটিত যকৃৎপ্রদাহ, পিত্তনালিতে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি। জণ্ডিস রোগের ফলে ত্বক ও শ্লেষ্মাঝিল্লি হলুদ হয়ে যাওয়া ছাড়াও প্লীহার (দ্র) আকৃতি বৃদ্ধি, প্রস্রাবের গাঢ় হলুদ বর্ণ ধারণ, রক্তাল্পতা, ক্ষুধামান্দ্য, বমি বমি ভাব প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

জণ্ডিস রোগীদের জন্য দরকার যথেষ্ট বিশ্রাম, প্রচুর পরিমাণে পানি পান, যথেষ্ট শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ আর চর্বিজাতীয় খাদ্য বর্জন।

সি. না. হ.

জন্মতিথি

নবজাতকের জন্মের সময় যে তিথি (অর্থাৎ চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ কাল) থাকে সেই তিথি। অর্থাৎ জন্মের সময়কার দিনকাল ও ক্ষণকে জন্মতিথি বলে। প্রতি বছর জন্মতিথির দিনে জন্মতিথি-কর্তব্য পালন করা উচিত। পৌরাণিক মতে, যে বছর জন্মমাসে জন্মতিথি জন্মনক্ষত্র যোগ হয় সেই বছর সম্মান, সুখ ও স্বাস্থ্য লাভ হয়ে থাকে। শনিবার বা মঙ্গলবার যদি জন্মতিথি পড়ে, অথচ তাতে যদি জন্মনক্ষত্রের যোগ না হয়, তা হলে সেই বছর পদে পদে বিঘ্ন ঘটে। এই বিঘ্ন থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়ও আছে। শাস্ত্রে এই ব্যাপারে অনেক বিধিবিধান আছে। জন্মতিথিতে দেবতাদের সেবা, গুরুদেব ও পিতা-মাতার সেবা করা বিধেয়। জন্মতিথির দিনে নখ-চুল কাটা, দূরে যাওয়া, আমিষ ভক্ষণ, কলহ ও হিংসা বর্জনীয়।

পৃথিবীর (দ্র) অন্যান্য জাতির মধ্যে ধর্ম (দ্র) ও দেশপ্রথা অনুসারে জন্মতিথি বা জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালিত হয়। জন্মদিনে উপহার প্রদান ও গ্রহণ, কেক কাটা, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, শুভেচ্ছাকার্ড প্রদান, গান-বাজনার অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদি আধুনিক কালে জনপ্রিয় হয়েছে।

অধুনা জন্মতিথি উপলক্ষে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বৃহদায়তন কেক কাটা হয়। কেক কাটার আগে কেকের চারপাশে জন্মতিথির বছর গুণে সমসংখ্যক মোমবাতি জ্বালানো হয়। যার জন্মদিন, সে বাতিগুলো ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিভিয়ে ফেলে। তারপর কেকটি কেটে অভ্যাগতদেরকে পরিবেশন করা হয়। জন্মতিথি পালন একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান। মহাপুরুষের জন্মতিথি বা জন্মদিন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হয়।

বি. ব.

জন্মান্তরবাদ

পুনর্জন্মবাদ। মৃত্যুর পর আবার জন্ম হয় এই বিশ্বাস বা মতের নাম জন্মান্তরবাদ। প্রাচীন কাল থেকে এই চিন্তাধারা ভারতীয় ধর্ম (দ্র)-গুলোতে লক্ষ করা যায়। একমাত্র চার্বাক (দ্র)-পন্থীরা ছাড়া প্রত্যেক ভারতীয় সম্প্রদায় জন্মান্তর স্বীকার করে। জৈন (দ্র) ধর্মাবলম্বীরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জৈন-মতে আত্মার বাসনাই আবেগ সৃষ্টি করে, এ জন্য

www.pathagar.com

দেহের সৃষ্টি হয়। জীবের (দ্র) জন্ম, জাতি, কুল ও স্বভাব জৈন-মতে কর্মের দ্বারা নির্ধারিত। জৈন তীর্থঙ্কর (দ্র) বা ধর্মগুরুরা পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বলার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে মনে করা হয়।

বৌদ্ধেরা আত্মার স্থায়ী সত্তা স্বীকার করে না। বৌদ্ধেরা অনাত্মবাদী, কিন্তু দেহের রূপান্তর বা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে। বৌদ্ধধর্মে (দ্র) জীবের কর্মের ওপর সর্বাপেক্ষা জোর দেওয়া হয়েছে। কর্মভোগের জন্য জীবের বার বার দেহলাভ ঘটে। বুদ্ধের (দ্র) নিজের পূর্ব-জন্মসমূহের বৃত্তান্ত জাতক গ্রন্থে (দ্র) সংগৃহীত আছে।

ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা, উপনিষদ ও গীতা, (দ্র) অদ্বৈত-বেদান্ত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও দ্বৈত প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা হয়েছে। এ ছাড়া শৈব-শাক্ত সম্প্রদায়গুলোও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। প্রাচীন গ্রিক চিন্তাধারায় এর স্বীকৃতি আছে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম (দ্র), খ্রিস্টধর্ম (দ্র) ও ইহুদীধর্ম (দ্র) একেশ্বরবাদী—এরা জন্মান্তর স্বীকার করে না।

বি. ব.

জন্মাষ্টমী

জন্মাষ্টমী বলতে বোঝায় ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। এই তিথিতে দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের (দ্র) জন্মের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে স্মরণে রেখে উক্ত বিশেষ অষ্টমী তিথি এবং সেদিনের পূজা ও উৎসবকে বলা হয় জন্মাষ্টমী।

দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্মরক্ষার জন্য ভগবান জীবরূপে পৃথিবীতে (দ্র) অবতীর্ণ হন। অবতীর্ণ হন বলেই তাঁকে বলে অবতার। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব, মাতা দেবকী। দেবকী মথুরার রাজা কংসের বোন।

পূজা, শোভাযাত্রা, নামকীর্তন, পদাবলী (দ্র) কীর্তন, আলোচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে হিন্দু ভক্তরা জন্মাষ্টমী তিথি পালন করেন।

বাংলাদেশে (দ্র) দিনটিকে জাতীয় ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এ দিনে বিশেষ অনুষ্ঠানও প্রচার করে থাকে।

নি. অ.

জপ

দেবতার (দ্র) নাম-মন্ত্র অর্থ-স্মরণপূর্বক মনে মনে বারংবার উচ্চারণ বা আবৃত্তি করা। এটি উপাসনার একটি বিশেষ অঙ্গ। সকল ধর্মকর্মের মধ্যে জপের স্থান সবার ওপরে। জপ করবার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। পবিত্রতার সঙ্গে একাগ্রমনে জপ করতে হয়। জপে উচ্চারণ দ্রুত বা বিলম্বিত হতে পারবে না। উচ্চারণের মধ্যবর্তী সময় এক হতে হবে। জপ চার প্রকার—বাচনিক, উপাংশু, জিহ্বা ও মানস। বাচনিক জপ উচ্চৈঃস্বরে করতে হয়, যাতে অন্যরা শুনতে পায়; এটি নিম্নস্তরের জপ। কেবল জপকারী শুনতে পায় এমন নিম্নস্বরে উচ্চারিত জপের নাম উপাংশু জপ। এটি মধ্যম মানের জপ। বাচনিক জপের চেয়ে এটি দশগুণ উন্নততর। শুধু জিহ্বার সাহায্যে করা জপকে জিহ্বা-জপ বলা হয়। এটি বাচনিক জপের চেয়ে শতগুণ শ্রেষ্ঠ। আর যা মনে মনে আবৃত্তি বা স্মরণ করা হয়, তা-ই মানস-জপ। এটি সবচেয়ে উত্তম জপ। বাচনিক জপের চেয়ে এর শ্রেষ্ঠত্ব সহস্র গুণ।

সুজ. ব.

জপমালা

হাতের আঙুলে হিসাব রেখে এবং মালার গুটিকা গুনে গুনে জপ করা যায়। যে মালার গুটিকা গুনে জপ করা হয়, তাকে জপমালা বলে। একেক জিনিসের মালার গুণ একেক রকম। উপাস্য দেবতা বা মন্ত্রভেদেও ভিন্ন ভিন্ন জপমালা ব্যবহৃত হয়। রুদ্রাক্ষ, জীবপুত্রিকা, তুলসীকাষ্ঠ ইত্যাদি মালার খুব নামডাক।

যদিও 'জপ' বলা হয় না, তবু তস্‌বি গুনে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আরাধনাও জপ।

সুজ. ব.

জবা

মালভেসি (malvaceae) গোত্রভুক্ত গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ (দ্র)। এর বৈজ্ঞানিক নাম *হিবিস্কাস রোজা সাইনেন্সিস (Hibiscus rosa-sinensis)*। এর উচ্চতা সাধারণত ২–৩ মিটার হয়ে থাকে। জবা গাছে অনেক ডালপালা হয়। এর পাতা খানিকটা ডিম্বাকৃতি, তবে অগ্রভাগ কিছুটা সরু। পাতার দুই ধার করাতের মতো খাঁজ-কাটা। এ জবা চীন (দ্র) দেশ থেকে এ দেশে আনা হয়েছে। *হিবিস্কাস*

www.pathagar.com

সিজোপেটালাস, হুক (H. Schizopetalus, Hooke) 'ঝুমকো জবা' নামে পরিচিত। এ জবা আফ্রিকা থেকে আনা হয়েছে। জবার আরো অনেক জাত আছে। দাবাকলম, চোখকলম, গুটিকলম ও কাটিং দ্বারা জবার বংশ বৃদ্ধি করা যায়। জবা ফুলের রঙ সচরাচর লাল হয়। তবে এরা হাল্কা বেগুনি, সাদা এবং হলুদ বর্ণেরও হয়ে থাকে। ফুলের বাগানে, পথের দুই ধারে এবং ঘেসো আঙিনার মধ্যে জবা গাছ লাগালে ভাল দেখায়।

মু. আ.

জমজম

আরবের একটি সুপ্রাচীন কূপের নাম। এটি পবিত্র কাবাঘরের নিকটে অবস্থিত।

জানা যায়, নবী হযরত ইবরাহিম (আ.) (দ্র) একদা তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী হাজেরাকে আল্লাহর (দ্র) ইচ্ছায় মক্কার (দ্র) জনমানবহীন প্রান্তরে নির্বাসন দেন। এখানেই তাঁর ছেলে ইসমাইল (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। পানির অভাবে হাজেরা শিশুপুত্রকে শায়িত রেখে নিকটবর্তী সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে পানির সন্ধানে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন। এভাবে অনেক চেষ্টা করেও তিনি পানির সন্ধান পান না। হঠাৎ দেখতে পান, শায়িত শিশুর পায়ের গোড়ালির আঘাতে মাটিতে পানির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এই পানির ধারারই পরবর্তী রূপ জমজম কূপ বলে বুখারি শরীফের হাদিসে (দ্র) উল্লেখ আছে।

মুসলমানদের নিকট জমজম কূপের পানি পবিত্র বলে গণ্য।

মু. মা.

১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে নবনির্বাচিত এম এন এ এবং এম পি এ-দের সমাবেশে স্বাধিকার আন্দোলনে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত। মোনাজাত পরিচালনা করেন মওলানা তর্কবাগীশ। উপরের ছবি : 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে উৎফুল্ল বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধারা : ১৯৭১

জয় বাংলা

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান (দ্র) এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) সময় উচ্চারিত জনপ্রিয় স্লোগান। আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলোতে লাখো মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত 'জয় বাংলা' ধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলত। মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এই ধ্বনি দেশের জন্য আত্মাহুতি দিতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা জোগাত। 'জয় বাংলা' ধ্বনি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্লোগান ছিল না, তা মুক্তিকামী বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার আবাহনমন্ত্র রূপে সেদিন কাজ করেছিল।

খু. জা.

www.pathagar.com

জয়দেব

'গীতগোবিন্দ' (দ্র) কাব্যের (দ্র) রচয়িতা জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ কবি। বীরভূম জেলার অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি তাঁর জন্মভূমি বলে জনশ্রুতি রয়েছে। অনেকে আবার তাঁকে মিথিলা বা ওড়িশার অধিবাসী বলে মনে করেন। জয়দেব লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন বলেও প্রসিদ্ধি রয়েছে। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যানুসারে তাঁর পিতা ভোজদেব, মাতা রামাদেবী এবং স্ত্রী পদ্মাবতী। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' শুধু কাব্যরসিকেরই প্রিয় নয়, ভক্ত বৈষ্ণবেরও প্রিয় গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। বিদেশী বহু ভাষাতেও কাব্যটি অনূদিত হয়েছে।

মে. খা.

জয়নুল আবেদিন [১৯১৪—১৯৭৬]

"সমগ্র মানবজাতির জন্য সুন্দর জীবন তৈরি করাই হচ্ছে শিল্পকলার মৌল উদ্দেশ্য।" এই কথাগুলো বলেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। তিনি যা বলতেন তা বিশ্বাসও করতেন। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন ও আঁকা-ছবি সে কথাই প্রমাণ করে।

বহু দিনের সাধনার ফলেই আজ সমাজে শিল্পকলা চর্চার একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এর পিছনে অবদান রয়েছে আমাদের দেশের কয়েক জন নামকরা শিল্পীর। এঁরা হলেন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান (দ্র), আনোয়ারুল হক (দ্র), শফিউদ্দিন আহমদ (দ্র), খাজা শফিক আহমদ, শফিকুল আমিন প্রমুখ। আর শিল্পী জয়নুল আবেদিন দিয়েছিলেন এঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

জয়নুল আবেদিনের জন্ম ২৯শে ডিসেম্বর ১৯১৪, কিশোরগঞ্জের কেন্দুয়া থানায়। বাবার নাম তমিজউদ্দিন আহমদ। তিনি ছিলেন থানার দারোগা। মায়ের নাম জয়নাবুন্নেসা। ন' ভাই-বোনের মধ্যে বড় ছেলে জয়নুল। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি তাঁর ছিল আগ্রহ ও

জয়নুল আবেদিন ছবি আঁকছেন

উৎসাহ। ময়মনসিংহ মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে পড়াশোনার সময়ে দিল্লির স্টেট্স্‌ম্যান পত্রিকার ছোটদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় সারা ভারতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ছবি আঁকায় অদম্য উৎসাহ, অথচ প্রচুর বাধা। অভাবের সংসারে কলিকাতায় (দ্র) থেকে আর্ট স্কুলের পড়ার খরচ চালানো বাবার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তার ওপর আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের মুরব্বিরাও ভাল চোখে দেখছেন না। ছবি আঁকা গুনাহ্‌র কাজ বলেও ভাবতেন কেউ কেউ। তদুপরি সে যুগে চিত্রশিল্পীদের ছিল না কোনো ভবিষ্যৎ। শেষ পর্যন্ত মা সাহস যোগালেন। নিজের সোনার হার বিক্রি করে ছেলেকে কলিকাতায় আর্ট স্কুলে পড়তে পাঠালেন।

অনেক কষ্ট, অভাব, অনটন ও সংগ্রাম। খেয়ে না খেয়ে অদম্য উৎসাহ ও নিষ্ঠা নিয়ে আর্ট স্কুলের পাঁচ বছরের কোর্স শেষ করে পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ভাল শিল্পী হিসাবে ছাত্রজীবনেই পরিচিতি লাভ

www.pathagar.com

করেছিলেন। ছাত্রজীবন শেষ করার আগেই ১৯৩৮ সালে আর্ট স্কুলে শিক্ষকতার নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। সে বছরই জাতীয় চিত্রপ্রদর্শনীতে ৬টি জলরঙ চিত্রের জন্য গভর্নরের স্বর্ণপদক লাভ করেন। সে সময় এই পদক ছিল শিল্পীদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান।

১৯৪২-৪৩ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (দ্র) ও তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের অবহেলার কারণে সারা বাংলা জুড়ে দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী (দ্র)। গ্রামবাংলার লক্ষ লক্ষ লোক দল বেঁধে ছুটে গেল খাবারের সন্ধানে তখনকার রাজধানী কলিকাতায়। অলিতেগলিতে ফুটপাতে রাজপথে অগণিত মানুষ না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কাক ও কুকুরের সঙ্গে বুভুক্ষু মানুষ অখাদ্য-কুখাদ্য খুঁজে ফিরছে ডাস্টবিনে নর্দমায়। দিনরাত ঘুরে ঘুরে অনেক স্কেচ—অনেক ছবি আঁকলেন, বিষয় দুর্ভিক্ষ। ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজন করল তাঁর প্রদর্শনীর। পরে দিল্লিতেও হল প্রদর্শনী। দুর্ভিক্ষ-চিত্রমালার জন্য তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দেশে ও দেশের বাইরে।

১৯৪৭ সালে ভারতভাগের পর জয়নুল আবেদিন কলিকাতা থেকে চলে আসেন ঢাকায় (দ্র)। ড্রইং শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে নর্মাল স্কুলে। তার পর অনেক সংগ্রাম ও পরিশ্রম করে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট—ছবি-আঁকা শেখার বিদ্যাপীঠ। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিল্পকলা আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এই ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত থেকে প্রতিষ্ঠানটিকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলেন এবং বাংলাদেশে শিল্পকলা চর্চার ক্ষেত্রকে আরো প্রশস্ত করে এ দেশের শিল্পীসমাজকে নেতৃত্ব দান করেন। কিছু দিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) চারুকলা অনুষদের ডীন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৯ সালে জয়নুল আবেদিন পাকিস্তানে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' পদক লাভ করেন। কিন্তু বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের দাবিতে ও পাকিস্তানি সামরিক কুশাসনের প্রতিবাদে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সেই 'হেলালে ইমতিয়াজ' উপাধি ত্যাগ করেন।

১৯৬৯ সালে প্যালেস্টাইনি যোদ্ধাদের আমন্ত্রণে তাদের সাথে ক্যাম্পে ও যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেন। অসংখ্য স্কেচ

জয়নুল আবেদিনের আঁকা সাঁওতাল মেয়ে

নিচে : গুনটানা ও মইটানা

www.pathagar.com

জয়নুলের আঁকা দুর্ভিক্ষ-চিত্রমালার ২টি ছবি

ও ড্রইং করেন সেই সব যোদ্ধার। কায়রো শহরে ও অনেক আরবদেশে সেসব ছবির প্রদর্শনী হয়।

তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে—দুর্ভিক্ষ-চিত্রমালা, সংগ্রাম (গরু), ঝড়, মই টানা, গুণটানা, গাঁয়ের বধূ, বেদেনী, পাইন্যার মা, সাঁওতাল রমণী, মা, নদী ও নৌকা নিয়ে অনেক জলরঙ ছবি, আদিবাসীদের জীবন ও প্রকৃতির ছবি, নবান্ন, পঁয়ষট্টি ফুট দীর্ঘ আবহমান বাংলার এক বিশাল ছবি, '৭০-এর ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের ছবি—মনপুরা-৭০, ৩০ ফুট দীর্ঘ এক মর্মস্পর্শী স্কেচচিত্র এবং আরো অনেক ছবি।

শিশু-কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলা (দ্র) গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনায় শিশুদের চিত্রাঙ্কনচর্চার জন্য এর বিস্তার ঘটেছে।

জয়নুল আবেদিন অনেক জাতীয় দায়িত্ব পালন করে গেছেন। শহীদ মিনার, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠাসহ বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান-গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব তাঁরই তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর (দ্র) প্রতিষ্ঠা তাঁরই স্বপ্ন ও উদ্যোগের ফসল।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য প্রায় দেশেই তিনি ভ্রমণ করেন। নিজের চিত্রকলা ও বাংলাদেশের শিল্পকলার বহু প্রদর্শনী করেছেন বিভিন্ন দেশে; বহু বার স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিদেশে।

১৯৭৪ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান লাভ করেন। বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে ভালবেসে উপাধি দিয়েছে 'শিল্পাচার্য'।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯৭৬ সালে ফুসফুসের ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেন। চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ চত্বরে রয়েছে তাঁর সমাধি।

জয়নুল আবেদিনের আট শ' ছবির সংগ্রহ রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে (দ্র) এবং তাঁর জন্মস্থান ময়মনসিংহে রয়েছে উনাশিটি চিত্রকলা—'জয়নুল আবেদিন চিত্রসংগ্রহশালা'য়।

হা. খা.

জয়সুরিয়া, সনৎ [১৯৬৯—   ]

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট-তারকা। তিনি বাঁহাতি ওপেনিং ব্যাটসম্যান এবং অর্থোডক্স স্পিনার।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জয়সুরিয়ার অভিষেক হয় ১৯৮৯ সালে। ষষ্ঠ বিশ্বকাপ

www.pathagar.com

১৯৯৬ পর্যন্ত তাঁর ওয়ানডে ব্যাটিং পরিসংখ্যান হল– ম্যাচ ১০৪, ইনিংস ৯৯, অপরাজিত ২, রান ১৯৯৭, সর্বোচ্চ ১৪০, সেঞ্চুরি ১, হাফ সেঞ্চুরি ১১। ষষ্ঠ বিশ্বকাপে 'অলরাউণ্ড নৈপুণ্যের' জন্য তিনি ম্যান অব দ্য সিরিজ পুরস্কার লাভ করেন।

বিশ্বকাপের পর ১৯৯৬ সালের ২রা এপ্রিল সিঙ্গাপুরের দ্য পাদাং ক্রিকেট গ্রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত সিঙ্গার কাপ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়সুরিয়া ৩টি বিশ্বরেকর্ড করেন। এই ম্যাচে তিনি মোট রান সংগ্রহ করেন ১৩৪। এর মধ্যে তাঁর রেকর্ড ৩টি হল– সবচেয়ে দ্রুত গতির সেঞ্চুরি (বলের ক্ষেত্রে), এক ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কা, এবং এক ওভারে সর্বাধিক রান। '৮৮-৮৯ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতীয় ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের করা ৬২ বলে সেঞ্চুরির রেকর্ডটি ভেঙ্গে জয়সুরিয়া করেছেন ৪৮ বলে সেঞ্চুরি। ১৯৮৯ সালের ১৮ই মার্চ অ্যান্টিগুয়ায় সেন্ট জনসে ভারতের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গর্ডন গ্রিনিজ এক ইনিংসে মেরেছিলেন সর্বাধিক ৮টি ছক্কা। জয়সুরিয়া ১১টি ছক্কা মেরে ভেঙেছেন সেই রেকর্ড। পাকিস্তানের অধিনায়ক আমির সোহেলের করা শ্রীলঙ্কার ইনিংসের ১৪ নম্বর ওভার থেকে সংগৃহীত ৩০ রানের মধ্যে ২৯-ই সংগ্রহ করেছেন জয়সুরিয়া। ওভারের প্রথম বলটি ছিল ওয়াইড। এর আগে এক ওভারে সর্বাধিক ২৭ রান সংগ্রহের রেকর্ড ছিল।

সিঙ্গার কাপ টুর্নামেন্টের ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরিরও রেকর্ড করেন জয়সুরিয়া। মাত্র ১৭ বলে হাফ সেঞ্চুরি করেন তিনি। এর আগে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলীয় অলরাউণ্ডার সাইমন ও' ডোনেলের ১৮ বলে হাফ সেঞ্চুরি করার রেকর্ড ছিল। সিঙ্গার কাপের ফাইনালে উদ্বোধনী জুটিতে মাত্র ৫.২ ওভারে শ্রীলংকা দল সংগ্রহ করে ৭০ রান। বিস্ময়কর ব্যাপার হল এই ৭০ রানই ছিল জয়সুরিয়ার।

আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের যেসব রেকর্ড হতে পারে, তার সব ক'টিই এখন জয়সুরিয়ার দখলে।

সুজ. ব.

জয়েস্, জেমস্ [১৮৮২—১৯৪১]

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেমস্ জয়েস্ (James Joyce) ১৮৮২ সালে আয়ারল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। শব্দ, শব্দবন্ধ ও বাক্যবিন্যাসের নানা জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে তিনি যেসব সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করেছেন, বিশেষত উপন্যাস, সেগুলো ইংরেজি সাহিত্যের (দ্র) এক অননুকরণীয় সাহিত্য-ফসলের মর্যাদার অধিকারী। জয়েসের রচনাশৈলী পরবর্তী কালে তাঁর উত্তরসূরি বহু সাহিত্যস্রষ্টাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম— উপন্যাস : 'ইউলিসিস্', 'এ পোর্ট্রেট অব দ্য আর্টিস্ট এ্যাজ এ ইয়াং ম্যান', ছোটগল্প : 'ডাবলিনার্স' এবং কবিতা সঙ্কলন : 'চেম্বার মিউজিক' ইত্যাদি।

জেমস্ জয়েস্ ১৯৪১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

জরথুস্ত্র [খ্রি. পূ. ৬২৮—৫৫১]

প্রাচীন ইরানের এক জন মহাপুরুষ। স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তাঁর আবির্ভাব-কাল সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৬২৮—৫৫১ সালের মধ্যে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিম ইরানের মিডিয়া প্রদেশে।

পনেরো বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে উশিদারায়ন পর্বতে সাধনায় রত হন। ঈশ্বরলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করার উদ্দেশ্যে ৪২ বছর বয়সে তিনি ইরানের ব্যাক্ট্রিয়া প্রদেশে যান। সেখানে ৩৫ বছর ধরে তিনি ধর্মপ্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত 'জরথুস্ত্র ধর্ম' পৃথিবীর (দ্র) একটি প্রাচীনতম ধর্ম। এই ধর্ম মতে 'অহুর-মজ্‌দা' হলেন পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।

www.pathagar.com

জরথুস্ত্র মনে করতেন—দিন-রাত্রির মতো পৃথিবীও ভাল-মন্দে বিভক্ত। মানুষের নৈতিক দায়িত্ব ভালকে বেছে নেওয়া। সত্য কথা বলা, সৎচিন্তা ও সৎকাজ করা মানুষের কর্তব্য। 'আবেস্তা' (দ্র) এই মতবাদে বিশ্বাসীদের পবিত্র গ্রন্থ। এর সঙ্গীতাংশ জরথুস্ত্রের রচনা বলে মনে করা হয়।

জরথুস্ত্রের চিন্তাভাবনা পরবর্তী অনেক ধর্মকে প্রভাবিত করেছে।

জরথুস্ত্র ছিলেন প্রথম ধর্মীয় সাধক, যিনি জনসমাজে মানবজীবনের নৈতিক দায়িত্বের কথা প্রচার করে গেছেন।

আ. ই.

জলতরঙ্গ

এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। জলপূর্ণ চিনে মাটির বাটির কানায় আঘাত করে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করে বাজানো হয় বলে এর নাম হয়েছে জলতরঙ্গ। কাঠের তক্তার ওপর ১৮টি বাটি অর্ধবৃত্তাকারে বসিয়ে বাঁশের কাঠির সাহায্যে আঘাত করে

বাজানো হয়। বাটিগুলো জলপূর্ণ করার তারতম্য অনুযায়ী স্বরের উচ্চতা ও নিম্নতা প্রকাশ পায়। তারতম্য অনুযায়ী বাটিগুলোকে বাম দিক থেকে ডান দিকে সাজানো হয়। এর ধ্বনি অত্যন্ত মিষ্ট ও সুরেলা। সমূহবাদনে ও এককভাবেও জলতরঙ্গ বাজানো হয়। এর প্রাচীন নাম উদকবাদ্য।

ক. গো.

জলবসন্ত বসন্ত দ্র

জলবায়ু

কোনো নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়ার বহুবিধ অবস্থার গড়পড়তা হিসাবকে জলবায়ু বলা হয়। তাপমাত্রা (দ্র), বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা (দ্র), বায়ু (দ্র) ও বায়ুচাপ (দ্র) প্রভৃতি জলবায়ু বিষয়ক নানা প্রকার অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে অক্ষাংশের গুরুত্বও যথেষ্ট। জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রকৃতি নির্ধারণে সহায়তাকারী অন্যান্য প্রভাবকগুলো হচ্ছে—ক. এলাকাটির অবস্থান বা সমুদ্র থেকে এর দূরত্ব, খ. সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা, গ. ভূ-সংস্থান, ঘ. বায়ু-প্রবাহের দিক, ঙ. সামুদ্রিক স্রোত এবং ঘূর্ণিঝড়।

উক্ত প্রভাবকগুলোর কারণে পৃথিবীর (দ্র) একেক এলাকার জলবায়ু একেক রকমের হয়ে থাকে।

অক্ষাংশ এবং অন্যান্য প্রকৃতি নির্ধারণী প্রভাবকের ওপর ভিত্তি করে জলবায়ু চারভাগে বিভক্ত। ভাগগুলো হচ্ছে—মহাদেশীয় জলবায়ু, সামুদ্রিক জলবায়ু, উপকূলীয় জলবায়ু এবং পর্বতমালা ও মালভূমির জলবায়ু।

পৃথিবী এবং সূর্যের (দ্র) দূরত্ব সারা বছর সমান থাকে না। তাই পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও সমান থাকে না। আহ্নিক গতির ফলে দিন ও রাত হয়। বার্ষিক গতির ফলে ঋতু বদলায়। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ঋতু বদলায় একইভাবে। তবে উভয় গোলার্ধের ঋতুকাল বিপরীত, অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পর বিভিন্ন বায়ুস্তরে সূর্যের যে কিরণ প্রবেশ করে, জলবায়ুর উপর তার সূক্ষ্ম প্রভাব পড়ে। এর ফলে ভূপৃষ্ঠ এবং বায়ুস্তরের মধ্যে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার কারণে সৌর তাপেরও পরিবর্তন ঘটে।

পৃথিবী যে তাপশক্তি বিকিরণ করে, তার বহুলাংশই মেঘ (দ্র) ও জলীয় বাষ্পে আটকা পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে তার অনেকাংশ অবশ্য আবারও পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে। এভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রার একটি নির্দিষ্ট উচ্চ মান বজায় থাকে।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ফলে কয়েক প্রকার বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এগুলো হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের নিয়ত বায়ু, সাময়িক বায়ু ও আকস্মিক বায়ু। আয়ন বায়ু, প্রত্যায়ন বায়ু ও মেরুপ্রবাহ হচ্ছে নিয়ত বায়ুর আওতাভুক্ত। তেমনি সাময়িক বায়ুপ্রবাহের আওতাভুক্ত হচ্ছে মৌসুমি বায়ু, স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু। আকস্মিক বায়ুপ্রবাহের আওতায় পড়ে কালবৈশাখী (দ্র), আশ্বিনের ঝড়, হারিকেন্ (দ্র), টাইফুন্ (দ্র), টর্নেডো, ঘূর্ণিবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণিবাত।

নিয়ত, সাময়িক ও আকস্মিক বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

মু. আ.

www.pathagar.com

জলবায়ু–অঞ্চল

পৃথিবীর (দ্র) জলবায়ু অঞ্চলকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তবে এসব অঞ্চলের কোনোটিরই কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই এবং তা নির্ধারণ করাও যায় না। কারণ যে কোনো একটি জলবায়ু-অঞ্চল ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে অন্য অঞ্চলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন জলবায়ু-অঞ্চলকে রাজনৈতিকভাবেও কোনো সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না। যে কোনো একটি দেশের ভিতরে একের চেয়েও বেশি জলবায়ু-অঞ্চল থাকতে পারে। আবার যে কোনো জলবায়ু-অঞ্চলের ভিতরেও জলবায়ুগত কিছুটা তারতম্যও থাকতে পারে। সাধারণভাবে পৃথিবীর জলবায়ু-অঞ্চলকে প্রধান ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়—

১. সমভাবাপন্ন জলবায়ু-অঞ্চল : পৃথিবীর যেসব অঞ্চলের জলবায়ুতে শীত ও গ্রীষ্মের তেমন কোনো প্রচণ্ডতা নেই, সেসব অঞ্চলকে সমভাবাপন্ন জলবায়ু-অঞ্চল বলা হয়।

২. চরমভাবাপন্ন জলবায়ু-অঞ্চল : যেসব অঞ্চলের জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরম এবং শীতকালে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয়ে থাকে, সেসব অঞ্চলকে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু-অঞ্চল বলে। মহাদেশের মধ্যভাগে এ ধরনের জলবায়ু অনুভূত হয় বলে এর অপর নাম মহাদেশীয় জলবায়ু-অঞ্চল।

৩. নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু-অঞ্চল : যেসব অঞ্চলের জলবায়ু তেমন বেশি গরমও নয় আবার ঠাণ্ডাও নয়, সেসব অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু-অঞ্চলের আওতাভুক্ত।

৪. আর্দ্র জলবায়ু-অঞ্চল : যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি, সেসব অঞ্চল আর্দ্র জলবায়ু-অঞ্চলের আওতাভুক্ত।

৫. শুষ্ক জলবায়ু-অঞ্চল : পৃথিবীপৃষ্ঠের যে অঞ্চলগুলোতে মোটেও বৃষ্টিপাত হয় না, সেসব অঞ্চল শুষ্ক জলবায়ু-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

৬. সামুদ্রিক জলবায়ু-অঞ্চল : সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোর অপর নাম সামুদ্রিক জলবায়ু-অঞ্চল।

মু. আ.

www.pathagar.com

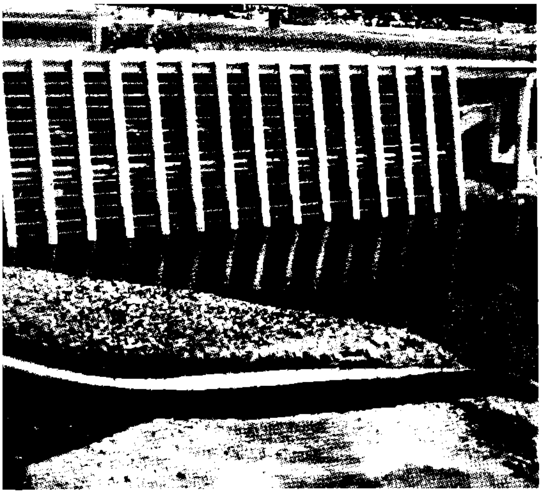

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কর্ণফুলি বাঁধ

জলবিদ্যুৎ

পানির (দ্র) প্রবাহের শক্তিকে ব্যবহার করে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়, তাকে জলবিদ্যুৎ বলা হয়। জলবিদ্যুতের উৎস আসলে বলা যায় সূর্য (দ্র)। সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে উপরে গিয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। এই মেঘ (দ্র) থেকে যে বৃষ্টি হয়, তার বেশির ভাগ সমুদ্রে পড়লেও কিছু মেঘ উচ্চ ভূমিতে বৃষ্টিপাত ঘটায় অথবা পর্বতচূড়ায় তুষারপাত ঘটায়। উচ্চভূমি থেকে প্রবাহিত বৃষ্টির পানি, অথবা পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসা বরফগলা পানি গতিশক্তি লাভ করে। টার্বাইন (দ্র) ব্যবহার করে পানির গতিশক্তিকে রূপান্তরিত করা হয় জেনারেটরে লিফ্‌ট্‌ ঘোরাবার কাজে। পানির যান্ত্রিক শক্তিকে জেনারেটর তখন বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে। বলতে পারি, জলবিদ্যুৎ সৃষ্টি হচ্ছে পানিচক্রের ফলে। অর্থাৎ সূর্যের তাপশক্তি সমুদ্রের পানিকে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়ায় বা উচ্চভূমিতে পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে। এখানে পানির মধ্যে যে যান্ত্রিক শক্তি জমা হচ্ছে তা জেনারেটর রূপান্তরিত করছে বিদ্যুৎশক্তিতে। এ ক্ষেত্রে যেহেতু কয়লা (দ্র) বা তেল পোড়াতে হচ্ছে না, এই শক্তির উৎস নিঃশেষ হবে না—অন্তত যত দিন সূর্য থাকবে এর প্রখরতা নিয়ে, সেই সঙ্গে আমাদের সমুদ্র ও পাহাড়। এ জন্য জলবিদ্যুতের শক্তিকে নবায়নযোগ্য শক্তি বলা হয়। জলবিদ্যুৎ শুধু সেখানেই উৎপন্ন করা যায়, যেখানে প্রাকৃতিক ভূ-বিন্যাস জলস্রোত সৃষ্টি করে। অনেক সময় পাহাড়ের পাশে জলাশয় থাকলে বা কৃত্রিম বাঁধ নির্মাণ করলে তা জলবিদ্যুতের উৎসরূপে কাজ করতে পারে। বাংলাদেশে (দ্র) কাপ্তাইয়ে এমনি বাঁধ নির্মাণ করে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে।

আ. আ.

জলরঙ জার্মান শিল্পকলা দ্র

জলহস্তী

জলহস্তী স্থলভাগের বড় বড় স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলোর মধ্যে অন্যতম। স্থলভাগের প্রাণী হলেও এরা জলাশয়ে থাকাই অধিক পছন্দ করে। আসলে এরা উভচর স্বভাবের। ইংরেজিতে এদের 'হিপ্পোপটেমাস' (hippopotamus) বলা হয়। জলহস্তীর দেহ দেখতে অনেকটা বিশাল আকারের তেলের পিপার মতো। মাংসল দেহ। দেহের আকার অনুপাতে পা কিন্তু বেশ ছোট। পাগুলো অনেকটা দালান বাড়ির থামের মতো। লেজ খুবই ছোট। ওদের মাথা চার কোণাকৃতির। ঠোঁট-জোড়া স্থূল ভোঁতা ধরনের। মুখের হাঁ বিশাল। নিচের ঠোঁটের দুই কোণায় দুটো বড় দাঁত দেখা যায়। কান আকারে ছোট এবং ত্রিকোণাকৃতির। ওরা দেখতে প্রায় হাতির মতো, কিন্তু জলেতেই প্রায় সময় দেখা যায় বলে হয়তো বাংলায় এর নাম হয়েছে জলহস্তী। ওরা জলে ডুবে থাকে, কিন্তু নাক রাখে জলের বাইরে। দিনের প্রায় পুরো সময় জলহস্তী ডুবো জলে বিচরণ করে। কাদাযুক্ত জলাশয়েও থাকা এদের খুব পছন্দ। ওরা উদ্ভিদ (দ্র) খেয়ে জীবনধারণ করে। পানিতে জন্মানো উদ্ভিদেই রুচি বেশি। জলহস্তীর মুখের বিশ্রাম নেই। সারাদিনই চিবায়। দিন শেষে ওরা ডাঙ্গায় ফেরে। মাদী জলহস্তী বছরে একটি বাচ্চা প্রসব করে। জলহস্তীর আদি নিবাস আফ্রিকায় (দ্র)। পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় প্রদর্শনের জন্য এদের নিয়ে পোষা হয়। এদের গড় আয়ু ১৫ থেকে ২০ বছর।

ত. চ.

জলাতঙ্ক (rabies / hydrophobia)

এক প্রকার ভাইরাসের সংক্রমণে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়। এই অসুখে রোগী জল দেখলেই ভয় পায়, পান করা তো দূরের কথা। জলাতঙ্কে আক্রান্ত কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে ইত্যাদি প্রাণী মানুষকে কামড়ালে মানুষের শরীরে জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মানুষ জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়। যথাসময়ে চিকিৎসা না করানো হলে রোগীর মৃত্যু অবধারিত। জলাতঙ্কে আক্রান্ত প্রাণী (বিশেষ করে

www.pathagar.com

জলহস্তী

পাগলা কুকুর) কাউকে কামড়ালে ক্ষতস্থান পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট অথবা ঔষধযুক্ত সাবান দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। উক্ত প্রাণীটিকে আটকে রেখে দশ দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। প্রাণীটি যদি সত্যিকার অর্থেই রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে, তা হলে এর মধ্যে রোগের বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখা দেয় এবং প্রাণীটি অবশেষে মারা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রাণীটির কামড়ে আক্রান্ত মানুষকে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া শুরু করতে হবে। যে প্রাণীটি কামড়েছে তাকে আটক করা যদি সম্ভব না হয়, তা হলেও আক্রান্তকে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া আবশ্যক। জলাতঙ্কের প্রতিষেধক হিসাবে 'অ্যান্টি-র‍্যাবিস ভ্যাকসিন' (Anti-Rabies Vaccine) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সি. না. হ.

জসীম উদ্‌দীন [১৯০৪—১৯৭৬]

জসীম উদ্‌দীন ১৯০৪ সালের ১লা জানুয়ারি ফরিদপুরের গোবিন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আনসারউদ্‌দীন মোল্লা। তাঁর মাতার নাম আমিনা খাতুন। শোভারামপুরের অম্বিকা মাষ্টারের পাঠশালায় ১৯০৮ সালে তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু। ১৯৩১ সালে তিনি এম. এ. পাশ করেন। ১৯৩৯ সালে বিয়ের পর তিনি সংসারজীবন শুরু করেন। এম. এ. পাশের পর তিনি ড. দীনেশচন্দ্র সেনের (দ্র) অধীনে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থেকে তিনি পল্লীসাহিত্য সংগ্রহ করেন এবং গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। এই কাজের সময়কাল ছিল ১৯৩৩–১৯৩৭। ১৯৩৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) বাংলা বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সরকারের প্রচার বিভাগে যোগ দেন। এই সরকারি চাকুরিতে নানা পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৯৬১ সালে তিনি অবসর নেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা

www.pathagar.com

একটি সাহিত্য অনুষ্ঠানে ভাষণ-দানরত কবি জসীম উদ্‌দীন। মঞ্চে উপবিষ্ট রণেশ দাশগুপ্ত, সন্তোষ গুপ্ত, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও অনেকে : ১৯৬৯

করেছেন। যেমন— 'রাখালী', 'নক্সীকাঁথার মাঠ', 'সোজন-বাদিয়ার ঘাট'। এ ছাড়া তাঁর কাব্য ও লোকনাট্যগ্রন্থ আছে। যেমন— 'এক পয়সার বাঁশী', 'মাটির কান্না', 'সকিনা'। কবি একটি আত্মজীবনী লিখেছেন, বইটির নাম 'জীবনকথা'। তিনি সারা জীবন গ্রামীণ বাংলা ও তার জনজীবন নিয়ে বিবিধ গ্রন্থ লিখেছেন। এ জন্য তাঁকে 'পল্লীকবি' বলা হয়। তাঁর একটি উপন্যাস আছে 'বোবা কাহিনী'। গল্পসংগ্রহ এবং সঙ্কলনও আছে 'ডালিম কুমার' ও 'বাঙালীর হাসির গল্প' (১ম ও ২য় খণ্ড)। গানের বই আছে 'রঙিলা নায়ের মাঝি', 'পদ্মাপার' ও 'গাঙের পার'।

১৯৬৮ সালে বিশ্বভারতী (দ্র) বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান করে। তিনি একুশের পদক পান ১৯৭৬ সালে। তিনি ১৯৭৬ সালের ১৪ই মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হা.

জহর গাঙ্গুলী (গঙ্গোপাধ্যায়) [১৯০৩—১৯৬৯]

বাংলা চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেতা। তিনি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার সেতুপুরে ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় ইণ্টালী মাইনর স্কুলে অধ্যয়নকালেই তিনি অভিনয়ের প্রতি অনুরক্ত হন। পরবর্তী কালে কলিকাতার (দ্র) পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে শতাধিক নাটকে অভিনয় করেন। অভিনয় ছাড়া ফুটবল (দ্র), হকি (দ্র), ক্রিকেট (দ্র) ইত্যাদি খেলার প্রতিও তাঁর অপরিসীম আকর্ষণ ছিল। সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবেও সেকালে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ছায়াছবিতে তাঁর অভিনীত চরিত্রের সংখ্যা তিন শতাধিক। এসব ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'কণ্ঠহার', 'নন্দিনী', 'শহর থেকে দূরে', 'অভয়া ও

www.pathagar.com

শ্রীকান্ত', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'চিড়িয়াখানা', 'নিষ্কৃতি', 'মহাদান' ইত্যাদি। চরিত্রানুগ অভিনয়ে জহর গাঙ্গুলীর স্বাভাবিক দক্ষতা যেন জন্মসূত্রে পাওয়া ছিল।

তিনি ১৯৬৯ সালের ৭ই জুন কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

জহরব্রত

মধ্যযুগে রাজপুত রমণীগণ বহিরাগত আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিজেদের সতীত্ব রক্ষার জন্য আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দিতেন। এভাবে মৃত্যুবরণের প্রথাকে বলে জহরব্রত। এ ছাড়া খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক বীর আলেকজাণ্ডারের (দ্র) ভারত (দ্র) আক্রমণকালে অনুরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিন্ধুর প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায়, মুসলমান সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধে রাজা দাহির নিহত হলে তাঁর রানী অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করেও রাজধানী রক্ষা করতে না পেরে সম্মান রক্ষার জন্য মহিলাদের সঙ্গে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেন। আলাউদ্দিন খলজির (দ্র) হাতে মেবারের রাজধানী চিতোরের পতন আসন্ন দেখে রানী পদ্মিনী অন্যান্য রমণীদের সঙ্গে জহরব্রত পালন করেন। আকবরের (দ্র) চিতোর জয়ের সময়ও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়।

বি. ব.

জহির রায়হান [১৯৩৪—১৯৭২]

কথাসাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকার। ১৯৩৪ সালের ১৯শে আগস্ট (মতান্তরে ১৯৩৩ সালের ৫ই আগস্ট) নোয়াখালি জেলার তৎকালীন ফেনী মহকুমার মজুপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় কলিকাতায় (দ্র)। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বাংলায় এম. এ. পাশ করেন। ১৯৪৯ সালে কলিকাতার 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় 'ওদের জানিয়ে দাও' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশের ভেতর দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা। ভাষা আন্দোলনে (দ্র) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক কারণে তিনি মোট তিন বার কারাবরণ করেন যথাক্রমে ১৯৫২, ১৯৫৫ ও ১৯৫৭ সালে।

জহির রায়হানের সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকারের জীবন ছিল সমান্তরাল। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ' (ছোটগল্প সঙ্কলন, ১৯৫৫)। 'যাত্রিক' ও 'প্রবাহ' নাম দিয়ে দু'টি সাময়িকীও সম্পাদনা (১৯৫৬) করেন তিনি। তিনি

'আগুন নিয়ে খেলা' ছবির মহরত অনুষ্ঠানে জহির রায়হান

www.pathagar.com

জহির রায়হান পরিচালিত 'কাঁচের দেয়াল' (১৯৬২) ছবিতে নায়িকা সুমিতা, নায়ক খান আতা ও আনোয়ার হোসেন। নিচে : 'লেট দেয়ার বি লাইট' (১৯৭০) ছবিতে ববিতা

চলচ্চিত্রজগতে যোগ দেন তৎকালীন পাকিস্তানের প্রখ্যাত পরিচালক এ. জে. কারদারের 'জাগো হুয়া সাবেরা' ছবির সহকারী পরিচালক হিসাবে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে (দ্র) ছিল তাঁর সুদৃঢ় ও সাহসী ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আল-বদর (দ্র) ও আল-শাম্‌স্ (দ্র) বাহিনীর হাতে ধৃত ও নিখোঁজ অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের সন্ধান করতে গিয়ে ১৯৭২ সালের ৩০শে জানুয়ারি তিনি নিজেও নিখোঁজ হন, আর ফিরে আসেন নি।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম : উপন্যাস 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৯৬০), 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪), 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯) এবং 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৯)। পুরস্কার : আদমজী পুরস্কার (১৯৬৪) এবং উপন্যাসে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭১)।

উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রকর্ম : 'কখনো আসেনি' (১৯৬১), 'কাঁচের দেয়াল' (১৯৬৩), 'বেহুলা' (১৯৬৬), 'আনোয়ারা' (১৯৬৭), 'জীবন থেকে নেয়া' (১৯৭০), মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র 'স্টপ জেনোসাইড' (১৯৭১) ও 'বার্থ্ অব এ নেশান' (১৯৭১)।

চলচ্চিত্রজগতে জহির রায়হানের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম রঙিন ছবি 'সঙ্গম' (১৯৬৬) এবং প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি 'বাহানা' (১৯৬৫) নির্মাণ।

তাঁর স্মরণে চান খাঁর পুল থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে পলাশীগামী সড়কটির নাম রাখা হয়েছে জহির রায়হান সড়ক।

আ. হ.

জহুর হোসেন চৌধুরী [১৯২২—১৯৮০]

সাংবাদিক, সম্পাদক ও কলাম্‌নিস্ট। তিনি ১৯২২ সালের ২৭শে জুন বর্তমান ফেনী জেলার দাগনভূঞার রামনগর গ্রামে এক শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট পিতার কর্মস্থল সিরাজগঞ্জের এক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জহুর হোসেন চৌধুরী ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরে কলিকাতার (দ্র) প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে আই. এ. এবং ১৯৪২ সালে ইতিহাসে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন। শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি এম. এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নি।

তাঁর সাংবাদিক-জীবনের সূচনা হয় প্রয়াত হাবীবুল্লাহ বাহার সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকায়। ১৯৪৫ সাল থেকে একাদিক্রমে তিনি শিক্ষানবিশ, সম্পাদক ও সাংবাদিক

www.pathagar.com

hিসাবে কাজ করেন কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'দ্য স্টেট্স্‌ম্যান', 'কমরেড' ও 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায়।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তিনি সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন। সরকারি কয়েকটি পেশা বদল শেষে তিনি আবার সাংবাদিকতায় ফিরে যান।

জহুর হোসেন চৌধুরী তাঁর সাংবাদিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'উপাত্ত' ও 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় কিছুকাল কাজ করার পর ১৯৫১ সালে 'দৈনিক সংবাদ'-এ সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে 'সংবাদ' সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হলে তিনি 'কাউন্টার পয়েন্ট' নামে একটি ইংরেজি সাময়িকী সম্পাদনা করেন। আজীবন তিনি 'দৈনিক সংবাদ'-এর অন্যতম পরিচালক ছিলেন।

ছাত্রজীবন থেকেই জহুর হোসেন চৌধুরী রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। প্রথমে তিনি মুসলিম ছাত্রলীগ, পরে এম. এন. রায়ের (দ্র) 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি'র সদস্য হন। সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে পঞ্চাশের দশকে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) (দ্র) প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হন। তৎকালীন পাক-চীন মৈত্রী সমিতি এবং পাক-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও সদস্যও ছিলেন তিনি। এ ছাড়া, সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন ও পূর্ব-পাকিস্তান প্রেস ক্লাবেরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পরে তিনি নেপথ্য থেকে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীদের মধ্যে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্যে ঐক্যমোর্চা গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জহুর হোসেন চৌধুরী ১৯৮০ সালের ১১ই ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৮১ সালে তিনি মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেন। 'দৈনিক সংবাদ' তাঁর স্মরণে প্রবর্তন করেছে 'জহুর হোসেন স্মৃতি পদক'।

দৈনিক সংবাদের পাতায় তিনি 'দরবার-ই-জহুর' নামে যে কলাম্ লিখতেন, তা খুবই জনপ্রিয় ছিল। এসব নিবন্ধেরই বাছাই করা সঙ্কলন 'দরবার-ই-জহুর' নামে ১৯৮৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

আ. হু.

জাইরোস্কোপ (gyroscope)

ঘূর্ণনশীল বস্তুর একটি বৈশিষ্ট্য হল, এর ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তন করতে গেলে আমরা বাধা অনুভব করি। অর্থাৎ বস্তুর রৈখিক গতির যেমন একটি জড়তা (দ্র) আছে, এর ঘূর্ণনগতিরও পৃথক একটি জড়তা আছে। ঘূর্ণনগতির এই জড়তাকে ভিত্তি করে জাইরোস্কোপ নির্মিত হয়।

জাইরোস্কোপ হচ্ছে একটি ভারি চাকা, যা এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে যে কোনো অক্ষের উপরে এটি পাক খেতে পারে। এই চাকা, ঘূর্ণনজড়তার কারণে যে দিকে প্রথমে একে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে, সেই ঘূর্ণনগতি এটি বজায় রাখবে। জাইরোস্কোপের এই বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে জাইরোকম্পাস নির্মিত হয়েছে, যা জাহাজ বা প্লেনে ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিকভাবে একটি চাকাকে ঘূর্ণনশীল অবস্থায় রাখা হয়। ঘূর্ণনজড়তার কারণে এই জাইরোকম্পাস সব সময়ই সত্যিকার উত্তর দিকে মুখ করে থাকে এবং জাহাজের গতির দ্বারা অপ্রভাবিত থাকে।

জাইরোস্কোপের আরেকটি ব্যবহার হচ্ছে জাইরো-পাইলট দিয়ে কোনো জাহাজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালনা করা। জাহাজ যদি চলার পথে দিক হারিয়ে ফেলে বা দিক বদলায়, জাইরো-পাইলট তা সংশোধন করতে পারে। কারণ জাইরোস্কোপটি ঘূর্ণনগতির জড়তার জন্য পূর্বের নির্দিষ্ট দিকেই থেকে যায়। ফলে জাহাজ কতটা দিকপরিবর্তন করেছে তা জানা যায়। জাইরো-পাইলট এই বিচ্যুতি সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণকারী মোটরকে সঙ্কেত দেয় এবং তা জাহাজের হালকে সেইভাবে ঘুরিয়ে দেয়।

আ. আ.

www.pathagar.com

জাইলেম্ কলা

উদ্ভিদদেহের এক ধরনের জটিল কলা। এটি উদ্ভিদদেহে দৃঢ়তা প্রদানকারী অন্যতম প্রধান অংশ। খাদ্যদ্রব্যের উপাদানসমূহ মূল থেকে পাতায় পরিবহণ করাও এর কাজ। জাইলেম কলা চারটি উপাদানে গঠিত। এগুলো হচ্ছে : ট্রাকিড্, ট্রাকিয়া বা ভেস্‌ল্, জাইলেম্ ফাইবার ও জাইলেম প্যারেন্‌কাইমা।

ক. ট্রাকিড্ (Tracheids) : এক জাতীয় দীর্ঘ, মৃত ও বড় গহ্বরযুক্ত কোষ। এগুলোর প্রান্তভাগ বাঁকা বা তির্যক ধরনের। পরিণত অবস্থায় এগুলোর প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ থাকে না। এগুলোর কোষপ্রাচীর সপাড় কূপযুক্ত। কোষগুলো পরস্পর প্রান্তে প্রান্তে যুক্ত হয়ে পরিবহণের পথ তৈরি করে। টেরিডোফাইটা ও নগ্নবীজী উদ্ভিদের জাইলেমের প্রধান উপাদান ট্রাকিড্, কারণ সেগুলোতে ভেস্‌ল্ নেই। ট্রাকিডের কাজ উদ্ভিদকে দৃঢ়তা প্রদান করা এবং পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ দ্রব্যসমূহ মূল থেকে পাতায় পরিবহণ করা।

খ. ট্রাকিয়া বা ভেস্‌ল্ : ট্রাকিয়া আবৃতবীজী উদ্ভিদের জাইলেম্ কলার প্রধান উপাদান। সাধারণত এ জাতীয় কোষগুলো মোটা ও খাটো এবং এগুলোর ভেতরটা ফাঁপা। এরা একটির সঙ্গে আরেকটি মাথায় মাথায় যুক্ত হয়ে লম্বা ফাঁপা নালিকা তৈরি করে। পরিণত অবস্থায় এদের প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ না থাকায় এরা মৃত। এদের প্রাচীর লিগ্‌নিন্‌যুক্ত ও নানানভাবে স্থূলীকৃত। মোটা গর্তযুক্ত ভেস্‌লের নাম মেটাজাইলেম। এর প্রাচীর জালিকা-আকার, মই-আকার এবং কূপ-আকার। সরু গর্তযুক্ত ভেস্‌লের নাম প্রোটোজাইলেম। এর প্রাচীর বলয়াকার ও সর্পিলাকার। আবৃতবীজী উদ্ভিদ ছাড়া অপর কোনো উদ্ভিদে ট্রাকিয়া বা ভেস্‌ল্ পাওয়া যায় না। এগুলো প্রধানত আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য নগ্নবীজী উদ্ভিদের Gnetum (নিটাম)–এ প্রাথমিক পর্যায়ের ট্রাকিয়া রয়েছে। পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ মূল থেকে পাতা ও অন্যান্য সবুজ অংশে পরিবহণ করাই এদের কাজ।

গ. জাইলেম্ ফাইবার (xylem fibre) : জাইলেমে অবস্থিত স্ক্লেরেন্‌কাইমা জাতীয় কোষগুলো জাইলেম্ ফাইবার নামে পরিচিত। এদের প্রাচীর পুরু। এরা দীর্ঘ এবং এদের প্রান্ত চোখা। পরিণত অবস্থায় এদের প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ থাকে না। তাই এরা মৃত কোষ। এদের প্রাচীর লিগ্‌নিন্‌যুক্ত। এদের উড্ ফাইভার্-ও বলা হয়।

ঘ. জাইলেম্ প্যারেন্‌কাইমা (xylem parenchyma): জাইলেম্ কলায় বিদ্যমান প্যারেন্‌কাইমা-কোষই জাইলেম্ প্যারেন্‌কাইমা। জাইলেম কলার এ কোষগুলোই কেবল জীবিত। এদের উড্ প্যারেন্‌কাইমাও বলা হয়।

মু. আ.

জাকসু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দ্র

জাগ্রত চৌরঙ্গী

মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) প্রেরণায় নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য। এই ভাস্কর্যটি শিল্পী আবদুর রাজ্জাক নির্মাণ করেন। এটি স্থাপিত হয়েছে জয়দেবপুর চৌরাস্তার সড়কদ্বীপে।

মুক্তিযুদ্ধের এই স্মারক ভাস্কর্য ১৯৭৩ সালে নির্মিত হয়। কংক্রিট, গ্রে সিমেন্ট, হোয়াইট সিমেন্ট ইত্যাদি দিয়ে ঢালাই করে এটি তৈরি করা হয়।

ভিত বা বেদিসহ 'জাগ্রত চৌরঙ্গী'র উচ্চতা ৪২ ফুট ২ ইঞ্চি। ২৪ ফুট ৫ ইঞ্চি ভিত বা বেদির ওপর ১৭ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চ মূল ভাস্কর্যটি। গ্রামীণ পোশাক পরা উদোম গায়ে পেশিবহুল এই ভাস্কর্যের ডান হাতে গ্রেনেড আর বাম হাতে রাইফেল রয়েছে।

'জাগ্রত চৌরঙ্গী' জয়দেবপুরের মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হুরমতউল্লাকে উৎসর্গ করা হয়। এর বেদিতে ষোড়শ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩নং সেক্টর এবং ১১নং সেক্টরের শহীদ সৈনিক–মুক্তিযোদ্ধাদের নাম উৎকীর্ণ হয়েছে।

র. শা.

জাতক

সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের দশম গ্রন্থ। বৌদ্ধসাহিত্যে 'জাতক' শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। এর দ্বারা বোধিসত্ত্ব (দ্র) অবস্থায় গৌতম বুদ্ধের (দ্র) অতীত জন্ম-জন্মান্তর বৃত্তান্তকে বোঝানো হয়। বৌদ্ধ বিশ্বাস মতে এক জন্মের কর্মফলের প্রভাবে কেউই সম্যকসম্বুদ্ধ হতে পারেন না। যিনি বুদ্ধ হন, তাঁকে বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুর-বেশে কোটি-কল্পকাল নানা জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণপূর্বক দানশীল ইত্যাদি পালনসহ সৎকর্মের দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষসাধন

www.pathagar.com

জাগ্রত চৌরঙ্গী : ভাস্কর আবদুর রাজ্জাক

করতে হয়। এভাবে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হবার অধিকার লাভ করেন এবং পরিশেষে পূর্ণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে অভিসম্বুদ্ধ হন। এই অবস্থায় তিনি নিজের এবং পরের অতীত জীবনবৃত্তান্তসমূহ দেখতে পান। গৌতম বুদ্ধেরও এই অলৌকিক ক্ষমতা জন্মেছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থমতে বোধিসত্ত্ব ৫৫০ বার নানা জন্মে পৃথিবীতে (দ্র) আগমন করেন। সর্বশেষ জন্মে তিনি বুদ্ধ বা জ্ঞানী হন।

বুদ্ধ শিষ্যদের উপদেশ দেওয়ার সময় অতীত জন্মের বিভিন্ন কথা শুনিয়ে তাঁদের নির্বাণের (দ্র) পথে আহ্বান জানাতেন, বিপথগামী শিষ্যকে তিনি সৎপথে ফিরিয়ে আনতেন। শিষ্যরা পরবর্তী কালে অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের মতো এসব আখ্যায়িকাও জনহিতার্থে সংগ্রহ করেন। পণ্ডিতদের মতে, খ্রিস্টের জন্মের অন্তত ৩৭০ বছর আগে জাতকসমূহের সঙ্কলন কাজ সম্পন্ন হয়।

প্রত্যেক জাতক তিনটি অংশে বিভক্ত। অংশগুলো হল—বর্তমান কথা, মূল জাতক বা অতীতবস্তু এবং সমবধান। গৌতম বুদ্ধ কী উপলক্ষে বা কোন প্রসঙ্গে আখ্যায়িকাটি বলেছিলেন তা বুঝিয়ে দেওয়ার নামই 'বর্তমান কথা'। আখ্যায়িকাটিকে 'মূল জাতক' বা 'অতীতবস্তু' বলা হয়। মূল জাতকে বর্ণিত পাত্রদের সঙ্গে বর্তমান কথায় বর্ণিত ব্যক্তিদের চরিত্রের সামঞ্জস্য-বিধানই 'সমবধান' অংশের উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধ সাহিত্য 'জাতক' অবলম্বনে আঁকা অজন্তা গুহার দেয়ালে ফ্রেস্কো

'জাতকার্থবর্ণনা' নামক গ্রন্থে জাতকের মোট সংখ্যা ৫৪৭। গ্রন্থটি পালি ভাষায় রচিত। ঈশানচন্দ্র ঘোষ এসব জাতক বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং ছয় খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম (দ্র) প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রাচীন কালের জাতক বার্মা (বর্তমান মায়ানমার), শ্যাম (অর্থাৎ থাইল্যাণ্ড), তিব্বত (দ্র), চীন (দ্র) ও জাপানে (দ্র) অনূদিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রে, রামায়ণ (দ্র) মহাভারতে (দ্র) এবং ঈশপের (দ্র) গল্পেও জাতককাহিনীর প্রত্যক্ষ প্রভাব পাওয়া যায়।

সুজ. ব.

www.pathagar.com

জাতিসংঘ (United Nations)

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে সহযোগিতা দানের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। মিত্রশক্তি (দ্র)-বর্গের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র)-কালীন সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতেও অটুট রাখার পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) উদ্যোগে জাতিসংঘ গঠিত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন সানফ্রান্সিস্কোতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ৫১টি রাষ্ট্রের সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ বছর ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ কাজ শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে স্থায়ীভাবে এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়।

জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হল : আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, সমান অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান এবং সর্বত্র মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা। এসব উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে গৃহীত জাতিসংঘের যাবতীয় কার্যক্রম ছয়টি পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। পরিষদগুলোর নাম : ১. সাধারণ পরিষদ (The General Assembly), ২. নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council), ৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council), ৪. অছি পরিষদ (The Trusteeship Council), ৫. বিশ্ব-আদালত (The International Court of Justice) এবং ৬. সচিবালয় (The Secretariat)।

জাতিসংঘের সকল সদস্যকে নিয়ে এর সাধারণ পরিষদ গঠিত। সাধারণ পরিষদ বছরে অন্তত এক বার বৈঠকে মিলিত হয়। এই পরিষদ যে কোনো বিষয় সম্পর্কে অন্যান্য পরিষদের কাছে সুপারিশ করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা ১৫টি দেশ। এর মধ্যে ৫টি দেশ স্থায়ী সদস্য। এরা হচ্ছে চীন (দ্র) প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য (দ্র), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া (দ্র)। ১০টি দেশ অস্থায়ী সদস্য হিসাবে দু'বছর মেয়াদের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। কোনো আন্তর্জাতিক বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সময় প্রস্তাবের সমর্থনে ৫টি স্থায়ী সদস্যসহ কমপক্ষে মোট ৯টি সদস্যদেশের ভোট লাগে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হয় ৫৪টি দেশের প্রতিনিধি-সদস্য নিয়ে। আন্তর্জাতিক আদালতের সদস্যসংখ্যা ১৫। আবার এক জন সেক্রেটারি জেনারেল বা মহাসচিব আর প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়ে জাতিসংঘ সচিবালয় গঠিত। মহাসচিব জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসক হিসাবে কাজ করেন। বর্তমান মহাসচিবের নাম বুট্রোস বুট্রোস ঘালি (Boutros Boutros Ghali)। তাঁর আগে বিভিন্ন সময়ে পাঁচ জন মহাসচিব দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘের ছয়টি পরিষদের কিছু অনুমোদিত এজেন্সি রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)—রোম, ইতালি; আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (IDA)—ওয়াশিংটন ডি. সি.; আন্তর্জাতিক ঋণদান সংস্থা (IFC)—ওয়াশিংটন ডি. সি.; আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)—জেনেভা, সুইজারল্যাণ্ড; আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)—ওয়াশিংটন ডি. সি.; ইউনেস্কো (UNESCO, দ্র)—প্যারিস, ফ্রান্স; ইউনিসেফ (UNICEF, দ্র) —নিউইয়র্ক সিটি; আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক)—ওয়াশিংটন ডি. সি; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)—জেনেভা ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠনগুলোর মাধ্যমে জাতিসংঘের বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

জাতিসংঘের আগে 'লীগ অব নেশন্স্' নামে অনুরূপ একটি সংগঠন স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর ১৯২০ সালে গঠিত হলেও নানা কারণে সেটি সফল হয় নি। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠিত হলে ১৯৪৬ সালে 'লীগ অব নেশন্স্'-এর বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৮৫। এটি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন। ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ এর সদস্যপদ লাভ করে। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় এই সংঘ সর্বক্ষেত্রে সফল হয়েছে এমন নয়, তবু এটি পৃথিবীর (দ্র) নাতিবৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর প্রধান ভরসা।

সুজ. ব.

www.pathagar.com

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউ এন ডি পি দ্র
জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফ দ্র

জাতিস্মর

পূর্বজন্মের কথা যে স্মরণ করতে পারে তাকে জাতিস্মর বলে। মানুষ মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করে এই বিশ্বাসের ওপর এর ভিত্তি। অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ায় এই ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত। সাহিত্যেও এর গভীর প্রভাব দেখা যায়। মহাভারতের (দ্র) কয়েকটি জায়গায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম (দ্র) ও জাতকে (দ্র) এর প্রবল রূপ পাওয়া যায়। গৌতম বুদ্ধ (দ্র) দিব্যজ্ঞান লাভের প্রথমে জাতিস্মরজ্ঞান লাভ করেন। জাতকের কাহিনীগুলো গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের ঘটনা জাতিস্মর-শৈলীতে লিখিত। তিনি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করে এই কাহিনীগুলো বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী কালে 'কথাসরিৎসাগর' (দ্র) ইত্যাদি গ্রন্থে জাতিস্মর মানুষ ও পশুপাখির নানা কাহিনী পাওয়া যায়। জৈন (দ্র) ধর্মগুরুরা জাতিস্মরক্ষমতার অধিকারী। ইসলাম (দ্র) ও খ্রিস্টধর্ম (দ্র) জন্মান্তরবাদ (দ্র) স্বীকার করে না। আধুনিক পাশ্চাত্যে জাতিস্মরতা অবলম্বন করে কাল্পনিক কাহিনী রচিত হচ্ছে। জ্যাক লণ্ডন (দ্র), আর্থার্ কোনান্ ডয়েল (দ্র), সমারসেট মম্ (দ্র) প্রমুখ লেখকের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যেও জাতিস্মরমূলক কাহিনী পাওয়া যাচ্ছে।

জাতিস্মরতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়ার জন্য নানা জায়গায় গবেষণা চলছে।

বি. ব.

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বাংলাদেশ

গ্রন্থ ও গ্রন্থজগতের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। কোনো সরকারি অধ্যাদেশবলে এটি গঠিত হয় নি।

ইউনেস্কো (দ্র) ও বিভাগপূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের সহযোগিতায় 'ন্যাশনাল বুক সেণ্টার অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকায় (দ্র) অবস্থিত ছিল। এর কার্যালয় প্রথমে ছিল টয়েনবি সার্কুলার রোডের একটি দ্বিতল ভবনে।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে এটি 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বাংলাদেশ' নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে এর কার্যালয় ঢাকার ৫/সি, বঙ্গবন্ধু এভেনিউ-র একটি দ্বিতল ভবনে অবস্থিত। এখানে একটি গ্রন্থ-বিক্রয়কেন্দ্রও রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্মকর্তা এর পরিচালক। ওসমানী উদ্যান সংলগ্ন 'মহানগর' পাঠাগারটি গ্রন্থকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে প্রতি বছর শুধু ঢাকায় নয়, দেশের বড় বড় শহরে জাতীয় গ্রন্থমেলা ও এর সম্প্রসারিত কর্মসূচি হিসাবে আঞ্চলিক গ্রন্থমেলা এবং রাজধানীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠান করা। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থ প্রদর্শনের পাশাপাশি স্মরণীয় দিবসভিত্তিক গ্রন্থপ্রদর্শনী ও আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজন, বিশেষ গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা দান, গ্রন্থ উন্নয়ন বিষয়ে প্রচারণা ও গ্রন্থপাঠভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করাও এর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও, জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থসচেতনতা বৃদ্ধি ও গ্রন্থপাঠে তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে 'গ্রন্থসুহৃদ' সমিতি এবং সারা দেশে এর সহস্রাধিক শাখা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী স্থানীয় পাঠক-পাঠিকারাই এই সমিতির উদ্যোক্তা ও সদস্য।

১৯৯৪ সাল থেকে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সারা দেশে 'গ্রন্থসপ্তাহ' পালন ছাড়াও পুস্তক-বিক্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, পুস্তক-বিপণন ও বিক্রয়, গ্রন্থাগার ও পাঠকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, পুস্তক রচনা, সম্পাদনা, অনুবাদ, গ্রন্থ-রূপায়ণ ও চিত্রণে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং পাঠকদের পাঠপ্রবণতা জরিপ করাও এই সংস্থার তৎপরতার অন্যতম অংশ।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থের সুমুদ্রণ, অঙ্গসৌষ্ঠব ও প্রচ্ছদ অঙ্কনের জন্য প্রতি বছর পুরস্কার প্রদান করে থাকে। দু'টি বিভাগে এটা দেওয়া হয়—সাধারণ গ্রন্থ ও শিশুতোষ গ্রন্থ। পাশাপাশি গ্রন্থজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকেও স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়ে থাকে। নতুন প্রকাশিত কোনো গ্রন্থের প্রকাশনা-উৎসব অনুষ্ঠান, নববর্ষে 'বই উপহার কর্মসূচি' এবং গ্রন্থবিক্রেতাদের সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান এই

www.pathagar.com

সংস্থার নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র 'বই' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে, যাতে দেশ-বিদেশের গ্রন্থ ও গ্রন্থজগৎ সংক্রান্ত নিবন্ধাদি নিয়মিত পরিবেশিত হয়।

আ. হু.

জাতীয় পার্টি

বাংলাদেশের অন্যতম একটি রাজনৈতিক দল। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও সকল ধর্মের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রসার ও তা সুদৃঢ়ীকরণ, গণতন্ত্রের কাঠামোসমূহকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান এবং সামাজিক প্রগতি তথা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে এই দল গঠিত হয়েছে বলে দলের ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়। এই দল গঠনের মূল উদ্যোক্তা সাবেক সেনাবাহনী-প্রধান ও প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

জাতীয় পার্টি স্বনামে দল গঠন করার আগে 'জাতীয় ফ্রন্ট' নামে একটি মঞ্চ গঠন করা হয়, যাতে সমবেত হন অবসরপ্রাপ্ত বেশ কিছু সামরিক কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বেরিয়ে আসা নেতৃবৃন্দ। ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি উক্ত ফ্রন্টভুক্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমবায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দল গঠন করা হয়।

১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দলটি ক্ষমতাসীন থাকে। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে জাতীয় পার্টি বস্তুত এক সংখ্যালঘু বিরোধী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। অবশ্য ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে দলটির মনোনীত যথাক্রমে ৩৫ জন ও ৩১ জন সদস্যপ্রার্থী বিজয়ী হয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেন। জাতীয় পার্টি দেশব্যাপী দলীয় আদর্শগত তৎপরতা তার মোট ১২টি অঙ্গসংগঠনের মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকে।

আ. হু.

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান (দ্র) বিষয়ে বাস্তব ধারণা দিয়ে সর্বস্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্য থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত।

সাবেক পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৬৫ সালের ২৬শে এপ্রিল গৃহীত এক সিদ্ধান্তবলে ঢাকা ও লাহোরে একটি করে বিজ্ঞান জাদুকর স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলে ১৯৬৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরি ভবনে এই জাদুঘরের কাজ শুরু হয় এবং ঢাকা জাদুঘরের কিউরেটর এই প্রকল্পের অফিসার-ইন-চার্জ নিযুক্ত হন।

১৯৭০ সালে এই জাদুঘর পাবলিক লাইব্রেরি ভবন থেকে প্রথমে ঢাকার শ্যামলীবাগে, সেখান থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ই মে ধানমণ্ডির ১ নম্বর সড়কে ও পরে ১৯৭৬ সালের ১লা আগস্ট ৬ নম্বর (ধানমণ্ডি) সড়কে স্থানান্তরিত হবার পর অবশেষে শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁওয়ের বর্তমান স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয় ১৯৮৭ সালে এবং এর পূর্বতন নাম পরিবর্তিত হয়ে গ্রহণ করে নতুন নাম 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর'। পাঁচ একর জমির ওপর নির্মিত এই জাদুঘরে চারটি গ্যালারি রয়েছে। দ্বিতীয় তলায় নির্বাহ করা হয় প্রশাসনিক কাজকর্ম। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের কর্মসূচি মূল্যায়ন কমিটি (পি ই সি) অনুমোদিত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এক জন পরিচালক এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

এই জাদুঘরের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস তুলে ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় যে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হয় তার পরিপূরক হিসাবে কাজ করা, সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে বিজ্ঞানের দান ও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরা এবং শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞানধর্মী ও উদ্ভাবনমূলক কাজে উৎসাহ দেওয়া।

জাদুঘরটির উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে এর গ্যালারিগুলো একক বা দলগত পরিদর্শনের ব্যবস্থা, নিয়মিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তৃতা শোনানোর ব্যবস্থা ও ভিডিও শো'র প্রদর্শনী, বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার, আলোচনাসভা ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান, প্রতি বছর দেশব্যাপী জেলাভিত্তিক এবং পরে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানসপ্তাহ পালনের কার্যক্রম, বিজ্ঞান-আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে তরুণ উদ্ভাবক ও বিজ্ঞান ক্লাবকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান, এর একটি প্রশস্ত কক্ষে স্থাপিত পাঠাগার ব্যবহারে ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষানুরাগীদের সুযোগ প্রদান,

www.pathagar.com

ঢাকার আদি মুদ্রণযন্ত্র—ঢাকা নগর জাদুঘরের সৌজন্যে প্রাপ্ত

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে টেলিস্কোপের (দ্র) সাহায্যে জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ ও প্ল্যানেটেরিয়াম (দ্র) শো'র ব্যবস্থা। এ ছাড়াও এই জাদুঘরের তরফ থেকে দু'টি সাময়িকী প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সাময়িক দু'টি হচ্ছে ত্রৈমাসিক 'নবীন বিজ্ঞানী' ও 'উদ্ভাবন'। এর পাশপাশি জাদুঘরের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে 'তরুণ বিজ্ঞানী প্রকল্প উন্নয়ন' শীর্ষক একটি প্রকল্প। সরকারি অর্থানুকূল্যে পরিচালিত এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিভাবান উদ্ভাবক ও তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্পের আরো উন্নতি সাধনে তাদের বৃত্তি দিয়ে সাহায্য প্রদ ন করা এবং একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির অধীনে তাদের কাজের সুযোগ করে দেওয়া।

এই জাদুঘরে প্রদর্শিত প্রায় ১ হাজার নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েক জন বিজ্ঞানীর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও দলিলপত্র, প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তু ডাইনোসরের (দ্র) অবিকল মূর্তি, বহু পুরাতন বিমানের ইঞ্জিন, ঝুলন্ত সেতু, পাকশি হার্ডিঞ্জ ব্রিজের (দ্র) মডেল, ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি।

আ. হু.

বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রবেশপথে ডাইনোসর (ভাস্কর্য) দাঁড়িয়ে আছে। নিচে : তারামণ্ডল দেখার জন্যে টেলিস্কোপ

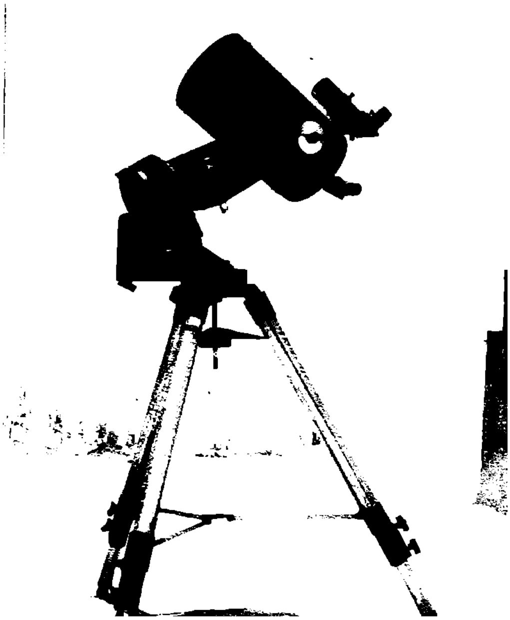

www.pathagar.com

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রিসহ সবগুলো পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোকে পরীক্ষাসহ একই অধিভুক্ত কর্মসূচির আওতায় আনার উদ্দেশ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে দেশের ডিগ্রি পর্যায়ের ৫৬৩টি কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রথম বারের মতো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৩ সালের ডিগ্রি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজগুলোর ডিগ্রি (পাশ)- সহ ডিগ্রি (সম্মান), এম. এ. (প্রিলিমিনারি/সনাতন), এম. এ. (চূড়ান্ত), এলএল. বি., বি. এড, এম. এড, বি. পি. এড. প্রভৃতি পরীক্ষাও গ্রহণ করা হবে। এর ফলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কেও ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা সহজ হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুধু পরীক্ষা পরিচালনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, শিক্ষাক্রম (Curriculum) প্রণয়ন, পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ডিগ্রিও প্রদান করবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্যালয় গাজীপুরে অবস্থিত।

মে. খা.

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আয়োজিত এ দেশের সর্ববৃহৎ শিশু প্রতিযোগিতা। সঙ্গীত, নৃত্য, ছবি আঁকা, আবৃত্তি, বিতর্ক, বক্তৃতা, খেলাধুলা ইত্যাদি ৬০টির বেশি বিষয়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৬ থেকে ১৬ বছর বয়সের শিশু-কিশোরেরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

এই প্রতিযোগিতা প্রথমে থানা পর্যায়ে শুরু হয়। এতে বিজয়ীদের মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ে ১ম স্থান অধিকারী জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জন করে। জেলা পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকারী বিজয়ী অঞ্চল পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। উল্লেখ্য প্রতিযোগিতার সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে ৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। অঞ্চল পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকারীগণ চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে পারে। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। শ্রেষ্ঠ বিজয়ীকে 'চ্যাম্পিয়ন' পদক দেওয়া হয়। বিজয়ী সকল শিশু-কিশোরকে পুরস্কৃত করা হয়।

খু. জা.

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার পুরস্কার হাতে উল্লসিত এক দল শিশু

www.pathagar.com

জাতীয় সঙ্গীত

জাতীয় সঙ্গীতরূপে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত গান। এই গান রাষ্ট্রীয় উপলক্ষসমূহে বিধি অনুসারে গাওয়া হয় বা এর সঙ্গীত বাজানো হয়। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহেও এই গান গাওয়া হতে পারে। স্কুলে ক্লাস শুরুর আগে এসেম্ব্লিতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার রীতি আছে। জাতীয় সঙ্গীত জাতীয় পতাকার মতোই একটি স্বাধীন জাতির শ্রদ্ধা ও গৌরবের বস্তু। জাতীয় সঙ্গীতে একটি জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও গৌরববোধ প্রতিফলিত হয়। আগেকার সময়ে বাংলায় জাতীয় সঙ্গীত কথাটি বর্তমান অর্থে ব্যবহার করা হত না। দেশপ্রেমমূলক গান বোঝাতেই জাতীয় সঙ্গীত কথার ব্যবহার চালু ছিল। ১৮৭৬ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) একটি দেশাত্মবোধক গানের সঙ্কলন প্রকাশ করেন ও তার নাম দেন 'জাতীয় সঙ্গীত'। 'জাতীয় সঙ্গীত' যদিও দেশাত্মবোধক গান, তবু দেশাত্মবোধক গান হলেই তাকে এখন বাংলায় 'জাতীয় সঙ্গীত' বলা হয় না। এই গানকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ও ঘোষিত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের একটি গানকে বাংলাদেশের 'জাতীয় সঙ্গীত' রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক'ও তাঁর একটি গান।

ক. গো.

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' আদর্শের ভিত্তিতে দেশে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর বাংলাদেশে এই রাজনৈতিক দলটির জন্ম।

প্রধানত আওয়ামী লীগ (দ্র) ও তার অঙ্গসংগঠনসমূহের ভিন্ন আদর্শানুসারী নেতা-কর্মীদের নিয়ে জাসদ-এর জন্ম হয়। দলটি অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এক পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাসদ-এর সম্পর্ক চরম বৈরিতায় পর্যবসিত হয়।

সাবেক ছাত্রনেতা আ. স. ম. আবদুর রব এবং মুক্তিযোদ্ধা মেজর এম. এ. জলিলকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করার মধ্যে দিয়ে সংগঠনটির যাত্রা শুরু। এর গুপ্ত সংগঠনের 'গণবাহিনী' ছিল।

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর মেজর খালেদ মোশাররফ তাঁর অনুগত কিছু সহকর্মী নিয়ে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এই উপলক্ষে মেজর জিয়াউর রহমানকে (দ্র) বন্দি

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা থেকে যা গ্রহণ করা হয়েছে

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

www.pathagar.com

করা হলে জাসদ–এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ 'বিপ্লবী সৈনিকসংস্থা'র সেনাসদস্যরা কর্নেল আবু তাহেরের নেতৃত্বে জিয়াউর রহমানকে ৭ই নভেম্বর (১৯৭৫) আটকাবস্থা থেকে মুক্ত করে। খালেদ মোশাররফ ও তাঁর অনুগত কয়েক জন সহযোদ্ধা নিহত হন।

১৯৮০ সালে জাসদ থেকে এক দল নেতা–কর্মী বেরিয়ে এসে গঠন করেন বাসদ (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল)। বাসদ এখন দুই ভাগে বিভক্ত। ১৯৮৩ সালে আ. স. ম. আবদুর রব–এর নেতৃত্বাধীন জাসদ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ জাসদ (রব) এবং অপর ভাগটি জাসদ (ইনু) নামে পরিচিত।

আ. হু.

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ হল এক নির্দিষ্ট জনসমষ্টির জাতিগত চেতনা। এই চেতনার সুনির্দিষ্ট কোনো উৎস নেই এবং এর বিকাশেরও নেই কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম কিংবা সূত্র। কখনো এর ভিত্তি হতে পারে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার ভেতরে বসবাসকারী একটি অভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী, কখনো অভিন্ন ধর্মবোধ বা ধর্মীয় পরিচিতি, কখনো অভিন্ন সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক উৎস।

মধ্যযুগের আগে জাতীয়তাবাদের মতো সক্রিয় কোনো রাজনৈতিক চেতনার অস্তিত্ব ছিল না। চতুর্দশ শতকে প্রথম এই চেতনা দানা বেঁধে ওঠে। ইতালির মাকিয়াভেল্লিকে (দ্র) বলা যেতে পারে জাতীয়তাবাদী বা জাতিগত চেতনার প্রথম উন্মেষকারী। তবে ইংল্যাণ্ডই প্রথম দেশ, যেখানে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্য ইংরেজ জাতির মধ্যে বিশেষ ঐক্যানুভূতির উন্মেষ ঘটে। এর পর ফ্রান্সের ওপর ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য বিস্তারের ধারাবাহিক প্রয়াসের মুখে জোয়ান অব আর্কের (দ্র) ভাববিপ্লব ও তাঁর সক্রিয় প্রয়াসের ভেতর দিয়ে ঘটে ফরাসি জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়। অষ্টাদশ শতকে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া (দ্র) এবং প্রুশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ডের ভাগ-বাঁটোয়ারা পোলদের মধ্যে পোলিশ জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়। পোল্যাণ্ডের বিভাজনের পর ফ্রান্সের বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের (দ্র) নেতৃত্বে রাশিয়া, জার্মানি, ইতালি ও স্পেনসহ ইউরোপের (দ্র) বিভিন্ন দেশে চলে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা। ফলে উল্লিখিত দেশগুলোয় জেগে ওঠে জাতীয়তাবোধ। এই সময় কাণ্ট (দ্র), হেগেল (দ্র), শিলার ও গোয়টে (দ্র) প্রমুখের রচনাকর্মের ভেতর দিয়ে যে রোম্যান্টিক আন্দোলন জেগে ওঠে, তাতে করে জাতীয়তার ঘটে নতুন রূপায়ণ।

যাই হোক, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার সংঘাতে জাতীয়ভাবের সূচনা হলেও বর্তমান জাতীয়তাবাদের জনক বলা যেতে পারে ইতালির দেশপ্রেমিক নেতা জুসেপ্পে মাৎসিনিকে (দ্র)। তাঁর মতে, প্রত্যেক জাতিই কোনো-না-কোনো বিশেষ প্রতিভা বা গুণের অধিকারী এবং জাতীয়তাবাদের ভেতর দিয়েই এই বিশেষ গুণ বা প্রতিভা বিকাশের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

আধুনিক ইতিহাসের শিক্ষা এই যে জাতীয়তাবাদ সফল ও সার্থক হয়ে ওঠে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের ভেতর দিয়ে। ভারত উপমহাদেশের ক্ষেত্রেও এ জাতীয় ঘটনার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত (১৯৪৭) হয়ে সৃষ্টি হল দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের— ভারত (দ্র) ও পাকিস্তান (দ্র)। বৃহত্তর বাংলার একটি অংশ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হল পাকিস্তান রাষ্ট্রের। ১৯৪৭ সালের পর থেকে যখন পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকদের দ্বারা সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সাহিত্য-সংস্কৃতি পদদলিত হতে লাগল, এমনকি অর্থনৈতিকভাবেও বাঙালিরা (দ্র) শিকার হল শোষণের। তখন প্রথমে তারা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, পরে পরিপূর্ণ স্বাধিকারের দাবিতে আন্দোলনমুখর হয়ে উঠল। বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর এই স্বাধিকার আন্দোলনের মূলে ছিল তাদের স্বাজাত্যবোধ অর্থাৎ বাঙালির জাতীয় বোধ বা বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এসবেরই পরিণতিতে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম (১৯৭১) হয়।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভাল ও মন্দ দু'টি দিকই রয়েছে। উগ্র জাতীয়তাবাদকে বার বার বিশ্বশান্তি বিপন্ন করতে দেখা গেছে। যেমন, হিটলারের (দ্র) জাতি-শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব এবং তার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে বিশ্বের দেশে দেশে সামরিক অভিযান এবং নির্মমভাবে নিধন করা হয়েছে বিভিন্ন জাতীয়তার বহু কোটি মানুষকে। অন্য দিকে সুস্থ

www.pathagar.com

স্বাদেশিকতা বোধ ও দেশপ্রেমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ কখনোই অমঙ্গলজনক নয়। একটি জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধ নষ্ট হওয়ার অর্থই তার অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়া। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদের ভাল-মন্দ নির্ভর করে শাসকশ্রেণীর চরিত্রের ওপর, তার শিক্ষাদীক্ষা, তথা ব্যাপক ও প্রখর ইতিহাসজ্ঞান বা বোধের ওপর।

শুদ্ধ জাতীয়তাবোধ বা জাতীয়তাবাদ এবং জাত্যভিমান বা জাতি-শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাবের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। শুদ্ধ জাতীয়তাবাদ একটি জাতির নিজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রেরণাস্বরূপ। এ ক্ষেত্রে তা তার আপন জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রেখেই অপরাপর জাতির সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়াসী হয়। অপর দিকে জাত্যভিমান বা জাতি-শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব এমন একটি উন্মাদনার জন্ম দেয়, অন্তিমে যা শুধু নিজ জাতিরই নয়, অন্য জাতিরও অকল্যাণ ডেকে আনতে পারে।

তবে, বর্তমান শতাব্দীতে গণসংযোগমাধ্যমের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে জাতি থেকে জাতি পর্যায়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের বিষয়টি সহজতর হওয়ায় জাতীয়তাবাদের অবিমিশ্র ভিত্তি ক্রমশ দুর্বল হবার পথে। ফলে তার জায়গা দখল করছে 'এক বিশ্বে'র ধারণা তথা 'বিশ্বের এক-মানবগোষ্ঠী'র তত্ত্ব বা বাদ।

আ. হ.

জাপাতা, এমিলিয়ানো সাপাতা, এমিলিয়ানো দ্র

জাপান

এশিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলে কামচাটকা উপদ্বীপের দক্ষিণ থেকে ফরমোজা দ্বীপের উত্তর পর্যন্ত প্রায় ৩২১৮ কিমি বিস্তৃত অঞ্চলে জাপান দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। জাপানে প্রায় ৩০০০ দ্বীপ থাকলেও হোক্কাইদো, হনশু, শিকোকু ও কিউশু নামক চারটি বৃহৎ দ্বীপ নিয়ে দেশের শতকরা ৯৪ ভাগ গঠিত হয়েছে। জাপানের আয়তন প্রায় ৩,৬৯,৬৯২ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি ৪৫ লক্ষ ১৩ হাজার (১৯৯২ সালে)। অধিবাসীগণ অধিকাংশই বৌদ্ধ (দ্র) ধর্মাবলম্বী। দেশটি থেকে সর্বপ্রথম সূর্যোদয় দেখা যায় বলে জাপানকে

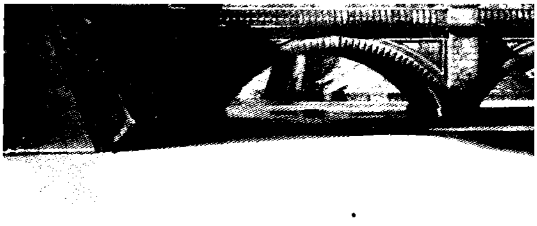

জাপান সম্রাটের রাজপ্রাসাদ
মাঝের ছবি : জাপানের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম ইকেবানা বা ফুলসাজানো। নিচে : চা-পান অনুষ্ঠান

www.pathagar.com

‘নিপ্পন’ বা উদীয়মান সূর্যের দেশ বলা হয়। জাপান পৃথিবীর (দ্র) মধ্যে অন্যতম শিল্পপ্রধান দেশ এবং এশিয়া (দ্র) মহাদেশের (দ্র) শ্রেষ্ঠ উন্নত দেশ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় জাপান এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে কোনো সঙ্কেত ছাড়াই ১৯৪১ সালে জাপান হাওয়াই দ্বীপের পার্ল হারবারে আক্রমণ চালায়। জাপান সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমায় (দ্র) এবং ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে (দ্র) পর পর দু'টি পরমাণু-বোমা হামলার পর জাপান সম্মিলিত বাহিনীর কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করে (১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর)।

পরমাণু বোমায় বিধ্বস্ত নাগাসাকি শহর : ৯ই আগস্ট ১৯৪৫, নিচে : হিরোশিমা শহর পরমাণু বোমায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলেও এটাই একমাত্র বাড়ি যা কঙ্কাল রূপে দাঁড়িয়ে আছে

জাপান সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের দেশ, অর্থাৎ সেখানে রাজা আছেন কিন্তু তাঁর হাতে কোনো ক্ষমতা নেই; ক্ষমতা ন্যস্ত আছে সংসদের উপরে। ১৯৪৭ সালের সংবিধান মতে বর্তমান জাপানে সরকার পরিচালিত হচ্ছে। জাপানে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রচলিত আছে। ১৯৪৭ সালের সংবিধানে জাপানে মহিলাদের ভোটাধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংসদই জাপানের আইন-কানুন নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করে। জাপানের সম্রাটকে রাষ্ট্রের এবং জনগণের ঐক্যের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়। সরকার পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জাপান একটি অপ্রশস্ত পর্বতসঙ্কুল দেশ। এ দেশের উপকূলভাগ সংকীর্ণ নিম্নভূমি দ্বারা গঠিত। ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত জাপানের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। জাপানে ঘন ঘন ভূমিকম্পের কারণ, এখানে অনেক আগ্নেয়গিরি রয়েছে। তা ছাড়া এখানে বেশ কিছু উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাঁশ (দ্র), কাঠ, কাগজ (দ্র) প্রভৃতি হালকা বস্তু দ্বারা বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা হয়। ফুজিয়ামা (৩,৮১০ মিটার) জাপানের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এবং এটি একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি (দ্র)। বিভিন্ন পর্বতের মধ্য দিয়ে পূর্বে ও পশ্চিমে প্রবাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলো জাপানে বহু উর্বর উপত্যকার জন্ম দিয়েছে।

গ্রীষ্মকালে জাপানের সর্বত্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু

www.pathagar.com

অনুভূত হয়। কিন্তু শীতকালে জাপানের উত্তর অংশে মেরুপ্রদেশীয় জলবায়ুর প্রভাব লক্ষ করা যায়। গ্রীষ্মকালে জাপানের পূর্বাঞ্চলে এবং শীতকালে পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। মৌসুমি বায়ুর গতি পরিবর্তনের সময় এখানে সামুদ্রিক ঝড় 'টাইফুন' (দ্র)-এর সৃষ্টি হয়। উষ্ণ কুরোশিও স্রোতের প্রভাবে জাপানের পূর্ব উপকূল পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা উষ্ণ থাকে।

জাপানের প্রায় অর্ধেক অরণ্যময়। এখানে ওক, কর্পূর, তুঁত এবং প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে। পর্বতময় হওয়ায় সমগ্র জাপানে মাত্র এক পঞ্চমাংশ আবাদযোগ্য সমতলভূমি আছে। অনেক পর্বতগাত্রে ধাপ কেটে কেটে কৃষিকাজ করা হয়। ধান (দ্র), গম (দ্র), যব, রেশম (দ্র), চা (দ্র), তামাক (দ্র), আখ (দ্র) প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। জাপান পৃথিবীর প্রধান রেশম উৎপাদনকারী দেশ। মৎস্যচাষ ও মৎস্যশিকার জাপানের অধিবাসীদের একটি প্রধান উপজীবিকা। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা (দ্র), লোহা (দ্র), তামা (দ্র), খনিজ তেল ও গন্ধক (দ্র) উল্লেখযোগ্য।

পর্যাপ্ত খনিজ তেল না থাকায় জলবিদ্যুৎ (দ্র) কারখানা জাপানের প্রধান শক্তির উৎস। আবাদী জমির স্বল্পতা, সুলভে পরিশ্রমী ও দক্ষ শ্রমিক লভ্যতা, যোগাযোগের সুবিধা, উপযোগী জলবায়ু, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রির জন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশসমূহের বিশাল বাজার জাপানের শিল্প-উন্নয়নে সহায়তা করেছে। লোহা ও ইস্পাত (দ্র), বস্ত্র এবং জাহাজনির্মাণ জাপানের প্রধান শিল্প। তা ছাড়া মোটরগাড়ি (দ্র), কাগজ, চীনামাটি ও কাঁচের জিনিস, রেশম (দ্র), রেয়ন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং খেলনা তৈরির জন্য জাপান প্রসিদ্ধ। উল্লেখ্য যে জাপানের অধিকাংশ শিল্প হনসু ও কিউশু দ্বীপে গড়ে উঠেছে।

জাপানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য দীর্ঘ পাকা সড়ক ও রেলপথ আছে। জাপান এয়ার লাইন্স একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিমানসংস্থা।

টোকিও (দ্র) জাপানের রাজধানী ও প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নগরী। এই নগরের লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ। ইয়াকোহামা বৃহত্তম বন্দর এবং প্রসিদ্ধ বস্ত্র ও রেশম শিল্পকেন্দ্র। ওসাকা বস্ত্র এবং লোহা ও ইস্পাতশিল্পের জন্য বিখ্যাত। ওসাকার নিকট অবস্থিত কোবে জাপানের দ্বিতীয় বন্দর একটি শিল্পশহর। কিয়োতো জাপানের প্রাচীন রাজধানী। এই শহর ধাতব তৈজসপত্র ও চীনামাটির দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত। হিরোশিমা ও নাগাসাকি শিল্পশহর ও বন্দর।

মু. এ.

জাফরান

পেঁয়াজের মতো পাতা ও কাণ্ডবিশিষ্ট বহুবর্ষজীবী গুল্ম। মাটির নিচে মূলে কন্দ ও অনেক শেকড় থাকে। অন্য নাম কুমকুম বা কুঙ্কুম। বৈজ্ঞানিক নাম ক্রোকাস সেটিভাস (*Crocus sativus* inn), গোত্র ইরিদাসি (Iridaceae)। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে এই গণের ৬০টি প্রজাতি বর্তমান।

জাফরান স্বাদে তেতো, ঝাঁঝালো, পিচ্ছিল ও সুগন্ধময়। দামী রান্নায় ও সুগন্ধের জন্য পরিমাণ মতো ব্যবহার করা হয়। সাধারণত কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ফুল হয়। ভাল জাফরান রক্তাভ-পীত রঙের ও পদ্মগন্ধযুক্ত। কাশ্মীরে উৎকৃষ্ট জাফরান জন্মে। ইরান, ইতালি, ফ্রান্স ও স্পেনে এর ব্যাপক চাষ হয়। কাশ্মীরের মতো আর কোনো দেশে এটি এত রক্তাভ-পীত নয়। প্রাচীন কাল থেকে কাশ্মীরে জাফরান উৎপন্ন হচ্ছে।

খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও দামী প্রসাধনসামগ্রী হিসাবে জাফরান ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালে জাফরান গায়ে মাখা হত শরীরের সৌষ্ঠব বাড়াবার জন্য। কুঞ্চিত চামড়া জাফরানের গুণে লাবণ্যময় হয়ে যায়। যৌবন অটুট রাখার জন্য কুঙ্কুমচূর্ণের ব্যবহার এখন আর সম্ভব নয়, কারণ এর দাম খুব বেশি। এ ছাড়া নানা রোগে (দ্র) জাফরানের ব্যবহার হয়। এক তোলা জাফরানের দাম অন্তত ৫০০ টাকা।

বি. ব.

জাভা মানব (Java Man)

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ। দশ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগে এরা জীবিত ছিল। এরা খাড়া মানবদের অন্তর্গত মানুষ। ইন্দোনেশিয়ার (দ্র) জাভা দ্বীপে এদের ফসিল পাওয়া গেছে। নদীর পুরানো খাত কিংবা আগ্নেয়গিরির (দ্র) জমাট লাভার স্তরে এদের চিহ্ন পাওয়া যায়। ১৮৯৯ সালে ওলন্দাজ চিকিৎসক ইউজ্যান্ ডুবোয়া (Eugène Dubois) এদের প্রথম আবিষ্কার করেন। এদের নৃতাত্ত্বিক নাম

www.pathagar.com

পিথেক্যানথ্রোপাস (Pithecanthropus)।

জাভা মানুষদের ফসিল থেকে বোঝা যায় যে তাদের লম্বা মুখ, ছোট নিচু কপাল এবং চোখের ওপর প্রচুর ভাঁজ ছিল। এদের মাথার খুলি মোটা, দাঁত বড় বড় এবং চোয়াল ছিল বড়। আধুনিক মানুষের চেয়ে এদের মস্তিষ্ক ছিল ছোট। এরা পাঁচ ফুটের (১৫০ সেন্টিমিটার) ওপর দীর্ঘ হত। মস্তিষ্কের আয়তন ৯০০ সিসি।

সৈ. আ. ই.

জাম

মার্টেসি (Myrtaceae) গোত্রভুক্ত বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ (দ্র)। এরা কালোজাম এবং গোলাপজাম এ দুই ভাগে বিভক্ত। কালোজামের বৈজ্ঞানিক নাম *সিজিজিয়াম কিউমিনি*

(Syzygium cumini)। এর আদি নিবাস ভারত (দ্র), বাংলাদেশ (দ্র), মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া (দ্র)। জাম গাছ নিবিড় ছায়াদানকারী এবং এর কাঠ আর্দ্রতাসহিষ্ণু, দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী। বাংলাদেশে এ গাছ ফলের জন্য লাগানো হয়। ফল পাকলে এর বাইরের অংশ ঘন ও কালো রঙের হয় এবং ভেতরের অংশ লাল রঙের রসে ভরে ওঠে। পাকা জাম বেশ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। পরিস্রুত জামের রস সিরকার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জামের রস রক্তবর্ধক ও রক্তপরিষ্কারক।

গোলাপ জামের বৈজ্ঞানিক নাম *সিজিজিয়াম জাম্বোস, আলস্টন্* (*Syzygium jambos*, Alston)। এরা মাঝারি আকৃতির চিরহরিৎ বৃক্ষ। এদের উচ্চতা ১২-১৩ মিটার। পাতার রঙ সবুজ, আকার লম্বাটে ও বোঁটা ছোট। ফুল দূর থেকে দেখতে পেয়ারা ফুলের মতো। তিন মাসের মধ্যে ফল পেকে যায়। পাকা ফলের রঙ হাল্কা সবুজ।

মু. আ.

জামাইষষ্ঠী অরণ্যষষ্ঠী দ্র

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল।

যতদূর জানা যায়, ১৯৪১ সালে লাহোরে এই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলটির জন্ম হয়। মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী এই দলটির মূল সংগঠক ও আজীবন আমীর বা দলপ্রধান ছিলেন। ১৯৪৫ সালে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম নিখিল ভারত রুকন্ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যদের বলা হয় রুকন্।

এই রুকন্ সম্মেলনের পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে এর শাখা-সংগঠন গড়ে ওঠে। চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলন (দ্র) তীব্র হয়ে উঠলে জামায়াত পাকিস্তান দাবির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মওলানা মওদুদী লাহোরে এসে পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী সংগঠিত করেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পক্ষে অবস্থানগ্রহণ করার জন্য ১৬ই ডিসেম্বরের পর জামায়াতে ইসলামীকে এদেশে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী কালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তাদের দলীয় কর্মসূচি সংস্কার করে। তাদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে ৬৫টি ধারা আছে। এই ধারাগুলোতে সাংগঠনিক স্তর, কেন্দ্রীয় সংগঠন রুকন্ সম্মেলনের নিয়মাবলি, দলীয় নেতা-কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ক্ষমতা ও অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। দলীয় সদস্যদের শপথনামায় স্বাক্ষর করে অঙ্গীকার করার রেওয়াজ আছে।

ম. মু.

জারণ-বিজারণ

জারণ এবং বিজারণ দু'টি পরিপূরক রাসায়নিক বিক্রিয়া। জারণ ক্রিয়ার ফলে কোনো বিক্রিয়ক (reactant) ইলেক্ট্রন (দ্র) হারায় এবং অন্য বিক্রিয়ক সেই ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়। দু'টি বিক্রিয়া এ জন্য একই সময়ে ঘটে।

যে সকল পদার্থ জারণ-বিজারণের সময় ইলেক্ট্রন লাভ

www.pathagar.com

করে তাদের জারক পদার্থ বলে। বিক্রিয়ার এক পর্যায়ে জারক পদার্থও বিজারিত হয়। একটি শক্তিশালী জারক পদার্থ বিক্রিয়া করে দুর্বল বিজারক পদার্থে পরিণত হয়। ইলেক্ট্রোনেগেটিভ পদার্থসমূহ জারক হিসাবে অংশগ্রহণ করে। ফ্লুরিন (দ্র) সবচেয়ে ইলেক্ট্রোনেগেটিভ মৌল এবং এটা অত্যন্ত সক্রিয় জারক। এটা বিক্রিয়া করে ফ্লুরাইড তৈরি করে, যা বিজারক হিসাবে দুর্বল। অক্সিজেন (দ্র) খুব সক্রিয় জারক; তবে অক্সিজেনের অ্যালোট্রপ (allotrop) ওজোন (O_3) আরো বেশি সক্রিয় জারক। হ্যালোজেন জাতীয় সব মৌলই শক্তিশালী জারক।

যেসকল পদার্থ সহজেই পজিটিভ আয়ন (দ্র) সৃষ্টি করে, তারা সক্রিয় বিজারক। লিথিয়াম (দ্র) সবচেয়ে শক্তিশালী বিজারক।

কতকগুলি যৌগ যুগপৎ জারক এবং বিজারকরূপে বিক্রিয়া করতে পারে। যেমন,হাইড্রোজেন পারক্সাইড় (দ্র)।

অনেক জীবিত প্রাণী জারণক্ষমতার জন্য অক্সিজেনের ওপর নির্ভরশীল। এখানে ঠিক সরাসরি রাসায়নিক বিক্রিয়া না ঘটলেও কতকগুলি অন্তর্বর্তী যৌগের মধ্যে পারস্পরিক ইলেক্ট্রন বিনিময় ঘটে। অন্তর্বর্তী যৌগগুলি সহজেই ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে এবং ছেড়ে দেয়। এটা ইলেক্ট্রন পরিবহণ বিক্রিয়া নামে পরিচিত। সকল জীবের ক্ষেত্রে এর ধরন প্রায় একই। এই বিক্রিয়ায় সবচেয়ে শক্তিশালী জারক অক্সিজেন এবং সেটাই সর্বশেষ ইলেক্ট্রনগ্রাহক। জীবিত প্রাণীতে অক্সিজেনের প্রধান ভূমিকাই হচ্ছে ইলেক্ট্রন এপার-ওপার বা 'ডাম্প' করা। অনেক জীবাণু অবাতজীবী; বাঁচার জন্য এদের অক্সিজেন লাগে না। কারণ ইলেক্ট্রন গ্রাহক হিসাবে এরা অক্সিজেনের বদলে সালফার (দ্র) কিংবা অন্যান্য জারক পদার্থ ব্যবহার করে।

সা. এ.

জারুল

দাড়িম্ব (Lythraceae) গোত্রভুক্ত দ্বিবীজপত্রী এক প্রকার বড় গাছ। এর ইংরেজি নাম লাইলাক (Lilac) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *ল্যাগেরস্ট্রোমিয়া ফ্লোস-রেজিনি (Lagerstroemia flos-reginae Reta = L. speciosa pers)*। জারুলের আদি নিবাস চীন (দ্র)। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই জারুল গাছ জন্মে; তবে চট্টগ্রাম (দ্র), পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে (দ্র) বেশি জন্মে। ভারত (দ্র), মায়ানমার (দ্র), নেপাল (দ্র), শ্রীলঙ্কা (দ্র) ও মালয়েশিয়াতেও এ গাছ জন্মে। দীর্ঘ আকারের এ গাছের উচ্চতা প্রায় ১৫-২০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে বিরাট বিরাট আকারের জারুল গাছ আছে। এগুলোর কাণ্ডের বেড় ৪ মিটারেরও কিছু বেশি। জারুল গাছের লালচে-সাদা রঙের কাঠ খুবই টেকসই ও মজবুত। এ কাঠ আর্দ্রতাসহিষ্ণু, তাই নৌকার বৈঠা ও মাস্তুলসহ বিভিন্ন অংশ তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া গরুর গাড়ি ও চাষের যন্ত্রপাতি তৈরিতেও এ কাঠ ব্যবহৃত হয়। এমনকি জারুল কাঠ দিয়ে রেলপথের স্লিপার এবং আসবাবপত্রও তৈরি হয়।

জারুলের পাতা সরল এবং এর বিন্যাস দ্বি-সারি ও অভিমুখী। ছায়া ও ফুলের সৌন্দর্যের জন্য রাজপথের দু'ধারে জারুল লাগানো হয়। এর পাতা ও ফলে শতকরা ১২ থেকে ১৭/১৮ ভাগ ট্যানিন থাকে। চামড়া 'ট্যান' করার কাজে তা ব্যবহার করা হয়। জারুল গাছের শিকড় উত্তেজক ও জ্বররোধী। এর পাতা ও বাকল রেচক এবং বীজ নিদ্রাকর্ষী।

মু. আ.

জার্মান শিল্পকলা

জার্মানেরা শিল্পচর্চা শুরু করেছিল কখন কীভাবে তার সঠিক কোনো হদিস জানা যায় না অর্থাৎ তার লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় নি। শুধু সেখানকার ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন নগরগুলির পুরাতন দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সমস্ত প্রাচীরচিত্র বা দেওয়ালচিত্রের নমুনা বা নিদর্শন আজও টিকে রয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে জার্মান দেশের শিল্পীরা ব্যাপকভাবে শিল্পের চর্চা করতেন প্রাচীন কাল থেকেই।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁরা মূলত জোর দিয়েছেন চিত্রশিল্প অর্থাৎ ছবি অঙ্কন শাখায়। তবেগ্রাফিক শিল্প বা ছাপচিত্রশিল্পও সেখানে বিকাশ লাভ করেছিল। তাঁদের অঙ্কিত চিত্রাবলি গির্জা বা উপাসনালয়ের অভ্যন্তরে সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হত।

www.pathagar.com

শিল্পী হান্স্ হোল্‌বাইন্ দ্য ইয়ংগার-এর শিল্পকর্ম

শিল্পী ড্যুরারের একটি ড্রইং

জার্মানির প্রাচীন নগরী কোলোন (Cologne বা Köln) ছিল জার্মানির চিত্রশিল্পের আকরভূমি। সেখানে প্রথম পর্যায়ের দু'জন শিল্পীর অবদানের কথা সর্বজনবিদিত, যাঁদের নাম জার্মানির শিল্প-ঐতিহ্যের সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এক জন হচ্ছেন ভিল্‌হেল্‌ম্ ফন্ হার্লে (সম্ভবত ১৩৫৮-'৭৮ খ্রিস্টাব্দ) এবং স্টেফান লখ্‌নার (মৃ. ১৪৫১)। লখ্‌নারের বিখ্যাত শিল্পকর্ম 'এডোরেশন অব দ্য ম্যাজাই' আজও প্রাচীন জার্মান শিল্পের সাক্ষ্য দেয়। কাজটি সংরক্ষিত রয়েছে কোলোনের প্রসিদ্ধ ক্যাথিড্রালে।

মাস্টার ভন লেইসবর্‌ন্, মাটিয়াস্ গ্রুনেভাল্‌ড্, আলব্রেখ্‌ট্ ড্যুরার (১৪৭১-১৫২৮) এবং হান্স্ হোল্‌বাইন্ (১৪৯৭-১৫৪৩) প্রমুখ শিল্পী জার্মান শিল্পকলাঙ্গনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এঁদের মধ্যে শেষোক্ত দু'জনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলব্রেখ্‌ট্ ড্যুরারের অবদানের কথা জার্মানির শিল্পকলার ইতিহাসে স্মরণীয় নানা কারণে। তিনি ছাপচিত্রের এক জন বিশ্বনন্দিত শিল্পী। আর তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি জলরঙ মাধ্যমের জনক। অর্থাৎ পানিতে রঙ গুলে তুলির সাহায্যে কাগজের ওপরে যে ছবি আঁকার পদ্ধতি আজ সারা বিশ্বে সবার প্রিয়, তার আবিষ্কারক ছিলেন ড্যুরার।

বিশ্ব-শিল্পকলাঙ্গনে আরো একটি বড় কারণে জার্মান আর্টের কদর, সেই সঙ্গে জার্মান দেশেরও। একটি বিশেষ গুরুত্ববাহী শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল সেখানে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যা এখনো সারা বিশ্বের শিল্পীদের মধ্যে কমবেশি প্রভাব বিস্তার করে আছে। তার নাম 'এক্সপ্রেশনিজ্‌ম্' বা 'প্রকাশবাদ' অথবা অভিব্যক্তিবাদ। এক্সপ্রেশনিস্ট আর্ট (দ্র) জার্মান শিল্পকলার এক বিরাট কৃতিত্ব। এই ধারার শিল্পকর্মে শিল্পী তাঁর মানসিক অনুভূতি, তাঁর আনন্দ-বেদনার বোধ এবং ক্ষোভ, প্রতিবাদ প্রভৃতির প্রকাশ ঘটান। রঙ ও রেখার বিন্যাসের ক্ষেত্রে সৃজনশিল্পীর জন্য এই জার্মান এক্সপ্রেশনিজ্‌ম্ শিল্পের সীমাবদ্ধতা ঘুচিয়ে বিস্তৃত ও অবারিত সুযোগের সৃষ্টি করে।

ম. আ.

www.pathagar.com

জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠী

জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ক'টি ভাষা : ইংরেজি (দ্র), জার্মান, ডাচ বা ওলন্দাজ, ফ্লেমিশ, ডেনিশ বা দিনেমার, সুইডিশ, নরওয়েজীয় এবং আইসল্যাণ্ডীয়।

হা. মা.

জালিয়ানওয়ালাবাগ

পূর্ব-পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উদ্যান। এখানে ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকারীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই উদ্যানে একটিমাত্র প্রবেশপথ এবং পাঁচটি অপ্রশস্ত বহির্গমনপথ ছিল। এর চারদিকে ২ মিটার (৫ ফুট) উঁচু প্রাচীর ছিল।

ব্রিটিশ-ভারতের বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ রাউলাট আইন (Rowlatt Act) পাশ করে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের বিনা বিচারে আটক রাখার ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত করেন। ফলে এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সংগঠিত হতে থাকে।

১৯১৯ সালের ১২ই এপ্রিল জেনারেল ডায়ার অমৃতসরে সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা সরকারের এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পরদিন ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে সমাবেশের ডাক দেয়। এই ডাকে সাড়া দিয়ে ছয় থেকে দশ হাজার লোক সেখানে সমবেত হয়। এরা ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। জেনারেল ডায়ারের সৈন্যরা কোনো রকম ঘোষণা না দিয়ে উদ্যানের সমস্ত পথ বন্ধ করে নিরস্ত্র জনতার ওপর ১০ মিনিটকাল এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। এর ফলে ১০০০ লোক নিহত ও ১৫০০ লোক আহত হয়। অবশ্য সরকারি হিসাব মতে নিহত হয় ৩৭৯ ও আহত হয় ১২০০ জন। তদন্ত কমিশন হত্যাকাণ্ডের জন্য জেনারেল ডায়ারকে দোষী সাব্যস্ত করলে সরকার তাঁকে সেনাধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণ করে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' (স্যার) উপাধি বর্জন করেন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ

জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবেশপথ

করে এবং মহাত্মা গান্ধীর (দ্র) নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের (দ্র) সূচনা হয়।

সুজ. ব.

জাহাঙ্গীর [১৫৬৮—১৬২৭]

সম্রাট আকবরের (দ্র) মৃত্যুর পর ১৬০৫ সালে তাঁর পুত্র সেলিম 'নূরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ গাজী' উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে তিনি জাহাঙ্গীর নামেই পরিচিত।

জাহাঙ্গীর এক জন ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রজাবৎসল সম্রাট ছিলেন। প্রজাদের অভিযোগ নিজ কানে শোনার জন্য তিনি ৬০টি ঘণ্টাযুক্ত একটি সোনার শিকল তাঁর দরবারে ঝুলিয়ে রাখতেন। প্রজারা যাতে সুশাসন পায় সে জন্য তিনি 'দস্তরুল আমল' নামক ১২টি আইন প্রণয়ন করেছিলেন।

উসমান খানের নেতৃত্বে বাংলায় আফগানেরা বিদ্রোহ

www.pathagar.com

করলে সম্রাট জাহাঙ্গীর সুবেদার ইসলাম খানের (দ্র) সাহায্যে তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন।

মেবারের রাজা অমর সিংহ তাঁর আমলে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৬১৬ সালে জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহ্জাদা খুররম দাক্ষিণাত্যের (দ্র) বিদ্রোহ দমন করে আহমদনগর পুনরুদ্ধার করেন। পাঞ্জাবের কাংড়া বিজয় জাহাঙ্গীরের শাসনামলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শাহ্জাদা খুররমের নেতৃত্বে মোগল বাহিনী চৌদ্দ মাস অবরোধের পর কাংড়া দুর্গ অধিকার করতে সমর্থ হয়।

৪২ বছর বয়সে জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসা নামক এক পরমা সুন্দরীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর মেহেরউন্নিসার নাম হয় নূরজাহান। এই নামেই তিনি ইতিহাসে পরিচিত। রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে প্রভাবিত করতেন। নূরজাহান শাহ্জাদা খুররমকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করলে খুররম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি জাহাঙ্গীরের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে এক জন চিত্রকর ছিলেন এবং কবিতা লিখতেন। তাঁর রচিত আত্মজীবনী 'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী' তাঁর সাহিত্যকীর্তির নিদর্শন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ইংরেজ বণিকগণ ভারতে ব্যবসা–বাণিজ্যের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে ব্যবসা–বাণিজ্য ও সাহিত্য–শিল্পের প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মোগল চিত্রকলা তাঁর সময়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৫৬৮ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬২৭ কাশ্মীরে মৃত্যুবরণ করেন। লাহোরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ইরাবতী নদীর তীরে তাঁর সুদৃশ্য সমাধিসৌধ রয়েছে।

খু. জা.

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭০ সালে ঢাকার ২০ মাইল উত্তরে সাভারে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সম্পূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ১৯৬৭ সালে, পাকিস্তান আমলে। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে প্রকল্পের কাজ শুরু হয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. সুরত আলী খানের তত্ত্বাবধানে। এক অর্ডিনান্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে এবং উদ্বোধন করা হয় ১৯৭১-এর ১২ই জানুয়ারি। বর্তমানে এখানে ৩টি অনুষদ, ২০টি বিভাগ এবং ২টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। ৯টি হলে ১৯৯৬ সালে ৪,০৭৪ জন শিক্ষার্থী ছিল। শিক্ষক-সংখ্যা তখন ৩২০ জন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ১,১৫৪ জন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ 'জাকসু' নামে পরিচিতি।

মে. খা.

জাহাজ

মানুষের যাতায়াত ও পরিবহণের একটি প্রাচীনতম বাহন হল জাহাজ। অতীতে জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়েই মানুষ দূর দূর অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। জাহাজের উন্নয়নের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কয়েকটি স্তম্ভ হল : খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে মিশরীয় নাবিকদের দ্বারা পাল আবিষ্কার; খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে মিশরেই কাঠের তক্তা জুড়ে জাহাজ তৈরির উপায় উদ্ভাবন; ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ইউরোপের নাবিকদের দ্বারা জাহাজের পিছনে হাল সংযোজন; ১৪৫০ সালে ভূমধ্যসাগরীয় নাবিকদের দ্বারা বর্গাকৃতি সম্মুখপাল আর ত্রিভুজাকৃতি তেরচা পালের সমন্বয়সাধন; ১৮০৭ সালে আমেরিকার (দ্র) রবার্ট ফুলটন কর্তৃক প্রথম ব্যবসায়িকভাবে সফল বাষ্পচালিত জাহাজ প্রবর্তন; ১৮১৮ সালে প্রথম পুরাপুরি লৌহনির্মিত জাহাজ 'ভালকান' তৈরি; ১৮৩৬ সালে জাহাজ চালনার জন্য প্রথম প্রপেলার ব্যবহার; ১৮৯৭ সালে প্রথম বাষ্পীয় টার্বাইন (দ্র)-চালিত জাহাজ 'তুর্বিনিয়া' ও ১৯১০ সালে প্রথম ডিজেল ইঞ্জিনচালিত জাহাজ তৈরি এবং ১৯৫৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পরমাণুশক্তি-চালিত জাহাজ 'সাভানা' (Savannah)। জাহাজের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে আবিষ্কৃত হয়েছে নৌ চালনার নানা কৌশল, দিঙ্নির্দেশক কম্পাস (দ্র), জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অবস্থান নির্ণয় ও পথ নির্দেশনা, সমুদ্র চার্ট, রেডার (দ্র) ও বেতার সিগন্যালের মাধ্যমে পথ নির্দেশনা, বেতার যোগাযোগ ইত্যাদি।

বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিমান চলাচল ব্যবস্থা ব্যাপকতা লাভ করার আগে পর্যন্ত জাহাজ ছিল

www.pathagar.com

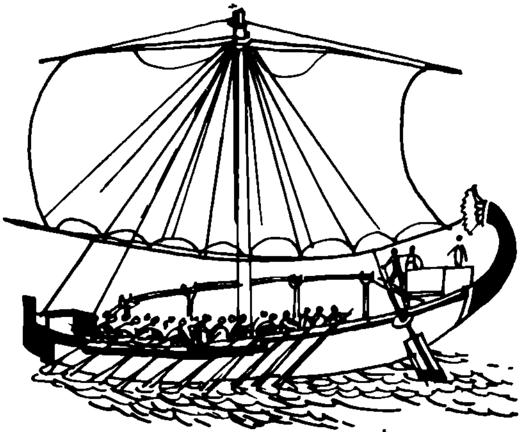

১

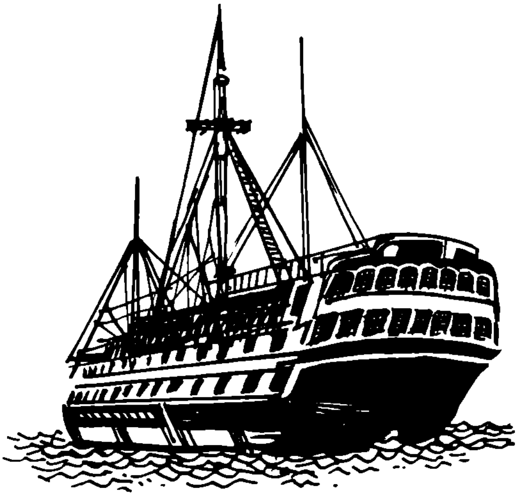

৩

২

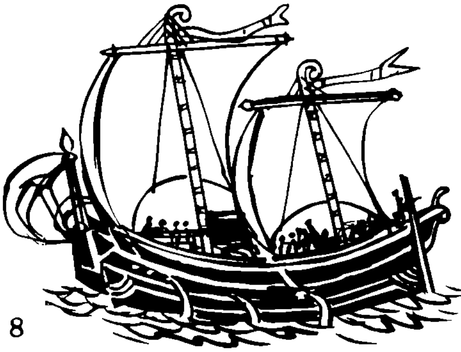

৪

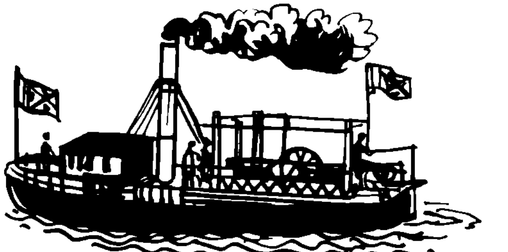

৫

১. মিশরীয় পালতোলা আদি জাহাজ ২. ভাইকিং জাহাজ ৩. মধ্যযুগের সামুদ্রিক জাহাজ ৪. ভারতের প্রাচীন জাহাজ ৫. ১৭৮৩ সালে এই নৌকায় বাষ্পীয় শক্তি প্রয়োগ করে নৌকা চালানো হয় ৬. নদীতে চলাচলের জন্য বাষ্পীয় ইঞ্জিনের যাত্রীবাহী স্টিমার, বাংলাদেশের 'গাজী' স্টিমার এই ধরনেরই জাহাজ যা প্রায় গত পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছে

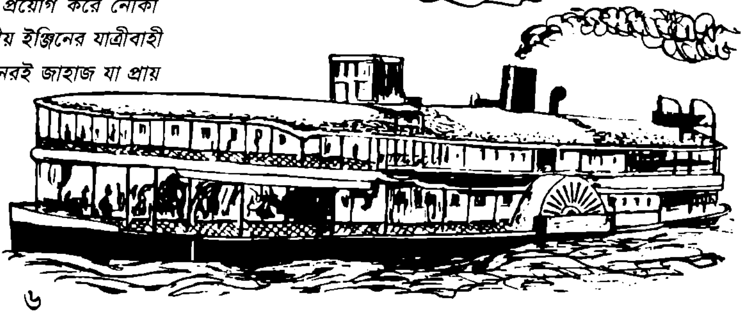

৬

www.pathagar.com

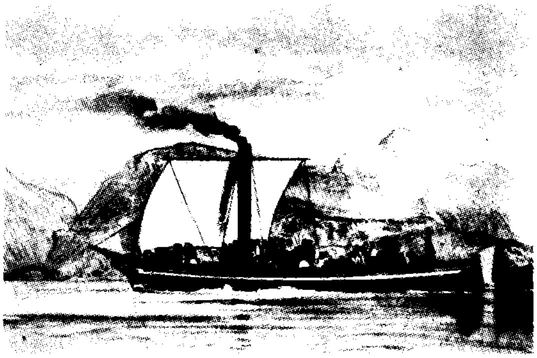

১

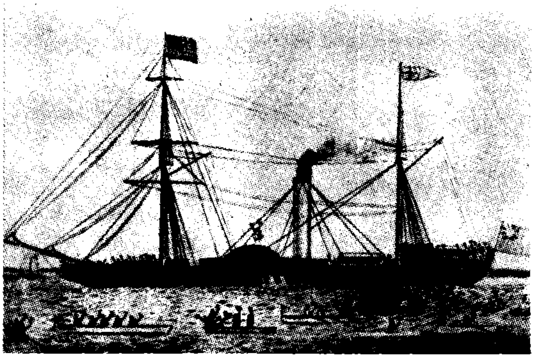

২

১. বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য সর্বপ্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ 'কমেট' (স্কটল্যাণ্ড) ২. 'সাইরিয়াস' : বাষ্পশক্তিতে চালিত হয়ে যে জাহাজ সর্বপ্রথম আটলান্টিক পাড়ি দেয় ৩. 'মোরিতানিয়া' নামে এই জাহাজ দীর্ঘ ২২ বছর ধরে আটলান্টিকে চলাচল করে। যুদ্ধের সময় ক্যামোফ্লেজ করে চলতে হয়েছে ৪. দ্বিতীয় বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজ 'কুইন মেরি' লম্বায় ১০২০ ফুট এবং জাহাজের টনেজ হচ্ছে ৮০৭৭৩

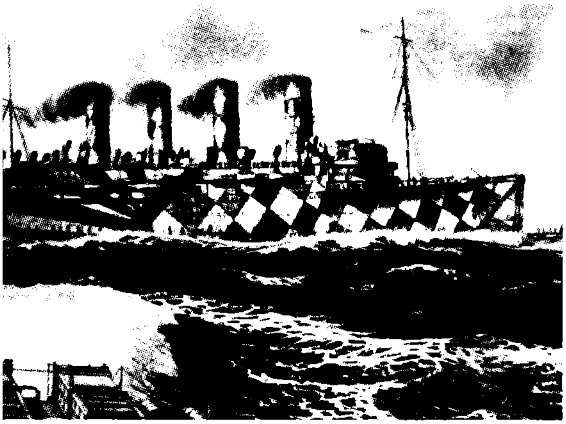

৩

৪

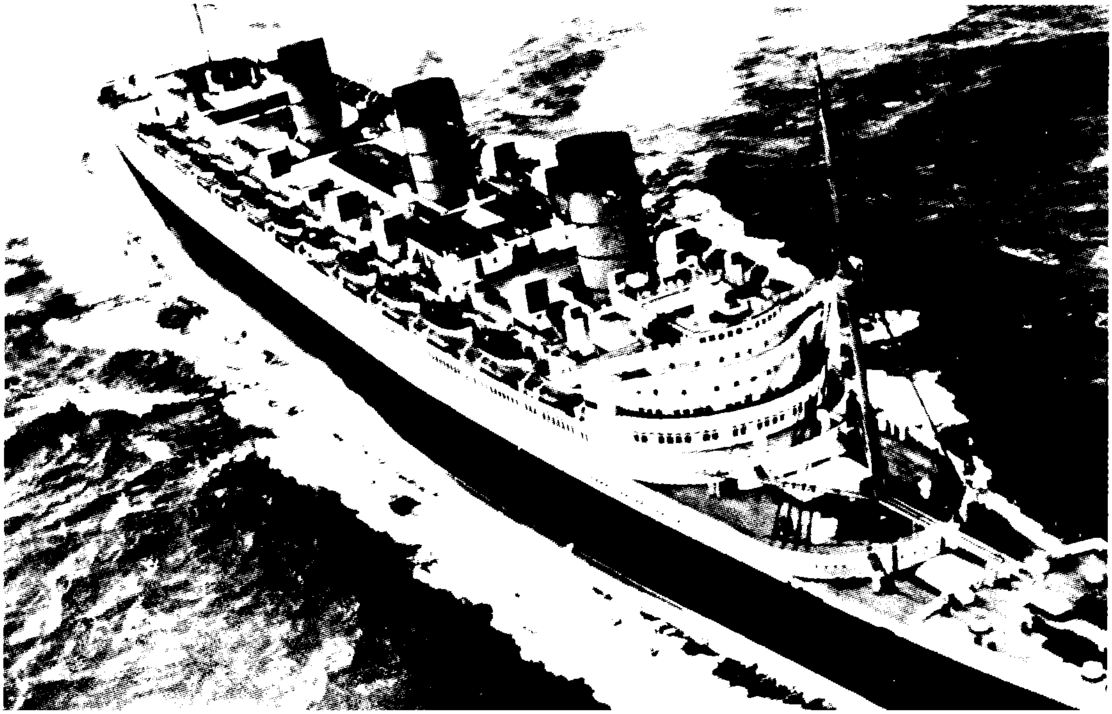

www.pathagar.com

দূরদেশে যাত্রী ও মাল পরিবহণের প্রায় একমাত্র মাধ্যম। এখন যুদ্ধজাহাজ বাদ দিলে জাহাজ হল মাল বহনের প্রধান মাধ্যম ও নিকটপাল্লায় ফেরি ইত্যাদিতে যাত্রী, গাড়ি এবং ক্ষেত্রবিশেষে ট্রেন বহনের যান। মালবাহী জাহাজ চার রকমের : সাধারণ মালবাহী, ট্যাঙ্কার, স্তূপমালবাহী ও বহুমুখী। সনাতন ধরনের সাধারণ মালবাহী জাহাজ হরেক রকমের মাল জাহাজের খোলের নানা জায়গায় রাখে। এগুলো নানা ছিদ্রপথে ঢোকানো ও বের করা হয় ক্রেনের সাহায্যে। এসব জাহাজ কমে গিয়ে এখন বাড়ছে একই কাজের জন্য কন্টেনার জাহাজ। মিটারের মাপে ৬x২·৪x২·৪ অথবা ১২x২·৪x২·৪ সাইজের ধাতুনির্মিত বাক্সকেই বলে কন্টেনার। এতে মাল আগে থেকেই ভরে রাখা হয়। কন্টেনার জাহাজ এসব বাক্সকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে রাখার একটি গুদামের মতো। এতে মাল ওঠানো-নামানো খুব সহজ। বিশালকায় সব ট্যাঙ্কার পেট্রোলিয়াম (দ্র) আনা-নেওয়ার কাজ করে। এদের খোলের প্রায় পুরোটাই বিভক্ত থাকে বিরাট বিরাট কয়েকটি ট্যাঙ্কের আকৃতিতে। স্তূপমালবাহী জাহাজে শস্য, সার (দ্র), লবণ (দ্র), চিনি (দ্র), আকরিক পাথর ইত্যাদি স্তূপ করে নেওয়ার মতো বিশাল বাক্স থাকে। আর বহুমুখী জাহাজে এই সব ব্যবস্থার সমন্বয় থাকে। তা ছাড়া বিশেষ ধরনের জাহাজও আছে, যেমন পচনশীল খাদ্য পরিবহণের জন্য দ্রুতগতির রিফ্রিজারেটর জাহাজ।

যে কোনো জাহাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো হল এর খোল, ইঞ্জিন (দ্র), প্রপেলার ও হাল। বাটির মতো আকৃতির খোলের জন্যই এত ভারি হয়েও জাহাজ ভেসে থাকে। খোলের ভেতরটা ডেক নামে পরিচিত। একের ওপর আরেক কতকগুলো পাটাতনে বিভক্ত থাকে, যার মধ্যে সবার উপরেরটি হল প্রধান ডেক। প্রধান ডেকের উপরে যা থাকে তা জাহাজের উপরিকাঠামো। খোলের ভেতরটা আবার আগাগোড়া কয়েকটি দেওয়াল দিয়ে বিভিন্ন কক্ষে বিভক্ত থাকে যাতে একটি কক্ষে পানি ঢুকলেও অন্যগুলোতে না যেতে পারে। চলার সুবিধার জন্য খোলের সম্মুখভাগ সরু এবং পশ্চাৎভাগ গোলাকার হয়। আজকাল অধিকাংশ জাহাজ বাষ্প টার্বাইন, গ্যাস টার্বাইন অথবা ডিজেল ইঞ্জিন চালিত হয়। টার্বাইনের জন্য বাষ্প বা গ্যাস তৈরি হয় পেট্রোলের (দ্র) দহনে। টার্বাইন অথবা ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে জাহাজের প্রপেলার বা স্ক্রু। তার আকার অনুসারে জাহাজের পিছনে একটি, দু'টি অথবা চারটি প্রপেলার থাকে। জাহাজের হাল হল বড় একটি ধাতব পাত, যা পিছনে খাড়াভাবে আটকানো থাকে এবং কব্জার কারণে দরজার পাল্লার মতো এপাশ এপাশ নাড়া যায়। সামনের দিকে থাকা চালনা-হুইল ঘুরিয়ে এই নাড়াচাড়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

দুনিয়ার দেশে দেশে বাণিজ্য ও সার্বিক অর্থনীতি জাহাজশিল্পের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। প্রতি বছর নতুন করে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টন মোট ওজনের জাহাজ দুনিয়ার জাহাজের বহরে যোগ হচ্ছে। এ শিল্পে অগ্রণী হচ্ছে জাপান (দ্র), জাহাজের মালিকানাতেও। তবে বন্দরে বন্দরে লাইবেরিয়া, পানামা ইত্যাদি কয়েকটি দেশের পতাকাবাহী জাহাজ বেশি দেখা যায়। এসব দেশে জাহাজ রেজিস্ট্রেশনের কিছু সুবিধা রয়েছে বলে নানা দেশের জাহাজ এদের নামেই চলে।

মু. ই.

জাহানারা ইমাম [১৯২৯—১৯৯৪]

কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও একাত্তরের ঘাতক দালাল বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী। জাহানারা ইমাম মুর্শিদাবাদ জেলার সুন্দরপুর গ্রামে ১৯২৯ সালের ৩রা মে জন্মগ্রহণ করেন।

জাহানারা ইমাম ১৯৪২ সালে পিতার কর্মস্থল রংপুর থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক, ১৯৪৫ সালে স্থানীয় কারমাইকেল কলেজ থেকে আই. এ. এবং ১৯৪৭ সালে কলিকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। পরে ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এড. এবং ১৯৬৫ সালে বাংলায় এম. এ. পাশ করেন। ১৯৬৪-৬৫ সালে ফুলব্রাইট স্কলার হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) থেকে

www.pathagar.com

শিক্ষায় সার্টিফিকেট লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুলে সহকারী শিক্ষিকা (১৯৪৮-১৯৪৯), ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা (১৯৫২-১৯৬০), বুলবুল একাডেমী কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা (১৯৬২-১৯৬৬) এবং ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রভাষকের (১৯৬৬-১৯৬৮) দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে অবৈতনিক খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবেও কাজ করেন।

একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল ও জাতীয় সমন্বয় কমিটির নেত্রী শহীদ-জননী জাহানারা ইমাম ১৯৯২ সালের ১০ই জানুয়ারি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন

গণতদন্ত কমিটির রিপোর্ট হাতে জাহানারা ইমাম ও কবি সুফিয়া কামাল : ২৬শে মার্চ ১৯৯২

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) সময় জাহানারা ইমামের জ্যেষ্ঠ সন্তান (জ. ১৯৫১) শাফী ইমাম রুমী গেরিলা তৎপরতা চালাতে গিয়ে পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগী এ দেশীয় ঘাতক দোসরদের হাতে ধরা পড়ে শহীদ হন। প্রকৌশলী স্বামী শরিফুল ইমাম আহমেদকেও পাকবাহিনীর হাতে অমানুষিকভাবে নির্যাতিত হয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দু'দিন আগে মৃত্যুবরণ করতে হয়। নিজের জীবনের এই শোকাবহ ঘটনা জাহানারা ইমামকে পরাভূত করতে পারে নি। তিনি সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন, রচনা করেন তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'একাত্তরের দিনগুলি'। তিনি ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীশক্তির উত্থান প্রতিরোধে সক্রিয় হন। একাত্তর সালের যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (দ্র) দলের আমীর নির্বাচিত করা হলে জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠনকে সংগঠিত করে এক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল ও জাতীয় সমন্বয় কমিটি'। তিনি এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালের ২৬শে মার্চ তাঁর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে (দ্র) এক গণ-আদালত গঠন করা হয় এবং পাঁচ লক্ষাধিক জনতার আদালতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের দশটি অভিযোগ এনে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করা হয়। এর ফলে তৎকালীন সরকার তিনিসহ সংশ্লিষ্ট ২৪ জন বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে। তাঁর এই আপসহীন ভূমিকার জন্য তিনি 'শহীদ জননী'র মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

www.pathagar.com

জাহানারা ইমাম দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক হাসপাতালে ১৯৯৪ সালের ২৬শে জুন মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৮৮ সালে যথাক্রমে 'বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পুরস্কার' ও 'কমর মুশতরী সাহিত্য পুরস্কার' এবং ১৯৯১ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

জাহানারা ইমামের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-কর্ম—যৌথভাবে সম্পাদনা : 'বাংলা উচ্চারণ অভিধান' (১৩৭৫); অনুবাদ : 'জাগ্রত ধরিত্রী' (১৯৬৮), 'তেপান্তরের ছোট্ট শহর' (১৯৭১), 'নদীর তীরে ফুলের মেলা' (১৯৬৬); মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ও অন্যান্য রচনা : 'An Introduction to Bengali Language and Literature' (Part-1) (১৯৮৩), 'বীরশ্রেষ্ঠ' (১৯৮৫) 'অন্য জীবন' (১৯৮৫), 'শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি' (১৯৮৯), 'একাত্তরের দিনগুলি' (১৯৮৬), 'দুই মেরু' (১৯৯০), 'নিঃসঙ্গ পাইন' (১৯৯০), 'নাটকের অবসানে' (১৯৯০), 'ক্যান্সারের সাথে বসবাস' (১৯৯১), 'নয় এ মধুর খেলা' (১৯৯০), 'জীবন মৃত্যু' (১৯৯২), 'প্রবাসের দিনলিপি' (১৯৯২); শিশুসাহিত্য : 'গজকচ্ছপ' (১৯৬৭), 'সাতটি তারার ঝিকিমিকি' (১৯৭৩), 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি' (১৯৮৯)।

আ. হু.

জাহেদুর রহিম [১৯৩৫—১৯৭৮]

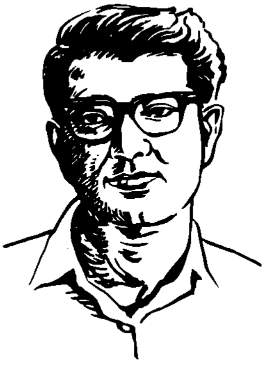

প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত (দ্র) শিল্পী। বগুড়ায় জন্ম। পিতা আবদুর রহিম। আদি বাড়ি পাবনায়।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করেন ঢাকার বুলবুল একাডেমীতে। আতিকুল ইসলামের (দ্র) কাছে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার সূচনা। উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী এই শিল্পী অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল সুখ্যাতি লাভ করেন। পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করার চেষ্টা চললে যে কয় জন শিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীতের পক্ষে নির্ভয়ে এগিয়ে আসেন জাহেদুর রহিম তাঁদের অন্যতম। সে সময় 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে তিনি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন। জাহেদুর রহিম ঢাকার শীর্ষ-স্থানীয় সঙ্গীতপ্রতিষ্ঠান 'ছায়ানটে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য তিনি কয়েক বার বিদেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত-রেকর্ড প্রকাশিত হয়। কণ্ঠশিল্পী ও সংস্কৃতিসংগ্রামী হিসাবে জাহেদুর রহিম স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ক. গো.

জি. সি. দেব গোবিন্দচন্দ্র দেব দ্র

জিদ্, অঁদ্রে [১৮৬৯—১৯৫১]

অঁদ্রে জিদ্ (André Gide)-এর পুরো নাম অঁদ্রে পল্ গিওম্ (Guillaume) জিদ্। জন্ম প্যারিসে, ১৮৬৯ সালের ২২শে নভেম্বর। তাঁর পিতা ছিলেন সর্বোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক। জিদ্-এর যখন ১১ বছর বয়স, তখন তিনি মারা যান। ফলে তাঁকে, বলতে গেলে, নিঃসঙ্গ অবস্থায় মানুষ হতে হয়। প্যারিসের এক প্রোটেস্টান্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শেষে তিনি আত্মনিয়োগ করেন সাহিত্য ও সঙ্গীতসাধনায়।

প্রবন্ধকার হিসাবেই জিদ্ তাঁর সাহিত্যিকজীবনের সূচনা করেন। পরে লিখতে শুরু করেন কবিতা, জীবনী, গল্প—উপন্যাস, সমালোচনা ও স্মৃতিকথা; এবং অনুবাদক হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

১৯১৭ সাল নাগাদ অঁদ্রে জিদ্ ফরাসি তরুণদের কাছে এক জন মহাপুরুষের মতোই নমস্য হয়ে ওঠেন। তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি সীমাহীন বিতর্ক এবং আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে।

১৯৪৭ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন এবং ১৯৪৮ সালে তাঁকে দেওয়া হয় এক জন 'সম্মানিত বিদেশী' হিসাবে অক্সফোর্ডের সম্মানসূচক ডিগ্রি। তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন ফরাসি ভাষায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'গীতাঞ্জলি'র (দ্র) অনুবাদক হিসাবেও।

প্রত্যেকটি ব্যক্তিস্বরূপই একক ও অনন্য। বাইরে থেকে চাপানো কোনো নিয়ম মানলেই ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়—এই ছিল জিদ্-এর সাহিত্যিক

www.pathagar.com

জীবনদর্শন।

তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'লিমরালিস্ত্' (অনৈতিকতাবাদী), 'লা পোর্ৎ এত্রোয়াৎ' (সঙ্কীর্ণ দরজা), 'লে কাভ্ দু ভাতিকাঁ' (ভাটিকানের গুহা), 'লে ফো-মনাইয়্যুর্' (জালিয়াত)। এ ছাড়া রয়েছে তাঁর চার খণ্ডবিশিষ্ট আত্মজীবনীমূলক রচনা 'জুর্নাল্' (জার্নাল); অনেকের মতে এটি তাঁর সর্বোত্তম সাহিত্যকীর্তি। অঁদ্রে জিদ মৃত্যুবরণ করেন ১৯৫১ সালে, প্যারিসেই।

আ. হু.

জিন্নাহ্, মুহম্মদ আলী [১৮৭৬—১৯৪৮]

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তানের (দ্র) প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৬ সালে করাচিতে জন্মগ্রহণ করেন। ষোল বছর বয়সে খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে পাঠ শেষ করে বিলাত যান। লণ্ডনের (দ্র) লিঙ্কন্স-ইন থেকে ব্যারিস্টারি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে বোম্বাই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। বিলাতে থাকাকালে তিনি ভারতীয়

কংগ্রেসের (দ্র) বিশিষ্ট নেতা দাদাভাই নওরোজির (দ্র) রাজনৈতিক সচিব হিসাবে কাজ করেন। তখন ভারতের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর রাজনীতির লক্ষ্য। প্রথম জীবনে তিনি উদারমনা রাজনীতিক হিসাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য কাজ করেন।

১৯১২ সালে তিনি সর্বপ্রথম মুসলিম লীগের (দ্র) অধিবেশনে যোগ দেন। ১৯২০ সাল থেকে দীর্ঘদিন মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৮ সালে 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগে'র অধিবেশনে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা ও আইনসভায় আসন সংরক্ষণ এবং অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনসহ মুসলমান সমাজের স্বার্থে চৌদ্দ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে তাঁর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। লাহোর প্রস্তাবের (দ্র) মূল দাবি ছিল হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি—এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতে (দ্র) মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জিন্নাহ্ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন।

১৯৪৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি করাচিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে কর্মতৎপরতা ও নিষ্ঠার জন্য মহাত্মা গান্ধী (দ্র) তাঁকে 'কায়েদ-ই-আজম' অর্থাৎ মহান নেতা উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। পাকিস্তানে এই নামেই তাঁর সর্বজনীন পরিচিতি।

সুজ. ব.

জিপ (jeep)

ইংরেজি jeep শব্দ বা বস্তু আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। বাংলায় একে আমরা জিপ/জীপ অথবা জিপগাড়ি/জীপগাড়ি বলি বা লিখি। চার চাকার ছোট্ট, ছাদ-খোলা, শক্তসমর্থ এই যানবাহনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (দ্র) সর্বপ্রথম মার্কিন সেনাবাহিনী ব্যবহার করেছিল। এর নাম ছিল General Purpose Vehicle অর্থাৎ সব রকম কাজের উপযোগী গাড়ি। General Purpose শব্দ দুটোর প্রথম অক্ষর G ও P মিলিয়ে শব্দটি প্রথমে লোকের মুখে মুখে জিপ্ হয়েছে, পরে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখতে গিয়ে Jeep লেখা চালু হয়েছে।

১৯৪১ সালে জিপ সর্বপ্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত এই গাড়িটির নানা রকম উন্নতি সাধন করা হয়েছে আকারে, আয়তনে, শক্তিতে, কর্মক্ষমতায়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই জিপ তার General Purpose-এর চরিত্র হারায় নি।

হা. মা.

জিপ্সাম্ (gypsum)

অধাতব খনিজ পদার্থ। রাসায়নিক নাম আর্দ্র ক্যালসিয়াম সালফেট ($CaSO_4 . 2H_2O$)। সাধারণত জিপ্সাম্ দেখতে প্রিজ্মাকৃতি, বক্রতল অথবা মোচড়ানো একাক্ষি কেলাস-বিশিষ্ট কাচের মতো চকচকে পদার্থ। বিভিন্ন ধরনের জিপ্সামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সিলিনাইট (selenite), অ্যালবাস্টার (alabaster), স্যাটিন স্পার (satin spar)। সিলিনাইট স্বচ্ছকেলাস, বর্ণহীন। অ্যালাবাস্টার প্রায় স্বচ্ছ, মসৃণ, দানাদার ঈষৎ রঙিন আভাযুক্ত। স্যাটিন স্পার মুক্তার

www.pathagar.com

মতো দেখতে, সামান্য আঁশযুক্ত। জিপ্সামের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৩, অত্যন্ত নরম। প্রকৃতিতে হেলাইট ও অন্যান্য খনিজের মধ্যে, চুনাপাথরের (দ্র) মধ্যে পানিতে সামান্য পরিমাণ জিপ্সাম্ বিদ্যমান। যে কোনো পানি সম্পূর্ণরূপে বাষ্পে পরিণত করলে পাত্রের তলায় যে সাদা গুঁড়ো পাওয়া যায় তা জিপ্সাম্।

জিপ্সাম্‌কে উত্তপ্ত করলে এর তিন-চতুর্থাংশ পানি (দ্র) উড়ে যায় এবং সাদা মসৃণ পাউডারে পরিণত হয়। একে বলা হয় প্লাস্টার-অব-প্যারিস। প্লাস্টার-অব-প্যারিসের সঙ্গে পানি মিশালে বাতাসে (দ্র) দ্রুত জমাট বাঁধে। অধিক তাপে জিপ্সামের সব পানি উড়ে যায়। এভাবে প্রাপ্ত প্লাস্টার ইমারত ও সিমেন্ট (দ্র) প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া জিপ্সাম্ ক্যাল্সিয়াম্ (দ্র) সার (দ্র) হিসাবে, গহনার পাথর হিসাবে এবং আলোকযন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

স. রা.

জিমন্যাস্টিক্স (gymnastics)

জিমন্যাস্টিক্স অতীতের গ্রিক ও রোমানদের নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গেছে। অতীত যুগে গ্রিস ও রোমে জিমন্যাস্টিক্স প্রতিটি স্কুলের ছাত্রের জন্য শিক্ষার অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে ধরা হত। ১৮০০ শতকে জার্মানি ও সুইডেন এই খেলায় আধুনিকতা আনয়ন করে। ১৮৯৬ সালে জিমন্যাস্টিক্স আধুনিক অলিম্পিক গেম্সের (দ্র) বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরবর্তী সবগুলি অলিম্পিকেই এটা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৭৪ সালে এটা এশিয়ান গেম্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। জিমন্যাস্টিক্সে পুরুষদের আটটি ও মহিলাদের ছয়টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে ছেলেদের ছয়টি ও মেয়েদের চারটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। পুরুষদের প্রতিযোগিতা : ১. দলগত প্রতিযোগিতা, ২. কম্বাইণ্ড এক্সারসাইজসমূহ (ব্যক্তিগত), ৩. ফ্লোর বা ম্যাট, ৪. সাইড হর্স্, ৫. রিংস, ৬. লং হর্স্ (হর্স্ ভল্ট), ৭. প্যারালেল বার্স্, ৮. হরাইজোন্টাল বার। মহিলাদের প্রতিযোগিতা হচ্ছে : ১. দলগত প্রতিযোগিতা, ২. কম্বাইণ্ড এক্সারসাইজসমূহ (ব্যক্তিগত), ৩. হর্স্ ভল্ট (লং হর্স্), ৪. অসম প্যারালেল বার্স্, ৫. ব্যালেন্স বীম, ৬. ফ্লোর বা ম্যাট।

দলগতভাবে প্রতি দলে ছয় জন করে প্রতিযোগী থাকে। প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে চীন (দ্র), জাপান (দ্র) ও দক্ষিণ কোরিয়া জিমন্যাস্টিক্সে উন্নত। বিশ্বে রাশিয়া (দ্র), জাপান, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া (দ্র), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) ইত্যাদি দেশ এই খেলায় উন্নত। চীন উন্নত বলে সর্বজনস্বীকৃত। বাংলাদেশ (দ্র) জিমন্যাস্টিক্সে এখনো অপরিণত অবস্থায় আছে। ১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস্ ফেডারেশনের অধীনে প্রতি বছর জাতীয় প্রতিযোগিতা ও জাতীয় জুনিয়র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলাটি খুব চিত্তাকর্ষক হলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি।

কা. আ. আ.

জিমন্যাস্টিক্সের ৩টি চমকপ্রদ শৈলী

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান, শহীদ রাষ্ট্রপতি [১৯৩৬—১৯৮১]

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা এবং বাংলাদেশের (দ্র) অন্যতম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৩৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি, বগুড়া জেলার বাগবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মনসুর রহমান এবং মায়ের নাম জাহানারা খাতুন। তাঁর ডাক নাম ছিল কমল।

১৯৫২ সালে করাচির একাডেমী স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করার পর জিয়াউর রহমান ভর্তি হন সেখানকার ডি.জি. কলেজে। ১৯৫৩ সালে তিনি যোগ দেন তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে। সেনাবাহিনীর কমিশন লাভ করেন ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯৬৩ সালে তিনি পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে কাজের দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৬৫ সালে সংঘটিত পাক–ভারত যুদ্ধে (দ্র) তিনি তৎকালীন পশ্চিম-পাকিস্তানের খেম্‌কারান সেক্টরে 'আলফা কোম্পানি'র একটি ব্যাটেলিয়ানের কমাণ্ডার হিসাবে ভারতের (দ্র) বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেন। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি কাকুলে অবস্থিত পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে প্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৬৬) তিনি উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সাবেক পশ্চিম জার্মানি যান।

১৯৬৯ সালে জিয়াউর রহমান ঢাকার (দ্র) জয়দেবপুরে অবস্থিত ইস্ট্ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ডের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে চট্টগ্রামে (দ্র) বদলি করা হয় ইস্ট্ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ানের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড করে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনী বাঙালি (দ্র) হত্যা শুরু করলে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে তাঁর অধীনস্থ বাঙালি সেনাসদস্যদের নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে ২৭শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই বেতারঘোষণা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (দ্র) সংগঠনে তীব্র গতি সঞ্চার করে। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও জনগণের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন। ১৯৭১ সালের জুন মাসে ছাত্র-জনতা, বি ডি আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহযোগে গঠিত মুক্তিবাহিনীর 'জেড ফোর্সের' তিনি অধিনায়ক হন। জুলাই মাসে তাঁর নেতৃত্বে রংপুরের রৌমারীতে এই বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করা হয়। ডিসেম্বর মাসে (১৯৭১) তাঁর বাহিনী নিয়ে তিনি সিলেটে (দ্র) অভিযান পরিচালনা করেন এবং ১৪ই ডিসেম্বর সিলেট মুক্ত করেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'বীরউত্তম' (দ্র) খেতাবে ভূষিত করেন। ১৯৭২ সালে তিনি কর্নেল হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ব্রিগেড কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। একই বছরের (১৯৭২) জুন মাসে তিনি সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (দ্র) নিহত হওয়ার ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক সঙ্কটের সময় জিয়াউর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এ বছরের (১৯৭৫) ৭ই নভেম্বর সিপাহী-জনতার এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে এবং তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্টাফপ্রধানের পাশাপাশি উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালের ৯ই আগস্ট তিনি কলম্বোতে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ১৯৭৬ সালের ৭ই অক্টোবর বাংলাদেশ ৭৭ জাতি গ্রুপের 'চেয়ারম্যানে'র পদ লাভ করে।

১৯৭৬ সালের ১লা নভেম্বর তিনি খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির অধীনে উলসী-যদুনাথপুরের বেতনা নদীতে স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক খাল খনন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯শে নভেম্বর তিনি প্রধান সামরিক

www.pathagar.com

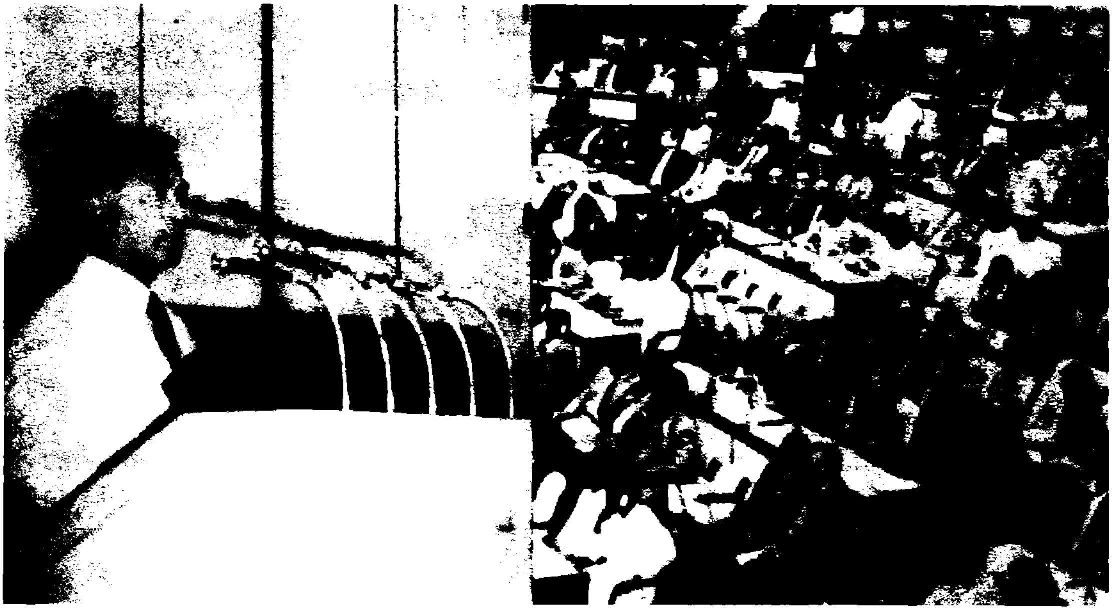

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান—হাভানার জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছেন : ১৯৭৯

আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণের পর তাঁর উনিশ দফা (দ্র) কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ১৯৭৭ সালের ৩রা জুন তারিখে তিনি গণভোটের মাধ্যমে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৭৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তিনি দেশে 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল' সংক্ষেপে 'জাগদল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৭৮ সালের ১লা মে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং এর চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ১৯৭৮ সালে উল্লিখিত ফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তিনি 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' সংক্ষেপে বি এন পি (অর্থাৎ Bangladesh Nationalist Party) গঠন করেন।

জিয়াউর রহমানই প্রথম 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের' ধারণার প্রবর্তন করেন। তাঁর আমলে শিশুদের কল্যাণে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (দ্র) ও শিশু পার্ক (দ্র) স্থাপন করা হয়। এবং শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন (দ্র) আয়োজিত নতুন কুঁড়ি প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হয়।

জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে "বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম" সংযোজন-সহ আরো কিছু পরিবর্তন করেন।

১৯৭৮ সালের ২২শে নভেম্বর তিনি যুগোশ্লাভিয়া সফর করেন এবং সে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব 'বিগ স্টার' উপাধি ও নাগরিকত্ব লাভ করেন।

১৯৮১ সালের ৩০শে মে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে নিহত হন। ঢাকায় শেরে বাংলা নগরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আ. হু.

www.pathagar.com

জিরা

বর্ষজীবী ছোট গুল্ম, ২-৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়, পাতা ছোট ছোট বহু শাখাবিশিষ্ট বা সরু কাঠির মতো দেখতে। এর আদি নিবাস মিশর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। বর্তমানে এই উপমহাদেশেও প্রচুর উৎপন্ন হয়।

আশ্বিন-কার্তিক মাসে জমিতে জিরা বীজ ফেলে চাষ করা হয়, ফুল ও ফল শীতের শেষে হয়। বোটানিক্যাল নাম *Cuminum cyminum* Linn., ফ্যামিলি Umbellerae। জীরক > জীরা > জিরা। এর অর্থ জীর্ণ হওয়া এবং নিজেও জীর্ণ হয়। এটি মসলা হিসাবে আমাদের খাদ্যে ব্যবহৃত হয়।

এর সুগন্ধি বীজ তরকারি, মাছ-মাংস, স্যুপ, রুটি, পিঠে, নাড়ু ও পনিরে ব্যবহৃত হয়। এর তেল মদ্যে লাগে।

আমাদের দেশে দু'রকমের জিরার হদিস পাওয়া যায়।

১. সংস্কৃতে কৃষ্ণজীরক বা সুশভী নামে জিরাকে হিন্দিতে সিয়া জিরা এবং বাংলায় সা-জিরা বলে। এর বোটানিক্যাল নাম *Carum carvi* Linn., ফ্যামিলি Umbelliferae।

২. একে বাংলায় কালো জিরা বলে। বোটানিক্যাল নাম *Nigella satva* Linn., ফ্যামিলি Ranunculaceae। এই কালো জিরা ও সংস্কৃত কৃষ্ণ জীরক এক নয়। বর্তমান কালো জিরাটি কিছুকাল আগে দক্ষিণ ইউরোপ থেকে এসেছে। আমাদের দেশের চাহিদা মতো জিরা উৎপন্ন হয় না, ফলে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

জিরাকে অগ্নিমান্দ্যে, অর্শে, স্বরভঙ্গে, গ্রহণী রোগে, কৃমির উপদ্রবে কবিরাজরা ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করেন। বিছায় হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দিলে ওই জায়গায় জিরা বেটে চেপে বসিয়ে দিলে জ্বালা কমে যায়।

বি. ব.

জিরাফ (giraffe)

পৃথিবীর (দ্র) জীবন্ত সকল প্রাণীর মধ্যে জিরাফ সবচেয়ে উঁচু। এ প্রাণী আর্টিওড্যাক্টিলা ক্যামেলোপার্ডালিস (Artiodactyla Camelopardalis) বর্গের গ্রাফিডি (Grafidae) গোত্রভুক্ত। এর উপগোত্র দু'টি :জ্রিয়াফিনি (Griaffinae) এবং ওকাপিনি (Okapiinae)। স্টেপি জিরাফ (Steppe giraffe) *জ্রিয়াফিনি* গোত্রভুক্ত এবং বনজিরাফ বা ওকাপিস *ওকাপিনি* উপগোত্রভুক্ত। স্টেপি জিরাফ সাহারা (দ্র) মরুভূমির দক্ষিণে আফ্রিকায় পাওয়া যায়।

প্রাচীন মিশরীয়দের ভুল ধারণা ছিল যে উট ও চিতাবাঘের যৌথ সন্তান হচ্ছে জিরাফ। সাধারণ জিরাফের বৈজ্ঞানিক নাম *জিরাফা ক্যামেলোপার্ডালিস (Giraffa camelopardalis)*-এ উক্ত ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়। পুরুষ জিরাফের উচ্চতা সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় মিটার এবং স্ত্রী জিরাফের উচ্চতা সাড়ে চার থেকে পাঁচ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের সামনের পা দু'টি পিছনের পায়ের চেয়ে লম্বা–এ কারণে এদের গলা সোজা উপরের দিকে উঠে যায়। এদের দেহের ওজন ১৪০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের গায়ে ছোট ছোট দাগ দেখা যায়।

শোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ানো বেশ কষ্টদায়ক বলে এরা সাধারণত দাঁড়িয়েই ঘুমায়। দীর্ঘ ঘাড় থেকে মগজ পর্যন্ত রক্ত (দ্র) সঞ্চালনের প্রয়োজনে এদের হৃৎপিণ্ড প্রকাণ্ড আকারের হয়ে থাকে। এদের অধিক উচ্চতার বড় সুবিধা এই যে গাছের উঁচু ডালের পাতা খাওয়ার জন্য এদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

মু. আ.

জিলানী, আবদুল কাদির আবদুল কাদির জিলানী দ্র

জিলেটিন (gelatin)

প্রাচীন চামড়া, টেণ্ডন, হাড় ইত্যাদির অন্যতম প্রধান উপাদান কোলাজেন (collagen) থেকে পাওয়া প্রোটিন- বিশেষ। এটা অনেক অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমার (দ্র)। চামড়া কিংবা হাড়ের সঙ্গে চুন (দ্র) কিংবা অ্যাসিড (দ্র) মিশিয়ে তাকে ফুটিয়ে ছেঁকে দূর করা হয়; এর পর শুকিয়ে গুঁড়ো করে জিলেটিন বানানো হয়। জিলেটিন স্বচ্ছ, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গুঁড়ো। এরা গরম পানিতে গলে যায়।

www.pathagar.com

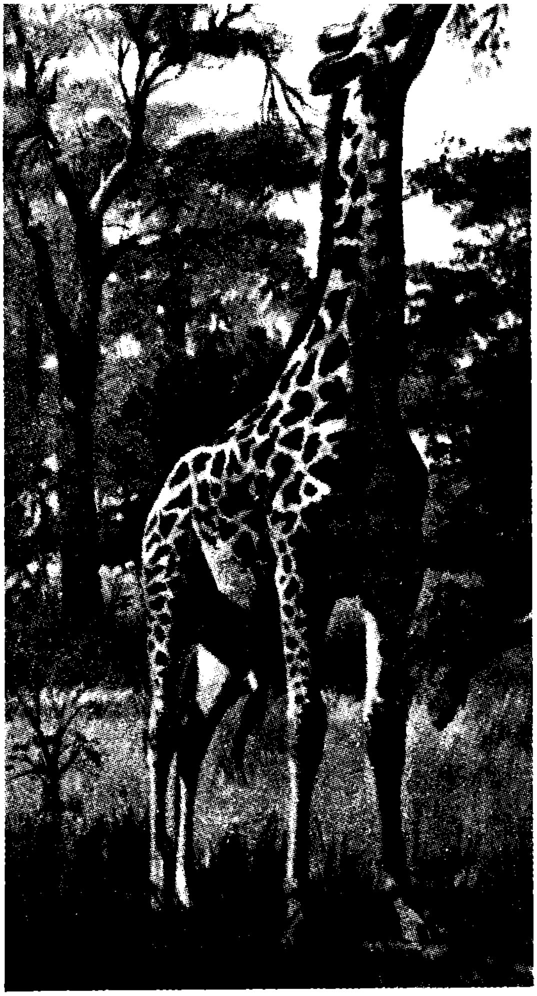

জিরাফ জীবন্ত জীবজন্তুর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু প্রাণী

জিলেটিন একটি অসম্পূর্ণ প্রোটিন। কারণ এতে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড (essential amino acid) ট্রিপটোফান (tryptophan) থাকে না। কিন্তু গম, বার্লি কিংবা ওট (oat)-এর সঙ্গে মেশালে এরা পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। এরা সাধারণত কোনো এলার্জি (দ্র) সৃষ্টি করে না।

জেলি, ক্যাণ্ডি, আইসক্রিম (দ্র) ইত্যাদি তৈরির জন্য জিলেটিন ব্যবহার করা হয়। ফটোগ্রাফির (দ্র) কাজে প্রচুর জিলেটিন ব্যবহার করা হয়। ফটোর ফিল্ম (দ্র) এবং কাগজের (দ্র) এটি একটি মূল উপাদান। সার (দ্র) এবং প্রাণীর খাবার হিসাবেও জিলেটিন ব্যবহৃত হয়। ক্যাপসুল, ট্যাবলেটের আবরণী, ইমালসন (emulsion) ইত্যাদি তৈরি করার জন্য ঔষধশিল্পে জিলেটিন ব্যবহার করা হয়। প্রসাধনী এবং প্লাস্টিক (দ্র)-সামগ্রী প্রস্তুত করার জন্যও এর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে।

সা. এ.

জিহ্বা

জিহ্বা নরম মাংসপেশি দিয়ে তৈরি, পরিপাকতন্ত্রের (দ্র) একটি অঙ্গ। জিহ্বা মুখগহ্বরে অবস্থিত। জিহ্বার প্রধান কাজ চর্বণ, গলাধঃকরণ, স্বাদগ্রহণ, শ্লেষ্মা ও তরল নিঃসরণ এবং কথা বলায় সাহায্য করা।

জিহ্বার উপরের অংশ সাধারণত গোলাপি থাকে। মুখগহ্বরের নিঃসরণ জিহ্বা ভেজা রাখতে সাহায্য করে। জিহ্বার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের স্বাদ (যেমন—মিষ্টি, টক, নোনতা, তেতো ইত্যাদি) গ্রহণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোষ (দ্র) রয়েছে। জিহ্বার মূল পিছনের দু'টি অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এর অগ্রভাগ মুক্ত থাকে। জিহ্বা খুবই চলনশীল অঙ্গ।

জিহ্বা অপরিষ্কার রাখলে ছত্রাক সংক্রমণ এবং ক্ষত দেখা দিতে পারে। দেহে লৌহের অভাবজনিত রক্তাল্পতা, পুষ্টির অভাব, সংক্রমণজনিত প্রদাহ (দ্র) ইত্যাদি কারণে জিহ্বার রোগ দেখা দেয়। জিহ্বা চারটি কেন্দ্রীয় স্নায়ু—ফেসিয়াল, গ্লোসোফেরিন্জিয়াল, ট্রাইজেমিনাল ও হাইপোগ্লোসাল থেকে প্রচুর স্নায়ু সরবরাহ পেয়ে থাকে এবং এদের মাধ্যমে স্বাদ, তাপ, শৈত্য, ব্যথা, চাপ ইত্যাদি অনুভূতি গ্রহণ এবং সঞ্চরণশীলতা সম্পন্ন করে থাকে।

আ. আ. হা.

জীন (gene)

জীবকোষের ক্রোমোজোমে (দ্র) অবস্থিত বংশগত বৈশিষ্ট্যের একক (unit)-গুলোর নাম জীন। জীন ক্রোমোজোমে সারিবদ্ধভাবে সুনির্দিষ্ট অবস্থানে বিন্যস্ত থাকে। তা জীব-দেহস্থ প্রোটিনের গঠনও নিয়ন্ত্রণ করে। গঠনগত দিক থেকে জীন ডিএনএ (DNA=deoxyribonucleic acid, ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড) অণুর অংশবিশেষ।

ভৌত-রাসায়নিক বা অন্য কোনো কারণের প্রভাবে জীনের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং এর ফলে উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের বৈশিষ্ট্যগত যে পরিবর্তন দেখা দেয়,

www.pathagar.com

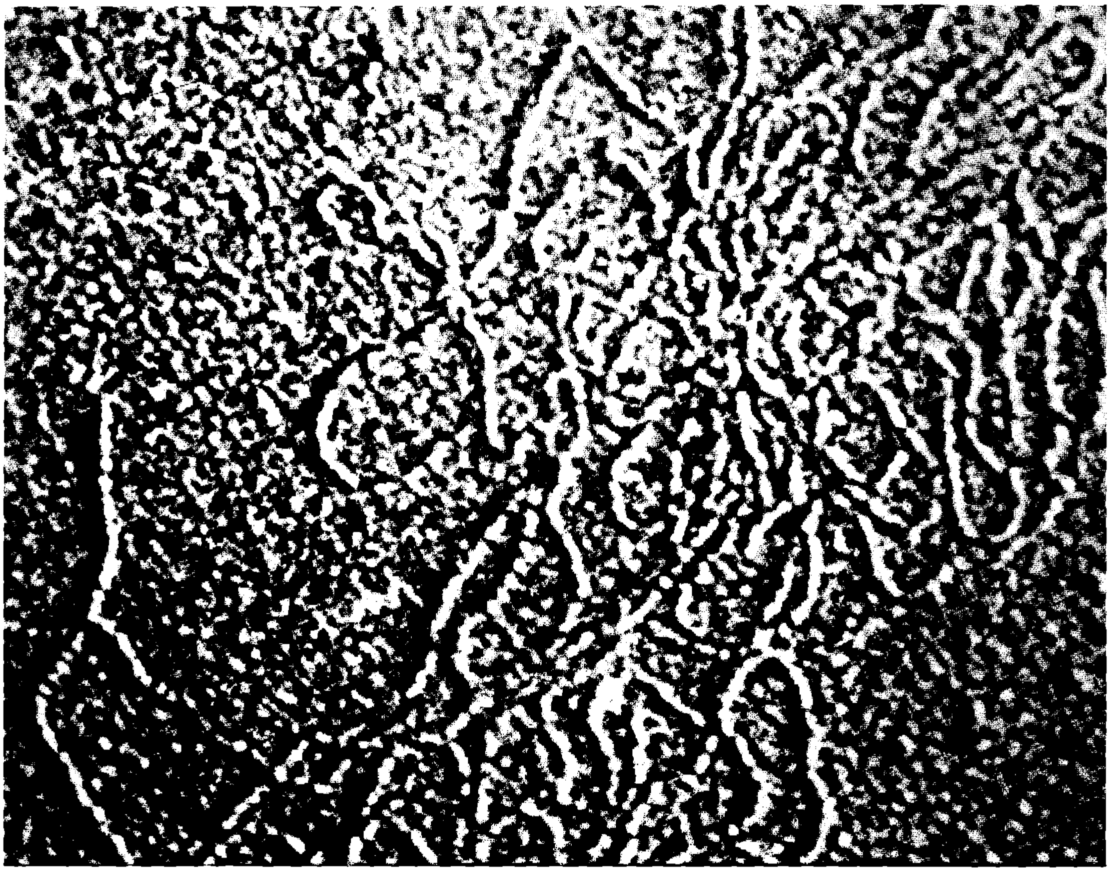

শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের নিচে ডি এন এ অণুর ছবি

তাকে বলে পরিব্যক্তি ('মিউটেশান', mutation)। পরিব্যক্তি প্রজাতির পরিবর্তনের একটি কারণ।

জীনের কার্যকলাপ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক গবেষণার ফলে জীনতত্ত্ব ('জেনেটিক্স', genetics)-এর উদ্ভব। গত দুই দশকে জীন পুনর্গঠন ও জীন পুনর্বিন্যাস নিয়ে গবেষণায় যে উচ্চতর প্রযুক্তির প্রকাশ ঘটেছে, তার নাম 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং' (genetic engineering)। এই পথে জীনত্রুটিজনিত রোগের প্রতিকার এবং জীন পরিবর্তনের চেষ্টাও চলছে। রোগজীবাণুর জীন বর্তমান গবেষণার প্রধান মাধ্যম।

আ. র.

জীব/জীবজগৎ

আমাদের পরিবেশে যা-কিছু আছে তার মধ্যে যেগুলোর জীবন আছে সেগুলো জীব। আকার-আকৃতি এবং বিবিধ বৈশিষ্ট্যে জীব বড় বিচিত্র। কোনো কোনো জীব এক-কোষী, যেমন অ্যামিবা। এরা এতই ছোট যে খালিচোখে এদের দেখা যায় না। অনেক জীবদেহ বহু কোটি জীবকোষ দিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে কোনো কোনোটি এতই বিশালাকার যে সেগুলো দেখে অবাক হতে হয়, যেমন—হাতি (দ্র), জিরাফ (দ্র), তিমি (দ্র), বট (দ্র) গাছ, সেকোইয়া গাছ ইত্যাদি।

জটিল সংগঠন, আন্তরসাম্য রক্ষণ (homeostasis), বৃদ্ধি, জনন ও অভিযোজন জীবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। জীবদেহে সঞ্চিত শক্তি ফুরিয়ে গেলে জীবনের লক্ষণগুলো স্তিমিত হয়ে আসে এবং ক্রমে জীবের মৃত্যু ঘটে। চলাফেরা জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খাদ্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষার জন্য কোনো কোনো প্রাণী উড়ে বেড়ায়, কোনো কোনো প্রাণী সাঁতার কাটে, কোনো কোনো প্রাণী আবার ধীরে বা জোরে

www.pathagar.com

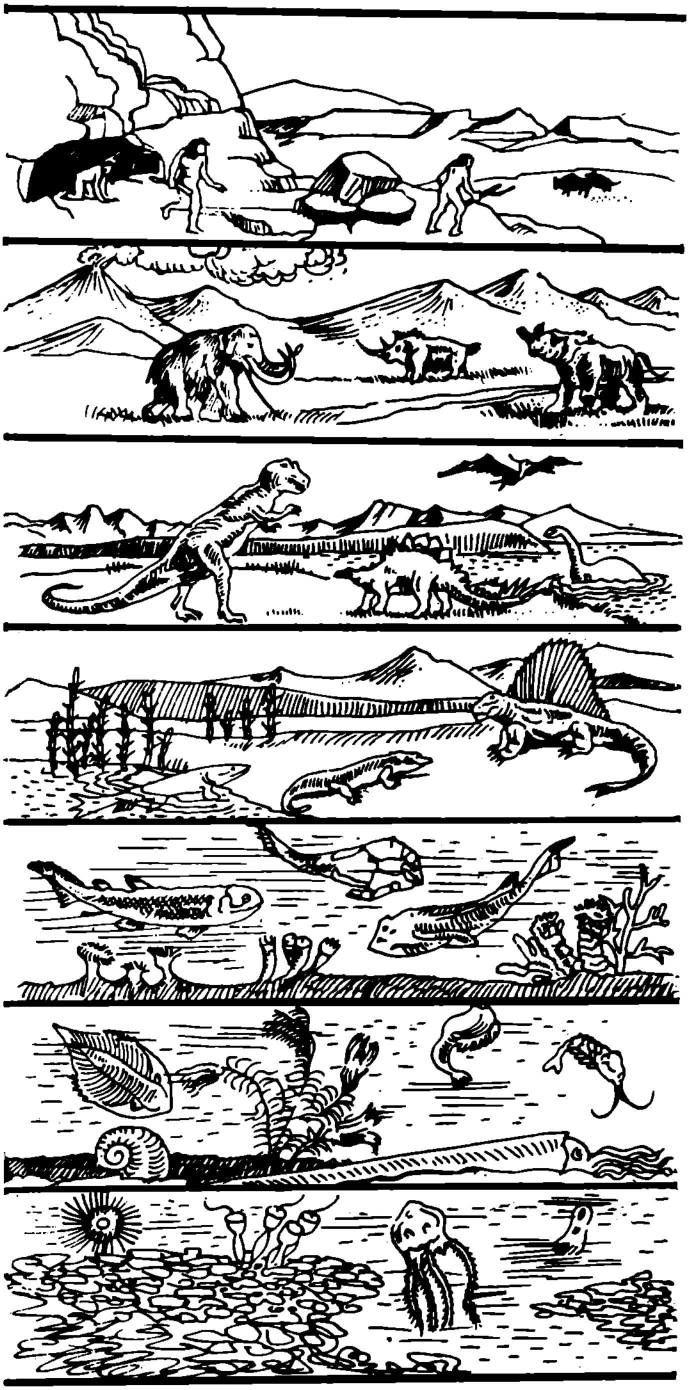

মানুষের যুগ

১০ লক্ষ বছর আগে :
প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু এ সময়ে মারা যায়। মানুষ যাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তারা বেঁচে থাকে।

স্তন্যপায়ীদের যুগ

৭ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে :
স্তন্যপায়ীরা ছিল তখন পৃথিবীর বাসিন্দা। বিভিন্ন জাতের পাখি এ সময়ে দেখা যায়।

সরীসৃপদের যুগ

২০ কোটি বছর আগে :
ডাইনোসরেরা ছিল এ সময় পৃথিবীর বাসিন্দা। উভচর প্রাণীও তখন ছিল।

উভচর প্রাণীর যুগ

৩০ কোটি বছর আগে :
মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব। এরা জলে ও ডাঙায় বাস করত।

মৎস্য যুগ

৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে :
পানিতে মাছ জাতীয় প্রাণী; ডাঙায় ছোটখাট কাঁকড়া ও শামুক ছিল।

মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর যুগ

৫০ কোটি বছর আগে :
প্রবাল, জেলিফিশ ও পানির নানারকম জীব এ সময়ে পৃথিবীর বাসিন্দা।

প্রাথমিক যুগ

২০০ কোটি বছর আগে :
পানিতে প্রাণের প্রাথমিক অবস্থান প্রকাশ।

জীব-জগতে বিভিন্ন সময়ে প্রাণিকুলের অবস্থান ও বিবর্তন

www.pathagar.com

হেঁটে চলে বা দৌড়ায়। গাছপালারও নড়া-চড়া রয়েছে। সূর্যোদয়ে পদ্মফুল তার পাপড়ি মেলে দেয় আর সূর্যাস্তে তা মুদে নেয়। পতঙ্গভুক উদ্ভিদের (দ্র) খোলা পাতা কোনো পতঙ্গ স্পর্শ করা মাত্রই অতি দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়, ফলে পতঙ্গটি অজান্তে নিজেই তার মরণ-ফাঁদে বন্দি হয়ে জীবন হারায়। রাতের অন্ধকারে জোনাকি (দ্র) পোকা জ্বলতে জ্বলতে চলতে থাকে। গভীর সমুদ্রে কোনো কোনো মাছের দেহের পার্শ্ব থেকে উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হয়। কোনো কোনো সামুদ্রিক মাছের দেহ থেকে বিদ্যুচ্ছটাও বিকীর্ণ হয়। শত্রুকে জব্দ করা এবং শিকার ধরার কাজে তারা সেই শক্তি প্রয়োগ করে। মৌমাছি (দ্র) ফুল থেকে মধু শুষে এনে মৌচাকের ছোট ছোট কোষে তা উগরিয়ে দেয়। এক পাউণ্ড মধু সংগ্রহের জন্য মৌমাছিকে মৌচাক আর ফুলের মধ্যে অনেক বার যাতায়াত করতে হয়। এতে একটি মৌমাছি যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাতে সে দু'বার সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে। বিচিত্র এ জীবজগৎ দু'ভাগে বিভক্ত। এর একটি উদ্ভিদজগৎ এবং অপরটি প্রাণিজগৎ (দ্র)।

মু. আ.

জীবনানন্দ দাশ [১৮৯৯—১৯৫৪]

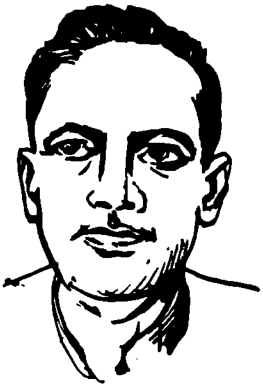

১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বরিশাল শহরে জন্ম। পিতা সত্যানন্দ দাশ, মাতা কবি কুসুমকুমারী দাশ। জীবনানন্দ দাশ এম. এ. পাশ করার পর প্রথম জীবনে ইংরেজি সাহিত্যের (দ্র) অধ্যাপকরূপে বরিশালে চাকুরি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) সময় অধ্যাপনা ছেড়ে কলিকাতা (দ্র) থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত দৈনিক 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কিছুকাল চাকুরি করেন।

তিনি এক জন শক্তিমান প্রগতিশীল আধুনিক কবি। তাঁর কবিকৃতি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। বিংশ শতাব্দীতে মানবতার বিপন্ন ছবি তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত। বর্ণনার সুস্পষ্টতায়, বাচনভঙ্গির শ্রেষ্ঠত্বে এবং শব্দচয়নের নৈপুণ্যে তিনি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট কবি। তাঁর প্রথম দিকের কবিতা বিষাদে আপ্লুত। শব্দ, ধ্বনি, পরিবেশোপযোগী রূপকল্প ইত্যাদিতে ধূসর নিঃসঙ্গতার ব্যঞ্জনা তাঁর কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর ইতিহাসচেতনা সুগভীর। অতীত ও বর্তমানকে তিনি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূত্রে গেঁথে নিয়েছিলেন। কবিতাকে তিনি গদ্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর এই প্রভাব পরবর্তী কালের কবিদের উপর পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ (দ্র) যথার্থই বলেছিলেন, তাঁর কাব্য 'চিত্ররূপময়'।

তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাংলা'য় (১৯৫৭) আবহমান বাংলার রূপ প্রকাশিত। এ জন্য তাঁকে 'রূপসী বাংলার কবি'ও বলা হয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থ: 'ঝরা পালক' (১৩৩৪ব.), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৩৪৩ব.), 'বনলতা সেন' (১৩৪৯ব.), 'মহাপৃথিবী' (১৩৫১ব.), 'সাতটি তারার তিমির' (১৩৫৫ব.), 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৩৬৮ব.)। 'কবিতার কথা' (১৩৬২ব.) তাঁর অসামান্য প্রবন্ধগ্রন্থ।

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর তাঁর অনেক অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে অনেক উপন্যাস ও গল্প রয়েছে। এ ছাড়া অপ্রকাশিত কবিতাও কম নেই। সংখ্যার দিক থেকে এগুলো তাঁর প্রকাশিত রচনার অনেক বেশি। 'জীবনানন্দ সমগ্র' নামে ১৯৮৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১০টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিক্ষণ প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত এই রচনাবলি সম্পাদনা করেছেন কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়।

জীবনানন্দ ১৯৫৪ সালের ১৪ই অক্টোবর কলিকাতার রাজপথে ট্রাক দুর্ঘটনায় আহত হন। ২২শে অক্টোবর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর তাঁর নামে সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

বি. ব.

জীবনী

কোনো এক জন ব্যক্তির জীবন সম্পৃক্ত আদ্যোপান্ত ঘটনার লিখিত বিবরণকেই জীবনী বলে।

জীবনীর ইংরেজি প্রতিশব্দ biography। দু'টি লাতিন

www.pathagar.com

শব্দ থেকে এর জন্ম। bio মানে জীবন এবং graphy মানে লেখা অথবা রচনা করা। অর্থাৎ biography অর্থ হচ্ছে জীবন সম্পর্কে লেখা বা রচনা। তবে আত্মজীবনী যেমন ব্যক্তির নিজের লেখা নিজের জীবনের বিবরণ, তেমনি জীবনী হচ্ছে কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবন সম্পর্কে অন্য কারো লিখিত রচনাকর্ম। আত্মজীবনী লিখিত হয়ে থাকে উত্তম পুরুষে, আর জীবনী প্রথম পুরুষে। জীবনী যিনি রচনা করে থাকেন, তাঁকে বলা হয় জীবনীকার।

জীবনী রচনার পেছনে বেশ কিছু উদ্দেশ্য কাজ করে। যেমন— ১. যাঁর জীবনী লিখিত হচ্ছে, তাঁর জীবনে এমন কিছু আগ্রহোদ্দীপক অজানা ঘটনা রয়েছে, যা সাধারণ মানুষ জানলে তারা তাঁর খ্যাতি বা অখ্যাতির রহস্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে; ২. জীবনীর আধার যে ব্যক্তি, তাঁর জীবনের মহৎ আদর্শগুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরা যাতে করে সমাজের আর দশ জন তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে; ৩. যে ব্যক্তি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এতদিন কেবল শুনেই এসেছে, যাঁকে জীবিতাবস্থায় তাদের দেখবার ও জানবার সুযোগ হয় নি, তাঁর জীবনের পরিচয় তুলে ধরা।

জীবনীর বিষয় বা আধার হতে পারে যে কোনো ব্যক্তির জীবন। এক জন জীবনীকার জনপ্রিয় নায়ক বা ব্যক্তিগত বন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ জীবনী রচনা করতে পারেন। সামরিক ব্যক্তিত্ব, অভিনেতা-অভিনেত্রী, লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, ক্রীড়াবিদ, এমনকি এক জন দস্যু-দুর্বৃত্তও জীবনীর উপাদান হতে পারেন।

প্রকৃত জীবনী রচনা দাবি করে সংশ্লিষ্ট তথ্য বিচার ও গ্রহণে নির্মোহতা, সর্বোপরি জীবনীকারের নিরেট সততা ও সত্যবাদিতা, প্রকৃত তথ্য সন্নিবেশে তাঁর ব্যক্তিগত সাহসও। প্রকৃত জীবনীতে যিনি জীবনীর আধার, তাঁর জীবনের মহত্ত্বকেই কেবল আলোকিত করা হয় না, তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতাগুলোকেও সমভাবে বিবৃত করা হয়, যে সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশে তাঁর জীবন কেটেছে তাকে অবিকল বিধৃত করা হয়, কোনো বিশেষ পারিবারিক বা সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ভূমিকা এবং তাঁর প্রাত্যহিক জীবনাচারের বৈশিষ্ট্যগত বিবরণকেও তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ ভাল ও মন্দের মিশেলে এক জনের সামগ্রিক জীবন-বিবরণই হচ্ছে প্রকৃত জীবনী।

স্মৃতিকথা ও জীবনীর মধ্যে পার্থক্য আছে। কোনো বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে লিখিত স্মৃতিকথা প্রায়শ আবেগমথিত হয়ে থাকে। অথচ জীবনীর ক্ষেত্রে আবেগ বা আবেগবাহুল্যের কোনো স্থান নেই। টমাস কার্লাইলের মতে, 'জীবনী একান্তভাবেই তথ্যবহ'।

জীবনীর গুরুত্ব এবং এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত। এমিল লুড্‌ভিগের মতে, 'প্রতি খণ্ড জীবনীর নেপথ্যে রয়েছে জীবন সম্পর্কে বিশেষ অনুভূতি, জীবন সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে একটি বিশেষ সঙ্কল্প।' টমাস কার্লাইলের উক্তিও এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, 'ইতিহাস হচ্ছে বহুসংখ্যক জীবনী বা জীবনচরিতেরই সারাংশ। ইতিহাসের অর্থ জানতে হলে মহৎ মানুষদের জীবনী পড়তেই হবে।'

সুদূর অতীত থেকে জীবনী লেখা হয়ে আসছে। বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থগুলোর অন্যতম প্লুটার্কের 'লাইফ অব মারকাস আন্তোনিয়াস', বস্‌ওয়েলের 'লাইফ অব জনসন', লক হার্টের 'স্যার ওয়াল্টার স্কট', টমাস মুরের 'বায়রন', টমাস কার্লাইলের 'ক্রমওয়েল' এবং আধুনিক কালে কার্ল স্যাণ্ডবার্গের 'জর্জ ওয়াশিংটন' ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যের (দ্র) উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজা রামমোহন রায়', যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর', সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'বিবেকানন্দ', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী', বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ'। এই সব জীবনীগ্রন্থের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে আরো বহু স্মরণীয় জীবনী রচিত হয়েছে এবং বহু সংখ্যক জীবনীকারের আবির্ভাব ঘটেছে। বাংলা একাডেমী (দ্র) বাংলাদেশের (দ্র) প্রখ্যাত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের জীবনী রচনা করার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত শতাধিক জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমীও (দ্র) নানা গুরুত্বপূর্ণ জীবনী রচনা করার প্রকল্প হাতে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

আ. হ.

www.pathagar.com

জীবনীসাহিত্য

ব্যক্তিমানুষের জীবন যখন সাহিত্য হয়ে ওঠে, তখনই তা জীবনীসাহিত্য। জীবনীসাহিত্য দু'ধরনের হতে পারে—১. আত্মজীবনী বা আত্মচরিত, যেখানে লেখক নিজেই তাঁর জীবনকথা পাঠককে জানান, এবং ২. জীবনী, যেখানে লেখক অন্য কোনো ব্যক্তির জীবনী রচনা করেন।

১. আত্মজীবনী : চিঠি বা দিনলিপির আকারে, গল্পচ্ছলে বা বিবৃতির ধরনে আত্মজীবনী লেখা হয়ে থাকে। তবে আত্মজীবনীর মোটামুটি দু'টি ধারা রয়েছে। প্রথমটিতে লেখকের নিজের কথাই মুখ্য, দ্বিতীয়টিতে লেখকের ভূমিকা গৌণ, যেখানে আত্মসমীক্ষা বা আত্মপর্যালোচনাই প্রধান। এই শ্রেণীর জীবনীকে স্বীকারোক্তিমূলক রচনাও বলা যেতে পারে। আত্মজীবনীর প্রাচীন নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় রাজাদের আত্মজীবনী। তবে এসব রচনায় প্রধানত তাঁরা তাঁদের কীর্তি ও সম্পদের মহিমাকীর্তন করেছেন। প্রাচীন আত্মজীবনীগুলোর মধ্যে 'সাধু অগাস্টিনের স্বীকারোক্তি' (Confession of St. Augustine) রচনাশৈলীর দিক থেকে অসাধারণ।

রেনেসাঁস (দ্র) মানুষকে তার নিজের এবং তার চার পাশের জগৎ সম্পর্কে সচেতন করে তুলল। ফলে রেনেসাঁসের সময় থেকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বহু বিখ্যাত আত্মজীবনী রচিত হয়েছে। আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত হল আত্মসচেতন জীবনীগ্রন্থগুলি। বিশ শতকে এসে বিখ্যাত লেখকেরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের আড়ালে নিজেদের উপস্থাপন করলেন। বাংলা সাহিত্যে (দ্র) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'ছেলেবেলা', 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', বিভিন্ন ধারায় রচিত আত্মজীবনী। এদের প্রতিটির সাহিত্যমূল্যও অপরিসীম। এ ছাড়া বুদ্ধদেব বসুর (দ্র) 'আমার ছেলেবেলা', 'আমার যৌবন', সুকুমার সেনের (দ্র) 'দিনের পরে দিন যে গেল' বাংলা সাহিত্যের আত্মজীবনীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে।

২. জীবনী : এই ধরনের রচনায় লেখক তাঁর ঘনিষ্ঠ কারো জীবন পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন। এই ধরনের রচনা সাধারণত রাজরাজড়ার প্রশংসাসূচক বা খ্যাতিমানদের প্রচারমূলক হয়ে থাকে। তবে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন ও কর্মের পর্যালোচনামূলক রচনাও একেবারে দুর্লভ নয়। বাংলা সাহিত্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মভিত্তিক 'রবীন্দ্র-জীবনী ও সাহিত্য প্রবেশক' (৪ খণ্ড) রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন আর কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ (দ্র) রচনা করেছেন 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা'। ১৯৪৭ পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের বেশ কয়েক জনের আত্মজীবনী সমকালীন ইতিহাস ধারণ করছে। এই আত্মজীবনীগুলোর মধ্যে অন্যতম—১. আবুল মনসুর আহমদের (দ্র)–'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', ২. আবুল ফজলের (দ্র)'রেখাচিত্র', ৩. আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'আত্মস্মৃতি'।

বাংলা একাডেমী (দ্র) জীবনী-গ্রন্থমালা সিরিজ প্রকাশের মাধ্যমে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী প্রকাশ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (দ্র)-ও ছোটদের জন্য এ জাতীয় জীবনী প্রকাশ করছে।

মে. খা.

জীববৈচিত্র্য

জীবজগৎ (দ্র) বড়ই বিচিত্র। এটি দু'ভাগে বিভক্ত— উদ্ভিদ (দ্র) জগৎ ও প্রাণিজগৎ (দ্র)। কোনো কোনো উদ্ভিদ আকারে অতি ক্ষুদ্র। খালি চোখে তাদের দেখা যায় না, যেমন ডায়াটম্ (দ্র)। কোনো কোনো উদ্ভিদ আকারে বেশ বড়। বহু দূর থেকেও তাদের চোখে পড়ে, যেমন—বট গাছ, খেজুর গাছ ও নারিকেল গাছ। সবুজ উদ্ভিদ নিজেরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে। ছত্রাক (দ্র) জাতীয় উদ্ভিদে ক্লোরোফিল (দ্র) না থাকায় তারা খাদ্য তৈরি করতে পারে না। কোনো কোনো উদ্ভিদের ফুল হয়, কোনোটির হয় না। কোনো কোনো উদ্ভিদের বীজাবরণ থাকে, আবার কোনোটির তা থাকে না। কোনো কোনো উদ্ভিদের বংশবিস্তার হয় বীজ দ্বারা, কোনোটির তা হয় অঙ্গের সাহায্যে।

ধান (দ্র) জাতীয় গাছ বেশি দিন বাঁচে না। তবে সেকোইয়া গাছ বাঁচে চার হাজার বছর পর্যন্ত। কোনো উদ্ভিদ

www.pathagar.com

জন্মায় পানিতে (দ্র), কোনোটি জন্মায় মাটিতে (দ্র)। কোনো উদ্ভিদ জন্মে মরু অঞ্চলে, আবার কোনোটি জন্মে লোনা মাটিতে।

উদ্ভিদজগৎ যেমন বিচিত্র, তেমনি বিচিত্র প্রাণিজগৎ। কোনো প্রাণীর দেহে একটিমাত্র জীবকোষ থাকে, যেমন— অ্যামিবা। কোনো কোনো প্রাণী বিরাটাকার, যেমন— হাতি (দ্র) ও তিমি (দ্র)। স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীর দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকে, যেমন— সায়কন্। এদের দেহ কোনো বস্তুর সঙ্গে লেগে থাকে। এ কারণে এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না। এদের দেহে শাখা-প্রশাখা থাকে। হাইড্রা জাতীয় প্রাণীর দেহ নলের মতো। এদের দেহের ভেতরে একটিমাত্র ফাঁপা নল থাকে। টেনিয়া ও ফ্যাশিওলা জাতীয় কিছু প্রাণীর দেহ বেশ নরম ও চ্যাপ্টা। এদের অধিকাংশই পরজীবী (দ্র)। সুতার মতো লম্বা কৃমি জাতীয় প্রাণীর দেহের মধ্যভাগ কিছুটা মোটা, তবে দুই প্রান্ত কিছুটা সরু। এরাও বেশির ভাগ পরজীবী।

কেঁচো (দ্র) বা জোঁক জাতীয় প্রাণীর দেহে আংটির মতো সারিবদ্ধ অনেকগুলো খণ্ড থাকে। এরা মাটি ও পানি উভয় স্থানেই বাস করে। চিংড়ি (দ্র), তেলাপোকা (দ্র) ও মৌমাছি (দ্র) জাতীয় প্রাণীর দেহ খণ্ডায়িত। খণ্ডগুলো মাথা, বুক ও পেট—এই তিন ভাগে বিভক্ত। শামুক ও ঝিনুক (দ্র) জাতীয় প্রাণীর দেহ শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত। তারা মাছ (দ্র) জাতীয় প্রাণীর ত্বকে সজারুর কাঁটার মতো উপাঙ্গ থাকে। এদের দেহে নলাকার পা আছে। এরা সকলেই সামুদ্রিক। রুই মাছ, বাঘ (দ্র), সিংহ (দ্র) ও মানুষের পিঠে ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু ও লম্বালম্বি নটকর্ড থাকে। এদের কোনোটি বাস করে পানিতে আবার কোনোটি বাস করে ডাঙ্গায়।

মু. আ.

জীবাণু (bacteria)

জীবাণু ছোট এককোষী জীব, যা অণুবীক্ষণ (দ্র) ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না। আকারে ছোট হলেও জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য ক্রিয়া, যেমন— বৃদ্ধি, বিপাক, বংশবিস্তার ইত্যাদি সম্পাদনের ক্ষমতা জীবাণুর রয়েছে। দ্বিবিভাজনের মাধ্যমে জীবাণু বংশবিস্তার করে। ওলন্দাজ অণুবীক্ষণবিদ লেভেনহুক (দ্র) ১৬৭৪ সালে প্রথম স্ব-উদ্ভাবিত অণুবীক্ষণের সাহায্যে জীবাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

জীবাণু আকারে এক থেকে দশ মাইক্রন দীর্ঘ হতে পারে। মাইক্রন এক মিলিমিটারের হাজার ভাগ। সুদৃঢ়

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা রোগজীবাণু

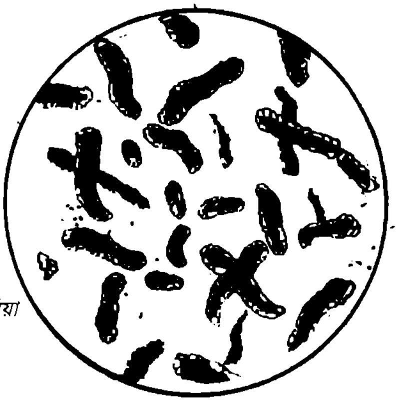

ডিফথেরিয়া রোগের জীবাণু

কলেরা রোগের জীবাণু

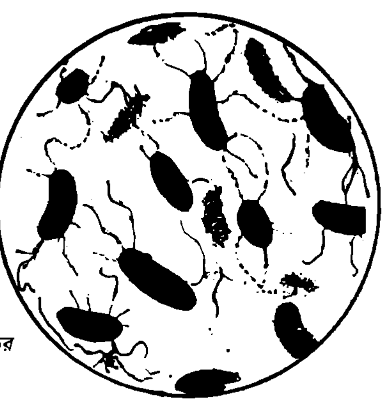

টাইফয়েডের জীবাণু

www.pathagar.com

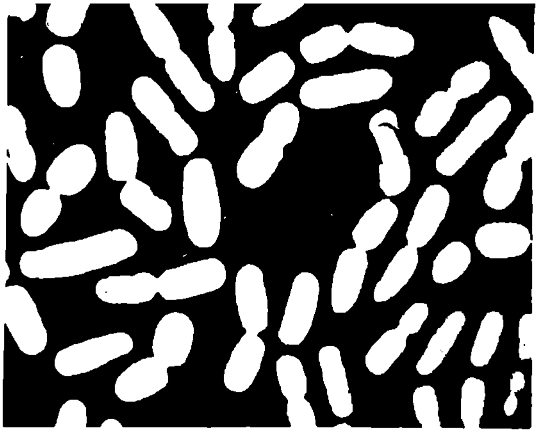

প্রত্যেক জীবাণু-কোষ পুরু এণ্ডোস্পোর-এর দেয়াল তৈরি করে থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ২৫৫০ গুণ বড় করে তোলা এ ছবি

প্রাচীরবেষ্টিত জীবাণুকোষের প্রধান উপাদান সাইটোপ্লাজম্, কেন্দ্রক (নিউক্লিয়াস), রিবোসোম, গ্র্যানিউল, মেসোসোম ইত্যাদি। জীবাণু প্রধানত কক্কাস, ব্যাসিলাস, ভিব্রিয়ো, স্পাইরাল্যাম, স্পাইরোকিট ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত।

দেহে প্রতিরোধক্ষমতা কমে গেলে জীবাণু মানুষ বা প্রাণীদেহে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। সজীব কোষে জীবাণুর আক্রমণ ও বংশবিস্তারের নাম সংক্রমণ (দ্র) বা ইন্‌ফেক্‌শন। সংক্রমণ নানা পথে সংঘটিত হয়ে থাকে। বায়ু (দ্র), পানি (দ্র) বা খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে, রোগাক্রান্ত মানুষ বা প্রাণীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ, কীটপতঙ্গের (দ্র) দংশন ইত্যাদি নানা উপায়ে দেহে জীবাণুর অনুপ্রবেশ ও সংক্রমণ ঘটে।

তাপ (দ্র), তেজস্ক্রিয় রশ্মি, বা রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে জীবাণু ধ্বংস করার পদ্ধতির নাম নির্বীজন (দ্র) ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌শান। ভেষজ বা রাসায়নিক উপাদান, বিশেষ করে আধুনিক কালে আবিষ্কৃত কেমোথেরাপিউটিক ও এণ্টিবায়োটিক্ (দ্র) জাতীয় ঔষধ (দ্র) জীবাণু সংক্রমণের বিরুদ্ধে খুবই কার্যকর। কোনো কোনো জীবাণুঘটিত রোগের (দ্র) বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক টিকাও (দ্র) ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন—বসন্ত রোগ, পোলিওমায়েলাইটিস (দ্র), ধনুষ্টঙ্কার, হুপিংকাশি, ডিফথেরিয়া (দ্র) ইত্যাদি।

সি. না. হ.

জীবাণুবিদ্যা অণুজীববিদ্যা দ্র

জুজুৎসু

কোনো প্রকার অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়া শত্রুকে পঙ্গু করে দেওয়া বা বিনাশ করার বিদ্যাকে জুজুৎসু বলে। আধুনিক যুগের জুডো (দ্র) জন্মলাভ করেছে জুজুৎসু থেকে। জাপানের (দ্র) ইতিহাসে অষ্টম শতাব্দীতে এর প্রচলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। জাপানের বীরশ্রেষ্ঠ সামুরাইয়েরা তাঁদের প্রভুদের পক্ষে লড়াই করার সময় তরবারি, ছুরি, বর্শা, তীর-ধনুক এবং সর্বশেষে তাঁরা জুজুৎসুবিদ্যায় পারদর্শী হতেন ও খালি হাতে শত্রুর মোকাবেলা করতেন। জুজুৎসুতে বিশেষ কিছু আক্রমণাত্মক মার বা ঘুষি আছে এবং বিশেষ কায়দায় হাত ও পা দিয়ে ধরার কৌশল আছে, যা দ্বারা বিপক্ষকে খুব সহজেই কাবু করা যায়। ১৬শ শতকে জাপানে জুজুৎসু শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অনেক। তবে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষণীয় কায়দাগুলি অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে ভিন্নতর ও গোপনীয় ছিল।

১৮৮২ সালে জাপানে আধুনিক জুডোর প্রবর্তক ডা. জিগারো কানো কর্তৃক কোদ্‌কান্ প্রতিষ্ঠার পূর্বে পর্যন্ত আক্রমণাত্মক জুজুৎসুই ছিল খালি হাতে আত্মরক্ষার ও বিপক্ষকে ঘায়েল করার কায়দা। জুডোর প্রচলনের পর জুজুৎসুর প্রচলন বহুলাংশে কমে যায় এবং জুডো নামক ভদ্র আত্মরক্ষামূলক ও খালি হাতে প্রতিপক্ষকে কাবু করার খেলাটির প্রচলন হয়। জুজুসুৎ কখনই খেলা ছিল না এবং তা সব সময়ই একটা যুদ্ধ কৌশল হিসাবেই বিবেচিত হয়ে আসছিল।

কা. আ. আ.

জুডো (judo)

জুডো বা জাপানি জুজুৎসু (দ্র) খেলাটি চীনাদের কাছ থেকে জাপানিরা শেখে। জাপানেই (দ্র) এর শ্রীবৃদ্ধি হয়। ১৯৬৪ সালে এটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া হিসাবে জাপানে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে সংযোজিত হয়। ডা. জিগারো কানো ১৮৮২ সালে জাপানে জুডোর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৮২ সালে জাপানে কোদ্‌কান্ স্থাপন করেন ও বিশ্বের কাছে এই খেলাকে পরিচিত করে তোলেন।

www.pathagar.com

অস্ত্র ছাড়া খালি হাতে আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে জাপানি প্রথায় তড়িৎ আক্রমণাত্মক এক ধরনের কুস্তি (দ্র) খেলাকে 'জুডো' বলা হয়। জুডোকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—১. দাঁড়ানোর কায়দা (নিক্ষেপের), ২. মাটিতে অবস্থানের বা থাকার কায়দা (ধরা, বাহুবন্ধন জাতীয় কায়দা, ঘাড় বন্ধনী ও বাহুবন্ধনের কায়দা) ইত্যাদি।

পূর্ব-পাকিস্তান আমলে ঢাকায় (দ্র) ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় ১৯৬০ সালে প্রথম জুডো প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে ঢাকার জাতীয় খেলাধুলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জুডো ফেডারেশন গঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের ছত্রছায়ায় জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতা ও ১৯৭৮ সাল থেকে জাপান কাপ প্রতিযোগিতা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জুডো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের (দ্র) ছেলেমেয়েরা দেশের জন্য দুর্লভ সম্মান বয়ে এনেছে। ১৯৯৩ সালে সাফ গেম্‌সে (দ্র) জুডো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জুডো প্রতিযোগিতা কুস্তি (দ্র), মুষ্টিযুদ্ধ (দ্র) ইত্যাদির মতো ওজন অনুযায়ী শ্রেণীগতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বহু তরুণ-তরুণী এই খেলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

কা. আ. আ.

জুতা

পায়ের তলাকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা মানুষের অতি প্রাচীন। প্রথম দিকে নলখাগড়া, গাছের বাকল ও চামড়া পায়ের সঙ্গে বেঁধে রাখার মধ্য দিয়ে এ কাজের সূত্রপাত হয়েছিল। তবে প্রকৃতপক্ষে জুতা বলতে যা বোঝায় মিশরীয়রাই তা সর্বাগ্রে তৈরি করেন। তালপাতা ও প্যাপিরাস (দ্র) পাতার সাহায্যে বোনা গদি এবং চামড়ার গদি তাঁরাই প্রথমে পায়ের নিচে বাঁধা শুরু করেন। গ্রিক ও রোমানেরা পরে কাঠ, চামড়া এবং ফেল্ট (felt) অর্থাৎ পশমী বস্ত্র দিয়ে জুতা তৈরি করে। তারা স্যাণ্ডেলের মতো চ্যাপ্টা তলা তৈরি করে তাতে ফিতা লাগিয়ে ব্যবহার করত। বাম ও ডান পায়ের জুতা পৃথকভাবে তৈরি করা এবং পায়ের তলার পাশ বরাবর তা কেটে দেওয়ার কাজও শুরু হয় তখন থেকেই। ফ্যাশনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জুতার ডিজাইনের পরিবর্তন ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীতে চওড়া মাথাওয়ালা জুতার বেশ কদর ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে উঁচু গোড়ালিওয়ালা জুতা ব্যবহৃত হত। তখনকার দিনে রাজরাজড়াদের পছন্দেই জুতার ডিজাইন বদলানো হত। জুতা তৈরির নতুন নতুন কলাকৌশলের কারণে আধুনিক যুগে বিভিন্ন ধরনের নতুন জুতা তৈরি হচ্ছে। মোটা কাপড়, রাবার (দ্র), প্লাস্টিক (দ্র) ও চামড়ার তৈরি নানা ডিজাইনের জুতা এখন বাজারে সহজেই পাওয়া যায়। আজকাল চামড়ার তৈরি জুতায় প্লাস্টিকের এমন ধরনের আবরণ দেওয়া হয় যে তাতে পালিশ করার প্রয়োজন হয় না।

মু. আ.

জুম / ঝুম

বাংলাদেশের (দ্র) পাহাড়ি লোকদের মধ্যে প্রচলিত কৃষিপদ্ধতিতে চাষ করার নাম জুম বা ঝুম চাষ। এর প্রচলিত অর্থ স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে চাষ করা। পৌষ-মাঘ মাসে সুবিধাজনক সময়ে চাষের জন্য এক টুকরো জঙ্গল নির্বাচন করা হয়। জমি নির্বাচনের সময় গাছ, বাঁশ (দ্র) ও আগাছাসহ পাহাড়ের গায়ের ঢালু জায়গাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তারপর সেই জঙ্গলের সমস্ত গাছ, বাঁশ, ঝাড়-জঙ্গল কেটে ফেলা হয়। বড় গাছ থাকলে তার নিচের ঝোপ-ঝাড়ও বাদ যায় না। কাটার পর সেগুলো রোদে শুকানো হয় চৈত্র পর্যন্ত। সাধারণত চৈত্র ও বৈশাখের শুরুতে ওতে আগুন জ্বেলে দেওয়া হয়। এ সময় সচরাচর বৃষ্টি হয় না। তাতে শুকিয়ে যাওয়া গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সঙ্গে ওপরের ১-২ ইঞ্চি মাটিও পুড়ে যায়। ছাই ও পোড়ামাটির জন্য জমি হয় উর্বর। এর পর দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে জমি ভিজে নরম হয়। তার পর বোনার কাজ শুরু হয়। চৈত্রসংক্রান্তি ও নববর্ষের বিজু (দ্র) অনুষ্ঠানের পর সাধারণত জমিতে ফসল বোনার উৎসব শুরু হয়। এ সময় পরিবারের প্রায় সবাই মিলে বীজ বোনার কাজ শুরু করে। ধান (দ্র), তুলা (দ্র), শসা, ঢেঁড়স, কুমড়া (দ্র), তরমুজ, তিল, সর্ষে, মারফা, চিনার প্রভৃতি নানা রকম শস্যের বীজ এক সঙ্গে মিশিয়ে বপন করা হয়। এই বপনপদ্ধতি আদিম। বাঁ হাতে দা-এর মাথা দিয়ে মাটি ফাঁক করে তাতে একত্রে মেশানো বীজ পরিমাণ মতো ডান হাত দিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়। তার পর

www.pathagar.com

দা-টা তুলে নিলে মাটিতে আপনা আপনি বীজগুলো ঢেকে যায়।

এই চাষের বৈশিষ্ট্য এই যে বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফসল বা তরিতরকারি জন্মে। তারপর যথাসময়ে তার সংগ্রহ চলে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে এ থেকে ধান পাওয়া যায়। এই সঙ্গে আসে ঢেঁড়স, তারপর মারফা, চিনার, শসা, তারপর কুমড়ো ও তরমুজ এবং সবশেষে তিল ও সর্ষে ইত্যাদি। এভাবে সারা বছর একই জমি থেকে ফসল পাওয়া যায়। এই চাষে ফসল পেতে হলে খুব পরিশ্রম করতে হয়, সব সময় বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে ধান কাটার সময় অন্য যেসব ফসলের চারাগাছ থাকে, তার দিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে হয়। এর মধ্যে ইঁদুরের উৎপাত সবচেয়ে মারাত্মক। ইঁদুরের আক্রমণ হলে জমির সব ফসল নষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়। জুমে ফসল রোওয়া ও তোলার সময় পাহাড়িয়ারা গান গায়, আনন্দ করে। এই নিয়ে লোক-কাহিনীর সৃষ্টি হয়। স্ত্রী-পুরুষ সবাই মিলে জুম চাষ করে। তারা সবাই কঠোর পরিশ্রমী। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবনে এই পদ্ধতিতে চাষ চলে। এ ছাড়া সিলেটের (দ্র) পাহাড় অঞ্চলেও কিছু কিছু এলাকায় জুম চাষ হয়। জুম চাষে লাঙ্গলের ব্যবহার নেই। একই চাষের জমিতে একাদিক্রমে দু-তিন বছর পর্যন্ত চাষ চলে, তার পর ওই জমি পরিত্যক্ত হয়। তখন আবার নতুন জমি সন্ধান করে চাষ হয় একই পদ্ধতিতে। ঐ জমিও আবার কয়েক বছর পর পরিত্যক্ত হয়।

বি. ব.

জুম্আতুল বিদা

আরবি ভাষায় 'জুম্আতুল বিদা' অর্থ বিদায়ী জুম্আ। পবিত্র রমজান মাসের শেষ শুক্রবারের জুমআর নামাযকেই বলা হয় জুম্আতুল বিদা। এই নামায মুসলমানদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মাসব্যাপী রোজা (দ্র) রাখার শেষ পর্যায়ে এই জুম্আর খুত্বায় (দ্র) বিদায়ী মাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়।

মো. ই.

জুম্মা

প্রকৃত আরবি উচ্চারণ জুমআ, জুমু'আঃ। তবে আমাদের দেশে সচরাচর 'জুম্মা' বা 'জুমা' উচ্চারণ দেখা যায়। এর আভিধানিক অর্থ : সপ্তাহ, সম্মেলন, বন্ধুত্ব, ইসলামী পরিভাষায় শুক্রবারের জুমার জামায়াত। এই দিনে মুসলমানগণ মসজিদে (দ্র) একত্রিত হয়ে নামায (দ্র) আদায় করেন। এতে নামায আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পারস্পরিক ভাববিনিময়ের সুযোগ হয়, সম্প্রীতির পথ সুগম হয়।

জুম্মার মূল নামায দু'রাকাত ফরজ বা অবশ্য আদায়যোগ্য নামায। সেই সঙ্গে অন্যান্য সুন্নাত এবং নফল নামাযও আদায় করা হয়। ফরজ নামাযের আগে ইমাম বা খতীব খুত্বা (দ্র) বা উপদেশমূলক ভাষণ দেন।

মু. মা.

জুল্ (joule)

জুল্ হচ্ছে S.I. পরিমাপব্যবস্থায় শক্তির একক। এক নিউটন (দ্র) বলের বিরুদ্ধে এক মিটার দূরত্ব অতিক্রম করলে যে পরিমাণ কাজ করা হয় তা হচ্ছে এক জুল্। বৈদ্যুতিকভাবে পরিমাপ করতে হলে এক জুল্ হচ্ছে এক ওহম রোধের ভিতর দিয়ে এক অ্যাম্পেয়ার (দ্র) তড়িৎপ্রবাহের ফলে এক সেকেণ্ডে সম্পাদিত কাজ। C.G.S. পরিমাপ ব্যবস্থায় শক্তির একক হচ্ছে আর্গ। এক জুল্ এক আর্গের এক কোটি গুণ বড়। তাপের একক ক্যালরির (দ্র) ৪·২ গুণ হচ্ছে এক জুল্। আয়ারল্যাণ্ডের পদার্থবিজ্ঞানী জন জুলের (John Joule) নাম অনুসারে এই শক্তির এককের নামকরণ হয়েছে।

আ. আ.

জুল্ ভের্ন্ [১৮২৮—১৯০৫]

ফরাসি ঔপন্যাসিক ও কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর স্রষ্টা। জন্ম ফ্রান্সের নাঁতে এলাকায়, ১৮২৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি।

আইনজীবী পিতার একান্ত প্রেরণায় জুল্ ভের্ন্ (Jules Verne) প্যারিসে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। কিন্তু পেশা হিসাবে আইন ব্যবসা মনঃপূত না হওয়ায় বেশ কয়েকটি পেশা বদলের পর নিবিষ্ট হন সাহিত্য রচনার কাজে। এই লক্ষ্য সাধনে প্রথমে হাত দেন মঞ্চনাটক রচনায়। কিন্তু ১৮৬৩ সালে তাঁর রচিত 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর লেখক হিসাবে তাঁর শক্তির প্রকাশ ঘটে এবং দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর খ্যাতি। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ১৮৭০ সালে

www.pathagar.com

প্রকাশিত 'সাগরতলে বিশ হাজার লিগ্' ও ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত 'আশি দিনে ভূপরিক্রমণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও বহুল পঠিত।

বেতারযন্ত্রের আবিষ্কারক মার্কোনি (দ্র), সাবমেরিনের (দ্র) জনক সাইমন লেক এবং সমুদ্রের গভীর তলদেশের আবিষ্কারক অগাস্ট পিকার্ডসহ আরো অনেক বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অকপটে স্বীকার করেছেন, জুল্ ভের্ন্ই তাঁদের এসব আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের অধিকাংশের কাছেই তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত বহু বিষয়ের আগাম ভাষ্যকার রূপে পরিগণিত।

সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভের্ন্ ফ্রান্সের জাতীয় সম্মান 'লিজিয়ন অব অনার' লাভ করেন। ফরাসি একাডেমী তাঁকে সংবর্ধনা দিলেও তাঁকে এর সভ্য করতে পারে নি নানা দলাদলির কারণে।

১৯৫০-এর দশকে তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে চলচ্চিত্র তৈরি করা হয় এবং বিশ্বব্যাপী সেগুলো দর্শকনন্দিতও হয়। জুল্ ভের্ন্ মারা যান ১৯০৫ সালের ২৪শে মার্চ।

আ. হু.

জুল্ রিম্

জুল্ রিম্ (Jules Rimet) বিশ্ব-ফুটবলের ইতিহাসে এক জন স্মরণীয় ব্যক্তি। ফ্রান্সের অধিবাসী জুল্ রিমের সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল ফুটবলকে ঘিরে।

ফুটবল (দ্র) শুধু একটি খেলা নয়, চামড়ার গোলক আকৃতির এই বস্তুটির মাধ্যমে বিশাল বিশ্বকে যে জয় করা যায়, সর্বপ্রথম জুল্ রিম্ই এই অসম্ভব বিষয়টি ভেবেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জুল্ রিম্ ফুটবলের একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা 'ফিফা' (FIFA = Fédération Internationale de Football Associations) গঠিত হলে বিশ্বের ফুটবল-রসিকেরা জুল্ রিম্কে এই সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত করেন। ১৯২০ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। জুল্ রিমের নাম অনুযায়ী বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম দিককার কাপটির নাম রাখা হয় জুল্ রিম্ কাপ। এক ফুট উঁচু এই

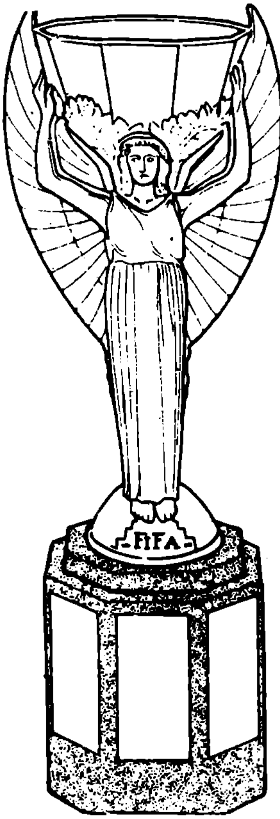

জুল্ রিম্ ট্রফি

www.pathagar.com

নিখাদ সোনার কাপটির নির্মাণব্যয় সেকালেই পড়েছিল আড়াই হাজার পাউণ্ড। সোনার পরীবিশিষ্ট এই কাপ ফরাসি ভাস্কর আবেল লা ফ্লু-র পরিকল্পনায় নির্মিত হয়। ফিফার সাবেক নিয়ম ছিল তৃতীয় বার কোনো দল বিজয় অর্জন করলে সেই দল চিরদিনের জন্য জুল্ রিম্ কাপের স্বত্ব লাভ করবে। ফলে, তিন বার চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ী হয়ে ১৯৭০ সালে ব্রাজিল এই কাপ চিরতরে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। এখন জুল্ রিম্ কাপের প্রচলন নেই, কিন্তু বিশ্বফুটবলের ইতিহাসে জুল্ রিমের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

পরবর্তী কালে বিশ্বকাপ ফুটবলে জুল্ রিম্ কাপের স্থান দখল করে নেয় ফিফা(দ্র) কাপ, যা বিশ্বকাপ নামে পরিচিত।

ফা. ন.

জেট ইঞ্জিন (jet engine)

বিমানকে গতিশীল করার জন্য আধুনিকতম যে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় তা জেট ইঞ্জিন। এর ফলে অনেক উচ্চ গতির বিমানে ভ্রমণ সম্ভব হয়েছে, এমনকি শব্দের গতিবেগকেও অতিক্রম করতে পেরেছে বিমান। প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে—নিউটনের (দ্র) এই তৃতীয় গতিসূত্র অনুসারেই জেট ইঞ্জিন কাজ করে। এতে জ্বালানি (দ্র) দহনের ফলে সৃষ্ট উচ্চ চাপের গ্যাস যখন এর পেছনের দিকে সজোরে বেরিয়ে আসে, তার প্রতিক্রিয়ায় ইঞ্জিনটি এবং সেই সঙ্গে বিমান সামনের দিকে ছুটে যায়। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই নিয়ম বায়ুশূন্য স্থানেও কাজ করতে পারে। তবে জ্বালানি দহনের জন্য জেট ইঞ্জিন বাইরের বাতাস (দ্র) টেনে নেয়। জেট ইঞ্জিনে বাতাস টেনে আনা হয় প্রপেলার ইঞ্জিনের তুলনায় অনেক কম পরিমাণে, অথচ সে বাতাসের চাপ ও গতিবেগ সৃষ্টি করা হয় অনেক বেশি। জেট ইঞ্জিন দক্ষ হয় অপেক্ষাকৃত উচ্চ গতিবেগে।

আধুনিক যাত্রীবাহী বিমানে যে রকম জেট ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়, তা সাধারণ টার্বোফ্যান প্রকৃতির। এতে ইঞ্জিনের প্রশস্ত সম্মুখ ভাগে বড় একটি পাখা প্রচুর বাতাস টেনে নেয়। এ বাতাস পর পর ঘূর্ণায়মান কয়েকটি পাখাসদৃশ চাকতির মধ্য দিয়ে গিয়ে অনেক সঙ্কুচিত হয় যার সঙ্গে মিশ্রণে জ্বালানির দহন ঘটে দহন-প্রকোষ্ঠের মধ্যে। দহনের ফলে সৃষ্ট উচ্চ চাপের গ্যাস বাতাস-টানা পাখা, সঙ্কোচনকারী পাখা ইত্যাদিকে টার্বাইনের (দ্র) সাহায্যে ঘুরিয়ে সচল রাখে এবং তারপর সজোরে পেছন দিয়ে নির্গত হয়ে বিমানকে গতিশীল করে।

বিমান চালনায় আধুনিক জেট ইঞ্জিন ব্যবহৃত হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) সময় থেকে। এটি যাত্রীবাহী বিমানে প্রথম চালু হয় ১৯৫২ সালে। রকেট ও জেট ইঞ্জিনের নীতি একই। তবে রকেট (দ্র) বাইরে থেকে বাতাস টেনে নেয় না, বরং জ্বালানি দহনের জন্য নিজেই অক্সিজেন (দ্র) বহন করে। তাই রকেট মহাশূন্যেও চলতে সক্ষম হয়।

মু. ই.

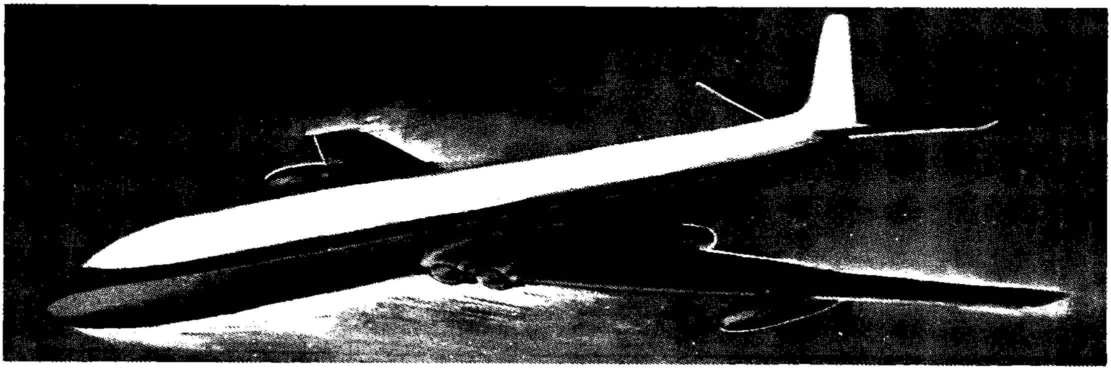

একটি যাত্রীবাহী জেট বিমান

জেনার্, এড্ওয়ার্ড [১৭৪৯—১৮২৩]

গুটি বসন্তের টিকা (দ্র) আবিষ্কার করে আধুনিক প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার দিঙ্‌নির্দেশ করে গেছেন এড্ওয়ার্ড্ জেনার্ (Edward Jenner)।

www.pathagar.com

তাঁর জন্ম ব্রিটেনের বার্ক্‌লে নামক ছোট শহরে, ১৭৪৯ সালে। তেরো বছর বয়সে জেনার্ স্কুল ত্যাগ করেন এবং ব্রিস্টলের সন্নিকটস্থ এক জন ডাক্তারের সঙ্গে শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ করতে থাকেন। এরপর তিনি লণ্ডনের সেন্ট জর্জ হাসপাতালে দু'বছরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

নিরলস চেষ্টার সাফল্য হিসাবে জেনার্ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন গুটি বসন্তরোগের (দ্র) টিকা। জেনার্

জেম্‌স্ ফিলিপ্‌কে গো-বসন্তের টিকা দিচ্ছেন জেনার

অনেক দিন ধরে শুনে আসছিলেন যে গো-বসন্তে (cow pox) আক্রান্ত ব্যক্তি গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয় না। বিষয়টা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। একটানা পাঁচ বছর বিভিন্ন প্রকার গো-রোগ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখতে পান যে বিভিন্ন ধরনের গো-বসন্তের মধ্যে শুধু মাত্র এক ধরনের ক্ষেত্রেই শরীরে গুটি বসন্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। তিনি এই বিশেষ ধরনের রোগের নাম দেন 'আসল গো-বসন্ত'।

জেনার্ ১৭৯৫ সালের ১৪ই মে জেম্‌স্ ফিলিপ্ নামে এক কিশোরের শরীরে আসল গো-বসন্তের জীবাণু ঢুকিয়ে দেন। ছেলেটি গো-বসন্তে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসাতেই ভাল হয়ে গেল। এরপর জেনার্ গুটি বসন্তের গুটি থেকে পুঁজরস নিয়ে ঐ ছেলের শরীরে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেটি গুটি বসন্তে আক্রান্ত হল না। এমনিভাবেই জেনার্ আবিষ্কার করেন গুটি বসন্তের প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

জেনারের আবিষ্কার গুটি বসন্ত রোগের ভয়াবহতা থেকে মানবসমাজকে মুক্তি দিয়েছে। আর তাঁর নাম হয়ে রয়েছে স্মরণীয়। তিনি ১৮২৩ সালে পরলোকগমন করেন।

সি. না. হ.

জেনেটিক্স জীন দ্র

জেফার্‌সন, টমাস [১৭৪৩—১৮২৬]

আমেরিকার (দ্র) তৃতীয় প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা।

জেফার্‌সনের (Thomas Jefferson) জন্ম ভার্জিনিয়ায় ১৭৪৩ সালে। শৈশব থেকেই কাব্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা ও চিত্র সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন।

তিনি ভার্জিনিয়ার গভর্নর হন ১৭৭৯ সালে। ১৭৮৫ সালে ফ্রান্সে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। এরপর ১৭৯০ সালে হন আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিব। ১৭৯৬ সালে জেফার্‌সন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৮০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেফার্‌সন ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আরন বার (Aaron Barr) সমান সংখ্যক ভোট পান। প্রতিনিধি পরিষদ জেফার্‌সনকে প্রেসিডেন্ট এবং আরন বারকে ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেন।

তাঁর শাসনের উল্লেখযোগ্য কাজ লুইজিয়ানা ক্রয় এবং লিউইস ও ক্লার্ক অভিযান। লুইজিয়ানা ক্রয়ের ফলে মিসিসিপি নদীর পশ্চিমের প্রায় ১২ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা আমেরিকার দখলে আসে। জেফার্‌সনের জনহিতকর কাজগুলোর মধ্যে অবাধ ও অবৈতনিক শিক্ষার পরিকল্পনা রূপায়ণ উল্লেখযোগ্য। তিনি ভার্জিনিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টিরও (দ্র) প্রতিষ্ঠাতা।

১৮২৬ সালের জুলাই মাসে টমাস জেফার্‌সন মৃত্যুবরণ করেন।

টি. কি.

www.pathagar.com

জেব্রা (zebra)

জেব্রা খুরযুক্ত স্তন্যপায়ী (দ্র) প্রাণী। এদের দেহ পরিষ্কার ডোরাকাটা। দু'টি জেব্রার দেহের ডোরাকাটা দাগ কখনই এক রকম হয় না। এর গোত্রের নাম ইকুইডি (Equidae), জেনারিক নাম ইকুয়াস (Equus)। এর মাথা এবং দেহ ২·৩ মিটার (৭·৫ ফুট) লম্বা। জেব্রার উচ্চতা ১·২ থেকে ১·৫ মিটার। এর ওজন ৩৪৬·৫ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। আফ্রিকার পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের ঘাসভরা প্রান্তরে জেব্রা বসবাস করে। পুরুষ ও স্ত্রী জেব্রা নিজেদের নিরাপত্তার

তাগিদে বড় পালে চলাফেরা করে। শান্ত স্বভাবের অন্যান্য চরে খাওয়া পশু, যেমন—অ্যান্টিলোপ ও উটপাখির (দ্র) সঙ্গে মিলেমিশেও এরা চলাফেরা করে। পুরুষ জেব্রা স্ত্রী জেব্রা ও শাবকের সঙ্গে একত্রে থাকে। এদের চিরশত্রু সিংহ (দ্র) কিংবা চিতাবাঘ (দ্র) অলক্ষ্যে কাছাকাছি এলে জেব্রা ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে দৌড়ে পালাতে থাকে। জেব্রা তৃণভোজী। ঘাস খেয়ে এবং ঝোপ-ঝাড়ের পাতা টেনে ছিঁড়ে খেয়ে এরা জীবন ধারণ করে। স্ত্রী জেব্রা বসন্তকালে একবারে একটি শাবকের জন্ম দেয়। চামড়ার জন্য অতিরিক্ত জেব্রা শিকার করা হয় বলে জেব্রার সংখ্যা কমে গেছে। গৃহপালিত পশু হিসাবে জেব্রাকে পোষ মানানোর চেষ্টা সফল হয় নি। তেমনি একে আরোহণের জন্য বা অন্যান্য কাজে লাগানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। ঘোড়া (দ্র) জাতীয় পশুর সঙ্গে এর সঙ্করায়নের চেষ্টাও সফল হয় নি।

মু. আ.

জেরুজালেম (Jerusalem)

জেরুজালেম মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের পবিত্র নগরী। ভূমধ্যসাগর (দ্র) থেকে ৫৫ মাইল পূর্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৮০ মিটার (২৬০০ ফুট) উঁচুতে অবস্থিত। ১৯৪৮ সালে এই নগরী জর্দান ও ইসরায়েলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। ইসরায়েলের অংশ (বা নতুন জেরুজালেম) ডিসেম্বর ১৯৪৯ থেকে ইসরায়েলের রাজধানী। এই জেরুজালেমের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ নিয়ে গঠিত যায়ন পর্বত ও স্কোপাস পর্বতসমূহ। জর্দান অংশে পড়েছে যায়ন পর্বত ছাড়া সমুদয় পবিত্র ভূমিসহ পুরানো জেরুজালেম নগরী। জেরুজালেমের পূর্ব অংশ পুরানো নগরী, পশ্চিম অংশ নতুন নগরী। জর্দান নদীর মোহনার পশ্চিমে ২৬০০ ফুট উঁচু পর্বতের উপর এই নগরী একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মতো এবং দুই পাহাড়ের উপর অবস্থিত এটি প্রথম সুলাইমান কর্তৃক নির্মিত (১৫৪২ খ্রি.) ও প্রাচীরবেষ্টিত হয়। প্রাচীরের মধ্যে চারটি মহল আছে। পূর্ব দিকের মুসলিম মহলে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং পুরানো মরিয়া পর্বতের উপর নির্মিত উমর মসজিদ ও আল-আক্সা মসজিদ (দ্র) অবস্থিত। বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রাচীর ইহুদিদের কাছেও পবিত্র। বায়তুল মুকাদ্দাসের দক্ষিণ-পশ্চিমের কয়েকটি প্রসিদ্ধ সিনাগগ্ (ইহুদি উপাসনালয়) সংবলিত ইহুদিমহল ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে বেশির ভাগ নষ্ট হয়েছে। খ্রিস্টান মহল পুরানো নগরীর উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত। এখানে যিশুখ্রিস্টের (দ্র) সমাধিগৃহ আছে।

নতুন জেরুজালেম ইসরায়েলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র। প্রাচীন জেরুজালেমের ইতিহাস আনুমানিক ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হয়। আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজা ডেভিড বা দাউদ (দ্র) শহরটি জেবুসাইটদের থেকে অধিকার করে এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র রাজা সলোমন (দ্র) এখানে বিশ্ববিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন। খ্রি. পূ. ৫৮৬ অব্দে ব্যাবিলনীয়দের কাছে জেরুজালেমের পতন ঘটে। তারপর এক সময় এটি

www.pathagar.com

ম্যাকাবী ও হেরড রাজাদের নগরী ছিল। প্রথম দিকের রোমক সম্রাটগণ এই পবিত্র নগরীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। ৭০ খ্রিস্টাব্দে টাইটাস (বা তিতস) এই নগরী আক্রমণ করে ধ্বংস করেন। পরের বছর সম্রাট হাদ্রিয়ান এই নগরী পুনর্নির্মাণ করেন। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হযরত উমরের (দ্র) অধিকারে আসে এবং পবিত্রভূমির মর্যাদা লাভ করে। ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেড (দ্র) যোদ্ধাগণ বুইয়ঁ (Bouillon)-র গডফ্রের নেতৃত্বে জেরুজালেম জয় করে লাতিন রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে সালাহ্উদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলমানগণ ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধে (দ্র) মুসলমানদের কাছ থেকে লর্ড অ্যালেন্‌বি এই নগরী জয় করে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করেন। এ সময় জেরুজালেম থেকেই প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ অছি-শাসন পরিচালিত হত। অছি-শাসন শেষ হলে জেরুজালেমের কর্তৃত্ব নিয়ে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। কিছুদিন যুদ্ধ করার পর ইহুদিরা পুরানো জেরুজালেম আরবদের অধিকারে ছেড়ে দেয় এবং নতুন জেরুজালেমে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারপর ১৯৬৭ সালের জুন (৫ই-১০ই) মাসে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে (দ্র) ইসরায়েল বহু আরব এলাকাসহ জেরুজালেম নগরীও পুরোপুরি দখল করে। ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে ইসরায়েলি পার্লামেন্টে একটি বিল পাশ করা হয়; তার বলে সর্বকালের জন্য এই নগরীকে ইসরায়েল রাষ্ট্রের একমাত্র ও অবিভাজ্য রাজধানী রূপে ঘোষণা করা হয়।

জেরুজালেম নগরীর দর্শনীয় স্থানগুলো হল আল-আক্সা ও উমর মসজিদ, ইহুদিদের রোদন প্রাচীর (ওয়েলিং ওয়াল), মাউন্ট অব অলিভ্‌জ-এর উপর বিখ্যাত গেথশেমানি (Gethsemane) উদ্যান, ক্রুশ বহনকারী যিশুখ্রিস্টের পদধূলিধন্য 'ভিয়া দোলোরোজা' বা দুঃখময় পথ, যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্থান গোল্‌গোথা এবং তাঁর সমাধিস্থল আরিমাথেয়ায় যোসেফের উদ্যান।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও জেরুজালেমের কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ রয়েছে। অবশ্য ইসরায়েল তাঁর পূর্বসিদ্ধান্তে অটল রয়েছে।

বি. ব.

জেলহত্যা

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে যে বর্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, পৃথিবীর (দ্র) ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে (দ্র) হত্যার পর ক্ষমতায় আসেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ। এ সময় বঙ্গবন্ধুর ৪ জন ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং বেশ কয়েক জন আওয়ামী লীগ (দ্র) নেতা জেলে বন্দি হন। এই চার নেতা হচ্ছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম (দ্র), তাজউদ্দিন আহমদ (দ্র), মনসুর আলী (দ্র) ও মোহাম্মদ কামারুজ্জামান (দ্র)।

খোন্দকার মোশতাক ক্ষমতায় থাকলেও তখন মূলত

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দিন আহমদ

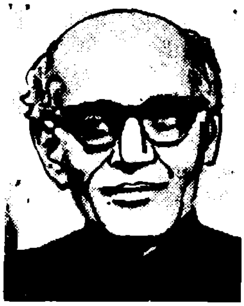

মনসুর আলী

মো. কামারুজ্জামান

জেলখানায় বন্দি অবস্থায় ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ মুক্তিযুদ্ধের চার নেতাকে হত্যা করা হয়

দেশ পরিচালনা করছিল ১২ জন মেজর। সেনাবাহিনীর সিনিয়র সদস্যরা মেজরদের কর্তৃত্ব মানতে রাজি ছিলেন না। ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবল অসন্তোষ বিরাজ করছিল। এই অবস্থার পটভূমিতে ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যার পর

www.pathagar.com

যখন সমস্ত কয়েদি লক-আপে, তখন গোলন্দাজ বাহিনীর কালো পোষাকে কতিপয় সৈন্য জেলখানায় ঢুকতে চায়। জেলার প্রথমে অনুমতি দেন নি। সেই সময় মোশতাক আহমদের বরাতে জেলারের কাছে ফোন আসে সৈন্যদের ঢুকতে দেওয়া হোক।

এভাবেই উক্ত সৈন্যরা জেলখানায় ঢুকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী ও মোহাম্মদ কামারুজ্জামানকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে এবং গুলি করে হত্যা করে।

৩রা নভেম্বর (১৯৭৫) জেলখানায় হত্যাকাণ্ড হয় বলে এই তারিখ 'জেলহত্যা দিবস' নামে পরিচিত।

র. হা.

জেলিফিশ (jellyfish)

কক্সবাজার (দ্র) সমুদ্রসৈকতে খুব ভোরে গেলে বালির উপর এক থালা জেলির মতো কিছু একটা পড়ে আছে দেখা যায়। স্থানীয় ভাষায় এদের 'নুন্যা' বলা হয়। নেড়েচেড়ে দেখলে

বোঝা যায় এটি একটি প্রাণীর (দ্র) মৃতদেহ—জেলিফিশ বা জেলি মাছের মৃতদেহ। মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণী। জেলি মাছ নাম হলেও এটি সিলেনটারেটা (coelenterata) পর্বের অমেরুদণ্ডী (দ্র) প্রাণী। জেলিফিশ বহু ধরনের আছে। সচরাচর যেটি পৃথিবীর (দ্র) প্রায় সব সমুদ্রোপকূলে দেখা যায় তার নাম অরেলিয়া। অরেলিয়া দেখতে ছাতার মতো। এর পরিধি ৩-৪ সেন্টিমিটার। আটলান্টিক মহাসাগরের (দ্র) উপকূলে অনেক বড় জেলি মাছ দেখা যায়। বড় জেলি মাছের আরেক নাম সূর্যজেলি মাছ। কক্সবাজারে যেটি দেখা যায় এটির নাম চন্দ্রজেলি মাছ। এর ছাতার মতো উত্তল তলকে বহিঃছত্রক তল এবং নিচের অবতল তলকে অধঃছত্রক তল বলা হয়। ছত্রকের কিনারায় সমান দূরত্বে আটটি গর্ত থাকে। প্রতি গর্তে থাকে একটি টেন্টাকুমোসিস্ট নামের ইন্দ্রিয়। ছাতার পুরো কিনারা জুড়ে থাকে ছোট ছোট কর্ষিকা। স্পর্শ-ইন্দ্রিয় দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। কর্ষিকা দিয়ে ওরা চারপাশের অবস্থা অনুভব করে। অবতলের কেন্দ্রে স্যানুব্রিয়াম নামক খাটো অঙ্গ থাকে। এর পুরোভাগে থাকে মুখ। মুখের চার কোণ থেকে চারটি দীর্ঘ বাহুর মতো অঙ্গ গজায়। কর্ষিকা ও বাহুর সাহায্যে ওরা ডিম, মাছ, ছোট ছোট শূককীট এবং প্রাণীদেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ধরে খায়। স্ত্রী ও পুরুষ জেলিফিশের ডিম্ব ও শুক্রকীটের মিলনে শিশু জেলিফিশের জন্ম হয়।

ত. চ.

জেহাদ / জিহাদ

জেহাদ কথাটি এসেছে আরবি ভাষা থেকে। জেহাদের অর্থ কঠোর পরিশ্রম, চেষ্টা, সাধনা, সংগ্রাম করা ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে শব্দটি সাধারণভাবে ধর্মযুদ্ধ (দ্র) এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধকে বোঝায়। তবে যে শব্দটি থেকে জেহাদ কথাটির উৎপত্তি, তার সঙ্গে কিন্তু অস্ত্রযুদ্ধের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। হযরত মুহম্মদ (স.)(দ্র)-এর মক্কায় (দ্র) প্রচারজীবনে অবতীর্ণ আয়াতে যে জেহাদের নির্দেশ রয়েছে, তা কিন্তু অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। 'যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে, সে শুধু তার আত্মার মঙ্গলের জন্য পরিশ্রম করে'—এই কাজকে জেহাদ বলা হয়েছে। অস্ত্রধারণের কথা এখানে বলা হয় নি। আর তখন মুসলমান সমাজও অস্ত্রধারণ করার মতো শক্তিসঞ্চয়

www.pathagar.com

করে নি। প্রকৃত পক্ষে, সে সময় সৎকাজ করার অর্থেই জেহাদ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ মানুষের পশুপ্রবৃত্তি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন ও সৎকাজ করতে বাধা দেয় বলে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। জেহাদ শব্দটি ব্যবহারের এটিই হল তাৎপর্য।

জেহাদ দুই প্রকার—বড় জেহাদ এবং ছোট জেহাদ। বড় জেহাদকে 'জেহাদে আকবর' বলা হয়। ইসলাম ধর্মের (দ্র) প্রকাশ্য শত্রুদের সঙ্গে অসিযুদ্ধকে বলা হয় 'জেহাদে আসগর'। এটা হল ছোট জেহাদ। আর বড় জেহাদ বা 'জেহাদে আকবর' হচ্ছে কুপ্রবৃত্তি ও আত্মার কুপ্ররোচনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সবচাইতে কঠিন যুদ্ধ হচ্ছে প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করা। এ যুদ্ধে ধাতব অস্ত্রের প্রয়োগ নেই। আত্মার কুপ্ররোচনা সব সময় মানুষকে কু-পথে চালায়। গোপন শত্রুরূপী শয়তান ও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করাই হচ্ছে জেহাদে আকবর বা বড় জেহাদের কাজ। অত্যাচারের মুখে ধৈর্যধারণ ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন অর্থেও জেহাদ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। হযরত মুহম্মদ (স.) বলেছেন যে অত্যাচারী শাসকের মুখের ওপর সত্য বা হক কথা বলাই হচ্ছে কঠিনতম জেহাদ। তিনি এক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আরো বলেছিলেন, 'আমরা ছোট জেহাদ (অস্ত্রের যুদ্ধ) থেকে বড় জেহাদে (জেহাদে আকবর বা প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধে) ফিরে এসেছি।'

যাঁরা জেহাদ করেন তাঁদের মুজাহিদ বলে। যাঁরা জেহাদে জয়লাভ করেন তাঁরা গাজী এবং যাঁরা জেহাদে মারা যান, তাঁরা হন শহীদ (দ্র)। যাঁরা জেহাদে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের সম্পর্কে কুরআন শরীফ (দ্র) ও হাদিসে (দ্র) প্রচুর প্রশংসা করা হয়েছে। যাঁরা জেহাদে শহীদ হন, তাঁরা মৃত নন, তাঁরা জীবিত, জান্নাতের দরজা তাঁদের জন্য খোলা—এ জাতীয় অনেক সুরা কুরআন শরীফে আছে।

মোট কথা, সমাজে সত্য ও শক্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এবং অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য মনপ্রাণ উৎসর্গ করে যুদ্ধ করাকে জেহাদ বলে। জেহাদ ইসলামী কর্মসৌধের অন্যতম প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর। দেশ জয় করা জেহাদের প্রেরণা নয়।

শা. হ.

জেহাদ, কে. এম. নাসিরউদ্দিন (শহীদ) [১৯৬৯—১৯৯০]

১৯৯০ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে শহীদ কে. এম. নাসিরউদ্দিন জেহাদ সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার নবগ্রামে ১৯৬৯ সালের ৬ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খন্দকার মঈনুদ্দীন মাহমুদ। স্থানীয় আকবর আলী কলেজে পাঠরত অবস্থায় জেহাদ ছাত্র- রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং শহীদ জিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী ছাত্রদলে যোগদান করেন।

১৯৯০ সালে অক্টোবর মাস। দেশে এরশাদবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ঢাকা মিছিলের নগরীতে পরিণত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পৃথক পৃথকভাবে ১০ই অক্টোবর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই অবরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য জেহাদ ৬০ সদস্যের একটি ছাত্রদল নিয়ে উল্লাপাড়া থেকে ঢাকায় আসেন। ঐদিন মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় জেহাদ মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাৎ বরণ করেন। জেহাদের মৃত্যু সারাদেশে ব্যাপক ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ছাত্র-রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয় এবং জেহাদের লাশ ছুঁয়ে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করে। এই আন্দোলনের মাত্র দুই মাস সময়ের মধ্যে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে।

১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় জেহাদের জন্ম, ১৯৯০ সালে আরেক গণঅভ্যুত্থানে জেহাদ শহীদ হন।

মা. র.

জৈনধর্ম

বলা হয় যে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর (দ্র) মহাপুরুষ জৈনধর্ম প্রবর্তন ও প্রচার করেন। এঁদের প্রথম জন ঋষভদেবের আবির্ভাব সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তীর্থঙ্কর দলের তেইশ ও চব্বিশতম মহাপুরুষ হলেন যথাক্রমে পার্শ্বনাথ ও মহাবীর (দ্র)। সাধারণত এই দু'জনকেই জৈনধর্মের

www.pathagar.com

প্রবর্তক মনে করা হয়।

পার্শ্বনাথ এক রাজবংশে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে জন্মগ্রহণ করেন বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। পরেশনাথ পাহাড়ে তিনি নির্বাণলাভ করেন। পাহাড়টি জৈনদের অন্যতম তীর্থস্থান। পার্শ্বনাথের চারটি মূল নীতি হল—হিংসা না করা, সৎ পথে চলা, চুরি না করা এবং অপ্রয়োজনীয় দান গ্রহণ না করা।

মহাবীর এই সঙ্গে আরো একটি উপদেশ যোগ করেন। সেটি হল ব্রহ্মচর্য। মহাবীরের প্রচারিত ধর্মাবলম্বীদের নির্গন্থি বা বন্ধনমুক্ত বলা হয়।

যাগযজ্ঞ বা জীবহিংসা জৈনধর্মে মহাপাপ। জৈনধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আত্মা বর্তমান। মানুষের মধ্যে আত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটলে তাঁকে ভগবান বলা চলে। মানুষ তার কর্মফলের কবল থেকে অব্যাহতি পেলেই তার মুক্তি সম্ভব হয়। এই মুক্তিলাভ সম্ভব জীবে দয়া করে, নিজেকে পীড়ন করে এবং কষ্টকর জীবন যাপন করে।

পূর্ব-ভারত থেকে জৈনধর্ম ধীরে ধীরে দক্ষিণ ও পশ্চিম-ভারতে ছড়িয়ে পড়লেও ভারতের (দ্র) বাইরে এই ধর্ম (দ্র) প্রচারিত হয় নি। রাজস্থান ও গুজরাটের অনেক অধিবাসীই বর্তমানে জৈনধর্মাবলম্বী।

জৈনধর্মাবলম্বীরা দুই ভাগে বিভক্ত : শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর (দ্র)। শ্বেতাম্বরেরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন এবং দিগম্বরেরা কোনো কাপড় পরিধান করেন না। বিশ্বাসের দিক থেকে এঁরা কিছুটা রক্ষণশীল।

টি. কি.

জৈব জ্বালানি

প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহনিঃসৃত কোনো পদার্থকে জ্বালানি (দ্র) হিসাবে ব্যবহার করা হলে সেই জ্বালানিকে জৈব জ্বালানি বলা হয়। ইংরেজিতে এর নাম বায়োমাস (biomass)। বর্তমানে পশুর মল থেকে বায়োগ্যাস তৈরি হচ্ছে যা জ্বালানি হিসাবে অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের হাওয়াই ও কাউয়াই দ্বীপে আখের ছোবড়া থেকে মিথাইল অ্যালকোহল (দ্র), ইথাইল অ্যালকোহল ও ভূতাপীয় শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। আখকে প্রথমে খুব ভাল করে ধুয়ে নিতে হয়। তারপর লম্বা গোলাকৃতির ধাতব দণ্ড দিয়ে তা মাড়ানো হয়। মাড়ানোর সময় আখের রস বের হয়। রসকে জ্বাল দিয়ে গুড় বা চিনিতে পরিণত করা হয়। রস নিংড়ানো ছোবড়া এবং আখের পাতা বড় পাত্রে নিয়ে জলসহ জ্বাল দেওয়া হয়। এতে জলীয় বাষ্প নির্গত হয়। এই বাষ্প টার্বাইনের (দ্র) মাধ্যমে প্রবাহিত করে জেনারেটর চালানো হয়। ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। টার্বাইন থেকে বেরিয়ে আসা অতিরিক্ত এক্‌জস্ট্‌ বাষ্প অতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি করে। একই সময়ে ঘনীভূত বাষ্প পানি ফোটানোর পাত্রে পানি হিসাবে ফিরে আসে। এই প্রক্রিয়া চালাতে বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় না। হাওয়াই ও কাউয়াই দ্বীপে প্রায় প্রতি খামারে এই প্রকল্প চালানো হচ্ছে। গাড়িতে পেট্রোল বা ডিজেলের বিকল্প হিসাবে ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহার সফল হয়েছে ভারতে (দ্র)। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মতে ১০০ ভাগ মিথাইল অ্যালকোহল দিয়ে গাড়ি চালানো সম্ভব। তবে এর জন্য একটি ভিন্ন ধাঁচের কার্বুরেটর (দ্র) নামক যন্ত্র বানাতে হবে যেটির দাম এক শ' ডলারের মতো পড়বে। কেবল আখের ছোবড়া নয়, ধানের খোসা, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদিকেও এ কাজে লাগানো যায়। বাংলাদেশে (দ্র) ব্যাপক আখের চাষ হয়। আখের ছোবড়াকে এ দেশেও জৈব জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার লাভজনক বিবেচিত হতে পারে। বায়োগ্যাস (দ্র) যে লাভজনক তা প্রমাণিত হয়েছে।

ত. চ.

জৈব দ্যুতি

জীবের দেহ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে আলো নিঃসৃত হয় সে আলো বা দ্যুতিকে জৈব দ্যুতি বলা হয়। ইংরেজিতে এই আলোর নাম বায়োলুমিনিসেন্স (bioluminescence) bio অর্থ জীব, luminescence অর্থ আলো বা দ্যুতি।

অতি ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী থেকে শুরু করে অতিকায় মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এ রকমের জৈব দ্যুতি দেখা যায়। স্থলজ ও জলজ উভয় প্রকার প্রাণীতে জৈব দ্যুতি আছে। স্থলজ অর্থাৎ স্থলভাগে জন্মায় এমন প্রাণীদের মধ্যে ফায়ার ফ্লাই, গ্লো ওয়ার্ম এবং আমাদের সকলের পরিচিত জোনাকি (দ্র) পোকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। যেসব জলজ

www.pathagar.com

বা জলে জন্মানো প্রাণীতে জৈব দ্যুতি লক্ষ করা যায় তাদের প্রায় সবগুলোই সমুদ্রের বাসিন্দা। এদের মধ্যে অতি ছোট নক্টিলুকা (Noctiluca) যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বিশাল সামুদ্রিক মাছ। এরা সমুদ্রের তলায় যেন আলোর মালা সাজিয়ে রাখে। এই আলোর মালা দেখে এক সময় বিজ্ঞানীরা ধারণা করতেন যে সমুদ্র দিনভর সূর্যের যে আলো শোষণ করে তা রাতে ছেড়ে দেয়। এই আলো যে জীবদেহ থেকে বিচ্ছুরিত হয়, তখন তাঁরা তা জানতেন না। পরে বিজ্ঞানীরা জীবদেহ থেকে যে আলো নির্গত হয় তা স্পষ্ট বুঝতে পারেন এবং এর কারণও ব্যাখ্যা করেন।

বিজ্ঞানীদের মতে, এ সকল প্রাণীর দেহে লুসিফারেজ ও লুসিফেরিন নামে দু'ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। লুসিফেরিনের সঙ্গে অক্সিজেনের (দ্র) উপস্থিতিতে লুসিফারেজ সংযুক্ত হলেই এই আলো উৎপন্ন হয়।

অনেক সময় কয়েক ধরনের ব্যাক্টেরিয়াও (দ্র) এই আলো সৃষ্টি করে থাকে। খোলস ছাড়ানোর পর অনেক চিংড়িতে (দ্র) এবং অনেক সামুদ্রিক মাছে এসব ব্যাক্টেরিয়া (দ্র) যুক্ত থেকে জৈব দ্যুতি সৃষ্টি করে।

ত. চ.

জোনাকি

রাতের অন্ধকারে মিটমিট করে জ্বলে আর চলে। ভেজা স্যাঁৎসেঁতে বন-জঙ্গল ও ঝোপ-ঝাড়ে এরা আহার খোঁজ করে। এরা মাংসাশী। এদের ছোট ছোট তিন জোড়া পা আছে। পুরুষ জোনাকির সাজসজ্জা জাঁকজমকপূর্ণ। এদের বুকের নিচের অংশের রঙ বাদামি। এদের দেহের প্রতি অংশের প্রান্তভাগ উজ্জ্বল লাল রঙের দু'টি ফোঁটা দিয়ে সজ্জিত। শামুক জোনাকির নিয়মিত খাদ্য। জোনাকির চুলের মতো সরু ও ধারালো দু'টি হুল আছে। প্রথমে এরা সেই ধারালো হুল দিয়ে হাল্কাভাবে শামুকের শুঁড় স্পর্শ করে। এভাবে ৮–১০ বার স্পর্শ করতে করতে শামুকের গায়ে এক রকম বিষাক্ত পদার্থ ঢুকিয়ে দেয়। ফলে শামুকটি মারা যায়। তারপর ধীরে ধীরে শামুকের দেহকে তরল করে নিয়ে জোনাকিরা দল বেঁধে তা পান করে। স্ত্রী জোনাকির কোনো পাখা নেই। এদের দেহের শেষ প্রান্তের তিন অংশে আলোর উৎস থাকে। প্রথম দু'টি অংশের প্রতিটির নিচের দিকে কোমরবন্ধের মতো আলোর একটি উৎস চোখে পড়ে। দেহের তৃতীয়াংশের উজ্জ্বল অংশটি ছোট এবং তাতে কেবল দু'টি বিন্দু থাকে। বিন্দু দু'টি পিঠের ভিতর দিয়ে আলোকিত হয় এবং তা উপর ও নিচ উভয় দিক দিয়েই দেখা যায়।

পুরুষ জোনাকির আলোর উজ্জ্বলতা কম। এদের দেহের শেষাংশের দু'টি বিন্দুই কেবল আলো ছড়ায়। অণুবীক্ষণ (দ্র) যন্ত্রে জোনাকির কোমরবন্ধ দেখলে ওর চামড়ার উপর ছড়ানো এক প্রকার সাদা গুঁড়ো দেখা যায়। এগুলো আলোর উৎস। এ উৎসের নিকটেই থাকে এক প্রকার বাতাস-নল। এর মাথা ছোট্ট বোঁটার মতো এবং তাতে অতি সূক্ষ্ম ধরনের লোমের মতো জিনিস থাকে। লোমগুলো সাদা গুঁড়োর উপর ছড়িয়ে থাকে। মাঝেমধ্যে ওগুলো গুঁড়োর মধ্যে ঢুকেও থাকে। জোনাকির শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমেই তার আলো আসে। জোনাকির এ আলো অক্সিডাইজেশনের ফলে সৃষ্ট। ইচ্ছা করলে জোনাকি তার এ আলো বাড়াতে ও কমাতে পারে। জোনাকি ঘাসের (দ্র) ডগায় বা মাটিতে (দ্র) ডিম পাড়ে। পরে তারা অবশ্য আর এসবের খোঁজখবর রাখে না।

মু. আ.

জোন্স, স্যার উইলিয়াম এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ দ্র

জোবেদা খানম [১৯১৭—১৯৯০]

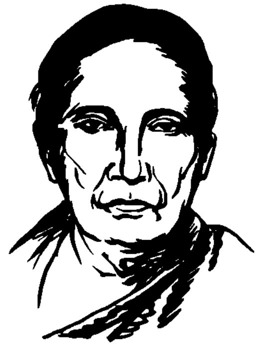

বাংলাদেশের (দ্র) শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যসেবায় নিবেদিতপ্রাণ মহিলা এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর (দ্র) প্রথম পরিচালক।

তিনি ১৯১৭ সালে (১৩২৪ বঙ্গাব্দের ৩১শে শ্রাবণ) কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলায় বালিয়াকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খন্দকার আজহারুল ইসলাম এবং মাতা মোসাম্মাৎ আলতাফুন্নেসা। পিতা ছিলেন স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর। পিতামহ খন্দকার মহীউদ্দীন আহমদ ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও সিদ্ধপুরুষ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর একটি কর্মশালায় পরিচালক জোবেদা খানম

এই পরিবারের মেয়েরা কঠোরভাবে পর্দাপ্রথা মেনে চলতেন।

পারিবারিক পরিবেশে জোবেদা খানমের শিক্ষাজীবন শুরু হলেও ১৯৩৪ সালে মাত্র তেরো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। স্বামী ডা. আবদুর রহিম খানের উদার সাহচর্যে নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে জোবেদা খানম প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর সিনিয়র ট্রেনিং কোর্স সমাপ্ত করেন এবং স্বামীর কর্মস্থল কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন। এ সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (দ্র) বেঙ্গল প্যাক্টের সুবাদে কলিকাতা কর্পোরেশন স্কুলে বহু মুসলমানের চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হলে জোবেদা খানমও শিক্ষিকার চাকুরি লাভ করেন। কিন্তু ১৯৪১ সালে তাঁর স্বামীর অকালমৃত্যু ঘটলে সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে তিনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তবে তিনি এতে ভেঙে না পড়ে চাকুরির পাশাপাশি প্রাইভেটে আই. এ. এবং বি. এ. পাশ করেন। এর পর ১৯৪৬ সালে কলিকাতা ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. টি. পাশ করেন।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় জোবেদা খানম তাঁর দু'সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ববঙ্গে চলে আসেন এবং ঢাকার (দ্র) ইডেন স্কুলে শিক্ষিকা হিসাবে যোগ দেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে এম. এ. পাশ করেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন' ডিগ্রি এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারলটন থেকে বয়স্ক শিক্ষার ওপরও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

জোবেদা খানম ইডেন স্কুলের শিক্ষিকা হিসাবে যোগ দিলেও পরে ইডেন স্কুল কামরুন্নেসা স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ১৯৫০ সালে তিনি এই বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাবাজার স্কুলেও তিনি কিছুকাল প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করেন। এরপর তিনি ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সরকারি স্কুল পরিদর্শক, ১৯৬০ সাল পর্যন্ত 'ভিলেজ এড্' নামে একটি গ্রাম উন্নয়ন প্রোগ্রামে প্রশিক্ষক এবং ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত 'ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন' (বি. এন. আর.)-এর সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালেই তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ পদে যোগ দেন।

১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তগ্রহণ করলে জোবেদা খানম এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হন। তাঁর অনন্যসাধারণ উদ্যম, অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মপ্রচেষ্টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের অপরিহার্য মাধ্যম হিসাবে গড়ে ওঠে। আসলে শিশু একাডেমী ছিল তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান এবং মনের মতো কর্মক্ষেত্র। মাতৃসুলভ হৃদয় নিয়ে শিশুদের কল্যাণে এখানে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৮৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত শিশু একাডেমীর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর তিনি ১৯৮৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এখানেই তাঁর কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটে।

জোবেদা খানম অল পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন (APWA), বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ কাউন্সিল, আজিমপুর লেডিজ ক্লাব, জাতীয় শিশু ও মাতৃকল্যাণ অ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ছোটবেলায় পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবেই জোবেদা খানম শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। শিক্ষানুরাগী পিতা আজহারুল ইসলাম নিজেও সাহিত্যচর্চা করতেন। পিতার প্রভাবে জোবেদা খানমও ছোটবেলায় গল্প-কবিতা লিখতে শুরু করেন। পরবর্তী কালে বিদ্যোৎসাহী স্বামীর

www.pathagar.com

কাছ থেকেও তিনি উৎসাহ পেয়েছিলেন। এ সময় 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'মৃত্তিকা' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। দেশবিভাগের পর ঢাকায় এসে তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি নিবেদিতচিত্তে সাহিত্যসেবায় ব্রতী হন। তাঁর সাহিত্যচিন্তায় সমাজের নানাবিধ সমস্যাসহ অনগ্রসর বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর স্থান ও ভূমিকা প্রাধান্য পায়। বয়স্কপাঠ্য সাহিত্য এবং শিশুসাহিত্য উভয় মাধ্যমেই তাঁর বিচরণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল— উপন্যাস : 'অভিশপ্ত প্রেম' (১৯৫৯), 'দুটি আঁখি দুটি তারা' (১৯৬৩), 'আকাশের রঙ' (১৯৬৪), 'বনমর্মর' (১৯৬৭), 'অনন্ত পিপাসা' (১৯৬৭), 'একটি ফুল দু'টি ফুল', 'সূর্যমুখী'; গল্প : 'কুকুর অ্যাডভেঞ্চার' (১৯৬৭), 'ওরে বিহঙ্গ' (১৯৬৮), 'একটি সুরের মৃত্যু' (১৯৭৪); শিশুসাহিত্য : 'গল্প বলি শোন' (১৯৬৬), 'সাবাস সুলতানা' (১৯৮২), 'শাহরিয়ারের অ্যাডভেঞ্চার' (১৯৮৪), 'বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ '(১৯৮৮)।

ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশনে কর্মরত থাকাকালে ১৯৬৪ সালে কর্মজীবনের সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি তৎকালীন জাতীয় পুরস্কার 'তমঘা-ই খিদ্‌মত' লাভ করেন।

১৯৯০ সালের ২৬শে জানুয়ারি জোবেদা খানম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সম্মানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর গ্রন্থাগারের নাম রাখা হয়েছে 'জোবেদা খানম শিশু গ্রন্থাগার'।

সুজ. ব.

জোয়ান অব আর্ক [১৪১২—১৪৩১]

পরাধীন ফ্রান্সের মুক্তিদাত্রী বীরকন্যা এবং রূপকথাতুল্য এক নেত্রী জান্ দার্ক্ (Jeanne d' Arc), যিনি ইংরেজিতে Joan of Arc নামে পরিচিত। ইংরেজদের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৩৩৭–১৪৫৩) সময় তিনি ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। মিউজ নদীর তীরে দঁরেমি গ্রামের এক সাধারণ কৃষক পরিবারে ১৪১২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রান্স তখন ইংরেজদের শাসনাধীন। ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরির (১৩৮৭–১৪২২) পুত্র ষষ্ঠ হেনরি (১৪২১–১৪৭১) ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করলে ফ্রান্সের রাজা পালিয়ে যান।

জোয়ান লেখাপড়া জানতেন না। কথিত আছে, মাত্র তেরো বছর বয়সে মাঠে ভেড়ার পাল চরাবার সময় তিনি দৈববাণী শুনতে পান যে তাঁকে মাতৃভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও ফ্রান্সের প্রকৃত রাজাকে ক্ষমতায় পুনর্বহাল করার জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। এই দৈববাণী তাঁর জীবনকে আমূল পাল্টে দেয়।

জোয়ান এর পর অনেক চেষ্টা করে ফ্রান্সের পলাতক রাজা সপ্তম চার্লসের সঙ্গে দেখা করেন এবং দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর কাছে সৈন্য প্রার্থনা করেন। রাজা প্রথমে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলেও যাজক সম্প্রদায়ের পরামর্শে জোয়ানকে সৈন্যসাহায্য দিতে সম্মত হন।

জোয়ান সাদা পোশাক পরিধান করে একটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে পঞ্চক্রুশধারী তরবারি হাতে ৪০০০ সৈন্য নিয়ে ১৪২৯ সালে ২৮শে এপ্রিল অবরুদ্ধ নগরী অরলেয়াঁয় প্রবেশ করেন। প্রথম আক্রমণেই তাঁরা জয়লাভ করেন এবং এরপর তাঁদের একের পর এক সাফল্য আসতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা ইংরেজ সৈন্যদের কবল থেকে তুরেলবুরুজ শহর উদ্ধার করেন। এরপর পাতে'র যুদ্ধেও ইংরেজেরা পরাজিত হয়। জুন মাসে জোয়ান তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে রীইঁ (Reims) নগরী অধিকার করেন। এর পর ১৬ই জুলাই সপ্তম চার্লস ফ্রান্সের রাজা হিসাবে আবার সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং এভাবে জোয়ান ফ্রান্সকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নেন।

কিন্তু ইংরেজেরা জোয়ানকে জব্দ করার ফন্দি আঁটতে থাকে। কঁপিঞ্যান্ (Compiègne) শহরের বহির্ভাগে শত্রুসৈন্যদের ওপর আক্রমণকালে ফ্রান্সের রাজনৈতিক দল বার্গেণ্ডি-কর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজেরা জোয়ানকে আটক করতে সক্ষম হয়। তারপর এক ইংরেজ

www.pathagar.com

পাদ্রির অধীনে তাঁর বিচারকাজ চলে। বিচারে তাঁর কার্যকলাপকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী আখ্যা দিয়ে তাঁকে 'ডাইনি' সাব্যস্ত করা হয়। আইনে এর শাস্তির বিধান ছিল জীবন্ত পুড়িয়ে মারা। এই রায় অনুসারে জোয়ানকেও তাই ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ফরাসিরা চিরতরে ফ্রান্সে ইংরেজদের সকল অধিকার ও চিহ্ন মুছে দেওয়ার প্রয়াস পায়।

জোয়ান অব আর্কের স্মরণে ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানে অনেক স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে।

সুজ. ব.

জোয়ার

জোয়ার এক ধরনের বর্ষজীবী খাদ্যশস্য। এর ইংরেজি নাম মিলেট (Millet) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *সর্ঘাম ভালগেয়ার (Sorghum Vulgare,* (h). Pers.)। এর গাছগুলো ১ মিটার থেকে ৪·৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। বেশির ভাগ জোয়ারেই পাশকাঠি হয় না। এরা অনাবৃষ্টি সহ্য করতে পারে। জোয়ারের দানায় ভুট্টার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি পরিমাণে প্রোটিন থাকে। বহুবর্ষজীবী জনসন ঘাস এর অন্তর্ভুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) জোয়ারের ব্যাপক চাষ হয়। শ্রেণীভেদে এর দানার রঙ লাল, সাদা, কালো ও হলুদ হয়। সাধারণ জোয়ার বা *প্যানিকাম মিলিসিয়াম (Panicum miliceum* h.) প্রাচীন কাল থেকে মানুষ ও পশুর খাদ্য। উত্তর আমেরিকায় (দ্র) শিয়ালের লেজের মতো জোয়ার (Indian millet), সেটারিয়া গ্লাওকা বোভ্ *(Setaria glauca* Beauv) পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে গমের আটার পরেই জোয়ারের আটার স্থান। জোয়ার বাংলাদেশে (দ্র) তেমন গুরুত্বপূর্ণ ফসল নয়।

মু. আ.

জোয়ার-ভাঁটা

চাঁদ (দ্র) ও সূর্যের (দ্র) মহাকর্ষজনিত আকর্ষণে ভূপৃষ্ঠের পানি (দ্র) কোথাও ফুলে ওঠে, তখন সেখানে জোয়ার। আর অন্য জায়গায় পানি নেমে যায়, তখন সেখানে ভাঁটা। এটি সব জলাশয়ে ঘটলেও সমুদ্র-উপকূলের সংলগ্ন নদী-খাল ইত্যাদিতে সমুদ্রের ফুলে ওঠা বিপুল পানি প্রবেশ করতে পারে বলে সেখানেই পানির ওঠা-নামাটি স্পষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, এরকম স্থানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আসা জোয়ার আর ভাঁটা মানুষের কোনো কোনো কাজ-কর্মকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন জোয়ারের সময় পানি বাড়লে জাহাজ সহজে বন্দরে ভিড়তে পারে, ভাঁটার সময় অচল হয়ে থাকা নৌকার মাঝি জোয়ারের স্রোতে নৌকা ছাড়েন, ভাঁটায় পানি সরলে বেলাভূমিতে ঝিনুক কুড়োবার সুযোগ হয় ইত্যাদি। জোয়ার-ভাঁটার টান থাকলে পানি আবদ্ধ থাকে না, ময়লা আবর্জনা ধুয়ে যেতে পারে।

চাঁদের চেয়ে সূর্য ২ কোটি ৭০ লক্ষ গুণ বেশি ভারি। ভরের (দ্র) সঙ্গে আকর্ষণ সমানুপাতিকভাবে বাড়ে, কিন্তু দূরত্বের বর্গের সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে তা কমে। পৃথিবী (দ্র) থেকে চাঁদের দূরত্বের চেয়ে সূর্যের দূরত্ব ৩৯০ গুণ বেশি। তাই শেষ অবধি জোয়ারের ক্ষেত্রে চাঁদের আকর্ষণটাই বেশি কার্যকর। চাঁদ ভূপৃষ্ঠের যে জায়গার ঠিক উপরে থাকবে সেখানকার পানি ফুলে উঠবে। একই সঙ্গে পৃথিবীর কঠিন অংশও সেদিকে কিছুটা সরে আসবে বলে ভূ-গোলকে এর ঠিক বিপরীত জায়গার পানিও ফুলে উঠবে। এই দুই জায়গায় এ সময় জোয়ার। এখানে আবার জোয়ার আসবে নিজ অক্ষের (দ্র) উপর পৃথিবীর আবর্তনে চাঁদ যখন আবার এই দুই জায়গার রেখা বরাবর আসবে তখন, অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা পর। অবশ্য একই সময়ে পৃথিবীর চতুর্দিকে চাঁদেরও কিছু পরিক্রমা ঘটবে বলে আরো ২৫ মিনিট বেশি সময় কাটবে দুই জোয়ারের মাঝে। এই দুই জোয়ারের ঠিক মধ্যবর্তী সময়ে সবচেয়ে বেশি ভাঁটার অবস্থা—তখন চাঁদের টান অন্যত্র সরে গেছে বলে পানি সমুদ্রের দিকে সরে গিয়ে নেমে যাবে। সব জোয়ার অবশ্য একই রকম তীব্র হয় না। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় চাঁদ ও সূর্য উভয়ে পৃথিবীর সঙ্গে একই সরল রেখায় থাকে বলে জোয়ারে সূর্যের আকর্ষণটুকুও যোগ হয়। তাই তখন ভরা জোয়ার। আবার পূর্ণিমা ও অমাবস্যার মাঝামাঝি চাঁদ থাকে পৃথিবীর যেদিকে সূর্য থাকে তার সমকোণে। জোয়ারের তীব্রতা তখন তাই সবচেয়ে কম হয়—এটি মরা জোয়ার।

www.pathagar.com

জোয়ারের তীব্রতা উপকূলের ও নদী-মোহনার আকৃতির ওপরও কিছুটা নির্ভর করে। ফানেল আকৃতির নদী-মোহনায় জোয়ারের পানি প্রচুর ঢুকে অনেক উচ্চতা পর্যন্ত ফুঁসে ওঠে। ভাঁটার সময় বাইরে পানি নেমে গেলে এই পানিকে নিচে পড়তে দিয়ে জলবিদ্যুৎ (দ্র) তৈরি করা হয়। জোয়ার-ভাঁটা এভাবে নবায়নযোগ্য শক্তির চমৎকার উৎস হতে পারে।

মু. ই.

জোলা, এমিল্ [১৮৪০—১৯০২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি ঔপন্যাসিক এমিল জোলা (Émile Zola) বিশ্বের এক জন শ্রেষ্ঠ লেখক বলে সর্বজনস্বীকৃত। তিনি স্বভাববাদ বা প্রকৃতিবাদ বা নেচার‍্যালিজ্ম্ (naturalism) নামক একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য-আন্দোলনের জন্ম দেন। এখানে লেখক সাধারণ বাস্তবতাবাদকে অতিক্রম করে আরেকটু অগ্রসর হন। স্বভাববাদে প্রাধান্য পায় তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, গভীর বিশ্লেষণ এবং সকল প্রকার তুচ্ছতা, মালিন্য ও কুশ্রীতাসহ জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটির মোহমুক্ত উপস্থাপন। বাস্তব জীবন তো বেশির ভাগ সময়েই যন্ত্রণাদগ্ধ, নিষ্ঠুর, ক্লেদময়। সাহিত্যে এসব তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন জোলার মতো স্বভাববাদীরা।

১৮৭১ থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে রচিত বিশটি উপন্যাসের (দ্র) এক বিরাট সিরিজ এমিল্ জোলার অসামান্য কীর্তি। তিনি এই উপন্যাসমালার সাধারণ নাম দিয়েছিলেন 'রুগঁ-মাকার্ : দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক ইতিহাস'। জোলা এই উপন্যাসমালায় ফরাসি সমাজের নানা স্তর ও পর্যায় উপস্থিত করেছেন। চরিত্রদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পেশার নরনারী—গ্রামের কৃষক, শহুরে শ্রমিক, খনিমজুর, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ভদ্রলোক, বারবনিতা, শিল্পী, রাজনীতিবিদ প্রমুখ। জোলা সর্বপ্রকার ক্লেদ, কালিমা ও নোংরামিসহ সমকালীন সমাজের এক নিখুঁত ছবি এঁকেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'নানা'য় (১৮৮০) তিনি নানা নাম্নী এক বারবনিতার জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। অনেকে জোলার 'জার্মিনাল'কে (১৮৮৫) তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচনা করেন। খনিশ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রম ও দুঃখ-দুর্দশাভরা জীবন, তাদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন, ন্যায্য মজুরির দাবিতে ধর্মঘট, এরই মধ্যে তাদের প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এ উপন্যাসের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। উপন্যাসে সমাজের কালিমা ও নির্মমতার ছবি আঁকলেও জোলা চেয়েছেন ওই কুৎসিত শৃঙ্খলে বন্দি হতভাগ্য মানুষদের জীবনে আনন্দ, মুক্তি, স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষাব্যবহারের দক্ষতা ও সহানুভূতিশীল মন নিয়ে জোলা তাঁর উপন্যাসগুলিকে জীবন্ত, বাস্তবধর্মী ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ সাহিত্যগুণসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মও করে তুলেছেন।

ক. চৌ.

জোলিও-কুরি, জঁ ফ্রেদেরিক্ [১৯০০—১৯৫৮]

জন্ম ১৯শে মার্চ ১৯০০, প্যারিসে। পিতা নাম রাখেন জঁ ফ্রেদেরিক্ জোলিও (Jean Frédéric)। প্যারিস ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিজিক্স অ্যাণ্ড কেমেস্ট্রি থেকে স্নাতক (১৯৩২) হয়ে প্যারিসের সদ্য প্রতিষ্ঠিত রেডিয়াম ইনস্টিটিউটে গবেষণা-সহকারী হিসাবে যোগ দেন।

বিজ্ঞানী মাদাম কুরির বড় মেয়ে ইর‍্যান্ কুরি (Irène Curie : জন্ম ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৭, প্যারিস) ইতোমধ্যে মায়ের সহকারী হিসাবে রেডিয়াম ইনস্টিটিউটে কর্মরত ছিলেন। জোলিও এবং ইর‍্যান্ দু'জনেই সমমনা জুটি খুঁজছিলেন। ফলে ১৯২৬ সালে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহসূত্রে তাঁরা দু'জনেই জোলিও-কুরি (Joliot-Curie) পারিবারিক নাম গ্রহণ করেন।

স্বামী-স্ত্রী একত্রে পদার্থবিজ্ঞান (দ্র) বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। তাঁরা ১৯৩২ সালে নিউট্রন (দ্র) এবং ১৯৩৩ সালে পজিট্রন কণিকার সন্ধান পান। কিন্তু সামান্য কয়েক দিনের ব্যবধানের জন্য দু'টি আবিষ্কারের গৌরবই পান

www.pathagar.com

যথাক্রমে বিজ্ঞানী চ্যাডউইক এবং অ্যাণ্ডারসন। তাঁরাও আলাদা ভাবে একই গবেষণা করছিলেন। জোলিও-কুরি দম্পতি ১৯৩৪ সালে বোরন থেকে তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেন আইসোটোপ (দ্র) উৎপাদন করে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌল উৎপাদনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। এ জন্য ১৯৩৫ সালে তাঁরা রসায়নে নোবেল পুরস্কার (দ্র) পান।

তাঁরা উভয়েই জার্মান-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ফ্রান্সের স্বাধীনতার পর ফ্রেদেরিক্ ফরাসি পরমাণুশক্তি কমিশনের প্রধান এবং ইর‍্যান্ অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। এই কমিশনের প্রচেষ্টায় ফ্রান্স ১৯৪৮ সালে প্রথম পরমাণবিক চুল্লি স্থাপন করে।

ফ্রেদেরিক্ এবং ইর‍্যান্ দু'জনেই ফ্রান্সের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৫০-এর পর থেকে তাঁরা উভয়েই কেবল গবেষণা, শিক্ষাদান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করেন। মায়ের মতো দীর্ঘদিন লিউকেমিয়ায় (দ্র) ভুগে ইর‍্যান্ জোলিও-কুরি ১৯৫৬ সালে এবং হেপাটাইটিস (দ্র) রোগে ভুগে ফ্রেদেরিক্ জোলিও-কুরি ১৯৫৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

স. রা.

জোলিও-কুরি পুরস্কার

বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক ফ্রান্সের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রেদেরিক্ জোলিও-কুরির স্মরণে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই পুরস্কার লাভ করেন। বাংলাদেশের (দ্র) শেখ মুজিবুর রহমান (দ্র) এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের (দ্র) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (দ্র), মিশরের গামাল আবদুল নাসের, কিউবার ফিদেল্ কাস্ত্রো, চিলির সালভাদোর আলেন্দে (দ্র) প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব।

খু. জা.

জ্ঞান

'জ্ঞান' শব্দটির দার্শনিক ব্যাখ্যা বহুমুখী ও বহুব্যাপ্ত। ইংরেজি knowledge শব্দের অনেক সমার্থক শব্দ রয়েছে, যেমন assured belief, enlightenment, learning ও perception, বাংলাতেও 'জ্ঞান'-এর রয়েছে একাধিক সমার্থক শব্দ, যেমন প্রমা, বোধ, বুদ্ধি, মতি, সংজ্ঞা, বৈদগ্ধ্য, প্রমিতি ইত্যাদি। শব্দটি বিষয়ভেদে বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে থাকে। তবে এর মূলগত অর্থ হল ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বিষয়ে চেতনা বা উপলব্ধি প্রাপ্ত হওয়া, কিংবা মন বা মনন আলোকিত হওয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গাছ থেকে মাটিতে আপেল পতনের গতি (দ্র) বা গতিভঙ্গি দর্শনে বিজ্ঞানী নিউটন (দ্র) পৃথিবীর (দ্র) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করেছিলেন, সেটাই জ্ঞান। বস্তুবাদী দর্শনশাস্ত্রে একেই বলা হয় ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বা চাক্ষুষ প্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান।

চার্বাকপন্থীরা বলেন, প্রত্যক্ষের সাহায্যে কেবল বর্তমানকেই জানা যায়, অতীত ও ভবিষ্যৎকে জানা যায় না। ফলে অতীত বা ভবিষ্যৎ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলে এই মতাদর্শের মাধ্যমে সর্ব দেশ-কালগত জ্ঞান অর্জন অসম্ভব।

জৈনরা অপরোক্ষ ও পরোক্ষ উভয়বিধ জ্ঞান স্বীকার করেন। সাধারণভাবে যাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়, সেটা তাঁদের মতে, আপেক্ষিক বা তুলনামূলক। ব্যবহারিক জ্ঞান ছাড়াও জৈনরা পারমার্থিক জ্ঞানের কথা স্বীকার করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জোলিও কুরি পদক পরানো হচ্ছে। ১৯৭২ সালের ১০ই অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু এই পুরস্কারে সম্মানিত হন

www.pathagar.com

তাঁদের মতে, এ জাতীয় জ্ঞানের জন্য কোনো ইন্দ্রিয়মাধ্যমের দরকার পড়ে না। একমাত্র কর্মসংস্কারমুক্ত পুরুষ পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করে থাকেন।

বৌদ্ধ মতে, জ্ঞান যখন জ্ঞেয় (জ্ঞাতব্য) বিষয়টিকে পাইয়ে দেয়, সেই জ্ঞানই অবিসম্বাদিত বা সত্য এবং এই অবিসম্বাদিত জ্ঞানই প্রমাণ। কোনো কোনো বৌদ্ধ মতে, প্রমাণ ছাড়া প্রমাণসাধ্য বা প্রমেয় জ্ঞান হয় না সত্য, কিন্তু প্রমাণের অভাব হলেই যে প্রমেয় বা প্রমাণসাধ্য জ্ঞান নেই, এ কথা বলা যায় না।

ন্যায়দর্শন মতে, জ্ঞান লাভের পক্ষে ৪টি প্রমাণ স্বীকৃত—জ্ঞান কি, জ্ঞানের প্রকারভেদ, প্রমা অর্থাৎ সত্য বা যথার্থ জ্ঞান ও অপ্রমার প্রভেদ প্রভৃতি। এই শাস্ত্রের মতে, জ্ঞান নানা প্রকার, যথা—প্রমা বা প্রমিতি। এটা আবার চার ভাগে বিভক্ত—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দ। প্রমা হল অসন্দিগ্ধ যথার্থ বিষয়ানুভব।

সাংখ্য মতে, জ্ঞান প্রকাশাত্মক ও আত্মগত ব্যাপার। অপরিবর্তনীয় জ্ঞানই পরমার্থ সৎ বস্তু।

পাশ্চাত্য জগতে দর্শনচিন্তায় জ্ঞান, বিশ্বাস ইত্যাদি শব্দ ওতপ্রোত সম্পর্কযুক্ত। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের (দ্র) মতে, মননসাপেক্ষ সচেতনতা জ্ঞান পদবাচ্য। তিনি বলতেন, নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতনতা জ্ঞানান্বেষণের প্রথম ধাপ। যুক্তির পর যুক্তি স্থাপন করে এক দিকে তিনি যেমন পূর্বস্বীকৃত ধারণার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনে প্রয়াসী ছিলেন, তেমনি অন্য দিকে আলোচ্য বিষয়কে সুসংহত ও সুস্পষ্ট করে তুলতেও সচেষ্ট হতেন।

প্লেটো (দ্র) জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় পুরোপুরি সক্রেটিসেরই অনুসারী ছিলেন। তবে তাঁর বৈশিষ্ট্য এখানে যে তিনি এই পদ্ধতি জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ ও বিকশিত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোনো 'সত্য' দিতে পারে না। এই ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের নেপথ্যে স্থায়ী সত্য বিরাজমান। তাঁর আরো অভিমত, 'প্রত্যেক জ্ঞানেরই একটা লক্ষ্য থাকবে সম্পূর্ণতাকে অর্জন করা।'

জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনায় ফ্রান্সিস বেকন (দ্র) পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী। জ্ঞান বলতে তিনি বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের কথা বলেছেন। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞানই ছিল তাঁর আলোচনার কেন্দ্র।

জন লক্-এর (১৬৩২–১৭০৪) মতে, মন একটা নিরেট সাদা কাগজের মতো—উদ্দীপকসৃষ্ট ইন্দ্রিয়জাত সংবেদন মনের ওপর ছাপ অঙ্কিত করে। ফলে যেসব আন্তর ধারণা ও বহির্বিষয়গত ধারণার জন্ম হয়, তাদের উভয়ের মধ্যে যথাযথ মিল ও অমিল থেকেই উৎপত্তি হয় জ্ঞানের।

পাশ্চাত্য জ্ঞান-দর্শনে নবযুগের সূচনাকারী হচ্ছেন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট (দ্র)। কাণ্টের আগে জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনায় মনের ভূমিকা ছিল কারো কারো মতে নিষ্ক্রিয়, কারো কারো মতে সক্রিয়। কাণ্ট বললেন, জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে গ্রহণাংশে মন নিষ্ক্রিয়, কিন্তু সেটা সক্রিয় সমন্বয়াংশে। তাঁর অভিমত, দেশ-কালসাপেক্ষ জাগতিক বিষয় সম্পর্কেই আমরা জ্ঞানের অধিকারী হতে পারি; পারমার্থিক জ্ঞান সম্ভব নয়।

জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাননির্ভর না জ্ঞাননিরপেক্ষ, এর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কিনা, এই সব বিষয় জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনার অংশভুক্ত। জ্ঞানের আধারসীমা ভূপৃষ্ঠের একটি অতি ক্ষুদ্র বালুকণা থেকে শুরু করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এমনকি অসীম মহালোক পর্যন্ত প্রসারিত।

প্রাগৈতিহাসিক কালের কৃষ্টি বা সংস্কৃতির কয়েকটি স্তর লক্ষ করা যায়। 'অসভ্য যুগের' 'নিম্নস্তর'কে মানবজাতির শৈশবকাল বলে অভিহিত করা হয়। মানুষ তখন প্রতিকূল পরিবেশে বন্য হিংস্র প্রাণিকুলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উঁচু গাছের মাথায় বসবাস করত। এই যে তার আত্মরক্ষার, টিকে থাকার প্রয়াস, একেই মানবজাতির 'প্রাথমিক জ্ঞানোন্মেষ'-এর উৎস বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রাগিতিহাসের 'মধ্যস্তরে' পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালতে শেখা—এও মানুষের জ্ঞানোন্মেষেরই ফল, মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে যা বিস্ময়কর অবদানস্বরূপ। এর পর 'উচ্চস্তরে' তীর-ধনুকের উদ্ভাবন ও ব্যবহার—এখানেও মানুষের আরো এক ধাপ অগ্রসর বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানোন্মেষকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ফলে তার পক্ষে বিরূপ প্রকৃতির ওপর অধিকার জন্মায় আরো বেশি করে, তার বাঁচবার প্রাথমিক শর্তগুলো আরো দৃঢ় হয়। এইভাবে ক্রমশ সমাজ, সভ্যতা

www.pathagar.com

এবং মানবগোষ্ঠীর অগ্রগতির জয়যাত্রা সূচিত হয়। এসবের মূলে কার্যকর মানুষের সাধারণ জ্ঞান থেকে উচ্চতর জ্ঞানের সোপানে পৌঁছুবার নিরন্তর প্রচেষ্টা। তাই বলা হয়, 'জ্ঞানের নিয়ত উন্নত হাতিয়ারই সমাজ ও সভ্যতার নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি।' শেষ কথা, জ্ঞানই শক্তি। ইংরেজিতেও বলে 'Knowledge is power'।

আ. হু.

জ্ঞানদাস

জ্ঞানদাস ষোল শতকের পদাবলী (দ্র) সাহিত্যের এক জন সেরা কবি। তাঁর সুনাম চণ্ডীদাস (দ্র) বা বিদ্যাপতির (দ্র) চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তাঁর জীবন সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। তিনি ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। সে জন্য তাঁর পদে ভক্তের আবেগ বেশি পাওয়া যায়। সেকালের বটপত্রে জ্ঞানদাস সম্বন্ধে সামান্য কিছু তথ্য আছে।

শ্রীচৈতন্যের (দ্র) জীবনী লিখেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে জানা যায়, জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ শাখার এক জন বৈষ্ণব। নিত্যানন্দ ছিলেন চৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সহচর এবং বাংলার বৈষ্ণব সমাজের খুব বড় নেতা। জ্ঞানদাসের অনেক পদে নিত্যানন্দের প্রতি ভক্তি ও প্রশংসা আছে। পদগুলো পড়লে মনে হয়, জ্ঞানদাস নিত্যানন্দকে খুব কাছে থেকেই দেখেছিলেন। নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী জাহ্নবা দেবী বৈষ্ণব সমাজের নেত্রী হয়েছিলেন। জ্ঞানদাস ছিলেন জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। চৈতন্যের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে বৈষ্ণব গ্রন্থগুলো প্রচারের দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন, নরোত্তম দাস (আনু. ১৫৪০-১৬১০) তাঁদের এক জন। তিনি রাজশাহী (দ্র) জেলার খেতুরি নামক স্থানে এক মহাউৎসবের আয়োজন করেছিলেন এবং উৎসবে বাংলাদেশের সকল বৈষ্ণবকে ডেকেছিলেন। সেই মহামেলায় জ্ঞানদাসও অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তখন নাকি তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। জ্ঞানদাস বলরাম দাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের সমসাময়িক হতে পারেন। কারো মতে, তাঁর জন্ম ১৫৩০ সালে; কারো মতে, ১৫২০ থেকে ১৫৩৫ সালের মধ্যে। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে। নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচক্রা বা একচাকা গ্রামের কাছাকাছি এই কাঁদড়া গ্রাম। এখানে জ্ঞানদাসের একটি মঠ আছে। জ্ঞানদাসের মৃত্যু উপলক্ষে প্রতি বছর পৌষ মাসের পূর্ণিমার সময় এই জায়গায় মেলা হয়। জ্ঞানদাস অবিবাহিত ছিলেন বলে জানা যায়। অন্যমতে, তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর একটি পুত্র ছিল।

জ্ঞানদাস উৎকৃষ্ট পদকার। তাঁর কিছু স্মরণীয় পদ আছে। যেমন, 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর', কিংবা 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ' ইত্যাদি। এই সব পদ বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পদাবলীর গুণ ও মান বৃদ্ধিতে জ্ঞানদাসের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ষোল শতক পদাবলীর স্বর্ণযুগ। জ্ঞানদাস এই স্বর্ণযুগের কবি। ভক্তের অনুভূতিকে কবিতায় প্রকাশ করার অপূর্ব প্রতিভা তাঁর মধ্যে ছিল। জ্ঞানদাসের পদে আবেগ ও অনুভূতির চমৎকার মিলন ঘটেছে। শব্দব্যবহার ও ভাষাভঙ্গি একই রকম বলে জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের অনুসারী বলা হয়। অকৃত্রিম সহজ রচনারীতির দিক থেকে চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁর মিল অবশ্যই আছে। কিন্তু জ্ঞানদাস এক জন স্বতন্ত্র কবি। আধুনিক কালের গীতি-কবিতার বৈশিষ্ট্য তাঁর পদে পাওয়া যাবে। জ্ঞানদাসের নামে প্রায় শ' দুয়েক পদ চালু আছে। ব্রজবুলি (দ্র)-তেও তিনি অনেক পদ রচনা করেছেন। তবে তাঁর বাংলা পদগুলো ব্রজবুলির পদগুলোর তুলনায় অনেক ভাল। জ্ঞানদাস সঙ্গীত (দ্র) বিষয়েও এক জন বিশেষজ্ঞ। একালে রবীন্দ্রনাথ (দ্র) ও নজরুল (দ্র) যেমন নিজেদের লেখা গানে সুর দিয়েছেন, সেকালে জ্ঞানদাসও একই কাজ করেছেন। সম্ভবত এ ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস বাংলা সাহিত্যে (দ্র) প্রথম ব্যক্তি, যিনি গান লিখে সুর দিয়েছেন। কীর্তন (দ্র) গানেও তাঁর দক্ষতা ছিল বলা হয়। কীর্তনের নতুন ঢঙ তিনি তৈরি করেছিলেন।

আ. ক.

জ্বর (fever, pyrexia)

কোনো কোনো রোগের কারণে দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা (দ্র) বেড়ে যাওয়াকে জ্বর বলা হয়। কারণ যাই হোক, দেহে তাপ উৎপাদন ও তাপ নির্গমনের ভারসাম্য নষ্ট হলে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামক অংশে তাপনিয়ন্ত্রণকেন্দ্র অবস্থিত। ঐ কেন্দ্রে তাপ-উৎপাদক পাইরোজেন জাতীয় উপাদানের প্রভাবে জ্বর দেখা দেয়। জীবাণু (দ্র) বা দেহকলা থেকে পাইরোজেন তৈরি হতে পারে।

www.pathagar.com

জ্বর কোনো রোগ (দ্র) নয়, দেহস্থ রোগের লক্ষণ বা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। জ্বরের প্রত্যক্ষ কারণ সংক্রমণ (দ্র), দেহতন্ত্রের বিশেষ ধরনের রোগ কিংবা উত্তাপের সরাসরি প্রভাব (যেমন তীব্র সূর্যকিরণে সান্‌স্ট্রোক)। জীবাণু, ভাইরাস (দ্র), রিকেট্‌সিয়া, পরজীবী (দ্র) বা ছত্রাক (দ্র) সংক্রমণের কারণ হতে পারে। আবার এলার্জি (দ্র), ঔষধের (দ্র) প্রতিক্রিয়া, আঘাত বা রাসায়নিক বিষক্রিয়ায়ও দেহতাপ বেড়ে যেতে পারে।

সুস্থ মানুষের দেহে স্বাভাবিক তাপমাত্রা মুখে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা ৯৮·৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট। কিন্তু দেশ, পরিবেশ, জাতি ইত্যাদি ভেদে এই মাত্রায় কিছুটা হেরফের ঘটে। আবার একই ব্যক্তির বগলের তাপমাত্রা মুখপথ থেকে কিছুটা কম এবং পায়ুপথের তাপ মুখপথ থেকে ০·৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

জ্বরের প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন, অবিরাম জ্বর (continuous fever) কখনো স্বাভাবিক মাত্রা স্পর্শ করে না। অন্য দিকে রেমিটেন্ট জ্বরে তাপমাত্রা নেমে আসতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক মাত্রায় নামে না। কিন্তু সবিরাম জ্বর পুরোপুরি ছেড়ে গিয়ে আবার ওঠে। জ্বরের মাত্রা সংক্রমণের তীব্রতার ওপরও নির্ভর করে।

জ্বর উপশমের উপায় সংশ্লিষ্ট রোগের নিরাময়। তবে জ্বর খুব বেশি হলে যন্ত্রণা লাঘব করতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে জ্বরনাশক (অ্যান্টিপাইরেটিক) প্যারাসিটামল বা অ্যাসপিরিন খাওয়া যেতে পারে। এতে সাময়িক আরাম মেলে। আবার অত্যধিক জ্বরে অনেক সময় বরফ-পানি দিয়ে শরীর মুছে দিলে (স্পঞ্জিং) বা মাথায় আইসব্যাগ চাপালে জ্বর কিছুটা নেমে আসে অথবা স্বস্তি মেলে।

আ. র.

জ্বালানি

যা পুড়িয়ে তাপ পাওয়া যায় তাকে জ্বালানি বলে। জ্বালানি তিন প্রকার—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। অ্যানথ্রাসাইট, বিটুমিন কয়লা, লিগ্‌নাইট, পীট, কাঠকয়লা প্রভৃতি কঠিন জ্বালানির আওতাভুক্ত। তেমনি কাঠসহ উদ্ভিদদেহের অন্যান্য অংশ এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে বিটুমেন ও অ্যানথ্রাসাইট জাতীয় কয়লার তাপশক্তি তুলনামূলকভাবে বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিগ্‌নাইট পুড়িয়েও তাপ পাওয়া যায়। জলাভূমির মসবর্গের উদ্ভিদজাত এক প্রকার পদার্থের নাম পীট। এগুলোও অনেক সময় জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর তাপশক্তি বেশি নয়। কাঠ গ্রামাঞ্চলের প্রধান জ্বালানি। কাঠে প্রায় শতকরা ৪৮·৬৬ ভাগ কার্বন (দ্র) ও শতকরা ৫·৭৪ ভাগ হাইড্রোজেন (দ্র) থাকে।

তরল জ্বালানির মধ্যে পেট্রোল ও কেরোসিন (দ্র) প্রধান। তরল জ্বালানিতে ধোঁয়ার পারিমাণ কম। পেট্রোলিয়ামে (দ্র) গড়ে শতকরা ৮৫ ভাগ কার্বন ও ১৩ ভাগ হাইড্রোজেন থাকে। এগুলো দহন করা হলে কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) গ্যাস ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া এগুলো দহনের ফলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে থাকে। উড়োজাহাজ চালানোর জন্য গ্যাসোলিন জাতীয় জ্বালানির চাহিদা বেশি। প্রায় সকল প্রকার তরল জ্বালানির উৎপত্তি পেট্রোলিয়াম খনিজ থেকে। খনিতে (দ্র) পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে নানা প্রকার দাহ্য গ্যাস প্রচুর পরিমাণে জমা থাকে। এগুলোকে প্রাকৃতিক গ্যাস (দ্র) বলা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস জাতীয় জ্বালানিতে দাহ্য গ্যাসের এক বা একাধিক মিশ্রণ থাকে। গ্যাস জাতীয় কিছু জ্বালানির নাম নিচে উল্লেখ করা হল : মিথেন (দ্র), ইথেন, ইথিলিন (দ্র), বিউটেন, বিউটিলিন, প্রপেন, প্রপিলিন, অ্যাসিটাইলিন (দ্র), বেনজিন, হাইড্রোজেন ও কার্বন মনক্সাইড (দ্র)।

LP গ্যাস বা তরলিত পেট্রোলিয়াম গ্যাসও সীমিতভাবে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এ গ্যাসের তাপশক্তির পরিমাণ যথেষ্ট। তেজস্ক্রিয় পরমাণুর (দ্র) বিভাজনের কারণে অত্যধিক পরিমাণে তাপ নির্গত হয়ে থাকে। এক পাউণ্ড কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম ২৩৫ বিভাজনের ফলে তার চেয়ে ২৬ লক্ষ গুণ বেশি তাপ বের হয়। সেই প্রচণ্ড তাপ গ্যাস (দ্র) বা পানিতে (দ্র) শোষণ করিয়ে তার সাহায্যে স্টিম বয়লার বা টার্বাইনে (দ্র) প্রয়োগ করা হয়। ফলে তা থেকে তড়িৎ-শক্তি এবং যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়।

মু. আ.

জ্যামিতি গণিত দ্র

www.pathagar.com

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪৯—১৯২৫]

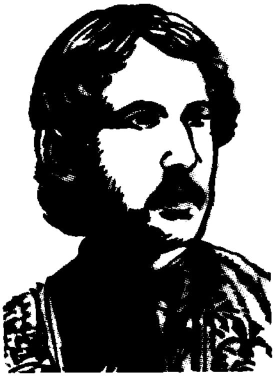

নাট্যকার, অনুবাদক, বহুভাষাবিদ, সঙ্গীত-রচয়িতা, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা ও সংগঠক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) ও সারদাসুন্দরী দেবীর সপ্তম সন্তান ও পঞ্চম পুত্র। বয়সে রবীন্দ্রনাথের (দ্র) চেয়ে এগারো বৎসর বড় হলেও এই 'ন-দা' বা 'নতুন দা' তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং কনিষ্ঠ ভাইটির উপর এঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবও ছিল সর্বাধিক। ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ২২শে বৈশাখ (১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মে) তারিখে কলিকাতার (দ্র) জোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুর-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যশিক্ষায় হাতেখড়ি স্বগৃহে। পরে বিভিন্ন স্কুলে লেখাপড়া করেছেন : সেন্ট পল্‌স্, মন্টেগু একাডেমী, হিন্দু স্কুল এবং সবশেষে ক্যালকাটা (অ্যালবার্ট) কলেজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৬৪)। প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র) এফ. এ. (F. A. = First Arts: এখনকার এইচ.এস.সি-র সঙ্গে তুলনীয়) ক্লাসে ভর্তি হন, কিন্তু পড়াশোনা শেষ করেন নি। মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ (দ্র) তখন আহমেদাবাদে চাকুরিরত; সেখানে চলে গিয়ে এক গুজরাটি ওস্তাদের নিকট সেতার শিখতে শুরু করেন এবং সেই সঙ্গে শিক্ষক রেখে ছবি আঁকা ও দু'টি বিদেশী ভাষা (ফরাসি ও মারাঠি) শিক্ষাও। কলিকাতায় ফিরে এসে সেতার চর্চা অব্যাহত থাকে, উপরন্তু যুক্ত হয় বেহালা (দ্র), পিয়ানো (দ্র) ও হার্মোনিয়াম (দ্র) শিক্ষা। তিনি ক্রমশ এসব যন্ত্র বাদনে কৃতবিদ্য হয়ে ওঠেন। প্রসিদ্ধ গায়কদের সঙ্গে যন্ত্রের সঙ্গত করার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও নাট্যকলার প্রতিভা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর ছোট ভাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতপ্রতিভা ও নাট্যরুচি বিকশিত হওয়ার পিছনে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব ও অবদান ছিল। নিজে পিয়ানো বাজিয়ে সুর তৈরি ও তার সঙ্গে ছোট ভাইকে দিয়ে কথা বসানোর চেষ্টা—দু' ভাইয়ের এই

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবি : ইন্দিরা দেবী

সাঙ্গীতিক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে বাঙালির সঙ্গীতভাণ্ডারে বহু বিখ্যাত গান সঞ্চিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের আদিযৌবনে রচিত বহু গানেরও সুর দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তা ছাড়া তাঁর নিজের রচিত বহু ব্রহ্মসঙ্গীত সেকালে রসিকসমাজে বিশেষরূপে আদৃত হয়েছিল, যদিও সেসব গান পুস্তকাকারে ছাপানো হয় নি। তাঁর নাট্যজীবনের সূত্রপাত ঘটে 'পুরুবিক্রম' নামে ঐতিহাসিক নাটক (দ্র) রচনার (১৮৭৪) মধ্য দিয়ে। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এটি মঞ্চস্থও হয়েছিল। তাঁর অন্যান্য নাটক—যেমন 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯), 'মানময়ী' (১৮৮০) নামে গীতিনাট্য, 'স্বপ্নময়ী নাটক' (১৮৮২) বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। তাঁর 'অলীকবাবু' প্রহসন (১৮৭৭-এ 'এমন কর্ম আর করব না' নামে বেরিয়েছিল) এখনো মঞ্চসফল নাটক। এসব ছাড়াও তিনি ফরাসি ও অন্যান্য ভাষা থেকে অনেক অনুবাদ করেছিলেন।

চিত্রশিল্পী রূপে তাঁর সিদ্ধি ছিল অতুলনীয়। তিনি পেন্সিল-স্কেচ অঙ্কনে পারঙ্গম ছিলেন এবং আমৃত্যু রেখাচিত্রে

www.pathagar.com

আরেকটি প্রতিকৃতি : চীনা মিস্ত্রি

প্রতিকৃতি এঁকে গেছেন অজস্র। ১৯১৪ সালে শিল্পী রোটেনস্টাইনের ভূমিকা সহযোগে তাঁর একটি অ্যালবাম বিলাতে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি কলিকাতা থেকে একটি অ্যালবাম ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে ইনিও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অতিপ্রজ ছিলেন—প্রায় ২০০০ ছবি এঁকেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাংগঠনিক শক্তিও ছিল বিস্ময়কর। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রূপে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে দায়িত্ব গ্রহণ করে একনাগাড়ে ১৯ বৎসর যাবৎ (১৮৬৯–৮৮) দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করেন। ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় স্বদেশী চেতনা জাগরণের উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দু মেলা' বা 'জাতীয় মেলা' বা 'চৈত্র মেলা' নামে যে বাৎসরিক সম্মেলনের কাজ নিয়মিতভাবে ১৪ বৎসর ধরে চলেছিল, তার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। অধিকন্তু 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্তসভা স্থাপন (সম্ভবত ১৮৭৬ সালে) করেছিলেন; এই প্রচেষ্টারও লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশদের তৈরি দ্রব্য পরিহার করে দেশীয় যাবতীয় বস্তুর প্রতি মানুষকে কৌতূহলী ও দরদী করে তোলা—এক কথায়, দেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি বিধান তাঁর লক্ষ্য ছিল এবং দেশলাই তৈরির কল, কাপড়ের কল, দেশী স্টিমার সার্ভিস চালানো, নীলচাষ ও পাটের ব্যবসা ইত্যাদি বহু উদ্যোগে ব্রতী হয়েছিলেন; পরিতাপের বিষয়, নানাবিধ প্রতিকূলতার কারণে তাঁর এই উদ্দেশ্য ও শ্রম সার্থক হয় নি।

স্ত্রীশিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলন সে যুগে অকল্পনীয় বিষয় ছিল। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে লোকের সমালোচনাকে উপেক্ষা করে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন : তাঁর নিজের সংসারে পর্দাপ্রথাকে তিনি আমল দেন নি, স্ত্রীকে সকলের সম্মুখে বের করতেন, তাঁকে নিয়ে প্রকাশ্যে সান্ধ্যভ্রমণে বের হতেন এবং নিজের শিক্ষা ও শিল্পরুচি দিয়ে স্ত্রীকে সুশিক্ষিতা করে তুলেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন সুখের হয় নি। ১৮৬৮ সালে কাদম্বিনী নামে একটি কিশোরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়; ঠাকুরবাড়িতে নববধূর নাম পরিবর্তন করে কাদম্বরী দেবী (১৮৫৯–৮৪) রাখা হয়। ইনি দেবর রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ছিলেন এবং স্বামীর এই কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে এত স্নেহ করতেন যে কবি সারা জীবন অজস্র প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখ করেছেন। যোগ্য স্বামীর পতিব্রতা সহধর্মিণী হয়ে উঠেছিলেন কাদম্বরী; তাঁদের গৃহে গুণীসমাগম নিত্যদিনের ঘটনা ছিল। এই মহিলাকে স্মরণ করে স্বামীর বন্ধু কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (দ্র) তাঁর 'সাধের আসন' কাব্যের (দ্র) নামকরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বৌঠানকে উৎসর্গ করেছিলেন একাধিক গ্রন্থ এবং তাঁকে স্মরণে রেখে রচনা করেছেন বহু গান। পরিতাপের বিষয়, কাদম্বরী দেবী পঁচিশ বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই মর্মান্তিক শোক সারা জীবন ভুলতে পারেন নি। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ঘটনার পরে ক্রমে নিজেকে এতখানি গুটিয়ে নেন যে শেষ পর্যন্ত কলিকাতা ছেড়ে চলে যান, বিহার প্রদেশের রাঁচিতে একটি টিলার উপরে বাড়ি কিনে নির্জনবাসে জীবন কাটিয়ে দেন।

রাঁচিতেই ৭৬ বৎসর বয়সে প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে এই প্রতিভাদীপ্ত পুরুষ পরলোক গমন করেন ১৯২৫ সালের ৪ঠা মার্চ।

হা. মা.

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিদ্যা

মহাবিশ্ব (দ্র) যা কিছু নিয়ে গঠিত সেসবের পর্যবেক্ষণ এবং সেসব নিয়ে যে বিজ্ঞান তাই জ্যোতির্বিদ্যা। এটি বিজ্ঞানের প্রাচীনতম শাখাসমূহের একটি। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদগণ মহাকাশে, গ্রহ-নক্ষত্রের চার্ট তৈরি করে তা ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন কাল থেকেই সময় রাখা, পঞ্জিকা তৈরি, সমুদ্রে জাহাজ (দ্র) চালনা ইত্যাদি কাজে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে মহাবিশ্বের একেকটি বৈজ্ঞানিক ছবিও জ্যোতির্বিদগণ খাড়া করার চেষ্টা করেছেন। ১০০ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক জ্যোতির্বিদ টলেমি (দ্র) যে বিশ্বচিত্রের বিস্তারিত জটিল জ্যামিতিক রূপ খাড়া করেন তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল আমাদের পৃথিবী (দ্র)। পরবর্তী দেড় হাজার বছর একেই নিখুঁত বিশ্বছবি মনে করা হয়েছে। ১৫৪৩ সালে প্রকাশিত গন্থে কোপার্নিকাসের (দ্র) সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা, একই শতাব্দীর শেষের দিকে দিনেমার জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহের (Tycho Brahe) অসংখ্য নিখুঁত পর্যবেক্ষণ, তাঁর সহকারী কেপ্লার(দ্র) কর্তৃক গ্রহের উপবৃত্তাকার পথের গাণিতিক নীতি আবিষ্কার, পরবর্তী শতকে গ্যালিলিওর (দ্র) দূরবীক্ষণভিত্তিক আকাশ পর্যবেক্ষণ, নিউটনের (দ্র) মহাকর্ষ তত্ত্ব ও গতিসূত্র আবিষ্কার অবশেষে জ্যোতির্বিদ্যাকে তার আধুনিক রূপে এনে দিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

জ্যোতির্বিদ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করেন প্রধানত দূরবীক্ষণ (দ্র) যন্ত্রের সাহায্যে। লেন্সভিত্তিক প্রতিসরণ দূরবীক্ষণ এবং বক্র আয়না-ভিত্তিক প্রতিফলন দূরবীক্ষণ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। মানমন্দির (দ্র) হল জ্যোতির্বিদের পর্যবেক্ষণের স্থল। দৃশ্য আলোয় গড়া জ্যোতিষ্ক দেখার যে সনাতন দূরবীক্ষণ, তা ছাড়াও এখন ব্যবহৃত হয় মহাকাশ থেকে আসা দুর্বল রেডিও তরঙ্গকে অনুধাবন করার জন্য রেডিও-দূরবীক্ষণ। একইভাবে আলট্রাভায়োলেট, ইনফ্রারেড, এক্সরে ইত্যাদি ভিত্তিক দূরবীক্ষণও রয়েছে। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক ফটোগ্রাফি (দ্র), ইলেক্ট্রনিক্স (দ্র) ও কম্পিউটার (দ্র) প্রযুক্তির সুবিধা। স্পেক্ট্রোস্কোপি বা বর্ণালিবীক্ষণের মাধ্যমে নক্ষত্রের বস্তুর গঠন, এমনকি তার গতিবিধি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। এসব পরিমাপের মাধ্যমে দূরতম জ্যোতিষ্কেরও দূরত্ব, গঠন, গতি, বয়স, আচরণ ইত্যাদি বহু তথ্য জানা এবং আন্দাজ করা সম্ভব হচ্ছে। মহাশূন্য অভিযানও এ ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এর ফলে কৃত্রিম উপগ্রহ (দ্র) থেকে স্কাইল্যাবের মতো মহাশূন্য-মানমন্দির থেকে বায়ুমণ্ডলের বাইরে আরো স্বচ্ছন্দ ও দক্ষ পর্যবেক্ষণ সম্ভব হচ্ছে। সম্প্রতি কক্ষপথে স্থাপিত স্পেস টেলিস্কোপ (দ্র) আগের তুলনায় সাত ভাগের এক ভাগ ক্ষীণ আলোযুক্ত জ্যোতিষ্কও উদ্ঘাটিত করতে পারবে।

আজ জ্যোতির্বিদদের সামনে রয়েছে পর্যবেক্ষণের জন্য একটি অতি বিস্তৃত ও বিচিত্র বিশ্ব। এতে রয়েছে গ্রহ (দ্র), নক্ষত্র (দ্র), গ্যালাক্সি (দ্র) বা নক্ষত্রপুঞ্জ, অতি দূরের শক্তিশালী বিকিরণশীল কোয়াসার, ক্ষণস্থায়ী উল্কা (দ্র), বিরল আগন্তুক ধূমকেতু (দ্র), হঠাৎ বিস্ফোরণে বিলয়প্রাপ্ত সুপার নোভা ইত্যাদি অসংখ্য সদস্য। পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণাকে আরো নিখুঁত করে চলেছে। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে আইনস্টাইনের (দ্র) আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছিল আজ তা একটি পূর্ণাঙ্গ কস্‌মোলজি বা বিশ্বতত্ত্বে রূপ পেয়েছে। বিগ ব্যাং তত্ত্বে (দ্র) বিশ্বাসী অধিকাংশ জ্যোতির্বিদ এখন মনে করেন, এক হাজার থেকে দু' হাজার কোটি বছর আগে একটি বৃহৎ বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছিল। এর ফলে সৃষ্ট বস্তুপুঞ্জগুলো ক্রমে ক্রমে পরস্পর থেকে সরে গিয়ে বিশ্বকে ক্রমপ্রসরমান করে রেখেছে।

জ্যোতির্বিদ্যার একটি বৈশিষ্ট্য কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে। তা হল এই বিজ্ঞানে শৌখিন চর্চাকারীদের অবদান। সাধারণ একটি দূরবীক্ষণ দিয়ে, এমনকি খালি চোখেও তাঁরা রাতের পর রাত নিজেদের উদ্যোগে পর্যবেক্ষণ করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছেন। প্রাচীন কালে জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে ভাগ্যগণনা বা জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি সম্পর্ক অনেকে কল্পনা করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সে ধারণা একেবারেই দূরীভূত হয়েছে। তখন থেকে জ্যোতিষশাস্ত্রকে অবৈজ্ঞানিক বিষয় হিসাবে পরিগণিত করা হয়, যার সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যাকে গুলিয়ে ফেলার কোনো অবকাশ নেই।

মু. ই.

www.pathagar.com

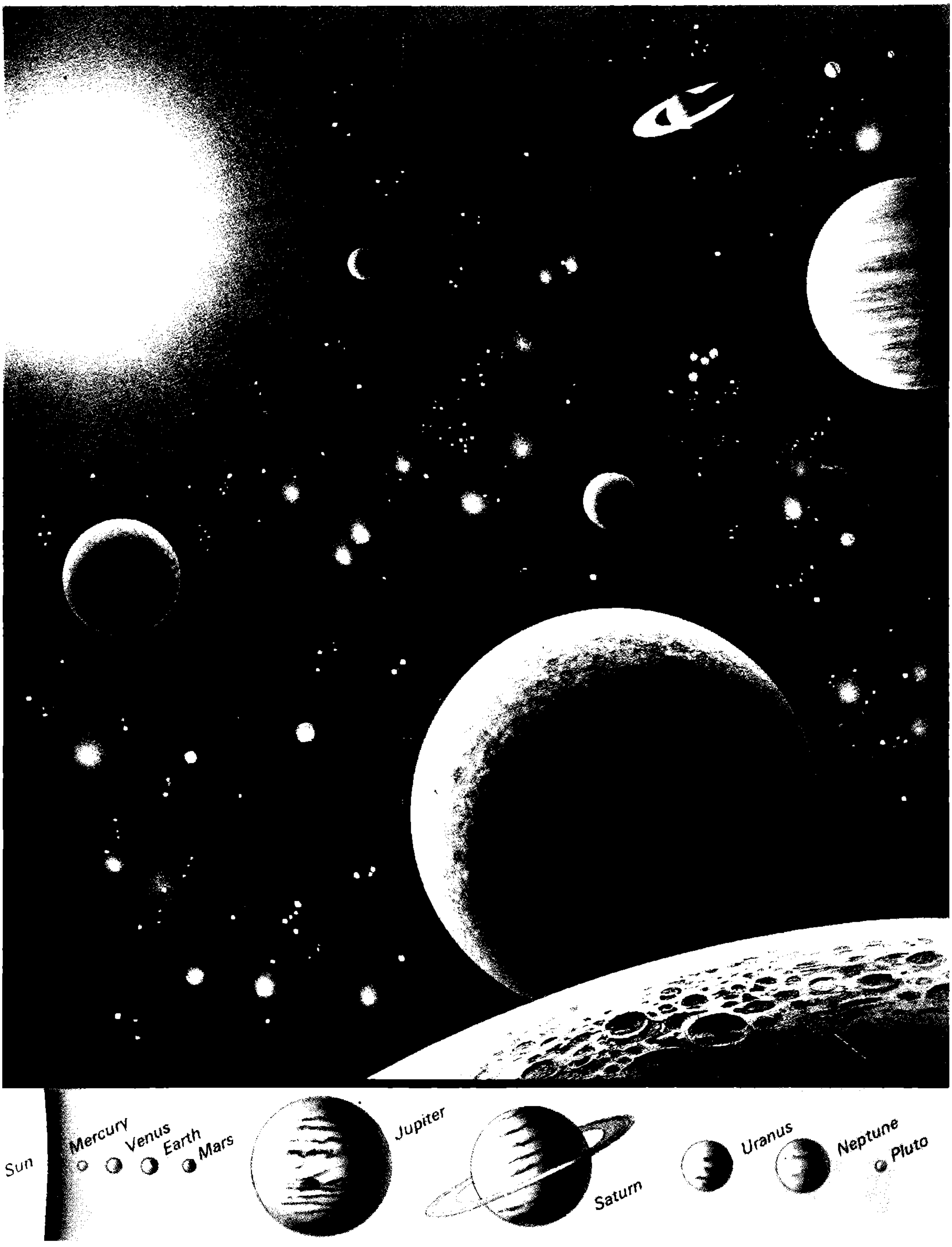

মহাবিশ্বে আমাদের সৌরজগৎ

www.pathagar.com

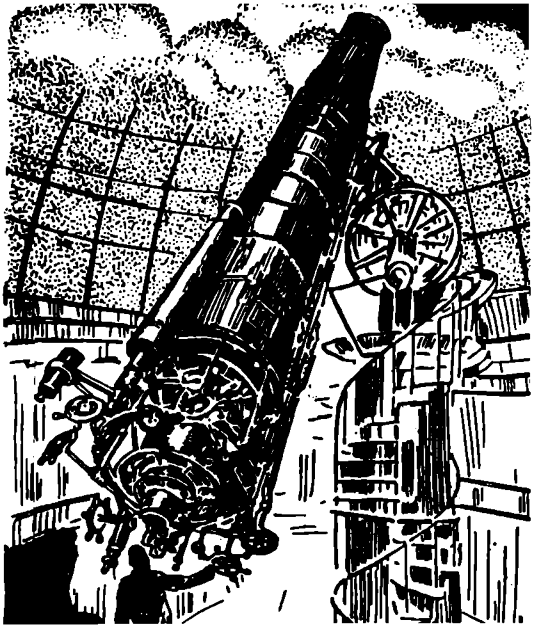

জ্যোতির্বিদ্যার কাজে ব্যবহৃত দু'টি দূরবীক্ষণ যন্ত্র

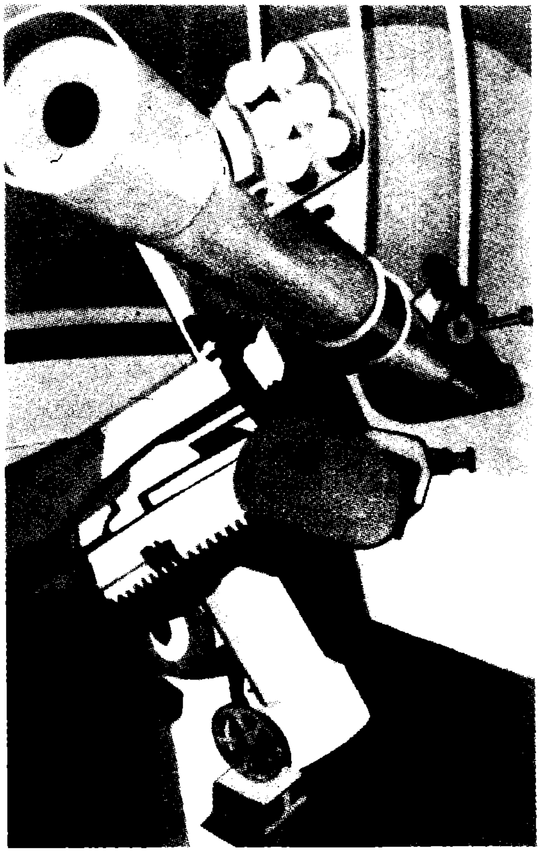

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা [১৯২০—১৯৭১]

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক। শহীদ বুদ্ধিজীবী। ১৯২০ সালের ১০ই জুলাই ময়মনসিংহ শহরের বড়বাসায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ১৯৩৬ সালে প্রবেশিকা পাশ করেন। তিনি ছাত্রজীবনে খুবই মেধাবী ছিলেন। ১৯৩৯ সালে আই. এসসি. পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৪২ সালে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়ে তিনি এম. এ. পাশ করেন।

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এম. এ. পাশ করার পর পরই ১৯৪৩ সালে গুরুদয়াল কলেজে প্রভাষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৯৪৯ সালেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের লেকচারার পদে যোগ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষক হিসাবে ফেলোশিপ নিয়ে তিনি লণ্ডন গমন করেন এবং ১৯৬৭ সালে লণ্ডন কিংস কলেজ থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার পদে উন্নীত হন।

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (দ্র) র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজ্‌ম্‌ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজচিন্তামূলক অনেক প্রবন্ধ লেখেন। দেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজে তিনি অগ্রগণ্য বিবেচিত হতেন। 'সুইনবার্ণ, স্টার্জ মুর অ্যাণ্ড এলিয়ট' নামের যে অভিসন্দর্ভ (দ্র) তিনি পিএইচ. ডি-র জন্য লেখেন, তা ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবনে তিনি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পাঁচ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ৩০শে মার্চ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

র. শা.

www.pathagar.com

শিশু-বিশ্বকোষ : দ্বিতীয় খণ্ড

ক থেকে জ

'বিশ্ব' বলতে আমরা যা যা বুঝি তার সব কিছু নিয়েই বিশ্বকোষ। আমাদের চেনা-জানা পৃথিবী ও মহাবিশ্বের কাহিনী, ইতিহাস ও পুরাকীর্তি, ভূগোল ও সভ্যতার কথকতা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন, সমাজ ও সংস্কার এবং শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবনী ও তাঁদের অবদান—এসব কিছু নিয়ে অসংখ্য তথ্য আর তত্ত্ব এখানে রয়েছে। গাছগাছালি কি পাখপাখালি, তাও বাদ যায় নি। গান-বাজনা আছে, খেলাধুলো আছে, সিনেমা-যাত্রা-থিয়েটার—এসবও আছে। তবে এই বিশ্বকোষের পরিকল্পনা ও প্রণয়ন সবই করা হয়েছে বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের কথা মনে রেখে।

দেশের অর্ধশতাধিক বিদ্বজ্জন প্রভূত পরিশ্রম করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর এই 'শিশু-বিশ্বকোষ' বইয়ের ভুক্তিগুলো রচনা করেছেন।

একাধিক খণ্ডে প্রণীত এই বিশ্বকোষের ভুক্তিসংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। আর পৃষ্ঠাসংখ্যা সব মিলিয়ে দেড় হাজারের মতো। প্রতিটি খণ্ডে রয়েছে সহস্রাধিক রঙ-বেরঙের ছবি—মানুষজনের, পশুপাখির, যন্ত্রপাতির। তার ওপর এতে আছে দেশ-বিদেশের মানচিত্র, পতাকা ইত্যাদি। এসব চিত্ররচনা এবং এর বিন্যাস ও অলঙ্করণের দায়িত্ব পালন করেছেন দেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীগণ।

বিশ্বকোষ আজীবন সঙ্গী হয় ধীমান শিক্ষিত মানুষের। ভুক্তি নির্বাচন তাই এভাবেই করা হয়েছে—'শিশু-বিশ্বকোষ' যেন শিশু-কিশোরদেরই শুধু নয়, বড়দেরও প্রয়োজন মেটায়।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

ISBN : 984-09-0364-0